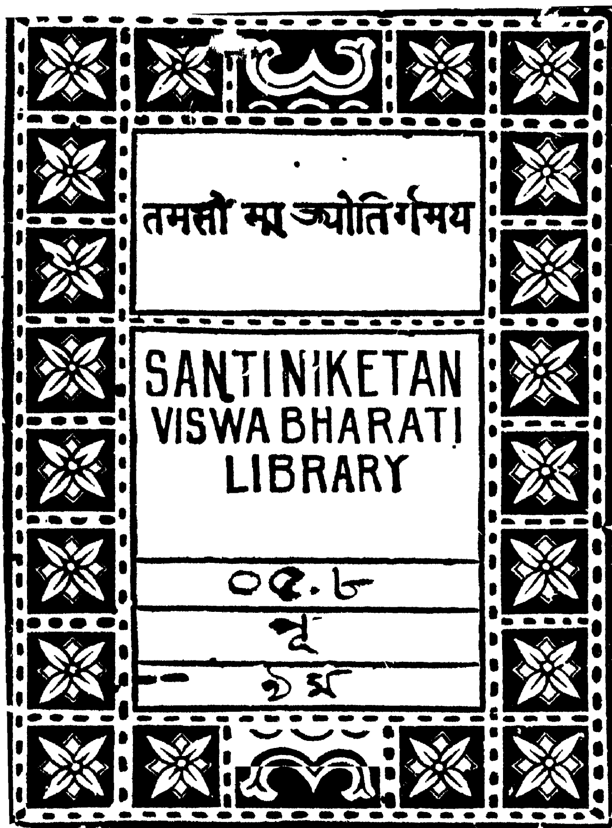

तमसो मा ज्योतिर्गमय
SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY
০৫.৮

পূর্ব্বাশা

বৈশাখ—চৈত্র ১৩৫৩

পূর্ব্বাশা

বৈশাখ—চৈত্র ১৩৫৩

সূচীপত্র

অ

আ

এ

ক

খ

গ



ভারতবর্ষ

সুজাতা

বৈশাখ, ১৩৪৩

শিল্পী—চারু রায়

চিত্রাধিকারী—মণি ঘোষ

পূর্বাশা

নবম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ • ১৩৫৩

বাসুদেব কৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতা

প্রবোধচন্দ্র সেন

বাসুদেব কৃষ্ণ

মহাভারতে গীতা ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণের বাণী বলে বর্ণিত হয়েছে। এই কৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় পৌরাণিক কাহিনী বর্জন করে যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যা জানা যায় তা অতি সামান্য। এস্থলে সমস্ত বিচারবিতর্ক পরিহার করে তাই বিবৃত করছি।

বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাবকাল নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তাঁর সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে। এই উপনিষদ্‌টি প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলির অন্যতম এবং এটি যে বুদ্ধদেবের (খ্রী পূ ৫৬৫-৪৮৫) পূর্ববর্তী তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত এই উপনিষদ্‌টি খ্রী পূ ৬০০ অব্দের পরবর্তী নয়, এই হচ্ছে পণ্ডিতগণের অভিমত। পক্ষান্তরে যে বৃষ্ণি বা সাত্বত কুলে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ঋক্ প্রভৃতি বেদসংহিতায় তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণগুলিতে আছে। সুতরাং কৃষ্ণ খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই অনুমান অসংগত নয়।

মথুরানগরীতে যাদব জাতির অন্তর্গত বৃষ্ণি কুলে তাঁর জন্ম। এই বংশের অপর নাম সাত্বত। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাঁর পিতার নাম নেই, মাতা দেবকীর নাম আছে। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্র, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতার নাম বসুদেব। পাতঞ্জল মহাভাষ্য (খ্রীস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর ভ্রাতা বলদেব বা সংকর্ষণের নাম পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকেই জানা যায় আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর নামক একজন ঋষি ছিলেন তাঁর গুরু। এই গুরুর নিকট কৃষ্ণ শ্রুতি শিক্ষা করেছিলেন। মহাভারতে

(কর্ণপর্ব ৬৯।৮৫) কৃষ্ণ আঙ্গীরসী শ্রুতিকে 'শ্রুতীনাম্ উত্তমা শ্রুতিঃ' বলে বর্ণনা করেছেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে শ্রুতিশিক্ষা সমাপ্ত করে কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু এ কথার ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করবার উপায় নেই।

মথুরায় বৃষ্ণিদের শাসনপদ্ধতি ছিল গণতান্ত্রিক। প্রাচীন কালে গণতন্ত্রকে বলা হত সংঘ। মহাভারতে বাসুদেব কৃষ্ণকে সংঘমুখ্য অর্থাৎ উক্ত বৃষ্ণিসংঘের নায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ জাতক, মহাভারত, পুরাণ ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায়, কংস মথুরায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হলে কৃষ্ণ তাঁকে নিহত করেন। এই কাহিনী সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের কোনো যোগ ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। বৌদ্ধ জাতকে স্বতন্ত্রভাবে পাণ্ডবদের কথাও আছে, কৃষ্ণের কথাও আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ স্বীকৃত হয় নি। বৌদ্ধ জাতক, মহাভারত এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃষ্ণিগণকে ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে একস্থলে বৃষ্ণিরা ব্রাত্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার হীন) বলে নিন্দিত হয়েছে (দ্রোণপর্ব ১৪১।১৫)। মহাভারত এবং পুরাণের অনেক কাহিনী থেকে মনে হয় কৃষ্ণ নিজেও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। মহাভারতের শিশুপালবধের কাহিনী থেকে অনুমান করা যায়, ব্রাহ্মণেরাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ঘোর আঙ্গিরস এবং তাঁর শিষ্য কৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুকূল ছিল না।

কৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস ছিলেন সূর্যোপাসক। সুতরাং কৃষ্ণ তাঁর কাছে যে ধর্ম শিখেছিলেন তাও স্বভাবতই সূর্যোপাসনামূলক ছিল। এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে ছান্দোগ্য উপনিষদেই। কৃষ্ণপ্রবর্তিত ধর্ম এককালে সাত্বত ধর্ম নামে পরিচিত ছিল; মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৩৫।১৯) সাত্বত ধর্মকে 'প্রাক্‌সূর্যমুখনিঃসৃত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণোক্ত ধর্ম প্রথমে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্যকর্তৃক কথিত হয়েছিল, এমন উক্তি গীতাতেও (৪।১) আছে। তা ছাড়া কৃষ্ণ স্বীয় গুরুর নিকট 'পুরুষযজ্ঞ-বিদ্যা' শিক্ষা করেছিলেন। পুরুষযজ্ঞ কথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জীবনযজ্ঞ, মানুষের সমগ্র জীবনটিকেই একটি যজ্ঞ বলে গ্রহণ করতে হবে। এই যজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে 'তপোদানমার্জবমহিংসাসত্যবচনাম্'। এই পুরুষযজ্ঞ বা জীবনযজ্ঞকে স্বীকার করলে বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণ বৈদিক যজ্ঞের আর প্রয়োজন থাকে না এবং যজ্ঞের পুরোহিতকে অর্থদক্ষিণাও দিতে হয় না। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই জীবনযজ্ঞ যে সকল নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে 'অহিংসা' অন্যতম। অহিংসানীতি স্বভাবতই পশুহিংসামূলক বিধিযজ্ঞের, সুতরাং যজ্ঞপ্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও, অনুকূল নয়। পরবর্তী কালে অহিংসা নীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক সদয়হৃদয় বুদ্ধদেবও পশুঘাতমূলক যজ্ঞবিধির

নিন্দা করতেন। কৃষ্ণ ও বুদ্ধ উভয়েই ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞে পশুহিংসার বিরোধী। এইজন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা উভয়ের প্রতিই অপ্রসন্ন ছিলেন।

গুরুর নিকট কৃষ্ণ যে শিক্ষা পেয়েছিলেন গীতাতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। আঙ্গিরসী শ্রুতির ন্যায় গীতোক্ত ধর্মও যে আসলে সূর্যভক্তিমূলক সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত পুরুষযজ্ঞ বা জীবনযজ্ঞের আদর্শটিও গীতাতে (৯।২৭) আছে। যথা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

গীতায় শুধু যে যজ্ঞের রূপকার্থই করা হয়েছে তা নয়। সাধারণ বৈদিক যজ্ঞকে দ্রব্যময় যজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ" (৪।৩৩)। "তপোদানমার্জবমহিংসাসত্যবচনম্", আঙ্গিরস কথিত জীবনযজ্ঞের এই নীতিগুলিও গীতাতে (১৬।১-২) বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। যথা—

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্
অহিংসা সত্যম্।

দেখা গেল আঙ্গিরস কথিত ধর্মের মূলনীতিগুলি প্রায় অবিকৃত ভাবেই গীতাতে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা অসংগত নয় যে, কৃষ্ণকথিত নীতিসমূহও গীতায় বহুলাংশেই সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের বাক্য যে গীতায় অবিকল ধৃত হয়নি, তাও নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। কারণ গীতা যে গ্রন্থ হিসাবে কৃষ্ণের সমকালীন নয়, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত।

গীতার রচনাকাল

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদির ঐতিহাসিক আলোচনা অনেক ধার্মিক ভক্তের নিকট নিষ্প্রয়োজন মনে হতে পারে। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনাতেও ঐতিহাসিক দৃষ্টি বর্জন করা চলেনা। ঐতিহাসিক পারম্পর্যবোধ না থাকলে অপব্যাখ্যা করার খুবই আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে কোনো গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে তার তাৎপর্যগ্রহণে স্বভাবতই অনেকটা সহায়তা হয়। সুতরাং গীতার রচনাকাল নির্ণয়েরও যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাচ্ছে।

গীতায় (১৩।৪) ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্রের উল্লেখ আছে। বেদান্তসূত্র প্রধান উপনিষদ্গুলির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গীতা মুখ্য উপনিষদ্গুলির পরবর্তী তাতে সন্দেহ নেই। "সর্বোপনিষদো গাবঃ···দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ", গীতামাহাত্ম্যের এই উক্তি

থেকেও প্রমাণিত হয় যে গীতা উপনিষদ্‌যুগের পরবর্তী এ ধারণা অনেক কাল যাবৎই আছে। ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় গীতা সূত্রযুগের (খ্রী পূ ৬০০-৩০০) পূর্ববর্তী হতে পারে না। গীতার বেদান্ত (১৫।১৫) এবং সাংখ্য (১৮।১৩,১৯) দর্শনের উল্লেখ থেকেও একথা সমর্থিত হয়। বস্তুত সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি তৎকালীন দর্শন সমূহের সমন্বয়সাধনই গীতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেদান্তসূত্রে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদগুলি 'শ্রুতি' বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু শংকর, রামানুজ এবং মধ্ব প্রমুখ ভাষ্যকারগণের মতে বেদান্তসূত্রে গীতা উল্লিখিত হয়েছে 'স্মৃতি' বলে। পণ্ডিতগণ গীতা এবং মনুসংহিতার মধ্যে নানা বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

গীতা যে বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পরবর্তী একথা মনে করবার কারণ আছে। গীতায় একস্থানে (৬।১৫) মোক্ষ অর্থে 'নির্বাণ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু গীতায় বৌদ্ধ ধর্ম বা ভাবধারার কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। তথাপি গীতাকে বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পরবর্তী-কালীন বলে স্বীকার করার পক্ষে যথেস্ট হেতু আছে। গীতায় বর্ণস্বাতন্ত্র্য ও কুলধর্ম রক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ এবং বর্ণসংকর (১।৪০-৪২, ৩।২৪) তথা স্বধর্মত্যাগ ও পরধর্মগ্রহণের (৩।৩৫, ১৮।৪৭) ফলে সমাজবিপ্লব ও ধর্মগ্লানির (৪।৭) আশঙ্কা লক্ষিত হয়। এই আগ্রহ ও আশঙ্কা ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক নয়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, গীতায় বর্ণিত সামাজিক অবস্থা তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত গীতায় বর্ণ ও কুলগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বধর্ম রক্ষার পক্ষে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ওই বিপ্লব রোধ করাই তার উদ্দেশ্য বলে অনুমান করা যায়। তাছাড়া গীতায় কর্মবিমুখতার বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বৌদ্ধ প্লাবনের ফলস্বরূপ দেশব্যাপী সন্ন্যাসধর্মের প্রাবল্য প্রতিরোধ করাই তার লক্ষ্য, এই অনুমানও অসংগত নয়। মৌর্য-সম্রাট অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব সামান্যই ছিল। অশোকের রাজত্বকালেই (খ্রী পূ ২৭২-২৩২) বৌদ্ধ ধর্ম দেশব্যাপী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল। সুতরাং গীতায় যে সামাজিক অবস্থা সূচিত হয়েছে তা যদি বৌদ্ধ প্রভাবের ফল বলে স্বীকৃত হয় তাহলে গীতাকেও অশোকের পরবর্তী বলেই মনে করতে হয়। বস্তুত ক্ষাত্রধর্মের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিমুখতার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ গীতায় ধ্বনিত হয়েছে তা অশোক কর্তৃক যুদ্ধত্যাগের পরবর্তী অবস্থার সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 'মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়' হয়েও রাজচক্রবর্তী অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করে শুধু 'অদণ্ড' ও 'অসাহস'এর দ্বারাই সমগ্র জম্বুখণ্ড অর্থাৎ ভারতবর্ষ-ব্যাপী সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে (অঙ্গুত্তরনিকায়) তাঁর প্রশংসাই করা হয়েছে।* কিন্তু গীতায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধত্যাগের পুনঃ পুনঃ নিন্দাই করা হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (খ্রীস্ট পূর্ব সপ্তম শতক) দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একজন মানুষ মাত্র। পাণিনির (খ্রী পূ পঞ্চম শতক) অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে (৪।৩।৯৮) কৃষ্ণ ভক্তির পাত্র বলে গণ্য হলেও তিনি একজন ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকৃত। মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ থেকে জানা যায়, খ্রীস্ট পূর্ব চতুর্থ শতকেও ভারতীয় হেরাক্লিস অর্থাৎ কৃষ্ণ দেবত্বে উন্নীত হননি। কিন্তু খ্রীস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের পাতঞ্জল মহাভাষ্যে বাসুদেবের দেবত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং ওই শতকেরই বেসনগর গরুড়স্তম্ভ লিপিতে বাসুদেবকে একেবারে 'দেবদেব' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতাতেও দুই স্থলে (১০।১৫, ১১।১৩) তাঁকে দেবদেব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তথাপি গীতাকে উক্ত স্তম্ভলিপির কিছু পূর্ববর্তী বলে মনে করাই সমীচীন। কেননা গীতারচনাকালেও অনেকেই বাসুদেবের দেবদেবত্ব স্বীকার করত না, এমন প্রমাণ আছে গীতাতেই। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' (৭।১৯), এবং 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (৯।১১), এই দুটি উক্তি বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই অবজ্ঞাকারী কারা এবং তাদের এই অবজ্ঞার কারণ কি তা জানা যায় শিশুপালের একটি উক্তি থেকে।

যদ্যয়ং জগতঃ কর্তা যথৈনং মূর্খ মন্যসে।
কস্মান্ন ব্রাহ্মণং সম্যগাত্মানমবগচ্ছতি॥

—মহাভারত, সভা, ৪২।৬

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ নন বলেই ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা তাঁর দেবত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন। উদ্ধৃত মূঢ় এবং মূর্খ শব্দের প্রয়োগ থেকে সহজেই বোঝা যায় এক কালে বাসুদেবপক্ষ ও ব্রাহ্মণপক্ষের কলহ কম তীব্র ছিল না। গীতা রচনার সময়েও সে কলহ একেবারে প্রশমিত হয়নি। কালক্রমে উভয় পক্ষই কলহ ত্যাগ করে পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। ব্রাহ্মণরা বাসুদেব কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে তাঁকে নারায়ণ ও বিষ্ণুর অবতার বলে গ্রহণ করলেন এবং বাসুদেবপন্থীরাও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ও যজ্ঞের উপযোগিতা স্বীকার করলেন। এই সন্ধি স্থাপনের প্রমাণ আছে উভয় পক্ষের সাহিত্যেই। বলা বাহুল্য বাসুদেব পক্ষে প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে গীতা। তাতেই দেখা যায় কৃষ্ণপ্রবর্তিত নীতি ও ভক্তিপ্রধান সাত্বত বা ভাগবত ধর্ম এবং বেদপ্রবর্তিত যজ্ঞপ্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে কতকটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে। জীবনযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা মানলেও গীতায় দ্রব্যযজ্ঞের উপযোগিতা একেবারে অস্বীকৃত হয়নি। তপোদানমার্জবমাহিংসাসত্যবচনম্ এবং দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদঃ, ভাগবত ধর্মের এই মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে যজ্ঞ এবং স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠও প্রশংসিত হয়েছে (১৬।১-২)। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন (২।৪৫) ইত্যাদি স্থলে বেদের উপযোগিতা

অস্বীকৃত হলেও অন্যত্র বেদের প্রশংসা আছে। শুধু বেদের নয়, গীতাতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃত হয়েছে। আমরা দেখেছি ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় ধর্মপ্রবর্তক কৃষ্ণ ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। একথা সুবিদিত যে, বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই উপনিষদ্ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় পেয়েছিল এবং সেজন্যেই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নামে আখ্যাত হয়েছে। গীতাও মূলত উপনিষদের তত্ত্ববিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, বস্তুত গীতা নিজেও একটি উপনিষদ্ বলেই স্বীকৃত। সুতরাং গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় যে মূলত ছিল ক্ষত্রিয়স্বীকৃত রাজবিদ্যা তাতে সন্দেহ নেই। গীতাতেই (৪।১-২) বলা আছে যে, ইক্ষ্বাকুপ্রমুখ রাজর্ষিরাই ছিলেন এই গ্রন্থোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার ধারক ও বাহক। গীতার দশম অধ্যায়ে কৃষ্ণ মানুষের মধ্যে রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কেই শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন (বিদ্ধি মাং···নরাণাঞ্চ নরাধিপম্, ১০।২৭)। সুতরাং দেখা গেল ভাগবত সম্প্রদায়ে মূলত ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যই স্বীকৃত ছিল। কিন্তু গীতা রচনার সময়ে এই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। গীতায় এক জায়গায় (৫।১৮) বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালের প্রতি সমজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষার দ্বারাই প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, ক্ষত্রিয়ের নয়। তাছাড়া অন্যান্য স্থলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা মেনে নেওয়া হয়েছে। গীতায় এক স্থলে (১০।২১) বাসুদেব বলেছেন, 'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ'। কিন্তু একটু পরেই আছে, 'রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি'। দুই জায়গায় কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলে সম্বোধন করা হয়েছে (১১।২৪, ৩০)। অন্যত্র তাঁকে বলা হয়েছে মহেশ্বর অর্থাৎ শংকর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গীতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্মের সমন্বয় এবং বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেবের ঐক্য স্থাপন সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এই সমন্বয় ও ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। গীতাকে এই সময়ের কিছু পূর্ববর্তী বলে মনে করার এও একটি কারণ। গীতা যেমন বাসুদেবপক্ষের গ্রন্থ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক তেমনি ব্রাহ্মণ পক্ষের গ্রন্থ। এই আরণ্যকের দশম প্রপাঠকে বাসুদেব স্পষ্ট ভাষায় নারায়ণ বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। এই দশম প্রপাঠকটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের খিলরূপ অর্থাৎ পরিশিষ্টাংশ বলে বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এই অংশটিকে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের (অর্থাৎ গীতার সমকালীন) রচনা বলে মনে করেন। এর থেকেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় যে, ভাগবত ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয়ই এই সময়ের ঘটনা।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভাগবত ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের কি প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল, ঐতিহাসিকগণ এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অনুমান করেন ঐ সময়ে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের দেশব্যাপী

প্রভাব বিস্তারের ফলে এই উভয় সম্প্রদায়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং তৃতীয় পক্ষের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরের আপসরফা করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্বে বলেছি গীতায় বর্ণিত সামাজিক অবস্থাও অশোকের পরবর্তী কালেই সম্ভব। গীতায় ধর্মের গ্লানি নিবারণ ও সমাজরক্ষার যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে তা বৌদ্ধ প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনজাত বলেই মনে হয়। এই অবস্থায় ভাগবত সম্প্রদায় যদি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করতে উৎসুক হয়ে থাকে তাহলে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

গীতায় অবতারবাদ অতি স্পষ্ট ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে (৪।৭-৮, ৯।১১)। কিন্তু সে অবতারবাদ পরবর্তী কালের ন্যায় পূর্ণপরিণত নয়। তাছাড়া গীতায় পত্রপুষ্পফল ও জলের দ্বারা কৃষ্ণপূজার উল্লেখ আছে—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি (৯।২৬)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এবং মহাভাষ্যের সমকালীন ঐতিহাসিক খোদিত লিপিতে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা সংকর্ষণের পূজারও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু গীতায় সংকর্ষণের ঈশ্বরত্ব ও পূজা স্বীকৃত হয়নি। এসব কারণে গীতাকে মহাভাষ্যের অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ববর্তী বলেই মনে হয়। আগে দেখিয়েছি গীতাকে অশোকের (খ্রী পূ ২৭২-২৩২) পরবর্তী বলে মনে করার হেতু আছে। সুতরাং খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ বা দ্বিতীয় শতকের প্রথম অংশকেই গীতার রচনাকাল বলে নির্দেশ করতে হয়। ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্গের বিচারেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেসব গৌণ যুক্তির অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তী কালে ভারতীয় সাহিত্যে গীতাপ্রভাব ও গীতাচর্চার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তার থেকে প্রকারান্তরে গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।

গীতার আদর ও চর্চা

ভারতীয় ধর্মসাহিত্য তথা ভারতীয় জাতীয় মনের উপরে গীতার প্রভাব যে কত গভীর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেক পর্বেই গীতার সমাদর ও চর্চার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে তারই একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

সদ্‌ধর্মপুণ্ডরীক একটি বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খ্রীস্ট জন্মের পূর্বেই এটি রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের উপর গীতার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। বোঝা গেল

বৌদ্ধ ধর্ম তথা সাহিত্যও গীতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। কুষাণ সম্রাট্ কনিষ্কের (খ্রী ৭৮-১০১) সমকালীন বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতেও গীতার চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক নাগার্জুনও (খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক) গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। গুপ্তযুগে মহাকবি কালিদাস (পঞ্চম শতক) যে গীতার একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে তাঁর রচনাতেই। কুমারসম্ভবের এক স্থানে (৬।৬৭) 'স্থাবরাত্মা' হিমালয়কে বিষ্ণুর বিভূতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুরাহুর্মণীষিণঃ।

এর ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বলেছেন, স্থাবরাণাং হিমালয় ইতি গীতাবচনাৎ (গীতা ১০.২৫)। রঘুবংশেও গীতার আভাস আছে। যথা—

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃ সংনিবৃত্তয়ে॥
—রঘুবংশ ১০.২৭

এর সঙ্গে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৬-৭ সংখ্যক শ্লোকের, বিশেষত 'ময্যাবেশিতচেতসাম্' কথাটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্মণোঃ॥
—রঘুবংশ ১০.৩১

এর সঙ্গে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২২-২৪ সংখ্যক শ্লোক তুলনীয়। 'জন্মকর্ম' কথাটিও গীতায় আছে (৪।৯, ২।৪৩)।

অতঃপর হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭) সভাকবি বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্য থেকে জানা যায় তৎকালে গীতাপাঠ ও গীতাশ্রবণ জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। নবম শতকে কেরল প্রান্তের শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০) যে গীতাভাষ্য রচনা করেন তাতে গীতাচর্চার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। ওই শতকেই দেখি বিখ্যাত কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মা (৮৫৫-৮৮৩) গীতার নির্দেশমতোই (৮।৫, ১৩) 'অন্তকালে' গীতাশ্রবণ ও বৈকুণ্ঠনাথ অর্থাৎ বাসুদেবকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন। নবম শতকে কাশ্মীরে গীতাচর্চা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বসুগুপ্ত, ভাস্কর, অবন্তিবর্মার সভাপণ্ডিত আনন্দবর্ধন, ও রাজানক রামকণ্ঠ, এই চারজন টীকাকারের আবির্ভাব থেকেই বোঝা যায় নবম শতকে কাশ্মীরে গীতার চর্চা কতখানি সমাদর লাভ করেছিল। ইদানীংকালে রামকণ্ঠের 'সর্বতোভদ্র' টীকা পণ্ডিতমহলে নানা কারণে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং দেখা গেল নবম শতকেই

গীতা কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্তকেই অধিকার করে ফেলেছিল। দশম শতকের শেষে বা একাদশ শতকের প্রথমে কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত গীতার ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তুর্কি মণীষী অলবেরুনির (৯৭৩-১০৪৮) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৈদেশিক মহাপণ্ডিত ভগবদ্‌গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্ববিদ্যার গভীরতায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গেই গীতা থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বৈদেশিকদের মধ্যে বোধ করি অলবেরুনিই সর্বপ্রথম গীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তী কালেও অনেক মুসলমান মণীষী গীতার গৌরব স্বীকার করেছেন এবং ফারসি ভাষাতে গীতার অনুবাদও হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতার জনপ্রিয়তার আরেক প্রমাণ এর অনুকরণে বহু নূতন নূতন গীতা রচনা। এসব নূতন গীতার মধ্যে অন্যূন চোদ্দখানি মহাভারতেই সংকলিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উতথ্যগীতা, বামদেবগীতা, ঋষভগীতা, ষড়জগীতা, পিঙ্গলগীতা, শম্পাকগীতা, মঙ্কিগীতা, বোধ্যগীতা, হারীতগীতা, বৃত্রগীতা, পরাশরগীতা এবং হংসগীতা, এই বারোখানি শান্তিপর্বে এবং অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা আশ্বমেধিক পর্বে স্থান পেয়েছে। শেষোক্ত দুখানিও ভগবদ্‌গীতার ন্যায় কৃষ্ণকথিত বলে প্রসিদ্ধ এবং এদের খ্যাতিও অপেক্ষাকৃত অধিক। এগুলি ছাড়া রামগীতা, শিবগীতা, গণেশগীতা, দেবীগীতা, কপিলগীতা, অষ্টাবক্রগীতা প্রভৃতি আরও অনেক গীতা আছে। গীতার পূর্বে উপনিষদ্ নামটিও অনুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বৈদিক উপনিষদ্‌গুলির অনুকরণে একসময়ে বহু উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল। মনে রাখা উচিত যে, ভগবদ্‌গীতাও এরূপ একখানি উপনিষদ্ বলেই পরিচিত। এ প্রসঙ্গে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের জনপ্রিয়তাও স্মরণীয়। মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত, হংসদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতি বহু দূতকাব্য রচিত হয়েছিল। এরকম অনুকরণের প্রবর্তক উপনিষদ্ ও গীতা।

গীতার জনপ্রিয়তার আরও এক প্রমাণ পুরাণাদি গ্রন্থে প্রচারিত গীতামাহাত্ম্য। তার মধ্যে বরাহপুরাণ ও বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্য এবং গরুড় পুরাণের অন্তর্গত 'গীতাসার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ভগবদ্‌গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গালবকণিকা পীতা' ইত্যাদি উক্তিও গীতার মাহাত্ম্যপ্রচারে কম সহায়তা করেনি।

গীতাগৌরবের সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রমাণ তার টীকা ও ভাষ্য-বাহুল্য। বস্তুত গীতার যত ভাষ্য বা ব্যাখ্যা হয়েছে, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যেই আর কোনো গ্রন্থের এত ব্যাখ্যা হয়নি। খ্রীস্টীয় নবম শতকে শংকরাচার্যকৃত ভাষ্যই বোধ করি গীতার প্রথম ব্যাখ্যা। সে সময় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত গীতাব্যাখ্যার আর বিরাম নেই। ভারতবর্ষের মতো বিরাট্ দেশে গীতার মতো ক্ষুদ্রায়তন বই নিয়ে সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ এই যে অবিরাম ব্যাখ্যা ও আলোচনা চলছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এর

থেকেই ভারতবর্ষে গীতার গুরুত্ব ও প্রভাব কতখানি তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। গীতা আলোচনার পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া সহজ নয়। এস্থলে ওই ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা অর্থাৎ বড়ো বড়ো ভাষ্যকার ও তাঁদের কার্যের সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র দিলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

গীতার প্রথম ভাষ্যকার শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০)। তাঁর জন্মমৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে; তবে তিনি অষ্টম শতকের শেষ পাদ ও নবম শতকের প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন এবিষয়ে বোধ করি সংশয় করা চলে না। ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে কেরল অর্থাৎ মালাবার অঞ্চলে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম এবং হিমালয়ের পাদদেশে কেদারনাথে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক। তিনি যে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই দার্শনিক ঐক্য প্রচার করেছিলেন তা নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও সমগ্র ভারতবর্ষকে এক ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করা ছিল তাঁর সাধনা। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে তার জন্ম এবং উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদচ্ছায়ায় তাঁর মৃত্যু; সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করে অদ্বৈতবাদ প্রচার ব্রত এবং উত্তরে হিমাদ্রিসানুতে বদরিকা, দক্ষিণে মহিষুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরি, পূর্বসাগরতীরবর্তী পুরী ও পশ্চিমসাগরতীরস্থ দ্বারকা, ভারতবর্ষের এই চতুঃসীমায় চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা তথা উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। সামান্য বত্রিশ (মতান্তরে চল্লিশ) বৎসরব্যাপী জীবনে জ্ঞান ও কর্মের এই অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত শংকরাচার্যের মধ্যে তৎকালীন ভারতীয় প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছিল সন্দেহ নেই।

শংকরাচার্যের প্রায় সমকালীন কাশ্মীরী টীকাকার বসুগুপ্ত, ভাস্কর, আনন্দবর্ধন ও রামকণ্ঠ (নবম শতক) এবং তৎপরবর্তী অভিনবগুপ্তের (দশম-একাদশ শতক) নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতঃপর উল্লেখ করতে হয় যামুনাচার্যের নাম। তাঁর আবির্ভাবকাল সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না, তবে তিনি যে একাদশ শতকের লোক তাতে সন্দেহ নেই। দ্রাবিড়ভূমির অন্তর্গত বীরনারায়ণপুর নগরে (আধুনিক মন্নরগুড়ি, দক্ষিণ আর্কট জেলা) তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম ঈশ্বরভট্ট। তাঁর পিতামহ নাথমুনি বা রঙ্গনাথাচার্য শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও দার্শনিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক; এই মতবাদ প্রচার করে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন তার প্রভাব একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি মথুরায় তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে যমুনা নদী দর্শনের স্মৃতিরক্ষার জন্যে পৌত্রের নাম রাখেন যামুন। নাথমুনি ত্রিচিনপল্লির নিকটে শ্রীরঙ্গম নগরে বাস করতেন এবং সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যামুনাচার্যও পিতামহের ন্যায় শ্রীরঙ্গম নগরে অধিষ্ঠিত হয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচনার মধ্যে সিদ্ধিত্রয়,

আগামপ্রামাণ্য ও গীতার্থসংগ্রহ বিখ্যাত। শংকরাচার্য গীতার ব্যাখ্যা করেছিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের আলোকে, এই অদ্বৈতবাদে ভক্তির স্থান নেই। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ভক্তির স্থান খুব বড়ো। বলা বাহুল্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য গীতার ব্যাখ্যায় ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা রামানুজাচার্য। যামুনাচার্য নিজেই রামানুজকে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্য মনোনীত করে যান। রামানুজের জন্মকাল নিঃসন্দেহে জানা যায় না। তিনি একাদশ শতকের শেষার্ধে মাদ্রাজের নিকটবর্তী শ্রীপেরুমবুদুর নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি কাঞ্চী নগরীতে যাদবপ্রকাশ নামক এক অদ্বৈতবাদীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে তৎকালীন বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। যামুনাচার্যের মৃত্যুর পরে তার স্থলে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে দ্রাবিড়ভূমির চোলরাজার উৎপীড়নে স্বদেশ ত্যাগ করে কর্ণাটের রাজা বিষ্ণুবর্ধন হোয়সলের (১১১১-১১৪১) আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১১৩৭ সালে শ্রীরঙ্গমে তাঁর মৃত্যু হয়। রামানুজের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তসার, বেদান্তদীপ এবং বেদান্তসূত্র ও গীতার ভাষ্য এখনও শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হয়ে থাকে। রামানুজকথিত সাধনপ্রণালী প্রধানত গীতার ভক্তিবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রামানুজের নায়কতায় শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্" এই গীতাবচন (৯ ৩২) অনুসারে নিম্নবর্ণ ও অন্ত্যজগণের মুক্তির অধিকার এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণশূদ্রের সমতা স্বীকার করত, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে বর্ণগত পার্থক্য কঠোর-ভাবেই মেনে চলত।

অতঃপর উল্লেখ করতে হয় নিম্বার্কাচার্য (আনুমানিক ১১০০-১১৬২) এবং মধ্বাচার্য আনন্দতীর্থের (১১৯৭-১২৭৬) নাম। নিম্বার্ক অন্ধ্র ব্রাহ্মণ, বেল্লারি জেলায় নিম্বগ্রামে তাঁর জন্ম। মধ্বাচার্যের জন্ম কর্ণাটের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়া জেলায় কল্যাণপুর বা রজতপীঠ নামক গ্রামে মধ্যগেহনামক এক ব্রাহ্মণ বংশে। নিম্বার্ক ও মধ্বাচার্য উভয়েই নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে শংকরাচার্যের মায়া ও অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও স্বমত স্থাপনে প্রয়াসী হন। নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী; তিনি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীদের বৃন্দাবন লীলাকে প্রাধান্য দান করেন এবং নিজেও বৃন্দাবনবাসী হন। তাঁর সম্প্রদায় সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষত মথুরা অঞ্চলে ও বাংলাদেশে, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, তাঁর ধর্মতত্ত্বে রাধাকৃষ্ণের স্থান নেই এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটভূমিতে। মধ্বাচার্য উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, গীতা এবং ভাগবত পুরাণের ভাষ্য লেখেন। তিনি শাংকর

অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মধ্বাচার্যের প্রায় সমকালেই বিষ্ণুস্বামীর আবির্ভাব। তিনিও দাক্ষিণাত্যবাসী এবং দ্বৈতবাদী। তাঁর ধর্মমত অন্যান্য বিষয়েও মধ্বাচার্যের অনুরূপ, কিন্তু তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্বে রাধাকে স্বীকার করেছেন। বিষ্ণুস্বামী গীতাভাষ্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

এই সময়ে (ত্রয়োদশ শতকে) মহারাষ্ট্রভূমিতেও বৈষ্ণব ভক্তিবাদের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। মরাঠি ভক্ত কবিদের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। কিন্তু তিনি গুরুর দ্বৈতবাদ সমর্থন করতে পারেননি, অদ্বৈতবাদের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। তাঁর কৃত জ্ঞানেশ্বরী নামক ভগবদ্‌গীতার মরাঠি পদ্যব্যাখ্যা গীতার প্রভাব বিস্তার তথা মরাঠি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের স্মরণচিহ্ন বলে গণ্য হতে পারে। গীতার এই মরাঠি ব্যাখ্যার তারিখ ১২৯০ অব্দ।

ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে অন্ধ্রদেশে বল্লভাচায (১৪৭৮-১৫৩০) এবং বাংলাদেশে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৪) বৈষ্ণবধর্মে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেন। বল্লভদেব কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। চৈতন্যদেব দক্ষিণাপথ ও আর্যাবর্ত সহ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। বল্লভাচার্য ও চৈতন্যদেব, উভয়ের প্রচারিত নীতিতেই রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রাধান্য পেয়েছে; তাঁদের ধর্মনীতির সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার প্রত্যক্ষত বিশেষ সম্পর্ক নেই। বস্তুত মধ্যযুগে নিম্বার্ক প্রমুখ আচার্য প্রবর্তিত ধর্মে রাধাকৃষ্ণের যতই প্রাধান্য পেতে লাগল ততই বাসুদেব প্রবর্তিত ও ভগবদ্‌গীতায় ধৃত আদিম ভাগবত ধর্ম নূতন নূতন মতবাদ ও অনুষ্ঠানের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু গীতার সমাদর ও চর্চা সমানভাবেই চলল। বৈষ্ণব সমাজে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা কাহিনীর প্রাধান্য ঘটলেও, তাঁদের মধ্যে গীতাচর্চা কখনও বিরত হয়নি। বৈষ্ণব সমাজের বাইরে গীতার চর্চা ও টীকাভাষ্যাদি রচনার অসাম্প্রদায়িক ধারাটিও অবিচ্ছিন্ন গতিতেই চলল। এই ধারার ইতিহাস অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মধ্যযুগে যে সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমশঃ পৌরাণিক কাহিনীর পথে অগ্রসর হল তখন থেকেই ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ধর্মের স্থান অধিকার করতে লাগল। অবশ্য তার সূচনা হয়েছিল অতি প্রাচীন কালেই। ভগবদ্‌গীতা অবশ্য মূলত ভাগবত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু আমরা দেখেছি অতি প্রাচীন কালেই অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রমুখ বৌদ্ধরাও গীতার প্রভাব মেনে নিয়েছিলেন। কালিদাস ভাগবত বা বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি সম্ভবত ছিলেন শিবভক্ত। শংকরাচার্য ছিলেন শৈব। টীকাকার বসুগুপ্ত ছিলেন কাশ্মীরী শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। গীতার এই অসাম্প্রদায়িকতা সেই প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে

ইংরেজ আধিপত্যের সূচনাকালেই দেখা যায়, গীতা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা করেন সার চার্লস উইলকিনস্। তৎকালীন গবর্ণর ওআরেন হেস্টিংসের উৎসাহে তিনি ১৭৮৫ সালে ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত ভারতীয় গ্রন্থের গীতাই প্রথম। এর থেকে বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গীতাই ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক বলে গণ্য হত। সে সময় থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে গীতার মর্যাদা ও প্রভাব বেড়েই চলেছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গীতাকে উপনিষদের পার্শ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর উনবিংশ ও বিংশ শতকে গীতার যে কত ব্যাখ্যা ও টীকা হয়েছে তার সীমা নেই। গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও অরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এত আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে গীতার স্থান এখনও যথাযথভাবে নির্ণীত হয়নি। এদিক থেকে এখনও গীতা আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রেই ঠাকুর পরিবার অগ্রণী। গীতা আলোচনার ক্ষেত্রেও তাঁদের দান সামান্য নয়। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ও সত্যেন্দ্রনাথের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালগঙ্গাধর তিলকের মারাঠি-ভাষায় রচিত বিরাট গ্রন্থ গীতারহস্যের বাংলা অনুবাদ করেন; বাংলায় গীতা আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই কাজের মূল্য যে খুবই বেশি তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথও গীতার মর্যাদা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তাঁর রচিত বিরাট সাহিত্যের নানা স্থানেই গীতার গৌরব স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গীতাকে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতেন তা সকলের পক্ষেই গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর দৃষ্টিতে গীতা যে এক নূতন আলোকে প্রতিভাত হয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক আলোচনায় তার বিশেষ উপযোগিতা আছে সুতরাং এস্থলে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

"আতস কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আরেক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আরেক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। ...মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিক্গত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সংখ্যা, বেদান্ত ও যোগকে যে একত্র

স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার।......হইতেও পারে মূল ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের সংখ্যা ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারতসংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধিরক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল।...ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূলসত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে।"

—ভারববর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচয় বস্তুত যেসমস্ত নিগূঢ় শক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে যুগে যুগেই চিরন্তনতার ভিত্তিতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে দৃঢ়রূপে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে সেগুলির মধ্যে গীতার শক্তিই সর্বাগ্রগণ্য। এখানেই গীতার যথার্থ গৌরব।

গীতা ও গীতাচর্চার কালক্রম

এস্থলে ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে গীতার ঐতিহাসিক স্থাননির্ণয় ও গীতা আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ধর্মগ্রন্থাদির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন নিম্নপ্রদত্ত অধিকাংশ তারিখই আনুমানিক, সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকগণের অভিমতই এখানে অনুসৃত হল।

ঋগ্‌বেদ	খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০-১০০০
সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ	,, ১০০০- ৮০০
ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্	,, ৮০০- ৬০০
বাসুদেব কৃষ্ণ	,, ৮০০- ৭০০
জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য	,, ৭০০- ৬০০
সূত্রসাহিত্য: বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন	,, ৬০০- ৩০০
মহাভারত ও রামায়ণ রচনারম্ভ	,, ৬০০- ৫০০
বুদ্ধদেব	,, ৫৬৫- ৪৮৫
পাণিনি	,, ৫৫০- ৪৫০
পালিসাহিত্যের সূচনা	,, ৪৫০- ৩০০
ধর্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধ পালিসাহিত্য	,, ৩০০- ০
অশোক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার	,, ২৭২- ২৩২
ভগবদ্‌গীতা	,, ২২৫- ১৭৫

মনুসংহিতা	খ্রীস্টপূর্ব	২০০- ১৫০
পাতঞ্জল মহাভাষ্য	,,	১৮৭- ১৫১
হরিবংশ	,,	১০০- ৫০
অশ্বঘোষ	খ্রীস্টাব্দ	৭৮- ১০১
অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত রচনাসমাপ্তি	,,	২০০- ৫০০
কালিদাস	,,	৩৮০- ৪৬৬
বাণভট্ট	,,	৬০৬- ৬৪৭

গীতার টীকাভাষ্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও তালিকা আকারে নিম্নে দেওয়া গেল।

শংকরাচার্য (অষ্টম-নবম শতক) বৈদান্তিক : ভাষ্য, অদ্বৈত
বসুগুপ্ত, ভাস্কর, আনন্দবর্ধন (নবম) : টীকা
রাজানক রামকণ্ঠ (নবম) : সর্বতোভদ্র
আনন্দগিরি (দশম) : টীকা
অভিনব গুপ্ত (দশম-একাদশ) : ব্যাখ্যা
অলবেরুনি (একাদশ) : উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা
যামুনাচার্য (একাদশ) শ্রীবৈষ্ণব : গীতার্থসংগ্রহ
রামানুজ (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রীবৈষ্ণব : ভাষ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত
আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য (ত্রয়োদশ) : ভাষ্য, দ্বৈত
শ্রীপুরুষোত্তম (ত্রয়োদশ) : অমৃত তরঙ্গিণী, শুদ্ধাদ্বৈত
বিষ্ণুস্বামী (ত্রয়োদশ) : ভাষ্য, দ্বৈত
জ্ঞানেশ্বর (ত্রয়োদশ) : অদ্বৈত, জ্ঞানেশ্বরী-মারাঠি পদ্য ব্যাখ্যা
জয়তীর্থ (চতুর্দশ), মাধ্বসম্প্রদায় : প্রমেয়দীপিকা
শংকরানন্দ (চতুর্দশ), বৈদান্তিক : তাৎপর্য বোধিনী
বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ (চতুর্দশ) : তাৎপর্যচন্দ্রিকা
নিগমান্ত মহাদেশিক : গীতার্থ সংগ্রহরক্ষা
শ্রীধরস্বামী (চতুর্দশ-পঞ্চদশ), ভাগবত : সুবোধিনী, অদ্বৈত
নীলাকণ্ঠ সূরি (পঞ্চদশ) : ভাবপ্রদীপ বা চতুর্ধরী
সদানন্দ (পঞ্চদশ), বৈদান্তিক : ভাবপ্রকাশ (পদ্য ভাষ্য)
কেশব কাশ্মীরী (ষোড়শ) নিম্বার্ক সং : গীতাতত্ত্ব প্রকাশিকা, দ্বৈতাদ্বৈত
মধুসূদন সরস্বতী (ষোড়শ) বৈদান্তিক : গূঢ়ার্থ দীপিকা, অদ্বৈত

* রাঘবেন্দ্র স্বামী ঃ গীতা বিবৃতি
শ্রীহনুমৎ স্বামী ঃ পৈশাচ ভায্য
ধনপতি সূরি ঃ পরমার্থ প্রপা
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (ষোড়শ-সপ্তদশ) চৈতন্য সং ঃ সারার্থবর্ষিণী
বলদেব বিদ্যাভূষণ (অষ্টাদশ) চৈতন্য সং ঃ গীতাভূষণ ভাষ্য
চার্লস উইলকিনস (অষ্টাদশ) ঃ ইংরেজি অনুবাদ ১৭৮৫

মার্ক্সীয় দর্শন

ভূমিকা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে কার্ল মার্ক্স্ (খ্রীঃ ১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডারিক্ এনগেল্সের (খ্রীঃ ১৮২০-১৮৯৫) আন্তরিক সহযোগিতার ফলে। সুতরাং এই দর্শন জগৎবিখ্যাত দুইজন মনীষীর চিন্তাধারাকে সুসঙ্গতভাবে প্রকাশিত করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এইরূপ দুইজন তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির দার্শনিক মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে সুপরিচিত হইতে হইলে মার্ক্স্ ও এনগেল্স এই উভয়েরই লিখিত পুস্তকাবলী গভীরভাবে পাঠ করা আবশ্যক। মার্ক্সীয় দর্শনকে ভ্লাডিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্ লেনিন (খ্রীঃ ১৮৭০—১৯২৪) সাম্রাজ্যবাদের ও রুশিয়ার নির্বিত্তশ্রেণীর বিপ্লবের যুগোপযোগী করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উহাকে প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং এই দর্শনের ঐতিহাসিক প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইলে লেনিনের লিখিত পুস্তকাবলী ও তাঁহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

মার্ক্সীয় দর্শন খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মানীর চিন্তাধারাকে, ফরাসীদেশের বস্তুবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী ও বৈপ্লবিক দর্শনকে এবং ইংলণ্ডের অর্থনীতির ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে (ডায়লেক্টিকাল্ অ্যাণ্ড হিস্টরিকাল্ মেটিরিয়ালিজম্) পরিণত হইয়াছে। এই বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সাম্যবাদ (কমিউনিজম্) নামে পরিচিত।

মার্ক্সীয় দর্শনের মতানুসারে দর্শন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির, ইতিহাসের, এবং মানব চিন্তার গতির মূল নিয়ম সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞান দান করে। এই দর্শনের মতে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ও চলমান। সেইরূপ ইতিহাস ও মানবের চিন্তাধারাও যুগে যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং এই দর্শন বিখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিক হেরাক্লাইটাসের ও ফরাসী দার্শনিক বার্গ্‌সঁএর 'বিশ্ব চলমান' এই মতের সমর্থক। উঁহারা বলেন যে পরিবর্ত্তনই জগতের প্রধানতম সত্য।

এই দর্শন ডায়লেক্টিক্ পদ্ধতির অনুসরণ করে। এই দর্শনের মতে ডায়লেক্টিক্ চিন্তাধারা জগতের ঘটনাসমূহের পরিবর্ত্তনের নিয়মকে অনুসরণ করে। হেগেলের মতে ডায়লেক্টিক্ চিন্তাধারা প্রধানতঃ মানবের ভাবধারার ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করিয়া যে নিয়মের সন্ধান পায় সেই নিয়মকে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করে। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনের মতে পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতকে ও মানুষের অর্থোৎপাদন কর্ম্মধারাকে যথাযথভাবে অনুসরণ না করিলে ডায়লেক্টিকের নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে মার্ক্সীয় ডায়লেক্টিক্স্ বস্তুবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী (এম্পিরিকাল্), কিন্তু হেগেলের ডায়লেক্টিক্স্ ভাববাদী ও রহস্যবাদী। ভাববাদের ও বস্তুবাদের প্রধান পার্থক্য এই যে ভাববাদের মতে আত্মা বস্তুর পূর্ব্বগামী এবং বস্তু আত্মার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে বস্তুবাদের মতে বস্তুর ক্রমবিকাশের ফলেই জীবনের ও মনের আবির্ভাব হয়। সুতরাং বস্তু মনের অথবা আত্মার পূর্ব্বগামী। সুতরাং মন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। শরীরের অস্তিত্বের বাহিরে মনের কোন অস্তিত্ব নাই। মানব-শরীরের উপরই মানব-মন নির্ভরশীল।

মার্ক্সীয় দর্শন অভিব্যক্তিবাদের (থিওরী অব্ ইভলিউসন্) সমর্থক। কিন্তু এই দর্শন আকস্মিক আবির্ভাব-স্বীকৃত অভিব্যক্তিবাদকে (দি থিওরী অব্ এমারজেন্ট ইভলিউসন্) সমর্থন করে। এই অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে পরিবর্ত্তনের ক্রমবিকাশের ফলে জগতে নবনব রূপের ও নবনব বস্তুর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তাই জীবনহীন বস্তুর ক্রমবিকাশের ফলে জীবনের আবির্ভাব হয় এবং এই জীবনের ক্রমবিকাশের ফলে মনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং মানুষের মধ্যে উহা একটি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে বস্তু ও তাহার রূপ (ম্যাটার্ অ্যাণ্ড ফর্ম্) একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এই দর্শন অনুসারে সামান্য ও বিশেষ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। মানবত্বের অস্তিত্ব প্রত্যেক মানুষের ভিতরে বর্ত্তমান, তাহার বাহিরে নহে। সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শন এই বিষয়ে অ্যারিষ্টট্লের দর্শনের সঙ্গে এক মত।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মার্কসীয় দর্শন অনুসারে মন শরীরের উপর নির্ভরশীল। ইহা হইতে এই ধারণা হইতে পারে যে মার্ক্সীয় দর্শন মানবমনের স্বাধীনতা অস্বীকার করে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মন যদিও শরীরের উপর নির্ভরশীল তাহা হইলেও মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এই দর্শন স্বীকার করে। বস্তু-জগৎ মনকে প্রভাবিত করে। কিন্তু মনও আবার বস্তুজগতকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এই দর্শনকে নিয়ন্ত্রণবাদী (ডিটারমিনিষ্টিক্) দর্শন বলিলে ভুল হইবে। জগতে নিয়ম আছে এ কথা সত্য এবং পরিবর্ত্তন কার্য্যকারণের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলেও এই দর্শন বলে যে মানব মনের স্বাধীনতা আছে এবং এই স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহার বিশ্বজগতের নিয়ম সম্বন্ধের জ্ঞানের উপর। যে মানুষ জগতের নিয়মকে ভাল করিয়া জানে সে-ই জগৎ ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যে ব্যক্তি কোনও একটি বিশেষ যন্ত্রের কর্ম্মপদ্ধতির নিয়ম উত্তমভাবে জানে সেই ব্যক্তিই উক্ত যন্ত্রকে স্বাধীনভাবে ও কুশলতার সহিত পরিচালিত করিতে পারে। সাধারণতঃ তত্ত্ববিজ্ঞানের (মেটাফিজিক্স্) প্রতিপাদ্য বিষয় অতীন্দ্রিয়, সুতরাং তত্ত্ববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষগম্য নহে। সেইজন্যই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ববিজ্ঞানের পরিপন্থী। ইহা কোন প্রত্যক্ষাতীত সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। সুতরাং দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইহা পরীক্ষণের ও নিরীক্ষণের সাহায্যে সত্য নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের কোনরূপ সংঘাত নাই। দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া অনুমানের সাহায্যে এই বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষকে দার্শনিক জ্ঞান দানের প্রয়াস পায়।

সেইজন্যই দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ যান্ত্রিকবস্তুবাদ অথবা জড়বাদ (মেকানিকাল্ মেটিরিয়ালিজম্) হইতে বিভিন্ন। যান্ত্রিকবস্তুবাদ তত্ত্ববিজ্ঞানের পরিপন্থী নহে। ইহা অদৃশ্যবস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহার মতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা বাহ্যিক, আন্তরিক নহে। দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের মতে এই সম্বন্ধ আন্তরিক। যান্ত্রিকবস্তুবাদের সাহায্যে ভাববাদীদর্শন রচনা করা অসম্ভব নহে। জিন্স্, এডিংটন্ প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ যান্ত্রিকবস্তুবাদের আশ্রয় লইয়া ভাববাদীদর্শনকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও ঐ সত্যসমূহকে উক্ত দর্শনের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শনের মতে আধুনিকতম

বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের পরিপন্থী নহে। আমরা আধুনিক জগতে দেখিতে পাই যে একদল বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকসত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া ভাববাদী-দর্শনের আশ্রয় লইয়াছেন, অন্যদিকে আর একদল বৈজ্ঞানিক আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহকে দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। প্রথমোক্ত বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তাধারা যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তাধারা ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। যান্ত্রিকবস্তুবাদ মানুষকে যন্ত্ররূপে কল্পনা করে। ইহার মতে মানুষমনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। মানুষ যন্ত্রের ন্যায় বাহ্যশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যান্ত্রিকবস্তুবাদের মতে মানুষ স্বাধীন চেষ্টার সাহায্যে জগতকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মানবমনের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ইহার মতে মানুষ স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা সমাজের ও বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। সেইজন্যই মার্ক্‌স্ বলিয়াছেন যে জগতের নিয়ম জানিয়াই এবং উহার ব্যাখ্যা করিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা। তাহার প্রধান কার্য্য হইল জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করা। সুতরাং যান্ত্রিকবস্তুবাদ নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মানবমনের স্বাধীনতা স্বীকার করে। দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের মতে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ স্বাধীন হইতে পারে। সে যন্ত্রের ন্যায় বাহ্যিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত নয়। যান্ত্রিকবস্তুবাদের ভিত্তির উপর যে সমাজতন্ত্রবাদ রচিত হইয়াছে, তাহা ভাববাদী। কিন্তু দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের সাহায্যে যে সমাজতন্ত্রবাদ রচিত হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক এবং ইহা সাম্যবাদ (কমিউনিজম্) নামে পরিচিত।

মার্ক্‌সীয় দর্শনের সমালোচকগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে এই দর্শন নিজের দার্শনিক মত অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই দর্শনের সমর্থকগণ বলেন যে একথা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ এই দর্শন নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে নূতন সত্যের সন্ধান পাইলে ইহা পূর্ব্বের মত বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করে না। এই দর্শনের মতে কোন সত্যই চিরন্তন নহে। যে সত্য এক বিশেষ যুগোপযোগী তাহা পরবর্ত্তী যুগে অস্বীকৃত হইতে পারে। সত্য যাচাই করার একমাত্র উপায় হইল সামাজিক ব্যবহার (সোসাল প্র্যাক্‌টিস্)। দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ জগতের পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করায় এবং ইহা সামাজিক ব্যবহারকে সত্যের নির্দ্ধারক বলিয়া মনে করায় এই দর্শন দাম্ভিকতাবাদ (ডগ্‌ম্যাটিজম্) হইতে মুক্ত।

এই দর্শন বস্তুর ও মনের দ্বিত্ব (ডুয়ালিজম্) স্বীকার করে না। ইহা ঐক্যবাদী (মনিষ্টিক্)। ইহার মতে বস্তুর ও মনের সঙ্গে আন্তরিক ও অব্যাহত যোগ বর্ত্তমান। সুতরাং এই দর্শন ক্যান্টিয় দ্বিত্ববাদ হইতে মুক্ত। হোয়াইট্‌হেড্ প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে বস্তুজগতের ও মনজগতের সম্বন্ধ আন্তরিক।

মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির ও অর্থনীতির যোগ অপরিহার্য্য। যাহারা এই দর্শনের সমর্থক তাহারা রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব্বদাই এই দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শনের মতে মানব-জীবনের সঙ্গে দর্শনের যোগ গভীর। রাষ্ট্রপরিচালকগণের দর্শন যদি দোষদুস্ট হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রে জনগণের জীবন বিষময় হইয়া উঠে। সুতরাং সর্ব্বদাই রাষ্ট্রপরিচালকগণের দার্শনিক মত বিচারসহ হওয়া আবশ্যক। প্লেটো বলিয়াছেন যে একমাত্র দার্শনিকই রাজা হওয়ার যোগ্য। মার্ক্সীয় দর্শন সম্পূর্ণভাবে একথা সমর্থন করে। যে দেশের জনগণ রাষ্ট্রের পরিচালক সে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দার্শনিক হইতে হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া মার্ক্সীয় দর্শন অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা করে। সেইজন্য ঐ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ দেশে প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারকে অথবা প্রত্যেক শিক্ষককে তাহার নিজের বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে যেরূপ যত্ন করিতে হয় তাহাকে সেইরূপ মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্যও যত্ন করিতে হয়। কারণ সে যদি উপযুক্ত দার্শনিক জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার পক্ষে উত্তম নাগরিক হওয়া অসম্ভব। সেইজন্যই ইহা বলা হইয়াছে যে, যে দেশের জনগণ রাষ্ট্রপরিচালনা করে সে দেশের সামান্য একজন রাঁধুনীরও জানা আবশ্যক যে কি নিয়মে দেশ শাসন করিতে হয়। সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শন ব্যবহারিক (প্র্যাক্‌টিকাল্) দর্শন।

মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে হেগেলের ও ফয়ারবাকের দর্শনের বিশেষ যোগ থাকায় আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে উক্ত দুই দর্শনের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

কবিতা

ইতিহাসযান

জীবনানন্দ দাশ

সেই শৈশবের থেকে এসব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি ;
এইসব ক্ষেত্র দেখেছি।
বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার দেখা গেছে মানুষের বাড়ী
রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ণ শক্তির মত আয়োজনে নির্ম্মিত হতেছে ;
কোলাহলে—কেমন নিশিত উৎসবে গ'ড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
স'রে যায়,—পুরোণো গাছের সাথে সহমর্ম্মী জিনিষের মত
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনো শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিষ ঃ অতীত।

তারপর ঢের দিন চ'লে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ।
তবুও আবার মৃত্যু।—তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে ;—হেমন্তের
অপরাহ্ণে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে

কোথাও শনের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্য্যের থেকে চুপে নেমে আসে ;
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কি যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনো সূর্য্য—মনে পড়ে—অবহিত হয়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে র'য়ে গেছে—বড়
গেলে—রাহুর আভাস নেই—এমনই পবিত্র নিরুদ্বেল।
এইসব বিকেলের হেমন্তের সূর্য্যছবি—তবু
দেখাবার মত আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।

মানুষেরা এই সব পথে এসে চ'লে গেছে,—ফিরে
ফিরে আসে ;—তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোণা হয়ে ওঠে—দেখে ;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হ'লে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মত
কিছু নেই ;—হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন্
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফিরতির মত অন্তহীন
সন্ততির সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চ'লে গেছে কত দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিল কেউ কেউ :
ছোট বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড় ;—
সেইখানে বই পড়া হত কিছু—লেখা হত ;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ীর আলোর মত কি যেন কেমন এক আশাবাদ ছিল
তাহাদের চোখে মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায় ;
সংসারে সমাজে দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হ'লে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড় ;

অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো এক পলিত চাঁদের
এ পিঠ ও পিঠ শুধু ;—সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে ; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

* * * *

মাঝে মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হয়ে যেত—
কোথাও সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবিড়ভাবে বিচলিত হয়ে উঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিষ হ'তে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে
অর্দ্ধ সত্যে অর্দ্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে ;
অনেক তরুণী যুবা যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে—তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো
অনবলুণ্ঠিত কিকে মৃগতৃষ্ণিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল ক'রে দিয়ে তবু পারমেয় কলঙ্কে নিবিড়
ক'রে দিতে চেয়েছিল,—মনে মনে—মুখে নয়—দেহে
নয় ; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরো বেশি
জয়ী হয়ে শুক্ল রাতে গ্রামীন উৎসব
শেষ ক'রে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বার বার
অপরাধী ভীরুদের মত প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।
তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

'ঢের ছবি দেখা হ'ল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, হাতে খননের
অস্ত্র নেই—মনে হয়—চারিদিকে ঢিবি দেওয়ালের
নিরেট নিঃসত্ত্ব অন্ধকার'—ব'লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।

সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিষ
সকলের; অধিগত হ'লে প্রাণ জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে?
আমাদের মণীষীরা আমাদের অর্দ্ধসত্য ব'লে গেছে
অর্দ্ধ মিথ্যার? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায়; তবু ভয়—হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঢের ছবি দেখা হ'ল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে র'য়ে গেছে,—জ্যোতিগ্রন্থে;
জীবনের তরে আজো নেই।
অনেক মানুষী খেলা দেখা হ'ল, বই পড়া সাঙ্গ হ'ল—তবু
কে বা কাকে জ্ঞান দেবে—জ্ঞান বড় দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গল্পে;—আমাদের তরে দূর—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা' তো নেই;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
র'য়ে গেছে। নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড় করি; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রনার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতন নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু'হাজার বছরের জ্ঞান এ রকম।
নচিকেতা ধর্ম্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হই নি তো।

এখনও পৃথিবী সূর্য্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা ;
তবুও সকলই উৎস গতি যদি,—রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে
পাখির প্রমাথী দীপ্তি সাগরের সূর্য্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তাহ'লে যে আলো অর্ঘ ইতিহাসে আছে, তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্ব্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসে নি তাকে বর্ত্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বারবার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, হোত্রী নেই, গতি আছে ;—তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর ;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হ'ল ব'লে স্থির ;—হতে হবে ব'লে দীন, প্রমাণ, কঠিন ;
তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে ;—সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয় ; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে ব'লে
মনে হয় ; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলা নাটকের উৎপত্তি

করালীকান্ত বিশ্বাস

ঠিক কবে এবং কি ভাবে আমাদের দেশে নাটকের উৎপত্তি তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ধর্ম্মাচরণের ভিতর দিয়াই মনের সভ্যতার আদিতে নাটক ও নৃত্যশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ঋকবেদের মন্ত্রে এইরূপ আদি নাটকের বীজ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। নাটক বলিতে বর্ত্তমানে যে সুসম্বন্ধ শিল্পরূপ বুঝি, আদিতে নাটক যে সেরূপ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। এখন পর্য্যন্ত একমাত্র গ্রীস দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। গ্রীস দেশে স্পস্টই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে ডায়োনিসাসের আরাধনা হইতে নাটকের উৎপত্তি এবং তাহা ক্রমে পূর্ণাঙ্গ গ্রীক ট্রাজেডিতে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা প্রায় অজ্ঞাত। এই দিকে আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের মারফতে। তাঁহাদের গবেষণা মূল্যবান সন্দেহ নাই, তবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপাদান হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তাহা অনেক সময়ে নির্ভরযোগ্য নাও হইতে পারে। ভারতবর্ষে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। রেনেসাঁসের পরে ইয়োরোপে গ্রীক সাহিত্য ইত্যাদির প্রতি একটি প্রবল অনুরাগ দেখা দেয়। তাহার ফলে ইয়োরোপীয়েরা গ্রীস দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রীসে শিল্প ও সাহিত্য কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা এখন আর অজ্ঞাত নহে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা গ্রীসের ব্যাপারে যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহার সূত্রগুলির সাহায্যে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। এই কারণেই তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা হয়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আপনার সত্তার মধ্যে মিশিয়া না থাকিলে উহার স্বরূপ উপলব্ধি করা শক্ত।

ভারতে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে জার্ম্মান পণ্ডিত ম্যাক্‌স্ মুল্যরের অভিমত সাধারণত গ্রাহ্য হইত। তাঁহার মতে ঋকবেদের কোন কোন সূক্তে প্রশ্নোত্তর অথবা নাট্যাভাস রহিয়াছে। তিনি মনে করেন বৈদিক যুগেই ভারতবর্ষে নাটক ও নৃত্যশিল্পের উৎপত্তি। শুধু মূল্যর নহেন, সিলভ্যাঁ লেভি, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি প্রাচ্যবিদেরাও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ডক্টর কীথ পরবর্ত্তীকালে এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বেদের এই মন্ত্রগুলিকে কোন মতেই নাটকের আদিরূপ বলা যায় না। যে ধারা বাহিয়া নাটক বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার সহিত বেদের এই মন্ত্রগুলির কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই।

ভারতবর্ষে নাটকের উৎপত্তি এইভাবে ধর্ম্মের সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা গ্রীক নাটকের নজীরে। গ্রীক ও আমাদের দেশের ধর্ম্মাচারণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। এই কারণেই গ্রীসের অ্যানালজি দিয়া আমাদের দেশের নাটকের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের দেশে যৌথভাবে ধর্ম্মাচরণ কখনও হয় নাই। নাটকের আদিরূপ যতই সরল হউক না কেন, তাহা ধর্ম্মাচরণের সহিত যুক্ত থাকিলে যৌথ ধর্ম্মাচরণ অনুমান করিয়া লইতে হয়। নাটক ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, ব্যষ্টির সমবেত চেষ্টার ফল।

এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বর্ত্তমানে এই মত প্রচলিত যে সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকার আর্ট আদিতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত জড়িত। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে নাটক ধর্ম্মাচরণের ভিতর দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে ইহাও মানিয়া লইতে হয়। ভারতবর্ষে নাটকের উৎপত্তিতে ধর্ম্মের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল, তবে মূল্যর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে ভাবে সেই প্রভাবের সূত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা যথার্থ কিনা সন্দেহ হয়। নাটকের উৎপত্তিতে ধর্ম্মের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কিছু না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাহা আসিয়াছে এমন অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে অনেকখানিই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, কারণ ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব আছে।

মানব সভ্যতার আদিতে পূজা ও ধর্ম্মাচরণের পিছনে অনেক সময়েই একটি বিরূপ অজ্ঞাত শক্তিকে শান্ত করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ ও এই অজ্ঞাত শক্তির বিরোধ এইসব আদিম ধর্ম্মাচরণে অত্যন্ত স্পষ্ট। এই বিরোধের অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই গ্রীক নাটক প্রথম ট্রাজেডিতে রূপ লাভ করে। বেকাসের আরাধনা হইতে পরে কমেডির জন্ম। সংস্কৃত নাটকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ট্রাজেডি এমন কি ইয়োরোপীয় অর্থে কমেডি কিছুই পাওয়া যায় না। প্রতিকূল শক্তির সহিত সংঘাতের কোনও চিহ্ন সংস্কৃত নাটকে নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাটক হইতে ট্রাজেডির সর্ব্বপ্রকার উপাদান বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। সংস্কৃত নাটক আলোচনায় দৃশ্য-কাব্য কথাটি ব্যবহার হইয়া থাকে। এই কথাটি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির একটি সূত্র অনুমান কবিতে সাহায্য করে। পিশ্শেল অনুমান করিয়াছেন যে ভারতবর্ষেই প্রথমে নাটকের সূত্রপাত এবং পুতুল নাচ হইতেই নাটকের উৎপত্তি। ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের নানাদেশে পুতুল নাচের যথেষ্ট প্রচলন আছে। নানারূপ মুখোস পড়িয়া বহুতর নৃত্যের প্রচলন আজও বিদ্যমান। কাজেই পিশ্শেলের এই মত বিবেচনা করিয়া দেখিবার মত। সহীদ সুরাবর্দ্দী পিশ্শেলের এই মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন সংস্কৃত নাটকে নান্দী পাঠের পরে সব সময়েই সূত্রধর কেন মঞ্চে প্রবেশ করে তাহা লইয়া কল্পনার অবকাশ আছে।

নিশ্চিতভাবে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। অনুমিত হয় যে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মাচরণ হইতে নাটকের উৎপত্তি না হইলেও ধর্ম্মের সহিত খুব আনন্দোৎসবেই নাটকের উৎপত্তি। ধর্ম্মের উৎসবে বহু লোক একত্র মিলিত হয়। মিলিত প্রচেষ্টা হইতে নাটক সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

এই অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যতটুকু সংবাদ আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে বাংলার আদি নাটকের কোনই সন্ধান পাই না। অথচ আমরা এই সংবাদ রাখি যে যাত্রার প্রচলন বাংলা দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে। যাত্রার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধেও অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরে তাহা আলোচনা করা যাইবে, প্রথমে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নাটকীয় উপাদান কি আছে তাহাই দেখা যাক।

চর্য্যাপদের কথা ছাড়িয়া দিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনেক লোকের হাতে নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত। রামায়ণ ও মহাভারত গান গাওয়া হইত, এখনও এই গানের প্রচলন আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য্য কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত অন্যূন তিনখানি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়াছে—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিপ্রদাস পিপলাইএর মনসামঙ্গল। এই কাব্য ও গান গাওয়া হইত। কাব্যগুলির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কোন কোন অংশে উহাতে বাদানুবাদের ভাষা রহিয়াছে। বাক্য বিনিময় নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ। গানের মধ্যে আশ্রয় পাইলেও এই বাক্যবিনিময় হইতে

নাটকের আভাস পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীযুগে গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী প্রভৃতি অন্যান্য গানে কাহিনীর অংশ প্রাধান্য পাইয়াছে, ফলে নাটকীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব গান সুর ও অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গীত হইত। অংশবিশেষের অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাষা অঙ্গভঙ্গীদ্বারা প্রকাশ করা হইত ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই সব গানকে নাটক বলা যায় না, নাটকের আদিরূপ এইগুলি এমন ইঙ্গিতও করা হইতেছে না। তবে এইগুলিতে যে সমস্ত নাটকের উপাদান রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। মনে হয় আদিতে নাটক যাহা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এইরূপ গান ভাবাভিনয় স্থান পাইত। দুইটির উৎস একই—একটি ক্রমে বাংলা দেশের যাত্রায় পরিণত হইয়াছে অপরটি পালাগানে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই কারণে উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক কতগুলি লক্ষণের মিল আছে।

আর একটি প্রাচীন নাটকীয় অনুষ্ঠান হইতেছে কথকতা। কথকতার উৎপত্তি রামায়ণ মহাভারত গান হইতেই। শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গও কথকতার অঙ্গীভূত হইয়াছে। পালাগান অপেক্ষা কথকতায় ভাবাভিনয়ের সুযোগ অনেক বেশী। নাটকের অভিনেতা যে ভাবে তাহার অংশ আবৃত্তি করে, কথক তেমনি ভাবে কাহিনীর সমস্ত অংশ বিবৃত করে। এই কারণে কথকতা ও নাটকের মধ্যে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। নাটক ও কথকতার মধ্যে দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই প্রাচীনতর। কথকতার মত পাঁচালীতেও যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান রহিয়াছে। পাঁচালী অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন।

অপরাপর নাটকীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে মালদহের গম্ভীরা ও ত্রিপুরা জেলার চতুরঙ্গ নৃত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের বিকাশে নৃত্য, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের কথাকলি ও ত্রিপুরার চতুরঙ্গের মত নৃত্যের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে নৃত্যগীত উভয়ই নাটকের অঙ্গীভূত। পরে নাটকের পূর্ণতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি স্বতন্ত্র শিল্পকলার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার গম্ভীরার উৎপত্তি ও বিকাশের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া উপযুক্ত প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে শৈবপূজা হইতে গম্ভীরার উৎপত্তি। এক সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে তাহার বিশেষ সমাদর ছিল।

উপরের এই নাটকীয় অনুষ্ঠানগুলির অনেকগুলিই এখনও বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। ভদ্রসমাজে আদর না পাইলেও জনসাধারণের কাছে উহা এখনও যথেষ্ট প্রিয়। এইগুলির প্রকৃতি হইতে অনুমিত হয় যে জনসাধারণ কর্তৃক এইগুলি সৃষ্ট, এবং তাহারাই এখন পর্য্যন্ত এইগুলিকে জীবিত রাখিয়াছে। এই অনুষ্ঠানগুলির নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য্য হইতে ইহা মনে হয় জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর নাটক ও নাট্যাভিনয় অতীতে অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

বাংলা নাটকের আদি ইতিহাস অজ্ঞাত। তবে একথা নিশ্চিত যে বাংলা নাটক সংস্কৃতানুগত নহে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাটকের পুনরাবির্ভাবের সময় সংস্কৃত আদর্শে নাটক রচিত রইয়াছে বটে, কিন্তু বাংলা দেশের নিজস্ব নাটক—যাত্রা— সংস্কৃত কখনই অনুসরণ করে নাই। প্রাক্ আধুনিক যাত্রাগানের কোনও নিদর্শন আমরা পাই নাই, তবে যাত্রার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। ডক্টর কীথ খৃঃ পূঃ অন্যূন দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বলিয়া অনুমান করেন। যাত্রার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিলে উহাকে সংস্কৃত নাটকের এই উৎপত্তিকাল হইতে প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। যাত্রা বাংলার নিজস্ব বিষয়। জনসাধারণ ইহার স্রষ্টা, জনসাধারণের মধ্যেই তাহার বিকাশ। এই কারণে যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন নাটক বাংলা দেশে পুনরায় দেখা দিল, তখন বাংলা দেশের এই নিজস্ব নাটকীয় অনুষ্ঠানটি অবজ্ঞাত হইয়াছিল। এ দিকে দৃষ্টি পড়িলে প্রকৃত জাতীয় নাটক এতদিন গড়িয়া উঠিতে পারিত।

যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এমন কোন উপাদান নাই যাহাকে নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আনন্দলাভ করিবার জন্যই যে যাত্রার সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎসবেই হয়ত নাটকের সূত্রপাত। কোন এক সময় ধর্ম্মাচরণের মধ্যে নাটকের বীজ ছিল তাহা হইতে জনসাধারণের মনে অনুকরণের স্পৃহা জাগরিত হইয়া থাকিবে। ধর্ম্মাচরণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, অব্রাহ্মণের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাহ্মণ পূজা করিত। অব্রাহ্মণেরা ছিল দর্শকের মতই নিষ্ক্রিয়। পূজা পার্ব্বণের উৎসবে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল না। উৎসবে অব্রাহ্মণ জনসাধারণ ছিল স্বাধীন। ব্রাহ্মণের মন্ত্র উচ্চারণ ও শাস্ত্রসম্মত অঙ্গসঞ্চালন সাধারণে এই সব উৎসবকালে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে। এই ভাবেই যাত্রাগানের উৎপত্তি।

এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যতগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নিম্নবর্ণের লোকদ্বারা রচিত। চর্য্যাপদ ও গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই সব গ্রন্থ ও কাহিনীতে যে ধর্ম্মমতের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতিতে। বিকৃতি কথাটিতে নিন্দার আভাস আসে, বরং বলা উচিত বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর যে রূপান্তর সাধারণে আপনাদের বিচার বিবেচনা মত করিয়াছে।

দেখিয়া ও শুনিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণ এই স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল। এই

ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি সংস্কৃত শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—এখনও যে সব অঞ্চলে ধর্ম্মপূজার প্রচলন আছে সেখানে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বাংলা দেশের জনসাধারণ একটি ধর্ম্ম অনুকরণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণ একটি নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। তেমনি হয়ত আদিতে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসম্মত অঙ্গসঞ্চালন ও বৈদিক মন্ত্রপাঠের অনুকরণের মধ্যে যাত্রার উৎপত্তি। সাধারণের ধর্ম্মাচরণের আকাঙ্ক্ষা সব সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মারফতে পূজা দিয়া তৃপ্ত হয় নাই, তাহারাও ব্রাহ্মণের অনুকরণে পূজা আরম্ভ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র দুইই সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। তাই নিজ ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণের মধ্যে দিয়াই মন্ত্র গানে পরিণত হইয়াছে, অঙ্গসঞ্চালন অভিনয়ে। সংস্কৃত মন্ত্র সাধারণের কাছে শব্দ মাত্র। মন্ত্রোচ্চারণে মনে যে আবেগ সঞ্চার হয় তাহা অস্পষ্ট, কিন্তু গান আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণতর আবেগ সৃষ্টি করে।

যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যে মত প্রকাশ করা হইল তাহা নিতান্তই আনুমানিক। প্রকৃতপক্ষে নানা পরীক্ষা ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাত্রার সৃষ্টি। উপরে সম্ভাব্য একটি পথ কল্পনা করা গেল। একথা সত্য এমন কোনও প্রমাণ নাই, যাহার উপরে নির্ভর করিয়া এই মতে উপনীত হওয়া যায়। আমরা শুধু জানি যে—যাত্রা সাধারণের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং সাধারণের মধ্যেই উহা আজও বাঁচিয়া আছে। প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মাচরণের সহিত যুক্ত থাকিলে তাহা সাধারণের মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। অথচ যাত্রাগানে ধর্ম্মের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ক্ষেত্রে এমন একটি অবস্থা কল্পনা করিতে হয় যাহাতে জনসাধারণের ধর্ম্মাচরণ অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত যোগ আছে। উপরে যে ভাবে বিবৃত করা গিয়াছে তাহা ছাড়া অপর কোনও উপায়ে সাধারণের সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ কল্পনা করা যায় না। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে উপরের মত অভ্রান্ত সত্য নহে; ক্রমে আরও উপাদান আবিস্কৃত হইবে। তখন প্রকৃত তথ্য জানা সম্ভব।

ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেণী

মণিলাল সেনশর্ম্মা

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ সঙ্গীতকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন। তাদের নাম ছিল—'মার্গ' ও 'দেশী'। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ বলতে তের শতক ও তার আগেকার সারা ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রীদের কথাই বলেছি। সেই প্রাচীন শাস্ত্রীগণ পরিকল্পনা করেছিলেন যে সারা ভারতের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণী থাকবে; প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক কালের লোক তাকে অনুশীলন করবে। আর সে-সঙ্গীত কতকগুলি সুনিশ্চিত নিয়মে বাধা থাকবে; তবে সে সঙ্গীতে উচিত স্বর সমাবেশ থাকবে, যাতে এই সঙ্গীত লালিত্যপূর্ণ হয় তার চেষ্টা থাকবে এবং এই সঙ্গীত হবে অপরিবর্ত্তনীয়—অনেকটা 'মন্ত্র'-এর মত। এতে সঙ্গীতজ্ঞের তৃপ্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য ও অন্যের মনোরঞ্জন গৌণ ব্যাপার।

সারা ভারতের সব সময়ের এই অপরিবর্ত্তনীয় উৎকর্ষ সঙ্গীত পরিকল্পনাটিই মার্গ-সঙ্গীত। মার্গ-সঙ্গীতের এরূপ চিন্তা করে সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ অনুভব করেছিলেন যে মার্গ-সঙ্গীতের প্রয়োগ পদ্ধতি যেসব নিয়মে আবদ্ধ করা হবে এই নিয়ম-নিয়ন্ত্রণকে সব প্রদেশের লোক সব সময়ে নিখুঁৎভাবে অনুসরণ করতে পারবে না তাতে মার্গ-সঙ্গীতের আদর্শ নষ্ট হবে; অথচ এই পঙ্কিল সঙ্গীত উৎকৃষ্ট মার্গ-সঙ্গীত নামেই চলতে থাকবে। তাছাড়া সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ আরও চিন্তা করেছিলেন যাদের কাছে সঙ্গীত পরিবেশিত হবে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও তাদের রুচির আনুকূল্যেই মনোরঞ্জন করবে, রুচির প্রতিকূলতায় উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও সমাজের বা ব্যক্তির মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। দেশ কাল পাত্রভেদে মানুষও দেশগত এবং ব্যক্তিগত রুচি প্রস্তুত করে; জিনিস আসলে যতই ভাল স্বভাবসিদ্ধ ও সুন্দর মনোরম হোক না কেন সেই রুচির ছাচের মধ্য দিয়ে তৈরী না করলে সে দেশের বা সে কালের ব্যক্তিদের গ্রাহ্যই হবে না—মনোরঞ্জন তো পরের কথা। আর পরিবর্ত্তনই তো স্বাভাবিক পরিণতি। সেজন্যে দেশে দেশে কালে কালে যে সঙ্গীত রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়ে চলতে থাকবে সেটিকে 'দেশী সঙ্গীত' বলা হবে।

সাধারণ কথায় মার্গ-সঙ্গীত বলতে বলা হয়—যে সঙ্গীতে উর্দ্ধলোকের আবাহন চাওয়া হতো, যে সঙ্গীত ভগবানের সঙ্গে যোগ রাখার জন্যে হতো ঋষিরা যে সঙ্গীত করতেন বিশেষ করে দেবতাদের কাছে, আর নিজেদের তৃপ্তির জন্য তাকে মার্গ-সঙ্গীত বলা হয়েছে। সঙ্গীতের মনোরঞ্জন, রসভাবাদির সৃষ্টি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধন ছাড়াও মার্গ-সঙ্গীতের আর একটি দিক ছিল আভিচারিক ফল—আভ্যুদয়িক ফল; অন্ততঃ পুরা কালের ঋষি তুল্য পরিকল্পনাকারকগণ এরূপ বিশ্বাস করতেন। এই জন্য মার্গ-সঙ্গীতে

যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হতো। উৎকর্ষ সঙ্গীত হলেও তার অনেকখানি মন্ত্রজাতীয় রহস্য-সমাচ্ছন্ন গোপনীয় স্বরে গাওয়া হতো। সে জন্যে মার্গ-সঙ্গীত সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হতো বলে অনুমান করা খুবই সঙ্গত। এই মার্গ-সঙ্গীত দিয়ে যে আভ্যুদয়িক ফল পাবার কামনা, সে ফল পারলৌকিক মঙ্গল বা ভবিষ্যৎ মঙ্গল, আর এগুলি দৃষ্ট ফল নয়, অদৃষ্ট ফল। তাছাড়া সুর দিয়ে মোহিত করা, প্রলোভিত করা, আকর্ষণ করা সম্ভব; সেগুলিও আভিচারিক সঙ্গীতেরই অঙ্গ; আর সেগুলি দৃষ্ট ফল। প্রাচীন শাস্ত্রীগণ বিশ্বাস করতেন যে মার্গ-সঙ্গীত দিয়ে সাধক তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে তার কার্য্যসিদ্ধ করতে পারে, দৃষ্ট আর অদৃষ্ট ফলকে লাভ করে ও করায়। পরবর্ত্তীকালে মার্গ-সঙ্গীতের আভ্যুদয়িক, আভিচারিক অংশকে গোপন রাখারই চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ সমাজের অধিকাংশ লোকই নিজের স্বার্থে অন্ধ। তাতে যে আভিচারিক সঙ্গীতের সাহায্যে সঙ্গীত সাধকগণ অঘটন ঘটাতে পারতেন সেগুলি স্বার্থে অন্ধ অনধিকারীদের কাছে দিয়ে দিলে সমাজের অমঙ্গলই হবে বলে এই সঙ্গীতকে গোপন ও রহস্যপূর্ণ করেই রাখা হয়েছে। ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রামই মার্গ-সঙ্গীতে ব্যবহার হয়। তার মধ্যে গান্ধার গ্রামই আভিচারিক সঙ্গীতের জন্য ব্যবহৃত হতো। এই গান্ধার গ্রাম বর্ত্তমানে অপ্রচলিত।

এই আভ্যুদয়িক অংশ স্তোত্র মন্ত্র জাতীয় সুর ছাড়া মার্গ-সঙ্গীতে ছন্দ ও ধ্বনির প্রয়োগ নৈপুণ্য ছিল, অনেকখানি চিন্তা ও উৎকর্ষ ছিল। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ বলেছেন সেগুলিও দেবতাদের উদ্দেশ্যেই গাওয়া হতো। এই উৎকর্ষ ও সুচিন্তিত প্রয়োগপদ্ধতি দেশী সঙ্গীতেও ব্যবহার করতে আপত্তি নেই তবে এই দেশীসঙ্গীত মানুষের তৃপ্তির জন্যই করা হতো। দেশী সঙ্গীতকে প্রাচীন শাস্ত্রীগণ অপকর্ষ সঙ্গীত বলেনি কোথাও। দেশী সঙ্গীতের আলোচনা বার শতকের গ্রন্থ 'রাগতরঙ্গিনী' এমনকি তের শতকের প্রামাণিক গ্রন্থ শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকরে' বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। দেশী সঙ্গীত অপকর্ষ সঙ্গীত নয়। উৎকর্ষ সঙ্গীতকেই তখন দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নামে যে গীত প্রচলিত তাকে মার্গ-সঙ্গীত ধরে নিয়ে বাংলার প্রচলিত অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীতকে অনেকে দেশী সঙ্গীত বলেছেন। অথচ এই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত উত্তর ভারতে মধ্যযুগে মানুষের রুচির আবেদনেই সৃষ্ট হয়। এই ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরী দিয়ে সমৃদ্ধদের বন্দনা ও মনতুষ্টিই করা হয় এবং এখনও লোকের মনোরঞ্জনই এই গীতের উদ্দেশ্য। দেশী-সঙ্গীতের সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতও খাঁটি দেশীসঙ্গীত।

অনেকখানি চিন্তা না করে, যত্ন করে সংগ্রহ, বাছাই ও ছাটাই না করেই যে সঙ্গীত রচনা অর্থাৎ যে সঙ্গীতে উৎকর্ষকারীর চেষ্টা নেই, যত্ন নেই তাকে লোক-সঙ্গীত বলা হয়।

লোক সঙ্গীতে চিন্তা ও প্রয়োগনৈপুণ্য কম, আবেগই অনেকখানি। বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ছাড়া অনেকশ্রেণীর সঙ্গীত রয়েছে সেগুলির ছন্দ ও সুর প্রয়োগে অনেক যত্ন অনেক চিন্তা আছে সে জন্য সবগুলিই লোকসঙ্গীত নয়। বাংলার কীর্ত্তন মার্গ-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক গান লোকসঙ্গীত নয়। সেগুলিও দেশীসঙ্গীত শ্রেণীভুক্ত।

উত্তর ভারতে মধ্যযুগে প্রথমে ধ্রূপদের উৎপত্তি হয়েছিল, অনেকেরই ধারণা ধ্রূপদ বৈদিকযুগ হতে চলে এসেছে। কিন্তু মুঘল বাদশা আকবরের সময়ে রচিত আইনী আকবরী গ্রন্থে এর উৎপত্তির ইতিহাস কতক আছে। আকবরের কিছু পূর্ব্বেই তার জন্ম। তাছাড়া প্রাচীনযুগের গান-রূপ (form কাঠামো) মধ্যযুগে জাত ধ্রুপদের ধাতু অর্থাৎ গান-রূপ এক নয়। সঙ্গীত রত্নাকরে গানের কাঠামোটিকে প্রথমতঃ অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ এই দুভাগে করা হয়েছিল, অনিবদ্ধ বাধাহীন, অপর নাম আলপ্তি। নিবদ্ধ গানের ধাতুকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাম উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। 'ধ্রুব' গানের প্রধান ও নিত্য অংশ। উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপক না-ও থাকতে পারে। কিন্তু ধ্রুব ছাড়া চলবেই না। গানের প্রকৃত বিষয় ও ভাব 'ধ্রুব'তেই থাকে। আর তারপর 'আভোগ' এ গান পরিপূর্ণতা পায়। উদগ্রাহ গানের আরম্ভে থাকে। যেমন কোন কিছুর ভূমিকা, উদ্‌গ্রাহের রূপ ও প্রয়োজনীয়তা ঠিক তেমনই। এরপর উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুবের মাঝখানে মেলকারক অংশই মেলাপক। মধ্যযুগে সৃষ্ট হিন্দুস্থানী গানে স্থায়ী অংশেই গানের প্রধান প্রস্তাবনা অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ই প্রকাশ করা হয়। আর অন্তরা অংশেই তার পরিপূর্ণতা ঘটে। কাজেই দেখা যায় সঙ্গীত রত্নাকরের সময়ের সঙ্গীতে যা ধ্রুব ও আভোগ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাই স্থায়ী ও অন্তরা। তাছাড়া, উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপকের ব্যবহার একেবারেই নেই। অথচ আধুনিককালেও কীর্ত্তন-গানের গৌর চন্দ্রিকায় উদ্‌গ্রাহ আছে; সামান্যভাবে মেলাপকও রয়েছে। গানের যে রূপ প্রাচীনকালে ছিল তার কতক কীর্ত্তনে এখনও আছে কিন্তু মধ্যযুগে উত্তর ভারতে সৃষ্ট সঙ্গীত ধ্রুপদ খেয়ালে তা একেবারেই নেই।

চৌদ্দ শতকের প্রথমে দেখতে পাই আমীর খসরু রাগরাগিণী মিশ্রণ করে বারটি নতুন রাগের সৃষ্টি করেন। কিন্তু তখনও গানের একটি নতুন রূপ গঠিত হয়ে উঠেনি। পনর শতকের শেষ দিকে চারটি স্থানে সঙ্গীতের চর্চ্চা খুব ছিল। তার মধ্যে মাশাদ ও তব্রীজ ভারতের বাইরে, আর ভারতের ভিতরে কাশ্মীরের রাজা জৈনওল আবেদিন এবং গোয়ালিয়রের রাজা তোমর বংশীয় মানসিংহের রাজসভা ভারতীয় গুণীদের আশ্রয় ছিল। সে সময়ে ষোল শতকে মানসিংহের দরবারে বক্সু ছিলেন অসাধারণ গুণী। রাজা মানসিংহের সভাপতিত্বে ধ্রুপদ জাতীয় গানের ধাতু বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। সে সময় হতে স্থায়ী অন্তরা অস্থায়ী আভোগ এই চারটি ভাগ করা হয়।

গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের দরবারের সভাগায়ক রামদাস ও তখনকার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ভন্নু, গোয়ালিয়রের রাজা তোমরবংশীয় মানসিংহের দরবারের বক্সু ও মধুসূদন প্রাচীন পন্থীদের অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ধ্রুপদকে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত করে। তার আগে ঢাঢী নামে একপ্রকার নটসম্প্রদায়ের মেয়েরা পথে ঘাটে বিশেষ করে অন্তঃপুরে মেয়েদের কাছে ধ্রুপদ গেয়ে জীবিকা অর্জ্জন করত। মানতোমর ও গুজরাটের সুলতানের দরবারে ধ্রুপদ গাওয়ার প্রচলন হওয়ার পর থেকে ঢাঢী কন্যারা পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের কাছে ধ্রুপদ গাইতে আরম্ভ করে। তার আগে ঢাঢী নটচারণ সম্প্রদায়গুলি 'কির্কে' শ্রেণীর গানই গাইত। এই ধ্রুপদ ছিল মথুরা বৃন্দাবন আগ্রা অঞ্চলের প্রাকৃতজনের গান বিশেষ করে মেয়েদের; পুরুষের অযোগ্য গান; যেমন কিছু আগেও ঠুংরী শ্রেণীর গানকে মেয়েদের গান বলেই উপেক্ষা করা হতো। কিন্তু সে সময়ে ঐ স্থানের লোকের রুচি অনুযায়ী সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হয়ে এই ধ্রুপদেরই উৎকষ হতে লাগলো। হুমায়ুন বাদশা মাণ্ডুনগর জয় করার পর বক্সুকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েও পরে গীতজ্ঞ জেনে আদেশ উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর সতর শতকে বৃন্দাবনে সাধক হরিদাস গোস্বামীর কাছে মকরন্দ পাঁড়ের 'রামতনু' নামে এক ছেলে গান শিখতে লাগলেন। এই রামতনুই পরবর্ত্তীকালে আকবরের দরবারের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ 'তানসেন'। তানসেনের রচিত বহু গান এখনও আছে। তিনি রচনা করেছেনও অনেক। নানা রাগ রাগিণীর মিশ্রণ করে তিনি নতুন রাগেরও সৃষ্টি করেছিলেন। তার সময়েই ধ্রুপদের পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ হয়। ধ্রুপদ চর্চ্চা মুঘল রাজত্বের মধ্যে রাজসহায়তায় ও তানসেনের ব্যক্তিত্বে অতি সত্বর ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা সে সময়ে মুঘলরাজের অধীন হলেও বাংলায় এই হিন্দুস্থানী গানের ঢেউ আসে প্রথম আঠার শতকের প্রথমে। বিষ্ণুপুরের মহারাজা রঘুনাথ সিংহ তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনকে বিষ্ণুপুরে সভাগায়ক করে আনেন। তারপর হতেই বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা ক্রমে আরম্ভ হয়।

জৌনপুরের রাজা হোসেন শাহ সির্কী খেয়াল-গীত গুণী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই খেয়াল ও খয়রাবাদের পথে ঘাটে নারীকণ্ঠে গীত প্রাকৃতজনের প্রচলিত গান। মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালেই দরবারে স্থান পেয়ে রাজ অনুগ্রহে প্রচারিত হতে লাগল। সেই সময়েই সদারঙ্গ অদারঙ্গ প্রভৃতি অদ্বিতীয় খেয়াল সুরকারগণ খেয়ালের উৎকর্ষ ও মর্য্যাদা বাড়িয়ে গিয়েছেন, এই দু শত বৎসর আগেকার কথা। বাংলা দেশে এই খেয়াল আসে প্রথম উনিশ শতকের প্রথম দিকে। গত শতকের শেষ দিকেও ধ্রুপদের দিকেই সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ছিল। খেয়ালও তার সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া হতো। আগে ধ্রুপদ পরে খেয়াল। কিন্তু বর্ত্তমানে গত পচিশ বৎসর ধরে বাংলায় খেয়ালেরই বহুল চর্চ্চা হচ্ছে।

ধ্রুপদের গান-রূপে দেখা যায়—স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী অভোগ চারটি ভাগ। কিন্তু খেয়াল গানে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি ভাগ। এ দুটিই যথেষ্ট কেন না তাতে 'তান' ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত হলো। তারপর টপ্পার প্রচলন। পাঞ্জাবের কোন অঞ্চলের উট চালকদের গানের অনুকরণে গোলাম নবী তার স্ত্রী শোরির উদ্দেশে যে প্রণয়গীতি লিখেছিলেন, তারই নাম টপ্পা। বাংলায়ও টপ্পার ঢেউ এলো। প্রথমে বাংলায় রামনিধি গুপ্ত টপ্পা রচনা করেন। টপ্পার প্রচলন হয় বাংলায় উনিশ শতকের শেষ দিকে। বর্ত্তমানে তার চর্চ্চা নেই বললেও চলে। লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা প্রদেশের লোকগীতই উৎকর্ষ হয়ে ক্রমে হয়ে উঠেছে ঠুংরীশ্রেণীর গান এই উনিশ শতকের প্রথম দিকে। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। কলিকাতার দক্ষিণে মেটুয়াবুরুজে তার বাড়ীতে ঠংরী গানের খুব চর্চ্চা হলেও বাংলায় ব্যাপক চর্চ্চা এই শতকেই আরম্ভ হয়।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বয়কে সঙ্গীত বলেছেন। বর্ত্তমান যুগে এই তিনের সমন্বয় বড় একটা পাই না; তবু কতক পাই নাটক ও চলচিত্রে। এতে একটি কথা সহজেই মনে আসে যে, সে যুগে অবসর ছিল প্রচুর; আর তখনকার সঙ্গীত পরিকল্পনা বিরাট হলেও সামাজিক জীবনকে ব্যাঘাত ঘটাতো না। বরং তখনকার অবসর বিনোদনের জন্য সঙ্গীত পরিকল্পনায় স্থান ও সময়ের দিকে না তাকিয়ে তার পূর্ণ বিকাশের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু বর্ত্তমানে কেন মধ্যযুগ হতেই—চৌদ্দ শতক হতে—উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো ছোট হতে থাকে। তখন তার পরিসরও ছোট হয়ে যায়। বৈঠকখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলো, নাম হয়ে গেল বৈঠকীগান। প্রাচীন-যুগের সঙ্গীতের অর্থাৎ গীত বাদ্য ও নৃত্যের ব্যবস্থা করতে বৈঠকখানায় স্থান হতো না—অঙ্গনেই তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতো। অথবা স্থায়ী নাট্যশালায় তার ব্যবস্থা করা হতো।

উত্তরভারতে গীতপদ্ধতি ধ্রুপদের সৃষ্টির সময় হতে গীত বাদ্য ও নৃত্য আলাদা হয়ে পড়লো। ঐ সময়ে উত্তর ভারতে সৃষ্ট ধ্রুপদ গানে নৃত্যকে পাই না। বাদ্যেরও সামান্য অবলম্বন নেওয়া হলো ধ্রুপদে এবং তার পরবর্ত্তী খেয়াল টপ্পা ঠুংরী প্রভৃতি উত্তরভারতীয় গীতপদ্ধতিতে। ঐ শ্রেণীর গানের সঙ্গে সুর রাখবার উপযোগী যন্ত্র তানপুরা আর তাল রাখবার জন্যে পাখোয়াজ বাজে, একে আমরা ঠিক বাদ্য বলতে পারি না। এতে বাজনাকে কমিয়ে গানে কণ্ঠের উপর জোর দেওয়া হলো। ধ্রুপদের সঙ্গে বীণা সরেঙ্গ সুরবাহার বাঁশী সানাই ইত্যাদি যন্ত্রের বাদ্য অথবা দু একজন নর্ত্তক নর্ত্তকীর নৃত্য পাই না বলে একে প্রাচীনরীতির সঙ্গীত বলতে পারি না। 'সঙ্গীত' শব্দটিরও ব্যবহার ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি গীত সম্বন্ধে করা ভুল। গান বা গীত শব্দের ব্যবহারই সঠিক প্রয়োগ।

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতচিন্তা একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে তখনকার সঙ্গীত সমবেত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। কয়েকজন গায়ক আর কয়েকজন বাদককে একত্রে মিলিত হয়ে 'বৃন্দ' রচনা করতে হবে বলা হয়েছে। তাছাড়া কতজন মূলগায়ক ও কতজন সাধারণ গায়ক আর সে সঙ্গে কতজন বাঁশীজাতীয় কতজন তারযন্ত্র অথবা কতজন তাল জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে থাকলে উত্তম মধ্যম ও অধম 'বৃন্দ' গঠিত হবে—শুধু তা-ই নয় কিরূপ —কার্য্যকুশলতা ও গুণ বৃন্দের থাকা উচিত সে সবই প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ বর্ণণা করেছেন। কিন্তু ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় মধ্য যুগে সৃষ্ট গীতপদ্ধতিগুলি সমবেত গানের উপযোগী করে রচিত নয়। সবই একা গাইবার কণ্ঠসর্ব্বস্ব গান। সেখানে গায়ক সভায় বসে যে ভাবে সুর রচনা করবে তা-ই হবে সঙ্গীত। উত্তর ভারতে মধ্যযুগে গায়কের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সমবেত সঙ্গীতে সকলকে এক নিয়মে চলতে হয়; সুকুমার হবে মনে করেও সভায় বসে কোন কিছু নিজের মত করার উপায় নেই; সকলের এক নিয়মে সুরের ও ছন্দের কাজ করতে হবে। তা-না হলে তা সঙ্গীত না হয়ে কোলাহলের সৃষ্টিই হবে। মধ্য যুগের গায়কগণ ঐরূপ বাঁধাবাঁধির নিয়মে শাসিত না হয়ে, কমনীয় না হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দুর্দ্দমনীয়ও হয়েছেন—অনেকাংশে স্বেচ্ছাচারীও হয়েছেন। যে সব ধ্বনি কণ্ঠের উপযোগী নয় বরং যে সব ধ্বনি যন্ত্র-উপযোগী সেগুলিও কণ্ঠ হতেই ধ্বনিত করার রীতি আসতে থাকে। সে সব ধ্বনি কণ্ঠ হতে কষ্ট করে মুখ বিকৃত করে বার করায় শেষ পর্য্যন্ত বাহবাও পেতে লাগলো। ফলে গানে কর্কশতা আসতে লাগলো। কণ্ঠকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করে কণ্ঠের সুকুমারত্ব নষ্ট হতে লাগলো। মুদ্রাদোষ থাকা সত্ত্বেও গায়ক মার্জ্জনা পেতে লাগলো। মুদ্রাদোষকে দোষ বলে ধরাই হলো না। কণ্ঠে গান গাওয়ার বদলে হতে লাগলো 'কণ্ঠ বাদন' করা, বর্ত্তমান কালের খেয়ালের নানা নাম দেওয়া তানগুলি কণ্ঠ-বাদন ছাড়া আর কিছুই নয়; সেগুলি যন্ত্র-উপযোগী তান এবং যন্ত্রেই সে গুলিতে সম্যক ঝঙ্কার দেওয়া সম্ভব ও সমীচীন।

প্রাচীন যুগের রাগরাগিনী নিয়ে একটু আলোচনা করলেই দেখা যায় যে মধ্যযুগে সৃষ্ট ধ্রুপদ খেয়ালের রাগরাগিনীও প্রাচীন যুগের রাগরাগিনীর রূপ এক নয়। এমন কি প্রাচীন কালের রাগ আলোচনায় দেখা যায় যে সে সময়েও কত যে ওলটপালট মতান্তর ও পরিবর্ত্তন হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। পাঁচ শতকে নারদ কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থ সঙ্গীত মকরন্দ একটু অনুধাবণ করলেই দেখা যায় যে রাগরাগিনী সে সময়েই বিক্ষিপ্ত ও নিরুদ্দিষ্ট ছিল। এই সঙ্কলন-জাতীয় গ্রন্থটিতে দেখান হয়েছে যে কোন মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিনী, কোন মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী, কোন মতে আট রাগ চব্বিশ রাগিনী। তাছাড়া একজনের মতে যা রাগ অন্যের মতে তা রাগিনী। একজনের মতে যে রাগিনী এই রাগের

অন্তর্গত অন্যের মতে সেই রাগিনী অন্য আর এক রাগের অন্তর্ভুক্ত। 'শ্রী' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ অথচ কারো মতে 'শ্রী'রাগ, রাগিনী নয়। একেবারে পুংলিঙ্গ হয়ে গেল। প্রায়ই নামের ঠিক নেই কখনও আভ্যুদয়িক নাম। যেমন মঙ্গল, কল্যাণ, ধনশ্রী ইত্যাদি কখনও বা ঋতুবাদক নাম। যেমন—বসন্ত, মেঘ ইত্যাদি। কখনও বা দেশবাচক—যেমন—বঙ্গাল, মালব গৌড় কর্ণাটা ইত্যাদি, তাছাড়া নাম হয়ত এক কিন্তু তাদের রূপের আকাশপাতাল তফাৎ। এতে এই মনে হয় যে সে সময়েও রাগরাগিনীর বিশৃঙ্খলাই ছিল, বিধিবদ্ধভাবে শ্রেণীকরণ ছিল না ; থাকলে এমন বিপর্য্যয় হতো না।

সে সময়ে কি কারণে এমন হয়েছিল তার কথাও অনুমান করা সম্ভব এবং সে অনুমান কষ্ট-কল্পনাও নয়। রাগ নিয়ে অতি প্রাচীনকালেই বিধিবদ্ধ চিন্তা করা হয়ে গিয়েছিল। এই রাগগুলি কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হতো বলে সেগুলিকে সাধারণের নিকট গোপন করার চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু তার পরবর্ত্তী সঙ্গীত চিন্তকগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে লুপ্ত স্বরবিন্যাসগুলি খুঁজে বার করেন ও তাদের অবলম্বন করে অনুশীলন করতে থাকেন। তার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কালে কালে রুচি অনুযায়ী অনেক ব্যক্তিগত মতের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ গুলিও দেশীসঙ্গীতের উপকরণ ও দেশীসঙ্গীতের উপযোগী চিন্তা ও উৎকর্ষেই হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়গত এসব মত ও রাগরাগিনীর শ্রেণীকরণ দরকার হয়েছিল। সেজন্যে নারদ তার সঙ্গীত মকরন্দে সবগুলিকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

তের শতকে লিখিত প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থ সঙ্গীত রত্নাকরে মার্গ-সঙ্গীতের রাগ ও তাল আর তখনকার দেশীসঙ্গীতের রাগরাগিনী ও তাল আলাদা করে লিখে রেখে গিয়েছিলেন। চৌদ্দ শতক থেকে উত্তর ভারতে দেশীসঙ্গীতের উৎকর্ষ কালে রাগরাগিনীর মিশ্রণ হতে থাকে। এইসব মিশ্রণের নতুন নামাকরণও হতে থাকে ; এই ছিল প্রাচীন রীতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে নতুন মানুষ যেসব আসে তাদের রুচি অনুযায়ী চলতে হলে দেশীসঙ্গীতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন চলতেই থাকবে। তখনও তা-ই হয়েছিল। সেজন্যে মধ্যযুগে আবার নতুন করে রাগরাগিনীর শ্রেণীকরণ প্রয়োজন হয়েছিল। সেগুলিতে শৃঙ্খলা আনবার বাঁধাবাঁধি নিয়মে বদ্ধকারীর চেষ্টাও তখন চলতে থাকে। অর্থাৎ সে সময়ে সঙ্গীতজগতে নতুন করে এক সাড়া আসে ; নতুন করে উৎকর্ষ চলতে থাকে। তাতে কবি ভাবুকদের মনেও সঙ্গীত এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। তার থেকে রাগরাগিনী ছাড়া তাদের সহচর-সহচরী ইত্যাদির কল্পনাও আসে। অর্থাৎ ষোল শতকের একেবারে শেষ দিকে রাগরাগিনীর ধ্যানরূপ সংস্কৃত কবিতায় রচনা হয়। তের শতকের আগে এই ধ্যানরূপ ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখনকার

উত্তরভারতীয় শিল্পীগণ এই রাগরাগিনীর ধ্যানগুলিকে অবলম্বন করে ছবিও এঁকেছিলেন। কিন্তু ধ্যানরূপগুলিতে স্বরলিপি ও রাগের স্বরস্থিতির কোন উল্লেখ নেই বলে সেগুলিতে সাঙ্গীতিক কাঠামোর কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগে উত্তরভারতে সৃষ্ট সঙ্গীত ও তার উৎকর্ষরূপ মুঘল রাজত্বের অধিকৃত দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যেখানে মুঘলের প্রবেশের সম্ভব হয়নি সে দেশ উত্তর-ভারতীয় এই পরিবর্ত্তিত সঙ্গীতকে গ্রহণ করেনি। তারা প্রাচীন মার্গ-সঙ্গীত অথবা তাদের অঞ্চলে সময়ের স্রোতে মানুষের রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়ে যে দেশীসঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছে তারই উৎকর্ষ করে থাকবে। এই সময় হতে ভারতীয় সঙ্গীত দুটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় আর আজও ভারতীয় সঙ্গীত দুটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত। একটি দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটী সঙ্গীত নামে প্রচলিত। আর অপরটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। মার্গ-সঙ্গীতের যে অচল ঠাট প্রাচীন শাস্ত্রীগণ বেঁধে রেখেছিলেন তার পরিবর্ত্তন সম্ভব ছিল না। কাজেই দেশী সঙ্গীতেরই পরিবর্ত্তন সম্ভব। আর সঙ্গীতের পরিবর্ত্তিত রূপ ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাঠুংরী সবই দেশীসঙ্গীত আর দেশীসঙ্গীত বলেই এখন দেশগত বিভাগই হয়ে আছে।

উত্তর ভারতে এই হিন্দুস্থানী পদ্ধতিগুলির প্রসারের ফলে বর্ত্তমানে সেখানে মার্গ-সঙ্গীত একেবারেই নেই। সে অঞ্চলে দেবতার উদ্দেশ্যে যে গান এখন আছে তার নাম ভজন। মধ্যযুগের রামানন্দ-কবীর প্রভৃতি সহজ সন্তগণ যে সহজ গানের অবলম্বন করেছিলেন সেই ভজন দিয়েও দেবতার উদ্দেশ্যে গীত করা সম্ভব। কিন্তু মার্গ-সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ও গঠন-পদ্ধতি, তাছাড়া গানের আঙ্গিক, সুর ও তালগুলির আলোচনায় দেখা যাবে সেই মার্গ-সঙ্গীতের রূপ বাংলার কীর্ত্তনে এখনও কতক রয়েছে।

মধ্যযুগে উত্তরভারতে রাগরাগিনীর শ্রেণীকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু মুঘল রাজত্ব পতনের পর দেশে যে অন্ধকার যুগ চলতে থাকে তাতে রাগরাগিনীর সঠিক কাঠামো উত্তরভারতে প্রায় লুপ্ত হয়েই গিয়েছিল। তখন স্বরলিপি না থাকাতে ওস্তাদদের মুখে মুখে যে গান বা রাগরাগিনীর রূপ চলে এসেছিল তাদের উপরই নির্ভর করতে হলো। তাদের স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। গত শতকের শেষ দিকে বাংলা দেশে প্রথম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উদ্ধার আরম্ভ হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে এই বিশ শতকের গোড়ার দিকে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সারাজীবন পরিশ্রম করে অতি যত্নে প্রাচীন কালের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রেখে আবার নতুনভাবে রাগরাগিনীগুলিকে সাজিয়েছেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন, রাগরাগিনীগুলির আঙ্গিকরূপ যথাসম্ভব বেঁধে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে সারা উত্তরভারতে ভাতখণ্ডের মত অনুযায়ী রাগের স্বরূপ আলোচনাই চলছে। কিন্তু উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই সেগুলি মেনে নিলেও দাক্ষিণাত্যে সব রাগরাগিনীর আঙ্গিক

রূপ স্বীকার করেনি। সেখানে গীতপদ্ধতি কোনকালেই একেবারে লোপ পায় নি বলে তাদের প্রাচীন রাগরাগিনী, গানরূপ, আর সঙ্গীতপদ্ধতিকেই তারা উৎকর্ষ করেছে। কালে কালে রাগরাগিনী এত ওলটপালট হয়েছিল যে, বর্ত্তমান রাগরাগিনীর রূপই সেই প্রাচীন অপরিবর্ত্তীতরূপ বললে সত্যকে গোপন করবার চেষ্টাই হয়। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের সঙ্গীত পরিকল্পনা মার্গ ও দেশীসঙ্গীতের পরিবর্ত্তে মধ্যযুগ হতে কর্ণাটীসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত দুটি ভাগ হয়ে আছে। বাংলায় মার্গ-সঙ্গীত শ্রেণীর কীর্ত্তন এখনও আছে। দেশীসঙ্গীত শ্রেণীভুক্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতও চলেছে। সহজীয়া সম্প্রদায়ের ভজন বাউলও রয়েছে। আর এই তিনটি প্রবাহের ফলে উর্ব্বর বাংলায় ঢপকীর্ত্তন, শ্যামাবিষয়ক বৈঠকীগান, আধুনিক বাংলা গানের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(**পূর্বপ্রকাশিতাংশের চুম্বক:** ছোট মফস্বল শহরের নিম্ন আদালতের উকিল যোগীশ্বর দত্ত। একদিন শেষ রাতের দিকে তাঁর বাড়িতে পুলিশ পড়ে। সার্চ করে তাঁর ভাইঝি তামসীর ঘরে ধরে তারা রণধীরকে। রণধীর রাজনৈতিক আসামী, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফিরছিল। ধরা পড়ে রণধীরের লম্বা জেল হয়ে যায়। তামসীও ছাড়া পায়না। কিন্তু জেল থেকে বেরোয় রণধীরের আগে। প্রথমে আশ্রয় নেয় তার দূর সম্পর্কের দিদি কল্যাণীর বাড়িতে, বন্ধুতা পায় দেবিকা ও মানসী নামে দুটি রাজনীতিক কর্মিনীর সঙ্গে। কল্যাণীর বাড়িতে তামসী বেশিদিন টিঁকতে পারেনা, কল্যাণীর প্রফেসর স্বামী ভবদেবের সঙ্গে তামসীর আত্মীয়তার একটা অসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। তামসী চলে আসে দেবিকাদের বাড়িতে, তাদের দলে এসে ভর্তি হয়। কিন্তু কত দিন পরেই মানসী দল ছাড়ে অভিভাবকের আদেশে, দেবিকাও আই-সি-এস বর পেয়ে বিয়ে করে বসে। দল উবে যায়। ভবদেবের সুপারিশে তামসী এক চৌকিতে মাষ্টারি নিয়ে আসে, কিন্তু ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট সার্কেল-অফিসর মনসিজের বাড়িতে পাঁঠার মাংস রাঁধবার হুকুমে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। চলে আসে কলকাতায়, মেয়েদের হস্টেলে, ছাত্রীছত্রে। আই-এ পরীক্ষায় তৈরি হতে। সেখানে বন্ধু পায় চন্দ্রমাকে, ভ্রান্তিমতী মেয়ে, সে ড্রিঙ্ক

করে, সিগারেট খায়। চন্দ্রমা আলাপ করিয়ে দেয় অধিপের সঙ্গে, রাতের হোটেলে। অধিপ সন্ত্রাসবাদী ছিল, এখন জমিদার বাপের প্রশ্রয়ে ভোগে-বিলাসে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আদর্শভ্রষ্ট। সেই তামসীকে চাকরি দেয়, মাইনে একশো টাকা। চাকরিটি অদ্ভুত, অধিপের সঙ্গে গল্প করা, মোটরে করে বাইরে বেড়ানোর চাকরি। হস্টেলের দেনা বাকি, তামসী ত্রিশ টাকা আগাম নেয় মাইনে বাবদ। টাকা নেবার পর এ চাকরির একটা ভীষণ কদর্থ করে চন্দ্রমা। তামসী ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় তার দেশের বাড়ি। গিয়ে দেখে তার জন্যে দরজা বন্ধ। তার ছোটবোন ঊষসীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে এক মূর্খ জমিদারের সঙ্গে। ঊষসীর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখে প্রাণধন শুধু মূর্খ নয়, পাষণ্ড। আর ঊষসী বন্ধনবিধুর, একটা ডাকাতির প্রত্যাশা করে বসে আছে মুক্তির জন্যে। তামসী দাঁড়াবার জায়গা পায়না। ঊষসীর দশা তাকে আরো দুঃসাহসী করে তোলে। সে কলকাতায় ফিরে এসে অধিপের কাছেই চাকরি করতে যায়। মেয়েদের সম্বন্ধে অধিপের যে শস্তা ধারণা ছিল তা বদলে গিয়েছে তামসীকে দেখে। তার দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা দেখে। ভাবে, তামসীকে যদি সে পাশে পায় সহকর্মিনী রূপে তা হলে বুঝি তার পুনরুজ্জীবন হয়। তামসীকে তাই সে বিয়ে করতে চায়। প্রত্যাখ্যান করে তামসী। তখন তার কাছ থেকে অধিপ ফেরৎ চায় তার তিরিশ টাকা। কিন্তু তামসীর টাকা কোথায়। এই অবস্থাটা বুঝে ও তাকে একটা মামুলি ভদ্র চাকরি দেবার অভিলাষে সে, মিল-মালিক জ্ঞানাঞ্জন বকসির সঙ্গে দেখা করে। জ্ঞানাঞ্জন ও অধিপের বাবা প্রমথেশ রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। বাবার সঙ্গে বিরোধ হয় অধিপের, বাবার এক রাজনীতিক পত্র চুরি করে সে জ্ঞানাঞ্জনকে উপহার দেয়, তার খাতির পাবার আশায়। খাতির জমিয়ে জ্ঞানাঞ্জনের অফিসে তামসীর সে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে। এদিকে আই-এ ফেল করেছে তামসী, কাঁধে করে-করে খদ্দর বিক্রি করে পয়সা রোজগারের উপায় খোঁজে। অধিপ আসে তাকে চাকরির খবর দেবার জন্যে, অধিপের সমস্ত সংস্রব থেকে দূর হয়ে গিয়েছে দেখাবার জন্যে সে বলে, তার দরকার নেই চাকরি। আর, যাতে অধিপ না আর তাকে বিরক্ত করতে পারে তার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেয়। তবু জ্ঞানাঞ্জনের থেকে চাকরির চিঠি আসে তামসীর নামে। তামসীকে দেখে পছন্দ হয় জ্ঞানাঞ্জনের, বিশেষত তার অসহায় একাকীত্ব দেখে। তামসীকে তিনি থাকবার জন্যে আলাদা ফ্ল্যাট দেন, সমস্ত রকম আসবাব, এমনকি গয়নাগাটি। আফিসের সবাই তাকে ডাকে, মিস পাবলিসিটি। খলভাষণকে তামসী ভয় করেনা, যা সুযোগসুবিধে এসেছে তার জীবনে তা অস্বীকার করে সে আর ঠকতে রাজি নয়। আফিসের সমরেশ পালিত মিলের শ্রমিকদের সুখসুবিধের তদারক করে, জ্ঞানাঞ্জনের কাছে ধমক খায়। ভাবতে পারেনা বিলাসিনী তামসীরও সহানুভূতি আছে এ বিষয়ে। এদিকে রণধীর বেরিয়ে এসেছে জেল থেকে, নিরাত্মীয়, নিরাশ্রয়। খেতে পায়না, শোয় পার্কে-ফুটপাতে, একটা চাকরির সংস্থান নেই। বিতাড়িত হয়ে ফেরে দোরে দোরে। দেখা করতে যায় নেতাদের সঙ্গে। প্রথমেই প্রমথেশ। কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব হয়নি বলে প্রমথেশ দেশের উপর চটে আছেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা। তারপরে দেখা করে অধিপের সঙ্গে। সে মদ খায়, কবিতা আওড়ায়, শস্তা সিনিসিজম করে। পথে বেরিয়ে দেখা হয় বিজয়ের সঙ্গে। সেও এককালে বিপ্লবী আসামী ছিল, সে এখন স্পাই হয়েছে। রণধীর দুপুরবেলায় এক উকিলের বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে তাকের থেকে চুরি করে আইনের বই। বিক্রি করে রোজগার করে বারো টাকা।)

সতেরো

দেওকিরাম ভকত মারা গেছে।

কিন্তু মরেনি চুনীলাল আহির, বটকৃষ্ণ পান্তি, ফজলে করিম দলদার।

'মরবেনা, মরবেনা ওরা। মরতে দেব না ওদের।' উত্তেজিত কণ্ঠে বললে সমরেশ। অসহায় পরাভবের মধ্যে এমন একটা অনর্থক মৃত্যু তার রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু শান্ত তামসীর কণ্ঠস্বর। পেয়ালার চা ঢালতে-ঢালতে আনত, স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আপনি মরতে না দেবার কে!'

'কে মানে!' সমরেশ প্রায় চমকে উঠল।

'আপনি কি ওদের অভিভাবক? ওরা কি আপনার শাসন-সংরক্ষণে বসবাস করছে?' তামসীর স্বরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

'বা তা কেন! আমরা ওদের দলের লোক, পক্ষের লোক। পথ দেখিয়ে ওদের নৌকো নিয়ে চলেছি পারের দিকে।'

'বড় অহংকার আমাদের। দরকার নেই। ওদের নৌকোর হাল ওদের হাতেই ছেড়ে দিন। কোথায় ওদের পথ ওরা নিজেরাই দেখতে পাবে। যাই বলুন, সবাই আমরা বাইরের লোক। বাইরের লোকেরাই যদি ভিড় বাড়াই, ভয় হয় নৌকো না শেষে ডুবে যায় মাঝনদীতে।' চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে তামসী বিশ্রান্ত ভঙ্গিতে বসল একটা নীচু চেয়ারে?

'হলুম বাইরের লোক, তাই বলে আমাদের কিছু করবার নেই?'

করবার নেই? এই অসাড় ভীরুতা, এই পঙ্কিল দারিদ্র্য, এই স্তূপীভূত অশিক্ষা— করবার কি শেষ আছে?

'কিন্তু আর যাই করুন; ওদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না।' সন্তর্পণে তামসী ছোট্ট একটু চুমুক দিল পেয়ালায়।

'বাঁচাবার চেষ্টা করবনা?' সমরেশের হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল পেয়ালাটা: 'মরতে দেব ওদের?'

'কিন্তু শুধু আরাম দেব, বিরাম দেব, অশন-আসন দেব, এই কি ওদের বাঁচানো? এ তো শুধু ওদেরকে খর্ব করে রাখা। ছোট জিনিসে লোভী করে তুলবেন না ওদের। ওরা নিঃস্ব আছে জানি, কিন্তু ওদেরকে নিঃস্বার্থ হতে দিন।'

যে দুটি কালো চোখ খানিক আগে কৌতুকে চঞ্চল ছিল এখন যেন সংকল্পে স্থির হয়ে আছে। তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রের মত অকম্প।

তেমনি গাঢ়, মন্থর স্বরে তামসী বললে, 'আপনি কি মনে করেন মৃত্যুর একটা ঝড় না বয়ে গেলে নবজন্মের চিহ্ন পড়বে মাটিতে? অন্ধকারের আর্তনাদে আকাশ যদি না বিদীর্ণ হয়, তবে সূর্যের সূচীপত্র লেখা হবে কী দিয়ে? তেমন করে মরতেই যদি না পারি তবে তেমন করে জন্মাতে পারব কেন?'

আশ্চর্য, এত যে দুর্দমনীয় সমরেশ, তার মুখে কথা নেই। তাকে যেন বা একটু দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে। যেন কথাগুলি সে শুনছেনা, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে শরীরী!

'যখনই বলেন ওদেরকে বাঁচাবেন, তখন মনে হয় আপনি ওদের থেকে বড়, ওদের থেকে আলাদা। ওদের প্রতি আপনার করুণার অন্ত নেই। আর তার বিনিময়ে ওদের থেকে চান কিছু কৃতজ্ঞতা। চান ভোট। চান ওদের নেতৃত্ব। দল নিয়ে দলাদলি করার মোড়লি। কি, খাবারের প্লেটে হাত দিচ্ছেন না কেন?' তামসী একমুহূর্ত সহজ হবার চেষ্টা করল।

কিন্তু এক মুহূর্তই। বললে, 'কিন্তু যদি বলেন এদেরকে নিয়ে চলেছি চরম সংঘর্ষের মধ্যে, তখন সহজেই আশা করতে পারি আপনিও ওদের পাশে থাকবেন। বাঁচানার নাম করে চাঁদার খাতাটা ওদের হাতে দিয়ে চাঁদার থলেটা নিয়ে সরে পড়বেন না।'

বলতে-না-বলতেই চমকে উঠল তামসী। সিঁড়িতে কি কারু জুতোর শব্দ হচ্ছে?

না, কেউ নয়।

'কী চান আপনি? মুক্তি না মীমাংসা? জয় না নিষ্পত্তি? শুধু কটা দিনের ছুটি, কটা দিনের মাইনে, কটা দিনের নিরীহ নির্ভাবনা? শুধু কটা সোনালি সুবিধে? একটু শস্তা সৌখিন সুখ? বুঝিনা বাপু আপনাদের কথা।'

'আপনি তবে কী বোঝেন?'

'আমি বুঝি সংগ্রাম। সংগ্রামের সরলতা।'

কথাটা কানে একটুও মিথ্যা শোনালনা। তামসীর চোখে এই সরলতার দীপ্তি দেখতে পেয়েছে সমরেশ। যে ঠিক তাকাতে পারবে সে কখনো ভুল করবে না। ভস্মে ঢাকা থাকলেও দেখতে পাবে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তাই তামসীর নাম সে লিখে নিয়েছে মনে-মনে, একই বাঁশির সুরে উচ্চকিত সাপিনী। অসীম আকাশের আনাগোনায় এক মেঘ আরেক মেঘের সঙ্গে যুক্ত হয়, ভাঙা-ভাঙা একা-একা মেঘ,—তেমনি দুজনে এসে পড়ল কাছাকাছি, এক অনুভবের আকাশে। এক অন্ধকারের বিস্তারে। এক আলোকের অভিমুখে।

প্রথমে আফিস, আফিসের সিঁড়ি। পরে রাস্তা, ট্রাম, রেস্টোরেণ্ট। শেষে, এখন, তামসীর নিজের বাড়ি, বাইরে বসবার ঘর। আত্মীয়তাময় নির্জনতা।

ভাবতে অদ্ভুত লাগছে সমরেশের। সে একজন ভদ্রলোক কেরানি, সভ্য ও শোভন, আর তামসী একটি বিলাসিনী তরুণী, ড্রয়িংরুমের মেয়ে। আর তাদের ঘিরে নরম ও নিরীহ পরিবেশ। পেয়ালায় চা, প্লেটে খাবার। কবিত্বময় কথা। দেয়ালে ম্লায়মান দিনের ধূসরিমা।

'আমরা কেউ নই যতক্ষণ না আমরা সংগ্রাম করি। ততক্ষণ আমরা জয়ী নই যতক্ষণ না আমরা ত্যাগ করি সর্বস্ব।' তামসীর দৃষ্টি গাঢ়তর হল: 'কাউকে যে ভালবাসি তা বুঝব কি করে যদি তার জন্যে দুঃখ পেতে ভয় পাই?'

কিন্তু তামসী আজ অমন উসখুস করছে কেন। সত্যি, সিঁড়ির গোড়ায় কি কেউ কথা কইছে না ফিসফিসিয়ে?

'তা হলে আমাদের ফণ্ডে চাঁদা দেবেন না আপনি?'

'চাঁদা? খুব তুচ্ছ শোনাচ্ছে? কিন্তু, বা, দেব বৈ কি। সুতো না ধরলে কাছি হবে কি করে?' তামসী ঝলমল করে উঠে পড়ল: 'আপনাদের চাঁদার হার কত?'

'ধরা-বাঁধা কিছু নেই। যা আপনি দেন।'

সিঁড়িতে স্পষ্ট করে জুতোর আওয়াজ। আস্তে-আস্তে যেন হিসেব করে-করে উঠে আসছে ভারী পায়ে।

আর কার! যা ভাবছিল তামসী, স্বয়ং জ্ঞানাঞ্জন।

সমরেশকে এখানে দেখতে পাবেন ভাবতেও পারতেন না। আর এমন একখানা ভাব করে বসেছে যেন কত দিনের অন্তরঙ্গতা। সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল মুহূর্তে।

'তুমি এখানে কী মনে করে? সঙ্গে কী ওটা? কবিতার পাণ্ডুলিপি?'

'চাঁদার খাতা।'

'কিসের চাঁদা?' জ্ঞানাঞ্জন ভ্রূকুঞ্চন করলেন। 'একটা ক্লাব-ট্লাব খুলছ নাকি এ-পাড়ায়? কি ক্লাব? ককটেইল ক্লাব? মিক্স্‌ড্‌?

শান্ত মুখে তামসী বললে, 'আমাদের মিলের শ্রমিকদের জন্যে একটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খোলা হচ্ছে।'

ছোট করে একটা নিশ্বাস চাপলেন জ্ঞানাঞ্জন। বললেন, 'তা এখানে কেন?'

'ওঁর কাছ থেকে চাঁদা নিতে এসেছি।' বললে সমরেশ।

'তা আফিসে আমার কাছেই চাইলে পারতে। দিয়ে দিতুম। কষ্ট করে এ পাড়ায় এসেছ কেন?' জ্ঞানাঞ্জনের ভাবার্থটা এই তিনি আর তামসী এক মানুষ। পকেট থেকে থলে বের করে বললেন. 'কত করে রেট তোমাদের?'

'আপনার কাছ থেকে নেব না।' বললে সমরেশ।

'কেন ?'

'মানেটা বোধহয় এই,' তামসী বললে নিঃসংকোচে : 'শ্রমিকের টাকা শ্রমিকের থেকেই আসছে। তা হলে থাকবে তাতে প্রীতি, থাকবে পবিত্রতা। তাই না ?'

সমরেশ হাসল। জ্ঞানাঞ্জনের মনে হল সমরেশ আর তামসীই আজ এক মানুষ।

'আমি হলে কিন্তু নিতুম। বেশ ভারী হাতে নিতুম।' হাসিমুখে বললে তামসী : 'যারা শোষক তাদের থেকেই শুষে নেয়া। যারা শত্রু তাদেরকে বোঝানো আমাদের যুদ্ধের বৈধতা।'

জ্ঞানাঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেলেন। টুপিটা আজ নিজেই রাখলেন ব্র্যাকেটে। কোটটা খুলে ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা কাঠের চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখলেন। বাইরে এসে বললেন, 'যা হয় কিছু দিয়ে ওকে বিদায় করে দিন না।'

কথাটা লাগল যেন ঘাড়ধাক্কার মত। সমরেশ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আজ তবে যাই। আরেকদিন না হয়—'

'না, না, বসুন।' তামসী চলে গেল ঘরের ভিতরে। ব্যগ্র হাতে বাক্স খোলবার চাবি খুঁজতে লাগল। কখন কোথায় রেখেছে ঠিক মনে করতে পারছেনা। বিছানার তলায়, এটাচি কেসে, না আঁচলে বাঁধা ফেলে এসেছে বাথ্‌রুমে ? না, কেউ ঘরে ঢুকে সরিয়ে নিয়েছে চোরের মত ?

জ্ঞানাঞ্জন বসলেন না। ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন ঘর-দোর। নিচে দারোয়ানের সঙ্গে এক প্রস্ত কথা সেরে এসেছেন, এখন কথা বলতে লাগলেন ঝি-চাকরের সঙ্গে। বাজার-দর, শরীর-গতিক, সুবিধে-অসুবিধে। মাসে ক পাউণ্ড চা লাগে, কত চিনি, কত বন্ধু এসে জমায়েৎ হয় সকাল-বিকেল। রাতে আলো জলে কতক্ষণ, মিটারের কাঁটা কোন ঘরে এ মাসে। যেন তিনিই এ বাড়ির প্রভু, আফিস থেকে ফিরে চাকর-বাকরের উপর কর্তালি করছেন, শাসন করছেন সমস্ত অপচয়ের।

চাবি খুঁজে পেয়েছে তামসী। কাগজ-চাপা হয়ে লুকিয়ে ছিল বইর মধ্যে। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে টাকা বার করে আনল।

'কত দিচ্ছেন ?' প্রশ্ন করলেন জ্ঞানাঞ্জন।

তামসী উত্তর দিলনা। নোট কখানা মেলে ধরল সমরেশের খাতার উপর।

পঞ্চাশ টাকা। জ্ঞানাঞ্জন ঝলসে উঠলেন : 'টাকা আপনার বেশি হয়েছে দেখছি।'

'টাকা কখনো কারো বেশি হয় না। যা বেশি হয় তা হচ্ছে অনাবশ্যক শাসনের থেকে মুক্তি পাবার আগ্রহ।'

জ্ঞানাঞ্জন তামসীর ধার দিয়ে গেলেন না। কেননা তিনি জানেন আগামী মাসে এই

পঞ্চাশটা টাকাই পাইয়ে দিতে হবে তামসীকে। তিনি ঝামটে উঠলেন সমরেশের উপর: 'যাও, সমস্ত জীবনের চাঁদা পেয়ে গেছ একসঙ্গে, লাইফ-মেম্বর করে নাও গে। ইহজন্মে আর তোমাকে আসতে হবেনা এদিকে। নাও, আর কেন। ওঠো—'

সমরেশটা কী মূর্খ। সত্যি-সত্যি উঠে পড়ল। বলতে পারলনা, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবার কে? এটা কি আপনার বাড়ি? বলতে পারলনা। তামসীই বা বলতে পারলনা কেন?

নিজের তাগিদেই চাকর চা করে এনেছে জ্ঞানাঞ্জনের জন্যে। তামসী বললে, 'আরেক পেয়ালা চা খেয়ে যান।' এমনি করে ঘুরিয়ে বললে। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারল না, না, যাবেন না, এটা আমার বাড়ি, আমি আপনাকে বলছি বসে থাকুন। তামসীর ইচ্ছে হল নিজেও এই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তার হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন বন্ধ হল এক মুহূর্ত। মন ফিরে এল দোর গোড়া থেকে। রাত্রে তার খিদে পাবে, ঘুম পাবে, সকাল উঠে মন চাইবে আবার আরম্ভের স্বাচ্ছন্দ্য। এখনো অনেক কথা ভাববার আছে। এখনো মায়া হয় বুঝি এই মনোহর অভ্যাসের জন্যে। এখনো বুঝি সমুদ্রে কোটাল ডাকেনি। খুঁটি-খাম এখনো ঠিক আছে।

সমরেশ চলে গেলে জ্ঞানাঞ্জন বসলেন খাঁট হয়ে। টাকা সম্বন্ধে একটা কঠিন কটুক্তি করেছেন, মনের মধ্যে লেগে আছে তার ঝালটা। সেটাকে মিঠে করে দেয়া দরকার। বললেন, 'টাকা আপনি যাকে যত খুশি দিন, তাতে কারু কিছু বলবার থাকতে পারে না। কিন্তু এই সব বাজে লোককে কি বাড়িতে ঢুকতে দেয়া ভাল?'

তামসী তার সেই বিমোহন হাসি হাসল। বললে, 'সংসারে কোনো লোকই আর বাজে নয়।'

'বাজে নয়? এই সব স্কাম, ডার্টি লোকগুলো এখানে এসে প্রশ্রয় পাবে তাই বলে? শেষে একদিন দেখব ফ্যাক্টরির হেডমিস্ত্রি এসে বসেছে। হেডমিস্ত্রি ছেড়ে ফিটার মিস্ত্রি?' জ্ঞানাঞ্জন গজগজ করতে লাগলেন।

'আশ্চর্য কী।' তামসী তেমনি সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললে, 'এই সব বাড়ি-ঘর, এত সব সুখ-ঐশ্বর্য একদিন এ সব বাজে লোকেরাই বাজেয়াপ্ত করবে। দরজা আর সিঁড়ি চিনে রাখুক আগে থেকে।'

'এ কিন্তু আপনি বেশি বলছেন।' রাগ করে এক চুমুকে অনেকটা চা খেয়ে ফেললেন জ্ঞানাঞ্জন। বললেন, 'আমি ক দিন এ বাড়িতে এসে থাকতে পারি তবে ঠিক হয়। ওসব চুনোপুঁটি কেরানির আস্পর্ধাটা বের করে দিতে পারি। আপনাকে গোবেচারা ভালমানুষ পেয়ে ওদের হাতে পুতুল-নাচ করাচ্ছে। দেখেছে বাড়িতে কেউ পুরুষ নেই, অমনি ভেবে

নিয়েছে কেউ অভিবাবকও নেই আশে-পাশে। না, এখানে এসে থাকতে হয় আমার কিছু দিন। নইলে ওরা বুঝবে না আপনি কে, আপনি কোথায়।'

তামসী তার মুখের হাসিটি অস্ত যেতে দিলনা। ভাবতে চেষ্টা করল, সত্যি, বাজে লোকের আস্পর্ধা কত দূর।

হঠাৎ খাটো গলায় জিগগেস করলেন জ্ঞানাঞ্জন: 'অধিপ আসে? সেই বিশ্ববখাটে বেকার?'

'কই আর এলেন!' তামসীর গলা থেকে মধুময় মমতা ঝরে পড়ল।

'না, আসবে বৈ কি। সে কি আর দিন থাকতে আসবে? সে আসবে রাত ঘন হলে। আর নিজেও একটু ঘন হলে। আচ্ছা, আমি ঠিক তাকে ধরে ফেলব এক দিন। আমি পশু পাটনা যাচ্ছি, সেখান থেকে ঘুরে আসি চট করে। মাঝরাতে আমরাও বেরুতে পারি। মাঝরাত হলেই ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলে পড়েনা।' কী আছে এর মধ্যে রসিকতার, জ্ঞানাঞ্জন নিজের আনন্দে হেসে উঠলেন।

তামসীকে তবুও চাকরি করতে হবে! করতে হবে বৈ কি। নইলে কোথায় পাবে সে এমন বাড়ি-ঘর, এই সাজসজ্জা, এত সুখশান্তি। বা, তাই বলে তার বাড়িতে কে আসবে না-আসবে সে সম্বন্ধে তার স্বাধীনতা থাকবে না? থাকলে ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন এসেছে বলেও তো গায়ে তার ফোস্কা পড়ছেনা। সমরেশ যে চলে গেল তা তার নিজের ভীরুতা। তাছাড়া বাড়িটা তার নয় অথচ ভাড়াটা মাগনা। তা না হয় মানছি, কিন্তু তাই বলে অমন হীন কটাক্ষ করে কথা কইবে কেন? শুধু কথায় কী হয়? কথায় তো আর পাহাড় টলে না। আজ কথা, কিন্তু কাল যদি আর ফাঁকা আওয়াজ না থাকে? যদি সত্যিই মাঝরাতে এসে দরজায় টোকা মারে! বা, সেই পরীক্ষার সামনে মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারবে না তো মানুষ হয়েছে কি! এক ভাবে না এক ভাবে সংঘাত তো এক দিন আসবেই। তার জন্যে আগে থেকেই প্রস্থান করবে সভয়ে? ছেড়ে দেবে চাকরি? এমন কাপুরুষও কেউ আছে?

'চলুন, বেড়িয়ে আসি একটু।' জ্ঞানাঞ্জন অন্তরঙ্গতায় আর্দ্র হয়ে উঠলেন: 'বড় গাড়িটা নিয়ে এসেছি।'

'না।' এতটা রূঢ় হবার কোনো মানে হয় না। না-টাই মোলায়েম করে বলা যায়, নানা রকম ভাবের আবরণ দিয়ে। পরক্ষণেই তামসী শুকনো ঠোঁটে হাসির অস্পষ্ট তুলি টানল, চোখে আনল কুণ্ঠার কুহেলি, বললে, 'শরীরটা ভাল নেই।'

চাকরি ছাড়াটাই সব নয়, চাকরি যাওয়াটাও আছে সংসারে। তামসীর চাকরি কে

ছোঁয়, কিন্তু চাকরি গেল সমরেশের। এক খোঁট কালিতে, কলমের একটিমাত্র আঁচড়ে। চব্বিশ ঘণ্টা না পেরোতেই।

অতর্কিতে চড় খাবার মত, এমনি মনে হল তামসীর। বাইরের চোখে কি কারণ তার চাকরি যাবার কে জানে, কিন্তু আসল কারণ যে সে নিজে এ কথা কে না বুঝবে? আরেকটা অপমানের শৃঙ্খল জড়ানো হল তার পায়ে, তার চলার পথে আরেক প্রতিবন্ধ। কিন্তু তার জন্যে করবে কী তামসী? সেও তার চাকরি ছেড়ে দেবে এই সঙ্গে? তাতে কী এমন সুরাহা হবে সমরেশের? সেও বা কী পাবে এই বৈরাগ্যের বিনিময়ে? সমরেশ যাবে এক রাস্তায়, সে আরেক। এক রাস্তায় হলেও দূর-দূর দিয়ে। কে জানে, হয়তো কারু সঙ্গে কারুর দেখাই হবে না। দেখা না হলেও যে দেখা হয় মনে-মনে তেমন দেখাও নয়।

ভেবেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে সমরেশ, অর্ডার পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু দু দিন হয়ে গেল তার দেখা নেই। কোথাও একটি পাতা নড়ল না, কলের তেলের কমতি হলনা এতটুকু, উলটে যেতে লাগল জ্ঞানাঞ্জনের লাভের খাতার পৃষ্ঠা। হাতের কলম ফেলে রেখে শুধু সমরেশই এল বাইরে বেরিয়ে। ভেবেছিল বোধহয় কিছু একটা কাণ্ড ঘটবে, অন্তত তামসী এ মুখ বুজে সহ্য করবে না। কিন্তু, না, কোথাও এতটুকু চিড় ধরল না, তামসী তেমনি খোঁপা ফাঁপিয়ে শাড়ি আঁট করে আফিস করছে। তার প্রসাধনে এতটুকু ত্রুটি নেই।

এক দিন তামসীর বন্ধ দরজায় ঘা পড়ল সমরেশের।

'আসুন।' ঈষৎহসিত মুখে সাদর সংবর্ধনা।

জ্বালা করে উঠল সমরেশের। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'এর কোনো প্রতিবিধান নেই?'

'আপনার হাতে যদি কলম না থেকে হাতিয়ার থাকত তবে অনেক সহজ হত।' তামসী যেন সেই সহজের প্রতিচ্ছায়া: 'কবির কলম আর কেরানির কলমে অনেক তফাৎ। কেরানির কলম কালিমা ছাড়া আর কিছু লেখে না। তাই তার কলম হাত থেকে মাটিতে খসে পড়লেও কলমই থাকে, হাতিয়ার হয়ে ওঠেনা। তাই আপনি চলে যাবার পর আপনার পাশের টেবিলের রমনীবাবু, আপনাদের গিল্ড্-এর যিনি সেক্রেটারি, আপনার জায়গায় তাঁর ভাইকে ঢোকাবার জন্যে তদবির করছেন।'

পরাভূতের মত তাকিয়ে রইল সমরেশ। বললে, 'কিন্তু আপনি তো কিছু করতে পারতেন।'

'বা আমার কী। আমি কী করব!'

'কেন, আপনাকেও তো অপমান করেছে।'

'কে বললে? আমার বরং আরো দাম বেড়েছে সেদিন থেকে। আপনাকে সেদিন যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলুম তা ফিরে এসেছে দ্বিগুণ হয়ে!' নিশ্চিন্ত সুখে হাসল তামসী।

'সেটাও তো অপমান।'

'আপনি ভাবতে পারেন, আমি ভাবি না। আমি মনে করি, সেটা উন্নতি। যেমন রমণীবাবু তাঁর সংসারের আয়ের উন্নতি খুঁজছেন ভাইয়ের চাকরি দিয়ে। তারপর বক্সি যখন শুনবে, আপনি আমার কাছে এসেছিলেন আর আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তখন আমার আরো উন্নতি হবে দেখবেন।'

'একজন সহকর্মীর উপর এই যে অন্যায় হল তার জন্যে আপনার কি কিছুই করবার নেই? এতটুকু একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত নয়?'

'আমার জন্যেই তো আপনার চাকরি যায়নি। চাকরি গেছে মজুরদের মধ্যে আপনি অসন্তোষ সৃষ্টি করছেন বলে।'

'কিন্তু ওরাই বা কী করল আমার জন্যে?'

'কেনই বা করবে? আপনি ওদের কে? ওদের পক্ষে হতে পারেন কিন্তু ওদের মর্মে তো আপনি নন। আপনি তো নন ওদের জ্ঞাতিগুষ্টির একজন। আপনি চলে গেলে ওদের খুব জোর চোখের জল পড়তে পারে, কিন্তু রক্ত ঝরবে কেন?

'তবে এখন আমি কী করব?'

'যখন জিগগেস করেছেন, বলি, শ্রেণীবদল করুন। ওদের একজন হয়ে যান। একেবারে সুরু করুন নিচে থেকে। যাতে ওরা বুঝতে পারে, আপনি ওদের আপনার লোক, যাতে বিশ্বাস করতে পারে আপনাকে। এদের মাঝে নিয়ে আসুন আপনার দৃষ্টি, আপনার কর্মশক্তি, আপনার আন্তরিকতা। পারবেন? সব কিছুর আগে নিজের জীবনে পারবেন এই বিপ্লব ঘটাতে?'

'থাক, আপনার উপদেশটা আপনি নিজের জন্যে রাখুন।' সমরেশ রাগ করে উঠে পড়ল: 'আমি জানতাম আপনার কাছ থেকে কোনো আশা নেই। আপনি শুধু কথার ফুলঝুরি। আসলে আপনার লক্ষ্য শুধু রমণীয় জীবন, ভোগবিলাস—'

'কার নয়?' তামসীর সেই ঈষৎহসিত মুখে সেই শান্ত ঔদাসীন্য: 'তারই জন্যে না এত সংগ্রাম, এত ব্যর্থতা।'

সমরেশ রাগ করে চলে গেল। কিন্তু তার মা রাগ করতে পারলেন না। ক'দিন পরে একটা চিঠিতে তামসীকে ডেকে পাঠালেন মিনতি করে।. আকুল মিনতি করে।

আফিস ফেরৎ তামসী সমরেশদের বাড়ি গেল। জ্ঞানাঞ্জন বকসির পাড়াতেই

তাদের বাড়ি, কিন্তু প্রতিবেশিতার সামান্যতম মাহাত্ম্যও তা দাবি করতে পারেনা। যেমন এঁদো তেমনি ঘিঞ্জি, অবিশ্বাস্যরকম জীর্ণ। ছেলেপিলে আছে কটি। কুলক্রমাগত দারিদ্র্যের তিলক সবাইর ললাটে।

ভদ্রমহিলার এককালে রূপ ছিল, ছিল সে রূপের তেজস্বিতা। বি-এ পাশ করেছিলেন, ছিল শিক্ষার চাকচিক্য। তবু এক দরিদ্র কেরানিকে বিয়ে করেছিলেন ইচ্ছে করে, সবাইর বাধা ঠেলে। আর সেই পরমনির্বাচিতের মৃত্যুশোক কী ভাবে গ্রহণ করেছেন জীবনে তাঁকে না দেখলে তামসী বিশ্বাস করতে পারত না।

'তুমি যদি সত্যি চেষ্টা কর, সমরেশের চাকরিটা আবার হয়।' ভদ্রমহিলা তামসীর হাত চেপে ধরলেন।

'আমার কী করবার আছে!' তামসী চেয়ে রইল অবাক হয়ে।

'কে না জানে, বকসির উপর তোমার প্রচণ্ড প্রভাব। তুমি যদি একটু অনুরোধ করো—'

তামসী চুপ করে রইল।

'আমি গিয়েছিলুম নিজে বকসীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কিছুতেই নড়লেন না একচুল। তাঁর নিষ্ঠুরতা নরম করতে পারি এমন আমার সাধ্যি নেই।'

'আমার আছে?' পাংশুমুখে হাসল তামসী।

তারপরে ভদ্রমহিলা যা বললেন তাতে তামসী সত্যি-সত্যি ভয় পেল। জ্ঞানাঞ্জন এমন আভাস দিয়েছেন যে তামসীকে তিনি বিয়ে করছেন। কল-কারখানার কলুষস্পর্শ থেকে রক্ষা করবেন তাকে। নিয়ে আসবেন তাকে দুষ্প্রবেশ অন্তঃপুরের নিভৃতিতে। তাঁর রুগ্ন স্ত্রী নাকি সম্মতি দিয়েছেন। আর কোনো আত্মীয়স্বজনকে ভয় করবেনা জ্ঞানাঞ্জন।

এতক্ষণে ভয়ের শীতস্পর্শ লাগল এসে তামসীর রক্তে। যা অন্যায় যা অত্যাচার তা যদি নগ্ন মূর্তিতে আসে তবে তার মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, কিন্তু যদি তা আসে আইনের বা সমাজধর্মের মুখোস পরে তবে তাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি! এমনি ব্যভিচারটা গর্হিত, কিন্তু তাকে একটা বিয়ের আচ্ছাদন দিতে পারলে কেউ আর টুঁ শব্দটিও করেনা।

তার মানে জ্ঞানাঞ্জনই ভয় পেয়েছেন।

'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব।' তামসী উঠে পড়ল।

পরদিন আফিসে সুইং-ডোর ঠেলে তামসী ঢুকল জ্ঞানাঞ্জনের খাস-কামরায়। বিনা কাজে, বিনা ঘোষণায়।

'আপনি আর আমার ওখানে যান না কেন? কী হয়েছে আপনার?'

জ্ঞানাঞ্জন উছলে উঠলেন। গায়ে পড়ে নিজে তাকে নিমন্ত্রণ করছে, কী হল আজ সংসারের ? বললেন, 'যাব, যাব বৈ কি। একদম সময় নেই। কখন যাব বলুন তো ?'

'বা, আপনার বাড়ি, যখন আপনার খুশি।'

সন্ধের ঠিক পরেই জ্ঞানাঞ্জন এলেন। আজ তাঁর বড় দরাজ হাসি, দিল দরিয়া ভাব। আরো তিনি বেশি খুশি, তামসী সুন্দর করে সেজেছে, তাঁর জন্যে খাবার করেছে নিজের হাতে।

কথার পর কথা বলতে-বলতে আসল কথায় চলে এল তামসী। বললে, 'সমরেশের চাকরিটা ফের পাইয়ে দিলে হত। ওদের বড় দুরবস্থা।'

'তুমি যদি বল দিয়ে দেব।' জ্ঞানাঞ্জন উদার ভঙ্গিতে বললেন।

'আমি ওকে বলেছিলুম কুলি হতে, কিন্তু ওর সেই কেরানি হওয়ারই সখ।'

উঁচু গলায় হেসে উঠলেন জ্ঞানাঞ্জন। 'চেয়ারে বসে চাকরি যে। ওর মা এসেছিল আমার কাছে ভিক্ষে করতে। আমি বলেছিলুম আমার কাছে কেন, মিস ডাট-এর কাছে যান। যার কাছ থেকে আপনার ছেলে ভাঁওতা দিয়ে টাকা এক্সটর্ট করে নিয়েছে, তাদের সমিতিতে যোগ দেবেনা বলে যাকে সে রীতিমত 'বুলি' করেছে গুণ্ডার মত। হা-হা-হা। এসেছিল নাকি মিসেস পালিত ?'

'এসেছিলেন।'

'বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। তবে বুঝে নিয়েছে ওরা হু ইজ হু, কার কী ক্ষমতা !' জ্ঞানাঞ্জন পকেট থেকে পাইপ বের করলেন। এটা তিনি তখনই ব্যবহার করেন যখন একটা বিরাট সাফল্যের শৃঙ্গারোহণ করেন। এখন তাঁর তেমনিই মনে হল। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এবাড়িতে ফোন থাকা উচিত ছিল। খাওয়া-দাওয়া তো হয়েই গেছে আজকের মত, বাড়িতে রিং করে দিতুম, ফিরব না আজ।'

ভড়কালনা তামসী। হাসিমুখে বললে, 'তারপর আপনি ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি রিং করে দিতুম থানায়, কত বড় একজন পুঁজিপতি কি-এক অখ্যাত জায়গায় খুন হয়ে পড়ে আছে।'

নির্বোধের মত জ্ঞানাঞ্জন হেসে উঠলেন।

তামসী টুপিটা বাড়িয়ে ধরল। জ্ঞানাঞ্জন সেটা তুলে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, ঘুরে আসছি শিগগির।' একটা সঙ্কেতসূচক কটাক্ষ করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললেন, 'ছোট মোটরটা তোমার জন্যে রেখে যাব ?'

তামসী শুনেও শুনল না।

সমরেশ হাতিয়ার না নিয়ে ফের কলম কুড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু তামসী করে কি ?

সে পালাবে। কোথায় পালাবে? পালাবার জায়গা নেই বলেই পালাবে। যদি জায়গা থাকত তবে শেষ পর্য্যন্ত দেখে নিত জ্ঞানাঞ্জনকে।

দু'সপ্তাহের পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে বসল তামসী। সম্ভব-অসম্ভব যত বিজ্ঞাপন দেখল পাগলের মত দরখাস্ত পাঠাতে লাগল। কোন এক সংঘ বেকার পুরুষ-মেয়েদের চাকরি দেবে, যার যেমন যোগ্যতা সেই অনুসারে, দরখাস্তের সঙ্গে দশ টাকা চাঁদা, সেখানে পর্যন্ত সে আবেদন করল। টাকা পাঠিয়ে দিল মনি-অর্ডার করে।

আঠারো

জ্ঞানাঞ্জন গিয়েছিলেন কে জানে কোথায়। আফিসের পর তাঁর সহকারী সেক্রেটারি কালিকিংকর এসে তামসীকে খবর দিল, আজ সাহেব রাতে ফিরবেন কলকাতা, ডিনার সেরে এবাড়ি আসবেন দশটা নাগাদ। এই মর্মে ও বাড়িতে খবর দিতে লিখেছেন।

এ যেন গল্পের মত। এক রাজার দুই রানি। বড় আর ছোট। রাজা কখনো বড়র কুটিরে, কখনো বা ছোটর। কালিকিংকরের এতটুকু আটকালনা। এ গল্প যেন তার বহুদিনের জানা।

তামসী খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে রইল। ভাবল, চলে যায় জ্ঞানাঞ্জনের বাড়িতে, তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সান্নিধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না সে উদ্যতাস্ত্র হয়ে? পদদলিত করতে পারবে না সেই লোলুপতা? কার কী সাধ্য তার এই একাকীত্বকে ব্যাহত করে? দরজায় সে খিল এঁটে থাকবে। ধাক্কা দিলে খুলে দেবে না। তাই বা কেন? আসুক না সে খোলা দরজা দিয়ে। কিসের কী ভয়? তাকে তার শানিত কথায় ও নিষ্ঠুর নিঃশব্দতায় পরাস্ত করতে পারবে না? তবে সে কিসের বিপ্লবিনী?

নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে এল তামসীর। শরীরটা যেন হালকা হল নিমেষে। যে যাই বলুক, এমন চমৎকার চাকরি সে খোয়াতে পারেনা। এত আরাম, এত প্রাচুর্য যেখানে। লক্ষ্মী না হয়ে কালী হতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এমন অলক্ষ্মী যেন সে না হয়। তাই নির্ভেজাল গোঁয়ারতুমি করার কোনো মানে হবে না। বন্ধ দরজায় জ্ঞানাঞ্জন ধাক্কা মারবে আর অন্ধকার ঘরে সে চুপচাপ দম আটকে বসে থাকবে, তার ফল হবে এই, কাল সকালে চাকরি থেকে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। কাল না হলেও পর্শু। এভাবে নিজের মনের শৈত্য নিঃসন্দেহে জানিয়ে দিলে জ্ঞানাঞ্জন কিসের ভরসায় হৃদয়ে তাপ সঞ্চয় করবেন? না, আঘাত দেয়া যাবে না প্রত্যাহারের রূঢ়তায়। দুর্গ অভেদ্য

থাকলেও অর্গল থাকবে অবারিত। আসুন তিনি ভিতরে। যে রণরঙ্গিণী, সে সহজেই রূপরঙ্গিণী হতে পারবে। মিষ্টি কথা বলে তোয়াজ-তোসামোদ করে ফিরিয়ে দেবে সে অনায়াসে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। যে করে হোক, বজায় রাখা চাই তার চাকরি। মেজাজ রাখা চাই মনিবের।

তামসী স্নান করে নিল। প্রসাধন করলে পরিপাটি করে। খুব দামী ঝলমলে শাড়ি পরলে। গয়না পরলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে হাসল তামসী। কে না বলবে সে সেজেছে আজ জ্ঞানাঞ্জনের জন্যে ?

'দিদিমণির আজ বিয়ে।' প্রশ্রয়পালিতা প্রগলভা ঝি বললে।

বলুক। সব বাক্যের বুদ্বুদ।

একটা ঢালু চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে তামসী। একটা চাউস পত্রিকা নিয়ে। ভাবটা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। দশটার সময় যখন আসবে বলেছে, ছ'ঘণ্টা আগে কোন না আসবে। খেয়ে আসবে বলেছে, হঠাৎ কেন না মত বদলে বলবে, যা হয়েছে তাই এখানে খাব। সেটাই তো বেশি সম্ভব। একটা পটভূমিকা তো দরকার।

যা ভেবেছে, সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হচ্ছে। বুকের ভিতর দুরদুর করে উঠল। দেয়ালঘড়িতে তাকিয়ে দেখল মোটে সাড়ে আটটা। সকাল-সকাল আসাই বরং ভাল। সকাল-সকালই তা হলে বিদেয় করা চলে।

দরজা খোলা। থামেজের আলোটা জ্বলছে। তামসী উঠে পড়ল।

দোরগোড়ায় রণধীর দাঁড়িয়ে।

'এ কি ! তুমি ? তুমি ?' নবীনাগত কিশলয়ের মত কাঁপতে লাগল তামসী।

'আর তুমি ! তুমি ! অসি !' রণধীর ডেকে উঠল বিহ্বলের মত।

অসি ! এই নামে আর কেউ কখনো তাকে ডাকেনি। তার বাবা তার নাম রেখেছিলেন তাকে মসী বলে ডাকবেন বলে। তার আত্মীয়স্বজন ছাত্রীবন্ধু সবাই তাকে মসী বলে ডাকত। মসীর মাঝে যে অসি ছিল লুকিয়ে এ শুধু রণধীরই দেখতে পেয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে দুঃসহ দামিনী। তামসী হঠাৎ আজ অনুভব করল সে সত্যিই অসি, শুভ্রধার তলোয়ার।

'কবে ছাড়া পেলে ?'

'অনেক দিন। কিন্তু ছাড়া পেয়েছি এমন কিছুতেই ভাবতে পারছিনা। নেকড়ে বাঘেরা একটা পথের কুকুরকে তাড়া করে ফিরছে।' বড় ক্লান্ত শোনাল রণধীরকে। পরিপূর্ণ চোখে একবার তাকাল তামসী। অত্যন্ত বিধ্বস্ত, হতশ্রী চেহারা। জামাকাপড়

ময়লা, জুতো ছেঁড়া, ক্লান্তি ও হতাশার প্রতিমূর্তি। দারিদ্র্যের মালিন্য যেন তার হাড় পর্যন্ত কালি করে দিয়েছে। দুই চোখে ভয়, পরাজয়ের যন্ত্রণা।

কিন্তু আর ভয় কিসের! আমি আছি। তোমার সমস্ত ব্যর্থতা আমি প্রক্ষালন করে দেব। তুমি পূর্ণ করবে আমার সকল প্রতীক্ষা। আমি আছি। তুমি আছ।

'আমার ঠিকানা পেলে কি করে ?' উৎফুল্ল চোখে বললে তামসী।

'ওঃ, কত দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। খুঁজছি আর খুঁজছি। ভগবান তো মানিনি কোনোদিন, তবু তিনি না মানিয়ে ছাড়বেন না। ট্রামে আজ হঠাৎ দেখতে পেলুম তোমাকে। পিছু নিলুম। ডাকতে সাহস হল না রাস্তার উপর। কে জানে চিনতে পারবে কিনা। দেখলুম, কোথায় যাও। পেয়ে গেলুম ঠিকানা। তবু তখুনি সাহস হলনা সিঁড়ি ধরে উঠে যাই তোমার সঙ্গে। কে জানে, কার ঘরের ঘরণী, কার অন্তঃপুরে অশান্তি সৃষ্টি করব। আশেপাশে খবর নিলুম। বললে, এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি, তুমি একা আছ তোমার আলাদা ফ্ল্যাটে। সত্যিই তুমি একা, অসি ?'

'একেবারে একা। একেবারে কোষমুক্ত।'

'একেবারে একা ?'

'তুমি এস আমার ঘরের ভিতরে, আমি নিঃসঙ্গ, নিরাত্মীয়। এখন যখন তুমি আমার ঘরে এসেছ, আর আমি একা নই। আমি এখন কোষবদ্ধ তলোয়ার। আবৃত, সুরক্ষিত।'

ঘরের চারদিক বিস্মিত চোখে দেখতে লাগল রণধীর। বিহ্বল কৌতূহলে দেখলে আরেকবার তামসীকে। বললে, 'এ সব ঘরদোর, আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, সব তোমার ? তুমি খুব বড়লোক হয়ে গিয়েছ দেখছি। কি করে হলে ?'

'বলছি, সব বলছি তোমাকে। তুমি আগে বোস এই বিছানায়।' খাটের উপর পাতা বিছানায় তামসী রণধীরকে হাত ধরিয়ে বসিয়ে দিলে।

'বিয়ে করোনি, অথচ অবস্থা এমন ফেরালে কি করে ?'

'বা, আমি চাকরি করছি যে।'

'চাকরি করছ ?' রণধীর চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, বেশ মোটা মাইনের চাকরি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রণধীর। বললে, 'তোমার তাহলে আর কোনো দুঃখ নেই'।

'দুঃখ নেই ? দুঃখের শেষ নেই বলো। এই চাকরি আমি ছেড়ে দেব।'

'ছেড়ে দেবে ?' রণধীর আবার একটা ধাক্কা খেল।

'হ্যাঁ ছেড়ে দেব, সব ছেড়ে দেব। তুমি একটু বোস, আমি আসছি দু' মিনিট।' বলে সরে গিয়ে তামসী ক্ষিপ্র হাতে একেক করে গয়নাগুলো খুলে ফেললে। তুলে রাখলে বাক্সয়।

পাশের ঘরে গিয়ে রেশমী ছেড়ে আটপৌরে মিলের শাড়ি পরলে। হ্যাঁ, সব, সব সে ছেড়ে দিতে পারে এই মুহূর্তে। এই গয়নাগাটি, শাড়িজামা, জিনিসপত্র, বাড়িঘর—যত সব আড়ম্বরের আবর্জনা। ছেড়ে দিতে পারে তার এই সাধের চাকরি। পায়ের তলায় ফেলে গুঁড়ো করে দিতে পারে। নতুন সূর্যের আলোকের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারে রাস্তায়। বেরিয়ে পড়তে পারে রণধীরের হাত ধরে।

তামসীকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। দুঃস্বপ্নের পর আধ-জাগরণের স্নিগ্ধ নিশ্চিন্ততা। বললে রণধীর, 'এমন চাকরি ছাড়বে কেন?'

'বলব, বলব, সব তোমাকে বলব। কিছুই লুকোবনা। কিছুই লুকোবনা তোমার কাছে। কিন্তু কেবল নিজের কথাই বলব—তোমার কথা শুনবনা?'

আমার কথা আর কী শুনবে। একটা চাকরির জন্যে হন্যের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরে বেড়াচ্ছি এক দরজা থেকে আরেক দরজায়। ভাগ্যহতের মত। কেউ আশ্রয় দিচ্ছে না, সম্মান দিচ্ছে না, বিশ্বাস করছে না এক বিন্দু। কারু ধারণা নেই, মহৎ কাজ করেছি, দেখেছি কোনো মহৎ স্বপ্ন। কারু কৃতজ্ঞতা নেই, সহানুভূতি নেই। শুধু ঘৃণা, অনুকম্পা। আমার কথা আর কী শুনবে? তোমার কথা শুনি। তোমাকে দেখি। তুমি কী সুন্দর! তুমি কেমন সুখে আছ!

সুখে আছি? তুমি তো জান জীবন কী ভয়ংকর যখন সমস্তক্ষণ শুধু অপেক্ষা করতে হয় মৃত্যুর জন্যে। জেলে বসে মুক্তির দিন গোনার মত। কোনো বাড়িতে যখন মৃত্যুর আসার সময় আসে, তখন লোকে ঘর-দোর ঠিকঠাক করে, সাজায়-গুছোয়, একটা সৌন্দর্যের পরিবেশ আনে। বিসর্জন দেবে বলেই প্রতিমাকে ডাকের গয়না পরায়। তেমনি আমি আমার ঘর-দোর সাজিয়ে দেহটাকে পর্যন্ত অলংকৃত করে বসে আছি। কতক্ষণে তুমি আসবে। তুমি এলে, যেন আমার কারাকক্ষের দরজা খুলে গেল। যে জীবনকে খানিক আগেও লোভনীয় মনে হয়েছিল, যে চাকরিকে ভাগ্যের মহামূল্য উপহার, এখন একেবারে ধুলো মনে হচ্ছে। সমস্ত সোনা মনে হচ্ছে রাংতা। সমস্ত সাজসজ্জা মনে হচ্ছে ভস্মলেপ।

'এখন তবে করবে কী?'

'তুমি আর আমি—এখন কি আর কাজের শেষ থাকবে, না, কাজ আর শেষ থাকবে?' গম্ভীর সংযত-কঠিন তামসী, যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। একটা পার্বত্য অরণ্য যেন হঠাৎ চকিত পুষ্প হয়ে উঠেছে। 'ছোট ঘর ছেড়ে দুজনে চলে আসব পথে, জীবনকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করে দেখব। চাকরী নয়, কাজ করব, দেশের কাজ।'

'তোমার এখনো ও সব বাতিক আছে দেখছি।' বড় নিস্পৃহ গলায় বললে রণধীর।

'ওই তো একমাত্র জীবনসাধন। শ্রেণীবদল করব আমরা। একেবারে নিচে থেকে

সুরু করব। যাতে ওরা বোঝে আমরা ওদের জ্ঞাতিগোত্র। সুখে দুঃখে সংগ্রামে বিশ্রামে ছুঁতে পারে আমাদের সবল আন্তরিকতা। হাত বাড়িয়ে টেনে তুলব না, হাত ধরাধরি করে সবাই মিলে উঠে আসব উপরে।

রণধীর হাসল মনে-মনে। তামসী এখনো স্বপ্নে ডুবে আছে। বুঝতে পারেনি এখনো মধ্যবিত্ততার ট্র্যাজেডি।

কিন্তু সমস্তক্ষণই কি তামসী গল্প করবে নাকি? রণধীরকে কিছু খেতে দেবেনা? তার জন্যে কিছু রান্না করবে না নিজের হাতে? তুমি এখন চা খাবে, না, একেবারে ভাত খাবে? না, লুচি? ভাত খাব। তুমি নিজের হাতে সামান্য কিছু রান্না করো। কত দিন ভাল কিছু খাইনি। তুমি এখন হাত-মুখ ধোবে, স্নান করবে? কোনো দরকার নেই। আমি এখন একটু শোব তোমার বিছানায়। হাঁটতে-হাঁটতে পা দুটো ক্ষয়ে গেছে। পাব তো শুতে?

রণধীর শুয়ে পড়ল, আর তামসী এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটোছুটি করতে লাগল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল নানান ছোট-বড় কাজে। চাকরকে বাজারে পাঠালে নতুন করে, ঝিকে বললে, হাতা-খুন্তি এখন আমার হাতে দাও। কতক্ষণ রান্না করছে, আবার ভিজে হাত শাড়িতে মুছতে মুছতে চলে আসছে এ-ঘরে। দেখছে, সত্যিই রণধীর শুয়ে আছে কিনা। না, সমস্ত স্বপ্ন হয়ে হারিয়ে গেল এক্ষুনি?

চোখ বুজে পড়ে আছে রণধীর। পর্যুদস্তের মত। কিসের লজ্জা, কিসের পরাভব, যদি সংগ্রামে থাকে সরলতা? যে সত্যিই অকপট, সে কখনো অকৃতকার্য নয়। যতক্ষণ তুমি লিপ্ত আছ তোমার কাজে, ততক্ষণ তুমি অর্থযুক্ত। কাজ বড় কর, তাহলেই আর তফাৎ থাকবেনা এ হার না জিত।

দশটা বেজে গেছে, তবু জ্ঞানাঞ্জনের দেখা নেই। রাতটা গভীর হতে দিচ্ছেন নিজে অবারণীয় হবেন বলে। গায়ে ঠেলা মেরে রণধীরকে জাগাল তামসী। বললে, 'রান্না তৈরি, খাবে চল।'

'খাবো খন। খাওয়ার পরেই তো চলে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'ফুটপাতে।'

'তবে সেখানে আমাকেও নিয়ে যেও। যেখানে তুমি সেখানে আমি। তেমনি যেখানে আমি সেখানেও তুমি। যতক্ষণ এ বাড়িঘর আমার, ততক্ষণ তুমিও এর অধিকারী। যদি আমি পাই শুতে, তোমারো জন্য জায়গা থাকবে। আমার সব কিছুতে তোমার সমান মালিকানা।'

'সত্যি বলছ? রাতে থাকতে পারব এখানে?'

'রাতের পর দিন। দিনের পর দিন। যত দিন না ঠিক সুযোগসুবিধে করে উঠতে পারি দুজনে। একজনে পারলেই দু জনে।'

খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দু জনে আবার গল্পে মেতে উঠল। বলতে-বলতে রণধীর বললে অধিপের কথা। কেমন অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছে। আর সে নিঃস্বতার মধ্যেও তার কী শূন্যগর্ভ অহংকার। মদ খায় আর কবিতা আওড়ায়, অলস কল্পনাকৌতুক করে। সংসারে আর কোনো আশা নেই রণধীরের। বলতে-বলতে তামসী বললে দেবিকার কথা। এখন এক জেলার কলেকটরের পত্নী। একজিবিশন ওপন্ করে, প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন করে সভায়-সভায়। স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে গিয়ে সেও ইনটারভিয়ু দেয়। তবু আশা হারায়নি তামসী।

রণধীর শুয়ে, আর তামসী তার শিয়রে বসা। সিঁড়িতে ভারী পায়ের জুতোর শব্দ হল। বলতে-বলতে আসছেন জ্ঞানাঞ্জন, 'আনাচে-কানাচে সমস্তগুলো বাতি জ্বলছে কেন? কী আজ বাড়িতে?' কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন আনন্দ, তিনি জানেন আজ বাড়ীতে কী।

তামসী রণধীরের আরো কাছে সরে এল, ভয়ের গল্প শুনে শিশু যেমন মার বুকের কাছে সরে আসে। ঘরের মধ্যে ঢুকে জ্ঞানাঞ্জন একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। এ কে?

'এ কে?' প্রশ্নটা জ্ঞানাঞ্জনের গলায় আর্তধ্বনির মত ফেটে পড়ল।

তামসী কথা বললনা। তেমনি ঘেঁসে বসে রইল শিয়রে।

প্রশ্নটার প্রতিধ্বনি ফুটে উঠল রণধীরের মূঢ় দৃষ্টিতে। এ কেন আসে রাত করে, তামসীর একা ঘরে? বুকের ভিতরটা তার কালো হয়ে উঠল জিজ্ঞাসায়।

'অন্য লোকও নিয়ে আসছ দেখি আজকাল। কিন্তু আমার চেয়ে কি বেশি দেবে?' জ্ঞানাঞ্জন অনাবৃত বর্বরতায় প্রকাশ করলেন নিজেকে।

মূঢ় চোখে তেমনি তাকিয়ে আছে রণধীর। যেন এ প্রশ্নটা সে নিজে করছে।

মুখ নিচু করে বসে আছে তামসী। তার দুই চোখ অশ্রুতে আচ্ছন্ন।

'পাপ কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। আজ ঠিক ধরে ফেলেছি।'

এ কথাটাও যেন রণধীরই বলছে। দুই জলধার নেমে এসেছে তামসীর গালের উপর দিয়ে।

'আচ্ছা, আমি দেখে নেব এর কী করতে পারি—'

ক্রুদ্ধ পা ফেলে জ্ঞানাঞ্জন চলে গেলেন। তামসী দুই হাতে আঁকড়ে ধরল রণধীরকে। না, তুমি যেওনা। তুমি কি অন্য লোক?

অন্নের থেকে স্বাদ চলে গেল রণধীরের। ক্ষুধার থেকে চলে গেল ধার।

'তুমি কিছু খাচ্ছ না।' বললে তামসী।

'কে বলে খাচ্ছি না? আমার শুধু ঘুম পাচ্ছে।'

হঠাৎ তাদের দুইয়ের মাঝখানে নেমে এসেছে প্রতিকূল স্তব্ধতা। হয়তো মনে-মনে রণধীর আঁচ করে নিচ্ছে, কি করে তামসীর এত প্রাচুর্য, এত উদ্বৃত্তি! সেই অনুমানের জ্বালাটা দগ্ধ করতে লাগল তামসীকে. এর পর আপাতচোখে লোক আর কী ভাবতে পারে? সমস্ত আফিসের লোক, পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবাই তো এই কথাই ভেবে এসেছে এত দিন। কিন্তু রণধীর তো তাকে ভুল বুঝতে পারে না। যদি সব কথা আদ্যোপান্ত সে খুলে বলে। যদি সমস্ত অবস্থাটা বিশদ করে বুঝতে দেয় তাকে। যদি ঠিকমত তাকাতে পারে সে তার অন্তরের গহনে। যদি হৃদয় এনে রাখতে পারে তার হৃদয়ের উপর।

'তোমাকে সব কথা আমি বলছি ব্যাখ্যা করে, তুমি শোন—' খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানার এক পাশে বসল এসে তামসী।

'আমার কাছে কোনো কিছুর ব্যাখ্যার দরকার নেই, অসি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। অনেক রাত হয়েছে।'

'না, তুমি শোনো।'

'আজ নয়, কাল শুনব। দিন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

কিন্তু আজকের এই রাতটাই বা কম কি। তামসী কুণ্ঠিতের মত বললে, 'কিন্তু—'

'আমার চোখ ঘুমে বুজে আসছে। অনেক হেঁটেছি। আমাকে এখন ঘুমুতে দাও লক্ষ্মী।'

তামসী আর কথা বলল না। তোলাপাট সব সারা হয়েছে দেখে দরজায় খিল দিলে।

রণধীর ঘুমিয়ে আছে খাটের বিছানায়। আর তামসী নিচে। শুয়ে আছে শীতল-পাটির উপর।

অন্ধকার।

অন্ধকারে কান পেতে ভারী, ঘুমন্ত নিশ্বাস শুনছে তামসী। আর তার বুক ভরে উঠছে।

এই ঘুমের মধ্যে কত বিশ্বাস আর সমর্পণ, কত পরিতৃপ্তি। না, সব ঠিকমত বোঝাতে পারবে রণধীরকে। কাল ভোরে যখন সূর্য উঠবে তখন অপসৃত হয়ে যাবে সমস্ত কুজ্ঝটিকা।

একটু তন্দ্রা এসেছিল তামসীর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কই, সেই নিশ্বাস শুনছে না তো! আস্তে-আস্তে উঠে বসল সে। আস্তে-আস্তে, অন্ধকারে, পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল সে খাটের দিকে। না, ঐ তো শুয়ে আছে রণধীর। অবোলা শিশুর মত ঘুমুচ্ছে।

পা টিপে-টিপে হেঁটে এসে আবার সে পাটির উপর শুল। ঘুমিয়ে পড়ল কি তক্ষুনি?

আজ তামসী একেবারে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে বুঝি সে। স্বপ্ন দেখছে, কোন অতল মরকতের সমুদ্রে সে ডুবে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। তার এ ঘুম যেন এ রাত পুইয়ে গেলেও ভাঙবেনা।

ধড়মড় করে উঠে বসল তামসী। না, এখনো ভাল করে ভোর হয়নি। চোখ কচলে তাকাল সে চারদিকে। রণধীর কোথায়? রণধীর নেই। দরজাটা খোলা। তার গয়নার বাক্সটা অন্তর্হিত।

শুধু একটা চিঠি পড়ে আছে মেঝের উপর। তামসীরই নিজের হাতে লেখা। তাড়াতাড়ি নিল সেটা কুড়িয়ে। যে প্রতিষ্ঠান যোগ্যতা অনুসারে কর্মহীন যুবকযুবতীর চাকরি জুটিয়ে দেবে বলে দশটাকা করে চাঁদা নিয়েছিল, তাদের কাছে লেখা তার সেই চিঠি তাড়াতাড়িতে হয়তো পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে। আর সেই চিঠিই তাকে দিয়েছে তার ঠিকানা। (ক্রমশঃ)

আন্তর্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্বের পটভূমিকা

শশধর সিংহ

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় আমূল বদলাইয়া গিয়াছে। কেন এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইহা স্থায়ী হইবে কিনা ইত্যাদি আলোচনা করিলে বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের অনেক তথ্য বোধগম্য হইবে। আর বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে যে রেষারেষি চলিতেছে তাহারও একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্ব যে-আকার ধারণ করিয়াছে তাহার স্বরূপ অতীতের মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলিবেনা। এশিয়ার জাগরণ, সোভিয়েট সম্মিলনের উত্থান, য়ুরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙ্গন প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনাবলীর তুলনা বর্ত্তমান ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ফরাসী বিপ্লবের পর য়ুরোপে ও অন্যত্র যে-সব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা আধুনিক পরিস্থিতির বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইবে। প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত য়ুরোপের রাজনৈতিক প্রাধান্য, সমৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও কৃষ্টির প্রগতি যাই হউক না কেন—এবং এই ব্যাপারে য়ুরোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই—

ইহার প্রত্যক্ষ প্রভাব মোটামুটি পাশ্চাত্য জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা অবশ্য সত্য যে, এশিয়া ও আফ্রিকা পশ্চিমের সংশ্রবে আসিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে নানাদিক দিয়া প্রভাবান্বিত এমন কি লাভবানও হইয়াছে, কিন্তু এই যোগাযোগে প্রাণের স্পর্শ খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়া প্রাচ্যের সমাজ ও সংস্কৃতি কেবল ভাঙ্গিয়াছে মাত্র, নতুন ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে নাই। তাহার কারণ এই যে, পশ্চিমের সভ্যতা এশিয়ায় মানুষের মন জয় করিতে আসে নাই; সাম্রাজ্যবাদের শোষণকারী রূপ নিয়া আসাতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্বন্ধ এমন বিকৃত হইয়াছে।

গত এক শতাব্দী ধরিয়া আন্তর্জাতিক শক্তি-সাম্যের যে-রূপ দেখিতে পাই তাহার কেন্দ্রস্থলে ছিল বৃটেন ও বৃটেনের জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য। পশ্চিম য়ুরোপীয় শক্তিচক্রকে নিজের কাজে লাগাইয়া বৃটেন জগতের balance of power এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল যে, বহুকাল এইভাবে য়ুরোপ ও অন্যত্র শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। ইংরেজের শক্তির উৎস য়ুরোপের বাহিরে থাকাতে য়ুরোপীয় দেশগুলি সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসকবৃন্দের পক্ষে অন্ততঃ বাহ্যিক খানিকটা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা সহজ হইয়াছিল। শক্তি-সাম্য নীতির সাহায্যে ইংলণ্ড য়ুরোপ ভূখণ্ডে এমন প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিয়াছে যে, এ-যাবৎ বিশেষ কোন কন্টিনেণ্টেল শক্তি য়ুরোপের উপর একাধিপত্য করিবার সুযোগ পায় নাই। অর্থাৎ যখনই কোন দেশ য়ুরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছে, তখনই ইংলণ্ড অন্য বিরুদ্ধ শক্তি বা শক্তিচক্রের সহিত যোগ দিয়া য়ুরোপের balance of power আবার ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য বৃটেনের এই য়ুরোপীয় কূটনীতি সব সময়ে সাফল্য লাভ করে নাই। বিশ বছরের মধ্যে দুই দুইবার জার্ম্মেণীর সহিত যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হওয়া ইহার প্রমাণ। আরেকটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে বৃটেনকে য়ুরোপীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত মনে হইয়াছে, কিন্তু আসলে তাহা সত্য নহে। বিশ্বের উপর নিজের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য বৃটেন চিরকাল য়ুরোপীয় শক্তিগুলির সহযোগিতা খুঁজিয়াছে এবং ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বৃটেনের সহযোগে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইয়াছে। য়ুরোপের সহিত এই পারস্পরিক সম্বন্ধ ছাড়া পাশ্চাত্যের শতাব্দীব্যাপী বিশ্বপ্রাধান্য কিছুতেই সম্ভব হইত না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই কিন্তু য়ুরোপীয় শক্তি-সাম্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তখন হইতে সুরু করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা দ্রুতপ্রসার লাভ করিয়াছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকা পৃথিবীর সেরা শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিকে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বৃটেন প্রভৃতি পুঁজিবাদী শক্তিদের টনক নড়িল, কিন্তু

গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে নবগঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্র কিছুকালের জন্য এমন কাহিল হইয়া পড়িল যে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও তাহাদের চক্রান্তের বিরাম হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের প্রচণ্ড প্রয়াসের ফলে সোভিয়েট সম্মিলনের শক্তি ও প্রভাব প্রবল গতিতে বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপীয় শাসকবৃন্দও বিপুল উদ্যমে রুশদেশের ধ্বংশ সাধনে লাগিয়া গেলেন। নাৎসী জার্ম্মেনীর উত্থান ও জার্ম্মেনী, ইতালী ও জাপানের মিতালি এই সোভিয়েট বিরোধী অভিযানের প্রথম পর্য্যায় বলা যাইতে পারে। বিশ্বের শক্তি-সাম্যকে পুনরায় সংগঠন করার চেষ্টা হইল। বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা এই শক্তিত্রয়কে উসকাইল ও ভাবিল যে, রাশিয়ার সহিত ইহাদের সংঘর্ষ ঘটিলে পর পূর্ব্বেকার শক্তি-সাম্য ফিরিয়া আসিবে। বৃটেন য়ুরোপে আবার নিজের মামুলী ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবে, আর এই উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্কট অতিক্রান্ত হইবে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি হইতেই বুঝা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের গোষ্ঠিগত সম্বন্ধ থাকিলেও এবং একসিস্ শক্তিত্রয় রুশবিরোধী হইলেও ফ্যাসিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সংঘাত কখনই লুপ্ত হয় নাই। এই স্বার্থের বিরোধ থাকার দরুণই ১৯৩৯ সালের আন্তর্জাতিক টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যেও সোভিয়েট রাশিয়া জার্ম্মেনীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিয়া রুশবিরোধী ইঙ্গ-ফরাসী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই যুদ্ধ যখন বাঁধিল তখন তাহা গৃহবিবাদেরই রূপ নিল। পরে নাৎসীরা যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করিল, অনেকে ভাবিলেন যে, যুদ্ধের গতি বুঝি আবার ফিরিল। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। ফ্রান্স পরাজিত হইয়াছে। য়ুরোপের অপরাংশ পরোক্ষে ও অপরোক্ষে নাৎসীদের আওতায় আসিয়াছে। পশ্চিমে ইংরেজ তখন একা ও সম্পূর্ণ অসহায়।

রাশিয়া আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জার্ম্মেনী ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা শেষ আপোষের চেষ্টা হইল। কিন্তু আপোষ কেন হইল না তাহা বুঝা খুব কঠিন নয়। প্রথমতঃ ঐ সময়ে আমেরিকার মত ছাড়া বৃটেনের পক্ষে কোন স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করার উপায় ছিলনা। ১৯৪১ সালের মে মাসে রুডলফ হেস্ স্বতন্ত্র সন্ধির প্রস্তাব নিয়া আসার সঙ্গে মার্কিন রাজদূত জন্ ওয়াইনেণ্ট আমেরিকা ফিরিয়া যান। এই দুইটি ঘটনার মধ্যে যে একটা যোগ ছিল তাহা সহজেই চোখে পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ এই পর্ব্বে বৃটেনের ক্ষমতা এত নিম্নস্তরে পৌছিয়াছিল যে, এই অবস্থায় জার্ম্মেনীর সহিত সন্ধি করার অর্থ হইত নাৎসীদের প্রাধান্য মানিয়া লওয়া। সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণের পরেই বৃটেনকে

তাই সোভিয়েটদের সাহায্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। ক্রমে জাপান ও আমেরিকা যুদ্ধে নামিল। তখন হইতে বুদ্ধিমান লোক মাত্রই বুঝিতে পারিলেন যুদ্ধের অন্তিম পরিণতি কি হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রধানতঃ মালমসলার যুদ্ধ (war of *matériel*); যার যত মালমসলা বেশী ও শিল্প বিজ্ঞানের কৌশল যথাযথ ভাবে জানা আছে সেইসব শক্তির যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত একসিস্ শক্তিত্রয় এই বিষয়ে কখনই সমত্ব লাভ করিতে পারে নাই। যে-কারণে ১৯১৮ সালে জার্ম্মেনী হারিয়াছিল এবারও একই কারণে যুদ্ধে পরাজিত হইল।

এই পরাজয়ের ফলে য়ুরোপে ও সুদূর প্রাচ্যে যে শক্তিসাম্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে বাকী রহিয়াছে মাত্র আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন। নানা ভাবে আমেরিকার মুখাপেক্ষী হওয়ায় ব্রিটিশদের পূর্ব্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আর য়ুরোপের যে সমস্ত ছোট বড় শক্তি এতকাল ইংলণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার শক্তি-সাম্য বজায় রাখিয়াছিল তাহারা এমনভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, ব্রিটিশরা এখন আর ইহাদের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না। ফলে সোভিয়েট রাশিয়া এখন য়ুরোপ ভূখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের একা কিছু করার ক্ষমতা নাই। পূর্ব্ব য়ুরোপ হইতে ইংরেজের ক্ষমতা একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। একমাত্র গ্রীসকে হাতে রাখিয়া বৃটেন এখনও ভাবিতেছে ভূমধ্যসাগর হইতে রাশিয়ার প্রভাব দূরে রাখিবে। পশ্চিম য়ুরোপেও একটা দল বা bloc তৈয়ারী করিয়া রাশিয়ার ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিবার প্রয়াসের অন্ত নাই। মধ্য-প্রাচ্যেও সোভিয়েট-ব্রিটিশ দ্বন্দ্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। আরব লীগ গঠনে সাহায্য করিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যের গ্রন্থিকে দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সিরিয়া ও লেবানন্ হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিয়া ব্রিটিশরা মধ্য-প্রাচ্যে কায়েম হইতে চায়। এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক New Statesman এ এক লেখক লিখিয়াছেন:—

"Col. Lawrence's ideal was that Britain should remain sole mistress of the Middle East, friend and protectress of the Arab world. Although this ideal came to grief in Paris and San Remo, in Syria and Palestine, it continued to exercise powerful fascination over the minds of British officials, who at last got their chance in 1941...To build up British power and please the Arabs, the first object of British Policy was to eliminate the French....The tactic for expelling the French was simply to

support and to encourage by every means local nationalist sentiment. Syrian and Lebanese independence was brought about with little attention juridical obligations."

বৃটেনের আরব নীতি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কেন সফল হইতে পারে না তাহার কারণ দর্শাইয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

"In deciding to found their future on a presumably anti-Soviet Arab bloc, British policy appears to us to be founded on sand. The Arab League is of no military account ; its economic resources are small ; it is beset by rivalries ; and there is not the slightest reason to believe that it will remain 'Loyal' to the British Empire."

পারশ্য নিয়াও একই কারণে ইঙ্গ-রুশ সংঘর্ষ চলিতেছে। জাপানের পরাজয়ের পর সুদূরপ্রাচ্যেও শক্তির অসাম্য ঘটিয়াছে। চীনের আভ্যন্তর দৌর্ব্বল্যের হেতু রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার রোধ করিবার প্রয়াস সাফল্য লাভ এইখানে করে নাই। এই এলাকায় মার্কিনরা একাধিপত্য স্থাপন করিবে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে, কিন্তু চীন ও জাপানের সহযোগিতা কতদূর ও কি ভাবে নিলে ইহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে তাহা নিয়া ইয়াঙ্কি নেতাদের মধ্যে এখনও মতদ্বৈধ আছে। স্বর্গীয় অধ্যাপক নিকলাস স্পাইকম্যান বিশ্বাস করিতেন যে, সুদূর প্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব চিরস্থায়ী করিতে হইলে জাপানকে হাতে রাখা দরকার এবং একই কারণে তিনি ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহার মতে য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্রিটিশদের সাহায্য ছাড়া মার্কিন-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুষ্কর। চীন ও রাশিয়াকে সাহায্য করার তিনি বিরোধী ছিলেন, কারণ ইঁহার মতে আমেরিকার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অনুপূরক নহে, বিরোধী। জাপানের সহিত মার্কিনের যুদ্ধোত্তর ব্যবহার আলোচনা করিলেই বুঝা যায় জাপানীদের প্রতি আমেরিকার অভিসন্ধি কি হইতে পারে।

গত মহাযুদ্ধে বিশ্বের ছোট বড় অধিকাংশ শক্তির বিনাশ সাধন বা পঙ্গু হওয়ায় একদিকে যেমন জাগতিক শক্তি-সাম্যের সমস্যা সহজ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ইহার জটিলতাও বাড়িয়াছে। আজ বৃহৎ শক্তির সংখ্যা মাত্র তিনটিতে পরিণত হওয়াতে শান্তির সমস্যা বিশেষভাবে আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেনের উপর নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুরোপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বহুসংখ্যক শক্তি বর্ত্তমান থাকায় যে-কোন বৃহৎশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিন্যাস ও সমবায়ের সৃষ্টি করা সম্ভব হইত। এই পরিস্থিতিতে কূটনীতি অবাধ সুযোগ পাইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক শান্তির ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। যুদ্ধের গুজব ও তোড়জোড়ে আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে,

কিন্তু যে অর্থনৈতিক সমস্যা ইহার মূলে রহিয়াছে তাহার কোন গঠনমূলক সমাধানের চেষ্টা হয় নাই। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পিছনে যে মৌলিক বিরোধ আছে তাহাও এই অনিশ্চয়তার অন্যতম কারণ। সোভিয়েট রাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে বাড়িয়া চলিল অথচ ধনিক পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সমস্যার অন্ত ছিল না। এই দুই সমাজ ব্যবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-পূর্ব্বের দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় কর্ম্মহীনের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া শেষে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই একই পর্ব্বে অন্য সব দেশে কর্ম্মহীনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে। বৃটেনে এই সংখ্যা বাৎসরিক ১০ হইতে ২০ লক্ষের মধ্যে আনাগোনা করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বাৎসরিক কর্ম্মহীনতার সংখ্যা এক সময়ে প্রায় ১৩০ লক্ষে উঠিয়াছিল। নাৎসী জার্ম্মেনীতে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে গিয়া কর্ম্মহীনতা দূরীভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে এই ঘটনাকে স্বাভাবিক প্রগতি বলিলে ভুল করা হইত। যুদ্ধের খাতিরে বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেও কর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব প্রসার ঘটিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঐসব দেশে কর্ম্মহীনের 'কিউ' (queue) দেখা দিয়াছে। গত কয়েক বছর ধরিয়া স্যর উইলিয়াম বেভারিজ প্রভৃতি অর্থনীতিজ্ঞ অনেকেই "full employment" বা পূরা কর্ম্মের সম্ভাবনা সম্বন্ধে লিখিতেছেন বটে, কিন্তু এ যাবৎ ধনিক সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোতে এই সমস্যার কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধান পাওয়া যায় নাই। ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অন্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া এবং শোষণের পরিসর বাড়াইয়া নিজেদের আভ্যন্তর সমস্যার সমাধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ফ্যাসি-সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার সহিত ইহাদের যৌথ বিরোধ যে কালে মহাযুদ্ধের আকার ধারণ করিবে তাহা অনেকেই জানিতেন। কেবল ভুল হইয়াছিল এই ঘটনাবলীর পরম্পরা সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য প্রথম হইতেই রাশিয়ার সহিত জার্ম্মেনীর লড়াই বাঁধিলে, সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত। কিন্তু নানা চেষ্টা সত্ত্বেও এই আশা কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং হয় নাই বলিয়াই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ বর্ত্তমান আকার নিয়াছে।

যুদ্ধকালীন মার্কিন-ব্রিটিশ-রুশ সহযোগিতা যে চিরস্থায়ী হইবে না তাহা আগেই বুঝা গিয়াছিল। এই যোগাযোগকে *mariage de convenance* বা স্বার্থের বিবাহ বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা; স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধন শিথিল হইতে সুরু হইয়াছে। মোট কথা এই যে, আমেরিকা তাহার ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন। মার্কিনরা বিশ্বের উপর সর্দ্দারি করিতে পণ করিয়াছে। ডলার ইম্পিরিয়েলিজম্ এর সহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তফাৎ এই যে, ইহাকে সোজাসুজি ভৌমিক বা territorial সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দেওয়া চলিবে না। আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে দ্বিগুণেরও বেশী বড় এবং ইহার জাতীয়

সীমার মধ্যে কাঁচামালের সম্ভার এত প্রচুর যে, স্বভাবতঃই মার্কিন কূটনীতি ব্রিটিশ কূটনীতি হইতে ভিন্নপথ অনুসরণ করিয়াছে। আমেরিকা চায় অর্থ ও শিল্পের কৌশল দিয়া পরোক্ষভাবে পৃথিবীকে শাসন করিতে।

এই পরোক্ষ indirect নীতির প্রথম ফল দেখা যাইতেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব হইতে। এই ব্যাপারে ইয়াঙ্কি নেতারা দোটানায় পড়িয়াছেন। পুরাতন য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যগুলিকে একেবারে অপরিবর্ত্তিত রাখার বিপদ আছে তাহা ইহারা বেশ উপলব্ধি করেন অথচ সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে উৎপাটন করিতেও ইহারা অনিচ্ছুক। এই পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তির কারণ আর কিছুই নয়, ইহাদের অভিপ্রায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে নিজের প্রভাব বিস্তারের কাজে লাগানো। তাহা না হইলে, ব্রিটিশ ওলন্দাজ ও ফরাসী উপনিবেশগুলিকে পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে আমেরিকার এত উৎসাহ কেন?

আমেরিকার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ওয়ালটার লিপম্যান লিখিয়াছেন :—

"...We shall serve our vital interests by maintaining and perfecting the Atlantic Community. For if the worst that men fear is going to happen, it will be upon the solidarity of Western Europe and the Americas that we shall have to rely, This solidarity is our ultimate insurance." (U. S. War Aims.)

আতলান্তিক গোষ্ঠি বলিতে আমেরিকাকে লইয়া প্রধানতঃ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি বোঝায় এবং ইহাদের নিকট সম্বন্ধ রক্ষা করার অর্থ আর কিছু নয়, ইহাদের সহযোগিতায় আমেরিকার জাগতিক কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করা। সম্প্রতি মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল আমেরিকার বক্তৃতায় ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলিয়াছেন এবং ইহার গরজ যে কেবল ইংরেজের নহে আমেরিকানদেরও তাহা বর্ত্তমান আলোচনাতে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি সুপরিচিত মার্কিন সাংবাদিকের লেখা হইতে কয়েকটি পঙক্তি তুলিয়া দেওয়া গেল :—

"The modernization of such countries and other parts of the Phillipines and East Indies, as well as of India, Burma, China, Thailand, Indo-China and Malaya, is essential to make the world safe for democratic way of life. It is essential to the regeneration of the world market without which capitalism eventually languishes· and either gives way to socialism, or fascism, or war. By planning of growth, and with the help

of Anglo-American capital and technique on a large-scale, the wealth and production of the whole colonial world could be increased five to ten times, in a decade or so and prosperity be assured for a long time to come." (Glory and Bondage.)

মিঃ এডগার স্নো নিজেকে সোসেলিষ্ট বলেন, সেইজন্য তাঁহার কথার গুরুত্ব আরও বেশী। ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগের গতি কোন দিকে বহিতেছে বুঝা কঠিন নয়।

আমেরিকা এতকাল বৃটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আত্মরক্ষার প্রথম ঘাঁটি (first line of defence) হিসাবে দেখিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে কিন্তু এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ উলটাইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও বৃটেন নিজের পূর্ব্ব স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার আশা একেবারে ছাড়ে নাই। মুমূর্ষু য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যগুলিকে বাঁচাইয়া তোলা ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও নতুন আকার দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষের সহিত বোঝাপড়াব চেষ্টাও এই প্রয়াসের অন্যতম নিদর্শন। ওয়ালটার লিপম্যানেব ভাষায় বলিতে গেলে অদ্যকার পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব বৃটেনের ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কটকে আর উপেক্ষা করা চলিবে না।

এখন বাকী রহিল বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট রাশিয়া। শ্রেণীহীন ভিত্তিতে এই যে অভিনব সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে ইহাকে কেহ কেহ এক নূতন সভ্যতা বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন। লেনিনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সোভিয়েটদের প্রধান কাম্য আন্তর্জাতিক শান্তি। নব্য সমাজ গঠনে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা নতুন করিয়া ব্যাখ্যা করার দরকার নাই। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেও সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য রুশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা। যে-অবস্থায় জার্ম্মেণী রাশিয়াকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি রুশ নেতারা কিছুতেই হইতে দিবেননা বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং রাশিয়ার সীমান্তে যে সব দেশ আছে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ছাড়াও এ দেশগুলিতে যাহাতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধপন্থী কোনদল ক্ষমতা না পায় সেইদিকে ইহাদের নজর পড়িয়াছে। ইঙ্গ-রুশ দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছে এই আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়। পূর্ব্বয়ুরোপ হইতে সুরু করিয়া মধ্য-প্রাচ্য পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে ইংরেজ তাহার ক্ষমতার ভিত্তি গাঁড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে তাহার শক্তির মূলে কুঠারাঘাত চলিতেছে। এই স্থলে স্তালিনের একটি সাম্প্রতিক উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"Mr. Churchill affirms that Warrsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, Sofia—all these famous cities and

towns are not only in one way or another under Soviet influence but also subject, to a considerable extent, to increasing control from Moscow......Germans invaded the USSR through Finland, Poland, Rumania, Bulgaria and Hungary. The Germans were able to invade us through these countries because Governments hostile to the Soviet Union existed in these countries".

তারপর মনে রাখিতে হইবে যে সোভিয়েট হতাহতের সংখ্যা বৃটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত হতাহতের সংখ্যার বহুগুণ বেশী ("losses of the Soviet Union exceeded several times the combined losses of Britain and the U. S. A.")। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়া যদি এইসব দেশে তাহার অনুকূল সরকার প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়, তাহা হইলে এই ইচ্ছাকে কোন হিসাবে "boundless expansionist tendencies of the Soviet Union" (Churchill) বলা যাইতে পারে ?

ইংরেজের রুশভীতির কারণ কিয়দংশে ঐতিহাসিক, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইঁহার মূলে দৃষ্টিভঙ্গী বা ideologyর প্রভেদই প্রধান। ইহাও সত্য যে, অনেকে ideologyর তফাৎকে তুচ্ছ মনে করেন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নয়। ধনিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। আর সোভিয়েটদের বেলায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব গত মহাযুদ্ধে চাক্ষুষ প্রমাণিত হইয়াছে। ঐকত্রিক ক্ষেত্রব্যবস্থা ও পরিকল্পিত (planned) শিল্পোন্নতি দ্বারা সোভিয়েট সমাজের গোড়া এমন সুদৃঢ় হইয়াছে যে, নাৎসীদের প্রাণান্ত চেষ্টাতেও রাশিয়াকে ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই।

বিশ্বের শান্তি আজ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরোধ কি ভাবে দূর করা যায় তাহার উপর। কিন্তু আগেই দেখা গিয়াছে যে, এই বিরোধের স্বরূপ এমন যে, ইহাদের স্বার্থের কোন অন্তিম সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। U N O বা সম্মিলিত শক্তিসংঘের ভিতর দিয়া এই দ্বন্দ্ব কিছুকালের জন্য ঠেকাইয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার জগৎকে বিভিন্ন শক্তিচক্রে বিভক্ত করিয়া বৃহৎ শক্তিদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টাও চলিতেছে। এই প্রচেষ্টাকে ইহাদের আত্মরক্ষার দ্বিতীয় পন্থা (second line of defence) বলিলে ভুল হইবে না। কিন্তু এইগুলি ত হইল বাহ্যিক, নঙর্থক ব্যবস্থা। সমস্ত দ্বন্দ্বের মূলে রহিয়াছে পৃথিবীর বর্তমান অসম বিবর্তন (unequal development)। অর্থাৎ যতকাল সাম্রাজ্যবাদ কায়েম আছে, আর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক তারতম্য ইহাদের সম্বন্ধকে বিড়ম্বিত করিতেছে ততদিন এই বিরোধের শেষ নাই। আণবিক বোমা উদ্ভাবন করিয়া আমেরিকা ও বৃটেন ভাবিয়াছিল যে, ইহা দ্বারা একদিকে রাশিয়াকে ঠাণ্ডা রাখা যাইবে, অন্যদিকে অশান্ত এশিয়াকেও দমন করা চলিবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই, হইতেও পারে না। আণবিক বোমা কোন দেশ বিশেষের সম্পত্তি নয় এবং স্বাধীনতার স্পৃহাকে ভয় দেখাইয়া বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। যতদূর দেখা যাইতেছে এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই প্রকার পরিণতি হইতে পারে। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা যদি সময়মত স্বাধীনতার ভিত্তিতে য়ুরোপীয় উপনিবেশগুলির সহিত নূতন যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে আশা করা যায় এখনও এশিয়ায় একটা শান্তিময় পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। ভবিষ্যতের আসল চাবি এখনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। ব্রিটিশ তথা য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা বাড়াইয়া বিশ্বের কর্ত্তৃত্ব করিবার অভিসন্ধি ইয়াঙ্কি নেতারা যদি ছাড়িতে পারেন, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, আমরা শান্তিপর্ব্বে পৌঁছিয়াছি ; এক নব যুগের সূচনা হইয়াছে।

ফলশ্রুতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মার্টিন কোম্পানির রেলের যে এত রহস্য আছে তা কে জানত।

বক্তিয়ারপুর জংশন ছেড়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে সবে গোটা তিনেক ষ্টেশন এগিয়ে এসেছে, এমন সময় ছেঁড়া জিনের কোট পরে টিকেট কালেক্টার দর্শন দিলেন। দুঃসংবাদটা পাওয়া গেল তাঁর মুখেই। যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানালেন, এ গাড়ি তো রাজগীর যাবেনা।

—তার মানে ?—আমরা গাছ থেকে পড়লাম।

ততোধিক মিষ্টি ভাষায় তিনি জানালেন, এই ট্রেন যাবে বিহার শরীফ্ পর্যন্ত।

পাণ্ডুর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে ?

—তা হলে ঘণ্টা চারেক বিহার শরীফে বসে থাকতে হবে। তারপরে রাজগীরের ট্রেন পাবেন।

আশ্বাস দিয়ে ভদ্রলোক প্রস্থান করলেন।

চিন্তায় ম্লান হয়ে আমি আর অনু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। সমস্ত প্ল্যানটাই

গোলমাল হয়ে গেছে। এই গাড়িতে গেলে বেলা চারটের মধ্যে দিনের আলো থাকতে আমরা রাজগীর পৌছুতে পারতাম। বেলাবেলি ধর্মশালা খুঁজে নিতে কষ্ট হতনা—বিকেলটা রাজগীরে কাটিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনে নালান্দা, তারপর দুপুরের গাড়িতে পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন। অর্থাৎ ব্লিৎক্রীগ করে আমরা রাজগীর আর নালান্দা সেরে নিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়ালো সেটা আশাপ্রদ নয়। রাজগীরে আমরা কখনো যাইনি—সেখানে চেনা কোনো লোক আছে বলেও জানিনা। কুণ্ডস্নানের সময় এটা নয়, সুতরাং আকস্মিকভাবে কোনো বাঙালির আতিথ্য যে পাওয়া যাবে এতখানি দৈববাণী হওয়াও শক্ত। এমন একটা বড় সহরও নয় যেখানে হোটেলে অবারিত দ্বার। সুতরাং এই রাত আটটার সময়ে সেখানে যে কী ব্যবস্থা করা যাবে সেটা ভাবতেই অস্বস্তি লাগছিল।

অনুকে বললাম, কী করা যায় ?

পরম নিশ্চিন্তভাবে অনু জবাব দিলে, একটা কিছু হবেই।

—কী হবে ?

—আঃ—তা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ওখানে গেলে নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত হবে। দ্যাখো—কী চমৎকার একটা পাহাড়—কী ছোট্ট! আচ্ছা, পাহাড়ের ওপরে ওটা কী? মন্দির, না ?

সাধে কি পথি-নারী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন! হতাশ হয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। কামরার বিহারী সহযাত্রীরা ততক্ষণে একটা চামড়ার প্রকাণ্ড ঝাঁকড়ী বাজিয়ে হোলির গান জুড়ে দিয়েছে আর ট্রেনের দুপাশে তরঙ্গিত অড়রের ক্ষেত ছিটকে ছিটকে পেছনে সরে যাচ্ছে।

খাঁটি পশ্চিমা প্যাড়া আর পুরীর সঙ্গে বিহার শরীফে চা-পর্বটা মন্দ জমলনা। কিন্তু রাজগীরের ট্রেন যখন ছাড়ল তখন কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা আকাশে তার কালো ডানা মেলে দিয়েছে। দেখতে দেখতে ঘন অন্ধকারে বিহারের মাঠ-ঘাট তলিয়ে গেল আর অন্ধকারের মতোই অনিশ্চিত একটা সংশয়ে আমার মনটা পীড়িত হতে লাগল।

আমি খানিকটা ঘরকুনো আর শান্তিপ্রিয় জীব। বাইরের পৃথিবীতে ছুটে বেরোবার সখ আছে, কিন্তু সাহস নেই। অনিশ্চয় অ্যাড্‌ভেঞ্চার সব সময়ে আমাকে রোমাঞ্চিত করে তোলেনা বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্বিগ্ন করে। একা হলে ভাবনা ছিলনা, কিন্তু রাত আটটার সময় সস্ত্রীক কোথায় আশ্রয় হাতড়ে বেড়াব সেইটেই প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা হয়ে

উঠেছিল। পাটনাতেই শুনেছি রাজগীরের ধর্মশালা বাঙালির প্রতি খুব অনুকূল নয়, আরো বিশেষ করে এই অসময়ে—

কিন্তু অনুকে কিছু বলা বৃথা। কালো অন্ধকারের দিকে বিভোর চোখ মেলে সে বোধ করি কবিতার খাদ্য খুঁজছিল। গদ্যময় স্বামীর জীবনে কবি স্ত্রীর মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর কী হতে পারে।

আমার দুর্ভাবনাকে উপেক্ষা করেই ট্রেন পরমোৎসাহে ছুটতে লাগল। মার্টিনের গাড়ির চাকায় যেন মেলট্রেনের ছন্দ মিলেছে। একটার পর একটা ষ্টেশন পেছনে সরে যেতে লাগল, তারপর নক্ষত্র আর ছায়াপথের আলোয় আভাসিত দিগন্তে মাথা তুলে দাঁড়ালো জরাসন্ধের পুরী, বিম্বিসারের রাজধানী, ভগবান তথাগতের চরণ-ধন্য পঞ্চগিরির শিখরমালা— গিরিব্রজপুরী রাজগৃহ। তীব্র হুইসিলের শব্দ করে ট্রেন একটা বাঁক ঘুরল।

অনুকে বললাম, রাজগীর তো এল।

ছেলেমানুষের মতো অনু খুসি হয়ে উঠল: ভালোই হয়েছে। ট্রেন থেকে নেমেই আমরা উষ্ণধারায় স্নান করে আসব। চমৎকার হবে—তাই না?

—চমৎকার তো হবে। কিন্তু তার আগে রাত্রের একটা আস্তানা—

অ্যাটাচির ডালাটা আট্‌কাতে আট্‌কাতে পরমোল্লাসে অনু বললে, কিছু না হয় ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকব।

মুখে যা এসেছিল ভাষায় তা প্রকাশ করা গেলনা। দাম্পত্য-কলহের কাব্য-মাধুরী যাই থাক, বাস্তব জীবনে ওটা আমি বরদাস্ত করতে পারিনা। সুতরাং নীরবে হোল্ড্ অল জড়াতে লেগে গেলাম।

আবার একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে দূরে দূরে কতগুলো আলো। আস্তে আস্তে মার্টিনের রেল গতি সংযত করতে লাগল। দেখা দিলে একটুকরো ষ্টেশন। রাজগীর।

অথ অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

ডাকাডাকি করেও কুলির সাক্ষাৎ মিললনা—দুচারজন যারা আছে তারা অন্যদিকে ভিড় জমিয়েছে। অ্যাটাচি আর বিছানাটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। মাথার ভেতরে দুশ্চিন্তার যেন জোয়ার চলেছে। আগে একটু দম নেওয়া যাক। তারপর ধীরে-সুস্থে ষ্টেশন মাষ্টারের সৌজন্যের কাছে আবেদন জানানো যাবে। তিনি যদি কৃপা পরবশ হয়ে একটা রাত্রির ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাদের চির-বাধিত করে রাখেন—

কিন্তু অদৃষ্টবাদী হওয়া কপালে নিতান্তই লেখা ছিল সেদিন। হঠাৎ আমাদের

একেবারে পাশেই পরিষ্কার নারীকণ্ঠে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় শোনা গেল : না, মা এ গাড়িতেও তো আসেনি।

মনে হল যেন দৈববাণী শুনলাম !

ষ্টেশনের এদিকটায় আলো নেই। শূন্য ইন্টার ক্লাশটার পাশে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একটা লণ্ঠনের আলো আমাদের চকিত করে তুলল। তাকিয়ে দেখি ছোট একটা হ্যারিকেন হাতে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি তরুণী, অপরটি প্রৌঢ়া।

—আপনারা কোথায় যাবেন ! প্রশ্নটা আমাদের প্রতি।

এবার জবাব দিলে অমু। বললে, ঠিক নেই।

—ঠিক নেই !—তরুণী মেয়েটির গলায় বিস্ময় প্রকাশ পেল : কোত্থেকে আসছেন আপনারা ?

—পাটনা।

—পাটনাতেই থাকেন ?

—না, কলকাতায়।

মেয়েটি হাসল : রাজগীরে কখনো আসেননি বুঝি ?

—না। একটা রাত থাকবার মতো ধর্মশালা কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?

হাতের লণ্ঠনটি তুলে ধরে মেয়েটি বেশ মন দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগল। তারপরে হঠাৎ হেসে উঠল সকৌতুকে। বললে, একটা রাত থাকবার জন্যে ধর্মশালা তো ? চলুন।

কথাটা বলেই মেয়েটি বাঁ হাতে অ্যাটাচিটা তুলে নিলে। বললে, চলুন।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম : আহা হা, করছেন কী। ওটা আমাকে—

শাসনের ভঙ্গিতে মেয়েটি আল্‌গা একটু ধমক দিলে। বললে, থাক থাক, আর ভদ্রতা করতে হবেনা। আপনি পুরুষ মানুষ, এই বিছানাটা নিন, তাহলেই হবে।

—একটা কুলি ডাকলে হত না ?

—কী যে বলেন !—ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মতো এক ঝলক স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার দৃষ্টি মেয়েটি আমার মুখের ওপরে ছড়িয়ে দিলে : দু পা তো যেতে হবে, এর জন্যে আবার কুলিকে পয়সা দেবেন নাকি। না পারেন বিছানাটাও আমিই নিয়ে নিচ্ছি।

সর্বনাশ—এ কী রকম মেয়ে ! সন্ত্রস্ত হয়ে আমি বিছানাটাকে ঘাড়ে তুলে নিলাম। আর লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম অমুর চোখে সন্দেহ আর অপ্রীতির একটা কুটিল ছায়াভাস নেমে এসেছে।

আবার তাড়া এল : কই, চলুন। সারারাত দাঁড়িয়ে প্ল্যাট্ফর্মেরই হাওয়া খাবেন মনে করেছেন নাকি ?

লণ্ঠন হাতে আগে আগে চলতে সুরু করলে মেয়েটি, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা তাকে অনুসরন করতে লাগলাম। অপরিচিত দেশের অন্ধকার রহস্যে ঘেরা পাহাড়ের ভেতর থেকেই যেন এই রহস্যময়ী মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে। কী একটা অপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতায় সে মুহূর্তে আমাদের বশীভূত করে ফেলেছে কে জানে, কিন্তু তার ইচ্ছার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যেন আমরা অচেতন অজ্ঞান সত্তার মতো এগিয়ে চলেছি। যেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি নেশার মতো আমার স্নায়ুর ওপরে ক্রিয়া করছিল। আমার পাশে পাশে চলছিল অনু। সে কী ভাবছিল জানি না, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই টের পেলাম তার ছোট হাতখানা আমার হাতের ভেতরে আশ্রয় খুঁজছে—ভয় পেয়েছে সে। আমাদের পেছনে পেছনে আসছে সেই প্রৌঢ়াটি, আগে কোনো কথা বলেনি, এখনো না—যেন স্তব্ধ একটা ছায়ামূর্তির মতো নিষ্প্রাণ।

কিন্তু এ আমরা চলেছি কোথায় ? প্ল্যাট্ফর্মের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে রেললাইন পেরুলাম। তারপরে দেখা দিলে হাঁটু প্রমাণ বুনো আগাছার ঝোপ, এলোমেলো পাথরের টুকরো। এ তো পথ নয়। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা বিদ্যুৎশিখার মতো চমক দিয়ে গেল, স্বপ্ন উড়ে গেল হাওয়ায়। থেমে দাঁড়িয়ে আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম : কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো ?

মেয়েটি কিন্তু ফিরেও তাকালো না। সহজ প্রসন্ন সুরে বললে, ভয় পাচ্ছেন বুঝি ? কলকাতার মানুষ তো, এক মুঠো ঝোপ দেখলেই গণ্ডার আর গরিলার কথা ভাবতে বসেন। কিন্তু ভয় নেই, এসে পড়েছি—ওই দেখুন।—আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে তিন চারটে আলো ভৌতিক চোখের মতো মিট মিট করছে।

কথার সূত্র ধরে বলে চলল, সোজা রাস্তায় এলাম কিনা। ঘুর-পথ হলে অনেকটা দূর পড়ত।

কথার ভঙ্গিটা বিস্ময়কর। অমার্জিত নয়, সহজ একটা শিক্ষা আর বুদ্ধির প্রতিধ্বনি তার ভেতরে শুনতে পাওয়া গেল। শুধু অনুভব করলাম আমার হাতের ভেতরে অনুর মুঠিটা ক্রমশ কঠিন আর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে আর পেছনে পেছনে তেম্‌নি আসছে নির্বাক সেই প্রৌঢ়া মহিলার ছায়ামূর্তিটা।

যেখানে এসে পথ শেষ হল, সেটা কিন্তু ধর্মশালা নয়।

একখানা ছোট একতলা বাড়ি। ইটের দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। মেয়েটী

চাবি দিয়ে ঘর খুলে ফেললে। তারপর অনুর দিকে ফিরে স্মিতমুখে বললে, একটা রাত তো ? ধর্মশালার চাইতে এখানে বেশি কষ্ট হবেনা।

—কিন্তু আপনিই বা কেন এভাবে মিছিমিছি কষ্ট করতে গেলেন ? একটা ধর্মশালা দেখিয়ে দিলেই--

—পাগল হয়েছেন ! এই রাত করে অচেনা অজানা জায়গায় কোথায় গিয়ে উঠবেন আর চোরে সব লোপাট করে নেবে। আমাদের এ ঘরটা তো একেবারেই খালি, একটা রাত ঘুমুতে কোনো কষ্ট হবেনা।

ঘরখানা শুধু খালিই নয়। পরিষ্কার আর ঝকঝকে। মেঝেতে কোনো তক্তপোষ নেই, বোঝা গেল মাটিতে শোয়াই এদের অভ্যাস। দেওয়ালের একদিকে একখানা কালীঘাটের পট, আর একপাশে দড়ির ওপড়ে কতগুলো শাড়ী। সামনে একটা মস্ত খোলা জানলা, তাতে শিক নেই। তার অবারিত ব্যাপ্তির ভেতর দিয়ে পাহাড়ের স্নিগ্ধ বাতাস হু হু করে ঘরের ভেতরে বয়ে আসছে।

আমি আর অনু শুধু পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

পাশের ঘর থেকে এতক্ষণে প্রৌঢ়ার আওরাজ পাওয়া গেল : নিরু, জল চাপিয়েছি।

বোঝা গেল মেয়েটির নাম নিরু। নিরু বললে, তা হলে আপনারা হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। তারপরে কুণ্ডে স্নান করে আসবেন।

—এত রাত্রে কুণ্ডে স্নান !

—বাঃ, রাত্রেই তো ভালো। এখন গরম পড়ে গেছে না ? দিনে কি আর কুণ্ডের জল ছোঁয়া যায় আজকাল !

নিন, নিন, হাত মুখ ধুয়ে নিন। বারান্দাতেই জল আছে। কই বৌদি, কাপড়-চোপড় বদলাবেন না ? চলুন, ও ঘরে চলুন।

বৌদি ! অনুর মুখের ওপর থেকে অস্বস্তির ছায়াটা সরে এল একটুখানি, এমন কি এক ঝলক হাসিও দেখা দিলে। বললে, চলুন।

কয়েক মিনিট পরেই টের পেলাম ষ্টোভের শাঁ শাঁ শব্দ ছাপিয়ে ওঘর থেকে হাসি আর গল্পের কলগুঞ্জন উঠছে। মেয়েরা কত সহজে যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে পারে, আশ্চর্য !

আধঘণ্টার মধ্যে পাঁপড় সহযোগে চা চলে এল। নিয়ে এল নিরুই। বললে, দাদা, এখন আর বেশি কিছু খেতে দেবনা। রান্না হয়ে যাবে একটু পরেই। চা টা শেষ করে চলুন, কুণ্ড থেকে স্নান করে আসা যাবে।

চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে এইবার আমি পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে

তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন বেহালার একটা তার ছিঁড়ে গেল ঝনাৎ করে—সুর কেটে গেল। আধো আলো আধো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিলনা, একখানা ছাপা শাড়ী আর শ্যামবর্ণ দুখানি বাহুর ছন্দে যাকে আশ্চর্য স্বপ্নসঞ্চারিণী বলে মনে হচ্ছিল, বন্ধনহীন অলস কল্পনা যাকে নিয়ে ইচ্ছে মতো মূর্তি রচনা করে চলেছিল, সে এই ! মেয়েটি সুন্দরী নয়—বরং কুৎসিতের সীমানা বেঁধেই চলেছে। রং ময়লা ; মুখখানা অসম্ভব লম্বা, হাসলে খানিকটা বিবর্ণ মাড়ি বেরিয়ে পড়ে অসঙ্গতভাবে। যৌবনের লাবণ্য স্বাভাবিক ভাবে যতটুকু আলো ছড়িয়েছে, কোনোখানে তার বেশি এতটুকুও চোখে পড়ল না। শুধু প্রসন্ন উজ্জ্বলতায় বুদ্ধি-মার্জিত দৃষ্টিটা তার জ্বলজ্বল করছিল।

আমার মুখের ওপর চিন্তার অভিব্যক্তিটা কতখানি ফুটে উঠেছিল জানি না। কিন্তু নিরু হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বলে গেল, বৌদি স্নানের জন্যে তৈরী, আপনাকে পাঁচ মিনিটের নোটীশ দিয়েছেন।

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত সাড়ে নটা। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, একটু শুয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি। এত রাত্রে স্নান-পুণ্য অর্জন করবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তা ছাড়া কাল অন্ধকার থাকতে নালান্দার ট্রেন ধরতে হবে, একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নেওয়াও দরকার।

কিন্তু আমার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা এখন বড় কথা নয়। কালো হোক, কুৎসিৎ হোক—তবু এই মেয়েটিই যেন আমার চিন্তা-চেষ্টা-চেতনার ওপরে একটা বিচিত্র প্রহেলিকার জাল বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে। নিজের ইচ্ছায় এখানে আসিনি—নিজের ইচ্ছায় এখানে কিছু করাও যাবেনা। কে এই মেয়েটি জানি না, কী তার পরিচয় তাও জানি না, শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যেন আমি সম্মোহিত হয়ে গেছি। মন আর প্রশ্ন করতে চায়না, একটা নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভেতরে সব মেনে নিতে চায়, সব স্বীকার করে নিতে চায়।

বসে বসে যে ভাবব, তারও কি জো আছে বেশিক্ষণ ! আবার নিরুর প্রবেশ।

—কই, তৈরী হয়ে নিলেন না ? আপনারা সাহিত্যিকেরা বড্ড কুঁড়ে মানুষ কিন্তু।

—সাহিত্যিক ! কী করে জানলেন ?

—বাঃ, বৌদির কাছে শুনলামনা ? নিন, উঠুন এখন। এক রাতের জন্যে এসেছেন বলেই এমন চমৎকার উষ্ণ ধারায় স্নান করবেননা, এ হতেই পারেনা।

নিরুত্তরে উঠে পড়লাম।

তিনজনে চলেছি স্নান করতে। চারদিকে তরল তমসার পরিব্যক্তি—দূরে কাছে পাহাড়ের শ্রেণী ধ্যানস্তিমিত হয়ে আছে বিস্মৃত ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় স্বাক্ষর বহন করে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন এক একটা বাড়ি থেকে এক এক টুকরো আলোর ঝলক পড়ছে চোখে।

রাশি রাশি উদ্দাম বাতাসে স্নিগ্ধ শীতের আমেজ। পায়ের তলায় মসৃণ পীচের পথ অগ্রসর হয়ে গেছে কুণ্ড পর্যন্ত।

অন্ধকারের ভেতরেও আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটি বলতে লাগল : এদিকের নিচু পাহাড়ের গায়ে যে ভাঙা পাথরের প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন, এটা মহারাজ বিম্বিসারের দুর্গ-প্রাকার। দূরে ঐ যে অন্ধকার পাহাড়, বুদ্ধদেবের উপদেশ সংগ্রহ করবার জন্যে ওখানে শ্রমণদের মস্তবড় একটা সভা বসেছিল--

আলোয় মেয়েটির যে মুখখানা দেখেছিলাম, অন্ধকারে আর তা দেখতে পাচ্ছিনা। শিক্ষায় রুচিতে এবং স্বাভাবিকতায় এমন পরিপূর্ণ কে এই মেয়েটি ? কে আশা করেছিল অজ্ঞাত অনাত্মীয় বিদেশে এমন একটি স্বজনের সঙ্গে এইরকম আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে ? কে এই নিরু—এবং কী এ ?

পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম কুণ্ডে। বাঁধানো উঠোনে অশ্রান্ত প্রবাহে পঞ্চধারার জল আছড়ে পড়ছে। এত রাত্রে স্নাতক বেশি নেই, শুধু মর্মরশুভ্র কতগুলি ভাস্করমূর্তির মতো দু তিনটি তিব্বতী মেয়ে সর্বাঙ্গ খুলে ধারায় স্নান করছে। আমরাও ধারার জলে প্রথম পুণ্য সঞ্চয় করে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম ব্রহ্মকুণ্ডে।

মাথার ওপরে শুধু বড় একটা আলো জ্বলছে, তার নীচে টলমল করছে কুণ্ডের উত্তপ্ত নীলজল। জলে নামতেই তাপে শরীরটা শিউরে উঠল, তারপর যখন কুণ্ডের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসলাম, মনে হল এমন চমৎকার ভালো লাগার অনুভূতি আমার জীবনে আর কখনো আসেনি।

অনু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বাঃ, কী ভালো লাগছে !

মাথার ওপরকার আলোতে নিরুর চোখদুটো কি একমুহূর্তের জন্যে চকচক করে উঠল ? না, আমার দেখবার ভুল ? নিরু বললে, শুধু ভালো লাগা নয়। এর জলে স্নান করলে সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে যায় জানেন তো ? শরীরের ব্যাধি নয়, মনেরও।

অনু বললে, তাই বুঝি আপনি এখানে নিয়মিত স্নান করেন ?

—করি বইকি। মনের ব্যাধির কি আর অন্ত আছে ! আমরা তো আপনাদের মতো ভালো লোক নই।

অনু হেসে বললে, আমরাও ভালো লোক নই।

নিরু এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইল। তারপর বিষণ্ণভাবে হাসলে, বললে, উঠুন, রাত হয়ে গেছে।

অন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে আবার আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু নিরু এবার আর

বেশি কথা বললে না, কেমন চিন্তিত আর অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। শুধু চলার তালে তালে তার ভিজে শাড়ীটা ছলাৎ ছলাৎ করে বাজতে লাগল।

বাড়িতে ফিরে দেখা গেল, নিরুর মা এর মধ্যেই আমাদের জন্যে চমৎকার মুগের ডালের খিচুড়ি আর দু তিনটে ভাজার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সমস্ত দিন ক্লান্তির পর কুণ্ডের স্নান যেন পেটে ক্ষিদের একেবারে ধূ ধূ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কী অসম্ভব তৃপ্তির সঙ্গে যে খেলাম তা বলবার নয়।

ঘুমের শরীর একেবারে অচেতন হয়ে এসেছে। টলতে টলতে বিছানায় এসে পড়লাম। বাইরে থেকে পাহাড়ের হাওয়া যেন গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কোথায় গেল অপরিচিত জায়গার একটা আশ্চর্য রহস্য, কোথায় রইল নিরু, তন্দ্রার অতলে আমি তলিয়ে গেলাম। অনু যে কখন পাশে এসে শুয়েছে টেরও পাইনি।

পরদিন ঘুম ভাঙল নিরুর ডাকে।

বাইরে তখনো রাত্রি পুঞ্জিত হয়ে আছে। জানালার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস। নিরু বললে, আপনাদের ট্রেনের কিন্তু আর দেরী নেই। আমার চায়ের জল ফুটে গেছে।

তটস্থ হয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

নিরু বললে, রাতারাতি এলেন, অন্ধকার থাকতেই চলে যাচ্ছেন। রাজগীর একবার দেখে নিতেও পারলেন না। একটা দিন থেকে গেলেই তো পারেন।

—অসম্ভব। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। আজ রাত্রেই দিল্লী এক্সপ্রেসে আমাদের কলকাতা ফিরতে হবে।

—আবার আসবেন তো?

—আসব বই কি। আশা করি, আপনার আতিথ্যই পাওয়া যাবে।

—বড়লোককে আতিথ্য দেওয়াই কি আমার পেশা?—নিরুর গলার স্বর আকস্মিকভাবে অত্যন্ত রূঢ় ঠেকল: কামনা করবেন আমার সঙ্গে যেন আপনাদের আর কখনো দেখা না হয়। পরক্ষণেই সে দ্রুতবেগে বেড়িয়ে গেল। আমি সবিস্ময়ে বললাম, ব্যাপার কী?

মেঘের মতো মুখ করে অনু জবাব দিলে, জানিনা।

—কাল তো খুব গল্প করলে দুজনে।

—ছাই—যেন একটা ধমক দিয়েই অনু মাঝপথে কথাটাকে থামিয়ে দিলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা নিয়ে এল নিরু। তার সঙ্গে লুচি, হালুয়া। কত রাতে উঠে সে আমাদের জন্যে বসে বসে খাবার তৈরী করেছে কে জানে।

আশ্চর্য, নিরু বদলে গিয়েছে এর মধ্যেই। তেমনি প্রসন্ন স্নেহভরে হাসল। বললে,

চা ঠাণ্ডা করবেন না বৌদি। পেট ভরে যা পারেন এই খেয়ে নিন, সারাদিন যে আর বিশেষ কিছু জুটবে তাতো মনে হয়না। আর এদিকে আজকাল কলেরা স্থরু হচ্ছে, বাজারের পুরীটুরী কিছু খাবেন না কিন্তু।

চা খাওয়া নীরবেই শেষ হল। কারো মুখে কোনো কথা জোগাচ্ছেনা। নিরু বললে, ষ্টেশনের পথ তো চেনেন না, চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি।

—আপনার মার সঙ্গে একবার দেখা করে—

—কিচ্ছু দরকার নেই। ঘুমুচ্ছেন।

ট্রেন যখন ছাড়ল তখন রাজগীরের পাহাড়ের ওপর প্রথম ভোরের আভাস দেখা দিয়েছে। সূর্য ওঠেনি, শুধু নিঃসঙ্গ রাত্রির তমসা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা নিরুর মূর্তিটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল—রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ-দেখা রহস্যময়ী রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

আমি আর অনু দুজনেই চুপ করে বসে ছিলাম। পেছনে পঞ্চগিরি ক্রমশ দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল—অড়োর ক্ষেতের ওপর এসে পড়ছিল সকালের সোনার আলো। নিরুর কথাই ভাবছিলাম। কে এই মেয়েটি—কী এ? নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেনি, শুধু আমাদের সব কথাগুলোই শুনে গেছে। অযাচিত ভাবে আশ্রয় দিয়েছে, যত্ন করেছে, অথচ নিজের সম্বন্ধে এতটুকুও দাবী নেই, তাকে যে কেউ মনে রাখবে তাও সে চায়না। আসবার সময় তাই একটি কৃতজ্ঞতার কথা পর্যন্ত মনে আসেনি, একটা ধন্যবাদ জানাতে পারিনি পর্যন্ত।

বাস্তবিক—অদ্ভুত রহস্য একটা। যেন একটা রাত স্বপ্ন দেখলাম। তিমিরাবগুণ্ঠিত রাজগীরের সঙ্গে সঙ্গেই নিরুও তিমিরেই নিহিত হয়ে রইল, তার আভাস পেলাম, কিন্তু চিনতে পারলামনা।

অনু কী ভাবছিল, কে জানে। ওর চোখদুটো জ্বলছে, যেন হিংস্র একটা বিদ্বেষে জ্বলছে। হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফেরালো। বললে, কী ভাবছ?

—ভাবছিলাম—

—বুঝতে পেরেছি।—অনু থামিয়ে দিলে আমাকে: তা ছাড়া আর ভাববে কী! আর একটা দিন রাখতে পারলেই বেশ ফাঁদে ফেলতে পারত।

—তার মানে?—আহত পশুর মতো আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

—মানে?—বিকৃত মুখে অনু বললে, মানে কী বোঝোনা? বিয়ে হয়েছে বললে, অথচ কপালে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই কেন? ওর মা—সেই বিচ্ছিরি বুড়িটা রাত্তিরে কপকপ করে কতগুলো খিচুড়ি গিললে, কোনো বিধবা রাত্তিরে অমন করে খায় কখনো?

তা ছাড়া অজানা অচেনা লোককে ষ্টেশন থেকে ডেকে আনে, বাড়িতে আশ্রয় দেয়, অথচ কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই—বুঝতে পারছনা ?

বুঝতে পারছি বই কি। সত্যিই তো—এসব কথা কেন এতক্ষণ আমার মনে হয়নি ! চকিতে সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। মনের ভেতর যে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্তূপাকার হয়ে জমে উঠেছিল, তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতেও এক মুহূর্ত সময় লাগলনা।

আমি সাগ্রহে বললাম, নিশ্চয়ই তাই। কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে হলে অমন পারে কখনো ? নিশ্চয়ই একটা—এমন কুশ্রী মন্তব্য দিয়ে কথাটা শেষ করলাম যা আমার মতো ভদ্রলোকের পক্ষেই স্বাভাবিক।

আমার ভদ্রতার বিচারে ভদ্রলোকের মেয়ে নিশ্চয়ই নয় নিরু। আর সেইখানেই সমস্ত রহস্যের সমাপ্তি, কৃতজ্ঞতার অবসান। বরং বহু ভাগ্য যে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারেনি।

একটা পরম নিশ্চিন্ততা ও সুগভীর আরামে মনটা ভরে গেল। সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে আরাম করে সিগারেট ধরালাম।

ততক্ষণে উজ্জ্বল সূর্যালোকে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেছে—দিগন্তে মিলিয়ে গেছে পঞ্চগিরির পাণ্ডুর আভাস আর নিশীথের স্বপ্ন বিলাস॥

দাম

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দলিলপত্র থেকে মুখ তুলে তাকালেন অশ্বিনীবাবু। সমালোচকের সেই কূট, শাণিত দৃষ্টি আর নেই—ক্ষমায়, দয়ায়, দাক্ষিণ্যে প্রশান্ত হয়ে গেছে চোখ।

"আমি কি করতে পারি, বলো—" নবাগতটির কাছে অশ্বিনীবাবু যেন আত্মসমর্পণ করলেন।

"আপনি ত আমাদের প্রোগ্রাম জানেনই—" স্যাণ্ডেলের উপর থেকে পা'জামার ধারগুলো একটু উপরে টেনে নিয়ে শক্ত হয়ে বসবার ভঙ্গী করলে নবাগত : "কংগ্রেস এখন জেলে, কংগ্রেসের কাজ—মানে দেশরক্ষা এখন আমাদের হাতেই তুলে নিতে হবে—"

নবাগতর পরেকার কথাগুলো মনে মনে আঁচ করে অশ্বিনীবাবু উৎফুল্ল হলেন কিন্তু

মনকে মুখের উপর চিহ্নিত হতে না দেবার কৌশল তাঁর মতো যশস্বী উকীলের জানা আছে—অন্যমনস্কতায় তাঁকে গম্ভীর দেখাল একটু।

নবাগত কয়েক সেকেণ্ড থেমে নিলে—জনসভায়, কলেজে, স্কুলে, চায়ের দোকানে বক্তৃতা দেবার অভিজ্ঞতা তার আছে—তাই তারও জানা আছে বক্তব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার জন্যে শ্রোতাকে ক'সেকেণ্ড সময় দিতে হয়।

তারপর আবার বলতে সুরু করলে নবাগত: "ফ্যাসিস্টদের হাতে ত আর আমরা দেশকে তুলে দিতে পারিনে—জনগণকে সে-কথা বুঝিয়ে এখন শান্ত করতে হ'বে—আর তৈরী করে তুলতে হবে তাদের ফ্যাসিষ্টদের রুখবার জন্যে।"

"আমাকে কি করতে হবে—কি করতে বলো আমায়?"

"আপনাকে আমদের মধ্যে চাই—"

"বাদী-বিবাদী রুখতেই ত আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত—ফ্যাসিষ্ট রুখব কখন?" পরিহাসের মিহি হাসিতে অশ্বিনীবাবু একটু তরল হয়ে উঠলেন।

"আপনার সহানুভূতি চাই আমরা—সেটুকুই যথেষ্ট। আপনি যে ফ্যাশি-বিরোধী সেটুকু জানলেই আমাদের চলে।"

আবারও অশ্বিনীবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন—কোনো কথা সাফ-কবুল করবার অভ্যাস তাঁর নেই, কাজেই চুপ করে যেতে হল। নবাগতও এবার আশ্চর্য্যভাবে আবেদনের কোমলতায় ঘোলাটে করে আনলে তার চোখ আর গলা—কথাগুলো জিভে হোঁচট খেতে সুরু করল: "আমাদের সঙ্ঘে—মানে আমরা সহরে-পল্লীতে একটা সঙ্ঘ গড়ে তুলতে চাই—সেই সঙ্ঘে—ফ্যাসিবিরোধী সঙ্ঘে আপনাকে সভাপতি হ'তে হবে।"

"আমি!" বিস্ময়ে অশ্বিনীবাবুর যেন ধ্যান ভেঙে গেল। এই অতি-প্রত্যাশিত কথাটিতে বিস্মিত হবার কথা নয় বলেই তিনি বিস্মিত দেখালেন: "আমি তোমাদের কতোটুকু উপকারে আসব? বয়েস হয়ে গেছে—মক্কেলরা সে-কথা শোনে না বলে কি তোমরাও শুনবেনা?"

নবাগত আব্দেরে হয়ে উঠল: "পাব্লিক অ্যাকৃটিভিটি থেকে মুক্তি চাইলেই কি আপনি মুক্তি পাবেন?"

"সেই ত মুস্কিল। বয়েসের কথা ওরা কানে তুলতে চায়না। একুশসনের সেই শরীরত এখন নেই—কিন্তু একুশসনের মনটা যে মরেনি কি করে যেন পাব্লিক তা টের পেয়ে গেছে—সেই হয়েছে মুস্কিল—" হাসিতে একটু অসংযত হয়ে পড়লেন অশ্বিনীবাবু।

"একটা মীটিং আপনাকে এড্রেস্ করতে হবে—পরশু।"

"পরশু?" অশ্বিনীবাবু চারদিকের দেয়ালে একটা নিস্পৃহতার দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন।

তারপর আর্টিক্‌ল্ ক্লার্ককে ডেকে বললেনঃ ‘পরশু কোর্ট থেকে ক'টায় ছুটি পাচ্ছি বল্‌তে পারো, রত্নেশ্বর ?”

অনাবশ্যক দ্রুততায় রত্নেশ্বর ডায়েরীর পাতা উল্টে চলল। 

“ছুটি পেলে যাব তোমাদের মীটিং-এ। কিছু বলতে পারব কিনা জানিনে—বারো বছরের অনভ্যাস—আইন-অমান্য আন্দোলনে ছিলে ত তোমরা কেউ-কেউ ?” একটু থেমে নিয়ে বললেন অশ্বিনীবাবুঃ “তোমাদের কাগজপত্র দিয়ে যেয়ো রত্নেশ্বরের কাছে !” তারপর মক্কেলের কাগজপত্রে মন দিলেন।

নবাগত সানন্দে উঠে দাঁড়াল। রত্নেশ্বর ঠোঁটের উপর কথা নিয়ে অপেক্ষা করছিল—অশ্বিনীবাবুকে চুপ করে যেতে দেখে তার ঠোঁট নড়ে উঠলঃ “তিনটের পর আর কাজ নেই পরশু—ফিফ্‌টিন্ ইলেভ্‌ন্ ফোর্টি টু।”

অশ্বিনীবাবুর একটি মৃদু হুংকার শোনা গেল। আধা-মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এল নবাগত।

আইন অমান্য আন্দোলনের দিনগুলো !—এখনও মনে পড়লে পেছনদিকে তাকিয়ে স্নেহময় দৃষ্টিতে অশ্বিনীবাবু যেন অতীতটা লেহন করতে থাকেন। যেন অজস্র সঞ্চিত বিত্তের কতগুলো সিন্দুক সাজানো রয়েছে—তার ঝলমলানিতে ঝল্‌মল করে উঠছে অশ্বিনীবাবুর জীবন। এ পুঁজির তুলনা নেই—কৃতজ্ঞচিত্তে অশ্বিনীবাবু দেশের কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করেন। তিনমাস মাত্র জেলে ছিলেন তিনি, মুক্তির পর অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন নিজের ওকালতি প্রতিভা—কোন যাদুবলে যে নিজেকে নূতন করে চিনতে হল নিজেই তিনি তা বলতে পারবেন না। মক্কেলের ভীড়ে তিলার্দ্ধ জায়গা নেই তাঁর বৈঠকখানায়। সরকারের আইনকে অমান্য করতে জানেন যিনি আইনকে বাতিল করবার আশায় বিবাদীর দল তাঁরইত শরণ নেবে ! মক্কেলের ভীড়ে লগ কেবিন ভেঙে হোয়াইট হাউস তৈরী হল—একতলা থেকে দোতলা, বাংলাদেশের মফঃস্বল সহরের স্কাইস্ক্রেপার। মক্কেলের ভীড়ে একছেলে বিলেত গেল—অষ্টিন হ'ল একটা ! কৃতজ্ঞ দেশকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন না অশ্বিনীবাবু ? শুধু কি তাই, দু'হাত ভরে দেশ কি তাঁকে অর্থই দিয়েছে শুধু ? অর্থের উপরেও কিছু দিয়েছে, দিয়েছে মান। দেশের অকুণ্ঠ সম্মতি কুড়িয়ে শাসন-পরিষদে আসনও করে নিয়েছেন অশ্বিনীবাবু।

কিন্তু এ পাওয়ার হিসেব কষে কি অশ্বিনীবাবু ত্রিশসনে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে এগিয়ে গিয়েছিলেন ? এখন ঠিক মনে পড়ছে না তাঁর। যতদূর মনে পড়ে, মনে হয়েছিল তাঁর, গান্ধীজির ডাণ্ডি-যাত্রায় আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব প্রেরণা এনেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণে—

জনসমুদ্রের সেই আশ্চর্য জোয়ারের দিকে তাকিয়ে মথিত হয়ে উঠছিলনা কি তাঁরও হৃদয়? 'আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো'—সহস্র প্রাণের এই নীরব নিবেদন এসে স্পর্শ করেছিল অশ্বিনীবাবুর মন। শোভাযাত্রার সামনে গিয়ে তাই দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে।

"যদি মারধোর হয়?" স্ত্রী বলেছিলেন।

"উপায় নেই—মার খেতে হ'বে—" পাথরের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছিল অশ্বিনীবাবুর।

"শরীর তোমার ভালো যাচ্ছেনা কদিন থেকে—"

"আলাদা আলোহাওয়ায় ভালো হয়ে যাবে।"

"জেল যদি বেশিদিনের হয়—অনিমেষের পড়াশুনো কি করে হবে?"

"একবছর না-হয় না-ই হ'ল।"

"এবার ও কলেজে যাচ্ছে—"

"কলেজ ত একবছরে ফুরিয়ে যাচ্ছে না!"

সহিষ্ণু মুখ নিয়ে স্ত্রী চুপ করে গেছেন। সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারেন নি অশ্বিনীবাবু—গান্ধীজির ডাণ্ডি-যাত্রার দুঃসাহসিক মূর্ত্তি কল্পনা করেও মহৎ ভাব দিয়ে মনের ছোটখাট সুখদুঃখগুলোকে তিনি মুছে দিতে পারছিলেন না। অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক যন্ত্রণা—তারপর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই পরিচ্ছন্ন হয়ে এলো মন—আর সময় নেই, সকাল আটটায় শোভাযাত্রা।

শোভাযাত্রার সামনে অশ্বিনীবাবুর নির্ভিক, হাস্যোজ্জ্বল মুখ—হয়ত অনেকদিন স্মরণ রেখেছে সহরের লোক তাঁর সেই দীপশিখার মতো মূর্ত্তি। নিজের এই শুভ্র রূপান্তর নিজের মনেই যেন ছবির মতো দেখতে পাচ্ছিলেন অশ্বিনীবাবু—পায়ে লেগেছে যেন তাঁর অশান্ত হাওয়ার ছোঁওয়া—ললাটে যেন লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য হাতের জয়টিকা। গর্ব্বের মৃদু উত্তাপে একটু প্রসারিত কি হয়ে ওঠেনি তাঁর বুক? হাজার হাজার দর্শনপিপাসুর উৎসুক চোখ থেকে কি তাঁর ভবিষ্যতের পথে আলো ঠিক্‌রে পড়েনি? মুহূর্ত্তের জন্যে হলেও হয়ত মনে হয়েছে তাঁর, ভবিষ্যৎ আর অনিশ্চিত নয়।

কিন্তু একসময় কতো অনিশ্চিতই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ—কতো অন্ধকার, সেই একুশ সনে। মফঃস্বল সহরে জুনিয়র উকীল—যুদ্ধোত্তর অর্থসঙ্কট—ভবিষ্যৎ বলে কি কিছু দেখা যেত তখন? সেই অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করে তুলেছিলেন অশ্বিনীবাবু—চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে আদালত বয়কট করে অনাহারে অনিদ্রায় গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—চরকার সূতোর

পাকে-পাকে দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচন হবে, অগাধ বিশ্বাসে বলেছেন সবাইকে এ-কথা—তারপর আবার একদিন ফিরে এসেছেন বার-লাইব্রেরীতে। ফিরে এসেছেন মক্কেলের পথের দিকে চেয়ে থাকতে—পরিবারের অনাহারে দুশ্চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে।

সরকারী উকীল মেঘলা মুখ থেকে হয়ত সময়ে-অসময়ে ঠাট্টার বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিয়েছেন: "কি অশ্বিনী, ত্রিশঙ্কুর মতো তোমাদের স্বাধীনতা-দেবী কোথায় ঝুলে রইলেন হদিশ পেলে কিছু—?"

"যুদ্ধে হারজিত ত আছেই স্যর, আমরা হেরে গেছি।" সঙ্কোচের ম্লান হাসিতে করুণ হয়ে উঠেছিল অশ্বিনীবাবুর মুখ।

"তোমরা ওকে যুদ্ধ বলো, কি জানি!"

"অহিংস যুদ্ধ—"

"দুর্ব্বল যারা তারা অহিংস হতে পারে, যুদ্ধ করতে পারে না—" রায়সাহেবী কেতায় থেমে থেমে উঁচু হাসি হেসে সরকারী উকীল অশ্বিনীবাবুর সঙ্গ ত্যাগ করেছেন।

অশ্বিনীবাবু ভেবেছেন—নিঃসঙ্গ বৈঠকখানায় বসে অনেকদিন ভেবেছেন তিনি, সত্যি কি স্বাধীনতা কথাটার কোনো মানে নেই—ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হবেনা কোনোদিন? কিন্তু এ-প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাননি তিনি—স্বাধীনতা হবেনা এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ে মনকে ধুয়ে মুছে ব্যবসাতে মনোযোগী হতে পারেন নি কোনো রকমেই। ওকালতি তাঁকে করতে হয়েছে, মুসাবিদা লিখত হয়েছে, সওয়ালজবাবে দাঁড়াতে হয়েছে, ছুটতে হয়েছে কমিশনে কিন্তু সবসময়েই একটা বিরাট অন্যমনস্কতা যেন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ছায়ার মতো। যা তিনি করেছেন তা যেন ঠিক নয় কিন্তু কি যে তাঁর করা উচিত তা-ও তাঁর জানা নেই। বুঝতে পারছিলেন শুধু কি রকম একটা অস্থিরতা যেন শিরায় শিরায় থিঁতিয়ে আছে, মাঝে-মাঝে তা উপরে উঠে ঘোলাটে করে দেয় রক্ত।

আটবছর কেটে গেছে এই দুঃসহ যন্ত্রণায়, দ্বিধায় আর দ্বন্দ্বে, অভাবে আর নিরাশায়। মনে-মনে জেনে নিয়েছিলেন তিনি ভবিষ্যৎ বলে কিছু আর তাঁর নেই—বর্ত্তমানেই শুধু বেঁচে যাওয়া, প্রাণপণে বেঁচে যাওয়া। বাঁচার প্রেরণাই তাঁকে আইন-বইএ ডুবিয়ে দিলে—সমগ্র মেধাকে তিনি একাগ্র করে তুলতে চাইলেন মক্কেলের মঙ্গল কামনায়। কিন্তু এ-নিষ্ঠার দাম হাতে হাতে তুলে দিতে চায়না ব্যবসায়িক জগৎ। দেয় অতি সামান্য—সেই সামান্যকে অসামান্যের পর্য্যায়ে তুলে আনা যাবে কি কোনোদিন? ভাবতেন অশ্বিনীবাবু।

সেই ভাবনায় ছেদ পড়ল তাঁর ১৯৩০-এর ১২ই এপ্রিল।

সচ্ছলতাকে অসামান্যের পর্য্যায়ে তুল্‌তে পেরেছেন অশ্বিনীবাবু কিন্তু তা ভাগ্যের হাতের দান পেয়ে নয়—স্বাধীনতার সেবা করে—১৯৩০-এর পর হঠাৎ একদিন তাঁর মগজের ওজন বেড়ে যায়নি, সমাজের কাছে বেড়ে গিয়েছিল তাঁর দাম—পরিচ্ছন্ন চোখ নিয়ে তাকালে অশ্বিনীবাবু তা-ই দেখতে পান। অনেকদিন অন্ধকার-বাসের পর একটা আলোর জগত, দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন তিনি এ-জগতকে। হয়ত এরই নাম স্বাধীনতা, এই সম্মান আর সচ্ছলতার নিশ্বাস হয়ত স্বাধীনতারই স্পর্শময়—এমন একটা অনুভূতিও তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল। 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান'—সেই বন্যায় নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন।

যাদের দিকে তিনি মন দিতে পারেন নি এতোদিন—তাঁর পরিবার—স্ত্রীছেলেমেয়ে, তাদেরই এবার ব্যাকুল আগ্রহে কুড়িয়ে নিল তাঁর মন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি দরকার, কাচা বাড়িতে আর চলে না, পাকাপাড়ি চাই—আর চাই চাকরঠাকুর। দরকার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ভালো ব্যবস্থা করা—কলেজে ভালো করতে পারলে অনিমেষ বিলেত যাবে, মেয়েদের গ্র্যাজুয়েট করে তুল্‌তে পারলে সুপাত্রের ভাবনা চুকে যায়--অনিমেষ বিলেতের পড়া শেষ করলেও ধ্রুবেশের বিলেত যাবার সময় হবে না।

একটি একটি করে রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে অশ্বিনীবাবুর পরিকল্পনা। খুসীর ঔজ্জ্বল্যে একটু একটু করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ। চমৎকার—নিজের সৃষ্টিতে অশ্বিনীবাবু নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছেন। সৃষ্টির পথে কোনো বাধা নেই, এক মুহূর্ত্তের উদ্বেগ নেই—যা তিনি চেয়েছেন সবই ঠিক তেম্নি হয়ে উঠ্‌ছে। নিরানন্দের ছোট একটু মেঘ উড়তে সুরু করেছিল শুধু ছোট মেয়ের বিয়ের বেলায়।

"ছোট খুকীর বেলায় তুমি যেন আবার প্রফেসর ধরে নিয়ে এসোনা—" স্ত্রী বলেছিলেন।

"বড় খুকীর কি অভাব যাচ্ছে খুব?" অশ্বিনীবাবুর মুখের পিতৃত্ব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

"মাইনে আর কতই বা পায় ও—ওদিয়ে খুকীর চল্‌বে কি করে—"

"ওকে মাসে-মাসে কিছু হাতখরচার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছ ত?"

"ও কি নিতে চায়—যে অভিমানী মেয়ে!"

অশ্বিনীবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। অবাক হলেন ভেবে, একটি শিক্ষিত ছেলে তার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে পারেনা কেন! অনটনের স্মৃতি আর তাঁর মনে বেঁচে নেই, এমন কি অনটনকেই যেন তিনি ভুলে গেছেন।

"মুকুল বলে যে ছেলেটির খবর এসেছে ওর সঙ্গেই আলাপ কর ছোটখুকীর।" স্ত্রী তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেন।

"মুকুল ?—বি-সি-এস্ পাশ করেছে যে ছেলেটি—"

"চিঠিপত্রগুলো দেখ্‌ছিলাম—ও ছেলেটিই ভালো—"

চোখ বুঁজে কপালে আঙুল বুলোতে সুরু করলেন অশ্বিনীবাবু—তারপর চোখ বোঁজা রেখেই বল্‌লেন : "আচ্ছা—"

নিজের অনেকখানি তিনি দেশকে দিয়েছেন, তার পুরস্কার মিলেছে বলে ত আর সেই দেওয়াটা মিথ্যে হয়ে যায়নি—আরো কি দাবী আছে দেশের তার উপর—দাবী আছে কি ছেলেমেয়েরও উপর ? ভেবেছিলেন অশ্বিনীবাবু। ভেবে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন যে দাবী নেই। মুকুলের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেছে ছোটখুকীর। বিলেত থেকে ফিরে এসেছে অনিমেষ একটা বিলিতি এঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মে চাকরি নিয়ে।

পরিকল্পনা শেষ হ'তে চলেছে কিন্তু তিনি ডুবে যাচ্ছেন ওকালতিতে। এ-ব্যবসাতে যে আজকালও এতো থ্রিল আছে অশ্বিনীবাবুকে না দেখ্‌লে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। মফস্বল থেকে ডাক আসে তাঁর—লোফালুফি লেগে যায় মক্কেলদের মধ্যে, বাধ্য হয়ে তিনি নিলেমে ওঠেন—কার কতটুকু টাকার জোর আছে দেখে নাও। পরিকল্পনার শেষে কার জন্যে এ-পরিশ্রম করছেন তিনি ?—কার জন্যে তা-ও ভেবে দেখেন না আর।

মাঝে-মাঝে ক্লান্তি আসে—বিশ্রাম চায় হাত-পা আর মাথা। বিশ্রাম নিলে ক্ষতি কি—ধ্রুবেশের পড়ার জন্যে নূতন করে রোজগার না করলেও তাঁর চলে। টাকার দরকার নেই আর, একথাও মনে হয় অশ্বিনীবাবুর। কিন্তু অযাচিত টাকা এসে পৌঁছয় তাঁর হাতে—তাঁর সামান্য একটু পরিশ্রমের জন্যে অসামান্য টাকা। তাকে উপেক্ষা করা যায়না—অশ্বিনীবাবু উপেক্ষা করেন না।

জীবন এতো সহজ—এম্নি অনাবিল, বয়েসও তাঁর শরীরে গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। মনে-মনে হেসেও উঠেছেন এককে সময় অশ্বিনীবাবু, দেশকে এতো কম দিয়ে এতো বেশি তিনি কি করে পেলেন ! কতো অদ্ভুত ত্যাগ করেছে কতো অখ্যাত মানুষ—কতো দুঃখ, কতো ব্যথা সহ্য করছে আজও কতো লোক, কি তারা পেয়েছে—অর্থ, মান, তৃপ্তি হয়ত কিছুই নয়। সেদিক থেকে নিশ্চয়ই তিনি ভাগ্যবান—ভাগ্য তাঁকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে সম্পদে-সুখে দু'হাত ভরিয়ে দিয়েছে।

দেশের চেহারা ক্রমেই ম্লান হয়ে গেছে অশ্বিনীবাবুর চোখে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাগ্যদেবীর মূর্ত্তি। দেবীভক্ত অশ্বিনীবাবুর হৃদয় থেকে দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ আঁচড়টিও মুছে গেছে ধীরে ধীরে। মনে মনে তিনি তর্ক করেছেন, দেশই যদি দিতে

পারত কিছু তাহলে অসহযোগ আর আইনঅমান্য আন্দোলনের প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবকের জীবন কেন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠ্‌লনা? ভাগ্যদেবীকে পরিহাস করে সুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের যে-অধ্যায় সে-অধ্যায়ের শেষে, বারো বছর পর, তাঁর জীবনে ভাগ্যদেবী স্বমহিমায় আবির্ভূত হলেন।

এক যুগ পরে গান্ধীজির ডাক এলো আবার। অশ্বিনীবাবু অটল থেকে গেলেন; ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিলের কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি তুল্‌তে লাগ্‌ল তাঁর মন। ত্রিশঙ্কুর মতোই শূন্যে ঝুলে থাক্‌বে স্বাধীনতা—মাটিতে নেমে আস্‌বে না।

সত্যি, মাটিতে নেমে এলনা স্বাধীনতা। মনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়াতে একটু উৎফুল্লই হলেন অশ্বিনীবাবু—অভিজ্ঞ মনকে তারিফও করলেন একটু। অনর্থক এই লক্ষ লক্ষ লোকের কারাবাস!

সেদিন মীটিং-এ একথাই বলে এসেছেন অশ্বিনীবাবু—জেলে গিয়ে লাভ নেই—তার বদলে ভাগ্যদেবীর আরাধনা করতে অবশ্য পরামর্শ দেননি, বলেছেন শক্তিশালী হয়ে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। ছেলেরা তাঁর মুখে একথাই শুনতে চেয়েছিল, তিনি বলেছেন। এ-ছেলেরাই হয়ত দেশের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকেই তিনি সম্মান দেখালেন। এ-যুদ্ধে পৃথিবীতে কি উলোটপালোট হবে কে জানে—কংগ্রেসের নেতারা বাঁচবেন কি না তা-ও বা কে বল্‌বে—বেঁচে থাক্‌লেও তাঁদের হাত থেকে নেতৃত্ব চলে আস্‌বে হয়ত এদেরই হাতে। এরা তাঁকে চায়, নিজের ক্ষতি না করে যদি এদের চাওয়া মেটানো যায়, মন্দ কি?

মীটিং থেকে ফিরে এসে ধ্রুবেশ ছেলেমানষি করেছিল বাবার সঙ্গে: "ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে তুমি সবাইকে লড়াই করতে বল্‌লে কেন, বাবা—ফ্যাসিষ্টরা কোথায়?"

অশ্বিনীবাবু স্নেহাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন ছেলের দিকে—কিছু বলেন নি।

"তুমি ত দেশের জন্যে লড়াই করেছিলে, না?" ধ্রুবেশ আবারও জিজ্ঞেস করেছে।

"ওটাও দেশের জন্যেই লড়াই।"

"দেশের জন্যে লড়াই করে ত গান্ধীজি-ওঁরা জেলে গেছেন—"

"হুঁ"—অশ্বিনীবাবু চুপ করে গেলেন। তারপর চোখ বুঁজে গম্ভীর করে তুল্‌লেন মুখ। ধ্রুবেশ চলে গেল। সে-ও গম্ভীর হয়ে থাক্‌তে জানে—মাত্র সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে তবু আব্দারে অনেকদূর হাত বাড়ায় না।

চোখ বুঁজেই ভেবেছিলেন সেদিন অশ্বিনীবাবু, ধ্রুবেশ দেশের কথা ভাব্‌তে শিখ্‌ছে।

একটু গর্ব্ব কি অনুভব করেন নি অশ্বিনীবাবু—ধ্রুবেশ যে দেশের কথা ভাবতে শিখেছে ? ধ্রুবেশের মতো আরো হাজার হাজার ছেলে এখন দেশকে বুঝ্‌তে চায়, জান্‌তে চায়। তাদের এই ইচ্ছার উৎস কোথায়—অশ্বিনীবাবুদের মতো প্রথম অভিযাত্রীর দেশাত্মবোধে নয় কি ? অন্ধকারে প্রথম তাঁরাইত তুলে ধরেছিলেন আলোক-বর্ত্তিকা—এখন দলে দলে লোক মশাল হাতে এগিয়ে আস্‌ছে ! ধ্রুবেশের মন পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে অশ্বিনীবাবু নিজের কাছে নিজেকেই মহার্ঘ করে তোলেন।

ধ্রুবেশের চিঠিতেই জেনেছেন অশ্বিনীবাবু কলকাতায় আবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিচ্ছে। ফাস্ট ইয়ারের ছেলে, তার চিঠিগুলো কি অদ্ভুত—বারবার পড়তে ইচ্ছা করে। কিন্তু বারবার পড়েন না অশ্বিনীবাবু—একটা ভয়, ভয়ের একটা হাল্কা মেঘ বিষণ্ণ করে তোলে তাঁর মুখ। ১৯২১-এর যে নদী ১৯৪২-এর মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলেছে বলে তিনি ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন এবার দেখা দেবে নূতন নির্ঝর—তা যেন সবই কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। কংগ্রেসের নেতারা কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন আবার, আবার স্বাধীনতার সেই পুরোনো ধ্বনি, সেই পুরোনো উদ্দীপনা ! এ-আবহাওয়ায় নিজের জন্যে কোনো ঠাঁই যেন খুঁজে পাচ্ছেন না অশ্বিনীবাবু—এ-হাওয়া তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডকে ভরে তুল্‌তে পারছেনা, শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। অশ্বিনীবাবু নিজেকে আবার আইনের বই-এ ডুবিয়ে ফেল্‌লেন—মক্কেলের প্রতি যৌবনোচিত উৎসাহ ফিরে এল তাঁর—দলিল-মুসাবিদা, সওয়াল-জবাবের আলাদা জগতে আবার আশ্রয় নিলেন তিনি।

কিন্তু ধ্রুবেশের চিঠি এলেই সেই আলাদা জগতের আলাদা আবহাওয়ায় একটু পুরোনো গন্ধ এসে যেন মিশে যায়—তাঁর স্নায়ুগুলো কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে অবসন্নতায়।

"এখানকার কলেজে নিয়ে এলে হয়না ধ্রুবকে, কল্‌কাতার হুজুকে কি পড়্‌শুনা হবে ওর ?" অশ্বিনীবাবু স্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান।

"কল্‌কাতার কলেজে না পড়লে ছেলেরা বোকা-বোকা হয়ে যায়—" ঘৃণার একটি সূক্ষ্ম রেখা ফুটে ওঠে স্ত্রীর মুখে !

"তা সত্যি—" সত্য নয় এ-কথা বলবার উপায় ছিলনা অশ্বিনীবাবুর, স্ত্রীর তৃপ্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।

কিন্তু এই আত্মসমর্পণে নিজের তৃপ্তির কণ্ঠরোধ করা হল। ধ্রুবেশের চিঠি পাথরের স্তরের মতো বিষণ্ণতার স্তর জমিয়ে তুল্‌ল অশ্বিনীবাবুর মনে। বাইরের জগতে আসুক স্বাধীনতার জোয়ার, জাতীয়তার প্লাবন—তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি ছিলনা, তিনি ত' সে-জগত থেকে বিদায় নিয়েই এসেছেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের সঙ্গে যে সে-জগতের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা

যাবেনা—সে-সম্বন্ধ যে এমন নিবিড় ভাবে গড়ে উঠ্‌বে সে-কথা কি অশ্বিনীবাবু ভাবতে পেরেছিলেন কোনদিন ? ধ্রুবেশ অনেকদূর উঠে যাচ্ছে—তিনি যতোটা চাননি ততোদূর ! কল্‌কাতা থেকে ধ্রুবকে চোখের পাহারায় নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু এ-আশঙ্কা স্ত্রীর কাছে খোলাখুলি বল্‌তে পারেন না তিনি, তাতে হয়ত স্ত্রীর চোখে তিনি অনেকখানি ছোট হয়ে যাবেন। স্ত্রীর তৃপ্তির জন্যে আত্মসমর্পন করা যায়, কিন্তু আত্মসমর্পন করে স্ত্রীর অতৃপ্তি সৃষ্টি করা যায়না।

৪৫-এর নভেম্বর কাঁপিয়ে তুল্‌ল অশ্বিনীবাবুর বুক—অন্ধকার দেশকে আলো দেখাবার শান্ত দীপশিখা উজ্জ্বলন্ত মশালে রূপান্তরিত হয়ে গেছে—আগ্নেয় আকাশের দিকে ভীতসন্ত্রস্ত চোখে তাকালেন তিনি। আর নয়—ধ্রুবকে আর কলকাতায় রাখা যায়না, অশ্বিনীবাবু অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু এবার আর স্ত্রী নয়—ধ্রুবেশই অসম্মতি জানালে আস্‌তে।

ধ্রুব আস্‌তে চায় নি ! আশঙ্কাহীন উত্তরাধিকার বলে মনে করেছিলেন অশ্বিনীবাবু একে একদিন—গর্ব্বও অনুভব করেছিলেন !

চোখের সামনে পঁচিশটি বছর আলো-অন্ধকারের রঙ মেখে ছবি হয়ে জেগে উঠ্‌ল। তারপর সে-ছবি মিলিয়ে গেল ৪৬-এর ফেব্রুয়ারীর একটি রাত্রির বাস্তব অন্ধকারে। সেই অন্ধকারের দিকেই অশ্বনীবাবু অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ—কি বল্‌বেন তিনি রত্নেশ্বরকে, কি আর জানবার আছে ? রত্নেশ্বরের হাতের ওই হল্‌দে কাগজটুকুতেই ত' লেখা আছে সব। তবু আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি : "হাসপাতালে নিয়ে গেছে ওকে, গুলি লেগেছে কি ?"

টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে কতক্ষণ যে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে রত্নেশ্বর বল্‌তে পারবেনা—অশ্বিনীবাবুর কথায় চমকে উঠে বল্‌লে সে : "আজই যেতে বল্‌ছে আপনাকে—"

আবার অন্ধকারে ডুবে গেলেন অশ্বিনীবাবু। আলোছায়ায় আবার একটা ছবি ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ক্ষেপে উঠেছে মহানগরের রুদ্ধ আত্মা—হাজার কণ্ঠের ক্ষিপ্ত শাণিত চীৎকার—লক্ষ লক্ষ পায়ে ঝড়ের গতি, আইন-অমান্য আন্দোলনে তাঁর পায়ে বুঝি তেমন গতি ছিলনা, ছিলনা তাঁর মুখ উদ্দীপনায় এমন উল্লসিত ! সেই বিরাট জনসমুদ্রে দেখ্‌তে পাচ্ছেন তিনি ধ্রুবকে—১৯২১-এর বিশীর্ণ, ক্ষীণ ধারা ত' মরুপথে হারিয়ে যায়নি, চলেছে সে সাগর সঙ্গমে, উচ্ছ্বসিত নিনাদে, বিপুল বেগের আকুল আবেগে ! যে-ধ্রুবেশকে তিনি নিরাপদ নীড়ে বেঁধে রাখ্‌তে চেয়েছিলেন এ যেন সে-ধ্রুবেশ নয়—অশ্বিনীবাবু চিন্‌তে পারছেন না একে—

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, অগ্র্যৎসারী চোখ, এ-ধ্রুবেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। মৃত্যু এর পদ-গোলক, ভয়ের ভৃত্য নয় জীবন। ...তারপর একটু আওয়াজ, বারুদের গন্ধ খানিকটা—রাস্তার পীচের উপর রক্তের দাগ—ধ্রুবের দেহ পড়ে আছে রাস্তায়! তারপর কারা এসে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালে। হষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টেলিগ্রাম লিখছেন, লিখ্‌ছেন ষ্টার্ট ইমিডিয়েটলি! তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন অশ্বিনীবাবু।

রত্নেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেন—রত্নেশ্বর মুখ তুল্‌তে পারছেনা। এই মুহূর্ত্তে কি করতে পারেন তিনি—একটু পরেই হয়ত এই হল্‌দে কাগজটা হাতে নিয়ে স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—কিন্তু এই মুহূর্ত্তে চেয়ারে বসে রত্নেশ্বরকে সামনে রেখে কি করা যায়? অশ্বিনীবাবু চোখ বুঁজলেন। গুলি লেগেছে—কোথায়? মাথায়, বুকে? সত্যি কি বাঁচবে না ধ্রুব—তার মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা হ'বে? আজই হচ্ছে কি শোভাযাত্রা? কতোবড় সে-শোভাযাত্রা—অনেক লোক, অনেক রকম চীৎকার! তার মৃত্যুর দাম মিটিয়ে দিচ্ছে দেশ। যতটুকু দেওয়া যায় দিচ্ছে। দেশ ত অশ্বিনীবাবুকেও দিয়েছিল অনেকখানি—কিন্তু পেয়েছিল কতোটুকু? কতোটুকু দিয়েছিলেন তিনি দেশকে? খুবই কম—খুবই সামান্য।

খুবই সামান্য?—ধ্রুবের জীবন কি খুবই সামান্য? —অশ্বিনীবাবু হু-হু করে কেঁদে উঠ্‌লেন।

সাময়িক সাহিত্য

সন্দীপন পাঠশালা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা ; মূল্য সাড়ে তিন টাকা)। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : শ্রীসুকুমার সেন ; বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন ; প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : শ্রীমনোমোহন ঘোষ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত আট আনা সিরিজের পুস্তিকা—প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

সন্দীপন পাঠশালা একটি অভিনব বই। অভিনব এই জন্যে নয় যে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে অপ্রত্যাশিত অথবা অভাবিতপূর্ব কোনো বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন। অভিনব এইজন্যে যে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের একটি সাধারণ পাঠশালার ততোধিক সাধারণ একজন পণ্ডিতমশায়ের জীবন-কাহিনী এর আগে আর কেউ এমন দরদ দিয়ে এমন নিষ্ঠায় উপন্যাসের আকারে লিখে যান নি। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশায়' বইটিতে এম্নিতরো একজন গ্রাম্য পণ্ডিতের কাহিনী আছে বটে, কিন্তু সেখানে পড়ুয়াদের নিয়ে বৃন্দাবন পণ্ডিতের পাঠশালা জমানোর ইতিহাসটা মুখ্য নয় ; বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের চিরাচরিত বিষয়বস্তুটিই সেখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা' একটি গ্রাম্য পাঠশালার সত্যিকারের ইতিহাস এবং যে মাষ্টারটির অপরিমেয় চেষ্টায় ও যত্নে, ধৈর্যে ও দুঃখসহনে একটি পাঠশালা নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে এমনভাবে গ'ড়ে উঠলো তাঁরই জীবনের ইতিবৃত্ত।

আজকাল প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সুখদুঃখ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা সংবাদপত্রে হচ্ছে দেখতে পাই। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সংগঠন থেকে বিধিবদ্ধভাবে তাঁদের দাবীদাওয়া, অভাব অভিযোগ উচ্চতন কর্তৃপক্ষের নজরে আন্‌বারও ব্যবস্থা হয়েছে। এই সেদিন বোম্বাই-এর বিয়াল্লিশ হাজার প্রাইমারী শিক্ষক তাঁদের প্রতি অব্যবস্থা, ঔদাসীন্য ও অবিচারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছেন এইরূপ সংবাদও কাগজে বেরিয়েছে। সমস্ত ভারতব্যাপী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একই অবস্থা। বাংলা দেশের সমস্যার সঙ্গেই আমরা সমধিক পরিচিত এবং সেই সমস্যা কর্তৃপক্ষের অপব্যবস্থায় ও জনসাধারণের ঔদাসীন্যে এক বিশেষ জটিল আকার ধারণ করেছে। বাংলা সরকার থেকে অবশ্য পল্লীঅঞ্চলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের আংশিক চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু সমস্যার মূল সেখানে নয়। সমস্ত বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যাদানের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, শিক্ষাসৌধের ভিত্তিগাত্র যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে পায়, যাঁরা বলতে গেলে একটা ভবিষ্যৎ জাতির স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, তাঁদের প্রতি সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষের

অবহেলা-অনাদরটাই সব চাইতে মর্মান্তিক। সমাজে প্রাইমারী শিক্ষকের কোনো মর্যাদা নেই, তাঁর ভালো-মন্দের সঙ্গে কারও পরিচিত হবার প্রচেষ্টা নেই, তাঁর শিক্ষা ও যোগ্যতা কি হ'লে বাড়তে পারে সে সম্বন্ধে কারও মাথাব্যথা নেই—তারাশঙ্করবাবুর নিজের কথায় বলতে গেলে "এঁদের সুখ-দুঃখ অবহেলিত, সমাজ-জীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত।" মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা, সমাজের একটি মূল্যবান অংশকে উপেক্ষায়-উপেক্ষায় এমন ভাবে ক্ষয়ে যেতে দেওয়ার দৃষ্টান্ত একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করবাবু এই অপচিত মনুষ্যত্বকে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে বইখানা লিখেছেন তাতে শুধু তাঁর শিল্পীমনের সুগভীর পরিচয়ই আমরা পাই না, তার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে যাই।

কৃতজ্ঞতার কথায় অনেকে কৌতুকবোধ করবেন, কিন্তু বলা প্রয়োজন, মানুষকে বাদ দিয়ে, মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণাকে বাদ দিয়ে, যে বিশুদ্ধ শিল্পসাধনা, তাতে ক্রমেই যেন পাঠক আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এই প্রসঙ্গে রোমাঁ রোঁলার কথা মনে পড়ে: মানবতার জন্যেই শিল্প, (Art for humanity's sake); মানুষের সেবাই শিল্পের স্বধর্ম। কাজেই যাঁর রচনায় এই মানবতার সুরটুকু পাইনে, তিনি যতো প্রগতিবাদীই হোন আর যতো ক্ষুরধারই হোন্, ঠিক যেন তাঁর লেখায় মন ভ'রে উঠতে চায় না। এই জন্যেই সাহিত্যে আদর্শবাদের এতো প্রয়োজন। দর্শন-শাস্ত্রে 'ভাববাদ' অর্থে যেভাবে আদর্শবাদ কথাটাকে ব্যবহার করা হয় আমি সেই অর্থে আদর্শবাদ কথাটি ব্যবহার করছি না; এখানে আদর্শবাদের অর্থ হিতৈষণা, মানুষের কল্যাণচিন্তায় ও কল্যাণপ্রচেষ্টায় নিজের সাহিত্যকে নিয়োগ করা। তারাশঙ্করবাবু সেইদিক থেকে একজন প্রথমশ্রেণীর আদর্শবাদী সাহিত্যিক। বাংলাদেশের বহু আধুনিক লেখককেই জানি (তাঁদের রচনার কথাই বলছি, ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা নয়) যাঁদের লেখা শাণিত আর ক্ষুরধার বুদ্ধির পালিশে চকচকে, যাঁরা অগ্রসর চিন্তার প্রকাশে ও আঙ্গিকের সুনিপুণ প্রয়োজনায় মাঝে মাঝে তাক্ লাগিয়ে দেন; রচনাশৈলীর উৎকর্ষের সমস্ত গোপন তথ্যই যাঁদের হাতের মুঠোয়; কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁরা কেমন যেন নিষ্করুণ আর হৃদয়বৃত্তিবর্জিত। তাঁদের লেখায় সেই সুরটুকু নেই যাতে মনে হ'তে পারে তাঁরা মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন। যেটুকু মানব-কল্যাণের কথা তাঁদের সাহিত্যে আছে তার উৎস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানবপ্রেম নয়; নিছক বর্তমান কালোচিত রচনার আদর্শের সঙ্গে নিজেদের সাহিত্যকে সমগোত্রীয় করার প্রচেষ্টা থেকেই সেই তথাকথিত মানবপ্রেমের জন্ম হয়েছে। ভরসার কথা, তারাশঙ্করের মানবপ্রেম এই তথাকথিত মানবপ্রেম নয়। তিনি সত্যি সত্যি মানুষকে ভালোবাসেন আর তার পরিচয় 'সন্দীপন পাঠশালা'-র ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে।

গল্পটির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই—কিন্তু লেখকের সহজ বর্ণনাভঙ্গির গুণে যা সাধারণ আর বিশেষত্ববর্জিত তাই বিশেষিত হ'য়ে উঠেছে এক অপরূপ শিল্পৈশ্বর্যময় কাহিনীতে। সীতারামের জীবনে অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি পর্যন্ত লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি—সীতারামের সাংসারিক জীবন, আট-আনা রকমের জমিদার বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা। আর পাঠশালার শিক্ষাদান—এই ত্রিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে সীতারামের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি পর্যন্ত লেখকের লেখায় স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে পল্লীর একটি বাস্তব চিত্রও সেই সঙ্গে আমরা পাই। স্বয়ং-সম্পূর্ণ চাষীর অনাড়ম্বর জীবন-

যাত্রা, বাহুল্যবিরহিত সন্তোষ আর পারিবারিক শান্তির সঙ্গে আমরা যখন একই পল্লীর ভদ্রপাড়ার বাবুদের অহেতুক ক্ষমতাপ্রিয়তা, মিথ্যা মর্যাদাবোধ, কূটচক্রিতা, পরনির্ভরতা আর সন্তানদের চরিত্রগঠনের ব্যাপারে ঔদাসীন্য ও অক্ষমতার তুলনা করি তখন এই ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই যে এই ভদ্রবাবুরাই এতোদিন পল্লীজীবনের সর্বেসর্বা নিয়ন্তা ছিলেন, চাষীরা শুধু তাঁদের প্রয়োজনের উপকরণ সংগ্রহ করে এসেছে বই নয়। কিন্তু চাকা ঘুরেছে। ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলন আর ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আঘাতে কি ভাবে বাংলাদেশের পল্লীর বাবু-শক্তির শক্ত বনিয়াদের মধ্যে চিড় ধরেছে এবং কি ভাবে অনুরূপ অন্যান্য বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় তা আজ একেবারেই ধ্বসে যেতে বসেছে লেখক অপূর্ব সূক্ষ্মতায় তাকে উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

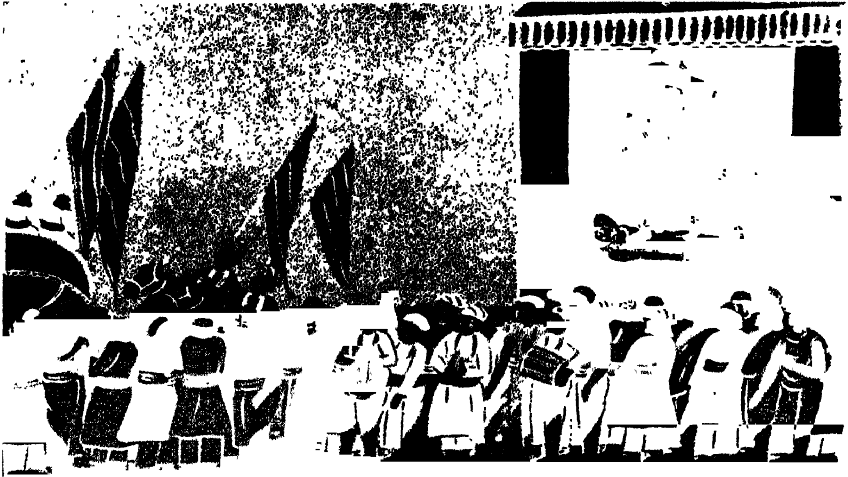
একটি জিনিষ দেখে বড়ো ভালো লাগ্‌লো। বেশির ভাগ পল্লীর গল্পতেই দেখি পল্লীবাসীরা শুধুই কুচক্রী, পরনিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ণ, সর্বদাই পরের অমঙ্গলকরণে তৎপর, কামুক, লম্পট এবং এইরূপ আরো কিছু। পল্লীবাসীর চরিত্রের ভালোর দিকটা আমাদের সাহিত্যে নেই এমন নয়, তবে যতোটা দেখ্‌তে পাবো ব'লে আমরা আশা করি তার কিছুই গল্পে অথবা উপন্যাসে থাকে না। ক্রমাগত মন্দ দিকটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পল্লীচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই খারাপ হ'য়ে গেছে এবং অভ্যাসের দোষে কিছু পড়তে আরম্ভ করলেই আমরা যে কোন পল্লীবাসীকে অভিসন্ধিপরায়ণ আর মন্দ ভেবে নিই, ভাবি এই বুঝি এর আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো। কিন্তু সুখের কথা, তারাশঙ্করবাবু আমাদের সেই অভ্যস্ত আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। পল্লীর মানুষ সমস্ত মানুষের মতোই ভালোয়-মন্দে মিশোনো—একই মানুষ নিরবচ্ছিন্ন ভালো আর একই মানুষ নিরবচ্ছিন্ন খারাপ বহুদিনের প্রচলিত এই সাহিত্যিক সংস্কারকে তিনি নির্মম হস্তে খণ্ডন করেছেন। সেইজন্যেই 'সন্দীপন পাঠশালা' বই-এর কাহিনীতে এমন একটা অনাবিলতার আবহাওয়া তিনি সঞ্চার করতে পেরেছেন যা দেখে মনটা সত্যি খুসী হ'য়ে ওঠে। বাবুদের বাড়ির ছেলেদের ডেঁপোমি আর গুণ্ডামির কথা বইটির এখানে-ওখানে আছে বটে, কিন্তু সব জড়িয়ে পল্লীর চাষীজীবনের যে ধারণা বইটির মধ্যে দিয়ে গ'ড়ে উঠে এবং জমিদারপুত্র ধীরাবাবুর কার্যকলাপে যে বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় মেলে তাতে সব ছাড়িয়ে একটি সুঠাম কল্যাণের আদর্শে যেন আমাদের অন্তর বিশোধিত হ'য়ে ওঠে। এই মঙ্গলকর আবহাওয়ার সফল দৃষ্টান্ত তাঁর আর একটি বইতে আমরা পাই, সেটির নাম 'রাইকমল'। রাইকমল মুখ্যত কাব্যধর্মী আবেগময় উপন্যাস; বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'সন্দীপন পাঠশালা'র সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে—উভয়েরই আবহাওয়াটি বড়ো নির্মল, বড়ো বিশুদ্ধ, বড়ো সুন্দর। তারাশঙ্করবাবু যখন পতনোন্মুখ জমিদারশ্রেণীর ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার কথা বর্ণনা করেন তখন সত্যি একটা শ্বাসরোধকারী ব্যর্থতার চেতনায় মন ভ'রে যায়; রচনার আবহাওয়ায় জ'মে ওঠে একটা ভঙ্গুরতার আবেগ। কিন্তু সেই দিক থেকে এই দু'খানি বইএর প্রকৃতি একেবারে স্বতন্ত্র। 'সন্দীপন পাঠশালা' যদিও সীতারামের জীবনের ট্র্যাজিডিরই কাহিনী, তা হলেও সেই ট্রাজিডিতে নেই দাহ, নেই ক্রূরতা, নেই মর্মান্তিক ব্যর্থতার পীড়ন—বরং ওই ট্র্যাজিডির মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম আভাসে যেন একটি প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় কল্যাণবাহী আদর্শেরই জয় ঘোষণা আমরা শুনতে পাই।

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজের আরও তিনটি বই আমাদের হাতে এসেছে। এর মধ্যে শ্রীসুকুমার সেন লিখিত 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই পাঁচশো বৎসর কালের বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস। অর্থাৎ তুর্কি অভিযানের সুরু থেকে ভারতে বৃটিশের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এই সুবিস্তৃত অধ্যায়ে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে বাঙালী জীবনের কোন্ কোন্ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল ডাঃ সেন একটি পুস্তিকার পরিসরে যতোটুকু প্রমাণপঞ্জী সম্ভব তার সাহায্যে সেকথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতির ফলে বাঙালীর ঐহিক সুখভোগের বাসনা আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত হয়ে তার পারমার্থিকতাটাই বড় হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালীর যে আর্থিক দুর্গতির চিত্র আমরা তখনকার সাহিত্যে পাই তার কারণ ডাঃ সেনের মতানুসারে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার নয়, তার আসল হেতু, মোগল শাসনে দেশের অত্যধিক শোষণ ও তার ফলে ক্রম-বর্ধমান অবনতি।

'বাংলার সাধনা' পুস্তিকায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বাংলার বিশেষ সাধনার ধারাটি পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বাংলার যে বিশেষ ঐতিহ্য তার ধর্ম-সাধনায়, তার শিল্পে, সংগীতে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে, তার কীর্ত্তন বাউল ভাটিয়ালিতে তার শাস্ত্রপরান্মুখতায় ও পুরাতন বিরোধিতায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলাকে আলাদা করে রেখেছে, সুচিন্তিত আলোচনার মধ্যে দিয়ে পণ্ডিতপ্রবর ক্ষিতিমোহনবাবু বাংলার সেই ঐতিহ্যের কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবিত কালে তাঁকে এই বিষয়ে আলোচনা করতে বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়ে যান, ক্ষিতিমোহনবাবু তদনুসারে আলোচ্য পুস্তিকাখানি সঙ্কলন করেছেন। বাংলার সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যটিকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বল্‌তে হয় বাঙালী মুখ্যত মানবপন্থী। আচার ও আচরণে, ধর্ম ও দর্শনে, সাহিত্যে ও লোকগাথায় এই মানবপন্থারই জয়জয়কার। তাই শুষ্ক নৈয়ায়িককেও এখানে প্রেমোচ্ছল বৈষ্ণব মতের দীক্ষার মধ্যে দিয়ে সাধনার সিদ্ধি খুঁজতে হয়, পরমতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিককেও হ'তে হয় সহজিয়া বাউল। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : জলপথের পথিক আমরা শুষ্ক ধুলোর পথে চলতে পারি নে। সত্যই, শুষ্কের সাধনা বাঙালীর জন্যে নয়, আর এই কথাটিই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর স্বাভাবিক রসালো কথকতার ভঙ্গিতে সমস্ত আলোচনাটির মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আলোচনা শুধু সরসই নয়, তথ্যের দিক থেকেও বিশেষ মূল্যবান।

'প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা' পুস্তিকায় ডাঃ মনোমোহন ঘোষ প্রাচীনভারতের নাট্যকলারীতি, দৃশ্যকাব্যের প্রকৃতি, ভারতীয় নাটকের উদ্দেশ্য, আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় প্রভৃতি নাট্যকলাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কে বিশেষজ্ঞোচিত আলোচনা পুস্তকটিতে গ্রথিত করেছেন। আলোচনায় বিবৃতি ও বক্তব্য দুইই আছে। প্রাচীন কালের ভারতীয়দের চিন্তা শুধু পারমার্থিক বিষয়েই নিবদ্ধ ছিল এমন একটা অভিযোগ প্রায়শই শুন্‌তে পাওয়া যায়—গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে এই মতের ভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ বলেছেন যে প্রাচীন ভারত কেবলই তপশ্চর্যামুখী হলে নাটকের এমন উৎকর্ষ সে সময়ে কখনই সম্ভব হ'তো না।

নারায়ণ চৌধুরী





উনিশ-শতকের বাংলা

[মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত পটের প্রতিলিপি]

পূর্ব্বাশা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

চিত্রাধিকারী :

জাতীয় প্রদর্শনী

[পরিচয় : কালীপুজো এবং কারবালা শোভাযাত্রায় হিন্দুমুসলমান একসঙ্গে যোগদান করছে। চিত্রটি থেকে উপলব্ধি হয় তাদের অনৈক্য ধর্ম্মগত নয়।]

পূর্বাশা

নবম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ • ১৩৫৩

'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য'

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

১৯৪০-সনে গান্ধীজি বলেছিলেন : 'এমন এক সময় ছিল যখন আমাকে বিশ্বাস করেন না এমন একজন মুসলমানেরও অস্তিত্ব ছিলনা। আমার দুর্ভাগ্য আজ আর সে-দিন নেই।' (২০।৩।৪০)

গান্ধীজির এই খেদোক্তিটিকে অন্য কোনো পথে ব্যাখ্যা না করে বাস্তব অবস্থার বর্ণনা হিসেবেই আমরা ধরে নিতে পারি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই যে আজ ভারতবর্ষের নেতা গান্ধীজির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, এখানে গান্ধীজির সেই স্বীকারোক্তিই উচ্চারিত। ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতার মনে নিজের নেতৃত্ব সম্বন্ধে এই দ্বিধা জনসাধারণকে শঙ্কিত করে তুলবে সন্দেহ নেই। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে এমন বিরাট নেতৃত্বের অবিসংবাদিতা ম্লান হয়ে গেল কার অপরাধে? এ কি নেতার অপরাধ, না কি ভারতীয় হিন্দুর অপরাধ, না ভারতীয় মুসলমানের অপরাধ? রাষ্ট্রনীতির কূট দৃষ্টিতে তাকালে হয়ত এঁদের সবার কার্য্যকলাপ থেকেই কিছু কিছু অপরাধ আবিষ্কার করে নেওয়া যায় এবং কার কতটুকু অপরাধ তা নিয়ে তর্ক অনন্তকাল পর্য্যন্ত অমীমাংসিত রাখা যায় কিন্তু তা করে ভারতবর্ষের দিন বা ভারতীয় মন কিছুতেই পরিচ্ছন্ন হবে না। কাজেই আমাদের দেখা উচিত রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি ছাড়া আর কোনো পথ আছে কিনা যেদিকে তাকিয়ে এ প্রশ্নের খানিকটা উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো নূতন পথে তাকাতে গেলে প্রথমেই আমাদের মেনে নিতে হবে যে ওই অপরাধের জন্যে কারো সচেতন ইচ্ছা দায়ী নয় কাজেই তাকে অপরাধ বলে আখ্যা দেওয়াও অন্যায়। গান্ধীজির নেতৃত্বে যে অপূর্ণতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার জন্যে দায়ী স্থিতাবস্থা। ভারতবর্ষের স্থিতাবস্থা যখন অসহযোগ

আন্দোলনের ভূকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল—নেতার নেতৃত্বের ভাণ্ড তখন অপূর্ণ মনে হয়নি, কিন্তু সেই আন্দোলন-তাড়িত জল যখন আবার স্থিতাবস্থায় ফিরে গেল, যখন রুদ্ধ হয়ে গেল সামাজিক উৎসাহ-উদ্দীপনার স্রোত তখন থেকেই নেতৃত্বের দেহে ভাটার টান সুরু হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রিক আন্দোলনের অবসানে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন মোটামুটি স্থিতাবস্থায় ফিরে গেলেও আন্দোলনপূর্ব্ব স্থিতাবস্থার সঙ্গে আন্দোলনোত্তর স্থিতাবস্থার যে হুবহু মিল থেকে গেছে তা নয়—আন্দোলনোত্তর স্থিতাবস্থা আপন দেহে আন্দোলনের গতি-ধর্ম্মকে সঞ্চিত করে নেবেই। স্থিতি ও গতির যে অন্তর্দ্বন্দ্বে সমাজ-রূপের আশ্চর্য্য বিকাশ হয়, তারই আলোতে হিন্দুমুসলমানের মিলন ও বিচ্ছেদের সমস্যার দিকে আমাদের তাকাতে হবে। এ মিলন বা বিচ্ছেদের অধ্যায় ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মফলে তৈরী নয়, মানব-মনের ভাঙাগড়ার কাহিনী তৈরী করে চলে যে-ইতিহাস তার হাতেই গড়ে ওঠে সমাজজীবনের সুখদুঃখময় এই অধ্যায়গুলো।

এ-ইতিহাসের মর্ম্ম মুসলিম লীগের অভ্যুদয়-পতন, পুনরাবির্ভাব ও বিবর্ত্তনের মধ্যেই নিহিত। ভারতীয় মুসলমানের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করবার আগে আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বা কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা উচিত।

কংগ্রেসের সুদীর্ঘ জীবনে ইংরেজী শিক্ষার ধাত্রীত্ব আছে বলেই তার শৈশব 'আর্ম্ম চেয়ারে' অতিবাহিত হয়েছে। অরবিন্দ এবং তিলকের আবির্ভাবের আগে কংগ্রেসের মণ্ডপে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামশীল আকাঙ্ক্ষা সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। এই সংগ্রামশীলতা বাংলার সন্ত্রাসবাদে এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংসার পথে অনেকবার বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করেছে বলেই কংগ্রেস আজ শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লীগের জীবনেও কংগ্রেসের অনুরূপ বিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয়। শৈশব পঙ্গুতা থেকে উদ্ধার করে লীগকে শক্তি-পরীক্ষার পথে টেনে এনেছেন মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব। শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কংগ্রেস শক্তির উৎস হিসেবে যে ব্যাপক ক্ষেত্র আবিষ্কার করে নিয়েছিল তা হচ্ছে জাতি-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশ, দেশের চল্লিশ কোটি অধিবাসী—আর শক্তির উৎস হিসেবে লীগকে নির্ভর করতে হচ্ছে আটকোটি ভারতীয় মুসলমানের উপর। এই আটকোটি মুসলমানকে একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রগতিশীল শক্তিতে পরিণত করতে হলে তাদের রাষ্ট্র-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই আসল কাজ নয়, সামাজিক চেতনায় অনুপ্রাণিত করাই আসল কাজ। শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে এবং অর্থনীতির পেষণে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ যে অনগ্রসরতার ব্যাধিতে আক্রান্ত, সমাজকে সেই ব্যাধি থেকে মুক্ত না করতে পারলে ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে যোগ্য সম্মান লাভ করতে পারবে না—আবার অনগ্রসর সমাজকে গ্লানিমুক্ত,

সুস্থ করে তুলতে হলে আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর না করলেও চলেনা। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে লীগ আজ বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে ভারতীয় মুসলমান-সমাজের শক্তি বা প্রগতি অপর কোনো সম্প্রদায় বা দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হতে পারেনা: কংগ্রেস নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (যদিও পাশ্চাত্য দেশের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি হিসেবেই তা গণতান্ত্রিক)—কিন্তু তাতে হিন্দুর সংখ্যাধিক্যও সন্দেহাতীত এবং এই সংখ্যাধিক্যের দরুণ কংগ্রেসে হিন্দুব আধিপত্যও স্বাভাবিক। হিন্দু-শাসিত কংগ্রেস যতো গণতান্ত্রিকই হতে চান না কেন, মুসলমান সমাজের প্রগতির জন্যে মনে মনে যতো সদিচ্ছাই পোষণ করুন—কার্য্যত মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন করতে পারবেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের কাছে গণতন্ত্রের মানে সংখ্যাধিক্যের শাসন—সে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানভুক্ত বিভিন্ন দলের স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তির সহায়ক নয়। কাজেই কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হলেই যে দেশের বিভিন্ন দল ও সমাজের উপর সুবিচার দেখাতে পারবেন, এমন কোনো যুক্তি নেই। যুক্তির সুবিধের জন্যে যদি মেনে নেওয়া হয় যে কংগ্রেস গণতন্ত্রকে বিশুদ্ধ করে আক্ষরিক ভাবে গণতন্ত্র অনুসরণ করে চলেছেন তখনও মুসলমান-সমাজকে মুসলমানের আন্তরিক দৃষ্টিতে দেখে তাকে একটি প্রগতিশীল সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে উন্নীত করা কংগ্রেসের হিন্দুদের পক্ষে অসম্ভব; মুসলমান সমাজের প্রতি মুসলমানের দৃষ্টিতে তাকান কোনো হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়, তেমন দৃষ্টি বা মানসিকতা অর্জ্জন করা দুঃসাধ্য। 'কংগ্রেস মুসলমান সমাজের উন্নতির সহায়ক কিনা'—এ প্রশ্নটি নিয়ে যুক্তির পথে এগোতে গেলে উপরোক্ত কয়েকটি নেতিসূচক বাক্যের মতো বাক্যের শরণ নিতে হয়। জিন্না সাহেব এই নেতি-র পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। পণ্ডিত জওহরলালের ভাষায় তাই তিনি "negative person" —কিন্তু পণ্ডিতজীর অনুমান অনুসারে আমরা কি সত্যি ভাবতে পারি যে জিন্নাসাহেবের কোনো 'positive aspect' নেই? কংগ্রেস সম্পর্কে জিন্নাসাহেবের মানসিকতা সন্দেহবাদী হতে পারে—কিন্তু লীগ সম্পর্কে সে মানসিকতা ত সৃষ্টিসন্ধানী! মুসলমান সমাজ নিজের চেষ্টায়, অর্থেসামর্থ্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনায় শক্তিশালী হয়ে উঠুক জিন্না সাহেব তাই চান।[১] হিন্দু মুসলমান একে অন্যের উপর রাষ্ট্রিক প্রভুত্ব বিস্তার করুক বা

[১] "I......appeal to you...to organise yourselves in such a way that you may depend upon none except your own inherent strength. That is your only safeguard and the best safeguard. Depend upon yourselves. That does not mean that you should have ill-will or malice towards others".

"We wish our people to develop to the fullest our spiritual, cultural, economic, social and political life in a way that we think best and in consonance with our own ideals and according to the genius of our people."

"Come forward as servants of Islam, organise the people economically, socially, educationlay and politically and I am sure that you will be a power that will be accepted by everybody." (*All India Muslim League-Lahore Session-Presidential Address*).

একের সামাজিক ব্যবস্থা অন্যের সামাজিক ব্যবস্থা প্রভাবিত করুক—এমন অবস্থা যাতে উপস্থিত না হতে পারে তার জন্যে জিন্নাসাহেব হিন্দুমুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছেন[১]। হিন্দু আর মুসলমান আলাদা জাতি কি না এবং তাঁদের স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে কিনা এ তর্কের মীমাংসা কোনো দিন হবে কিনা সন্দেহ—একপক্ষ জাতির আভিধানিক অর্থ উপস্থিত করবেন, অপর পক্ষ বাস্তব অবস্থার দিকে ঝোঁক দিয়ে কথা বলবেন এবং তর্ক এ পথে চলতে সুরু করলে সে পথ কোনোদিন ফুরোবে না। 'দুই জাতি' সমস্যাটি কংগ্রেস রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির আলোতে বুঝতে চেয়েছেন[২]—জিন্নাসাহেব এ সমস্যাটিকে বুঝতে চান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে[৩]। জিন্নাসাহেব বলেন, দু'টি পৃথক দার্শনিক মতবাদ, পৃথক সাহিত্য ও পৃথক সমাজব্যবস্থা থেকে যে দুটি পৃথক সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে, হিন্দু আর মুসলমান সে দুটি পৃথক সভ্যতার মানুষ—পৃথক ইতিহাস তাদের প্রেরণা দেয়, জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণা পৃথক, কাজেই একটি অবিভক্ত জাতি হিসেবে তারা কিছুতেই দাঁড়াতে পারেনা। জিন্নাসাহেবের যুক্তিকে খণ্ডন করবার অবকাশ আমাদের সামাজিক ইতিহাস আজও তৈরী করেনি।

জিন্নাসাহেবের নেতৃত্বে লীগ ভারতীয় মুসলমানের সামাজিক সমস্যাটাকেই উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন—সমাজকে কেন্দ্র করেই তাঁদের রাষ্ট্রিক অধিকারের প্রশ্ন তৈরী হয়েছে। সামাজিক বিষয়ের দিকে তাকাবার অবসর কংগ্রেসের ছিলনা—যে প্রেরণার ভিত্তিতে তার জন্ম তার স্বরূপ সামাজিক নয়, রাষ্ট্রনৈতিক। জাতীয় মুক্তির স্থির লক্ষ্য নিয়েই কংগ্রেসের পথ-চলা সুরু হয়েছিল, সেই বিরাট ও ব্যাপক অভিযানের সঙ্কল্পের সামনে সামাজিক কোনো সমস্যাই ঠাঁই পায়নি, ঠাঁই পাবার সুযোগও হয়ত ছিলনা। সামাজিক সমস্যার সূক্ষ্ম ও বিশদ বিচার করে নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্কৃতির ও ভৌগোলিক আবেষ্টনীর চল্লিশ কোটি নরনারীকে কোনো রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পথে সমবেতভাবে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়, সবাইকে আন্দোলনোন্মুখ করে তুলবার জন্যে তখন

---

১ "..... the only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states. There is no reason why these states should be antagonistic to each other. On the other hand the rivalry and the natural desire and efforts on the part of one to dominate the social order and establish political supremacy over the other in the government of the country will disppear." (*Ibid*)

২ "The personal nationalities of Hindus and Muslims may differ but they donot constitute them into separate states." "If we take the criteria of race, language and religion and the resultant of their action and reaction which is described by the word culture, we find that Hindus and Muslims belong to the same race......" (*The League Demand—Dr. Rajendra Prasad*)

৩ "It is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religious in the strict sense of the word but are, in force, different and distinct social orders......" (*Lahore Address*)

একটি সাধারণ সূত্র বা সার্ব্বজনীন অভিযোগ খুঁজে নিতে হয়—পরাধীনতাকেই কংগ্রেস তখন সাধারণ সূত্র হিসেবে দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পরাধীনতার অবসানে ইচ্ছা বা স্বাধীনতার কামনা রাষ্ট্রনীতির সীমা ছাড়িয়ে যে সমাজ-মানসেও এসে ছড়িয়ে পড়তে পারে এ ধরণের ভবিষ্যৎ-চিন্তা করবার অবকাশ সেদিনের কংগ্রেসের ছিলনা। কংগ্রেস রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেসের মনে রাষ্ট্রিক চিন্তাই সবার উপর স্থান পেয়েছে, কংগ্রেসের কাছে ষ্টেটের বা রাষ্ট্রযন্ত্রের মানে একটি জন-সংখ্যার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার উপায় মাত্র, কংগ্রেস মনে করেন হিন্দুমুসলমান-সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জ নিয়েই মুসলমান যুগে এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে এক একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অবিচ্ছিন্নতা বৃটিশ আমলে আরো স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে[১]। রাষ্ট্র সম্বন্ধে এ-ধরণের চিন্তাধারার পেছনে কংগ্রেসের যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে যাচ্ছে তা স্বাভাবিক হলেও ইংরেজি শিক্ষারই প্রেরণা-জাত। কংগ্রেস ও জাতীয়তার উন্মেষে অবশ্য ইংরেজি-শিক্ষার ও বাংলাদেশের উনিশ শতকের দান অনস্বীকার্য্য[২]। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারতীয় চেতনায় যে বিবর্ত্তন এনেছে তাতে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের রঙই বেশি উজ্জ্বল এবং সেই উজ্জ্বলতা বিশশতকের দ্বিতীয়পাদে আজ পরিপূর্ণ গৌরবে প্রতিভাত। আজ ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা থেকে ভারতীয়ত্ব আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য, হয়ত বা অসম্ভবই। পাশ্চাত্যের একটি রাষ্ট্রশক্তির হাত থেকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা নিজের হাতে আনবার কোনো উপায় হয়ত ভারতবর্ষের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতি বাৎলে দিতে পারতনা, কাজেই প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা বা কার্য্যকলাপ নিঃসন্দেহে অনিন্দ্য। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির শক্তিদ্বন্দ্ব বা কূটচক্র থেকে বাইরে এসে যদি প্রশ্ন করা যায়—এ-ধরণের রাষ্ট্রনীতি কি ভারতীয়?—এ-ধরণের রাষ্ট্রনীতি কি ভারতবাসীর নিজেদের পক্ষে উপযোগী?—তাহলে নিশ্চয়ই তার কোনো সদুত্তর খুব সহজে পাওয়া যাবে না।

---

১ "During the second half of the eighteenth century and the first half of the nineteenth. Bengal ..played a dominant role in British-Indian life. Not only was Bengal the centre and heart of the British administration, but it also produced the first groups of English-educated Indians who spread out to other parts of India under the shadow of the British power. A number of very remarkable men rose in Bengal in the nineteenth century, who gave the lead to the rest of India in cultural and political matters, and out of whose efforts the new nationalist movement ultimately took shape." (*The Discovery of India—Jawharlal Nehru*)

২ "The state is the organ by means of which the common affairs of a number of people who are administered...... They also had during the period of Muslim rule a common state which in those days meant a common ruler, whether it was one of the provincial Governors who had established an independent kingdom of his own or the Emperor of Delhi who exercised suzerain rights over a great part of the country. During the period of British rule the existence of a common state has become even more explicit and obvious than before." (*The League Demand—Dr. Rajendraprasad*)

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেনি—রাষ্ট্র সম্বন্ধে দু'শো বছরের অচেতনতাই তার জন্যে দায়ী। সেই আত্মবিস্মৃত জড় উপাদানের উপর ইংরেজি শিক্ষার আলো তাকে বৈদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের স্তম্ভ রূপে তৈরী করতে চেয়েছে—স্তম্ভ যে তৈরী হয়নি তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে স্তম্ভের বিপরীত শক্তিরও উদ্ভব হয়েছে এই নূতন শিক্ষায়। বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির নূতন হাতিয়ার হাতে নিয়েই এই বিপরীত শক্তির আবির্ভাব হল। কাজেই ভারতীয় রাষ্ট্রিক আন্দোলন গোড়ায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে চল্‌তে পারেনি ক্রমবিকাশের পথেই তা সমাজকে সচেতনতর করে তুলেছে এবং সচেতনতর বিভিন্ন নেতার সংস্পর্শে ভারতীয় রাষ্ট্রিক আন্দোলন আজ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে।

একটি দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলন সমাজ-মানসে কেবল রাষ্ট্রচেতনাই পরিবেশন করেনা, সমাজকে নিজের দেহের দিকে তাকাবার দৃষ্টিও দান করে থাকে। কংগ্রেস যে সময়ে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত থেকেছে, সবসময়েই তখন দৃষ্টির অগোচরে ভারতীয় সমাজ-শরীর বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বহুদিনের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শাসনের ফলে নিষ্ক্রিয় ও জড় সমাজ যে তখন প্রাণস্পন্দনেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জেগে উঠেছে যে কেবল আবেগ ও অনুভূতিরই রাজ্যে তা নয়—চিন্তার ও জ্ঞানের দুয়ারও তার মনের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে গেছে। সমাজ ভাবতে শিখেছে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ—রাষ্ট্রের জন্যেই কি তার বেঁচে থাকতে হবে—না কি তার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে রাষ্ট্রের? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যদি বর্ত্তমানের দিকে তাকান যায় তাহলে সেখানে পাওয়া যাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতির আধিপত্য—সমাজ রাষ্ট্রের ভৃত্য। কিন্তু অতীত সভ্যতায়—ভারতবর্ষের অতীতে যদি উত্তর খুঁজতে যাওয়া যায় আমরা দেখতে পাব সমাজের উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব নেই—সমাজ সেখানে স্বতন্ত্র শৃঙ্খলায় আসীন, সমাজের রক্ষী হিসাবেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। মুক্তির প্রেরণায় জাগ্রত সমাজ রাষ্ট্রের বন্ধনকে স্বীকার করে নিতে পারেনা—যতো নূতনই এ-পদ্ধতি হোক না কেন, ভারতীয় সমাজ-মানস রাষ্ট্রকে রক্ষক হিসাবেই পেতে চাইবে, ভক্ষক হিসেবে নয়। মোস্‌লেম সমাজের এই ধরণের চাওয়ার সঙ্গে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয়তার বিরোধই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বিচ্ছেদের নদী তৈরী করে চলেছে। মোস্‌লেম সমাজের দিকে তাকিয়েই লীগের রাষ্ট্রনৈতিক মতামতগুলো উচ্চারিত; মোস্‌লেম রাজনীতি মোস্‌লেম সমাজের সহায়ক হোক, রাজনীতিদ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত না হোক—এই ইচ্ছাই লীগের কর্ম্মপদ্ধতিতে অভিব্যক্ত। লীগের মনোভাব সর্ব্বাংশেই পাশ্চাত্যচিন্তামুক্ত কিন্তু আজ হঠাৎ এক মুহূর্ত্তেই কংগ্রেস এ-মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠ্‌তে পারে না। রাজনীতির পথে বহুদিন যাবৎ এগিয়ে চলেছেন কংগ্রেস—বহুদূর এসে গেছেন, জাতীয়

মুক্তির দ্বারপ্রান্তেই এসে পৌঁছেছেন হয়ত—এই চলার পথে মোস্লেম সমাজের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছেন, কাজেই সবটুকু পথ না ফুরোতে কংগ্রেস আজ রাজনীতির পথ ছেড়ে দিয়ে সমাজনীতির পথে পা বাড়াতে পারেন না। কংগ্রেস চান এই যাত্রার অবসানে সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে—মুসলমান সমাজের যে-অংশ এতদিন রাজনীতির পথে কংগ্রেসের সহযাত্রী হয়েছেন, অভিযানের শেষে তাঁরাও হয়ত মোসলেম সমাজের প্রতি মনোযোগী হবার অবকাশ পাবেন—এবং তখন কংগ্রেস, জাতীয় মুক্তির সার্থক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস, সমগ্র মোসলেম সমাজের দাবী অসঙ্কোচে স্বীকার করে সামাজিক মুক্তির সার্থক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠ্‌বে। কংগ্রেসের দেহে এই বিবর্ত্তনের সম্ভাবনা একাধিক্ কংগ্রেসনেতার সাম্প্রতিক উক্তি থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায়। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি ভারতীয় সমাজের পায়ে শৃঙ্খল পরাতে পারবে না, সেখানে রাষ্ট্রকে বেঁচে থাকতে হবে সমাজেরই শুভানুধ্যায়ী হয়ে—পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রপূজাকে কল্যাণকর বলে ভারতীয় মন কখনও গ্রহণ করবেনা—ভারতবর্ষের সমাজ-মনের ইতিহাস সন্ধান করেই এখানকার রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিণিত হবে।

অবশ্য ভারতবর্ষের সত্যিকারের সামাজিক ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয়েছে কিনা সন্দেহ—যা তৈরী হয়েছে তা রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সমাজ ও সংস্কৃতি অভিন্নদেহী নয় তবু সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে সামাজিক ইতিহাস বলে ভুল করবার দৃষ্টান্ত অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের রচনাতেই দেখা যায়। পাঠান-মুঘল যুগে হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেছিল—নৃত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, ভাষায় ও ভাবে যে-সমন্বয়ের সন্ধানে আমরা খুঁজে পাই তাকে সামাজিক সমন্বয় বলা ভুল। বিভিন্ন দুটি জাতির দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে তৃতীয় একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে—তার জন্যে এ-কথা বলা যায়না সে-দুটি জাতির সামাজিক সমন্বয় হয়ে গেছে। গ্রীকভাস্কর্য্যের প্রভাবে ভারতীয় ভাস্কর্য্যে নূতন একটি ধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল বলেই আমরা ভাব্‌তে পারিনে যে গ্রীক্ ও ভারতীয় সমাজপদ্ধতি ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। সেদিন একমাত্র বৈবাহিক বন্ধন অসঙ্কোচে স্বীকার করেই হয়ত হিন্দুমুসলমানের সামাজিক সমন্বয় সম্ভবপর ছিল—তবে খিল্‌জি-তুঘলক বংশের কয়েকজন সুলতানের বা দু'একজন মুঘলসম্রাটের বিবাহ দিয়ে সামাজিক সমন্বয়ের মতো একটি বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হতে পারেনা—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সঙ্গে গ্রীকরাজ সেলুকস বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন বলে সে-ঘটনা হিন্দু-গ্রীক সমাজের সংমিশ্রন সূচিত করেনা। হিন্দুগুরু রামানন্দের কাছে মুসলমান কবীর দীক্ষা নিয়েছেন—তেম্নি গ্রীক সামন্তরাজ হেলিওডোরাস ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। হিন্দুভারতের সামাজক ইতিহাস বর্ণনায় যেমন আমরা গ্রীক্ সমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করিনে, তেম্নি মুসলমান

আমলের সামাজিক ইতিহাস-বিচারে হিন্দুমুসলমানের সামাজিক সমন্বয় কল্পনা করার অধিকারও আমাদের নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে হিন্দুর ও মুসলমানের সমাজ ঐক্যের পথে অগ্রসর হয়নি—তা যদি হ'ত তাহলে দেশী বা বিদেশী কোনো প্রকার রাষ্ট্রের শাসনই সে-পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াতে পারতনা, কেননা, ভারতীয় সমাজ-শক্তি রাষ্ট্রশক্তির উর্দ্ধে অবস্থিত। অনেক বিচার-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েও আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর সামাজিক পদ্ধতি মোসলেম সামাজিক পদ্ধতির পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়নি—'They neither intermarry nor interdine together' জিন্নাসাহেবের এই বাস্তব উক্তি গান্ধীজির খেদোক্তির মতোই আমাদের অনুধাবনীয়।

তাই আজকের দিনে আমাদের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে হিন্দুমুসলমানের সামাজিক স্থিতাবস্থার বিবর্ত্তন সম্ভব কিনা—এমন কোনো শক্তি আছে কি না যাতে এদুটি পৃথক সমাজ-রূপ একই ধাঁচে গড়ে তোলা যায়? এ-প্রশ্নের উত্তর আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয়না। তিনি বলবেন, এদু'টি সমাজরূপের ও সমাজপ্রকৃতির মিলন অসম্ভব নয় কিন্তু সমাজের নিজস্ব শক্তিতে সে-মিলন সংঘটিত হবেনা—কেননা, সমাজের নিজস্ব শক্তি বলে যা আখ্যাত হয় তা অমূলতরু—বিশেষ ধরণের কোনো উদার নীতির আকস্মিক প্রেরণা। একত্রে পানাহার বা অন্তর্বিবাহ যদি আকস্মিক প্রেরণাজাত হয় তাহলে তা দিয়ে সমাজশরীরে বিবর্ত্তনের আলোড়ন আনা যায়না। প্রয়োজনের তাগিদে এ-প্রেরণাকে দৃঢ়মূল হ'তে হবে, তবেই আন্দোলনের দোলায় তুলে উঠবে সমাজ-শরীর। এই প্রয়োজনের জন্ম দিতে পারে কে?—উত্তরে সমাজবিজ্ঞানী বলতে থাকবেন, সমাজ-রূপে ও সমাজ-প্রকৃতিতে যে-যে শক্তি সক্রিয় তাদের প্রকৃতিবিচার করলেই প্রয়োজনের জননীকে আবিষ্কার করা যায়। সমাজদেহে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো কি? সামাজিক ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে বহুদিন যাবৎ শাসক ও পালক হিসেবে ধর্ম্ম সমাজের উপর আধিপত্য বিচার করে এসেছে—কিন্তু ইতিহাসের কোনো একটি অধ্যায়ে এসে দেখা যায় ধর্ম্মের শাসন-প্রতিভা এবং পালন-মহিমা ম্লান হয়ে পড়ছে, সে-অধ্যায়ের মানুষগুলোকে দেখা যায় বিজ্ঞানে বিশ্বাসী এবং যন্ত্রোৎপাদনে প্রয়াসী। ভোগ্যোৎপাদনে যন্ত্রনির্ভরতার সূচনা থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসের যে-অধ্যায়, তার সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্ম্মের প্রভাব অস্তমিত—অর্থনীতিই সেখানে শাসক ও পালক। কাজেই সমাজের ভাঙাগড়া বা বিভিন্ন সামাজিক পদ্ধতির মিলন-বিচ্ছেদ আজ অর্থনীতির অঙ্গুলিনির্দ্দেশের উপরই নির্ভরশীল। এধরণের বিশ্লেষণান্তে সমাজবিজ্ঞানী বলবেন: ভারতীয় নব অর্থনীতি যদি যন্ত্রোৎপাদনের সাহায্যে হিন্দুর ও মুসলমানের সমাজে একই ধরণের বিভিন্ন শ্রেণী তৈরী করে চলে অথবা শ্রেণীহীনতার জন্ম দেয়—সমাজের আভ্যন্তরীন আমূল পরিবর্ত্তন যদি সূচিত হতে থাকে, একমাত্র তখনই প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দুমুসলমানের সামাজিক মিলন সম্ভব।

মার্ক্সীয় দর্শন

হেগেল ও মার্ক্স্

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যদিও মার্ক্স্ হেগেলের ন্যায় সর্ব্বত্রই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়াছেন এবং দার্শনিক পদ্ধতির জন্য তিনি হেগেলের নিকট ঋণী, তথাপি তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সারসত্য গ্রহণ করিয়া উহার ভাববাদের বাহ্যিক খোলস পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দর্শন হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। হেগেল তাঁহার মূলভাবকে জগতের চরমসত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। মানবের নৈয়ায়িক চিন্তাধারা কি প্রকারে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এই চরম মূলসত্যে উপনীত হয়, তিনি তাঁহার ন্যায়বিজ্ঞানে তাহাই দেখাইয়াছেন। আমরা এ-বিষয়ের পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মূলভাবই মানুষের মনে গতিবেগ সঞ্চার করে এবং তাহার ফলে মানুষের নৈয়ায়িক চিন্তাধারা নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে উপনীত হয়। যখন মানুষের মন নৈয়ায়িক চিন্তার ফলে মূলভাবের সন্ধান পায় তখনই সে স্বাধীনতা লাভ করে। হেগেল তাঁহার ন্যায়বিজ্ঞানে নৈয়ায়িক তত্ত্বসমূহকে পরপর বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দৃশ্যমান জগৎ ভাবজগতের বাহ্যিকরূপ। সুতরাং দৃশ্যমান বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। বাহ্যজগৎও দ্বান্দ্বিকের নিয়মানুসারে নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে প্রকাশিত হয়। তাই প্রাণহীন বস্তু হইতে প্রাণের ও মনের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। হেগেল বলিয়াছেন যে যাহা চিন্তারাজ্যে সত্য তাহা বাস্তব জগতেও সত্য। কিন্তু তাঁহার নিকট ভাবজগতেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। দৃশ্যমান বাস্তব জগতের সেরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বাস্তব জগৎ ভাবজগতের কেবলমাত্র ছায়ার স্বরূপ।

কিন্তু মার্ক্সের মতে ভাব সর্ব্বদাই মানবশরীরের উপর নির্ভরশীল। মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতেই চিন্তাধারার উদ্ভব। সুতরাং মানব-শরীর-নিরপেক্ষ ভাবের কোন অস্তিত্ব নাই। তাই মার্ক্স্ বলেন যে হেগেলের ভাববাদ রহস্যজালে আবৃত। হেগেল বস্তুকে ভাবের উপর নির্ভরশীল করায় তাঁহার দর্শন প্রত্যক্ষসত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। মার্ক্স্ বস্তুবাদী দার্শনিক

এবং তিনি প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে অনুমানের সাহায্যে আমরা তখনই সত্য নির্ণয় করিতে পারি যখন অনুমান প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়। হেগেলের মতে সত্যের অতি-প্রাকৃত বাস্তবতা আছে। কিন্তু মার্ক্‌সের মতে যাহা বাস্তব তাহা আমরা কেবলমাত্র নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যেই নির্ণয় করিতে পারি এবং অনুমান প্রত্যক্ষলব্ধ বাস্তব সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইতে পারে। তাই মার্ক্‌স্ বলিয়াছেন যে হেগেল তাঁহার মস্তিষ্ক-প্রসূত ভাবকে জগতের স্রষ্টা করিয়া গাড়ীকে ঘোড়ার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্যই মার্ক্‌সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হেগেলীয় দর্শনকে বিপরীতমুখী করিয়া তাহাকে তাহার যথাযথ স্থানে স্থাপন করা। এই বাহ্য দৃশ্যমান বস্তুজগৎই দর্শনের প্রথম স্বীকার্য্য সত্য, কারণ এই জগতের অভিজ্ঞতা হইতেই মানবজ্ঞানের উদ্ভব, এবং মানব সর্ব্বদাই তাহার ব্যবহারিক জীবনে এই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। এই বাহ্য জগতকে স্বীকার না করিলে মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হয়। সুতরাং মার্ক্‌স্ বলেন যে হেগেলের দর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে। বস্তু জগতের অস্তিত্বকেই দার্শনিক জ্ঞানের মূলসত্য বলিরা ধরিয়া নিতে হইবে, ইহাই মার্ক্‌সের মত। এইজন্যই মার্ক্‌সীয় দর্শন বস্তুবাদী।

দ্বিতীয়তঃ হেগেলের সত্য-জগৎ ভাবময় হওয়ায় উহা কালের পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে। হেগেলের মতে সময় অবাস্তব। সুতরাং তিনি যে অভিব্যক্তির ধারার বর্ণনা করিয়াছেন উহা কোন কালাতীত অদৃশ্য জগতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মার্ক্‌সের মতে সময় বাস্তব। এই বাহ্যপ্রকৃতি দেশে ও কালে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং দেশ ও কাল এই চলমান প্রকৃতিরই প্রকাশভঙ্গীর বিশেষরূপ। কাল বাস্তব। চরমসত্য কালাতীত নহে। কালের বাহিরে অভিব্যক্তির কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনই কালের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে। হেগেলের দর্শন কার্য্যকে কারণ করিয়াছে এবং কারণকে করিয়াছে কার্য্য। ভাবজগৎ দৃশ্যমান জগতের কারণ নহে। দৃশ্যমান জগতের ক্রমবিকাশের ফলেই চেতনার অথবা ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে।

হেগেলের মূলভাব ঈশ্বররূপী হওয়ায় তাঁহার দর্শনকে ঈশ্বরের আত্মজীবনী বলা যাইতে পারে। সুতরাং হেগেলীয় দর্শনের মতে জগতের পরিবর্ত্তনের যে ইতিহাস তাহা ঈশ্বরের জীবনের ইতিহাস। এই জগৎ প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর তাঁহার নিজকে প্রকাশিত করেন এবং মানব জীবনের নৈতিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কর্ম্মধারার ভিতর দিয়া ভাবরূপী বিশ্বস্রষ্টা আপনাকে প্রকাশিত করেন। সাহিত্যে, শিল্পে এবং ধর্ম্মেও আমরা এই মূলভাবের আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই। এই বাহ্যজগতের ও মানবের অভিব্যক্তির ভিতরে হেগেল দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বস্রষ্টার আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী। সুতরাং হেগেলের মতে ইতিহাসের

ভিতরে আমরা দেখিতে পাই বিশ্বস্রষ্টার জীবনবৃত্তান্ত। যে উদ্দেশ্য জগতকে পরিচালিত করে তাহা বিশ্বস্রষ্টার স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের কর্ম্মধারা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং জগতের ইতিহাসের গতি মূলভাবদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মার্ক্‌সের মতে ইতিহাসের পরিবর্ত্তন নির্ভর করে কর্ম্মজীবনের উপর। মানুষকে জীবনধারণের জন্য অর্থোৎপাদন করিতে হয় এবং এই অর্থোৎপাদনের প্রয়োজনে মানব-সমাজের ভিতরে বিরুদ্ধশ্রেণীর উদ্ভব হয়। মানব সমাজের এই শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অর্থোৎপাদন ব্যাপারে যাহারা শক্তিমান অর্থাৎ অর্থোৎপাদনের মূলধন যাহাদের হাতে তাহারাই সমাজকে ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে। কিন্তু অর্থোৎপাদনের উপায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের। সেই জন্যই আমরা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা দেখিতে পাই। আধুনিক ধনিক সমাজের অর্থোৎপাদন ব্যবস্থা অনুশীলন করিয়া মার্ক্‌স্‌ দেখাইয়াছেন যে কি প্রকারে আধুনিক সমাজ ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে ধনিকদের হাতে মূলধন থাকায় কি প্রকারে ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রের পরিচালক হইয়া পড়িয়াছে। তাই তাঁহার মতে ধনিক শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র চালনার ভার থাকায় তাহারা তাহাদের আধিপত্য রক্ষার জন্য আইন, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিকে আপনাদের স্বার্থরক্ষার উপযোগী করিয়া লইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে আধুনিক যান্ত্রিকযুগে ধনিক সমাজে অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থোৎপাদনের শক্তির সংঘাত ঘটিয়াছে এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে শ্রমিকশ্রেণী সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ফলে সবদেশেই ধনিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংঘাত বাধিয়াছে। মার্ক্‌স মনে করেন যে ধনিক-সমাজ-শরীরে যে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান সে দ্বন্দ্বের অবসান হইবে তখনই যখন শ্রমিক সম্প্রদায়ের হাতে মূলধনের অধিকার আসিবে এবং তাহারা রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পাইবে। এইরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইলে ধনোৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ধনোৎপাদনের শক্তি-সংঘাত দূরীভূত হইবে। যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হইবে তখন আইন, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নূতন রূপ ধারণ করিবে। সুতরাং মার্ক্‌সের মতে মানব-সমাজের শ্রেণীসংঘাতের ফলে ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং এই শ্রেণীবিভাগর মূলে আছে অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা। সেইজন্যই মার্ক্‌সীয় দর্শনের মতে ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারণ করে মানুষ। মানুষ তাহার ব্যবহারিক জীবন যাপন করিবার জন্য নবনব রূপে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ইতিহাস মানুষের ইতিহাস। ইহা বিশ্বস্রষ্টার জীবন চরিত নহে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হেগেলীয় দর্শনের দৃষ্টি পশ্চাৎদিকে, কিন্তু

মার্ক্সীয় দর্শনের দৃষ্টি সম্মুখদিকে। হেগেল দেখাইয়াছেন যে কি প্রকারে বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা অথবা আত্মনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মভঙ্গী জগতের স্তরে স্তরে প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে হেগেলের রাষ্ট্রমত একটি বিশেষরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মতে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্বস্রষ্টা তাঁহার আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে রাষ্ট্রচালকদের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা। অবশ্য হেগেল ইহা স্বীকার করেন যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিধাতার ইচ্ছা সমানভাবে প্রকাশিত হয় না। তিনি তাঁহার সময়ের প্রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সে রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তথাপি তিনি তথাকার রাষ্ট্রচালকদের ইচ্ছাকেই বিশ্বস্রস্টার ইচ্ছা বলিয়া মনে করিতেন। তাই হেগেলের মতে রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের আইন সমূহকে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানিয়া চলা আবশ্যক। কারণ ইহা শুদ্ধবুদ্ধির প্রকাশরূপ। এই রাষ্ট্রদর্শনের মতে কোন সংঘের অথবা ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার নাই। মার্ক্সের রাষ্ট্রীয় মত ইহার পরিপন্থী। তিনি বলেন যে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাসক ও শাসিত এই দুইশ্রেণীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান। অবশ্য তিনি যখন এইমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন কোন সাম্যবাদী রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহার মতে শাসকশ্রেণী আপনাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারা আইন রচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের আইন কোন অমোঘ সত্যের প্রকাশরূপ নহে। শাসকশ্রেণীর হাতে মূলধন থাকায় তাহারা অর্থোৎপাদন ব্যাপারে শক্তিমান। তাই তাহারা সহজেই নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আপনাদের করায়ত্ত করিতে পারে। নিম্নশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপরিচালনের ভার আপনাদের হাতে গ্রহণ করে, সুতরাং ইহা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার অনুকূল। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালিত হয় নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করিয়া ও পরাধীন রাখিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। ফলে সমাজের দুইশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে জনস্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়। যে অর্থোৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি সেই অর্থোৎপাদন ব্যবস্থার ভিতরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অর্থোৎপাদনের শক্তির সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য অথবা দ্বন্দ্ব ক্রমেই বিষম হইয়া উঠে। এই দ্বন্দ্বের অবসান হইতে পারে তখনই যখন শ্রমিকশ্রেণী অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা আপনাদের করায়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা তখনই করায়ত্ত করিতে পারে যখন তাহারা বিপ্লবের সাহায্যে ধনিকদের হাত হইতে আপনাদের হাতে মূলধনের অধিকার কাড়িয়া

আনিতে পারে। এইরূপ বিদ্রোহের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হইতে পারে। এইরূপ সমাজে অর্থোৎপাদন শক্তির সহিত সমাজ-ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয় এবং শ্রমিকগণ আপনাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র জনগণের হিতার্থে রাষ্ট্রপরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে মার্ক্‌সীয় দর্শনের মতে রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ নির্ভর করে সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার উপর। হেগেলের দর্শন বিপ্লববাদের পরিপন্থী, কিন্তু মার্ক্‌সীয় দর্শন বৈপ্লবিক। তাই বার্ণার্ড-শ বলিয়াছেন যে সমাজবিজ্ঞান মার্ক্‌সের করতলগত, তিনি সমাজের গতি ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন করিয়াছেন, তিনি সমাজের পরিবর্ত্তনের কারণসমূহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ এর দিকে স্থাপিত। তিনি তাঁহার পথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন না এবং তিনি বিপ্লবের সাহায্যে কি প্রকারে সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত।

হেগেলের নৈয়ায়িক তত্ত্বসমূহ (ক্যাটিগরি) অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং ঐ সব তত্ত্ব মানব অভিজ্ঞতার বাস্তবজীবন হইতে বিশ্লিষ্ট। মার্ক্‌সের মতে ন্যায়ের তত্ত্বসমূহ সংগৃহীত করিতে হইলে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। একত্ব, বহুত্ব, সাদৃশ্য, অসাদৃশ্য, সমগ্রত্ব, অংশত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের ধারণা আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত করিতে পারিনা। হেগেলের ন্যায়শাস্ত্র মানবের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত হওয়ায় উহা মানবের বাস্তব চিন্তাধারাকে সুবিন্যস্ত করিতে পারে নাই। তিনি অতিপ্রাকৃত ধারণার সাহায্যে বাস্তবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছেন।

হেগেলের নীতিবাদও বাস্তবসত্যের উপর নির্ভরশীল নহে। তিনি সেই কর্ম্মসমূহকে নীতিসঙ্গত বলিয়াছেন, যাহারা বিশ্বস্রষ্টার কর্ম্মধারার সঙ্গে সুসঙ্গত। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার কর্ম্মধারা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের চলিয়া যাইতে হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে। মার্ক্‌সের মতে মানুষের নৈতিক ধারণা তাহার সামাজিক জীবনের উপর নির্ভরশীল। ইতিহাস অনুধাবন করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং মার্ক্‌সের মতে কোন নৈতিক ধারণাই চিরকালের জন্য সত্য নহে। মার্ক্‌সীয় দর্শনের মতে যে সব নৈতিক ধারণা প্রগতিশীল, যাহা অর্থোৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সুসঙ্গত, তাহাই গ্রহণীয় নৈতিক ধারণা। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যেসব নৈতিক ধারণার সাহায্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে পারি সেইসব নৈতিক ধারণাই গ্রহণীয়।

হেগেলের সত্য সম্বন্ধীয় ধারণা ও মার্ক্সের সত্য সম্বন্ধীয় ধারণা একরূপ নহে। হেগেলের মতে যে সব ধারণার ভিতরে সামঞ্জস্য আছে অর্থাৎ যে সব ধারণা মূলভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত তাহারাই সত্য। অবশ্য হেগেল কোন কোন সত্যকে উচ্চস্তরে এবং কোন কোন সত্যকে নিম্নস্তরে স্থাপন করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতে সত্যের উচ্চনীচ পর্য্যায় আছে। মার্ক্স কিন্তু সামঞ্জস্যকে সত্যের নির্ণায়ক মনে করেন না। তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষের অথবা ধারণার সত্য নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে সামাজিক ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সত্যকে চিরন্তন মনে করা ভুল। প্রত্যেক সত্যকেই যুগোপযোগী ব্যবহারিক জীবনের সাহায্যে প্রমাণিত করিতে হইবে।

হেগেল অসীমের ধারণার সাহায্যে সসীমের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। সেইরূপ তিনি চিরন্তন কালের ধারণার সাহায্যে বাস্তব কালের ধারণার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্ক্সীয় দর্শনের মতে অসীমের ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে সসীমের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা চলমান কালের সাহায্য ব্যতীত চিরন্তন কালের ধারণায় উপনীত হইতে পারি না।

এই সব বিষয়ে মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে হেগেলীয় দর্শনের মূলতঃ প্রভেদ। ইহা হইলেও মার্ক্স দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির জন্য হেগেলের কাছে ঋণী। হেগেল ও মার্ক্স উভয়েই জগৎকে গতিশীল মনে করেন। হেগেল ও মার্ক্স উভয়েই ক্যান্টের ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদের পরিপন্থী। হেগেল ও মার্ক্স উভয়েই স্বীকার করেন যে সমাজের অস্তিত্বের উপরই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে। উভয়েই সমাজকে ব্যক্তির উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। মার্ক্সীয় দর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ভাববাদী দর্শনের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে। হেগেল ও মার্ক্স উভয়েই বার্কলির আত্মসর্ব্বস্ব ভাববাদের ও হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের পরিপন্থী। সুতরাং মার্ক্স, তাঁহার স্বকীয় দার্শনিক মতবাদে উপস্থিত হইবার জন্য হেগেলের দার্শনিক মতবাদ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন।

ইহার পরে আমরা যখন মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আলোচনা করিব, তখন আমরা হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সঙ্গে মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পার্থক্য কি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবিতা

দ্বীপ শিকারীকে

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের দিনগুলো আজকাল কেবল আলোর
অনেক নরম রোদ ছড়াতে জানে।
অনেক সবুজ রোদ সাগরের জলের ওপর
চূর্ণ আকাশগুলো কুড়িয়ে আনে।

শরতের রাতগুলো আজকাল কেমন প্রেমের
ফুলের কুঁড়িকে ছুঁয়ে ফোটাতে পারে।
রবার পাতার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি একটি চাঁদের
অনেক চোখের ঘুম স্বপ্নে কাড়ে।

এমন শরত তবু এমন এমন কেন সব ;
তোমরা শিকারী কারা এদেশে এলে !
আমার সবুজ দ্বীপে আয়ুধ নামার কলরব,
লোহার জাহাজ ঘাটে নোঙ্গর ফেলে।

এমন শরতখানি আকাশের আলোর প্রেমের
আঘাতে আঘাতে ছিঁড়ে ছিটাবে কেন ?
দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো, আধ-চেনা বন্ধু দূরের
এ দ্বীপে শিকারে এসে লজ্জা মেন'।

সাদা পাখীরা

শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

সাদা পাখীদের পাখার ঝাপট দেখেছ কি তুমি ভাই,
শব্দ শুনেছ কানে ?
আলো সমুদ্রে বাস তাহাদের, আলোকের রোশনাই
তাই তাহাদের প্রাণে।
যে পথে তাহারা উড়ে যায় সেথা আলোয় আলোকময়,
—তমসা অপসৃত ;
মৃত্যুর দেশে এসে গেয়ে যায় নব-জীবনের জয়
সিঞ্চিয়া অমৃত।
শিকারীরা সব ওৎ পেতে থাকে লক্ষ্য করিয়া তীর
বক্ষ ভেদিতে চায়,
ফিরে আসে তীর আনে সাথে তার আলোকের পক্ষীর
রক্তের বন্যায় !
সাদা পাখীদের রক্ত দেখেছ ? তাদেরও রক্ত লাল
তোমার-আমারি মত ;
রক্ত আলোকে দেখাইয়া পথ, উড়ে যায় পালে পাল
শির করি উন্নত !
সাদা পাখীদের বচন শুনেছ, করণ দেখেছ চোখে
ধরণ দেখেছ ভাই ?
মর জগতের তিমির বিদারি উড়িছে অমরালোকে
মৃত্যু তাদের নাই।

একটি কবিতা

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

আজকে ঝড়ের রাতে এমনি ঝড়ের রাতে বাতায়নে বসে বসে হে রাজকুমারী !
একটি করুণ-সুরে একটি গানের কলি যদি আমি ছেড়ে দিই দুরন্ত-বাতাসে
দুরন্ত হাওয়ার খামে নিশাস্-লেখনি দিয়ে একটি কবিতা যদি লিখে দিই আমি—
সে সুর কি আচমকা
সে লেখা কি আচমকা
আনবে ঝড়ের দোলা প্রাসাদে তোমার ?
অনেক সাগর দোলা অনেক নাগর দোলা স্মৃতির জোয়ার—
তোমারে কি টেনে নেবে খোলা বাতায়নে ?
তোমারো কি ঘুমহারা কমল-নয়নে ঃ
মেঘের অরণ্য হতে অকস্মাৎ ঝিলিমিলি একটি বিজুলি
মনে করে দেবে সেই পুরানো জগত ?
যে জগতে রাজবালা—রাজার কুমার
ময়নামতীর কূলে মালা গাঁথে আর
আহা যেথা চাঁদিনীর মধু-উপবনে
রজনী পোহায়ে যায় কূজনে কূজনে··· !
আর যদি সে সময় একটি রাতের পাখী ডেকে উঠে অকস্মাৎ ঃ 'বউ কথা কও'—
আর সে সুরের সনে মিলে গিয়ে মোর সুর যদিবা শোনায় আরো অতি সকরুণ—
হয়ত বা বাতায়নে উতলা ঝড়ের বায়ে উড়বে তখন তব এলো কেশ-রাশ
হয়ত তখন তুমি মেঘ পানে চেয়ে চেয়ে ছেড়ে দেবে কত কত লোনা-নিশ্বাস···
যদি ছেড়ে দাও আর যদি মনে পড়ে যায় তা'হলে তোমারে কহি রাজকুমারী গো ঃ
তোমার কবরী হ'তে তুলে নিয়ে দু'টি ফুল রে'ঙে দিয়ে অধরের চুমায় চুমায়—
ছেড়ে দিও দলগুলি উতল-হাওয়ায়···।
ঘুম নয় জাগা নয় আধো ঘুম আধো জাগা এমনি কেমন এক অলস ক্ষণে
হয়ত শিয়রে মম ফ্রেমেবাঁধা ফটো তব ছড়ায়ে হাসির বান চপল নয়নে—
কথা কয়ে যাবে অবিকল
চুম দিয়ে যাবে অবিরল...।
আর যদি অকস্মাৎ স্বপন ভাংগিয়া যায়—ভেংগে যায়—ভেংগে যাবে—হয়ত তখন-
তারার সমুদ্র হ'তে মেঘের বন্দর হ'তে রূপার মতন সেই ঝলমল্ চাঁদ ঃ
ঘুম-ভাংগা বাতায়নে দাঁড়াবে আমার—
সে চাঁদ ত চাঁদ নয়—সে মুখ তোমার।

বাংলার সংস্কৃতি

প্রচলিত গানের কতক

মণিলাল সেনশর্ম্মা

বন্য ও অসভ্য মানুষের মধ্যে যে গানবাজনা ও নাচ পাওয়া যায় সে-গুলি আলোচনা করলে অতি আদিম কালের সঙ্গীত কিরূপ ছিল তার একটু আভাস যেমন আমরা পাই আবার মানুষের মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কি কি ভাবে সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে তারও কতক নিদর্শন আমরা পাই। যে কোন অসভ্য সমাজের সঙ্গীত আলোচনায় দেখা যাবে যে সুরের আবেদন তাদের মধ্যে পরে এসেছে; প্রথমে এসেছে তাল, তারপর নাচ। সাওতালদের সঙ্গীতে দেখা যায় যে সুর বড়ই একঘেয়ে। মাদল (প্রাচীন নাম—মর্দ্দল) বাজনাই প্রধান; তার উপরই সকলের দৃষ্টি ও পরে নাচের লোভ। আফ্রিকার বন্যদের গানবাজনা নাচের আসরে দেখা যায় যে সার বেঁধে স্ত্রীপুরুষ অনেকে দাঁড়ায়। একজন একটা বিরাট আকারের নাগরায় বেশ বড় ও মোটা কাঠি দিয়ে একটানা ঘা দিতে থাকে। তার সঙ্গে সকলে হাতে তালি দেয়; আর চীৎকার করে একই সুরের পুনরাবৃত্তি করে। তাছাড়া এক তালির সঙ্গে সকলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আবার আর এক তালির সঙ্গে শরীর সোজা করে। এই তাদের সঙ্গীত। আন্দামানের অসভ্যদের দেখা গেছে একটা বড় তক্তা গাছে ঝোলানো, তাতেই কাঠি দিয়ে আওয়াজ করছে। আর তাকে কেন্দ্র করেই একটানা সুর ও নাচ চলছে। এমন প্রমাণ আরও দেওয়া যায় যে অসভ্যদের মধ্যে তালকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তারপর নাচ, তারও অনেক পরে সুর এসেছে। শুধু অসভ্যদের মধ্যে কেন আমাদের খুব নীচু স্তরের মধ্যেও যে বাজনা নাচ গান রয়েছে তাতেও তাল আর তালযন্ত্রের প্রতি ভক্তিই প্রমাণ করে যে সুরটুকু তাদের কাছে কিছুই নয়। হোলির আগে যে রামাহো রামাহো চলতে থাকে তাতে দেখা যায় একটি বা দুটি ঢোলক মাঝখানে রেখে তার চারদিকে বসে এই বাদ্যযন্ত্রটি কপালে ঠেকিয়ে কেবল রামাহো রামাহো সুর করে বলা হয়। গান না হয়ে তা কোলাহল হয়ে উঠ্‌ল কিন্তু তাতে কি হয়, তাল ঠিক আছে তো। এই যে তালের বাধাবাধি ও সুরের স্বল্পতা সেটিই অসভ্য সঙ্গীতের লক্ষণ। সভ্যতার সঙ্গে

সঙ্গে মন সুকুমারত্ব যত অনুভব করতে থাকে সুরের কাজ বেড়ে যেতে থাকে তাল কমতে থাকে। কাজেই যে-সঙ্গীতে তালের বন্ধন বেশী ও জটিল সে-সঙ্গীত ততই নীচু।

অসভ্যদের সঙ্গীতযন্ত্রগুলি প্রথম সৃষ্টি হয়েছে। তাল দেওয়ার যন্ত্রগুলিই প্রথমে সৃষ্টি করে তারা তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। প্রথমে শুধু কাঠ বাজিয়েছে কত শত বৎসর—তার কে খবর রাখে। তার অনেক অনেক পরে নাগারা, ঢোলক মাদল জাতীয় যন্ত্রগুলি আবিষ্কার করেছে। বন্য পক্ষীর ডাকগুলি অনুকরণ করার জন্যই বাঁশ দিয়ে বাঁশী তৈয়ার করেছিল অসভ্য মানুষ। তার অনেক পরে সেগুলি সঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে বলে তাণ্ডব ও লাস্য কথা দুটির আদ্যপর নিয়ে তাল কথাটির সৃষ্টি। কিন্তু হাত তালি হতে তাল শব্দটির প্রথম উৎপত্তি হয়েছে যারা বলে তাদের কথাই যুক্তিযুক্ত কেন না দুটিই অনেক পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি।

পাট-ধান ক্ষেতের মধ্য হতে, নদীতে মাঝির মুখ হতে হাটে যাওয়ার পথে যে-সব গান ও সুর এই বাংলা দেশে শুনতে পাওয়া যায় সে গুলির সংখ্যা ও শ্রেণী কম নয়। কত পল্লীর কত অজ্ঞাত-স্বভাব কবি ও সুর-রচয়িতার আন্তরিক যত্নে ও চেষ্টায় কতকাল ধরে রচিত হয়ে হয়ে বর্ত্তমান আকার ধরে সাধারণের আবেগকে সুরে প্রকাশ করেছে তার সঠিক ইতিহাস জানা নেই। নানা উদ্দেশ্যে গান বাজনা নাচ হতো এবং এখনও হয়; বাংলার লোকসঙ্গীতও সেভাবেই নানাশ্রেণীভুক্ত হয়ে আছে। যেমন ধরা যাক সারি গান। একই রকমের ঝোঁক রাখবার জন্য একটি সহজ তালে সারি গান বাঁধা হয়। গানের গতি দ্রুত অথবা বিলম্বিত হয়। বর্ষায় পূর্ব্ববঙ্গে নদীতে অথবা বড় বিলে ছিপ নৌকার বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। সে সময় তালে তালে বৈঠা ফেলবার সুবিধার জন্যেই সারি গানের উৎপত্তি, ছাদ পিটাতে এই গানের সাহায্যই নেওয়া হয়ে থাকে; বড় ঘটনা, দেশের অবস্থা, চলতি সংবাদ প্রভৃতি নিয়ে গানের কথা রচিত হয়। প্রথমে একজন গানের একটি পদ গায় পরে সেই পদটি সকলে গেয়ে থাকে।

ভাটিয়ালী গান একটু টেনে টেনে বিলম্বিত গতিতে গাওয়া হয়। একজনেই গায়, তবে অনেকে একত্রে গাইতেও আপত্তি নেই। স্রোতের টানে যখন নৌকা আপনিই চলতে থাকে অথবা পাল খাটিয়ে দিয়ে মাঝি যখন হাল ধরে স্রোত ও হাওয়াকে খুব পরিশ্রম করিয়ে নিয়ে নিজের শ্রম কমিয়ে নেয় তখন যে গান মাঝিরা করে সে গানই ভাটিয়ালী। কায়িক পরিশ্রম যখন থাকেনা টেনে টেনে সুর বিলম্বিত করা তখনই সম্ভব হয়। ধান কাটতে কাটতে বিশ্রাম নেওয়ার সময়ও ভাটিয়াল গানই সম্ভব হয়। সুরকে যন্ত্রধ্বনির সাহায্যে আরও মধুর করার দিকে লক্ষ্য ভাটিয়াল গায়কের ইচ্ছা থাকলেও মনের আবেগকে

শুধু সুরে ফুটিয়ে তোলাই ভাটিয়ালীর লক্ষ্য। ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তু দেহতত্ত্ব, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন। ভাটিয়ালী সুরের বাঁধুনী একা গাইবার পক্ষেই প্রশস্ত।

সহজ কথায় ভগবানের সঙ্গে সমান সম্পর্ক স্থাপন, দেহতত্ত্ব, ঈশ্বরভক্তি, ভগবানের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির বর্ণনা করে বাউল গান। গানে মন্দিরা, খঞ্জনী, গোপীযন্ত্র, আনন্দ-লহরী বা খমক, বাঁশী, সারিন্দা প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর এই সব যন্ত্র দিয়ে বাউল দল গঠিত হয়। বাজিয়ে সকলে গানও গায়। এদের মধ্যে একজন মূল গায়ক থাকে। বাউলের দল পর পর অনেকগুলি গান গেয়ে থাকে, বাউল লোকসঙ্গীতের মধ্যে মার্জ্জিত গান।

ঝুমুর গানের গোড়ার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে সাওতালদের গান তাদের আশে পাশে অবস্থিত নীচুজাতিগুলি দিয়ে ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত হয়ে ঝুমুর আলাদা শ্রেণী হয়ে গিয়েছে।

চৈত্র মাসে শিবের পূজা উপলক্ষ্যেই গাজন গানের উৎপত্তি। এতে গান আছে, নাচ আছে, বাজনা ত আছেই। এই উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে যে হরগৌরী নৃত্য হয় তার সঙ্গে যে নৃত্য-উপযোগী বাজনা থাকে তাতে ঢাক বাজে। সে সময়ে যে সব গান হয় তাতে শিবকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়, সেগুলি গ্রামের সাধারণ লোকের খুবই উপভোগের বিষয়। শ্যামা পূজায় গ্রামে গ্রামে যে কালিকা নৃত্য হয় সেটিও একটি প্রাচীন রীতি। সে নাচকে বীরব্যঞ্জক করে তুলবার জন্যই বিশেষ করে ঢাক বাজে। বর্ত্তমানে সব পূজায়ই এই একই ধরণের যন্ত্র বাজে। সরস্বতী পূজায় ও শুধু কালী পূজার তাল ঢাক দিয়েই বাজানো হয় বলে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাজনার আর কোন সম্বন্ধ থাকেনা।

গম্ভীরা গান শিবকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়। বুড়ো শিব, দিগম্বর শিব; আপন ভোলা শিবকে নিয়ে গান বাঁধা পূর্ব্বে হলেও বর্ত্তমানে পল্লীজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়েও গান হয়। বৌদি ননদীর কথাবার্ত্তা হাসিঠাট্টা নানাবিধ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়েও গান বাঁধা হয়। এই শ্রেণীর গানে একটু চিন্তা আছে বলে গম্ভীরা গান মার্জ্জিত। এই শ্রেণীর গানে গোপীযন্ত্র খঞ্জনী আনন্দলহরী বা খমক ইত্যাদির ব্যবহার হয়।

দেশের নানাবিধ সংবাদ, প্রসিদ্ধ ঘটনা, খ্যাতনামাদের জীবন-কাহিনীর ছড়া রচনা করে অথবা রামায়ণ মহাভারতের পদ্য সুর করে বাড়ী বাড়ী গেয়ে দু'একজনের জীবিকার্জ্জন করার প্রথা প্রাচীনকাল হতেই ছিল। তাদেরে বলা হতো ভাট্। এখন ভাট্ নেই। তারপর কথকতা আসে। পুরাণের নানাকাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কথা শুনানো কথকতার উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কাহিনী উপযোগী কোন কোন ধুয়া, সুপ্রচলিত বাউল মালশী গানের দুএকটি পদ, ঢপকীর্ত্তনের একটু আধটু সুর ও কথা ব্যবহার করে

কথকতা সরস করে তোলা হতো। কথকতা এখন আর নেই বললেও চলে। কথকতা একা একজনেই করে সকলে শুনে।

পাঁচালি পড়ার রীতি আগে বাংলায় বিশেষ ভাবে থাকলেও এখন খুবই কমে গিয়েছে। পদ্মপুরাণ পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে শ্রাবণ মাসে আগে পড়া হতো। তাতেও নানারূপ ধুয়া, কীর্ত্তনের একটি পদ গাওয়া হয় বৈচিত্র্য আনবার জন্য; পাঁচালি পড়াকে খোলকরতালের সাহায্য নিয়ে সমবেত গানের উপযোগী করা হয়। পাঁচালিতে অনেকে যোগ দেয়। ভাট্দের ছড়া গান করতে বেশী সময় লাগে না। কথকতার আসর পাতা হয় ও বেশী সময় লাগে। পাঁচালিতে আরও অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়; একদিনেও হয় না। পর পর রোজ একটা সময়ে পাঁচালি পড়া আরম্ভ করা হয়ে থাকে এবং আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেশ সময় দরকার।

কবিগান এক সময়ে খুব প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে ততটা নেই। কবিগানের দল পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে এক একটি পালা করে, তাছাড়া দুই কবির কবিতায় কথা কাটাকাটি তখনকার দিনে খুবই উপভোগ্য ছিল। এরূপ লড়াইএর ফাঁকে ফাঁকে যে গানগুলি হয় সেগুলি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়েও রচিত হয়ে থাকে। এই গানগুলির সুরের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কবিগানে ঢোল ব্যবহার হয়। ভাট পাঁচালি কথকতা ও কবিগানের মধ্যে কথকতা ও কবিগানের চিন্তা ও যত্ন আছে বলে উৎকর্ষের ছাপ পাওয়া যায়।

কীর্ত্তন খুব প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে। চৈতন্যদেব কীর্ত্তনকে নতুন আকারে পরিবেশন করেন। কীর্ত্তন এই সময়ে বহুল প্রচলিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা একত্রে সংকীর্ত্তন গান করে। আর এই সংকীর্ত্তন গেয়ে নগর প্রদক্ষিণ করার প্রথা তখন প্রচলিত হয়। এই বিপুল কণ্ঠ-সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গৎ করার সুবিধার জন্য খোল যন্ত্রটি মহাপ্রভু আবিষ্কার করেন। খোল আর করতাল সংকীর্ত্তনের প্রাধন অঙ্গ। নামকীর্ত্তন পদ্ধতি চৈতন্যদেবের সময়েই আরম্ভ হয়। ধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার। আর নাম-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব বলে মনে করেই নাম কীর্ত্তন প্রথা আরম্ভ।

লীলাকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করে হয়। জন্মলীলা, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, ঝুলন, মান, বিরহ ইত্যাদি নানা পালা হয়ে থাকে। নানা পদ রচয়িতা নানাবিধ গান রচনা করে কীর্ত্তনকে সমৃদ্ধ করেছে। তার ফলে গরাণহাটি মনোহরসাহী রণেটি ও মন্দারণ নামে চারটি পৃথক গীতশ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে। এ গুলিতে সুর, ছন্দ ও গতির পার্থক্য রয়েছে। কীর্ত্তনের এক একটি পালা এক একটি পৃথক পালা হলেও যাত্রায় পালার যেমন গান ও কথোপকথন নির্দ্দিষ্ট থাকে কীর্ত্তনের পালা তেমন নয়, কীর্ত্তন গায়ক বিভিন্ন পদকর্ত্তার নানা পদ বেছে নিয়ে সেগুলিকে পালার আকারে সাজিয়ে নেয়। অন্য সঙ্গীতের

সঙ্গে কীর্ত্তনের একটি পার্থক্য যে কীর্ত্তনে গায়ক তার ইচ্ছামত অলংঙ্কার (আঁখর) যোগ করে। গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য গায়ক কথার অলংঙ্কার যোগ করে। এই কথার সঙ্গে সুর আর ছন্দও পরিবর্ত্তনকারীর দরকার হয়। হিন্দুস্থানী খেয়ালের তান সুর ও ছন্দে রচিত হলেও তা কথাই—কথার অন্তর্নিহিত ভাব তাতে নেই।

কীর্ত্তন ছোট আকারে সাজিয়ে ঢপকীর্ত্তনের সৃষ্টি হয় একশ বৎসর আগে। কীর্ত্তনের অবনতি আরম্ভ হবার অনেক পর হিন্দুস্থানী গানের বিশেষ করে টপ্পার ছাচে যে কীর্ত্তন গান বৈঠকী গানের অনুরূপ আকৃতি অবলম্বনে রচিত হয়েছিল তাকেই বলা হয় ঢপ কীর্ত্তন। ঢপে সুরের বিশিষ্টভঙ্গী রয়েছে। কিন্তু বৈঠকীগানের রীতি হলেও গানের মাঝে মাঝে কথা ব্যবহার করার রীতি আছে।

শ্যামাভক্তদের গান মালশী গান নামে খ্যাত। কোনও সময়ে মালশ্রী রাগিনীতে শ্যামা-বিষয়ক গান বাঁধা হতো বলে এখন সিন্ধু রাগিনীতে সে-গান বাঁধলেও সেটি মালশীই বলবে সবাই। রামপ্রসাদী গানও এরূপ মালশীগান। এককালে মালশীগান বাংলার ঘরে ঘরে ছিল। শ্যামাভক্তির অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে মা ও ছেলের সম্বন্ধ ঠিক রেখে অনেক বাউল গান এখনও প্রচলিত আছে।

নিধুবাবু বাংলায় টপ্পা-গীত পদ্ধতিতে কালী বিষয়ে যে গান রচনা করেন সে-সব গান উৎকম গান বলে মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে গীত হতে থাকে। তখন হতেই বায়াতবলার উপযোগী টপ্পার আকারে সহজ তালে সে-সব গান কালীকে নিয়ে রচিত হয়। সেগুলিকে বৈঠকী শ্যামা-গীত বলা যায়। এমন অনেক রচয়িতার অনেক গান এক সময়ে খুব প্রচলিত ছিল। এখনও গ্রামে গ্রামে কতক প্রচলিত আছে। বাংলা গান গ্রামোফোন রেকর্ড আরম্ভ হলে প্রথমে তখনকার এই সব জনপ্রিয় গানই রেকর্ড করা হয়েছিল।

ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা যে সময়ে আরম্ভ হয় সে-সময়ে রাজা জমিদারদের বাড়ীতে উত্তর ভারতীয় ধ্রুপক গানের চর্চ্চা খুবই চলছে। কীর্ত্তন ও বৈঠকী শ্যামা গান ব্রাহ্মসঙ্গীতের ভাব দিতে পারে না বলে ধ্রুপদ গানের সুর ও তাল হুবহু রেখে তার হিন্দী ও ব্রজবুলি কথাগুলির পরিবর্তে ব্রাহ্মসঙ্গীতোপযোগী বাংলা কথা বসানো চলতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই কাজ আরম্ভ করেন। প্রচলিত বহু ধ্রুপদ গানের এবং তারপরে খেয়াল-গানের হুবহু সুর রেখে বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মসঙ্গীতে সবগুলিই রয়েছে। এতে বাংলাদেশে উত্তরভারতীয় ধ্রুপদ ও খেয়ালের সুর বাংলায় রয়ে গেল।

জমিদার, মধ্যবিত্ত আর নিম্নশ্রেণী এই তিন বিভাগ অনুযায়ী বিগত শতকের সঙ্গীত চর্চ্চায়ও তিনটি ভাগ ছিল। রাজাজমিদারগণ মুঘলরাজ-দরবারকে অনুকরণ করতে থাকে; আর উনিশ শতক পর্য্যন্ত রাজা জমিদারদের সঙ্গীত অনুশীলন ও ধ্রুপদ খেয়াল

টপ্পা আর উত্তর ভারতীয় ওস্তাদমণ্ডলীকে নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। জমিদারদের বাড়ীতে অন্যশ্রেণীর সঙ্গীত চর্চ্চা হতো না। অন্যশ্রেণীর গায়কবাদককে কোন কোন সময়ে উৎসাহিত করা হলেও উত্তরভারতীয় সঙ্গীতের দিকেই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। অভিজাত শ্রেণীভুক্তগণ যা আলোচনা করে সেটিই অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। সঙ্গীতের অনুশীলনেও উত্তরভারতীয় সঙ্গীত বাংলায় অভিজাত সঙ্গীত হয়ে পড়ে। তার জের এখনও চলেছে। অন্যশ্রেণীর সঙ্গীত তো সঙ্গীতই নয়; সেটিই সঙ্গীত যা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ফরমুলায় পড়ে—এরূপ মনোভাব বর্ত্তমানে কমতে থাকলেও এখনও রয়েছে। রাজা-জমিদারদের দরবারে যারা গায়কবাদক তাদের কেউ অভিজাত সম্প্রদায়ের নয়। সবই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত; দরবারে সঙ্গীত বিতরণ করে জীবিকা উপার্জ্জন করে। কিন্তু রাজাজমিদার এবং ধনীলোকও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাদের মনোমত সঙ্গীত দিয়েই সে-সময়ে আমোদ বিতরণের ব্যবস্থা করে দিত। নিজেদের জমিদারীর মধ্যে উৎসবে মেলায় পূজাপার্ব্বণে আমোদের ব্যবস্থায় তখনকার দিনে বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায় কবি-গানের দল, কীর্ত্তনীয়ার দল, যাত্রার দল, বাইজির দল প্রভৃতি গীতবিতরণী দলগুলিকে নেওয়া হতো। কিন্তু এসব গানের চর্চ্চা নিজেরা করত না। নিজেরা হিন্দুস্থানী ওস্তাদ রেখে তাদেরই অনুকরণ করা আভিজাত্যের অঙ্গ মনে করত, নিজেদের গণ্ডী বজায় রেখে সঙ্গীত চর্চ্চা করত।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চা করা গত শতকে কেউ শুভদৃষ্টিতে দেখত না। গায়কবাদকের অবস্থা খুবই পঙ্কিল ছিল। সেজন্যে গান বাজনার চর্চ্চা খুবই অশ্রদ্ধার চোখে সবাই দেখত। তবে কীর্ত্তন ও টপ্পার ধরণে মালশীগান মধ্যবিত্তগণ তাদের নিজেদের মধ্যে চর্চ্চা করত নিজেদের গণ্ডী বজায় রেখে।

বাকী গান সব নীচু স্তরের গান—ঝুমুর গাজন গম্ভীরা, সারি ভাটিয়ালী বাউল ইত্যাদি সবই চাষী মজুরদের গান হয়ে আছে। কিন্তু সবসময়েই প্রত্যেক অঞ্চলে এক একজন স্বভাবকবি সুরকার জন্ম নিয়েছে, আর এইসব শ্রেণীর গানকে জীবিত রেখেছে। কিন্তু একসময়ে অভিজাত শ্রেণীর লোক এমন কি মধ্যবিত্তগণও এসব শ্রেণীর গানকে হেয় চক্ষেই দেখেছে।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মেয়েলী গান একটি প্রাচীন রীতি। বড়লোকদের বিয়েতে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে পেশাদার বাজিয়ে গাইয়ে ও নর্ত্তকী আসে। মধ্যবিত্তদের বাড়ীতেও পেশাদার বাজিয়ে আসে। তাদের সানাই, ঢোল ইত্যাদির বাজনা চলে; আর দু একটি আধুনিক বাংলা গান বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের মধ্যে দু একটি মেয়েছেলেদের গান বাসরে, ফুলশয্যায় করা হয়। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর বিয়েতে মেয়েদের গান না

হলে তো বিয়ের নিয়মআচার সব সম্পূর্ণ ই হয় না। অধিবাসে (গায়ে হলুদ), বিয়ের যাত্রায়, সপ্তপ্রদক্ষিণকালে, বাসরঘরে, বিদায়কালে, বরণ করার সময়ে, ফুলশয্যায় প্রত্যেক সময়ের বিভিন্ন মেয়েলীগান আছে। এগুলি চার পাঁচ জনে একত্রে গান করে। এসব গানের কথা বিশেষ করে রামচন্দ্রকে নিয়ে রচিত। বিয়েতে নানারূপ মেয়েলী আচারের মধ্যে পাড়া-পরশীদের নাচ এখন পর্য্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে। এইসব গান বাউল ভাটিয়ালী গাজন ইত্যাদির সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না—যদিও ঐসব গানের সুর ও কাঠামোতেই তৈরী ; তবে এখন নতুন গান আর তৈরী হয় না বলেই মনে হয়।

গত শতক পর্য্যন্ত বাংলার প্রায় সব গান ধর্ম্মকে অবলম্বন করেই সৃষ্ট হয়ে এসেছে। শৈব সম্প্রদায়ের গাজন, গম্ভীরা, সহজসন্তদের বাউল ভাটিয়ালী, শাক্তদের মালশী, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন, ঢপ, উত্তরভারতীয় ধ্রুপদ-খেয়ালের সুর নিয়ে ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা হয়েছে। কিন্তু কালের স্রোতের টানে কোন কোন পদ্ধতি পঙ্কিল হয়ে গিয়েছে ; আবার কোন কোন শ্রেণীর এখনও কতক উৎকর্ষ চল্‌ছে। যা হোক এই বিশ শতকের প্রথম হতে বাংলায় সঙ্গীতের একটা নতুন রূপের সৃষ্টি হয়। সে সঙ্গীত ধর্ম্ম বাদ দিয়ে প্রথমে নাটককে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হতে থাকে। আর প্রথম অবস্থায় নাটুকে গান বলে অবজ্ঞাও পেয়েছে অনেক।

আধুনিক বাঙালীর মন

নারায়ণ চৌধুরী

বাইরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের ধরণ-ধারণও বদ্‌লায়। মনের দিক থেকে আমরা আজকের দিনের বাঙালীরা আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে অনেক পেছনে ফেলে চ'লে এসেছি। নানা বিপর্যয়কর অবস্থার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনধারণ-পদ্ধতিতে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েচে সে সম্বন্ধে সবাই আমরা অল্পবিস্তর সচেতন, কিন্তু তার কারণগুলি অনুসন্ধান করে দেখছি না। কিম্বা কী কী বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মনের এই পরিবর্তন ঘটলো তাও বিচার করছি না। আমাদের ইতিহাসকারদের দৃষ্টি শুধু বাইরের ঘটনাতেই আবদ্ধ ; কিন্তু আধুনিক বাঙালীর মনের ইতিহাস আড়ালেই পড়ে রইলো।

মনের ক্রিয়াকলাপ চোখে দেখা যায় না ব'লে বরাবরই আমরা মনকে পেছনে ফেলে রেখে ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছি। ঘটনা চোখে দেখা যায়, তার ফলাফলটাও প্রত্যক্ষ ;

তাই ইতিহাসকর্তার বিচারে ঘটনাই প্রধান। মনকে নিয়ে নাড়াচাড়ার অনেক অসুবিধে : সূক্ষ্ম পথে তার সঞ্চরণ, ততোধিক সূক্ষ্ম তার প্রতিক্রিয়া, সমাজের উপর ফলাফলটাও তার আপাতত প্রত্যক্ষ নয় ; তাই সাধারণত মনকে বাদ দিয়েই আমাদের হিসাব।

কিন্তু এ হিসাবে অনেকখানি ফাঁক থেকে যায়। মনকে বাদ দিয়ে যে সমাজ-বিশ্লেষণ, তা একতরফা বিশ্লেষণ, অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ। মানুষের মৌলিক বিচারে ঘটনা প্রধান নয়, মনই প্রধান। অবশ্য একথা ঠিক যে ঘটনার গতি মনকে প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু সমস্ত রকম ঘটনাই মনের বাহ্যিক প্রতিফলন মাত্র। এইটে যদি মনে রাখি তা হ'লে দেখবো সব কিছুর পেছনেই মন নামক পদার্থটি কাজ করে যাচ্ছে, তা সে ভাববাদী কথিত মনই হোক আর জড়বাদী কথিত মনই হোক। মানুষের মনের বিচারই আসল বিচার, ঘটনার বিচার তার পরে। কিন্তু মনকে পেছনে ফেলে রেখে যাঁরা ঘটনাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেন তাঁরা এই প্রক্রিয়াটাকে উল্টে' দিচ্ছেন, অর্থাৎ, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়তে চাইছেন।

আমরা ঠিক এই ভুলই করছি। মন চোখে দেখা যায় না বলে সে সম্বন্ধে আলোচনায় কিছুটা অনুমান কিছুটা কল্পনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা লেখকরা নাকি বড়ো বেশি হুঁসিয়ার, পাছে অনুমানের উপর নির্ভর করতে গিয়ে ভুল করে বসি সেই ভয়ে মনকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন আমরা বাঁচি ; আমাদের সমস্তটা ঝোঁক গিয়ে পড়ছে ঘটনার উপর। এটা যে শুধু ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বেলাতেই ঘটছে তাই নয় ; কথা-সাহিত্যেও এই ত্রুটিটুকু সমান প্রকট। ঘটনাই সেখানে পনেরো আনা জায়গা জুড়ে আছে ; সেই তুলনায় মন প্রায় অনুপস্থিত বললেও চলে। যুদ্ধের ছ'টা বৎসর বাংলার শহর ও পল্লী জীবনের উপর দিয়ে কী কী ঝড়-ঝাপটা গেছে ; কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় বন্যা, কোথায় মহামারী, ১৩৫০-এর মন্বন্তরে কারা বেঁচেছে কারা মরেছে ; বস্ত্রের অভাব ও দুর্মূল্যতা, রেশন, কন্‌ট্রোল, কালাবাজার, মজুতদারী প্রভৃতি সম্পর্কে অজস্র ঘটনাসম্বলিত গল্প লেখা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত যে মন আমাদের নিতান্ত চেনা, যে মন আমাদের নিজেদেরই মন, সেই মনের পরিচয় তাতে কোথায় এবং কতোটুকু? সংবাদপত্রের আলোচনাও ঠিক একই দোষে দুষ্ট—সেখানেও দেখি ঘটনার সূত্র অনুসরণ করার দিকেই কেবল ঝোঁক, মন নামক পদার্থটি যে ঘটনার বোঝার তলায় একেবারেই চাপা পড়ে গেলো সেইদিকে সম্পাদক বা প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতার একেবারেই খেয়াল নেই। সংবাদপত্রের পক্ষে তবু বল্‌বার এই যে প্রত্যক্ষ ঘটনা নিয়েই তার কারবার, মানুষের মনের রাজ্যের উপর আলোকপাত করবার তার কথা নয়। তবু যেভাবে আমরা সমস্ত রকম আলোচনা থেকে মনের খবরাখবর বরবাদ করে চলেছি তাতে আপত্তি না জানিয়ে পারি নে।

আলোচ্য প্রবন্ধে আধুনিক বাঙালীর মনের দিকটির সামান্য একটুখানি পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনায় মন প্রত্যক্ষ, ঘটনা অপ্রত্যক্ষ। 'সংস্কৃতি' কথাটিকে যদি তার প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি তা হ'লে হয়ত এই আলোচনার কিছু কিছু অংশ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবান্তর মনে হতে পারে; কিন্তু সমস্ত সংস্কৃতির উৎস যদি মন হয় আর সেই মনের বিশ্লেষণই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তা হ'লে ব্যাপক অর্থে সেই সেই অংশকে সাংস্কৃতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত না করে আমরা পারিনে। এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ অল্পবিস্তর impressionistic, তাই আলোচনার ধারায় বহু-পরীক্ষিত সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করার সুবিধা হয় নি। লেখাটিতে যে সব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে লেখক কোনরূপ অভ্রান্ততা দাবী করছেন না; রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী কেউ তাদেরকে মানবেন, কেউ মানবেন না।

এই প্রায় ছয় বৎসরের যুদ্ধের ফলে বাঙালীর মানসিক জীবনে সব চেয়ে যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হচ্ছে এই, বাঙালী অত্যাশ্চর্য রকমের স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। স্বার্থপরতা যুদ্ধপূর্ব বৎসরগুলিতেও বর্তমান ছিল, কিন্তু তা এমন উগ্র হয়ে কখনও আত্ম-প্রকাশ করেনি। এর মূলে অভাব অনটন দৈন্য এ সব তো আছেই, তার চাইতেও যেটা বড়ো কথা, বাঙালীর বিবেক-জীবনের ভিত্তিই একেবারে ধ্বসে গেছে। শুধুমাত্র অভাব অনটনে মানুষকে এতোটা আত্মকেন্দ্রিক করতে পারে না যদি না তার পেছনে সর্বগ্রাসী frustration-এর চেতনা থাকে। যুদ্ধ সেই frustration-কেই বাঙালী জীবনের সর্বক্ষেত্রে চিহ্নিত করে রেখে গেছে; সেই কলঙ্কলাঞ্ছন মুছে ফেলতে আমাদের আরও বহুদিন কেটে যাবে।

মানুষ স্বার্থপর হয় কখন? মানুষ স্বার্থপর হয় তখুনি যখন দৈন্যে ও দুঃখে নিজেকে নিয়ে ভাবা ছাড়া তার আর পথ থাকে না। নিজেকে সামলাতেই যার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা ব্যয়িত হ'লো সে অপরের কথা ভাববে কখন? সেই উদ্বৃত্ত সময় তার কোথায়? আধুনিক বাঙালীরও ঠিক এই অবস্থা ঘটেছে। দুঃখ তাকে সমস্ত দিক থেকে এমন আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে যে তার সমস্ত ধ্যান ও সাধনা, চিন্তা ও কর্ম নিজেকে কেন্দ্র করেই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে—স্বার্থের কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও বলা যায়, স্বার্থের উর্দ্ধে উঠবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক বাঙালী আরো অতিরিক্ত স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।

সচ্ছলতার অবস্থায় প্রয়োজন সহজেই সিদ্ধ হয় ব'লে মানুষের নিজের সম্বন্ধে ভাববার উপলক্ষ ঘটে কম আর সেই অনুপাতে মনোযোগ বেশি গিয়ে পড়ে অপরের উপর। প্রাচুর্য স্বার্থপরতাকে বাড়ায় না, কমায়। বাঙালী জীবনে এই প্রাচুর্য ক্ষয়ে ক্ষয়ে তার শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁচেছে, তাই সমাজের সর্বস্তরে স্বার্থপরতা আজ এমন উলঙ্গ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ

করেছে। কল্‌কাতায় যখন হাজার হাজার লোক রাস্তায় ফুটপাতে মুখ থুব্‌ড়ে মরেছে তখন আমরা কল্‌কাতাবাসীরা রাজধানী কল্‌কাতাতেই ছিলুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু করতে পারি নি। জীবনধারণের নিম্নতম মানটুকুর কাছাকাছি পৌঁছুতেই যাদের প্রাণান্ত তাদের চোখের সাম্‌নে কে মরলো কে বাঁচলো কে তার হিসাব রাখে—তাই পঞ্চাশের মন্বন্তর কল্‌কাতার সাধারণ নাগরিকদের কাছে আজ পর্যন্ত একটা স্বপ্ন হ'য়েই রইলো, বাস্তব হ'য়ে উঠ্‌তে পারলো না। দুঃখের পীড়নে মানুষ এম্‌নি নীতিভ্রষ্ট হয় যে কর্তব্য পালন করা দূরে থাকুক, কর্তব্যজ্ঞান পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়। ১৩৫০ সালের বাঙালী সেই নীতিভ্রষ্টতার নিম্নতম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁচেছিল, কল্‌কাতার বিবেকহীন মনুষ্যত্বই তার সাক্ষ্য।

এ তো গেলো একদিকের হিসাব। আবার তার একেবারে উল্টো লক্ষণও চোখে পড়ে। দেখা যায় দুঃখের পীড়নে বাঙালী একদিকে যেমন আত্মকেন্দ্রিক হ'য়েছে, তেমনি দুঃখের দহনে জ্ব'লে পুড়ে আবার সে অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণ হ'য়েও উঠেছে। গত কয়েক বৎসরে নতুন ভাবে নতুন কথা সে অনেক ভাব্‌তে শিখেছে—সে ভাবনা গতানুগতিকার প্রভাবমুক্ত, বলিষ্ঠ, নিরাবেগ ভাবনা। এই চিন্তাশীলতাকে নির্জীবতার লক্ষণ মনে করলে ভুল করা হবে—অজস্র বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সেই চিন্তাশীলতার মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর তা যে শুধু কথার কথা নয় গত নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসের কল্‌কাতার রাস্তায় পুলিশের গুলীর সাম্‌নে বাঙালীর ছেলের বুক পেতে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্তের মধ্যেই বারে বারে সেকথা প্রমাণিত হয়েছে।

এই যে মহৎ লক্ষণ বাঙালীর সাতমাসের ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা প্রকটিত দেখতে পাই তার সঙ্গে একটু আগের স্বার্থপরতার অভিযোগকে অনেকেই খাপ খাওয়াতে পারবেন না জানি—কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ইতিহাস এই আলো-আঁধারেরই খেলা। সেখানে সব কিছুই সাদায় কালোয় মেশানো—কোনো কিছুই নিরবচ্ছিন্ন সাদা বা নিরবচ্ছিন্ন কালো নয়। তাই একই ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক, আবার জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সাহস ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, এইরূপ সমাবেশ আজকের বিপর্যয়কর অবস্থায় কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। বরং এইটেই স্বাভাবিক, এইটেই রীতি। দেশের পরিস্থিতিটাই এমন হয়ে উঠেছে যে, যে লোক ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য স্বার্থ পর্যন্ত ত্যাগ করতে নারাজ সেই আবার জাতীয়তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্যে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত—এই অদ্ভুত, আপাতবিরোধী সংঘটন আজকের দিনে মোটেই অবিশ্বাস্য মনে হয়না। আরও তথ্যগত ভাবে বল্‌লে, যে ছেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে এতোটুকু দ্বিধা করে নি, আশ্চর্য নয় সেই হয়তো কিছুক্ষণ আগে কাপড়ের রেশন-দোকানের 'কিউ'-তে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ স্বার্থের কারণে তার অগ্রবর্তীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে এসেছে —কে বল্‌বে?

ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থপরতা আর জাতীয় জীবনে মহত্ব এই অবস্থাটা নিঃশেষে যুদ্ধেরই ফল—যুদ্ধপূর্ব বৎসরগুলিতে তার অস্তিত্ব ছিলনা। আর অস্তিত্ব থাক্‌লেও তখনও তার রূপ এমন সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয় নি। ঊনবিংশ শতক এবং প্রথম যুদ্ধ-পূর্ব বিংশ শতকের বৎসরগুলিতে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত লক্ষণ চোখে পড়ে। অর্থাৎ সেই সময় বাঙালীর ব্যক্তিগত জীবনে সার্থক বিবেকবোধের পরাকাষ্ঠা দেখ্‌তে পাই অথচ জাতীয় হিতৈষণার প্রশ্নে, দেশের ও দশের কাজে, তাকে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখিনে। বরঞ্চ এই দিক দিয়ে তখনকার উন্নতচরিত্র মহদাশয় ব্যক্তিরা খানিকটা নিস্পৃহই ছিলেন। সে সময়ের করিৎকর্মা আদর্শবাদী শিক্ষিত বাঙালীর মনের মূল ঝোঁকটা ছিলো ধর্মসংস্কারের উপর। আর সেই সঙ্গে—চাক্‌রির উপর। আধ্যাত্মিক প্রেরণা ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশেরই সহায়ক, তাতে সমাজজীবনের আশু এবং প্রত্যক্ষ কোন উপকার হয় না। তাই ধর্মীয় সাধনায় তৎপর তখনকার শ্রেষ্ঠ বাঙালীসন্তানেরা স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে যে পরিমাণ তৎপর ছিলেন, সমাজের বা জাতির মঙ্গলকরণে সে পরিমাণ তৎপর ছিলেন না। দেশের জন্যে তাঁরা যতোটুকু ক'রে গেছেন তা তাঁদের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের পরোক্ষ ফল ; আত্মসাধনার খিড়কি পথেই শুধু তাঁরা দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলির দিকে চেয়ে গেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্ম-চরিতে দেখা যায় বিবেকবোধ দ্বারা পীড়িত হ'য়ে তিনি পতিতাকেও গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের কল্যাণেই হোক কি যুগপ্রভাব বশতই হোক, এ যুগের মানুষ আমরা পতিতাকে খানিকটা মার্জনা করতে শিখেছি, কিন্তু তাই ব'লে এখনকার কোন শিক্ষিত ভদ্র বাঙালী সন্তান শুদ্ধমাত্র বিবেকের তাড়নায় পতিতাকে গৃহে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হবেন এটা বিশ্বাস্য মনে হয় না। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশে সেটা বিশ্বাস্য ছিলো। এর কারণ, ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশই তখন শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে সর্বেসর্বা ছিলো, আত্মোন্নতিই ছিল তার মূল সাধনা তাই পতিতার প্রতি তদনীন্তন সমাজের অনমনীয় কঠিন মনোভাব সত্ত্বেও অসাধারণ বিবেকী শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে নিছক মানবতার কারণে পতিতাকে গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় দিতে বাধে নি।

যেখানে ব্যক্তিজীবন পরিশুদ্ধ, পবিত্র রাখ্‌বার জন্যে এমন আকুলিবিকুলি, সেখানেই সংস্কারকামিতা, স্থিতাবস্থা রক্ষণপ্রচেষ্টা, বিপ্লববিমুখতা। ঊনবিংশ শতকের মহাপুরুষদের জীবনে তাই একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ দেখতে পাই, অন্যদিকে তেমনি পাই সংস্কারকামিতা, অর্থাৎ বিপ্লববিমুখতা। উঁচু মাইনের সরকারী চাকুরের পক্ষে দেশের কাজ করতে যাওয়া আজকের দিনে অসম্ভব (হিন্দু মহাসভা-ওয়ালাদের বাদ্ দিয়ে বল্‌ছি!), তখন অসম্ভব ছিলো না। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কাজ বল্‌তে ব্যক্তিজীবনের উন্নয়নের ফাঁকে যতোটুকু সমাজসেবা আপনা থেকে হয় ততোটুকু কাজকে বোঝাতো। তাই

সরকারের বাঁধা মাইনের চাকুরি সেই কাজের প্রতিবন্ধক ছিলো না, বরং সহায়ক ছিলো। তাই সে যুগে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে একই সঙ্গে সরকারপ্রীতি ও জাতীয়তার মন্ত্র ছড়ানো অবিশ্বাস্য ছিলো না, অনেক মান্যবর তা ক'রে দেখিয়েও গেছেন।

ভরসার কথা, আধুনিক বাঙালীর মনের ঝোঁক চাকুরির ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে স'রে এসেছে। চাকুরি যে নির্ভেজাল গোলামি, বিশেষ করে তা যদি বিদেশী শাসক শ্রেণীর অধীন হয়, এই বোধ কিছুকাল হলো আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। তার ফলটাও ধরাছোঁয়া ভাবে পাচ্ছি। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী দলে দলে ব্যবসায় ও শিল্পবাণিজ্যের প্রতি ঝুঁকছে। বাঙালী যুবজীবনে শিল্পবাণিজ্যপ্রীতি হঠাৎ দেখা দেয় নি, তার পেছনে সুদূরপ্রসারী মানসিক কারণ বর্তমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বৎসরগুলিতেই এই ঝোঁক প্রথম প্রকট হয়—তারপর নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে, বাঙালী আজ কিছুটা ব্যবসায়িক মর্যাদা পেয়েছে। এর ফলটাও হয়েছে প্রত্যক্ষ। বাঙালী মনের দৃষ্টির পরিধি ও দৃষ্টির ক্ষমতা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। যেখানে এককালে ছিল সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাবোধ, সেখানে আন্তঃপ্রাদেশিকতার সূত্রপাত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের স্রোত এসে বাঙালীর মনোজগতে মিলছে ; বাঙালী তার এতোদিনকার সযত্নপোষিত শ্রেষ্ঠত্ববোধ ঝেড়ে ফেলে দিতে আর আপত্তি করছে না। বাঙালীর অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যের চেতনা তার জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ; আশার কথা সেই বাধা অপসারণের প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই আজ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে।

চিন্তা বা মানসিকতার ক্ষেত্রে এর ফল কি দাঁড়াচ্ছে দেখা যাক্। শিল্পপ্রসারের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে শিক্ষিত বাঙালী মন আজ অতিরিক্ত সীরিয়াস হয়ে উঠেছে। হাল্কা ও তরল জিনিষের প্রতি সমাজের সচেতন, নিয়ত কর্মপ্রয়াসী অংশের নিদারুণ ঘৃণা ; পুরাতন বাঙালীর রহস্যালাপপ্রিয় বৈঠকী মনোভাব আর কোথাও বেঁচে নেই। যদি বা ছিঁটেফোঁটা কিছু থেকে থাকে, এযুগের মানসিক স্রোতোধারা থেকে বিযুক্ত সরকারী পেনসন-ধারীর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অয়েলপেন্টিং সমন্বিত, তাকিয়া ফরাসবিলম্বিত বৈঠকখানা কিম্বা অনুরূপ অবসরজীবনযাপনকারীর প্রমোদকক্ষের নিভৃতে গিয়েই তা মুখ লুকিয়েছে। হাল্কা হাসি বা বিশ্রম্ভালাপ সমাজের সচেতন, সক্রিয় অংশকে আর আগের মতো স্পর্শ করতে পারছে না। এটা ভালো কি মন্দ সে-বিচার পরে; আপাতত বিচার্য, আধুনিক বাঙালী অইভাবেই বেড়ে উঠ্ছে। শিল্পপ্রসারের অন্তর্নিহিত সদাসক্রিয় প্রয়াস তার চিন্তাকে করেছে বৈজ্ঞানিক মনোভাবযুক্ত, চিন্তার গতিকে করেছে বহুমুখী—নানাদিকে তার চিন্তার উদ্যম ফেটে ফেটে পড়ছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এর ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই আজ রাজনীতি-ঘেঁসা। শুধু রাজনীতি-ঘেঁসা বললে ঠিক বলা হলো না; রাজনীতি আমাদের সমস্ত চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে গ্রাস করতে বসেছে। বিচিত্র পথে বিকশিত কর্মোদ্যমের মতো বাঙালীর মন আজ নানা রাজনৈতিক বিশ্বাসের দ্বারা বিভক্ত। আমাদের মধ্যে কেউ গান্ধীবাদী, কেউ সাম্যবাদী, কেউ বিপ্লবী সাম্যবাদী, কেউ ধনতন্ত্রের প্রসারের প্রকাশ্য সমর্থক। আবার একই ব্যক্তির মধ্যে এই বিভিন্ন মতবাদগুলির অপরূপ মিশ্রণের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। অর্থাৎ, মত থেকে মতে দোল খাওয়ার দৃষ্টান্ত। কিন্তু যে যেই মতই বিশ্বাস করুক না, সকলেই দেখাতে ব্যস্ত জনসাধারণের প্রতি তার সহানুভূতির অভাব নেই। দুর্গত ও নির্যাতিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশে একে অন্যকে আক্ষরিক অর্থে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু কেউ এবিষয়ে পুরোপুরি আন্তরিক নয়। রাজনীতি আজ নিশ্বাসবায়ুর মতোই আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে; তাই রাজনীতি ছাড়া আমাদের চলে না। সম্পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন থাকুক আর নাই থাকুক, কোন একটা মতবাদকে আঁকড়ে' ধরে আমরা দেখাতে চাই আমরা সকলেই আধুনিক thought-current এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। অবশ্য, এর সবটাই দেখানেপনা নয়, ভেতরের নিজস্ব তাগিদও আছে। প্রেরণার অঙ্কুশটুকু মুলত নিজের থেকে না এলে রাজনীতির প্রভাব বাঙালীর জীবনে কখনই এমন সর্বব্যাপী হতে পারতো না।

কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যা বিশ্বাস করি (বা বিশ্বাস করি বলে দেখাই) সেই অনুযায়ী কাজ করি না। তাই নানারূপ অসঙ্গতির পীড়নে বাঙালীর রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। আন্তঃপ্রাদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর একমাত্র দান—দলাদলি, আর কিছু নয়। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের বিশিষ্ট কার্যাবলীকে এ বিচারের মধ্যে আমি ধরিনি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা অন্য সবাকার থেকে এতোই স্বতন্ত্র যে এই আলোচনায় তাঁকে আমি টানতে চাইনে; আমরা সবাই অল্পবিস্তর বামপন্থী, কিন্তু যে সামাজিক অপব্যবস্থার দৌলতে আমরা শিক্ষিত ধনীসন্তানেরা অগণিত জনসাধারণকে বঞ্চিত রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করছি, বিলেত ঘুরে আসছি এবং শিক্ষার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যে বিলেত থেকে ফিরে এসেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোগদান করছি, সেই অন্যায় বৈষম্যের ফলটুকু গ্রহণ করতে কারও এতোটুকু দ্বিধা দেখা যায় না। মুখে আমরা সবাই বামপন্থায় বিশ্বাসী, কিন্তু বহুর শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত যে উচ্চ জীবনযাত্রায় আমরা অভ্যস্ত তাকে সঙ্কুচিত করতে আমরা নারাজ। এইখানেই আধুনিক বাঙালীর আত্মঘাতী স্বার্থপরতার কথা পুনরায় উল্লেখ করতে হয়। আমরা শিল্পবাণিজ্যই করি, রাজনীতিই করি আর সমাজসেবাই করি, স্বার্থের মানদণ্ড দিয়েই সব কিছুকে পরিমাপ করতে শিখেছি। নানা বিপর্যয়ে হৃদয়বৃত্তি

নামক পদার্থটিই আমাদের ভেতর ম'রে গেছে। আমরা public life-এ অংশ গ্রহণ করি মানবতার কারণে ততোটা নয় যতোটা বুদ্ধিগত কারণে। আমাদের স্বদেশহিতৈষণার পেছনে হৃদয়বৃত্তির তাগিদ প্রায় অনুপস্থিত ; যেটা উপস্থিত তা হলো নানা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বকে সার্থক করে তোলার ইচ্ছা।

সি, ই, এম্, জোডের একটি লেখা পড়ছিলাম। তাতে তিনি প্রথম যুদ্ধপরবর্তী ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে সেখানকার intelligentsia-র স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মত হলো, ইংলণ্ডের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সম্প্রদায় সবাই মতবাদের ক্ষেত্রে বামপন্থায় বিশ্বাসী, তা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় সুযোগগুলি ভোগ না করে তাদের গত্যন্তর নেই, ফলে তাঁদের জীবনে দেখা দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্যায়ের চেতনা। 'We are at war with ourselves'। কিন্তু আমাদের এই অন্যায়ের চেতনাটুকু পর্যন্ত নেই। আমরা নিঃসংশয়ে সব পাথর বনে গেছি। তাই মুখে সাম্যবাদের বুলি আওড়ালেও জমিদারী ভোগদখল করতে কোনো সাম্যবাদীরই আটকায় না ; তথাকথিত সোশ্যালিষ্টরা ড্রইংরুম বিহারী socialite বই আর কি ? বিশ্বাসকে জীবনের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রতি এমন ঔদাসীন্য, এমন হেলাফেলার ভাব পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। এতেই মনে হয় আমরা শুধু intellect-এর ক্ষেত্রে বেঁচে আছি ; বিবেকবোধ, কর্তব্যাকর্তব্যের ধারণা অনেক দিন আগেই আমাদের জীবন থেকে অন্তর্ধান করেছে।

কোনো একটা বিশ্বাসকে অন্তরে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করতে হলে খানিকটা হৃদয়বৃত্তিরও প্রয়োজন ; শুধু মননের সাহায্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। মনন থেকে আসে বিচারবোধ ; কিন্তু আবেগ থেকে আসে উদ্দীপনা, কর্মচাঞ্চল্য। জীবনের পথে কোনো একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে চলতে হলে মনন এবং আবেগ এই দুই-এরই প্রয়োজন। আমাদের জীবন নানা কারণে আজ মননপ্রধান, আবেগশূন্য—তারই ফলে মতের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রেখে চলা আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না, আমরা কেবলই মত থেকে মতান্তরে দোল খেয়ে ফিরছি। এই অবস্থায়, কোন বিশ্বাসকে আচরণে কার্যকরী করা তো দূরের কথা, সেই ইচ্ছাই মনে উদয় হয়না। আধুনিক বাঙালীর জীবনে সেই মারাত্মক অবস্থাই আজ সমুপস্থিত।

বিশ্বাসের (বিশ্বাস অর্থে এখানে conviction বুঝতে হবে, faith নয়) শিথিলতার ছিদ্রপথে আরেকটি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেটি ধর্মের পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা। যেখানে মতের দৃঢ়তা নেই, কেবলই ক্ষেত্র পরিবর্তন, সেখানে চরম সত্তা হিসেবে God-head-এর কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। এতে একদিকে যেমন পরম নির্ভরতার আশ্বাস আছে অন্যদিকে তেমন স্বতোবিরোধের রুদ্ধশ্বাস কবল থেকেও

মুক্তির প্রতিশ্রুতি আছে। নানা সমাজলক্ষণে বাঙালী জীবনে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার বিরুদ্ধে এখনই সতর্কতার প্রয়োজন, নইলে ধর্মের জোয়ার একবার প্রবল হয়ে উঠতে পারলে তাকে প্রতিহত করা শক্ত হয়ে উঠবে।

এর পর শিল্প ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ। কিন্তু তার জন্যে বিস্তৃত পরিসর দরকার। আমরা বারান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

পরিত্যক্ত

শোলম্ আখ্

অনুবাদক: ধীরেন রায়

ছোট্ট ছেলের কান্নায় ঘুম ভেঙ্গে গেল বেরির। চোখ না খুলেই তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বল্ল—'গোল্ডা, বাচ্চাটার কান্না থামাও।'

নিরুত্তর গোল্ডা। বেরি চোখ খুলে দেখলো ঘরে তার স্ত্রী নেই। আশ্চর্য্য হয় কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে—'হয়ত স্নানের ঘরে রয়েছে'। শিশুটার মুখে একটুক্রো কাপড় গুঁজে দ্যায় কান্না থামাবার জন্যে। শয্যাত্যাগের পর পোষাক পরিবর্ত্তন করতে করতে ভাবে ঝব্লিনারদের বাড়ী থেকে যে বাতিদানটা 'হাতিয়েছে' তা'থেকে কত টাকা 'দাঁড়াতে' পারে! কথাটা মনে পড়তেই সে 'মাল'গুলো দেখ্তে গেল চিলেকোঠায়।

য়্যাঁ—বাতিদানটা নেই! তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল জিনিষগুলো 'উধাও' হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নেমে এল স্ত্রীর জিনিষপত্র দেখতে—কিন্তু হা ঈশ্বর কিছুই যে নেই! গভীর হতাশায় কপালে হাত দিয়ে বেরি বসে পড়ল। অন্ধকারময় শূন্যতার পর সে দেখতে পায় আলোকরেখা। বিদ্যুৎ রেখার মত একটা চিন্তা তা'কে চঞ্চল ক'রে তোলে। গোল্ডা তা'হলে পালিয়ে গেল তাকে ছেড়ে! কিন্তু কার সঙ্গে?

—স্লুইমা স্লেশোর না হাইমুল গুবের সঙ্গে?

—ঠিক আছে। ভেগে যাক্, চুলোয় যাক! দেওয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলে বেরি। পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি এসে গেছে তার—অন্ততঃ তা'র মুখভঙ্গি দেখ্লে তাই মনে হ'বে।

তোমাকে কে পরোয়া ক'রে? ঘৃণায় বারকয়েক থুথু ফেল্‌লে সে দেওয়ালে। বে-রে মজার ব্যাপার হ'য়েছে—হাঃ হাঃ হাঃ—বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হাস্‌ল বেরি ক্যুলক।

শায়িত শিশুটার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর ভাবলে ঃ

—এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করা যায়? যদি একবার গোল্ডার আস্তানার খোঁজ পায় তাহ'লে দরজার সামনে ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে বল্‌বে—"নিয়ে যা তোর ছেলেকে—"

বেরির মাথায় এল দুর্ব্বুদ্ধি কথাটা তলিয়ে ভাব্‌তে গিয়ে তার মুখ হ'য়ে গেল ফ্যাকাশে। ওপরের দাঁত দিয়ে চেপে ধর্‌ল ঠোঁট। কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল হাত। নাঃ নাঃ সে পারবেনা! উলঙ্গ শিশুটা গা থেকে ফেলে দিয়েছে ময়লা কাঁথাটা, অর্থহীন, শূন্যহাসি ছেলেটার সারামুখে ছড়ানো। গম্ভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল বেরি—তার মনে জেগে উঠ্‌ল বিস্মৃতপ্রায় একটি মুখ।—অবিকল তারই মত শিশুটার চেহারা। টুপিটা নিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। উদ্দেশ্যহীনের মত পথে পথে ঘুরতে লাগল। শান্তি নেই মনে। তাকে অদৃশ্য ভাবে টান্‌ছে শিশুর ক্রন্দন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘরের ছবি। পা তুলে ছেলেটা কাঁদ্‌ছে অবিশ্রান্ত। নাঃ—বেরির ফিরে যাওয়া উচিত। গোল্ডাকে একবার পেলে গলা টিপে তার জিভ্ বের করে দেবে! ক্রুদ্ধ বেরি কল্পনা করে আনন্দ পায়। জাহান্নামে যা হারামজাদী!

রুটির দোকান থেকে একটা রুটি কিনে সে বাড়ী ফিরে এল। উলঙ্গ হয়ে হাস্‌ছে ছেলেটা।

'শয়তানও তোমায় নেবেনা—দিব্যি আরামে আছ বাপধন—ক্ষুদে হারামজাদা!' গজর গজর করতে থাকে বেরি। রেগে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

পা চল্‌তে চায়না। কানে ভেসে আসে অসহায় শিশুর করুণ ক্রন্দন। অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় ভরে ওঠে তার মন। অকারণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফিরে আসে আবার।

ছেলেটা কাঁদ্‌ছে সত্যি! টেনে টেনে ভাঙ্গা গলায় ডাক্‌ছে—'মা-ম্মা-মাম্মা'......

'মা—হুম্—শয়তানের বাচ্চা, যাও তোমার মা ঠাকরুণের কাছে!'

ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে অবুঝ শিশু। কোলে তুলে নেয় বেরি। ছেলেটা পরম প্রত্যাশায় কি যেন খোঁজে বেরির বুকে।

—'মাগি-নরকে যাক্'—বেরি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ দ্যায় গোল্ডার উদ্দেশ্যে।—'খোকা আমার, মাণিক আমার কাঁদিস্‌নে বাপ্ চুপ্ কর্—ওঃ চুউপ..!' ছেলেটা তার বুকে খোঁজে মায়ের স্তন; না পেয়ে ছোট লাল জিভ দিয়ে চাট্‌তে থাকে বেরির লোমশ বুক। সকৌতুকে সে শিশুটাকে আরো কাছে টেনে নেয়। দুধ চাই। খুঁজতে খুঁজতে বেরি একটা এনামেলের বাটিতে খানিকটা বাসি দুধ পেল। গলাটা ভিজ্‌বে তবু! দুধ খাওয়াবার সময় শিশুটার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'বার চেষ্টা করে।

'খেয়েনে—এইটুকু দুধ। তোর মা-মাগি কলেরায় মরবে। কুত্তির চেয়েও খারাপ। তারাও ত ছানাগুলোকে ফেলে কোথাও যায় না। আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যা-ব না-রে!'

দুধ খেয়ে শান্ত হ'ল বাচ্চাটা। কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে ওকে জড়িয়ে নিয়ে বেরি নেমে এল পথে। বাজারের মোড়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল অনেকে। বেরি ক্যুলকের কোলে একটা ছেলে! ফ্রাডনিক ডাকল—'ওহে ক্যুলক্, এবাচ্চাটাকে পেলে কোথায়?'—ফ্রাডনিক-পত্নী উত্তেজিত ব্যস্ততায় ছিনিয়ে নিল শিশুটাকে বেরির কোল থেকে। গামছা দিয়ে বারে বারে মুখ মুছে দিতে লাগ্‌ল। ওকে নিয়ে কি যে কর্‌বে তা' ঠিক করে উঠতে পারেনা ফ্রাডনিকের স্ত্রী।

—'তোমার ছেলে বুঝি ক্যুলক্? আমি জান্‌তামনা দেখ-দেখ চোখগুলো অবিকল মেরিণার মত, নাকটা বাস্তবিক সুন্দর—বেশ ছেলেটি—আমাকে দাওনা।' দুহাতে তুলে বেরির ছেলেকে নাচাতে লাগ্‌ল ফ্রাডনিক-পত্নী।

—'এই-এই ক্ষুদে শয়তান!'

চোরের দলের সর্দ্দার, বুড়ো ফ্রাডনিক মনোযোগ দিয়ে দেখে বেরি ক্যুলকের পিঠ চাপ্‌ড়ে দিল।—'হাল্‌কা ছেলে, খুঁটি বেয়ে তরতরিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে—বেশ-বেশ! এর মা কে?'

—'সে মাগী জ্বলে মরুক—ঝব্‌লিনারদের বাতিদানটা নিয়ে সরে পড়েছে—চোরের ওপর বাট্‌পারি।'

—'য়্যাঁ—বল কি? আর তোমার জন্যে রেখে গেছে এইটেকে?'

—'হুম্'!—ক্ষুব্ধ আক্রোশে বেরি দাঁতে দাঁত দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে।

—'বড় খারাপ ব্যাপার!' বুড়ো ফ্রাডনিক মাথা দোলাতে দোলাতে বল্‌ল। ফ্রাডনিকের ছেলে ঠাট্টা ক'রে উঠল—'তা' বেশ—ব্যবসা ছাড়্‌ছ নিশ্চয়! এখন তোমাকে ধাইগিরি কর্‌তে হবে ক্যুলক্—ছেলের মা খুব চালাকি খেল্‌লে যাহোক।'

—'আমার জন্যে ভেবে মাথা খারাপ করতে হ'বেনা—ঈশ্বর আছেন তিনি পেট দিয়েছেন পেটের খোরাকও জোগাবেন—ক্যুলক ক্যুলকই থাকবে।' রাগতভাবে জবাব দিল বেরি।

শিশুটিকে নিয়ে বেরি শহর সীমার পথে চলতে থাকে। তা'র মনে হচ্ছে—তাকে নিয়ে শহরশুদ্ধ লোক আলোচনা করছে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। ঠোঁটের কোনে বাঁকা হাসি ঝিল্‌মিলিয়ে উঠ্‌ছে।

নগরের প্রান্তসীমায় তরল অরণ্য। সেখানে একটা পাথরের উপর বেরি বস্‌ল।

জনমানবের চিহ্ন নেই। লোকালয় অনেকদূরে। হরিৎপাতায় ছেয়ে গেছে বনভূমি। ঝরাপাতার মর্ম্মরধ্বনি মনে হয় শোকগীতির মত করুণ। দূরের প্রবহমান খরধারার শব্দ ভেসে আসে। উচ্ছ্বলিত নদীতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে বালুবেলায়। বেরি মাটিতে বসিয়ে দিল ছেলেটিকে। অসীম বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠেছে। সরলশিশু স্তব্ধশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বেরি ক্যালকের পানে। বেরি তা'র কর্ত্তব্য ঠিক কর্তে পার্ছেনা! এক বিবেচনাহীন মুহূর্ত্তে শিশুটাকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার চিন্তা তার মনে প্রবল হ'য়ে ওঠে। আবার অজানিত মমতায় তা'র মন পরমুহূর্ত্তেই গলে যায়। যতই হোক তা'র নিজের রক্তমাংসে গড়া ছেলে! বুকে চেপে ধরে। তার মনে হয় সে যেন নোতুন ক'রে নিজেকে চিন্তে পেরেছে। সারাদেহে বয়ে যায় খুসীর ঢেউ।

'ছোট্ট চোর!' উচ্চতর কণ্ঠে বল্তে লাগ্ল বেরি ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ চোরের ব্যাটা ঠিক চোর হ'য়েছে, বাজি রেখে বল্তে পারি কালে তুই পাকা চোর হবি। খুঁটি বেয়ে তর্তরিয়ে উঠ্বি ওপরে, জানালার শিক ভেঙ্গে লিকলিকে শরীরটাকে গলিয়ে দিবি ভেতরে। তালা ভাঙবি। গুদোম থেকে বাছুরের চামড়ার বাণ্ডিল নিয়ে সরে পড়বি আলগোছে। তার পর তোর ছেলেমেয়ে হ'বে আর তাদের মা পালিয়ে যাবে—কিন্তু তুই কি তাদের খাওয়াবার জন্যে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করবি? তুই কে?—আমার মত একটি চোর! কেমন?······"

নদীর তীরে শিশুটিকে রেখে বেরি গাছের আড়ালে গেল। ছেলেটা কী ক'রে তাই দেখবার জন্যে। অসহনীয় বিরক্তিতে তার মেজাজ হ'য়ে ওঠে তিরিক্ষি। আপদটাকে বিদেয় না কর্তে পার্লে শান্তি পাবেনা সে। পা তুলে আঙ্গুল চুষতে চুষতে আপন মনে ও অস্ফুটস্বরে ডাক্ছে 'মা ম্মা!'

খানিকটা দূরে গিয়ে বেরি অন্য একটা গাছের পেছন থেকে লক্ষ্য কর্ল ছেলেটা একই অবস্থায় রয়েছে। কাঁদ্ছেনা। বেরি গাছের আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করে সহায়হীন শিশুর ভঙ্গিমা। শেষ পর্য্যন্ত বেরি দৌড়তে থাকে। আবার তার কানে ভেসে আসে শিশুর একঘেঁয়ে, নিস্তেজ কান্না।

'কাঁদ্তে কাঁদ্তে নদীতে গড়িয়ে পড়তে পারে!' অতর্কিত এই আশঙ্কা বেরিকে আচ্ছন্ন ক'রে বাৎসল্যের প্লাবন নামে তা'র অন্তরে। নদীসৈকতে ফিরে আসে সে। জোর গলায় কাঁদ্ছে ছেলেটা। ওকে কোলে তুলে নিয়ে পায়েচলাপথে চলতে থাকে বেরি। বনান্তরালের কুটিরগুলোর প্রতি দরজায় ভগ্নকণ্ঠে ভিক্ষা চায় 'একটু দুধ, মা বাপ মরা ছেলের জন্যে একটু দুধ দাও!"

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্‌-সি.

ধর্ম্মের স্বরূপ ও বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আজকের দিনে এত বিভিন্ন মতবাদের জন্ম হয়েছে যে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কলকোলাহল মুখরিত পাদদেশ অতিক্রম করে ঊর্দ্ধ শিখরে অধিরোহণ করতে সক্ষম হয় না যেখান থেকে প্রভাবমুক্ত পক্ষপাতশূন্য মন নিয়ে সে সবকিছু অবলোকন করতে পারে। সাধারণ মানুষ নিজের অতীত ইতিহাস কতটুকুই বা জানে—প্রাচীন ধর্ম্ম-রীতির কতটুকু খোঁজই বা সে রাখে? বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কত বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়েছে ও প্রচলিত রয়েছে সে সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা সে করতে পারে?

অথচ এই অতীত দিনের আলেখ্য সাম্নে রেখেই চিন্তাশীল মানুষকে আজ আর একবার ধর্ম্ম-জীবনের পুনর্গঠনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, যাতে যন্ত্রযুগের চাহিদাগুলি মেটানো তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। এইভাবেই প্রকৃত ধর্ম্ম গড়ে ওঠে। ঠিক এইভাবেই আমাদের এতদিনকার ক্রমান্বিত ধর্ম্ম-ধারা চলে এসেছে—চলে আসছে যুগে যুগে। নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা নব নব বিশ্বাস এবং নূতনতর সমস্যা ও দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে যোগসূত্র কোথাও ছিন্ন হয়ে যায় নি। সবসময়েই একটা সমতা, একটা সাদৃশ্য, একটা অনুবৃত্তি (ইংরেজিতে যাকে আমরা continuity বলি) একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বজায় থেকে এসেছে।

স্বীকার করি আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের পূর্ব্বপুরুষপ্রবর্ত্তিত মতবাদগুলি হয়ত চূর্ণ করে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে সেকালের ঋষি ও মহাপুরুষ বর্ণিত সকল নীতিই কি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে পরিত্যাগ করতে পারি? অনেক ঘুরে ফিরে আমরা আবার সেই আগেকার পরিত্যক্ত স্থানটিতেই সাধারণত ফিরে আসি।

চিন্তাশীল মানুষ নীরবে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুধাবন করতে প্রয়াস পায়। সে বুঝতে পারে আজকের পরিবর্ত্তিত পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সংহতি রাখতে গিয়ে প্রচলিত ধর্ম্ম-ধারায় বিপ্লবের জোয়ার দেখা দিয়েছে। এ তো অবশ্যম্ভাবী। তাই যারা ধর্ম্ম রসাতলে গেল বলে খেদোক্তি করে তাদের কথায় সে কৌতুক বোধ করে, আবার যারা ফ্রয়েডীয় মন্তব্যানুযায়ী সকল ধর্ম্মাচরণকে মানসিক বিকার বোধে সযত্নে পরিহার করে চলে তাদের মূঢ়তায় তার হাসি পায়। চিন্তাশীল মানুষের কাছে এ হল যেন কোন পুরাতন ধারাবাহিক গল্পের আর এক অধ্যায়।

ভগবৎ-বিশ্বাসই যদি ধর্ম্ম হয় তবে সে-ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোথাও দ্বন্দ্ব বাঁধবার হেতু নেই। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম কখনো বৈজ্ঞানিক মতবাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি, আবার বিজ্ঞানও ভগবৎ-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে যায়নি। ধর্ম্মমত তো যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে—তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ বাধবে কেমন করে? সংগ্রাম যা করতে হয়েছে তা শুধু সমাজের পুরাতন সামাজিকতার কাঠামোতে রূপান্তর ঘটাবার জন্যে। ধর্ম্মমতের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল উনবিংশশতাব্দীতে, যখন জনকয়েক অতি আগ্রহশীল বিজ্ঞানী নবজাত বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণের চিত্তাকর্ষণের জন্যে বিজ্ঞানকে ধর্ম্ম বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে ধর্ম্ম তখন কেবল বিশ্বের কল্পিত. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যেই পর্য্যবসিত থাকবার উপক্রম করেছিল।

তাই প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের বিজ্ঞানকে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রহণ করে নিতে পারলেও ডেকার্টে এবং নিউটনের বিজ্ঞানকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারেন নি। কোথায় যেন কী অপূর্ণ রয়ে গেল! কী যেন ভুল হল! নিউটন থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তীকালের প্রায় সকল পদার্থবিদই ঈশ্বরকে ঈথর, তেজ অথবা কোন যান্ত্রিক রূপক বলে নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু, শীঘ্রই দেখা গেল ধর্ম্মকে এইভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত করলে—ধর্ম্মনীতিতে এই প্রকার আধুনিকতা প্রয়োগ করলে—ধর্ম্মের আর কোনই মূল্য থাকে না। ঈশ্বর রূপক বিশেষ হলে তাতে স্বর্গীয়ভাব আরোপ করা চলে কেমন করে? অবশ্য আমরা পারি, আমাদের পৌত্তলিক ধর্ম্মে প্রতিমা পূজায় বিরাটের ধ্যানে কোথাও ব্যাঘাত ঘটে না—স্বর্গীয়ভাবের কোন অভাব হয় না। কিন্তু তাহলে কী হবে, পদার্থবিজ্ঞানে অত্যল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের কোন বিশেষ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হল। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক মতবাদের মধ্যে ধর্ম্মকে নিবদ্ধ রাখতে গিয়ে দেখা গেল সেই বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি ক্রমে নূতন নূতন মতবাদের দ্বারা চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে এবং ধর্ম্মও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে।

ধর্ম্ম আর যাই হোক না কেন তা যে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয় সেকথা সুনিশ্চিত। অথচ উনবিংশ শতকে অনেকেই গোড়ায় গলদ করে বসেছিলেন। তাই বার বার তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আজকের এই বিংশ শতকেও স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ সেই একই চেষ্টায় ব্রতী রয়েছেন—পদার্থ বিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞানের কোন মূল সূত্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পাবার আশা করছেন। র‍্যাণ্ডেল এ সম্বন্ধে বলেছেন "Their present day successors, who still strive to find God in some postulate of physics or biology, like

ether or evolution, would do well to study the history of 18th century modernism."

তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্ম্মের কেন যে পুনরায় জাগরণ হ'ল তা আমরা এখন বুঝতে পারি—কোন মতকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করতে না পারায় একটা ইণ্টেলেকচুয়্যাল ব্যর্থতার পটভূমির উপরে ধর্ম্মস্রোতের পুনঃপ্রবর্ত্তন হ'ল। ললিতকলা ধর্ম্ম এবং নৈতিক চরিত্রের কি কোন মূল্য নেই—কেবল মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার উপরেই কি সকল গুরুত্ব আরোপিত হবে ? তাতো নয়। একই সঙ্গে এদের সবগুলিকেই মানুষের প্রয়োজন। সমাজগত এবং কৃষ্টিগত পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি নিরূপণ করতে, আধুনিক যুগের উদ্দাম কালপ্রগতি সংযত করতে অথবা তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে সবগুলিকে নিয়ে একটা নূতন সংমিশ্রণী (synthesis) গড়তে হবে। "Religion must be a great human enterprise, an organization of men's feelings and actions as well as their beliefs. It could not be a mere club to enforce a narrow moral code ; it must be a complete life, as little rational or narrowly useful as life itself". ধর্ম্ম কেবল অনুদার নীতি-সংগঠণী সঙ্ঘমাত্রে পর্য্যবসিত হ'লে চলবে না—তা যেন একটা অখণ্ড সমগ্র জীবন—ধর্ম্মের সাহায্যেই জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। বাস্তবতা বা reality বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অনুসন্ধিৎসার নাগালের বাইরে থাকে ; তাকে পাওয়া যায় কেবল ধর্ম্মজীবনকে অবলম্বন করে। ঠিক এই ধরণের মনোভাবই সেদিন সর্ব্বত্র প্রকট হয়ে উঠল। হেগেল, স্লিয়ারমাসে (Schleiermacher) এবং রিশেল (Ritschl) ধর্ম্মের স্বরূপ নিজ নিজ বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হেগেলের মতে ধর্ম্ম শুধু অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিমাত্র। এ হল একটা দার্শনিক মতবাদ বিশেষ। তবে বিশুদ্ধ দর্শন যেখানে কতকগুলি ধারণার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করে থাকে, সেখানে ধর্ম্ম রূপকের প্রয়োগ করে থাকে।

স্লিয়েরমাসে বলেছেন, ধর্ম্ম কোন ব্যাখ্যা নয় ; তা হল শুধু আবেগ এবং অনুভূতির প্রকাশমাত্র। ধর্ম্মকে কলাবিশেষ বলা চলে—বিশ্বকে কেন্দ্র করে এই সৌন্দর্য্যবোধ গড়ে উঠেছে। তাই ধর্ম্মনীতির কোন পার্থিব অথবা বিষয়ীগত মূল্য থাকতে পারে না।

আবার রিশেলের মতে ধর্ম্ম দার্শনিক ব্যাখ্যাও নয় অথবা আবেগের অভিব্যক্তিও নয়—ধর্ম্ম হল আচার এবং আচরণের ধারা বিশেষ। মানবতার সামাজিক আদর্শ উপলব্ধির জন্যে যে নৈতিক অভিযান দেখতে পাওয়া যায় আসলে তাই হল ধর্ম্ম-জীবন।

মোটামুটিভাবে এখন এটুকু অন্ততঃ জানা যায়, যাঁরা বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসী অথচ ধর্ম্মের প্রতিও অনুরাগী, বিজ্ঞান তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে না। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি বিরল নয়—বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম দুই-ই সাদরে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস এমন প্রবল, এমন আপনাতে আপনি সম্পন্ন যুক্তিমূলক, এমন গভীরভাবে আমাদের সমাজে ওতপ্রোত হয়েছে যে সাধারণত বিজ্ঞানের সঙ্গে আর কোন বিশ্বাস মেশাতে প্রবৃত্তি হয় না—মনে হয় পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস এর তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর—মনে হয় কি তার প্রয়োজন আধুনিক যুগে! যুক্তির দিক থেকে ততটা নয়, যতটা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিজ্ঞান ধর্ম্মের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে। মানুষের মন বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে এমন পরিতৃপ্তি লাভ করেছে যে সময়ে সময়ে আর সব কিছুই তার কাছে অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের যে দর্শন ঈশ্বর এবং অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, আজকের দিনে সে দর্শনকে অবলম্বন করে মানুষের কৌতূহল নিবৃত্ত হতে পারে না। আধুনিক বস্তু-তান্ত্রিক মানুষের সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবসরও নেই এবং আগ্রহও নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দর্শন পরিপুষ্টি লাভ করেছে নৃতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান থেকে। মানুষের বিভিন্ন আচার এবং আচরণের কারণ এবং উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেছে এই দর্শন। কেমন করে অব্যক্তের প্রতি বিস্ময় থেকে ঈশ্বর তথা ধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটেছে আজ আর সেকথা অবিদিত নেই। তাই আজকের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ধর্ম্মকে মায়া অথবা মোহ বলে অস্বীকার করে না, বরং জীবন্ত সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারা বলে মেনে নেয়।

পিউপিন, মিলিকান, অলিভার লজ, আর্থার টমসন, হেনরি ফেয়ারফিল্ড, অসবোর্ণ প্রভৃতি পদার্থবিদ্ ও জীব-বিজ্ঞানিগণ তাই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে উদারপন্থীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা এখনো সেই পুরাতন ধর্ম্মনীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী—কারণ আধুনিক বিজ্ঞান তো ধর্ম্মে বাধা দেবার প্রয়াসী নয়। এইখানে তাঁরা ভুল করেছেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ আজকের দিনে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে নয়—ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মানুষ প্রতিমা গড়ে যদি পূজা করতে চায় এবং তাতে যদি সে তৃপ্তি পায় তো করুক না পূজা—বিজ্ঞানের তাতে বলবার অথবা বাধা দেবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে সেই পূজার ফলে যে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় একথা বিজ্ঞান কোনমতেই স্বীকার করে নিতে পারবে না। পূজা করাকে বিজ্ঞান-সম্মত বলবার প্রশ্রয় বিজ্ঞান দেবে না কারণ পূজা করবার প্রবৃত্তির উৎস কোথায় তা বিজ্ঞানের জানা আছে।

র‍্যাণ্ডেল বলেছেন, "The vast majority of those attracted to science, even when they have abandoned all supernaturalism, all belief in a cosmic companion or in human immortality, have not grown thereby any the less religious. Indeed, one of the outstanding facts of recent years has been the increasing interest taken by scientific thought in religion."

বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে দেবতার ধারণা মেলে না বলেই বিজ্ঞান দেব-পূজাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান বিরাট তেজপুঞ্জের উৎসগুলি নিরূপণ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক অদৃশ্য তেজের প্রতি মানুষের মন ধাবিত হয়। এই কল্পিত অদৃশ্য তেজই ঐশীশক্তি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তাই অতিবড় বিজ্ঞানীও—এককালে যিনি নাস্তিক ছিলেন তিনিও—ধর্ম্মভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। এ হল সাইকোলজি—কারো কারো মতে এ হল দুর্ব্বলতা। মানুষের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের যতদিন না অবসান ঘটে ততদিন ধর্ম্মের পুনর্গঠনের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিসের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে এই পুনর্গঠন হবে? কেমন করে ঘুচবে মনের এই কুহেলিকা?

অমানুষিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সে ছিল ওরকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকি পেটার বেশী না খেয়ে, কখনো বা দু'চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিঁকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ছিদামের ইতিহাসটাও আর দশজনের মত সাধারণ, যদিও ভয়াবহ। প্রথমে গেল তৈজসপত্র, তারপর গেল গাইটা। কুন্জার রূপার পৈছেটা দিল সে নিজেই, কানের লুকানো মাকড়ি খুঁজে বার করে কেড়ে নিতে হল জমিটুকু যাওয়ার পর। ভিটেটুকু বাঁধা পড়ল সকলের শেষে,—মাকড়ি আগে যাবে না ভিটে আগে যাবে এই নিয়ে মনান্তর হয়েছিল কুন্জার সঙ্গে ছিদামের। সবই যে যাবে, তখন একরকম স্থির নিশ্চয়ভাবে জেনে গিয়েছে ছিদাম, ছেলেটাও তার তখন মরে গেছে। তবু ঘরদুয়ারটা সে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। অদৃষ্টে বিশ্বাস আর তার ছিল না, কোন কিছুতেই বিশ্বাস ছিল না, ধুঁকতে ধুঁকতে তবু এক দুর্লভ স্বপ্নের রঙ একটু সে মনে পুষে রেখেছিল যে মাথা গুঁজবার ঘরটা থাকলে হয়তো বেঘোরে প্রাণটা তার যাবে না, আবার একদিন সব আসবে, জমি জমা গাইবাছুর তৈজসপত্র কুন্জার গয়না, কুন্জার গর্ভে সন্তান। ললিতবাবুর কাছে বাড়ীটা বাঁধা দেবার পর তাই সে হতাশায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

একদিন ভোরবেলা বুড়ী মা, যোয়ান বৌ আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে রওনা দিয়েছিল অন্যকোথাও কিছু করা যায় কিনা এইরকম একটা অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। মরবে তো তারা সকলেই। সেও মরবে, বৌও মরবে, মেয়েটাও মরবে, মাও মরবে। দেখা যাক বাঁচবার কোন পথ যদি খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীর কোথাও, যেখানে রোজ ইস্টিমার ভেড়ে, বড় বড় লোক থাকে বড় বড় দালানে, বড় বড় কারবার চলে বড় বড় আড়তে, রোজ দু'বার বায়োস্কোপ দেখান হয়, হাকিমরা বসবাস করে!

কিছুই সে প্রায় সঙ্গে নেয় নি। শুধু ছেঁড়া ধুতি আর পিরাণের বাণ্ডিলটা, তার মধ্যে কল্কি আর তিনপুরুষের তাবিজটা, তামার। বাহুতে আঁটা তাবিজটা খুলে সে বাণ্ডিলে ভরেছিল অবিশ্বাসে। ফেলে দিতেও পারত, তা দেয় নি। কোন কিছু ফেলে দেবার স্বভাব তার নয়। তাছাড়া, গায়ে না রাখুক একেবারে ফেলে দিতে মনটাও খুঁত খুঁত করেছিল।

কুন্জা শুধিয়েছিল সসন্দেহে, 'যাও কই?'

'আসি, দেইখ্যা আসি। কিছু নি করণ যায়।'

কুঞ্জার মনে বুঝি খটকা লেগেছিল তার হাতের বাণ্ডিল আর ভাবসাব দেখে। গাঁয়ের আরও কত লোক এরকম 'আসি' বলে চলে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। ক্ষীণ আর্তস্বরে সে বলেছিল, 'কই যাও কইয়া যাও, মরা মুখ দেখবা।'

'কমু অনে। ফির্‌য়া আইসা কমু অনে।'

হন হন করে এগিয়ে গিয়েছিল ছিদাম কথা আদানপ্রদানের সীমানা ছাড়িয়ে, পালিয়ে যাওয়ার মত। হাপরের মত ফুঁসতে সুরু করেছিল তার দুর্ব্বল ফুসফুসটা ওইটুকু জোরে হেঁটে।

তারপর কতকাল কত পথ হেঁটেছে ছিদাম, কত দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, বাজারে বাজারে ফালতু ফেলে দেওয়া পচা তরকারী মাছ ডিম কাড়াকড়ি করে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচাকাঁচা খেয়ে খেয়ে, এর বাগানের ফলটা ওর বাগানের মূলটা চুরি করে করে, এ কেন্দ্রে খিচুড়ি নিয়ে আরেক কেন্দ্রে পাবার আশায় ছুটতে গিয়ে দম নিতে পথের ধারে ছায়ায় বা রোদে, রোয়াকে বা ধুলা কাদায় বসে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুঁকে আর ধুঁকে। এমনিভাবে গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, শীত গেছে।

কত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ছিদাম। দেখেছে শুনেছে সে অনেক কিছু, নিজেও করেছে অনেক কাণ্ড। তার মধ্যে গাবোকে বৌ সাজিয়ে তার কোলে হাড়ে চামড়ায় এক করা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দিয়ে দুস্থ গৃহস্থ সেজে ভিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ছিদাম জীবনে ভুলবে না, ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান। কাদের ক'শ বছরের পুরাণো দালানের এক পরিত্যক্ত অংশে কোলাকুলি দুটো দেয়াল আর এপাশে ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপের মধ্যে তিনকোণা ছাদহীন সাপ-শেয়ালের বাসটিতে সে আশ্রয় নিয়েছিল গাছতলায় থাকলে পুলিশে জুলুম করে বলে, শীতে জমে যেতে হয় বলে। এখানে আকাশের হিম পড়ুক তার গায়ে, দুকোণা ভাঙ্গা দেয়াল দুটোতে উত্তুরে হাওয়া আটকাত, পুলিশ সামনের পথ দিয়ে গটমটিয়ে হেঁটে গেলেও লাঠির খোঁচা তাকে দিয়ে যাবার সুযোগ পেত না।

ওইখানেই গাবো এসে জুটেছিল একদিন না ডাকতেই। কুকুর বেড়াল তাড়ানোর মত করে ছিদাম বলেছিল, 'যা যা, ভাগ্।'

গাবো তার পিছু নিয়েছিল নিশ্চয়, চট কাপড় কাঁথা মোড়া একটা পুরুষ পদ্মপাতার মস্ত এক খাবারের ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাগের আশায় লোভের বশে খাবারের ঠোঙ্গাটা সেদিন মরিয়া হয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল ছিদাম আকাশের চিল যেমন মরিয়া হয়ে মানুষের হাতের খাবারের ঠোঙ্গায় ছোঁ দেয়।

ষ্টীমার ষ্টেশন আর রেল ষ্টেশনের রাস্তা যে মোড়ে মিলেছে, যেখানে অনেকগুলি খাজা গজা রসগোল্লা পান্তোয়ার খাবারের দোকান আর মুর্গী পাঁঠার মাংস, ডিম কারীকোপ্তা

ইলিশমাছের ঝোলের ভাতের হোটেল জাঁকিয়ে চলেছে, সেইখানে ভিক্ষা করছিল ছিদাম। তার সামনের দোকান থেকে বেঁটে রোগা নিকেলের চশমা পরা টাকওয়ালা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, যাকে দেখলে মনে হয় কোন আড়তের খাতা-লেখা কর্ম্মচারী, হাকিমের মত জোর গলায় হুকুম দিয়ে খাবার কিনলে সাড়ে তিনটাকার, পরোটা এত, পান্তোয়া এত, জিভে গজা এত, অমৃতি এত। চেঙারিতে পদ্মপাতার ঠোঙ্গায় সব খাবার নিয়ে সে যখন চলতে সুরু করল ইষ্টিমার ও রেলষ্টেশনের উল্টো দিকের পথটাতে, ভিখারী ছিদাম এক নিমেষে হয়ে গেল ডাকাত, আকাশের ছোঁমারা চিল। সোজা গিয়ে ছোঁ মেরে ঠোঙ্গাটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশ কাটাল পাশের মেয়ে-বস্তির সরু মোটা গলিঘুঁজির গোলোক ধাঁধাঁয়। সেখান থেকেই বোধ হয় গাবো তার পিছু নিয়েছিল। সরকারী মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে গাবো।

'ধ্যাত্তেরি, ভাগ বলছি হারামজাদি কুত্তি !'

গাবো ভাগে নি। ইঁটের স্তূপ ডিঙ্গিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তার পায়ে একটা হাত দিয়ে, আরেকটা হাত উঁচু করে ধরা খাবারের ঠোঙ্গাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। জোড়াতালি লাগানো গায়ের ঢাকনিটা তার খসে গিয়েছিল। আকাশে কোন তিথির চাঁদ ছিল কে জানে। ছাদহীন পোড়ো বাড়ীর আশ্রয়ে ছালা কাপড়ের ঢাকনাহীন গাবোর দেহে এসে পড়েছিল মোটাসোটা চাঁদের তেরছা আলো। খাবারে কিন্তু গাবো বেশী ভাগ বসাতে পারে নি। কিছু খেয়েই সে গলা আটকে বলেছিল, 'জ-জ-জ জল—'

জল খেয়েছিল এক গাদা। খেয়ে আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, যেন মরে গেছে এমনি ভাবে।

বাচ্চাটাকে যোগার করেছিল গাবোই। বুঝিয়ে বলেছিল, 'শোন বলি। না না, এডা আমার পেটের না। কুড়াইয়া পাইছি, লইয়া আইছি আমাগো রোজগার বাড়ানের লেইগা।'

চামড়া ঢাকা একরত্তি একটু প্রাণ, তেলফুরানো পিদীমের নিভু নিভু শিখার মত, চামড়া ভরা ঘা।

'রাতটা বাঁচবো ?'

'ক্যান বাঁচবো না ?' গাবো গর্জ্জে উঠেছিল ক্ষীণকণ্ঠে, 'মাই দিয়া দুধ পড়ে অখনো, ছাখো নাই ?'

মাই টিপে দুধ বার করে আবার সে দেখিয়েছিল ছিদামকে। বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিয়েছিল মাই। সেই চামড়াঢাকা প্রাণটুকুর যে কোন মায়ের স্তন্যপানের শক্তিশালী লীলাটা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ছিদাম। তারপর, আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য ইষ্টিমারের একজন চাষাভূষো ধরণের যাত্রীর চলটা-ওঠা টিনের স্যুটকেশ চুরি করে সে পোষাক সংগ্রহ করেছিল, ভদ্র চাষী গেরস্তের পোষাক।

দু'খানা ঘরে-কাচা ন'হাতি মোটা শাড়িও ছিল সেই টিনের বাক্সে, খুসীতে গদগদ হয়ে গিয়েছিল গাবো।

অনেক আশা নিয়ে মাসখানেক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছে ছিদাম। গেরস্ত চাষীই সে ছিল ভিক্ষুক হবার আগে, এবার সে ভিক্ষা সুরু করেছে আবার গেরস্ত চাষী সেজে। গাবোকে কুন্জারই মত গেরস্ত চাষীর বৌ সাজিয়ে সঙ্গে নিয়েছে কোলে মর মর বাচ্চাটাকে দিয়ে। কিন্তু বিশেষ কিছু তারতম্য হয়নি তাদের উপার্জ্জনের। সহরের দালানের বড় বড় লোকেরা যেন খেয়ালও করতে চায়নি সন্তান-যুক্ত গেরস্ত চাষী পরিবার ভিক্ষা চাইছে না ছালা জড়ানো ঘেয়ো কুষ্ঠ রোগী ভিক্ষা চাইছে, ভিক্ষাই যাদের ব্যবসা। তারপর বাচ্চাটা মরল। গাবো একদিন কোথায় গেল নীল প্যান্ট পরা আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে ছিদাম জানতে চায় নি।

তার মন তখন কেমন করছিল ফুলদিয়ার খড়ো ঘরের একটি স্ত্রীলোকের জন্য, যার নাম কুন্জা, যার কোলে গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের আগে সে রেখে এসেছিল গাবোর কুড়ানো বাচ্চাটার মত চিমসে একটা বাচ্চা মেয়েকে, সুনিশ্চিতভাবে তারই ঔরসে কুন্জার গর্ভে যেটার জন্ম হয়েছিল।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে, দই-কাদার পিছল পথে ছিদাম থুপ থুপ হাঁটে, বেলা পড়ে এসেছে। এ ছিদাম সে ছিদাম নয় সে তো জানা কথাই। ফুলদিয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে মনটা তার ধাত ফিরে পেয়েছে খানিকটা।

বাড়ী ফিরবার ইচ্ছা তার জেগেছিল অনেকদিন আগেই। কিন্তু লজ্জা আর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। অসময়ে মা-বৌ-মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত মরণের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার লজ্জা, ওরা কেউ বেঁচে আছে কিনা এই ভয়। ঘরে যখন ধান থাকে, তৈজসপত্র থাকে, গাইবাছুর থাকে, বৌয়ের পৈছেটৈছে মাকড়িটাকড়ি রূপাসোনার গয়না, চারিদিকে আশাভরসা ছড়ানো থাকে বিপদেআপদে সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার—তখন পুরুষ মানুষ খেয়ালের বসে হোক, বৈরাগ্যে হোক, গোসায় হোক, মা-বৌ-মেয়ে ফেলে গিয়ে অনায়াসে দু'একটা বছর বাইরে কাটিয়ে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বাড়ী ফিরতে পারে—বাড়ী ফিরেই কৃতার্থ করা যায় বাড়ীর লোকগুলিকে। কিন্তু গাঁয়ের যত কাছে এগোচ্ছে থুপ থুপ পা ফেলে তত যেন লজ্জা ভাবনার তোলপাড়টা বাড়ছে ছিদামের মনের মধ্যে। সে অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল তখন, যখন আর কোন সন্দেহই ছিল না যে সবই মরবে, সে শুদ্ধ। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যও সে পালায় নি, সবাইকে বাঁচাবার উপায় খুঁজবার জন্যই

পাগলের মত নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। কিন্তু এতদিন কাজে লাগলেও ফুলদিয়ায় পা দেবার পর আজ এসব যুক্তি যেন ভাবনার বানে কুটার মত ভেসে যাচ্ছে।

কে যেন মনে বসে প্রশ্ন করছেঃ সবাইকে বাঁচাতে চাইলে সঙ্গে নিলে না কেন সবাইকে? তুমি বেঁচেছো—ওরাও বাঁচতো—তোমার মা বৌ মেয়ে!

হয়তো বাঁচত—কুব্জা। কি ভাবে বাঁচতো ছিদাম জানে। গাবোর মত মেয়েটার কংকাল কাঁখে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরত ভিক্ষে করে, মেয়েটা মরলে নীল প্যান্ট পরা কারো সঙ্গে চলে যেত অন্য সুখের সন্ধানে।

তবে সে বাঁচতো। সে যখন বাঁচাতে পারল না, কুব্জা যেভাবে বাঁচুক তার তো কিছু বলার থাকত না।

বাড়ী তার নেই, বেদখল হয়ে গেছে, বদলে গেছে— অথবা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। বাড়ীটা কি অবস্থায় কার হয়ে আছে এ বিষয়ে খটকা ছিল ছিদামের। কিন্তু বাড়ীর কেউ যে তার বেঁচে নেই এতে সন্দেহের লেশটুকু তার ছিল না। কুব্জা মরে গিয়েছে ধরে নিয়েই অনেকদিন ধরে অনেকরকম উদ্ভট পরিকল্পনা সে গড়ে তুলেছে কি করে বাঁচানো চলতে পারত কুব্জাকে—সকলকে! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা হলেও বড় প্রিয় ছিল পরিকল্পনা-গুলি তার কাছে।

তাই, বাড়ী তার ভাল আছে দেখে, বাড়ীর সামনের শিউলী গাছটা আজও ঝাঁকিয়ে উঠেছে দেখে আর সেই শিউলি তলায় সাবান-কাচা তাঁতের কোড়া রঙীন শাড়ী পরা কুব্জাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ছিদাম থ' বনে যায়! কলসী কাঁখে ঘাটেই কুব্জা যাচ্ছিল, আগে যেমন যেত। ছালা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো একটা লোককে বাড়ীর বেড়ার সামনে দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কথা মনে জাগে ছিদামেরঃ আজও কুব্জা বেলা শেষ করে ঘাটে যায়? ঘাট অবশ্য নাগাও, তবু—

চেহারা ফিরেছে কুব্জার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুব্জাকে। এ বড় অদ্ভুত কাণ্ড, নয় কি! বিয়ের সময়কার রোগা প্যাঁটকা মেয়েটা ছ'সাত বছর যদ্দিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাঁকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্দ্ধানের সময়টাতে সে মন্বার বদলে পুড়ন্ত বাড়ন্ত যুবতী হয়ে গেছে!

কুব্জা ঝেঁঝে বলে, 'বাড়ন্ত সব, আরেক বাড়ী যাও।'

ছিদাম বলে, 'চিনলা না মোরে? আমি যে ফির‍্যা আলাম।'

কুব্জা দু'পা এগিয়ে যায়।—'তুমি! ফির‍্যা আসছ? কন থেইকা আইলা তুমি?'

সে যেন ভূত দেখেছে। এই মাটির পৃথিবী না মৃত্যুর দেশ কোথা থেকে আজ সে এই

ছায়াচ্ছন্ন পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হয়েছে এ বিষয়ে তার রীতিমত সংশয় ।

ম্রিয়মান ছিদাম বেড়া পেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, উদাস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'যামু গা ?'

'ক্যান ? যাইবা ক্যান ?' দাওয়ায় কুব্জা ভাল পাটি বিছিয়ে দেয় ঘর থেকে এনে, বলে, 'বসবা এক দণ্ড ? জলডা নিয়া আস্থম ? ঘরে এক পলা জল নাই, কমু কি তোমারে !'

কুব্জা একরকম পালিয়েই যায় কলসীটা তুলে নিয়ে কিন্তু আদর করে পাটি পেতে বসিয়ে গেছে বলে মনটা বিগড়ে যায় না ছিদামের। ঘাট থেকে ফিরে আসবে কুব্জা, তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। ও শুধু একটু দম ফেলতে গেছে, সব কথা বিচার করে দেখতে গেছে ঘরে এক ফোঁটা জল নেই বলে জল আনতে যাবার ছুতো করে ! দম ফেলার দরকারটা, বিচার বিবেচনার প্রয়োজনটা জড়িয়ে আছে ওর বেঁচে থাকার, বাগানে ফুল ফোটাবার, রঙীন শাড়ী 'গায়ে জড়াবার, পুরিপুষ্ট হবার রহস্যের সঙ্গে। তাকে বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসিয়ে নইলে সে কখনো গা ধুতে জল আনতে যায় ! তার বাড়ী ছিল এটা। ও ছিল তার বৌ। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘর এবং ঘরের ভেতর দিয়ে আরেক ঘর হয়ে উঠান রসুইঘর গোয়াল সব দেখে ফিরে এসে পাটিতে গুম খেয়ে ছিদাম বসে থাকে ।

বাইরের দাওয়ায় বসে থাকা পর্যন্ত রহস্য তার আয়ত্তে ছিল, বাড়ীর ভেতর ঘুরে আসবার পর সে হার মেনে হাল ছেড়ে দেয়। গাবোর মতই কোন একটা পুরুষকে বাগিয়ে কুব্জা বেঁচে থেকেছে, রঙীন শাড়ী পরেছে, পুড়ন্ত হয়েছে, জানা কথা। কিন্তু তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্তে সহুরে শয্যা, জিনিষপত্র, প্রসাধন সামগ্রী দেখে, ললিতবাবুর বাড়ীর বুড়ী ঝি সুবালার মাকে উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন করে গড়া চালার নীচে কোন একজন রাধুনী রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম।

বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসে এদিক ওদিক একটু ভাবতে না ভাবতে অনেক পথ হাঁটার ফলে ঝিম না ধরে গেলে ছিদাম বোধহয় উঠে পালিয়ে যেত আরেকবার।

ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফিরে তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে কুব্জা একটু রাগ করে। প্রকাশ্য রাস্তার সামনে এখানে এই বেশে এই চেহারায় বসে থাকাটা কি উচিত হয়েছে ছিদামের, কতলোকে না জানি দেখে গেল তাকে, কত লোক না জানি কত কথা বলছে কুব্জার নামে !

'কে আর কি কইবো তোমার নামে ? কইও আমি ফিরা আইছি। কাইল কইও।'

'কমু ?'

'কইবা না ?'

'আসো, আসো, আসো—ভিতরে আসো।'

কুজা তাকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে দেয়, খাটে ছিদাম বসে তার জীবনে এই প্রথম, দামী খাটে গদি, তাতে তোষক, তাতে আবার চাদর পাতা ধবধবে পরিষ্কার !

'তামাক দিবার পার একছিলুম ?'

কুজা তাক থেকে টিন সামনে ধরে সিগারেটের। একটা সিগারেট নিয়ে হুস্ করে একটানে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছিদাম ভাবতে থাকে।

'আসি।' বলে কুজা বেরিয়ে যায়। পরে ফিরে এসে বলে, 'সুবলের মা, ঠাকুর, সব কয়টারে বিদায় দিলাম। ব্যাটাব্যাটিরা কি বজ্জাত জানো, কওন মাত্র গেল গিয়া। আমারে মানে না।'

'কারে মানে ?'

'ললিতবাবুরে।'

অস্ফুট ক্ষীণস্বরে কুজা জবাবটা দেয়, বজ্রের মত স্পষ্ট শোনে ছিদাম। অনেককিছু চোখে দেখে সে অনুমানে আগেই শুনেছিল বলা যায়, এখন সেটাই প্রমাণিত হল মাত্র। আইনে প্রমাণ না হলে চাষাভূষার মন মানে না।

'ললিতবাবু কখন আইবো ?'

'আইজ আইবো না।'

ছিদাম ভাবে, তাই এত মেয়েলিপণা। ললিতবাবু আজ আসবে না, যদি আসবার কথা থাকত তবে কুজার চালচলন কথাবার্ত্তাও অন্যরকম হয়ে যেত।

'যামু ?'

'ক্যান যাইবা ? বস। কই ছিলা এতকাল ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে হাতপা ধোয়ার প্রয়োজন জানানো মাত্র কুজা তাকে পরিষ্কার কাপড় ও গামছা দেয়, ভিতরের রোয়াকে জলও দেয় নতুন বালতি ভরা, কাঁসার ঘটি দেয়, নতুন। তৈজসপত্র আবার হয়েছে কুজার, আগের চেয়ে ভালভাবেই হয়েছে। গয়নাগাঁঠি কেমন হয়েছে বলা যায় না, কাণে পুরাণো মাকড়ি দুটি ফিরে এসেছে চোখে পড়ে। ললিতবাবুর কাছেই মাকড়িটা ছিদাম বিক্রী করেছিল।

খিদেয় নিজেকে অসুস্থ ঠেকছিল ছিদামের। মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার ধুতিখানি পরে ঘরে গিয়ে সে বসেই থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সাগ্রহে কুজা দু'একটা কথা

বলে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, তাকে কিছু খেতে দেবার কথাই তোলে না। ছিদাম শেষে মরিয়া হয়ে বলে, 'মুড়ি চিড়া আছে না কিছু ?'

কুব্জা গুটিসুটি মেরে তার দিকে কাত হয়ে বসেছিল, তড়াক করে যেন লাফিয়ে উঠে বলে, 'দেই, দেই ! অখনি দেই।'

এক ডালা মুড়ি আর এক খাবলা গুড় সে এনে দেয় ছিদামকে, তিনজনের খাবার মত। ছিদাম মুড়ি চিবোতে চিবোতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

কুব্জা দীপ জ্বালে, ধুনো পোড়ায়। বেড়ায় টাঙ্গানো মালা জড়ানো সেই পুরাণো আবছা ছবিটার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। মুড়ি চিবানো সাঙ্গ করে জল খেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে ছিদাম। সন্ধ্যা সেরে আবার নিঝুম হয়ে বসে থাকে কুব্জা তার দিকে পাশ ফিরে।

কেমন যেন হয়ে গেছে কুব্জা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা। এতক্ষণের লক্ষণগুলি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ছিদাম। নিজে থেকে যেচে সে তাকে এতটুকু আদর যত্নও করে নি। তামাক চাইলে সিগারেট দিয়েছে, মুখ হাত ধুতে চাইলে কাপড় গামছা জল দিয়েছে, খেতে চাইলে মুড়িগুড় খেতে দিয়েছে। দিয়েছে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে, আগ্রহে একেবারে যেন অধীর হয়ে পড়ে, কিন্তু চাইলে তবে দিয়েছে, যা চেয়েছে শুধু সেইটুকু। কিছু যেন খেয়াল নেই কুব্জার, মনে নেই। একদিন সে স্বামী ছিল সেটা নয় বাদ গেল, একটা মানুষ ঘরে এলে, একটা মানুষকে ঘরে ডেকে বসালে, তার সুখসুবিধার দিকে যে একটু তাকাতে হয় তাও কুব্জা ভুলে গেছে। খেয়ে উঠেছে, তাকে এখন আরেকটা সিগারেট দিলে হয়। না চাইলে কি দেবে ! চাইলে হয়তো লাফিয়ে উঠবে দশটা দেবার জন্য !

তবে, গোড়ায় ভড়কে গিয়ে বিদায় নিতে চাইলে কুব্জা তাকে বসতে বলেছিল। মুখ ফুটে ছিদামকে বলতে হয় নি, বসুম না কি ? তা, এক হিসাবে ধরলে, এতকাল পরে ফিরে এসেই চলে যাওয়ার কথা বলা মানেই তো ডেকে বসতে বলতে মনে করিয়ে দেওয়া !

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ছিদাম। কুব্জাকে এভাবে আবিষ্কার করার অস্বস্তি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু। বাইরে বাদলার আঁধার, ঘরে পিদীমের মিটিমিটি আলো, তারা, দুজন থাকলেও তাদের ঘিরেই যেন নির্জ্জনতা আর স্তব্ধতা থম থম করছে। তার ভাঙ্গাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বৌটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতী—নতমুখে ঝিম ধরে বসে আছে তো বসেই আছে ! ছিদামের মধ্যে যুগযুগান্তের পুঁজি করা স্তূপাকার রহস্যানুভূতি আর ভয় পাকিয়ে পাকিয়ে মাথা তুলতে থাকে ধীরে

ধীরে। এরকম কত গল্প সে শুনেছে কত লোকের মুখে। দশ পনের বছর পরে বিদেশ থেকে মানুষ ফিরল সাঁজসন্ধ্যায়. দেখল ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিল তেমনি গিজ গিজ করছে বাড়ী ভরা আত্মীয় পরিজন—অথবা ভেঙ্গেচুরে গেছে ঘরবাড়ী, তার মধ্যে মাথা গুঁজে আছে দু'একজন আপনার লোক। অথচ অনেকদিন আগেই একরাত্রে রোগে কিম্বা দুর্ঘটনায় ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সব মরে বাড়ীটা শ্মশান হয়ে গেছে, সন্ধ্যার পর সে পোড়ো বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ হাঁটে না। বাড়ী যে তার শুধু মায়া, আপনজনেরা রক্তমাংসের জীব নয় বিদেশী মানুষটা তা শুধু টের পেয়েছে বৌকে কাঠের বদলে উনানে নিজের পা গুঁজে রাঁধতে দেখে অথবা কোন জিনিষ চেয়ে সেটা আনতে বৌকে একঘর থেকে আরেক ঘরে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখে।

কে জানে এ ঘরবাড়ীও তার মায়া কি না! কুন্জা হয়তো সুশ্রী সুন্দর করেছে বাড়ীটা, নিজেকে করেছে সুন্দরী তাকে ভোলাবার জন্য! গায়ে হাত দিয়ে দেখবে একবার কুন্জার গায়ে খাঁটি রক্তমাংস কি না?

মা ও মেয়ের কথা এতক্ষণ জিজ্ঞেস করে নি খেয়াল হয় ছিদামের। খানিকটা সে কাছে সরে যায় কুন্জার।

'নাই, কেউ নাই, সকলে মরছে।' কুন্জা বলে মুখ না ফিরিয়েই, 'আমি পোড়া-কপাইলা, আমি ছাড়া মইরা জুড়াইয়েছে সব।'

ছিদাম একটা হাত রাখে কুন্জার পিঠে। কুন্জা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়, তাকিয়েই থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার মুখ সোজা করে আগের মতই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বেড়ার দিকে।

কি বলবে কি করবে তারা ভেবে পায় না, তেমনিভাবেই বসে থাকে দুজনে। আরেকটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে টানা যেতে পারে, এ কথাটা সবে মনে পড়েছে ছিদামের, বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

'কেডা?' কুন্জা শুধায়।

'আমি।' জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিস ফিস করে কুন্জাকে শুধায়, 'ললিতবাবু নাকি?'

কুন্জা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

'কি করণ যায় অখন!'

'কি জানি।'

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়, আবার ললিত ডাকে। কুন্জা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মত বসে থাকে।

'খুলে দে।' ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ভিতরের রোয়াক থেকে ভিখারীর ছাড়া পোষাকের বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বাঁশবনের ধার ঘেঁষে রাস্তায় নেমে পড়ে। টিপি টিপি বৃষ্টিটা তখন ধরেছে। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি, বিদ্যুতের ঘন ঘন চমক ও আওয়াজ।

বাংলার আর্থিক অবস্থা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

কিছুদিন থেকে অনেক বাঙালীর মনে দেখেছি যেন একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে বাংলা দেশের যে অবস্থা তাতে তার সর্ব-ভারতীয় ব্যাপারের সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন, কেননা নিখিল-ভারতের সাধারণতঃ যাতে সুবিধা আমাদের তাতে অসুবিধা। এ ধারণার মূলে যে প্রাদেশিকতা ও স্বার্থবুদ্ধি আছে সেটুকু বাদ দিলেও এ কথা স্বীকার ক'রতে হবে যে নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের এমন একটি পর্যায় এসে উপস্থিত হয়েছে যেখানে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সত্যই তার অমিল আছে। তার মূল কারণ হচ্ছে তিনটী। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের আধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ প্রথম আরম্ভ হয় বাংলাদেশে—বাংলাই ইংরেজ সাম্রাজ্যের আদিভূমি। সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশে সে বিকাশ দেখা দেবার আগেই বাংলায় তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একটা উদাহরণ দিই। অন্যান্য প্রদেশে এতদিনে সুস্পষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠছে। কিন্তু বাংলায় মধ্যবিত্তসমাজ বহুদিন আগে গড়ে উঠে তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য শেষ করে ভাঙনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং সমস্ত ভারত যদি এখন মধ্যবিত্তসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্যাগুলিতে দেখতে চায়, তাতে বাংলার সুবিধা না হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মধ্যবিত্তসমাজ খুব আগেই গড়ে উঠল বটে, কিন্তু যখন কালক্রমে তার ঐতিহাসিক সার্থকতা কমে আসতে লাগল এবং নতুন শ্রেণী উদ্ভাবনের প্রয়োজন হল তখন বাংলা গেল পিছিয়ে। ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, মধ্যযুগকে দূর করে ধনতান্ত্রিক যুগ। কিন্তু উপনিবেশের বেলা সে নিয়ম খাটে না। তার কারণ, উপনিবেশের মধ্যযুগ অল্পই দূর করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, অংশতঃ তাকে টিকিয়েও রাখে যাতে দেশী ধনতন্ত্র মাথা তুলতে না পারে। এই কারণেই সেসময় আমাদের সমাজ-নেতৃত্ব পড়েছিল

মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর। কিন্তু যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ এদেশের চেহারা বদলাতে আরম্ভ হল এবং ধনতন্ত্র একটু একটু করে দেখা দিতে লাগল সেসময় মূলধন চলে গেল বাংলা ছেড়ে পশ্চিম ভারতে। সেইজন্য এখন যদি এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় তাহলে লাভ হবে যেসব প্রদেশে মূলধন আছে তাদের, আর বাংলা সে লাভের অংশীদার হতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যখন ইংরেজসাম্রাজ্যের প্রথম যুগে বাংলা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে আগে বিকশিত হচ্ছিল সেসময়েও তার অখিল-ভারতের সঙ্গে অমিল ছিল—তবে সেসময় লাভ ছিল বাংলারই কেননা তখন সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্ব চলছে। তারপর এলো মধ্যবিত্তসমাজের ভাঙনের দিন এবং পুঁজিপতিদের আবির্ভাব। এ যুগেও অন্য প্রদেশেরসঙ্গে বাংলার অমিল। তবে এবার অবস্থা উল্‌টো—লাভের অংশটা এবার আর বাংলার ভাগে নয়, এবার ক্ষতির পালা বাংলার, লাভের পালা অন্যের। তৃতীয়তঃ, এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আমাদের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা। নিখিলভারতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য কোনও সুবিধার ব্যবস্থা করলে নিখিলভারতে যে সম্প্রদায় তা উপভোগ করে বাংলায় তা উপভোগ করে অপর সম্প্রদায়—আর নিখিলভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য কোনও ব্যবস্থা হলে অন্যত্র যে সম্প্রদায় তার আস্বাদন করে এখানে সে সম্প্রদায় তা হতে বঞ্চিত হয়। তার কারণ, অন্য সর্বত্র যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এখানে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ।

এই সব নানা কারণে বাংলায় অনেক বিদ্বেষ ও সন্দেহ অনেক সময় ঘনীভূত হয়, যার থেকে উদ্ধার না পেলে আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি সুস্থভাবে পরিচালিত হবে না। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই সুস্থ আদর্শ স্থাপিত করতে হলে দুটী কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ, এ সব সন্দেহের কি কি কারণ ঘটছে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে জানতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি দেখা যায় যে কোনও কোনও বিষয়ে বাংলা বেশীরকম ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে সে বিষয়ে সে-ও সুস্থ দাবী জানাতে পারে, আর নিখিল ভারতকেও সে দাবী পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এইরকম পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এই সব সন্দেহ বিদ্বেষ দূর হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান প্রসঙ্গে এমন একটী বিষয়ের উল্লেখ করছি যেখানে বাংলা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ঢের বেশী অসহায়। সেটী হল বাংলার আর্থিক অবস্থা। যুদ্ধের ফলে এবং অন্যান্য কারণে বাংলার অবস্থা এতই শোচনীয় যে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় তার বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

২

মহাযুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের উপর যত পড়েছে তত আর বোধ হয় কোথায়ও পড়ে নি। তেমনই এই যুদ্ধের মূল্য বাংলাকে যেমন দিতে হয়েছে অন্য কোনও প্রদেশকে তত দিতে হয় নি। অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণ নিয়ে তার মূল্য আর কোথায়ও আদায় হয় নি।

বাংলার এই আর্থিক শোষণের কয়েকটা হিসাব নেওয়া দরকার। প্রথমে, বাংলার বাজেটগুলি আলোচ্য। নতুন শাসনতন্ত্র চালু হবার পর বাংলাদেশের যে প্রথম বাজেট হয় (১৯৩৭-৩৮ সাল) সে বাজেটে অনুমানিক আয় ছিল ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ, ব্যয় ছিল ১২ কোটি ২১ লক্ষ, উদ্বৃত্ত ছিল আনুমানিক ৩৪ লক্ষ। সে বছর অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার নানা পরিকল্পনার কথা তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেন, তাঁর আশা ছিল যে বাংলায় অনেক কিছু করা সম্ভব হবে। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ অবস্থা বদলে গেল। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা দূরে থাক্, অত্যাবশ্যক ব্যয় বহন করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। নিম্নলিখিত হিসাবগুলি বিবেচ্য ঃ—

(লক্ষ টাকার হিসাব)

	১৯৩৮—৩৯ (প্রকৃত হিসাব)			১৯৩৯—৪০ (প্রকৃত হিসাব)			১৯৪৬—৪৮ (বাজেট ঃ অনুমানিক হিসাব)		
	আয়	ব্যয়	ঘাটতি (—) বা বাড়তি (+)	আয়	ব্যয়	ঘাটতি (–) বা বাড়তি (+)	আয়	ব্যয়	ঘাটতি (—) বা বাড়তি (+)
মাদ্রাজ	১৬,১৩	১৬,১০	+ ৩	১৬,৬৬	১৬,৩৭	+২৯	৪১,৪৪	৪০,৮২	+৬২
বোম্বাই	১২,৪৫	১২,৮০	—৩৫	১৩,১৪	১২,৮৩	+৩১	৩০,২০	৩০,১৫	+ ৫
বাংলা	১২,৭৭	১২,৭৭	.....	১৪,৩২	১৩,৭১	+৬১	৪১,১৯	৫০,৬৫	—৯,৪৬
যুক্তপ্রদেশ	১২,৮০	১২,৮০	.....	১৩,৫২	১৩,৪৫	+ ৭	২৭,০৭	২৭,০৩	+ ৪
পাঞ্জাব	১১,১৭	১১,৬১	—৪৪	১১,৬৯	১২,০৬	—৩৭	২১,৩০	২০,৮৩	+৪৭
বিহার	৫,২৪	৪,৯৩	+৩১	৫,৪৮	৫,৩৬	+১২	১৩,৮৯	১৩,৩৯	+৫০
মধ্যপ্রদেশ	৪,২৭	৪,৭১	—৪৪	৫,০৯	৪,৭৬	+৩৩	৯,০৫	৮,৪৪	+৬০
আসাম	২,৫৮	২,৯৯	—৪১	২,৯৩	২,৯২	+ ১	৫,১৬	৫,০৫	+১১
উঃ পঃ সীমান্ত	১,৮১	১,৭৮	+ ৩	১,৮৩	১,৮৭	— ৪	২,৬৩	২,৭৮	—১৫
উড়িষ্যা	১,৮২	১,৮১	+ ১	১,৮৮	১,৮৪	+ ৪	৩,৫৮	৩,৯২	—৩৪
সিন্ধু	৩,৭০	৩,৪৬	+২৪	৪,২৯	৪,০৫	+২৪	৮,০৩	৮,০০	+ ৩

এ হতে দেখা যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় বাংলা দেশের কি অবস্থা ছিল এবং যুদ্ধ শেষ হবার পর তার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে যে উদ্বৃত্ত ছিল ১৯৩৮-৩৯

সালে দেখি তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর এলো মহাযুদ্ধ। সব জিনিষেরই দাম চড়তে লাগল এবং যুদ্ধ তখনও ঘরের কাছে না আসায় কিছু কিছু লাভও হতে লাগল। সেইজন্য সব প্রদেশেরই মোট আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ বাড়তে লাগল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটল উদ্বৃত্ত। বাংলায় সেবার ঘটে ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত, মাদ্রাজে ২৯ লক্ষ, বোম্বায়ে ৩১ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশে ৭ লক্ষ। কিন্তু তারপরই চেহারা গেল বদলে, যুদ্ধ ঘরের কাছে এসে পড়ল। বাংলার ঘাটতির পরিমাণ কিভাবে বাড়তে লাগল নিম্নলিখিত হিসাব থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে ঃ—

বাংলা

(লক্ষ টাকার হিসাব)

	১৯৩৮-৩৯ (প্রকৃত হিসাব)	১৯৩৯-৪০ (প্রকৃত হিসাব)	১৯৪৪-৪৫ (প্রকৃত হিসাব)	১৯৪৫-৪৬ (সংশোধিত হিসাব)	১৯৪৬-৪৭ (অনুমানিক হিসাব)
আয়	১২,৭৭	১৪,৩২	৩৯,৩৯	৩৫,৮২	৪১,১৯
ব্যয়	১২,৭৭	১২,৭১	৪৪,১২	৪৩,২৭	৫০,৬৫
ঘাটতি (—) বা বাড়তি (+)	..	+৬১	—৪,৭৩	—৭,৪৫	—৯,৪৬

এ হতে তিনটী জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। (১) প্রথমতঃ, বাংলার উদ্বৃত্ত যা কিছু ছিল সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গেছে, উপরন্তু ঘটেছে বিপুল ঘাটতি। একসময়ে বাংলার মোট বাজেট ছিল নয় দশ কোটি টাকার; এখন ঘাটতিরই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা। (২) অন্যান্য প্রদেশের যেসময় ঘটেছে বাড়তি, বাংলার সে সময় ঘটেছে ঘাটতি। এবার উড়িষ্যা ও বাংলা ছাড়া আর অন্য কোনও প্রদেশে ঘাটতি ঘটে নি। আসামও তো যুদ্ধের ধারে কাছে ছিল, কিন্তু সেখানেও ঘটেছে ১১ লক্ষ টাকার বাড়তি। মাদ্রাজে ৬২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত, পাঞ্জাবে ৪৭ লক্ষ টাকা, অন্যান্য প্রদেশেও কম বেশি উদ্বৃত্ত আছে, শুধু বাংলাতেই ঘাটতি। আর, সে ঘাটতির পরিমাণ কি বিপুল! বাংলা নিঃসম্বল হয়ে অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে চাতকবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে। (৩) বাংলা যে কতদূর নিঃসম্বল হয়েছে তা বোঝা যায় তার আয় ব্যয়ের অঙ্ক দেখলে। যুদ্ধারম্ভের ঠিক আগের বছর বাংলার বাজেট ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকার। সেই অঙ্ক বাড়তে বাড়তে এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এত বৃহৎ অঙ্ক অন্য কোনও প্রদেশে নেই। তার অর্থ কি? যেখানে আয় ছিল ১২ কোটি, বা ১৩ কোটি সেখানে আজ করভার বাড়াতে বাড়াতে ও জনসাধারণকে শোষণ করতে করতে আয় ঠেলে তোলা হয়েছে ৪১ কোটিতে। তবুও

ব্যয়ের পরিসীমা নেই। এত আয়, তবুও ব্যয় তাকেও ছাড়িয়ে গেছে, এতই ছাড়িয়ে গেছে যে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

বাংলা দেশে কিভাবে জনসাধারণকে শোষণ করে এই বিরাট আয় হচ্ছে সেটাও বিবেচনা করা দরকার। যুদ্ধের প্রথম বছর এবং যুদ্ধের শেষ বছর কোন কর হতে কত আয় হয়েছে তার হিসাব দিচ্ছি :—

		১৯৩৯—৪০ (প্রকৃত হিসাব)	১৯৪৫—৪৬ (সংশোধিত অনুমানিক হিসাব)
১।	কৃষি আয় কর	..	৬০,০০,০০০
২।	ভূমি রাজস্ব	৩,৮৬,১০,০০০	৩,৯৫,৫৫,০০০
৩।	আবগারী	১,৬৫,২৭,০০০	৭,৯৯,৮৬,০০০
৪।	স্ট্যাম্প	২,৫৬,৪৪,০০০	৩,৬০,০০,০০০
৫।	রেজিষ্ট্রেশন	২৭,৩১,০০০	৬৬,০০,০০০
৬।	অন্যান্য ট্যাক্স ও মাশুল—		
	প্রমোদ কর	৮,০১,০০০	৫৫,০০,০০০
	জুয়ার ট্যাক্স (Betting Tax)	১১,৩৩,০০০	৮০,০[illegible],০০০
	ইলেকট্রীসিটি মাশুল	২০,২৪,০০০	৫৫,০০,০০০
	জীবিকার ট্যাক্স ইত্যাদি (Profession Tax)	৭,০৩,০০০	১০,৩৪,০০০
	বিক্রয় কর	...	৩,০০,০০,০০০
	পেট্রোল কর	...	২,০০,০০,০০০
	কাচা পাটের ট্যাক্স	...	৪০,০০,০০০
	মোটর গাড়ীর আইনে প্রাপ্য	২[illegible],৩১,০০০	২৭,০২,০০০
		[illegible],০৩,০৫,০০০	২৪,৪২,৭৭,০০০

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩৯-৪০ সালে বাংলাদেশে যে সব খাতে ৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে সেই সব খাতে গত বছর আদায় হয়েছে প্রায় ২৪½ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগের চেয়ে আড়াই গুণেরও বেশি। একটী একটী করে করগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে কিভাবে শোষণ চরমে উঠেছে। প্রথম কৃষি আয় কর। যখন ফ্লাউড কমিশন ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে তদন্ত করেন সে সময় তাঁরা মন্তব্য করেন যে যদি কৃষি-আয়-কর বসানো হয় তাহলে তার সমস্ত টাকাটাই কৃষি এবং কৃষকদের উপকারে যাবে। যখন কৃষি-আয়-কর বসাবার কথা সত্যই হল, তখন পরিষদকক্ষে বিরোধী দল ফ্লাউড কমিশনের কথা তৎকালীন মন্ত্রীমণ্ডলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁরা তাতে দৃক্‌পাত করলেন না। অর্থসচিব

শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী তাঁর বক্তৃতায় বললেন I quite realise that what the Floud Commission had in mind was that the proceeds of the tax should be devoted to the development of agriculture. In other words, the agricultural income-tax would in that case be a kind of compulsory investment. But situated as we are today and as we are likely to be for some time to come, it would be impossible to earmark the proceeds of the agricultural income tax for a particular purpose. We want money to save the nation and we cannot proceed on lines which are ordinarily recommended to us by the canons of taxation. (*Vide Bengal Legislative Assembly Proceedings*, 16th Sept. 1943) তার ফলে তাঁরা বছর বছর এই ৫০৷৬০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের খরচ জোগাতে এবং অন্য ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন, চাষীর ও চাষের উপকার হওয়া দূরের কথা। তারপর আবগারী। ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার জায়গায় আয় হয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে দেশী মদ, গাঁজা ও আফিম হতেই আয় সব চেয়ে বেশী। আবগারী করের হার ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে। ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রিতে আয় বেড়েছে। দুর্ভিক্ষের সময়, এবং এখনও, জমি হস্তান্তর হলে ষ্ট্যাম্প বা রেজিষ্ট্রির আয় বাড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য ট্যাক্সের মধ্যে প্রমোদকর বেড়েছে প্রায় ৭ গুণ। জনসাধারণের উপর যতদিকে সম্ভব ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে। জুয়ার উপর ট্যাক্স বেড়েছে ৮ গুণ। ইলেক্‌ট্রিকের উপর ট্যাক্স বেড়েছে আড়াইগুণ। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের উপর এর চাপ সহজেই অনুমেয়। তার উপর বেড়েছে বিক্রয় কর। এই কুখ্যাত করের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু কথা বলারই দরকার নেই—অথচ গবর্ণমেণ্ট বেশ বছরের পর বছর করের হার বাড়িয়ে যাচ্ছেন। এ বছর এর অনুমিত আয় হচ্ছে তিন কোটি টাকা। এই হল বাংলা সরকারের কথা। এর উপর আছে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স (যেমন, সুপারি ট্যাক্স ইত্যাদি)।

অবশ্য একটা যুক্তি দেওয়া যায় যে, হলই বা আয়ব্যয় বেশী,—তাতে ক্ষতি কি যদি রাষ্ট্র এভাবে সংগৃহীত অর্থ জাতির উন্নতির জন্য খরচ করে? এ যুক্তি ঠিক যুক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এইভাবে সংগৃহীত অর্থ কিসে বেশী খরচ হয়েছে? বিস্তারিত হিসেব দেবার আগে বিভিন্ন বছরের অর্থসচিবদের কিছু কিছু স্বীকারোক্তি তুলে দিচ্ছি, তা হতেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে :—

(১) ১৯৩৭ সালে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার—Though the Finance Minister is answerable for the presentation of the Soundness and Stability of the finances of the Province, he has the obligation to find the ways and

means of accomplishing what the Legislature may accept as immediate social ends. ...For some years to come it may not be possible to take up simultaneously or to the full extent all the problems of our national reconstruction, but I hope it will not be very long before we shall be in a position to prosecute a comprehensive programme with profit and success (Proceedings 29. 7. 37)

(২) ১৯৪২ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—The situation which confronts us today is without parallel in the history of our country. The War is now at our door...In the estimate that I shall place before the House this afternoon, "Nation-Saving" takes the place of "Nation-building." (Proceedings, 16.2.42).

(৩) ১৯৪৩ সালে মিঃ ফজলুল হক্—It would be the height of folly to think that one could change overnight and without confusion from the haphazard distribution of peace-time plenty to a system of distribution that aims at the most equitable and economical use of the supplies available. (Proceedings 16.2.43)

(৪) ১৯৪৪ সালে শ্রীযুত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী—Bengal, once so richly dowered with Nature's bounties, is today bent double with woe and agony and is a suppliant for neighbourly help (Proceedings 14. 9. 43)

(৫) ১৯৪৪ সালে শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী--We have seen and heard of death by the thousand in circumstances which might easily make us suspect that all is not well with civilisation based on the Idea of Progress. (18. 2. 44.)

(৬) ১৯৪৫ সালে শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী—Our most urgent tasks nevertheless has been, and will for some time continue to be, the rehabilitation of our people. (16. 2. 45)

বক্তৃতা ছেড়ে হিসাবের কথায় আসা যাক্। Extraordinary Charges in India বলে কতকগুলি খরচের হিসাব দেওয়া হয়—এগুলি সবই যুদ্ধসংক্রান্ত খরচ। তা হতে দেখা যায় ১৯৪১-৪২ সালে এই খরচের আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৭৮,২৫,০০০ টাকা। ১৯৪২-৪৩

সালে তা বেড়ে হয় ১,২৫,২৯,০০০ টাকা। খরচ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তারপর তা বেড়ে বেড়ে কোথায় পৌঁছল তা নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে ঃ—

যুদ্ধসংক্রান্ত অতিরিক্ত খরচ

(*Vide* Assembly Proceedings, 16. 2. 45)

১৯৪৩-৪৪ সাল	১৯৪৪-৪৫ সাল	১৯৪৫-৪৬
প্রকৃত হিসাব	সংশোধিত অনুমান	বাজেটের অনুমান
১৪,২১,৫০,০০০ টাকা	২৯,০৮,০০,০০০	১৮,১০,০০,০০০ টাকা

দেখা যাচ্ছে ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৪ কোটি, পর বছর ২৯ কোটি এবং গত বছর ১৮ কোটি টাকা যুদ্ধের জন্য খরচ হয়েছে। ১৯৪৫-৪৬-এ যদি মোট ব্যয় ৪৩ কোটির কাছাকাছি হয়ে থাকে তাহলে তার শতকরা ৪২% ভাগ খরচ হয়েছে যুদ্ধের দক্ষিণা জোগাতে। ১৯৪৪-৪৫ সালে যদি মোট ব্যয় হয়ে থাকে ৪৪ কোটি টাকা, তাহলে তার শতকরা ৬৬% ভাগ গিয়েছে যুদ্ধের মূল্য দিতে।

এই যুদ্ধের দক্ষিণা কি ? অন্য দেশে, এমন কি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও, যুদ্ধব্যয় অনেকসময় জনসাধারণের কাজে লেগেছে। যেমন, পাঞ্জাবে অধিকাংশ যুবকই সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ায় সরকার সৈন্যদের জন্য যা খরচ করেন তা আবার গ্রামেই ফিরে যায়। বাংলায় কিন্তু অবস্থা অন্যরকম। এখানে বেশী লোক যুদ্ধে যোগদান করে নি। সেইজন্য আমরা কেবল দক্ষিণা জুগিয়েই গিয়েছি, তার লাভ একটুও পাই নি। কি কি ব্যাপারে এই যুদ্ধব্যয় হয়েছে দেখলেই তা স্পষ্ট হবে। এর মধ্যে আছে দুটি প্রধান ভাগ যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধের খাতে খরচ পড়েছে বেসামরিক রক্ষা, হোমগার্ড, অতিরিক্ত পুলিশ, জেলের অতিরিক্ত খরচ, মাগ্‌গি ভাতা, কলিকাতা কর্পোরেশনে সাহায্য, (এটা ১৯৪৩-৪৪ সালের পর আর দেওয়া হয় নি), সিভিল সাপ্লাই বিভাগ এবং খাদ্যশস্যে লোক্‌সান—এগুলির উপর। আর দুর্ভিক্ষ খাতে খরচ পড়ছে টেস্‌ট ওয়ার্ক, বিনাশর্তে সাহায্য, কম্বল, বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ খরচ হয়েছে ফসল-বাড়াও আন্দোলনে। বছরে ১ কোটি, সওয়া কোটি টাকাও এরজন্য খরচ হয়েছে। এতে ফসল কতটা বেড়েছে তা প্রত্যেক বাঙালীই জানে।

এর সঙ্গে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আসল যা যা দরকার তার কিছুই হয় নি। আমাদের শিক্ষা, আমাদের কৃষি বা শিল্পের অগ্রগতি—এ সবের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। কেবল কর আদায় করা হয়েছে এবং যুদ্ধের দক্ষিণা জোগানো হয়েছে। কিন্তু এতোতেও তো আমাদের উপর শোষণ শেষ হয় নি। কর তো আদায় হল, কিন্তু সেইসঙ্গে ঋণ-গ্রহণের হিসাবটাও আলোচ্য। বাংলাদেশে কর বসিয়ে যেরকম আদায় করা হয়েছে ঋণের

অছিলাতেও তার কম শোষণ হয় নি। ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে নিজেদের ট্রেজারি বিল ব্যবস্থা করতে বলেন, তার পর থেকে বাংলা সরকার সেই ব্যবস্থা করেছেন। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু ইন্‌ফ্লেশন কমাবার নাম করে যে সমস্ত ঋণ আদায় হচ্ছিল সেগুলিও প্রায় কর-আদায়ের সামিল। বিভিন্ন প্রদেশে কত ঋণ আদায় হয়েছে তার হিসেবটাও বিবেচ্য। হিসেবটা তুলে দিলাম ঃ—

কোন্ প্রদেশে কত আদায় করা হবে স্থির হয়েছে

(হাজার টাকার হিসেব)

	বাংলা	বোম্বাই	মাদ্রাজ	পাঞ্জাব	মধ্যপ্রদেশ	বিহার	যুক্তপ্রদেশ
১৯৪৬ সাল	২৮,০০,০০	৭০,০০,০০	২২,০০,০০	২৬,৫০,০০	১৪,০০,০০	৯,০০,০০	২০,০০,০০

দেখা যাবে, বোম্বাই ছাড়া, বাংলা দেশেই সব চেয়ে বেশী আদায় করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার অবস্থা কি এত স্বচ্ছল? এ কি ইন্‌ফ্লেশন কমাবার চেষ্টা, না আসলে বাজেটের ঘাটতি মেটাবার উপায়?

এ হল প্রত্যক্ষ শোষণ। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের করভারটাও যোগ করতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া আরও বহু অপ্রত্যক্ষ শোষণ আছে। বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত দুর্ভিক্ষটাই শোষণের চরম উদাহরণ। লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে এই শোষণের ফলে, লক্ষ লক্ষ লোক নির্বীর্য্য ও জীবন্মৃত হয়েছে শোষণের ফলে, লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা হারিয়েছে এই শোষণের ফলে। বাংলার সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, ও সাংস্কৃতির জীবন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। শুধু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু চারটা কথা বলে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। বাংলার যা অবস্থা তাতে যদি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলতে হয় তাহলে কতকগুলি মূলনীতি গ্রহণ করা দরকার। (১) প্রথমতঃ, বাংলা দেশের কৃষির সুব্যবস্থা। সেচ, ভূমিরাজস্ব-সংস্কার, জমির উন্নতি—সব কিছুই এর মধ্যে আসে। (২) সেইসঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ অবহিত হতে হবে। এ কথা বলবার কারণ আছে। বাংলা দেশ শিল্পে বেশী অগ্রসর নয়। অথচ এমন ভারতবর্ষে শিল্পের, বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্পের, দ্রুত প্রসার আশা করা যায়। এ সময় বাংলাকে যদি বিশেষ সাহায্য না করা যায় তাহলে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তাল রাখা দূরের কথা, বাংলাদেশ সত্যই অত্যন্ত পিছিয়ে পড়বে। সেইজন্য তার বিশেষ সাহায্য দরকার। (৩) সেইসঙ্গে দরকার আর্থিক বিলিবন্দোবস্তের নতুন ব্যবস্থা। এভাবে অর্থনষ্ট হলে চলবে না। বাংলা দেশের এত সমস্যা রয়েছে, তার জন্য কোটি কোটি টাকার দরকার—অথচ বাংলাকে শোষণ করে এমন অবস্থায়

দাঁড় করানো হয়েছে যে তার আর নতুন কর দেবার সামর্থ্য নেই। কাজেই এ ব্যবস্থার বদল না হলে সমস্ত ভবিষ্যৎ পঙ্গু হয়ে যাবে।

কিন্তু তার আগে জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আসা দরকার। সেইজন্য সবসময়েই স্বাধীনতা হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রথম সমস্যা।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উনিশ

নিজের হাতে লেখা চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তামসী। চিঠি তো নয়, দরখাস্ত। অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে লম্বা দরখাস্ত করেছিল সে। বলেছিল অনেক দুঃখ দুর্দশার কথা, তার অসহায়তার ইতিহাস। যাতে ওদের দয়া হয়, ডাক পড়ে তার। কথার মাঝে রেখেছিল বা একটু ব্যক্তিগত সুর। যাতে দরখাস্তটা চিঠি-চিঠি মনে হয়।

তাকে কারুর ডাকতে হয়নি। তারই ডাকে সে পথ চিনে এসে পড়েছে। বলে কিনা, ট্র্যাম থেকে নামলুম। পিছু নিলুম। দেখলুম সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে উপরে। মিথ্যেবাদী!

শুধুই কি মিথ্যেবাদী? চোর। তার গয়নার বাক্স চুরি করে পালিয়েছে।

রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায় তামসী কাঠ হয়ে রইল। ভেবে পেলনা, সত্যিই এ কি সে বিশ্বাস করবে, না, সমস্তটাই একটা ভুতুড়ে ব্যাপার? সত্যিই কি এখন ভোর হয়েছে, না, এখনো সেই মরকতের সমুদ্রে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে সে?

গয়নার এ্যাটাচি কেসটা ট্রাঙ্কের উপরে ছিল। গা থেকে গয়নাগুলো খুলে রেখে

তাড়াতাড়িতে বাক্সটা আর আলমারির মধ্যে ঢোকানো হয়নি। তখন কি আর তার গয়নার দিকে মন আছে? কিন্তু তখনি হয়তো বাঁকা চোখে বাক্সটা ঠিক দেখে রেখেছিল রণধীর। যদি সেটা আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত তবে এক ফাঁকে আলমারির সে তালা ভাঙত নিশ্চয়ই। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল হয়তো তার যন্ত্রপাতি। যদি রাখত ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে, তবে হয়তো গোটা ট্রাঙ্কটাই তুলে নিত মাথায় করে। দলের লোক ছিল নিশ্চয়ই বাইরে।

কেন এমন হল? কেন এমন হল? শুষ্ক মূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল তামসী।

যদি বলত, দিয়ে দাও তোমার গয়নার বাক্সটা, তবে তামসী কি তা দিয়ে দিতনা? কী মনে হয়? স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিত। তার চেয়ে আরো অনেক বেশি সে দিতে পারত অনায়াসে। কিন্তু সে চেয়ে নিলনা কেন? কেন বা ছিনিয়ে নিল না জোর করে? কেন চুরি করতে গেল? কোন লজ্জায় কোন অপমানে?

দু চোখ কানায়-কানায় ভরে উঠল অশ্রুতে। মনে পড়ল রাজসাহির কথা। একবার বাড়তি পাঁচটা টাকা এসেছিল বাড়ি থেকে, ছাতা কেনবার জন্যে। কলেজে যেতে আসতে অনেকটা পথ হাঁটতে হত তামসীর। রোদ খাঁ-খাঁ করছে, কখনো বা বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। সব সময়েই মাথার উপরে একটুকরো একটু আঁচল তোলা। কিন্তু নিজেই বুঝত সেটা যথেষ্ট নয়; জুতো না হলে চলে কিন্তু ছাতা না হলে চলে না। যেদিন টাকাটা আসে, সেদিনই রাস্তায় রণধীরের সঙ্গে দেখা, চলেছে হনহন করে। ভালই হল, তাকে সঙ্গে করে কিনে আনতে পারবে দোকান থেকে। তাকে দেখতে পেয়েই থেমে পড়ল রণধীর, বললে ব্যস্ত হয়ে—আমাকে কটা টাকা দিতে পার? প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলনা তামসী তবু ঘুণাক্ষরেও সে জানতে চায়নি টাকার দরকার কেন? রণধীর গায়ে পড়ে নিজের থেকেই বললে। বললে, মাথামুটে খাবারওয়ালার থেকে খাবার খেয়েছিলুম ধার করে। মেজদা এখনো টাকা পাঠায়নি, কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে খাবারওয়ালা পিছু নিয়েছে ক দিন থেকে। ব্যাখ্যাটা ভাল লাগেনি তামসীর, তবু সক্ষম বন্ধুতার প্রতিশ্রুতিতে তক্ষুনি জিগগেস করলে,—কত?—এই গোটা পাঁচেক। রণধীর বললে অসহিষ্ণুর মত। রৌদ্র-বৃষ্টি ভুলে গিয়ে কষ্টপ্রাপ্ত সেই পাঁচটা টাকা অম্লানমুখে দিয়ে দিলে তামসী। তারপর তার আর ছাতা হয়নি। কিন্তু রুক্ষ রোদে মনে হয়েছে নিবিড় মেঘের ছায়া করে আছে চারদিকে, আর যখন বৃষ্টি নেমেছে অঝোরে, মনে হয়েছে গায়ে তার জড়ানো আছে বর্ষাতি।

সেই পাঁচটা টাকা রণধীর আর তাকে ফেরত দেয়নি। ছি-ছি-ছি, এ কথা তার মনে হচ্ছে কেন? তার শুধু মনে হওয়া উচিত এমনি ফিরিয়ে না দেবার অধিকার আছে রণধীরের। দাবি আছে দায় নেই। তার শুধু মনে হওয়া উচিত, যা রণধীর চায় আর যা দেবার মত জমা আছে তার তবিলে, সব সে বিনিঃশেষে দিয়ে দিতে পারে। দিয়ে দিতে

পারে দেনা-পাওনার খতেন না করে, তুচ্ছ করে সব ফলাফলের ভাবনা। কিন্তু, না, কেবলই এখন মনে হচ্ছে সেই পাঁচটা টাকা শোধ দেয়নি রণধীর। কেবলই মনে হচ্ছে অতর্কিতে ঘরে ঢুকে চুপি-চুপি চুরি করে নিয়েছে তার গয়নার বাক্স।

না, এ কখনোই হতে পারেনা। মরে গেলেও না। নিশ্চয়ই এমনি কোথাও ঘুরতে গেছে ভোরবেলা। আর, তার মনে নেই, গয়নার বাক্সটা অজ্ঞানে অভ্যাসবশে রেখে দিয়েছে আলমারিতে, নয় তো, ট্রাঙ্কে। মেঝের উপর বসে ছিল, ধড়মড় করে উঠে পড়ল তামসী। আলমারিটা খুলে ফেলে ছু হাতে তছনছ করতে লাগল শাড়ি-জামা, যত কিছু জিনিসপত্র। এ ট্রাঙ্ক থেকে ও ট্রাঙ্ক। আনাচ-কানাচ। কিন্তু কোথায় গয়নার বাক্স।

'কী খুঁজছ গো দিদিমণি ?' ঝি জিগগেস করলে।

সত্যিই তো। কী খুঁজছে সে ? গয়নার বাক্স ? শূন্য হাতড়াতে লাগল তামসী। না, খুঁজছে সে তার নাম, তার প্রেম, তার এতদিনের প্রতীক্ষা।

'শিগগির চা করে দাও স্টোভ জেলে। আমি এখুনি বেরুব।'

'সেই তোমার রাতের বাবুটি কোথায় গেলেন দিদিমণি ?'

তামসীর গলা এতটুকু কাঁপল না। বললে, 'ভোররাতে উঠে বেড়াবার অভ্যেস। বাইরে গেছেন।'

বিছানায় এখনো যেন তার স্পর্শছায়া শুয়ে আছে। সেই দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশব্দ হয়ে তামসী বলে উঠল ঃ মিথ্যেবাদী ! চোর !

আর, তুমি মিথ্যেবাদী না ? দরখাস্তে যে অত কাঁদুনি গেয়েছিলে, খেতে পাচ্ছনা, নিরীহ একটা আশ্রয়ের জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমার উপরে নিঃস্ব একটা পরিবার নির্ভর করে আছে—এ সমস্ত আগাগোড়া ছলনা নয়, শঠতা নয় ? আর, চোর যে বলছ, তুমি কী ? এ কিসের পণ্যবীথি খুলে বসেছ তুমি ? এত বিভ্রম, এত বিলাস, এত লাবণ্য ? এই কৌচ আর কার্পেট, এই গয়না আর পোষাক, এই ফেনধবল বিছানা ! তারপর জিগগেস করি চাপা গলায়, গভীর মধ্যরাতে কে আসে ঐ নট-নাগর ?

কিন্তু তাই বলে চুরি ?

খুব ভোরেই আজ স্নান করল তামসী। যেন একটা ধূলিস্পর্শ থেকে সে মুক্তি চায় তাড়াতাড়ি। ঝি এসে চা দিয়ে গেল। হ্যাঁ, এখুনিই সে বেরুবে। সোজা চলে যাবে থানায়। স্পষ্ট এজাহার করবে। কাকে আপনি সন্দেহ করেন ? এ আর সন্দেহ কি ! একেবারে সোজা সাফ কথা। তার এ মুহূর্তে বেঁচে থাকার মতই প্রত্যক্ষ।

রাস্তায় নেমে এল তামসী। কে জানে হয়তো কোন বড় কাজের জন্যেই গয়নাগুলোর দরকার হয়েছে। বারে-বারে হয়ে যায়নি তার পরীক্ষা ? আর, যে-কাজে তাকে সে নিলনা,

নিল শুধু তার গয়নাগুলো সে-কাজকে সে বড় বলবে কোন মন দিয়ে ? আশ্চর্য, তার থেকে তার গয়নাগুলোকেই বেশি দামী মনে হল। তাকে কাছে পাওয়ার থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দূরে চলে যাওয়াটাই লোভনীয় লাগল। আশ্চর্য, তার ঘুমন্ত, নির্জন দেহটার পর্যন্ত কোনো দাম ছিল না। রাজনীল মরকতের চেয়ে দামী হল তার কাছে কাঁচের টুকরো, পাথরের নুড়ি।

থানাটা বেশি দূরে নয়। উত্তরমুখো একটা ট্র্যাম ধরল তামসী। সকালবেলা তত ভিড় নেই ট্র্যামে। একটা সিটে বসে শূন্য চোখে সে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। যেন ত্বরা নেই, লক্ষ্য নেই, সামর্থ্য নেই। সত্যিই সে অপহৃত, নিঃস্বকৃত।

সত্যি, দেহে আর তার আছে কি, কাঠ বেরিয়ে পড়েছে। জামাটা গা থেকে খুলে ফেললে হয়তো পাঁজর গোনা যায় একেক করে। যেন পাহাড়ের চুড়ো থেকে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। খাবার নেই, পরবার নেই, মাথা গোঁজবার মত নেই এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়। একটা মূঢ় ভয় তাকে তাড়া করে ফিরছে, লাঞ্ছনার বেদনা তাকে থামতে দিচ্ছে না একজায়গায়। সে ব্যর্থ, বিধ্বস্ত, সমাজের সে অমনোনীত, তাই সে অন্ধকার কোণ খুঁজছে, দাঁড়াতে পারছে না সারল্যের সূর্যালোকে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক নৈরাশ্যের থেকে আরেক নিষ্ফলতার মধ্যে। তার জন্যে সম্মান নেই, বিশ্বাস নেই, তাই নিজেও সে সম্মান করতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছেনা। জীবনের ভাণ্ডার থেকে সমস্ত আশা-আদর্শ ব্যয় হয়ে গিয়েছে নিঃশেষে। ফসলের ক্ষেত ভরে গিয়েছে আগাছায়। যার হবার কথা ছিল স্বর্ণচূড়া, সে এখন ভাঙা মন্দিরের অবশেষ।

ট্র্যাম চৌরঙ্গিতে চলে এসেছে।

তামসীকে দেখে আনন্দে চমকে উঠেছিল রণধীর। ডেকে উঠেছিল অসি বলে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল মর্চে পড়েছে তলোয়ারে। চারিদিকে শুধু মিথ্যে আর কপটচারের চাকচিক্য। সাধনার বদলে এখন শুধু প্রসাধনের বেসাতি। তামসীকে দেখে রণধীরের ঘেন্না ধরে গেল। তার মাঝে আর সেই তামসী রাত্রির পবিত্র দ্যুতি নেই, সে এখন সত্যি-সত্যি মসীময়ী। তার শরীরেও যেন কোনো শোভা নেই, আহ্বান নেই। সে এখন বাজে জিনিসের সামিল। ঘেন্নার থেকে ক্রমে-ক্রমে জ্বালা ধরে গেল রণধীরের রক্তে। সে সংগ্রামের মাঝে থেকে কত ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, আর তামসী কেমন মসৃণ স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে চলেছে মোলায়েম পাল তুলে দিয়ে। সেই মহাসমুদ্রের পথ কোন পঙ্কিল স্রোতমুখে কোথায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আর কেন! তুমি তোমার পথ দেখেছ, আমিও আমার পথ দেখি।

ট্র্যাম এসপ্ল্যানেড ঘুরছে।

অনেক নিশ্চয়ই টাকার দরকার পড়েছে। বোধ হয় জমেছে অনেক ধার,

অনেক তাগিদের তাড়না। এমন হয়তো বিপদের মুখে পড়েছে যার থেকে বাঁচতে হলে চাই অনেক টাকার খেসারৎ। বেশ করেছে, গয়নাগুলো যে নিয়ে গিয়েছে বাক্স ভরে। তবু এতদিনে সত্যিকারের কাজে লাগল ওগুলো। কিন্তু ক'খানা গয়নাই বা আদায় করতে পেরেছে জ্ঞানাঞ্জনের থেকে। ক'দিনই বা এ দিয়ে চালাতে পারবে? তার কাছে আরো তো কিছু নগদ টাকা ছিল। তা-ও বা কেন চাইল না? বলল না কেন মুখ ফুটে? বলল না কেন, আমি সব চাই? যা তুমি দিতে পার শেষ বিন্দু পর্যন্ত!

ট্র্যাম ড্যালহৌসি স্কোয়ার ঘুরে চলল। কণ্ডাকটর এসে ফের ভাড়া চাইলে।

কেন পালিয়ে গেল দরজা খুলে? তামসীর কাছে তার কিসের লজ্জা, কিসের লুকোচুরি? এমন কী পাপ সে বহন করছে যা স্খালন হতনা ভালবাসায়? কেন একটু বসল না, বুঝল না মনে-মনে? ডাকাতি করতে এসে কেন চোর হয়ে চলে গেল? বাকি জীবনে আর দেখা হবে না এই বুঝি তার আশা, কিন্তু আশাহীন সমস্ত বাকি জীবনটাই তো সে নিয়ে যেতে পারত সঙ্গে করে! ঘৃণার মাঝেই সে মুক্তি খুঁজতে গেল, কিন্তু ঘৃণার প্রথম প্রতিবেশীই তো প্রেম!

ভাটির লাইনে ফিরে চলেছে ট্র্যাম।

ভাল করে খেতে পারেনি। যেন খিদে লাগে না। ঘুমুতে পারেনি নিশ্চিন্ত হয়ে। যেন থেকে-থেকে উঠে দেখেছে তামসী ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। প্রায় রাতেই বোধ হয় এমনি হয়। তার ঘুম আসে না। তার কী যেন কঠিন অসুখ হয়েছে অনেকদিন। নইলে কত অন্ধকার দুর্দিনের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সে পথ করে। কোনো দিন এমন অস্থির হয়নি। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে বিপদের সামনে। লজ্জা-নিন্দাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। এমন কোনোদিন ছিল না রণধীর। এমন সে হতে পারেনা কিছুতেই। না, নিশ্চয়ই তার কোনো অসুখ করেছে। রাত্রে নিশ্চয়ই তার খুব জ্বর এসেছিল। মেসে থাকতে তাকে মাঝে-মাঝে নিশি পেত, বেরিয়ে যেত ঘুমের মধ্যে। নিশ্চয়ই তাকে নিশি পেয়েছে।

এই থানা! ঝপ করে নেমে পড়ল তামসী।

নিশ্চয়ই ধারে-কাছে ঘুর-ঘুর করছে। দুষ্টুমি করে দেখছে সত্যিই তামসী থানায় এতলা দিতে আসে কিনা। তার পিছনে তামসীই পুলিশ ছেড়ে দেবে, যে তামসী একদিন তাকে এই পুলিশের থেকে বাঁচাবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল বুক বেঁধে। বলা যায় না, দিন-কাল বদলে যাচ্ছে দিনে-দিনে। গৃহস্থের টাকা-পয়সা বেশি হলেই পুলিশের জন্যে মায়া হয়। দেখা যাক তামসী কী করে। আমি আছি এই কাছাকাছি।

নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে কোথাও আছে। যেই সে পা রাখবে থানার সিঁড়িতে, অমনি

রণধীর স্মিতকণ্ঠে ডেকে উঠবেঃ তামসী! ধরে ফেলেছি তোমাকে। ছি, শেষকালে আমার নামে তুমি থানা-পুলিশ করলে! একে এমনি দু'দণ্ড শান্তি নেই বিশ্রাম নেই, তায় পুলিশ লাগালে পিছনে?

তামসী ফুটপাতে অপেক্ষা করতে লাগল। ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চার পাশে। এর-ওর মুখের দিকে। ছল করে লুকিয়ে আছে, দেখা হয়ে যাবে এখুনি।

হাঁটতে লাগল দক্ষিণে। হাঁটতে-হাঁটতেই দেখা হয়ে যাবে তার সঙ্গে। বলবে, বাক্সটা নেই, কিন্তু আমি আছি। বাক্সর কথা কে জিগগেস করবে?

কে জানে, বাড়ি গিয়েই হয় ত দেখতে পাবে, বসে আছে চুপচাপ। যেন কিছু হয়নি এমনি সাদাসিধে সরল মুখ। তামসীও ভুল করে জিগগেস করবে না, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সে জানে, কোথায় রণধীর ছিল। আর সব জায়গা দেখা হলেও খাটের তলাটা যে দেখা হয়নি এতক্ষণে মনে পড়ল তামসীর। রণধীর যে খাটের তলায় লুকোয় এ কথাটাই তার মনে নেই। এমন আশ্চর্য ভুলও হয়!

ঝি বললে, 'আজ কি আর আপিস যেতে হবে না?'

ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তামসী, ঝির ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল। বা, আপিস যেতে হবে বৈ কি। এ যে দেখছি অনেক বেলা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরুল তামসী। কলকাতায় এত লোক সে আর দেখেনি, এত ধরণের জামা-কাপড়, এত রকমের গলার আওয়াজ। ট্রামের জানলা থেকে এত দৃশ্য যে দেখবার আছে, প্রত্যেকটি মানুষের মুখে এত বিচিত্র ইতিহাস, এ কে জানত। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে বুঝি তামসী। তার ট্রাম যে আপিস-পাড়া পার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে জানে। যাচ্ছে সে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকে। ঠিকানাটা আরেকবার সে দেখে নিল। দেখে নিল তারই লেখা সেই চিঠিটার থেকে।

অনেক অন্ধি-সন্ধি খুঁজে বের করলে সে নম্বরটা। দোতলার উপরে ভিতর দিকে ছোট্ট একটা ঘর। দেয়ালে সার্ভিস সিকিউরিং বুরো-লেখা ছোট্ট সাইনবোর্ড আঁটা। এক দরজার ঘর, কিন্তু তালা বন্ধ।

'এ দোকান কখন খোলে জানেন?' কাছে-দাঁড়ানো জিজ্ঞাসু কয়েকজন ভদ্রলোককে জিগগেস করলে তামসী।

'আজ সাতদিন ধরে নানান বিচিত্র সময়ে আসছি, কখনো ঘর খোলা পাচ্ছিনা।'

'পাচ্ছেন না?' তামসী পাংশু হয়ে গেল।

'আপনিও ঠকেছেন বুঝি দশ টাকা?' উত্তরদাতা ভদ্রলোকের মুখে সমবেদনা ফুটে উঠল।

'না, ঠকব কেন? আমাকে তো জুটিয়ে দিয়েছেন চাকরি।'

'জুটিয়ে দিয়েছেন? বলেন কি?'

'সে তো কবেই জুটিয়ে দিয়েছেন। আপিস যখন বউবাজারে ছিল। এ কি আজকের আপিস? বহু দিনের বনেদী ফার্ম।'

'আপনি কোথায় কাজ করেন জিগগেস করতে পারি কি?'

'জ্ঞানাঞ্জন কটন মিলসের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে।'

'ও, হ্যাঁ।' ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। 'তা হলে একেবারে ঠক নন বলতে চান?'

'কি বলেন। আমরাই বরং ঠকাচ্ছি ফার্মকে। দশ টাকা তো শুধু রেজিস্ট্রেশন-ফি। তারপর চাকরি পাকা হয়ে গেলে মাইনের অনুপাতে ফার্মকে একটা বোনাস দেবার কথা। কেউ বিশেষ দিচ্ছে না, কাজ ফুরিয়ে গেলেই সরে পড়ছে। আমি কিন্তু এসেছিলুম আমার বোনাসটা দিয়ে দিতে, অবশ্যি গোটা কতক রিমাইণ্ডার পাবার পর।'

'বলেন কি! আমরা তো ভাবছিলুম পুলিশে খবর দেব।'

তামসী স্নেহময় উপেক্ষার হাসি হাসল। বললে, 'আমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। সবতাতেই অবিশ্বাস।'

কে একজন বললে, 'পুলিশে খবর দেয়া আর বাকি নেই। খুঁজছে পুলিশ। ঐ গিরীন হালদার লোকটা নাকি আরো অনেক খুচরো ক্রাইম করেছে।'

কে গিরীন হালদার! ঐ গিরীন হালদারকেই তো তামসী চিঠি লিখেছিল। আর সেই চিঠিই তো রণধীরের পকেটে।

'মাছির কি। ঘায়ের-গন্ধ পেলেই উড়ে বেড়াবে। কিন্তু ভদ্রলোক হয়তো বাড়ি গেছেন কোনো জরুরি খবর পেয়ে আর অমনি তার পিছনে আমরা পুলিশ ক্ষেপিয়ে দিলুম।' তামসী অপরাধীর মত হাসল।

'আর যা শুধু দড়ি তাই পুলিশ মনে করে সাপ।' আর-সবাই সমর্থন করলে।

দু'দিন তামসী আপিস গেল না। তৃতীয় দিন সন্ধে বেলা তার দরজায় টোকা পড়ল। নিজেকে উত্তেজিত হতে দিল না তামসী। হ্যাঁ, যা সে ভেবেছে, কালিকিংকর। আপিসের কেরানি। সঙ্গে একটা চিঠি।

'এই চিঠিটা আপনার উপর সার্ভ করতে হচ্ছে।'

চিঠিটা নিয়ে বিতৃষ্ণের মত খুলে পড়ল তামসী। তেমন কিছু নয়। চাকরি থেকে জ্ঞানাঞ্জন তাকে সরাসরি বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

'এই? এরি জন্যে কাগজ-কালি খরচ করবার দরকার ছিল না।' খোলা চিঠিটা তামসী ফেলে দিল মেঝের উপর।

'আপনার চাকরিটা ঠিক চাকরি ছিল না, খোসখেয়ালের জিনিস ছিল, তাই নোটিশ পেতে পারেন না আপনি। আগাম কোনো মাইনে পাবারও আপনার অধিকার নেই।'

'কষ্ট করে মনে না করিয়ে দিলেও চলত।'

'হ্যাঁ, এই আরেকটা চিঠি আছে। কষ্ট করে এ বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে হবে আপনাকে।'

দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে রাগে জমাট হয়ে উঠল তামসীর গায়ের রক্ত। তাকে বলা হয়েছে, এক্ষুনি, পত্রপাঠমাত্র বাড়ি থেকে উঠে যেতে হবে।

'হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রেও আপনি নোটিশ পেতে পারেন না।' কালিকিংকর অনুভূতিহীন আইনের ভাষায় বললে, 'আপনি টেন্যান্ট নন, আপনি লাইসেন্সি। আপনার কোনো স্বত্ব নেই এ বাড়িতে বাস করবার। আপনার দখল শুধু একজনের দয়ার উপরে। সে দয়া শুকিয়ে গেছে। তাই মুখের কথাতেই আপনাকে এখন বেরিয়ে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল তামসী। বললে, 'আমারও মুখের কথাটা তবে শুনে রাখুন। আমি যেতে পারব না এ-বাড়ি ছেড়ে। মানে, যতক্ষণ না আমি আরেকটা আস্তানা পাই। পথেও যদি নামতে হয়, যতক্ষণ না পাই পথচলার সঙ্গী। কিছুকাল আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।'

তার এই বিদ্রোহবানী শুনে থমকে রইল কালিকিংকর। এতটুকু ভয় নেই উদ্বেগ নেই, নিঃসংশয় নিঃস্বতার দীপ্তিতে জ্বলছে। বললে, 'জোর করে বাড়িতে থাকবেন আপনি?'

'জোর করে শুধু তাড়িয়েই দেয়া যায় না, জোর করে দখল করেও থাকা যায়।'

'তা হলে আমাদেরকে আইনের আশ্রয় নিতে বলেন?'

তামসী স্নিগ্ধ মুখে হাসল। বললে, 'হার-না-মানা লোককে আইনের ভয় দেখানোর কোনো মানে নেই।'

তামসী ভেবেছিল সমরেশ একদিন আসবে খোঁজ করতে। এসে একটা কিছু আশ্রয়ের সন্ধান দেবে। তার বিদ্রোহের পিছনে রাখবে বন্ধুতার সমর্থন। কিন্তু না, সমরেশের জীবনের মানচিত্র থেকে এ রাস্তাটা মুছে গিয়েছে। তার চাকরির চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

সন্ধে বেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখে, এ কী কাণ্ড। বাড়িতে অনেক মুটে-মজুরের আনাগোনা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা লরি, সিঁড়ির মুখে আফিসের কটা দারোয়ান। ঘরের মধ্যে কালিকিংকর। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো, বই-খাতা, শিশি-কৌটা, যত রকমের টকিটাকি। কাঁচের গুঁড়োর জন্যে মেঝেতে পা রাখতে ভয় করে। আলনা

থেকে শাড়ি-জামাগুলো পর্যন্ত ফেলে দেয়া হয়েছে মেঝের উপর, খাট থেকে গদি আর বিছানা। সমস্ত ঘরময় একটা তাণ্ডবের চেহারা।

'এ ঘরের কোনো ফার্নিচারই আপনার পয়সায় নয়, তাই এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' বললে কালিকিংকর। 'আপনার নিজের জিনিসগুলো দেখে রাখুন। ওতে আমাদের হাত দেয়া বারণ। আর দয়া করে আলমারিটা খুলে দিন, সরিয়ে নিন ওর ভিতরের জিনিস।'

'কোনো জিনিসই আমার নিজের নয়।' তামসী দৃঢ় অথচ উদাসীন গলায় বললে, 'গোটা আলমারিটাই তাই নিয়ে যেতে পারেন।'

'তা হয় না। দয়া করে চাবিটা দিন।'

'চাবি নেই। ইচ্ছে করলে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলতে পারেন দরজা।'

কালিকিংকর বাক্যব্যয় করল না। যা পারল তা দিয়ে লরি বোঝাই করল, চেয়ার টেবিল সোফা কৌচ খাট আলনা কিছুই বাদ দিল না। শুধু শূন্য ঘরে শরীরী ভূতের মত আলমারিটা রইল দাঁড়িয়ে। কাঁচের গুঁড়ো সরিয়ে মেঝের উপর শুয়ে রাত্রে যখন ঘুমুলো তামসী, স্বপ্ন দেখল আলমারিটা হাঁটছে ঘরের মধ্যে, মানুষের চেহারায়, দরজা খুলে বাইরে বেরুতে পাচ্ছেনা, হাতে তার গয়নার বাক্স।

পর দিন ঝি এল না। চাকর আগেই সরে গেছে।

তবু তামসীর ভঙ্গি নত হয় না, বলে, দেখি কে আমাকে এখান থেকে উৎখাত করে।

বাড়ির বাইরে সে বেশি থাকে না, আবার না থাকলেও দেখা যায় না খুঁজে-খুঁজে। কে জানে কখন চকিতে কার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়ে যায়। থেকে-থেকে শুধু ঘর আর বার করে তামসী।

এক দিন দুপুরবেলা সে ফিরে আসছে, দেখলে দরজায় মোটা তালা আঁটা। তার সমস্ত স্পর্ধার উত্তরে নীরবনিষ্ঠুর অট্টহাস্য।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সাহিত্য

প্রবন্ধ

পাকিস্থানের বিচার : রেজাউল করিম (বুক কোম্পানী—১৸৹)

রেজাউল করিম সাহেব চিন্তাশীল লেখকরূপে সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার যথাযথ সমাধানে যে কয়জন লেখক তাঁদের সাহিত্যিক শক্তি নিয়োজিত করেছেন করিম সাহেবকে তাঁদের সকলের অগ্রগণ্য বললেও চলে। 'পাকিস্থান' মতের ভ্রান্ততা এমন যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠার সাহায্যে বাংলায় আর কেউ প্রমাণ করেছেন বলে আমরা জানি না। আজকাল স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরণায় স্বাধীন পথে চলার বিপদ অনেক ; স্বাধীন মত বলতে আর কিছু রইলো না, ব্যক্তিকে শাসানোর জন্যে মূঢ় জনমত হুমকির ভঙ্গিতে উদ্যত হয়েই আছে। সেই বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিয়েই করিম সাহেব নিজের স্বাধীন বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত মতকে প্রচার করবার কাজে ব্রতী হয়েছেন ; তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ।

'পাকিস্থানের বিচার' পুস্তকে লেখক 'পাকিস্থান' ব্যাপারটিকে কল্পনায় সম্ভব সমস্ত দিক থেকেই বিচার করে এর অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। দেশের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই মূল্যবান গ্রন্থটি প'ড়ে দেখা উচিত। বিশেষ করে রাজনীতিবিদের কাছে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। —নারায়ণ চৌধুরী

অনুবাদ

খনির গোলাম—বিমল সেন (বর্দ্ধণ পাব্লিশিং হাউস—১৷৹)

'খনির গোলাম' ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলার 'জারমিনাল' উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে রচিত। রচনা করেছেন সুদক্ষ অনুবাদকার বিমল সেন। খনিতে যারা সামান্য ভাতকাপড়ের বিনিময়ে নিজের জীবনটা বিকিয়ে দিতে চায় তাদের অবস্থা সর্বত্রই সমান। এমন কি, এক শতকের আগেকার খনির গোলামদের অবস্থা আর আজকের দিনের খনির গোলামদের অবস্থা—এতেও খুব বেশি প্রভেদ নেই। তখনকার ফরাসী খনি আর আজকের ভারতীয় খনিতে শুধু দেশকালগত অবস্থাতেই সামান্য পার্থক্য, নইলে দুঃখদুর্দশার কাহিনী উভয়ত্রই এক। সেইদিক থেকে, আমাদের দেশে মজুর সংগঠনের কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের পক্ষে আলোচ্য বইখানা বিশেষ কাজে আসবে। খনিমজুরের সমস্যাগুলিও আবার নতুন ক'রে তাঁরা পরখ করে দেখতে পারবেন। লেখকের লেখার হাত স্বচ্ছ, পড়তে কোথাও আটকায় না। নারায়ণ চৌধুরী

নাটক

শব ও স্বপ্ন—মন্মথকুমার চৌধুরী (মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। দাম ২৲)

সাহিত্যক্ষেত্রে নাটকেরও যে একটা সম্মানিত স্থান আছে সে কথাটাকে স্বীকার করতে আজো

যেন বাংলাদেশ মুক্তকণ্ঠ নয়। অথচ, কথায় কথায় যে সব কন্টিনেন্টাল লিটারেট্যরের বুলি আমরা আওড়াই সেই শ', ও' নীল, ইব্‌সেন বা পিরাণ্ডেলো ইত্যাদির অধিকাংশই বিশ্বসাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন নাটক রচনা করেই। বাংলা নাট্যকারদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ খোঁজ করলে দেখতে পাওয়া যাবে এর পেছনে আছে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ঔদাসীন্য বা আভিজাত্যবোধ। এ কথাটা অত্যন্ত সত্য যে, নাটকের (নাট্যকারেরও বটে) সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে মঞ্চসাফল্যের ওপর। রঙ্গমঞ্চের এই ঔদাসীন্য পরোক্ষে বাঙালী পাঠক সাধারণকেও তাই নাটক সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন করে তোলে।

তবু, এই প্রতিকূলতা সত্বেও যে দু'একজন নাট্যকার এদিকে এগিয়ে এসেছেন মন্মথকুমার তাঁদের অন্যতম। এই বিঘ্নসঙ্কুল পথে পা দিয়েও তিনি যে ব্যর্থকাম হননি তা প্রমাণ করেছে তাঁর প্রথম নাটক 'হে বীর পূর্ণ কর।'

মন্মথকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু আধুনিক। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তথাকথিত প্রগতিপন্থী বা উদ্দাম বিপ্লববাদী। যে সমাজচেতনা আর দেশাত্মবোধ সজ্ঞান মানবচিত্তকে আজ আলোড়িত করে তুলেছে তিনি নিঃসঙ্কোচে সেই চেতনা ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করেছেন। ইতিপূর্ব্বে দেশাত্মবোধ বা সামাজিক আবর্ত্তনকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটক রচিত হয়নি এমন কথা বলা চলে না, তবু, একথাটা নিশ্চয়ই মিথ্যে নয় যে, সামাজিক আবর্ত্তনের ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে নাটকীয় বিষয়বস্তু সৃষ্টি হতে পারে, ইতিপূর্ব্বে কোনো নাট্যকারই সেদিকটা লক্ষ্য করেন নি। দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করতে গিয়ে তাঁরা সাধারণত ফিরে তাকিয়েছেন অতীত ইতিহাসের দিকে, যার ফলে ইতিহাসকে ছাপিয়ে কল্পনার বিস্তার ঘটেছে অনেকখানি। 'শব ও স্বপ্নে' মন্মথকুমার সেই গতানুগতিক ধারাকে ব্যাহত করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, এটা তাঁর সাহসেরই পরিচয় সন্দেহ নেই।

১৯৪২-এর আগষ্ট থেকে সুরু করে সমগ্র যুদ্ধকালটাই ভারতবর্ষের পক্ষে একটা দ্রুত পরিবর্ত্তনের যুগ। সেই পরিস্থিতির অংশবিশেষ স্থান পেয়েছে এই নাটকে। 'শব ও স্বপ্ন'কে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করেছেন নাট্যকার। প্রথম পর্য্যায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ভূমিকামাত্র। সংসারনভিজ্ঞ উদাসীন গৃহকর্ত্তা কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী জীবনের হারজিত খেলায় বারবার হেরে গিয়ে যখন প্রায় সম্বলহীন ঠিক তখনই তিনি আবার নতুন করে জীবনকে ফিরে পেলেন একটা আকস্মিক ঘটনায়—লটারীর টাকা পেয়ে। তারপরই সুরু হলো দ্বিতীয় স্তর যা দ্রুত অগ্রসর হয়ে অবশেষে যবনিকাপাত করলো নাটকের। জমিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত সন্ত্রস্ত পল্লীবাসীর পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে অহিংসাব্রতে দীক্ষিত গান্ধীবাদী মুকুন্দলালের একমাত্র কন্যা উজ্জ্বলা, আর তার পাশে এসে দাঁড়ালেন অগ্নিযুগের নেতা সূর্য্যশঙ্কর। শকুনি-চরিত্র নায়েবের প্ররোচনায় গ্রামবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছে বাইরের লোক। উজ্জ্বলা বা সূর্য্যশঙ্কর এ অন্যায় কিছুতেই ঘটতে দিতে পারেন না। এদিকে ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জনযুদ্ধবাদী ইন্দ্রজিৎ। উত্তেজনার মুখে প্রাণ দিলেন সূর্য্যশঙ্কর। এই হলো নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কল্পনার বিস্তার নেই, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে আগাগোড়া।

প্রাথমদিকের প্রচেষ্টা হিসেবে লেখার মধ্যে যেটুকু ত্রুটী থাকা স্বাভাবিক নাট্যকার তাকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। সার্থক নাটকের একটি বড় লক্ষণ চরিত্র-রূপায়নে নাট্যকারের একান্ত

নৈর্ব্যক্তিকতা। কিন্তু 'শব ও স্বপ্নে'র সূর্য্যশঙ্কর বা উজ্জ্বলা বা মুকুন্দলালের কথার ফাঁকে ফাঁকে আমরা কি নাট্যকারের নিজেরই বক্তব্যের সন্ধান পাই না?

Dialogue এর দিক থেকে মন্মথকুমার কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তথাপি একটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। সাহিত্যের কথোপকথন যদিও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আলাপ-আলোচনা নয়, তথাপি সে কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন কিছু থাকাও বাঞ্ছনীয় নয় যাকে বড়বেশী কেতাদুরস্ত বলে মনে হয়। আর একটি কথা--মন্মথকুমার মাঝে মাঝে stunt দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। নাটকীয় অবস্থা সৃষ্টি করে তোলার খাতিরে আকস্মিকতার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু সেখানে পরিমিত সংযমেরও দরকার আছে। ভবিষ্যতে নাট্যকার এদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন আশা করি।

'শব ও স্বপ্নে' নাট্যকার শুধু ধ্বংসেরই ছবি আঁকেন নি, তিনি সেই সঙ্গে ভবিষ্যতেরও স্বপ্ন দেখেছেন, এক নবগঠিত সুন্দরের স্বপ্ন। সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই এই নাটককে এবং নাট্যকারকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

অনিল চক্রবর্ত্তী

উপন্যাস ও গল্প

অমৃতের সন্ধানে: শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ (টুয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরী পাব্লিকেশনস্—১৷৹;)

অমরার অমৃত সাধনা: দেবদাস ঘোষ (শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২্)

দুখানি পুস্তকই অদ্ভুতভাবে 'অমৃত'গন্ধী। এ ছাড়া আরো দু'বিষয়ে বই দুটির মিল আছে। দুজন লেখকই বোধ হয় প্রবাসী বাঙালী এবং দুজনের লেখাই অত্যন্ত অপরিণত।

'অমৃতের সন্ধানে' একটি গল্পগ্রন্থ। গল্পগ্রন্থও হয়ত ঠিক বলা চলেনা। আটটির মধ্যে তিনটি রচনা ভ্রমনকাহিনী ও ঘরোয়া বর্ণনার সমন্বয়। কোন গল্পেরই কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য নেই,—না বক্তব্যের, না বাচনভংগীর। লেখকের দৃষ্টি অত্যন্ত দুর্বল, দুর্বলতর তাঁর লেখনী। প্রায় গল্পেই নায়ক নায়িকার নামের বিশ্রী পুনরুক্তি আছে। প্রত্যেক গল্পেই জোলো অবাস্তব প্রেমের আমদানী ধৈর্যহানিকর। বইটার নামের সংগে গোটা বইয়ের অথবা ঐ নামীয় গল্পের মুখ্যবস্তুর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

মলাটের ধারে যেসব কল্পিত বিশেষণে লেখককে ভূষিত করবার চেষ্টা হয়েছে তা' হঠাৎ মফস্বল-সুলভ সাহিত্যিকমন্যদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "মতবাদ কণ্টকিত সাহিত্যের কলরবে বিভ্রান্ত পাঠক এই বই পরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন আশা করা যায়।"—প্রকাশকের এই আশা দুরাশা। বরং রুচিজ্ঞানী পাঠকের হাঁফ ধরে যাবার সম্ভাবনা আছে।

'অমরার অমৃত-সাধনা' একটি উপন্যাস, বিপ্লবীদের রোমাঞ্চকর জীবন নিয়ে লেখা এক গুচ্ছ ঘটনা গ্রন্থনকে যদি উপন্যাস বলা যায়। যা' আশংকা করা গেছল মধ্যে মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ উগ্রতর ভাষায় মাখিয়ে দেয়া হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমাংশ ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত পড়তে লাগে। শেষাংশে মন্বন্তর ও আগষ্টবিপ্লবের মতো প্রয়োজনীয় জায়গায় অত্যন্ত স্থূল ভাববাদের ভেলকী দেখিয়ে কাজ সারবার চেষ্টা হয়েছে।

লেখক বিপ্লবীজীবনের যে দিকটা দেখিয়েছেন তা' রুদ্র ও উৎকট। বিপ্লবী চরিত্রদের চালচলন

ও কথাবার্তা নাটুকে নায়কদের মতো মনে হয়। চরিত্রধর্ম সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতা বালসুলভ। তাই উপন্যাসটি যতটা বর্ণনাবহুল হয়েছে, ততটা উপন্যাসধর্মী হয়নি। —রবি চক্রবর্তী

কবিতা

ধানক্ষেত: রামেন্দ্র দেশমুখ্য; (প্রকাশক—শ্রীহট্ট লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ; মূল্য এক টাকা)

একটি ফুলের গুচ্ছ: প্রজেশকুমার রায়; (প্রকাশক—শ্যামধন সেনগুপ্ত, শ্রীহট্ট; মূল্য ছয় আনা)

সমসাময়িক আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর যদি কোনও কবির প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয়ে থাকে তো তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আলাদা School-ই গড়ে উঠেছে।

'ধানক্ষেতে'র কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্যও এই School-এরই অন্তর্ভুক্ত। ভাবে এবং ভাষায়। যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিংশ শতাব্দীর অনিশ্চয়তাকে অনুভব করেন, এবং সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্যে যে ভাষা তিনি গ্রহণ করেছেন তার দুয়েরই ওপর জীবনানন্দ দাশের মোহরাঙ্কণ জ্বলজ্বল করছে। রামেন্দ্রবাবুর ইমেজারী আর শব্দ-চয়ন লক্ষ্য করলে এই উক্তির তাৎপর্য বুঝ্‌তে পারা যাবে।

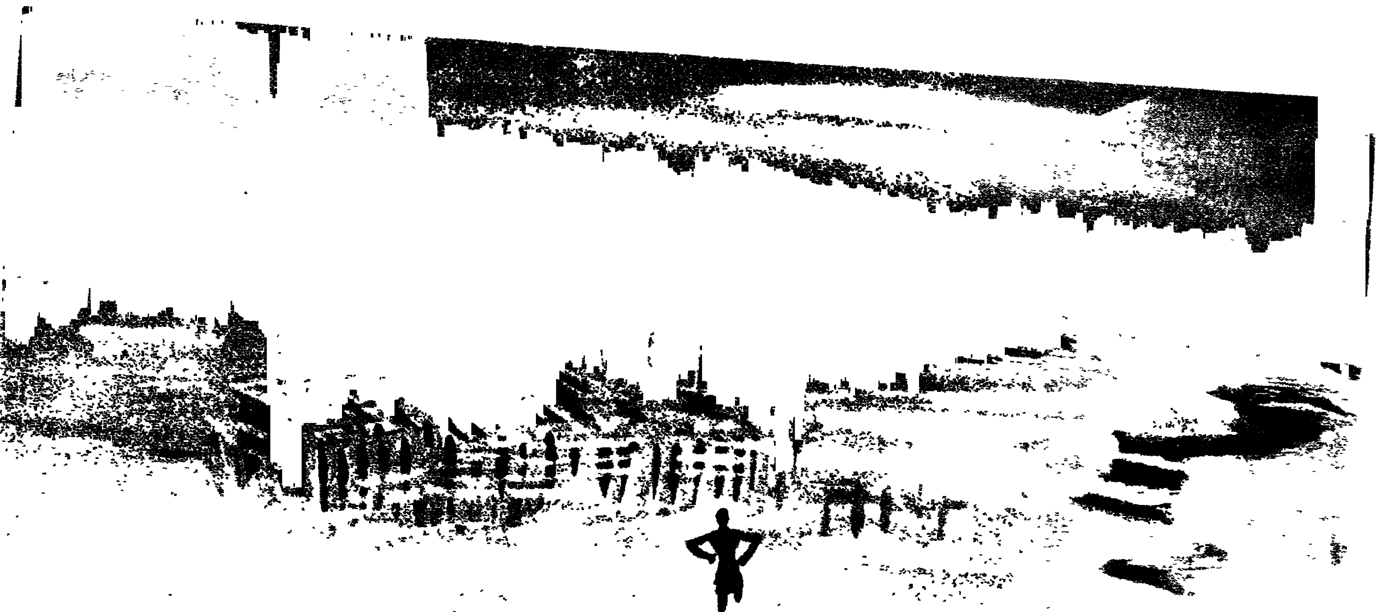
অথচ, মাঝে মাঝে দু একটি কবিতায় জীবনানন্দ দাশের আত্মঘাতী ক্লান্তি থেকে তিনি মুক্ত। নারীর হৃদয়, শিশু, অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা—সবকিছুকে পরাজিত করে যেখানে জীবনানন্দের কবিতায় লাস-কাটা ঘরের ক্লান্তিহর হাতছানিই প্রবল হয়ে উঠেছে, সেখানে—'ভিখারী ও সেনাপতি শব হয়' জেনেও রামেন্দ্র দেশমুখ্য উচ্চারণ করতে পেরেছেন—'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়।'

এই যে আশাবাদী মনোভাব, একে বেশীক্ষণ ধরে রাখ্‌বার মতো ক্ষমতা রামেন্দ্রবাবুর নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই কারণে যে, সামান্যতম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও তিনি মানুষের সমস্যাগুলির সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করেননি। অথচ বর্তমান পৃথিবীর বিজ্ঞান-প্রকর্ষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম না করেই যদি কোনও কবি শুধুমাত্র আবেগ-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে বিশ-শতকীয় সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন তবে তাঁর কবিতার মধ্যে হতাশ ও অনিশ্চয়তা ফুটে উঠ্‌বেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই বিজ্ঞান-প্রকর্ষ 'বৈতণ্ডিক বুদ্ধি আবেগের' প্রশ্রয় দিতে একেবারেই নারাজ।

তবু 'ধানক্ষেতে'র কবিতাগুলির মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন পরিমিতিবোধ ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞান নয়, প্রকৃতির সঙ্গে রামেন্দ্রবাবু একাত্ম। ফলে, হতাশাব্যঞ্জক হলেও, একটি ব্যথা-ম্লান অনুভূতির মধ্যে দিয়ে কবিতাগুলি নিবিড় হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে। 'প্রকৃতিগতপ্রাণ' হওয়ার মধ্যে অসুবিধের সঙ্গে কিছু পরিমাণে সুবিধেও থাকে। অসুবিধের কথা আগেই উল্লেখ করেছি; সুবিধেটুকুকে রামেন্দ্রবাবু বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন।

প্রজেশকুমার রায়ের 'একটি ফুলের গুচ্ছ' কয়েকটি ঝক্‌ঝকে কবিতার সমষ্টি। জনৈক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে বইখানি লেখা; বোধ হয় সেই কারণেই কবিতাগুলির মূল উপজীব্য—প্রেম।

কোথাও কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা উঁকি মারেনা; শুধুমাত্র একটি স্নিগ্ধরস বইখানির সর্বত্র ক্ষরিত হয়েছে। —নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা

পূর্ব্বাশা

নবম বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ় • ১৩৫৩

সাম্প্রতিক বাঙলা

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঠিক দুই বৎসর পরে কোলকাতা সহরে একটানা সপ্তাহ কয়েক থাকতে পেলাম। নানা লোক ও দলের সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ হোলো। বলা বাহুল্য আলোচনার প্রধান বিষয় দেশের রাজনৈতিক সমস্যা। সাহিত্য ও অন্যান্য চারুকলা নিয়েও কথাবার্ত্তা হয়েছিল। অবসর মত খানকয়েক বাঙলা নভেল, গল্প ও কবিতার বই পড়লাম। বাঙলার সাধারণ আর্থিক ও সামাজিক অবনতির কাহিনী পেলাম শ্রীভবানী সেনের 'নূতন বাঙলা'য় ও স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুর্ভিক্ষের ফলাফলের রিপোর্টে। এই অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় না অবশ্য, এবং কোনো পাকাপাকি মন্তব্যও করা চলেনা। কোলকাতা সহর বাঙলাদেশ নয় তাও জানি। তবু এক চট্‌কা ধারণার কোনো দাম নেই বলবনা। আমার পক্ষে অন্ততঃ তার প্রয়োজন আছে। অন্যের কাছে বিচারের সুযোগ হিসাবেও তার মূল্য থাকা অসম্ভব নয়।

প্রথমে সাহিত্য-প্রভৃতির কথা তুলছি। আমার যেন মনে হোলো 'সাহিত্যে'র প্রতি অনুরাগ একটু কমেছে। সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য পাইনি বটে, তবু সকলের মুখে শুনলাম যে 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের স্থান আর নেই। দেখলামও তাই। সর্ব্বত্র সমাজতত্ত্ব, এবং সমাজ-তত্ত্বটাও একপেশে, সমাজতান্ত্রিক, যদিও তারই মধ্যে ভীষণ বিরোধ রয়েছে। বিরোধটি ঠিক কি নিয়ে বুঝলাম না, কারণ কেউ সোশিয়ালিজম আর কম্যুনিজমের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না, এবং সেই পার্থক্যের জন্য সাহিত্যের রূপ কতটা ভিন্ন হতে বাধ্য তারও বিচার করছেন না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লুলু হারকোর্ট বলেছিলেন, 'আজকাল আমরা

সকলেই সোশিয়ালিষ্ট'; আজ দেখলাম বাঙলা দেশের প্রত্যেকেই ভাবছেন তিনি কম্যুনিষ্ট, এবং একমাত্র কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিজমে দেখছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রীতিমত বজায় থাকে।

ব্যাপারটাতে আশ্চর্য্য হয়েছি, কিন্তু খারাপ লাগেনি মোটামুটি। 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যে আমি বরাবরই অবিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রের তরফদারী অনেকদিন যাবৎ করে আসছি। বহুদিন পূর্ব্বে লিখেছিলাম বাঙলায় নভেলের বিষয় অনেক, যেমন জমিদার-বংশের, গ্রাম্যজীবনের পতন, এবং সেজন্য সেট্ল্‌মেন্টরিপোর্ট পড়তে হবে। সোশিয়ালিজম্-কম্যুনিজমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমার আছে। রবীন্দ্রনাথের পর বাঙলা সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে ও-ছাড়া গতি নেই আমার বিশ্বাস। তবু যেন খিচ্ রয়ে গেল। সমাজতন্ত্রের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও বর্ত্তমান কয়েক বৎসরের সাহিত্য অ-বাস্তব ঠেকছে। বয়সের দোষ খানিকটা, কিন্তু সবটা কি? সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুটার মধ্যে একটা ধর্ম্মভাব, একটা ভবিষ্যতের প্রতি মোহ, এমনকি পুরাতন সমাজ, যেমন গ্রাম্য সভ্যতা সম্পর্কে একটা ভাবপ্রবণতার বেগ আছে। আমার মতে সেই বেগটাই বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যকে চালাচ্ছে। এখনও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কোঠায় সাহিত্যিক সম্প্রদায় ওঠেন নি। তার অবশ্য নানা কারণ আছে, তার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাঠামো ও বাঙলার সামাজিক সংস্থান, যাতে মাত্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই আপন খুশীতে সাহিত্য চর্চ্চা করতে পারেন, এই দুটোই বোধ হয় প্রধান। দেশের সামাজিক সংস্থানের অন্যান্য অংশ দেখলে অবশ্য মনে করা চলে যে ইয়ুটোপীয়ার যুগ গত। ক্ষিতীশ বাবুর তত্ত্বাবধানে যে-রিসার্চ চলেছে তার রিপোর্ট পড়ে কোনো সাহিত্যিক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে পারেন কি? অবশ্য 'পরিচয়' এখন কম্যুনিষ্ট দলের পত্রিকা, সেখানে যাঁরা লিখছেন তাঁরা বাঙলা সমাজের আমূল ধ্বংসের খবর রাখেন। তবু তাঁদের গল্প, কবিতা, সমালোচনা জমছে না। সমাজতাত্ত্বিক যাকে বলেন Culture-lag; কিন্তু সেটাই বা কেন থাকবে এই দুর্ভাগা দেশে যেখানে প্রত্যেক জিনিষটাই পিছিয়ে আছে, যেখানে সময়ের ফাঁক দিয়ে একাধিক সামাজিক অন্যায় ঢুকে পড়বার জন্য ছটফট করছে। বাঙলা সাহিত্যের এই ফাঁক ভরাতেই হবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাঠামোয় শরৎ-সাহিত্যের মেদ, তার ওপর লাল-পিরাণ পরালেই প্রোগ্রেসিভ সাহিত্য হয় কি? ইতিহাস, মজুর, কৃষক—অক্ষরগুলো ছাপাখানার যে-কোনো কম্পোজিটরের হাতে ফেলে দিয়ে সমাজতন্ত্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ও কর্ম্মের সমন্বয় করলে মন্দ হয় না। পরিচয়ের লেখকবৃন্দ দু'কাজই করেন, তবে কি তাঁদের অসার্থকতার হেতু কর্ম্ম ও চিন্তার অসমঞ্জস বিভাগ? পাঠক ভাবতে পারেন যে আমি তথাকথিত প্রগতি সাহিত্যিকদের সঙ্গেই মেলামেশা করেছি। তা নয়। পুরাতন-পন্থী ও কংগ্রেস-সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আলাপ করলাম। এঁদের দর্শন, এঁদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, এঁদের বিচারদণ্ড ঠিক ধরতে পারি নি। কংগ্রেস-সাহিত্য এখনও সদর্থক হয় নি। তা ছাড়া এই দলের সাহিত্যিকরা

পূর্ব্বেও যে ঢঙে লিখতেন এখনও সেই ঢঙেই লিখছেন। তবে কি 'কংগ্রেস' বিশেষণের অর্থ সমাজতন্ত্রের বিপক্ষাচরণ? সম্পূর্ণ নন-পলিটিক্যাল সাহিত্য 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে শুনলাম। কবিতা নন-পলিটিক্যাল নিশ্চয়, কিন্তু তার পৃষ্ঠায় সৃষ্টির দিক থেকে অভিনবত্বের নিদর্শন বড় বেশী নেই। রবীন্দ্রনাথকে ভেঙ্গেচুরে ক'দিন চলবে জানিনা। তাঁরও দশা কাহিল। জন্মতিথি উপলক্ষে ভক্তিরই বন্যা ছুটল, তাও আবার সভার কর্ত্তৃপক্ষের রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। তা হোক, কিন্তু একটু বুদ্ধি সহকারে হলেই ভালো লাগত। পূর্ব্বাশায় প্রায়ই পঠিতব্য প্রবন্ধ বেরোয় কিন্তু তবু পূর্ব্বাশার দানা বাঁধেনি।

সঙ্গীতের অবস্থা কাবু। রবীন্দ্র-সঙ্গীত যারা গাইছেন তাঁদের ভাব আছে, প্রাণ নেই। দশ বারো লাইনের গান তাঁদের মুখস্থ থাকে না। মীড়েরই প্রাধান্য, তালে কোনো উন্নতি হয় নি, উচ্চারণ অস্পষ্ট। দিনেন্দ্রনাথ এ-ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন না। শোনবার সময় মনে হয়েছে যে মেয়েদের কণ্ঠ থেকে উদ্ধার পেলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরমায়ু বাড়বে। উচ্চ-সঙ্গীত শোনবার সুযোগ হয় নি। তবে 'গায়কী' ও রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত গায়কের সন্ধানে আছি। কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতে আঙ্গিকের ওপর শ্রদ্ধা বাঙলা দেশে এক'বছরে বেড়েছে মনে হল না।

প্রথমেই বলেছি দেশের সমস্যা সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হোলো, একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম দেশের সমস্যা মানে অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে উঁকি দেয় নি। অথচ এই সেদিন ঐ কাণ্ড হয়ে গেল, এবং দুর্ভিক্ষের দুটি পাকা রিপোর্ট বেরিয়েছে। আমার বিশ্বাস অর্থনীতিতে আমাদের আগ্রহ এখনও ফুটে ওঠে নি। অথচ আমরা সমাজতান্ত্রিক। সে-মতে নিশ্চয়ই অর্থনীতির স্থান আছে। আর্থিক সমস্যা নিয়ে মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ চোখে পড়ল। আমাদের সমাজতন্ত্র তবে কি কথার কথা? না, আমরা এমন এক অবস্থার মধ্যে আছি যেখানে সমাজতন্ত্রের অর্থ জোর সেই ভিক্টোরীয়ান যুগের সাধারণতন্ত্রের বেশী আর কিছু হতে পারে না? বোধ হয় এই ব্যাখ্যাই ঠিক, কারণ সকলেই ক্যাবিনেট মিশনের কীর্ত্তিকলাপ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের সিদ্ধান্তে অর্থনীতির উল্লেখ যৎসামান্য, নেই বল্লেই চলে। দেশের প্ল্যানিং কে করবে তার কোনো ঠিকানাই নেই। কনষ্টিটিয়ুন্ট এসেমব্লি মুদ্রার ব্যবহার কি ভাবে চালাবে তাও জানি না। ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের রীতি কি হবে তারও হদীস নেই। যে-কালে ক্যাবিনেট মিশন হদীস দেন নি তখন আমাদেরও তাগিদ নেই। কর্ত্তারা যা দিয়েছেন, তারই আলোচনার নাম দেশের সমস্যা বিচার?

কিন্তু পলিটিক্যাল সমস্যার আলোচনা শুনে খুশী না হয়ে থাকা যায় না। কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির চিন্তাধারা কোন পথে যাচ্ছে আন্দাজ করা যায় বটে, কিন্তু ঠিক কোথায় মন্ত্রীপক্ষের নিয়ন্ত্রণ-বিধানে তাঁরা আপত্তি তুলেছেন আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নি। অথচ সাধারণ কংগ্রেস-কর্ম্মীর মুখে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা শুনেছি তার চেয়ে সূক্ষ্ম বিচার সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস যে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাঙলা দেশের কর্ম্মীদের মনঃপূত হবে। যদি তাই হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। তাই থেকে প্রমাণ হবে যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব যথার্থ, অর্থাৎ নেতা ও নীতদের বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে দূরত্ব নেই, এবং তাদের সম্বন্ধ নিতান্ত নিকট। (তা ছাড়া, একটা বোঝাবুঝি হলে এতগুলি বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্ফূরণ হবে।) সে যাই হোক, পৃথিবীর খুব কম দেশে এমন উচ্চশ্রেণীর রাজনৈতিক আলোচনা চলে, খুব কম দেশেই সাধারণ যুবক-যুবতীর মধ্যে দশ পনের বছর জেল খাটবার পরও এমন ঘৃণাশূন্য, এমন শান্ত ও স্থির মনোভাবের পরিচয় মেলে। প্রবাসে বসে শুনেছি যে বাঙলার রাজনৈতিক মেজাজ সপ্তমে বাঁধা। সে-খবর আংশিকভাবে সত্য। যারা সোরগোল বাধায় তারা বোধ হয় কর্ম্মী নয়, জনতা।

তবু একটু হতাশ হয়েছি। অতখানি বুদ্ধি ও চরিত্র থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক বিধানের ওপর এই কর্ম্মীদের প্রভাব নিতান্ত কম। বাঙালীদের ধারণা যে কংগ্রেসের ওপর স্তরে বাঙলার স্থান নেই, অবহেলাই আছে। এ-ধারণার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। আমার মতে এটা অভিমান। কিন্তু অভিমান জিনিষটাও তথ্য, অর্থাৎ হিসেবে তাকে ধরতে হবে। অন্যদিকে, অভিমান থাকা সত্ত্বেও, এমন কি মহাত্মাজীর বাণী ও নেতৃত্ব বাঙালীর মন জুড়ে না থাকলেও, কংগ্রেস অনুষ্ঠানের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা এতই গভীর যে কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্তের অপমান কোনো বাঙালী করে নি। এটা মস্ত কথা। ভারতবর্ষের ধারণা বাঙালীর চরিত্র ও ব্যবহারে সংযম নেই। মন্তব্যটি দোষ হিসেবেই করা হয়। সংযম নেই জানি, বোধ হয় বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্ম্মের কৃপায়; এবং যদি সংযমের অর্থে গড্ডলিকা-প্রবাহ হয়, তবে সেটা না থাকাই মঙ্গল। কিন্তু বাঙালীর এক প্রকার চরিত্রগত দৃঢ়তা আছে; তার জন্য দায়ী বোধ হয় তন্ত্র। মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ কিংবা নন্-ভাওলেন্স্ (যার বাঙলা প্রতিশব্দ নেই) বাঙালী গ্রহণ করে না, এবং কংগ্রেসের রীতিনীতি বাঙালী তীব্রভাবেই সমালোচনা করে। দেশবন্ধু ও মতিলালের মৃত্যুর পর কংগ্রেস-নীতি মধ্যে মধ্যে যে-পথে গিয়েছে সে-পথ বাঙালীর মানসিক ধারার কাটা পথ নয়। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান-বিদ্বেষী বলে অন্তরে হিন্দু-মহাসভার সভ্য। তবু বাঙলায় মহাসভা ভেসে গেল; তবু জেল খাটা, দেউলি-আন্দামান-ফেরৎ ছেলে-বুড়ো কংগ্রেসে যোগ দেয়; তবু বাঙালী কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে ফিরতে চায়। এতদূর পর্য্যন্ত বলা চলে যে

আজ যদি কংগ্রেস যে-কোনো সর্ত্তে ইংরেজ ও মুসলমানের সঙ্গে 'সমঝোতা' করে, তবে প্রত্যেক বাঙালী সেটা গ্রহণ করবে। (মাথা পেতে অবশ্য নয়, কারণ মাথা থাকলে পাতা যায় না।) যা লিখলাম তাতে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপন্ন হয় নিশ্চয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের সংযমও প্রমাণিত হয়। বাঙালীর চরিত্রে একটা বড় রকমের সংযম আছে। এটা আমার নতুন আবিষ্কার।

আমার দুঃখের কারণ কিন্তু ঠিক এইখানে। বিশ্লেষণ-বুদ্ধি ও চারিত্রিক সংযম থাকা সত্ত্বেও বাঙলাদেশ যেন দিশাহারা। দলাদলি অবশ্য একটা কারণ। কিন্তু বোম্বাইএ গুজরাটি-মারহাট্টা, মাদ্রাজে তামিল-তেলুগু, মধ্যপ্রদেশে মারহাট্টা-মহাকোশল ও বিহারে উত্তর ও দক্ষিণ কায়েস্থ কিংবা বিহারী-বাঙালীদের মধ্যে ঝগড়াও কিছু কম নয়। বোম্বাইএ কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষের তুলনা নেই। কেবল যুক্ত প্রদেশে ঝগড়া ঝাঁটি কিছু কম। সামাজিক পরিবর্ত্তনের সময়, বিশেষত যখন সে-সময় স্থষ্টির সুযোগ থাকে না, তখন দলাদলিটা স্বাভাবিক। যে-দেশের লোকের একমাত্র রাজনীতি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা সে-দেশে সরকারের আন্তরিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির সময় জন-সাধারণের মধ্যে ক্ষমতা অর্জ্জন সম্পর্কে মতের পার্থক্য হতে বাধ্য। তা ছাড়া জনকয়েক লোক দেশোদ্ধারকে প্রাথমিক ও অন্যরা সামাজিক পরিবর্ত্তন-সাধনকে প্রাথমিক ভাববেই। অতএব দলাদলিটা চিহ্ন মাত্র, এবং মারাত্মক চিহ্নও নয়। বেশী দল থাকলে বেশী দিক ও তার ফলে জনসাধারণ দিশা হারাবে এমন কোনো কথা নেই। বাস্তবিক পক্ষে দিক বেশী নয়। তবে কেন বাঙলা খেঁই খুঁজে পাচ্ছে না?

অনেকেই বল্লেন, প্রকৃত নেতৃত্বের অভাব। সুভাষ জীবিত কিনা জানি না। যদি বেঁচে থাকে ও দেশে ফেরে তবে বাঙলার মনকে সে পথ দেখাতে পারবে, অন্তুতঃ কয়েক বৎসরের জন্য। কিন্তু এ-ধরণের আলোচনা বিলাস মাত্র। আমি নেতৃত্বের উল্লেখ করছি। ব্যক্তিগত নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে কোনো বৈজ্ঞানিক বিচার চলে না। লেনিন্ নেতা, আবার হিটলারও নেতা। অবশ্য নেতার দ্বারা কাজ সহজ হয়। কিন্তু কোন্ কাজ? সে যাই হোক, এখন আমাদের মধ্যে নেতাজী নেই। নেতাজী নেই তাই নেতৃত্বের অভাব-এ-ধরণের যুক্তি বুদ্ধিমান বাঙালীর অনুপযুক্ত। ব্যাপারটা নেতৃত্ব, leadership, যেটা জন্মগত সংস্কার নয়, যে-জন্য শিক্ষা-দীক্ষা থাকা চাই। আমার মনে হয় পার্টিই হোলো এ-যুগে নেতৃত্ব তৈরী করবার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। গোএবেল্স ও ইংরেজ টোরী পছন্দে যতই সোভিএট-বিদ্বেষ আমরা দেখাই না কেন, সোভিএটের কাছে আমরা এ-টুকু শিখতে পারি যে পার্টিই হোলো নেতৃত্বশিক্ষার একমাত্র কলেজ। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, কংগ্রেসের মধ্যে গঠনগত ও ব্যবস্থাগত কোনো গুরুতর দোষ আছে। একটা দোষ আগে ছিল,

কোলকাতা ও দেশের পার্থক্যে। সে-দোষ কাটছে। অভদ্র সহুরে ভাষায় বলতে গেলে, কংগ্রেস এখন বাঙালীর নয়, বাঙালের। এটা সুখবর। কোলকাতা ও পশ্চিম বাঙলার দম ফুরিয়েছে। তবু আনুষ্ঠানিক দোষটি রয়ে গেছে ছোট সহর ও গ্রামের ভার-বৈষম্যে। গ্রাম-নগরের বিরোধ শ্রেণী-বিরোধের মতনই সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতি নির্দ্ধারণ-করে। যতদিন জমিদারী প্রথা যাচ্ছে না, এবং গ্রামের সাধারণ পরিণতি নগরের দিকেই থাকবে, ততদিন ঐ ভারবৈষম্য যাবে না। এই জন্যেই প্রত্যেক স্বদেশী অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ত্তব্য ব্যবস্থাবিন্যাসের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত দোষটির যথাসম্ভব খণ্ডন করা। বাঙলা দেশে গ্রামের প্রভাব নাগরিক অনুষ্ঠানের ওপর কম। গ্রামে কাজ হচ্ছে না বলি না, তবে নগর ও সহরের পার্টি গ্রাম্যজীবন ও সমস্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় মনে হয়েছে। অথচ, নেতৃত্বের আঁতুড়ঘর ঐ গ্রামেরই কুটিরে, তার আঁস্তাকুড়ে। সকলেই এ-টুকু জানেন, তবে সে-জানা আমাদের অন্যান্য জানারই মতন, অর্থাৎ হয় মস্তিষ্কে না হয় হৃদয়ে, মজ্জায় নয়। সেই জন্যেই লিখলাম, এত বুদ্ধি এতটা চরিত্র থাকা সত্ত্বেও বাঙালী দিশাহারা। তাই আমার দুঃখ। সারাদিন কাটালাম, সারারাত কাটালাম, ভোর আগতপ্রায়, এখন আর না ঘুমিয়ে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে, কাজে প্রবৃত্ত হওয়াই মঙ্গল।

বাঙালী মুসলমান কি ভাবছে টের পাই নি। তবে মুখে তাদের বাঙালা ভাষাই শুনলাম। এবং সে-ভাষা চমৎকার, সুবেলা, এমন কি সংস্কৃতবহুল। এরা অবশ্য যুবক। তবে যুবকের স্থান কোথায় এ-পোড়া দেশে ? যুবকই বা কোথায় ? যা পাওয়া যায় তাদের শুধু বয়স কম, অর্থাৎ কর্ত্তার গোলাম।

মার্ক্সীয় দর্শন

লুডভিগ্ ফয়ারবাক্ (খ্রীঃ ১৮০৪-১৮৭২) ও মার্ক্স

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

লুডভিগ্ ফয়ারবাক্ জার্ম্মান চিন্তাধারার ভিতরে একটি বিপ্লব আনিয়াছিলেন। বামপন্থী হেগেলীয় দার্শনিকগণ সকলেই হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ফয়ারবাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফয়ারবাক্ কেবলমাত্র হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি হেগেলীয় দর্শনের স্থলে একটি বিরুদ্ধবাদী দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার ভিতরে এরূপ ভাবধারা বর্ত্তমান যাহার দ্বারা মার্কস ও এন্‌গেলস্ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৪১-১৮৪৪ পর্য্যন্ত মার্ক্‌সের চিন্তাধারা ফয়ারবাকের চিন্তাধারা হইতে অভিন্ন ছিল। পরে অবশ্য মার্কস ফয়ারবাকের দর্শনের সমালোচনা করিয়া নিজের দর্শনের সুস্পষ্ট রূপ নির্দ্ধারিত করেন।

ফয়ারবাক্ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রথম চিন্তার-বিষয় ছিল ঈশ্বর, দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় ছিল প্রজ্ঞান (রিজন্) কিন্তু অবশেষে তিনি মানুষকেই তাঁহার চিন্তার প্রধান বিষয় করেন। তিনি হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা করিয়া দেখান যে এই ভাববাদী দর্শন মানবের বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক চিন্তাধারা হইতে বিশ্লিষ্ট। ইহা রহস্যবাদী। ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে মানুষের বিশেষ অনুভব ও অভিজ্ঞতা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। মানুষ এই বিশেষ অভিজ্ঞতাকেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান বলিয়া মনে করে। ধর্ম্ম মানবের কল্পনাপ্রসূত। যে সব সত্য ধর্ম্ম স্বীকার করে তাহাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ফয়াকবাকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান মানুষের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তাধারাকে একটি বিশেষ পথে পরিচালিত করিয়াছে। ইহার ফলে ধর্ম্মের মনোবিজ্ঞান নামক একটি বিশেষ বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। ফয়ারবাক্ বলেন যে দর্শনের প্রধান কার্য্য হইল মানুষকে জানিতে চেষ্টা করা। মানুষের সুখদুঃখ, তাহার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবন, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই মানুষ কোন বিশেষ মানুষ নহে, ইহা মানবজাতি। ফয়ারবাক

এই মানব জাতিকে ভগবানের স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। এই মানুষকে সেবা করাই ফয়ারবাকের মতে মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। এই মানুষকে জান, এই মানুষকে ভালবাস এবং এই মানুষের সেবার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ কর, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মজীবন পূর্ণতা লাভ করিবে। সেইসব নীতিই ধর্ম্মের নীতি, যাহা মানব প্রেমের সঙ্গে সুসঙ্গত। সুতরাং ফয়ারবাক্ নিজকে ধর্ম্মের বিদ্রোহী মনে করিতেন না। তিনি নিজকে ঈশ্বরবাদী (থিইষ্ট) বলিতেন। কারণ মানুষই তাঁহার নিকট ঈশ্বর।

ফয়ারবাকের দর্শন হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক বিদ্রোহ। হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা করিয়া ফয়ারবাক্ দেখাইয়াছেন যে নৈয়ায়িক তত্ত্বের অভ্যুত্থানের ধারা হইতে জগতের অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। হেগেল ভাবরাজ্য হইতে কি প্রকারে বাস্তব অস্তিত্বের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। ভাব বাস্তবকে সৃষ্টি করিতে পারে না। বস্তু-জগতের উদ্ভবের ফলেই চৈতন্যের ও ভাবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ফয়ারবাকের মতে হেগেল তাঁহার দর্শনে যে সত্যকে ভিত্তি করিয়া দার্শনিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষকালে সেই সত্যেই উপনীত হইয়াছেন। মূলভাবই তাঁহার দর্শনের ভিত্তি এবং মূলভাবই তাঁহার দর্শনের শেষ কথা। হেগেল মূলভাব হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু কি প্রকারে এইরূপ উদ্ভব সম্ভব তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার দর্শনে, বাস্তবজগৎ হইয়াছে ভাবজগতের ছায়াস্বরূপ। তিনি শুদ্ধসত্তাকে (পিয়োর বিয়ীং) নৈয়ায়িক চিন্তার প্রথমতত্ত্ব বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। কিন্তু মানবচিন্তার পক্ষে এই শুদ্ধসত্তার ধারণা করা অসম্ভব। ফয়ারবাক্ আরও দেখাইয়াছেন যে হেগেল সামান্যকে বিশেষের উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া নৈয়ায়িক চিন্তার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। মানুষ বিশেষের ধারণা হইতেই সামান্যের ধারণায় উপনীত হয়। রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতির ধারণা হইতেই মানুষ মানবজাতির ধারণায় উপস্থিত হয়। কিন্তু হেগেল বলেন যে মানব জাতির ধারণা বিশেষমানুষের ধারণার পূর্ব্বগামী। ফয়ারবাক্ আরও বলেন যে হেগেল বাক্যকে (স্পিচ্) বস্তুর উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন। শব্দকে (লোগস্) করিয়াছেন বস্তুর স্রষ্টা। তাঁহার মতে মানব শব্দটি বাস্তবমানবের পূর্ব্বগামী। সুতরাং ফয়ারবাকের মতে, সর্ব্বত্রই হেগেল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধকে বিপরীতভাবে দেখিয়াছেন। ফয়ারবাক্ শেলিংএর দর্শনের সমালোচনা করিয়াও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শেলিং চিন্তার ও বাস্তবের একত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। তিনি জগৎকে ভগবানের শরীর বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এই দর্শনও ভাববাদী ও কল্পনাবাদী।

তাই ফয়ারবাক্ বলেন যে প্রত্যক্ষকেই দর্শনের ভিত্তি করা আবশ্যক। মানবের

বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যেই সত্য দর্শন রচনা করা সম্ভব। আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যেই বাস্তব জগতের প্রকৃতরূপ জানিতে পারি। আমরা প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করিয়া অনুমানের সাহায্যে জগতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারি। নৈয়ায়িক চিন্তাধারা বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্লিষ্ট নহে। অভিজ্ঞতাই নৈয়ায়িক চিন্তার ভিত্তি। সেইজন্য ফয়ারবাক্ বলেন যে তাঁহার দর্শন সাধারণ লোকের দর্শন। জনসাধারণ প্রত্যক্ষকেই চিন্তার ভিত্তি করিয়া থাকে। মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, প্রভৃতিকে সুবিন্যস্ত করাই দর্শনের কার্য্য। সুতরাং ফয়ারবাকের দর্শন মানবকেন্দ্রিক (এন্‌থ্রপোমরফিক্)।

ফয়ারবাক বস্তুবাদী দার্শনিক। তাঁহার মতে বস্তু চিন্তার পূর্ব্বগামী। বস্তু হইতে জীবনের ও মনের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলেন যে, শরীরের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়াই চৈতন্যের অথবা ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। মানবের মস্তিষ্কক্রিয়ার উপরই চৈতন্য নির্ভরশীল। আমাদের শরীরের সঙ্গে বাহ্য জগতের সংঘাত ঘটিয়া থাকে। তাহা হইতেই সংবিদের ও প্রত্যক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল। মানবশরীরের উপরই মানবচিন্তা নির্ভরশীল।

ফয়ারবাক্ বস্তুবাদী দার্শনিক হইলেও তিনি বস্তুসর্ব্বস্ববাদ (অ্যাব্‌সলিউট্ মেটিরিয়ালিজম্) সমর্থন করেন নাই। বস্তুসর্ব্বস্ববাদী দার্শনিকগণ মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বস্তুসর্ব্বস্ববাদী দার্শনিকগণ বলেন যে মানুষের মস্তিষ্ক-ক্রিয়াই চৈতন্য। চৈতন্য বলিয়া কোনরূপ স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই দার্শনিকগণ সমস্ত ভাবজগৎকে মানুষের মস্তিষ্কক্রিয়া বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। আধুনিক ব্যবহারবাদী দর্শনও (বিহেভিয়ারিজম্) মনের অথবা চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্যবহারবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে বাহ্যজগৎ যখন শরীরের উপর ক্রিয়া করে তখন শরীর বাহ্য জগতের উপর প্রতিক্রিয়া করে। এই প্রতিক্রিয়াকেই চৈতন্য বলা যায়। কিন্তু চৈতন্য শরীরের প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং এই দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ার নামই চৈতন্য। ফয়ারবাক্ এ মতের সমর্থক নন। তিনি বলেন যে শরীরের ক্রিয়া ও চৈতন্যের ক্রিয়া দুই পর্য্যায়ের। শরীরের ক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্যের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা চলে না। ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। চৈতন্য একটি বিশেষ সত্তা। মানুষের মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহা মানুষ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। ফয়ারবাক্ এই সত্যের প্রমাণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে যদি চৈতন্য কেবলমাত্র শরীরক্রিয়ার নামান্তর হইত তাহা হইলে মন শরীরের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত না। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে মন ও শরীর একে অন্যকে প্রভাবিত করে। ফয়ারবাক্ আরও বলিয়াছেন যে মানুষের মন বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারে। ইহা বর্ত্তমানের গণ্ডীতে

আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞান নানারূপ আনুমানিক সত্যের (হাইপথেসিস্) সাহায্য লইয়া জগৎ ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের মন যদি কেবলমাত্র শরীরক্রিয়ার নামান্তর হইত তাহা হইলে মনের পক্ষে এইরূপ বৈজ্ঞানিক চিন্তা করা সম্ভব হইত না। সুতরাং ফয়ারবাকের মতে মন শরীরের উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু বস্তুবাদের সমর্থন করিতে গিয়া ফয়ারবাক্ অনেক সময় অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মানুষের শক্তি, ভাব, চিন্তা প্রভৃতি তাহার খাদ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের প্রকৃতি জানিতে হইলে সে কি খায় তাহা জানা আবশ্যক। ফয়ারবাকের এইসব উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রথমজীবনে মার্ক্স ও এনগেলস্ বিশেষভাবে ফয়ারবাকের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে ইঁহারা ফয়ারবাকের দর্শনের সমালোচনা করিয়া উহার ভিতরে নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পান। মার্ক্স ফয়ারবাকের ন্যায় বস্তুবাদী দার্শনিক। হেগেল চিন্তাকে উদ্দেশ্য (সাব্জেক্ট) এবং বস্তুকে বিধেয় (প্রেডিকেট্) করিয়াছেন। ফয়ারবাকের ও মার্ক্সের মতে হেগেলের এই মত গ্রহণীয় নহে। বাস্তবিক নৈয়ায়িক প্রতিজ্ঞার (জাজ্মেণ্ট) উদ্দেশ্য হইল বস্তু, এবং চিন্তা তাহার বিধেয়। আমরা চিন্তার সাহায্যে এই বস্তুজগতের স্বরূপ কি তাহা জানিতে চেষ্টা করি। সুতরাং ফয়ারবাক্ ও মার্ক্স বলেন যে হেগেল ভাবকে উদ্দেশ্য করায় তাহার দর্শন ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। ফয়ারবাক্ ও মার্ক্স উভয়ের মতেই বস্তু নৈয়ায়িক প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য, বিধেয় নহে। ইঁহাদের মতে বস্তু ভাবের পূর্ব্বগামী এবং ভাব বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ফয়ারবাক্ ও মার্ক্স উভয়েই বস্তুবাদী দার্শনিক।

ফয়ারবাকের ন্যায় মার্ক্সও প্রত্যক্ষকে দর্শনের ভিত্তি করিয়াছেন এবং উভয়েই প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক। উভয়েই হেগেলের ভাববাদের পরিপন্থী। তদ্ব্যতীত বস্তুবাদী দার্শনিক হইলেও মার্ক্স ও ফয়ারবাক্ উভয়েই মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের মত এই যে মন শরীরের উপর নির্ভরশীল হইলেও মনের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। ফয়ারবাক্ স্বকীয় দর্শনকে মানবের ব্যবহারিক জীবনের দর্শন বলিয়া মনে করিতেন, এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মার্ক্সীয় দর্শন বিশেষভাবে মানবের সামাজিক-ব্যবহারিক জীবনকেই ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে।

ফয়ারবাকের দর্শনের সঙ্গে মার্ক্সীয় দর্শনের বহুবিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও মার্ক্সীয় দর্শনের স্বরূপ ফয়ারবাকের দার্শনিক মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র। ফয়ারবাক্ ভাববাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই তিনি মানুষের সারসত্তাকে একটি চিরন্তন অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি মানবজাতিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে

দেখেন নাই। মার্ক্স সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে মানবের সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তন অনুধাবন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্রই মানবের সামাজিক জীবনকে আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে দেখিয়াছেন এবং কি প্রকারে অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহা তিনি সর্ব্বত্রই দেখাইয়াছেন। মার্ক্সের মতে অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারাই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ফয়ারবাকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল। দ্বিতীয়তঃ মার্ক্স সর্ব্বত্রই হেগেলের ডায়লেক্টিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ফয়ারবাক্ তাঁহার দার্শনিক সত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মার্ক্স হেগেলীয় ডায়লেক্টিকের খোলস পরিত্যাগ করিয়া উহার যুক্তিযুক্ত সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মার্ক্স তাঁহার ফয়ারবাক্ সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত ১১টি সূত্রে (থিসিস্) আপনার দর্শনের সম্বন্ধে ফয়ারবাকের দর্শনের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। আমরা ঐ সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেই মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে ফয়ারবাকের দর্শনের পার্থক্য বুঝিতে পারিব।

(১) ফয়ারবাক্ ও অন্যান্য বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বাহ্যবস্তুকে অথবা প্রত্যক্ষকে কেবল বাহ্যসত্তারূপে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উহাকে ক্রিয়াশীল প্রত্যয়ের অথবা ব্যবহারের দিক দিয়া দেখেন নাই। ইহা সত্য যে ফয়ারবাক্ প্রত্যক্ষের ও ধারণার (কন্সেপ্সন) মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু মানবমনের কর্ম্মশীলতা কি প্রকারে বাহ্যবস্তুকে ও চিন্তাধারাকে রূপায়িত করে তাহা ফয়ারবাক্ ও অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুবাদী দার্শনিকগণ দেখান নাই। মানুষের ব্যবহারিক জীবন দ্বারা বস্তুর রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে ক্রিয়াশীল মানবমন কি প্রকারে বস্তুকে ও চিন্তাকে পরিবর্ত্তিত করে, সে বিষয় অবহিত হওয়া আবশ্যক। একটি যন্ত্রকে ব্যবহার না করিলে তাহার প্রকৃতরূপ জানা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানবের সামাজিক ব্যবহারের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ মার্ক্সের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ মনকে অক্রিয় মনে করিতেন এবং তাঁহাদের মতে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে মানবমনের ক্রিয়াশীলতা অনাবশ্যক। কিন্তু মার্ক্সের মতে মানবমনের ক্রিয়াশীলতাকে বাদ দিলে সত্যজ্ঞানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ কথা অসম্ভব। তাঁহার মতে ব্যবহারই সত্যের নির্দ্ধারক।

(২) সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রে মার্ক্স বলেন যে মানুষ বাস্তব সত্যের স্বরূপ জানিতে পারে কিনা ইহা শুষ্ক জ্ঞানের প্রশ্ন নহে, ইহা ব্যবহারের (প্র্যাক্টিস্) প্রশ্ন। ব্যবহার হইতে বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে সত্য বা অসত্য বলা চলে না। ভাববাদী দার্শনিকগণ সামঞ্জস্যকেই (কোহেরেন্স) সত্যের নির্দ্ধারক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এই দার্শনিকগণ সামঞ্জস্য

বুঝিতে নৈয়ায়িক সামঞ্জস্য বুঝেন। ইহারা অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়া সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। এমন কি অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিলেও সামঞ্জস্যকে সত্যের নির্দ্ধারক বলা চলে না। কারণ কতকগুলি অভিজ্ঞতার মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকিতে পারে। তদ্ব্যতীত ভাববাদী দার্শনিকগণ কোন বিশেষের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সমগ্রের আশ্রয় নিয়া থাকেন। সেইজন্যই হেগেল তাঁহার মূল ভাবের সঙ্গে যে সব ভাবের সামঞ্জস্য আছে তাহাদিগকেই সত্য বলিয়াছেন। মার্ক্‌স আরও বলেন যে ভাবের সঙ্গে বস্তুর ঐক্যকে সত্যের নির্ণায়ক বলা যায় না। কারণ ভাব অথবা চিন্তা ও বস্তু বিভিন্ন পর্য্যায়ের সত্তা সুতরাং ভাবের সঙ্গে বস্তুর ঐক্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ঐক্য থাকিতে পারে। কিন্তু ভাবের সঙ্গে বস্তুর ঐক্য থাকা সম্ভব নহে। মার্ক্‌সের মতে ন্যায়ের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে ইহার ব্যবহারিক মূল্যের দ্বারা। সুতরাং তাঁহার মতে প্রত্যেক নৈয়ায়িক অথবা বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞার একটি ব্যবহারিক দিক আছে। কোন সত্যকে স্বীকার করিয়া তাহা হইতে যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই মার্ক্‌সের মতে কোন সত্যই চিরন্তন নহে। বিশেষ সত্য বিশেষ যুগোপযোগী।

(৩) মার্ক্‌সের তৃতীয় সূত্রের মর্ম্ম এই যে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ এতদিন মনে করিয়াছেন যে মানুষের জীবন বাহ্য ঘটনা ও শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্ত্তিত ঘটনার ও শিক্ষার ফলে মানবের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে মানুষ বাহ্য ঘটনাসমূহকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং শিক্ষকদিগেরও নূতন করিয়া শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। ফয়ারবাক্ ও অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মনে করিতেন যে বাহ্য ঘটনার দ্বারাই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যে আপনার কর্ম্মজীবন দ্বারা বাহ্যবস্তুর রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং ইতিহাসের গতি ফিরাইয়া দিতে পারে তাহা এইসব দার্শনিকগণের ধারণার বাহিরে। তাই মার্ক্‌স্ বলেন যে বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে ফয়ারবাকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এবং ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি ভাববাদী দার্শনিক। ফয়ারবাকের সমাজতন্ত্রবাদ কাল্পনিক, বৈজ্ঞানিক নহে। মার্ক্‌সের পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুবাদী দর্শন বৈপ্লবিক নহে, কিন্তু মার্ক্‌সের দর্শন বৈপ্লবিক। মার্ক্‌সের মতে ব্যবহারিক জীবন যাপন করিতে করিতে মানুষ বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করিতে পারে এবং বিপ্লবের সাহায্যে সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে।

(৪) ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া ফয়ারবাক দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মের উদ্ভব মানবের

বৈষয়িক জীবন হইতে। কিন্তু এই বৈষয়িক জীবনের স্বরূপ তিনি নির্দ্ধারণ করেন নাই। ইহা সত্য যে মানবজীবনের প্রয়োজন হইতে ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু কিরূপ প্রয়োজন হইতে ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে ফয়ারবাক্ তাহা দেখান নাই। মার্ক্সের মতে ধর্ম্মের উদ্ভব জানিতে হইলে সমাজশরীরের ভিতরে যে আর্থিক দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান তাহার স্বরূপ অনুধাবন করা আবশ্যক। কেন ধর্ম্ম কতকগুলি রহস্যময় ভাবকে সত্য বলিয়া মনে করে তাহা দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিতে হইবে। কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট নহে যে মানুষের অজ্ঞতা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। কেন কোন ধর্ম্ম নানা যুগে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে তাহা বুঝিতে হইবে। ইহা সত্য যে এই জগতের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় মানুষ ধর্ম্মের সাহায্যে পারলৌকিক শান্তির সন্ধান করিয়া থাকে।

(৫) মার্ক্স ফয়ারবাকের প্রত্যক্ষবাদ স্বীকার করিলেও তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে মানুষের কর্ম্মজীবন দ্বারা নির্দ্ধারিত ফয়ারবাক্ তাহা বুঝেন নাই। ইহার কারণ এই যে ফয়ারবাকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। তাই তিনি মনে করিতেন যে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ক্রিয়াশীলতার ফলেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিন্তু মার্ক্স বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবমনের ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়া থাকে। মানবমন স্বকীয় ক্রিয়াশীলতার দ্বারাই বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে। ফয়ারবাকের মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিবাদী (ইণ্ডিভিডুয়ালিস্টিক্), কিন্তু মার্ক্সের মনোবিজ্ঞান সমাজবাদী (সোসালিষ্টিক্)।

(৬) ফয়ারবাক্ ধর্ম্মের সারসত্তাকে মানবের সারসত্তা বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানবতা প্রত্যেক মানুষের ভিতর বিচ্ছিন্নভাবে আছে। কিন্তু মার্ক্সের মতে মানবের সারসত্তা নানারূপ সামাজিক সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল। যুগে যুগে মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং এই পরিবর্ত্তন বিভিন্ন সামাজিক সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল।

(৭) ফয়ারবাক্ মনে করিতেন যে ব্যক্তির চেতনা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। তিনি ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে ধর্ম্ম মানবের সমাজ জীবন হইতেই উদ্ভুত। কেবল ব্যক্তিচেতনা অনুশীলন করিয়াই ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না। ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাও ঐতিহাসিক কারণে ঘটিয়া থাকে।

(৮) সামাজিক জীবন কর্ম্মময়। মানুষ তাহার ব্যবহারিক জীবনের সাহায্যেই রহস্যবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারে। অনেক সময় পরবর্ত্তীযুগ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চিন্তাধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় কোন বিশেষ যুগের ভাবধারা চিরন্তন সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

(৯) যে বস্তুবাদ কেবল শুষ্ক ভাবের উপর নির্ভরশীল সেই বস্তুবাদ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক বুঝিতে পারে না এবং এইরূপ বস্তুবাদ ব্যক্তিবাদী এবং ইহার মতে সমাজ ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র।

(১০) পূর্ব্বের বস্তুবাদ ব্যক্তিবাদী হওয়ায় ইহা সমাজকে ব্যক্তিসমষ্টি বলিয়া মনে করে। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনের মতে মানবসমাজ অথবা সামাজিক মানবই বাস্তব। ইহা ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করে না।

(১১) দার্শনিকগণ এতদিন জগতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান সমস্যা হইল কি প্রকারে এই জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তাহা স্থির করা। মার্ক্সীয় দর্শন মনে করে যে দর্শনের একটা প্রধান কাজ হইল বাহ্য জগতকে ও মানবসমাজকে পরিবর্ত্তন করা। সুতরাং দর্শন ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাবজগতে বিচরণ করা দর্শনের কাজ নহে। মার্ক্সীয় দর্শন মানুষকে কর্ম্মের প্রেরণা দেয় এবং ইহা বলে যে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়া বিপ্লবের সাহায্যে সমাজের অন্যায় ও অবিচার দূর করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে হইবে। সুতরাং এই দর্শন বিপ্লবের দর্শন এবং এই দর্শন নিপীড়িত জনগণকে শিক্ষা দেয় কি উপায়ে শোষকশ্রেণীর হাত হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া তাহারা সাম্যবাদী সমাজ গঠন করিতে পারে।

কবিতা

যুদ্ধোত্তর

সুধীরকুমার গুপ্ত

কঠিন হাতুড়ি আজো অগণিত ইস্পাতের পাতে
আবার আঘাতে বেজে ওঠে,
সময়ের প্রতিচ্ছবি নানাবিধ কারুকার্য্যে ফোটে।
দুর্ব্বল হাতের পেশী, নিরুৎসুক বুকের পাঁজর
একটী শপথে শুধু তিলে তিলে ক্ষয়ে যেতে জানে,
অনেক মৃত্যুতে রচে নিরালম্ব আকাঙ্ক্ষার ঘর।

তবু অনেকের চোখ প্রেমের দোহাই আজো পাড়ে,
চেনার পরিধি যত দিনে দিনে ছোট হয়ে আসে
তত তার অস্থিরতা বাড়ে।
জানিনা কি তাকে দিতে হয়;
সেদিন আশ্চর্য্য রাত মুখ ঢেকে সীমান্তের পরে
ধারালো অস্ত্রের বোঝা চারিদিকে স্তূপীকৃত করে
পেলো কোন ইপ্সিত প্রত্যয় ?

আঘাতে জাগে কি প্রেম আঘাতে কি মুছে যায় ঘৃণা
তার কিছু আমরা জানিনা।
আমরা পেয়েছি গতি, হাতে ফের অবসর জমে
সৈনিক ভিক্ষুক হয় ধরাবাঁধা পুরানো নিয়মে।
সব চাওয়া ঘরে ফেরে, ভুলে যায় সে রক্তের স্বাদ,
আবার সংসার তার বাড়িঘর সাঁকো ও আবাদ
তেমনি আগ্রহে রাখে ধরে।

আমাদের কাজের বন্দরে
আবার সকলে জড়ো হয়।
কৃষকের শীর্ণ মুখ, মজুরের নিষ্পলক চোখ
অনেক হতাশা ঘেঁটে পেতে চায় যেটুকু আলোক
অন্ধকারে আজো তার মূল।

জীর্ণ কঙ্কালের স্তূপে একগুচ্ছ বসন্তের ফুল
আমাদের শুধু ব্যঙ্গ করে ;
এ যুদ্ধ কঠিনতর সে যুদ্ধের বিরতির পরে।

ভাবীযুগের মহাকাব্যের নায়কেরা

গৌর ঘোষ

নিরংকুশ,
নিস্পৃহ ছুটো থাম
কংক্রীটের গাথুনী পোরা থাম
কাঁটা তারের হিংস্রতা ঘিরে আছে।
রৌদ্রপক্ক সপিল পথটা পাক খেয়ে
মুচড়ে ঢুকেছে ভেতরে।
('কাজ ছাড়া ভেতরে ঢোকবার হুকুম নেই')
গেটের নীরস প্লেটটা একটা সতর্ক 'ফুলষ্টপ্'।

নৈর্ব্যক্তিক ধূসর যান্ত্রিক
অজস্র শব্দের অবিরাম আনাগোনা।
ভেতরে অজস্র কাজ, অজস্র ক্ষিপ্রতা।
বাইরে নির্বাক স্থাণু থাম।

রৌদ্র ফাটা ওপর আকাশে
শুধু ধূমেল পরিবেশ।
ঘুম-নামা সুনীল আকাশে
কলংকিত কালোর কুহেলী।
পাক খেয়ে ওঠে কালো
চিল নয়, শকুনি নয়
ধূম।

যন্ত্র আর মানুষ,
যান্ত্রিক মানুষ
প্রেমে পড়া প্যান্‌প্যানে নয়,
ধীর, স্থির, ক্ষিপ্রতায় ভরা।

স্রষ্টা এরা ঃ
অজস্র সৃষ্টির এরা সফল জনক।

যন্ত্রের কঠিনতায়
'সোনার কাঠি'র ছোঁয়া
পেয়েছে যান্ত্রিক মানুষ।
আগামী কালের এগিয়ে থাকা মানুষ এরা।
'পিষ্টনে'র পিছলানো প্যাঁচের কৌশল
এদের জানা।
তাই ঠোক্কর খেয়ে ও ঠিক্‌রোবে না
ঠিক থাকবে।
এরা প্যাঁচ মেরে সামলে ওঠা
আহত 'স্পিট্‌ফায়ার'।

এদের মনটা 'অক্সি-এসিটিলিনের স্টোভ্‌'।
ভেতরে পোরা জ্বালাধরা তরল অনুভূতি।
ইসারা পেলেই হুস্‌ করে
বেরিয়ে আসে
নরম আগুনের ইংগিত।
পোড়ায়,
কুয়াশা ধরায় না
আগামী কালের স্রষ্টারা।
অজস্র সৃষ্টির সার্থক জনকেরা।

বাইরেটা এদের
ওই বাইরেরই মত
নিষ্প্রভ, নিস্পৃহ ছুটো থাম
কংক্রীটের গাথুনী পোরা আছে,
কাঁটা তারের হিংস্রতা ঘেরা আছে।
('কাজ ছাড়া ভেতরে ঢোকবার হুকুম নেই')
ভেতরটা 'অক্সি-এসিটিলিনের ষ্টোভ্‌'।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলা গানের ক্রম

মণিলাল সেনশর্ম্মা

গত শতকের শেষ দিকে ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে নাটককে অবলম্বন করে বাংলায় এক প্রকার গান রচনা আরম্ভ হয়। সে-গানের সুরে বাংলায় তখনকার প্রচলিত সুরগুলি হতে পার্থক্য রাখবার চেষ্টা থাকে। সে-সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকের গানগুলিতে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেন। তখন বাংলা গান টপ্পার ছাঁচে বাঁধবারই প্রচলন ছিল। 'আস্থায়ী' আর দুটি কি তিনটি 'অন্তরা' ব্যবহার করে গান বাঁধা চলছিল। 'সঞ্চারী' ও 'আভোগ' ব্যবহার বাংলা গানে তখন ছিল না। আর শুধু হারমোনিয়ম ও বায়াতবলা সঙ্গৎ যন্ত্ররূপে ব্যবহার হতো। তবে মাঝে মাঝে ক্লেরিওনেট আর মন্দিরাও নাটকে ব্যবহার চলতো। সে সময়ে ধ্রুপদই শ্রেষ্ঠ গান বলে সম্মান লাভ করেছিল। খেয়ালও তখন গাওয়া হতো কিন্তু তার স্থান ছিল ধ্রুপদের পরে। আজ ধ্রুপদ নেই, খেয়ালই হিন্দুস্থানী গানের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। যাহোক ধ্রুপদের ছাঁচের গান সবসময়ে নাটকে ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ পিয়ারার মুখে প্রেমের গান ঠিক ধ্রুপদে চলে না। কীর্ত্তন বা ঢপ কীর্ত্তনের সুর ভগবত প্রেমেরই শ্রেষ্ঠসুর; মানবীয় প্রণয়ের সুর এগুলি নয়। মানবীয় প্রেমের গান তখন বাংলায় ছিল না। তখনকার প্রচলিত লালসাবর্দ্ধক বাইজির গানের সুরগুলিও নাটকে ব্যবহার সম্ভব হয়নি। সেজন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল নতুন গানের সৃষ্টি করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিতে 'আস্থায়ী' ও একটি বা দুটি 'অন্তরা' দিয়ে রচিত। 'সঞ্চারী' ও আভোগ' নেই অর্থাৎ খুবই কম। দ্বিজেন্দ্রলাল খেয়ালের সুরগুলি ভিত্তি করেই তার এরূপ গানের রচনা করেন। টপ্পার অনুকরণে এমন কি হুবহু সুরে গান রচনা উনিশ শতকে নিধুবাবু করে গিয়েছিলেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল হুবহু সুর গ্রহণ করেন নি। তিনি সেসব সুরে নতুনত্ব করে গিয়েছেন। ধ্রুপদ-ভঙ্গিম গান তাঁর নাটকে থাকলেও তাঁর সুরে খেয়াল-ভঙ্গিম সুর রচনাই বেশী।

কিন্তু সে সময়ে গান-গাওয়া বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ ভাল চোখে দেখত না। গত

শতাব্দী ও তার পূর্ব্ব শতাব্দীগুলিতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-শ্রেণীর চর্চ্চা যখন বাংলায় খুব চল্‌ছিল, সেসময়ে বাংলার কীর্ত্তন মালশী প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক গান গাওয়া ছাড়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নাচগানবাজনায় শিল্পীদের নৈতিক অবনতি এমন হয়েছিল যে তখনকার মধ্যবিত্তদের সমাজ গানবাজনার চর্চ্চা করাকে রীতিমত ঘৃণার সঙ্গে দেখত। কেউ গানবাজনায় অনুরক্ত হয়ে পড়লে বাড়ীর অভিভাবকগণ আশঙ্কান্বিত হয়ে উঠতেন। কি জানি যদি বা ছেলেটা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ কীর্ত্তন গান বা মালশী বৈঠকী গান করাতে আপত্তি ছিল না। এতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ওস্তাদমণ্ডলীর নৈতিক অবস্থাটা সে সময়ে কিরূপ ছিল তা অনুমান করা সহজ। সমাজের এরূপ পরিস্থিতিতে যখন গান রচনা আরম্ভ হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাল্ গানগুলিও 'নাটুকে গান' বলে বেশ অবজ্ঞাই পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সে সময়ে হাসির গানও রচনা করেন। তার আগে এরূপ গান আমাদের দেশে ছিল না। অবশ্য তার আগে বহুরূপীদের হাসিমস্করার গান ছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলির মত হাসির গান বাংলার বাইরে ভারতে আর কোথাও সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা নেই। এই হাসির গানগুলি কিন্তু বর্ত্তমানে অচল। আমাদের হাসি ক্রমে নানা কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে ঠিক। কিন্তু সে-গানগুলিরও যে হাসাবার ক্ষমতা আছে, তা-ও নয়। গানগুলি হাসির কবিতা যতখানি—হাসির সুর ততখানি নয়।

কীর্ত্তনে ও পাঁচালীতে যে ধুয়া গাইবার রীতি সে সমবেত গান করার পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন প্রথা হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে কোরাস গান সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে গানরূপের পার্থক্য রয়েছে। কোরাস গানের প্রত্যেকটি ধাতুর সুর একই প্রকার এবং একা গাইবার। আর প্রত্যেকটি ধাতু গাওয়ার পর একটি বিশেষ সুরবিন্যাস সকলে গাইবার জন্য রচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানগুলির সুরবিন্যাসে সকলে গাইলে যাতে কোলাহল হয়ে না পড়ে—যেমন বর্ত্তমান কালে কীর্ত্তনের ধুয়ার সুরে হয়—সেজন্য চেষ্টা ও যত্ন আছে। এই কোরাস-গান-পদ্ধতির পরিকল্পনা বিদেশ হতে পেলেও সেসব গান ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীতে ও তালেই বাঁধা হয়েছে—অর্থাৎ সুর রচনার অভিনবত্ব থাকলেও তাতে রাগরাগিণীর কাঠামো ধরা পড়ে। তার আগে এই পদ্ধতির বাংলা গান ছিল না। আর স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এই পদ্ধতির গান বাংলার প্রতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কোরাস গানগুলি এখনও এত প্রচলিত যে বাংলার গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সহরে ও মহানগরীতে এমন কি সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় যে গান গাওয়া হয় প্রায় সবগুলিই দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানের অনুরূপ সুরে বাঁধা। অন্য সব উদ্দেশ্যে এই কোরাস গানের সুর তো চলছেই। দ্বিজেন্দ্রলালের সব গানের সুরে একটা পৌরুষ ভাব আছে। নেতিয়ে-পড়া, ঝিমিয়ে-পড়া সুর তার রচিত গানে কম।

নাটকের গানের সুর গঠনে আরও অনেকে সহায়তা করেছেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ এই শতকের প্রথম দিকে গিরীশচন্দ্র, দেবকণ্ঠ বাগচী আর পরবর্ত্তীকালে অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্র নাটকের গানের সুরে বৈচিত্র্য আনবার আর নাটকের গান সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ পদ্ধতির গানগুলি বেশ প্রচলিত ছিল। এখনও যাত্রায় এসব গান ব্যবহার করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় গান করার রীতি আসে; আর সে-সময়ে অনেক গান রচয়িতার ঐ জাতীয় গান রচনার ফলে জাতীয় সঙ্গীত নামে এক শ্রেণীর গানের সৃষ্টি হয়। সেসময়ে রবীন্দ্রনাথ বহু স্বদেশী গান রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যে কোরাস গানের সৃষ্টি করেন সেগুলি জাতীয় গানেরই শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে। তিনি ঐ শ্রেণীর গান কেবল কোরাসেই রচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একক গাইবারও জাতীয় গান রচনা করেছেন অনেক। সে যুগে সঙ্গীতের প্রতি যে অশ্রদ্ধা ছিল তার পরিবর্ত্তন করতে এই স্বদেশী গানগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের উৎকৃষ্ট গানগুলিও সে-সময়ে মধ্যবিত্তদের পরিবারে সঙ্গীতের তেমন চর্চ্চা না থাকাতে বহুল প্রচারিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ গত শতকের শেষদিকে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বা খেয়ালের হুবহু সুর রেখে তার কথাগুলি বদল করে যেমন গান রচনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ করেননি। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গান রচনাও নাটককে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। বাল্মিকীপ্রতিভা, মায়ার খেলা প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে চিরকুমার সভা, চণ্ডালিকা, নটীর পূজা প্রভৃতি নাটক, আধা-নাটক, পালাগান উপলক্ষেই গান রচিত হয়েছে। আর সেগুলি আলাদা গান হিসাবে শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে বাংলার মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে সঙ্গীতের আদর ও চর্চ্চা সম্ভব হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি শুধু নাট্যালয়েই গাওয়া হতো ও শোনা হতো। বাড়ী বাড়ী শিখবার ব্যবস্থা ছিল না। যারা সখের নাটক করবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিখে নিত। এতে গানের বহুল প্রচার সম্ভব ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল খেয়ালকে ভিত্তি করে তার গানগুলি রচনা করে নতুন রূপ সৃষ্টি করেন আর রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদকে ভিত্তি করে তার নিজস্ব ভঙ্গীর সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের খেয়ালঘেঁসা গান যে নেই তা নয়, তবে সেগুলির সংখ্যা খুবই কম। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গীর গানরূপ ধ্রুপদ আর বাউলের মিশ্রণ-ফল। ধ্রুপদের কাঠামোটি নেওয়া হয়েছে; বাউলের সহজ সরল ছন্দটি গ্রহণ করা হয়েছে, রাগরাগিণীর দাপট নেই—কীর্ত্তন বাউলের স্পর্শে সুর নরম হয়ে গিয়েছে। বাউলের মত সুর বিস্তারের পরিসর কম। কীর্ত্তনের মত কথার ভাব বেশী। কিন্তু আঁখর ব্যবহার নেই আর ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ পরিবর্ত্তন

নেই। শব্দ-চয়ন আর তার থেকে উৎপন্ন ধ্বনিমাধুর্য্য, আবেগ, ঠাসবুনন কথা আর লিরিকের সংক্ষিপ্তি রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষত্ব। মিষ্টি গান মাত্রেই এগুলি পাওয়া গেলেও তার সুর সুঠাম ও সুসমঞ্জস হয়েছে এবং গানের কথা সুরের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে বিরাজ করছে শুধু একাধারে কবি ও সুরকারের সম্মিলিত প্রতিভার ফলে।

দিনেন্দ্রনাথ যদি না থাকতেন তবে রবীন্দ্রনাথের গান বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত এত সহজে হতো না। সঙ্গীতের প্রতি সমাজের ঘৃণাভাবও এত সহজে ও সত্বর নষ্ট হতো না। রবীন্দ্রনাথ রচনা করেই অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাকে শিখিয়ে বাইরে গান করিয়ে লোককে আকৃষ্ট করিয়ে বাংলা গানকে সামাজিক অঙ্গ করিয়ে দিতে দিনেন্দ্রনাথের যথেষ্ট পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন রয়েছে। সে সময়ে গানকে বাড়ী বাড়ী পৌছে দিতে রেডিয়ো, সিনেমা ছিল না। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী তখন আরম্ভ হলেও রবীন্দ্রনাথের গান খুব কমই রেকর্ড করা হতো। সেজন্যে দিনেন্দ্রনাথ গানগুলি স্বরলিপি করে মাসিক পত্রিকায় ও পরে বই আকারে ছাপাতে থাকেন। তাতে গানগুলির যেমন সঠিক সুর রয়ে গেল, আর ঘরে ঘরে চর্চ্চা হওয়ার সুযোগও তেমন হলো। বর্ত্তমানে সবাকচিত্রের ও রেডিয়োর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গান আরও বহুল প্রচারিত হয়েছে। বিশ বৎসর আগে তেমনটি ছিল না।

অতুল প্রসাদ যে গান রচনা করে বাংলা গানের নতুন রূপ দিয়েছেন সেটি ঠুংরীকে ভিত্তি করেই রচিত। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীর গানগুলিতে সুর বিস্তারের পরিসর রবীন্দ্রনাথের গান হতে বেশী। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ছন্দ যেমন গম্ভীর তেমনটি অতুলপ্রসাদের নয়। তাঁর গানে ঠুংরীতে ব্যবহৃত চঞ্চল ছন্দ ও সুর ব্যবহৃত হয়েছে। অতুলপ্রসাদও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের মত কোরাস গান অথবা কীর্ত্তনাঙ্গ গান রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর গান বলতে যা বুঝা যায় সেটি ঠুংরীর সঙ্গে বাংলার মন সংযোগেই উৎপত্তি।

অতুলপ্রসাদকে বাংলা দেশে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন দিলীপকুমার। সে সময়ে তিনি যে শুধু অতুলপ্রসাদকেই পরিচিত করেছেন তা-নয়। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে ভাতখণ্ডের লিখিত পুস্তকগুলি ও তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিখবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়ে তরুণ বাংলার মন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিখে নেবার বন্যা এলো সারা বাংলায়। আর তাতে খেয়াল ও ঠুংরীর চর্চ্চা বাংলা দেশে বেড়ে গেল। তার জের এখনও চলছে।

কাজী নজরুল সৈনিকদের মার্চ্চের সুরেও গান লিখেছেন, কোরাস্ গানও লিখেছেন।

কিন্তু নিজস্ব সুর সেগুলিতে নেই। উত্তর ভারতীয় লোকসঙ্গীত গজলের সুর আর বাংলায় প্রচলিত আধুনিক বাংলা গান এই দুটি মিশিয়ে নজরুল-গীতি রচিত। তাঁর গান প্রচারিত হয়েছে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে। সে সময়ে নাটকের গান ঝিমিয়ে পড়েছিল, সবাকচিত্র আবিষ্কৃত হয়নি, আর রেডিয়োর ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেনি। পরবর্ত্তী কালে সবাক চিত্রেও তাঁর গানের সুর প্রচারিত হয়েছিল।

যে কয়জন সুর-রচয়িতার কথা বলা হলো তাঁরা সকলেই নিজেদের লেখাতেই সুর দিয়েছেন। কথা ও সুর দু-ই রচনা করবার ক্ষমতা থাকাতে তাঁরা অত্যন্ত সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সুরসাগর হিমাংশুকুমার সুর রচনায় ব্রতী হয়ে নিজে 'কথা' রচনা করতে পারেন না বলে অন্যের কাছ থেকে তাঁকে কথা ধার করে আনতে হয়েছে। কাজেই অনেক খুঁজে তবে এক একটি মনের সুর অনুযায়ী কথা বার হতে লাগলো। যাহোক তাঁর সুর বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো—যেমন করে সত্যিকারের সুরকারের সুর প্রকাশ পায়। তাঁর সুরে আমরা দেখতে পাই হিন্দুস্থানী ভজনের গীতপদ্ধতি, খেয়াল ঠুংরীর কতক কতক কারুকাজ আর সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ বাঁধবার রীতি। তিনি ধ্রুপদ বেঁধেছেন আর তাতে খেয়ালঠুংরীর অলংকার জুড়ে দিয়ে সুরকে বড় করে দেখিয়েছেন। তাঁর সুরে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সুরের ন্যায় হিন্দুস্থানীর পূরোপূরি সুর নেই। তাঁর সুর রবীন্দ্রনাথ, ভজন ও খেয়াল দিয়ে গড়া। সে সুরে কথা ও সুর সমান; মাঝে মাঝে সুরপ্রধান। গতিভঙ্গী অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। অতুলপ্রসাদ, নজরুল যেমন বাংলার বাইরে থেকে সুর নিয়ে এসে হাজির হলেন, সুরসাগর হিমাংশু পূরোপূরি ভাবে তা করেন নি। তিনি যা-এনেছেন তা-ও রবীন্দ্রনাথের ঢালের সঙ্গে যথাসম্ভব মিশিয়ে বাংলার ছাপ রাখবার চেষ্টা করেছেন।

গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি হতে বাংলা গানের ক্রমপরিণতিটি সহজে পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর ও এই শতকের প্রথম কয়েক বছর যখন সমৃদ্ধদের বাড়ীতে হিন্দুস্থানী গানের ধ্রুপদ ও খেয়াল খুব চলছে সেসময়ে গানের শেষে শ্রোতাগণ অনুরোধ জানাতেন 'এখন একটা বাংলা হোক'। ওস্তাদগণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দু একটি নিধুবাবুর টপ্পা নয় মালশী-বৈঠকী গান গাইতেন। ঐসব বাংলা গানই গ্রামোফোন রেকর্ড করা হয়েছিল প্রথম—টপ্পা, মালশী, ভাঙ্গাকীর্ত্তন। তারপর নাটকের গানগুলি রেকর্ড হতে আরম্ভ হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্র গান রেকর্ড করতে থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্র অন্যের গান যেমন রেকর্ড করেছেন নিজের সুর করা গানও যথেষ্ট রেকর্ড করে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার গানে প্রথম অবস্থায় নাটকে ব্যবহৃত সুরের উপর কারুকাজ করাই দেখতে পাই। পরবর্ত্তী গানে, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন সুর। রচনার এদিক দিয়ে যতটা না হোক

গায়ক হিসাবে তাঁর গানগুলিকে তিনি সুন্দর ভাবে শ্রোতার কানে তুলেছেন। তাঁর কীর্ত্তন গানগুলির রেকর্ড বর্ত্তমানে অতুলনীয়।

তাঁর সমসাময়িক শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে গান রেকর্ড করতে দেখতে পাই। রেকর্ড-গানে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর খেয়াল গান রচনা করে রেকর্ড করে যাওয়াই তাঁর বিশেষ দান। বাংলার বিশেষ নিজস্ব সুর না হলেও বাংলার গানকে সমৃদ্ধ করে রেখে বাংলার পরবর্ত্তী গীত-ছাত্রদের ঋণী করে রেখে গিয়েছেন। সে সব গান তাঁর কণ্ঠেই মানায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখতে পাই ভীষ্মদেব তাঁর নিজস্ব সুর রেকর্ড করেছেন। এঁর গানের সুরে আমরা বাংলার নিজস্ব ভঙ্গীর সুর পাই না, পাই উত্তর ভারতীয় খেয়ালশ্রেণীর গানের সুর জুড়ে দেওয়া গান। তুলনায়, আমার মতে, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গান হতে কম প্রয়োজনীয়। তবে নিজে গায়ক হওয়াতে গানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেগুলিও কৃষ্ণচন্দ্রের গানের মত সুসমঞ্জস ও প্রাণবন্ত নয়।

চলচ্চিত্র যখন সবাক হয়ে উঠল তখন হতে সঙ্গীত সিনেমায় একটি প্রধান বিষয় হয়ে গেল। অথচ আমাদের সঙ্গৎ সঙ্গীত নেই। নাটকে হারমোনিয়ম, বায়াতবলা মন্দিরা মধ্যে মধ্যে ক্লেরিওনেট ও বেহালা দিয়ে কাজ চালানো হতো। কিন্তু সিনেমা শিল্প সঙ্গৎ-সঙ্গীতের অভাব বোধ করতে লাগলো। গানকে যন্ত্রসঙ্গীত দিয়ে সঙ্গৎ করা যেমন প্রয়োজনীয় নৃত্যে সঙ্গৎ সঙ্গীত ততোধিক আবশ্যক। নৃত্যগীতের চাহিদা বাড়তে থাকাতে এদিকেও দৃষ্টি পড়লো কিন্তু যন্ত্রীদলের অভাব থাকাতে সবাক চিত্রেও প্রথম প্রথম শুধু বায়া-তবলা দিয়েই কাজ চালানো হয়েছে। অথচ সবাকচিত্রের প্রাণ ধ্বনিসম্পদ শুধু বায়াতবলায় দেওয়া অসম্ভব। যা হোক গত দশ বৎসর হতে যন্ত্রধ্বনিযুক্ত গান আমরা শুনতে পাই। সিনেমার চাহিদায় উৎপত্তি হলেও বর্ত্তমানে বাংলা গানের রেকর্ডে প্রথমে ও শেষে যন্ত্রধ্বনির সংযোগ না থাকলে রেকর্ড বিক্রি তেমন হয় না। বাঙ্গালী জনসাধারণের কান কি ধরণের তৈরী হয়েছে তা অনুমান করা সহজ।

একাজে দেখতে পাই প্রথম রাই বড়ালকে তার পর পঙ্কজ মল্লিককে সবাকচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনায় লিপ্ত থেকে গানের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের মিশ্রণ-চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্যের গান যন্ত্রসঙ্গীত ছাড়া চলে না। যন্ত্রসঙ্গীতের উপর অনেকখানি নির্ভর করে তবে গান রচনা হয়। গানগুলির সুর হয় সহজ কিন্তু সঙ্গে যে যন্ত্রসঙ্গীত বাজে সেটি হয় কারুশিল্পীদের উপভোগ করার মত। গানে কথাকে বাদ দেওয়া যায় না বলে সুরকে সহজবোধ্য করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু এতে সঙ্গীতজ্ঞদের তৃপ্তি হয় না, এজন্যে সঙ্গে যে যন্ত্রসঙ্গীত-যুক্ত হয় তাতে কারুশিল্পের দিকে কতকটা দৃষ্টি রেখে রচনা চলে। সে আদর্শে আজ

পর্য্যন্ত রচনা বাংলা দেশে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া গানের সুরকে যন্ত্রধ্বনি দিয়ে রঞ্জন (colouring) করার যে পদ্ধতি পাশ্চাত্য এতদিনকার অভিজ্ঞতার ফলে গ্রহণ করেছে সে-পদ্ধতি এখনও আমাদের গানে ব্যবহৃত হয়নি।

কমল দাশগুপ্ত অনেককাল পূর্ব্ব হতেই তাঁর সুরের গ্রামোফোন রেকর্ড করিয়েছেন। তাঁর হিন্দী গানের সুরগুলি বাংলার বাইরে ব্যাপক আদর পেয়েছে। তার সুরগুলিতে যন্ত্রসঙ্গীতের আবেদন দেওয়া সহজ হয়। তাছাড়া তার যন্ত্রধ্বনি সংযোজনার যে ধারা সে-টি তাঁর নিজস্ব। তাঁর সিনেমার প্রয়োজনে রচিত গানের সুরগুলি সংক্ষিপ্ত ঠাসবুনন্ ধ্বনি-চয়নে মাধুর্য্যপূর্ণ। তাছাড়া যন্ত্রধ্বনি ও সুর সংযোগের উৎকর্ষ মিলে সুঠাম ও সুসমঞ্জস; কিন্তু সুরগুলি চঞ্চল আর মাঝে মাঝে একঘেয়ে। যন্ত্রধ্বনি সম্মিলিত বাংলা গান-রূপ এখনও শিশুমাত্র। এগুলি হতে গানের একটি পূর্ণ বলিষ্ঠ অবয়ব এখনও দৃষ্টিগোচর সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলা গানের গতি এই দিকেই বর্ত্তমানে চলেছে। আর এ পথে আরও অনেক অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীর গান-রূপ আমরা এযুগে পাই যার স্রষ্টা দিলীপ কুমার। তাঁর নিজের এবং উমা বসুর কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ড করা তাঁর গানগুলি এই কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একা গাইবার ভারতীয় আদর্শ যা মধ্যযুগে সৃষ্ট হয়েছিল সে-গানের ঔৎকর্ষে এ-টি বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ গান-রূপ। তিনি হিন্দুস্থানী গীতপদ্ধতি হতে টপ্‌খেয়ালঠুংরীর সুর বিস্তার করার পদ্ধতি নিয়েছেন। আর তাতে কীর্ত্তন হতে নেওয়া আঁখর যোগ করেছেন। কীর্ত্তনের একই গানে তাল পরিবর্ত্তন ও সুর পরিবর্ত্তন রীতি তাঁর গানে নেওয়া হয়েছে। একই ঠাটের অন্তর্ভুক্ত সুরে খরজ পরিবর্ত্তন করলে রাগরাগিনীর রূপের যে পরিবর্ত্তন হয়ে পড়ে, এক রাগিনী প্রায় আর এক রাগিনী হয়ে পড়ে, সে কৌশলটি নিয়েছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত-বিজ্ঞান হতে। কীর্ত্তন গানে ভাবের সঙ্গে ঐক্য রাখতে একই সুরকে খরজ ধরে রাগের পরিবর্ত্তন করা হয়। কিন্তু তিনি খরজ স্থিতিশীল না রেখে খরজ পরিবর্ত্তন করে অন্য রাগরাগিনীর আভাস গানে এনেছেন। তিনি খেয়াল গানের তান কুর্ত্তবকে কেবল সুরে ব্যবহার না করে খেয়ালের তানগুলির সঙ্গে কীর্ত্তনের কথার আঁখর যুক্ত করে নতুন সুর প্রধান আঁখরের রচনা করেছেন। এই গান-রূপ অতুলনীয়।

যে পাহাড়ের চূড়া বেশী উঁচু সে পাহাড়ের গোড়াও প্রশস্ত বেশীই হয়। যদি তা না হতো তবে চূড়া বেশী উঁচু হওয়ার সুযোগ পেতো না; অথবা পেলেও ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কাই বেশী থাকত। এ কথাটি সঙ্গীতের ঔৎকর্ষে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গীত অনুশীলনের তুলনায় বাংলার সঙ্গীত অনুশীলন অনেক বেশী সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গীতের গোড়া বাংলার সঙ্গীতের ভিত্তি হতে অনেক কম প্রশস্ত।

অন্যান্য প্রদেশে সঙ্গীতের গোড়ায় এত বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত নেই। যে দেশে যত বেশী নদী সে দেশ তত বেশী উর্ব্বরা হয় এই নীতিতে বাংলার এই যে নানা শ্রেণীর গানের চর্চ্চা চলে আস্ছে তাতে বাঙ্গালী সঙ্গীতে অনুরক্ত হচ্ছে বেশী, সাঙ্গীতিক মন বহুল তৈরী হচ্ছে আর ব্যাপক ভাবে সঙ্গীতের প্রসারও সহজে হচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশে উৎকর্ষ সঙ্গীত রচনার সম্ভাবনা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় খুবই বেশী।

প্রাক-আধুনিক যাত্রা

করালীকান্ত বিশ্বাস

সাধারণত অনুমিত হইয়া থাকে যে বাংলা দেশের প্রাচীন যাত্রাগান ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল। প্রাচীন যাত্রাগানের অস্তিত্ব এখন নাই, কালীয় দমন অথবা কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডী, ভাসান প্রভৃতির বর্তমানে যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই ধর্ম্মের সহিত যাত্রাগানের যোগ ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ধর্ম্মাচরণ ও যাত্রাগানের সহিত প্রত্যক্ষ কোনও যোগ ছিল কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কোনও রূপান্তর হয় নাই এমন একটিও প্রাচীন যাত্রার পরিচয় আমরা পাই নাই। গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং নেপালে প্রাপ্ত একটি পুঁথি প্রাচীনতম বাংলা যাত্রার নিদর্শন। এই একটি ছাড়া আর সবগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত। কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রাচীন যাত্রাকে কতখানি এবং কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা বলা শক্ত।

ধর্ম্মের প্রভাব যে প্রাচীন যাত্রায় ছিল তাহা স্বতই মনে হইবে। একমাত্র বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কথা বাদ দিলে প্রত্যেকটি প্রাচীন যাত্রা ধর্ম্মবিষয়ক। রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা, ভাসান, চণ্ডী, গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কোনটিই ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত নহে। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার উৎপত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি নিদর্শনের একটি বাহ্যিক লক্ষণের মিল আছে। প্রত্যেক কবি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আদেশকারী দেবতার মহিমা প্রচার করিতে। প্রাচীন যাত্রাগুলিও দেবদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত এবং অভিনীত হইয়া থাকিবে। প্রত্যক্ষ ধর্ম্মাচরণের সহিত যোগ না থাকিলেও ধর্ম্মানুষ্ঠানে

যে যব উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে তাহাতে নিশ্চয়ই যাত্রাগানের অভিনয় হইত। কালক্রমে এই ধরণের উৎসব হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবেও যাত্রাগান আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনাই প্রধানত যাত্রাগানের বিষয় ছিল। প্রতি বৎসর বিশেষ তিথিতে এই সব ঘটনার স্মৃতি বহন করিয়া উৎসবাদি এখনও হইয়া থাকে। রাসযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি তাহারই নিদর্শন। কিন্তু এই সব 'যাত্রা' ও যাত্রাগান এক ভাবিবার কারণ নাই। রাসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রাসলীলা যাত্রাগান হয়ত সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি গোষ্ঠবিহার ও অন্যান্য কাহিনী অবলম্বন করিয়া গান বাঁধা হইয়া থাকিবে এবং তাহা বিশেষ বিশেষ তিথিতে অভিনীত হওয়াও সম্ভব। ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন যাত্রার যোগ থাকিলে এই ভাবেই ছিল বলিয়া মনে হয়।

এদিক দিয়া নেপালের যাত্রাগান আলোচনা করিলে এদিকে অনেকটা আলোক-সম্পাত হইবে। গুর্খালিরা নেপাল জয় করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নেপালে বাঙ্গালীদের প্রভাব যথেস্টই ছিল। প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন নেপাল দরবারেই পাওয়া গিয়াছে। কাজেই নেপালী যাত্রায় বাঙ্গালীদের প্রভাব কিছু কিছু ছিল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে।

নেপালে এখনও মৎস্যেন্দ্রনাথ, ভৈরব প্রভৃতির যাত্রার প্রচলন আছে। পুরাবিদেরা মনে করেন যে নেপালে যাত্রাভিনয়ের যে রীতি এখনও প্রচলিত তাহা প্রাচীন প্রথারই নিদর্শন। ভৌগোলিক বিশেষ পরিবেশের জন্য এই প্রথা রূপান্তরিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

ভৈরবযাত্রায় প্রথমে দুইখানি রথে ভৈরব ও ভৈরবী মুর্ত্তি স্থাপন করিয়া নগর পরিভ্রমণ করানো হয়। এই ভৈরবের রথের সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মত বহু লোক অনুগমন করে। ঐ দিন রাত্রে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিনয় হইয়া থাকে। রাত্রিকালে বার জন নর্ত্তক মুখোস পরিয়া ধর্ম্মী সাজিয়া আসে, ঐরূপ অপর চারিজন ভৈরব, ভৈরবী (কালী), বারাহী (কুমারী) সাজিয়া আসে। মন্দির প্রাঙ্গণে তাহারা বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নাচগান করে।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধর্ম্মের উৎসবেই এই অভিনয়ের আয়োজন। পূজা ও আরাধনায় অনুষ্ঠানটির যে অর্থ সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না তাহা এই অভিনয়ের সাহায্যে সহজেই মর্ম্মে প্রবেশ করে। নেপালের ভৈরবযাত্রা অথবা কুমারীযাত্রায় যতখানি ধর্ম্মের যোগ এবং প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিক ধর্ম্মের প্রভাব বাংলা দেশের প্রাচীন যাত্রাতে কল্পনা করিবার কারণ নাই। যাত্রা-গানকেই এক ধরণের ধর্ম্মাচরণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা ঠিক হইবে না।

বাংলা দেশের প্রাচীন যাত্রার অস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এখনকার কালিয়দমন (কৃষ্ণযাত্রা), ভাসান যাত্রা প্রভৃতি হইতে। গত দুইশত বৎসরে বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেশের গভীরতম প্রদেশেও অতীত ঐতিহ্য এই কারণে অবিকৃত থাকিতে পারে নাই। বিভিন্ন ধরণের প্রভাব নানা ভাবে তাহা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, কখনও কখনও একেবারেই রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান কৃষ্ণ ও ভাসান যাত্রা হইতে উহার প্রাচীন বিশুদ্ধ রূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে যাত্রার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চরিত গ্রন্থগুলিতে। চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যেকটিতে উল্লেখ আছে যে চৈতন্যদেব অনেক সময়ে যাত্রাভিনয় করিয়াছেন। এই সব গ্রন্থগুলিকে চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে প্রামাণিক বলিয়া মনে করা হইলে একথা স্বীকার করিতে হয় যে চৈতন্যদেবের সময় যাত্রাভিনয় বিশেষ প্রচলিত ছিল। চরিত গ্রন্থগুলির সত্যাসত্যের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয় নাই বলিয়া এইসব গ্রন্থের প্রত্যেকটি উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি থাকিলেও একথায় কেহ আপত্তি করিবেন না যে, যে সময়ে চরিতকারগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সেই সময়ে যাত্রাগানের সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই সময়ে যে শুধু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাগানের প্রচলন ছিল তাহা নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থানকালে সর্ব্বদাই নৃত্যগীতাদিতে কালাতিবাহিত করিতেন। মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছে ঃ

"বিজয়া দশমী দিন লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥"

অর্থাৎ রামায়ণের নানা কাহিনী লইয়াও যাত্রাগানের প্রচলন পূর্ব্বাবধিই ছিল।

চরিত গ্রন্থগুলিতে চৈতন্যদেবের নিজের অভিনয় করিবার কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগে যাত্রাগান সব দিক দিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই সময় হইতেই বৈষ্ণবগণ যাত্রাগান অভিনয় এবং রচনা করিতে আরম্ভ করেন বোধ হয়। এই সময়ে রচিত একখানি পুঁথিও এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই! চৈতন্যদেব নিজে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা অনুসরণ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই খাঁটি বাংলা নাটকের সূত্রপাত মনে করা অসঙ্গত নয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা দেশে বিশেষ ঘটনা। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে বাংলা দেশে মৌলিক সংস্কৃত নাটক রচিত

হইয়াছে, কিছুদিন পরে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদও যথেষ্ট হইয়াছিল।

প্রাচীনতম বাংলা নাটকের পরিচয় দিয়াছেন ডক্টর সুকুমার সেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হইতে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নেপাল হইতে প্রাপ্ত একখানি পুঁথির কিয়দংশ নকল করিয়া লইয়া আসেন। ডক্টর সেন এই অনুলিপি হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। নাটকটি গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত, রচনাকাল ১৬২০-৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই নাটকটির ভাষা বাংলা, নেওয়ারী মিশ্রিত। ডক্টর সেন মনে করেন যে এই নাটকটি বাংলা ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কোন গীত বা পাঁচালী হইতে রচিত।

এই প্রসঙ্গে নেপালে প্রাপ্ত আরও চারিখানি নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুঁথি কয়খানি 'নেপালে বাংলা নাটক' নাম দিয়া শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (গ্রন্থাবলী-সংখ্যা ৬১)। বিদ্যাবিলাপ, মহাভারত, রামচরিত্র এবং মাধবানল-কামকন্দলা—এই চারিটি নাটক ইহাতে আছে। ভাষাবিদেরা মনে করেন যে নাটকগুলির ভাষা মৈথিল। কিন্তু সম্পাদক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় বলিয়াছেন যে নেপালে বাঙ্গালীদের প্রভাব হ্রাস হইবার পরেও, সে দেশে মৈথিলদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় ছিল। নাটক কয়েকটির লিপিকার বোধ হয় মৈথিল। নাটকের ভাষায় মৈথিল ছাড়াও নেওয়ারী ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট পড়িয়াছে। সম্পাদক মহাশয় মনে করেন যে কালের প্রভাবে মূল বাংলা ভাষায় রচিত নাটকের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে। ভাষাগত বৈসাদৃশ্য কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না, কাজেই ভাষা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রচনা কয়েকটির মূল মৈথিল ভাষায় রচিত বলিয়া ধরিয়া লইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে মৈথিল ভাষায় ঐ ধরণের কোনও নাটক সমসাময়িক কালে রচিত হইত কি না। মৈথিল সাহিত্যে এমন কোনও নাটকের ট্রাডিশন থাকিলে ইহা অনুমান করা সঙ্গত যে নাটকগুলির মূল মৈথিল ভাষাতেই রচিত। কিন্তু মৈথিল ভাষায় নাটক রচনার এমন কোন ট্রাডিশন আছে বলিয়া জানা যায় না। রামচরিত ও মহাভারত হিন্দী ও মৈথিল প্রাক্-আধুনিক নাটকে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিলাপের বিষয়টি বাংলা দেশেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। সম্পাদক মহাশয়ের অনুমান সমর্থন করিবার মত যুক্তির অভাব নাই।

যাহা হউক, এই নাটকগুলির মূল কোন ভাষা তাহা আলোচনা করা অপেক্ষা নাটকগুলির ফর্ম কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাংলা যাত্রার প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইতে পারে। পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের নির্দ্দেশ হইতেই পুঁথিগুলিকে নাটক বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে। কাহিনীতে যতটুকু নাটকীয় উপাদান আছে তদতিরিক্ত কোনও ঘটনা উহাতে নাই। বিদ্যাবিলাপে সুন্দরের নায়কোচিত গুণাবলী প্রদর্শন করাইবার

জন্য রাজার প্রমোদ উদ্যানেই রাক্ষসাদির সহিত লড়াইয়ের একটি দৃশ্য আছে। ইহা ছাড়া আর কোনও নাটকীয় ঘটনা উহাতে নাই। নাটকগুলির আগাগোড়াই গান। গানের রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। বক্তৃতাদি আছে, কিন্তু সামান্য। বক্তৃতায় ঘটনার গতি অথবা নাটকের পরিণতি কিছুই অগ্রসর হয় না।

প্রাচীন বাংলা নাটকের ফর্মও ঠিক এইরূপ ছিল তাহা অনুমান করা যায়। প্রাচীন বাংলা নাটকের যে বর্ত্তমান পরিণত রূপের সহিত আমরা পরিচিত তাহাতেও নাটকীয় ঘটনা, সংঘাত অথবা পরিণতি কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ জীবনলীলা, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি কাহিনী হইতে দর্শকেরা নূতন কিছু আশা করে না। ধীরে ধীরে কাহিনী উন্মোচন করা তাই নিষ্প্রয়োজন। পাত্রপাত্রী ও দর্শকদের পরিচিত বলিয়া ঘটনা সংঘাতে তাহাদের চরিত্র বিকাশের প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। প্রাচীন বাংলা নাটকের গতি অতি ধীর, কৃষিপ্রধান সমাজের উপযোগী। সংঘাত একেবারেই বর্জ্জিত। সংঘাতের স্থানে আছে গানের পরে গান।

নেপালি যাত্রার বর্ণনা, চরিত গ্রন্থগুলিতে চৈতন্যদেবের রাধিকার ভূমিকা অভিনয়ের উল্লেখ প্রভৃতি হইতে মনে হয় যে প্রাচীন যাত্রাতে যথেষ্ট সাজপোষাক ব্যবহার করা হইত এবং নৃত্যেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

সংস্কৃত ও ইংরাজী আদর্শ দিয়া বিচার করিলে প্রাক্-আধুনিক যাত্রাগুলিকে নাটক বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা জন্মায়। রচনার দিক হইতে আদর্শ হইতে বহু দূরে হইলেও অভিনয়ের দিক হইতে বিচার করিলে এইগুলিকে নাটক বলিতে বাধা থাকে না। ইংরেজি মর‍্যালিটি অথবা মিরাক্যল্ প্লে গুলিকেও নাটক বলা যায় না। কিন্তু পরে তাহারই ক্রমবিকাশে ইংরেজী ট্রাজেডির জন্ম হইয়াছে। প্রাক্-আধুনিক যাত্রাও বিকাশ লাভ করিতে পারিত কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাট্যকারদের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট হইয়াছিল।

আধুনিক যাত্রা আধুনিক বাংলা নাটকেরই ভেজাল সংস্করণ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন কলিকাতার ধনীদের গৃহে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় আরম্ভ হইল তখন হইতে সখের ও পেশাদারী যাত্রার উদ্ভব। রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় যাহারা করিতে পারিত না তাহারা এইরূপ সখের যাত্রা অভিনয় করিত। উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যাভিনয় আধুনিক যাত্রাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাম্বিত করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন যাত্রা এবং কবি পাঁচালী এবং অন্যান্য জনপ্রিয় উপাদানও উহাতে যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি নাটক রচনা আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বেও যে সখের যাত্রার প্রচলন ছিল তাহার উল্লেখ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে আছে। সখের যাত্রাতেই সব কয়টি জনপ্রিয় উপাদান রহিয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া গান ও নৃত্যের। এই দিক হইতে প্রাচীন যাত্রার প্রভাব পরোক্ষভাবে এখনও আমাদের নাটকে প্রচুর মাত্রায় আছে।

শেষ পড়া

দদে

অনুবাদক—ধীরেন রায়

সেদিন স্কুলে যেতে দেরী হয়েছিল। তার ওপর ম্যসিয়ে হ্যামেলের গ্রামারের পড়া হয়নি। একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারিনি পর্যন্ত। স্কুল ফাঁকি দিয়ে সারাদিন বাইরে কাটাবার চিন্তাও মনে জেগেছিল। সূর্যকিরণ-প্লাবিত বসন্তের আনন্দময় দিন! টুনটুনি পাখীগুলো বনঝোপে তাদের ভাষায় গান গাইছে। করাতকলের পিছনের ময়দানে কুচকাওয়াজ করছে প্রাসিয়ান সৈনিকেরা। এসময় গ্রামারের চেয়ে প্রকৃতির আহ্বানে মন সাড়া দেয় বেশী। প্রলোভন জয় করবার শক্তি আমার কিছুক্ষণ তাই নির্মেঘ আকাশ, আকাশ-চারী বিহঙ্গদের সংগীত, অরণ্যের শীতল ছায়া আমাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারলনা। স্কুলের পথে দ্রুতবেগে চল্‌লাম।

টাউনহলের যেখানে ইস্তাহার লট্‌কানো থাকে—সে-জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। গত কয়েক বৎসর থেকে যুদ্ধের পরাজয়, অপমানজনক সন্ধিসর্ত এবং বিজয়ী কম্যাণ্ডিং অফিসারের হুকুমনামা প্রতিটি দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে এখান থেকে। অশুভ স্থান! মনে মনে ভাবলাম—'এবার কী ব্যাপার হতে পারে'? কামার ওবাখতার তার সহকারীর সংগে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে বলল—'এত তাড়াতাড়ি যাবার কোন দরকার নেই খোকা—ইস্কুল বস্‌তে এখনো ঢের দেরী।'

লোকটা ঠাট্টা করছে আমার স্কুলে যেতে দেরী হওয়াতে। একদমে ম্যসিয়ে হ্যামেলের ছোট বাগানটার কাছে পৌঁছুলাম। সাধারণতঃ, ছুটি-না-থাক্‌লে একটা জমাট গোলমাল থাকে। রাস্তা থেকে শোনা যায়। বেঞ্চি সরানোর শব্দ, ফাঁকিকাজ ছেলেদের উচ্চকণ্ঠে পড়ার চীৎকার—শিক্ষক মহাশয়ের লৌহদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত জীর্ণ টেবিলের সশব্দ আর্তনাদ শোনা গেল না—অন্যদিন হাত দিয়ে কান চেপে রাখলেও স্পষ্ট শোনা যেত। আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। রবিবারের সকালের মত শান্ত। চোরের মত চুপি চুপি পিছনের বেঞ্চিতে আত্মগোপন কর্‌তে হবে। ম্যসিয়ে হ্যামেলের শ্যেনদৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাল সহপাঠিরা সকলেই বসে আছে। শুধু ম্যসিয়ে হ্যামেল তাঁর ভয়ংকর লৌহদণ্ডটি বগলদাবা করে পায়চারি করছেন।

ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু সাংঘাতিক কিছু ঘটল না। আমাকে দখে ম্যসিয়ে হ্যামেল অদ্ভুত নরম সুরে বল্‌লেন—'ফ্রাঁস তোমার জায়গায় গিয়ে বস।—তোমাকে বাদ দিয়েই আমার

পড়া শুরু করছিলাম।' প্রায় লাফিয়ে বস্‌লাম বেঞ্চিতে। ভয়ার্ত ভাবটা কেটে যাওয়াতে তাকালাম 'মাষ্টার মশাই'র দিকে। সুন্দর সবুজ কোট পরণে, মাথায় কালো রেশমী টুপি— সমস্ত পোষাকগুলোই সুচারু কারুকার্যমণ্ডিত। বাস্তবিক সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্কুল পরিদর্শকের আগমন হলে বা প্রাইজের দিনেই শুধু এমন জমকালো পোষাকে তাঁকে দেখা যেত। বিদ্যালয়ময় একটা থম্‌থমে স্তব্ধতা। কেমন যেন বিষাদমগ্ন মনে হয়। এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। সব কিছু পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে যেন। বিস্ময় চরমে উঠল যখন তাকালাম পিছনের দিকে। গ্রামবাসীরা ছাত্রদের মত শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে। তিনকোণা টুপি মাথায় হোসার্, ভূতপূর্ব মেয়র, প্রাক্তন পোষ্টমাষ্টার এবং আরো অনেকে আছে শূন্য বেঞ্চগুলো পূর্ণ করে। বুড়ো হোসারের হাতে একটা প্রথম ভাগ—পুরু কাঁচের চশমা চোখে লাগিয়ে অতি মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। বোকার মত যখন চারদিক তাকিয়ে দেখছিলাম তখন ম্যসিয়ে হ্যামেল চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগলেন—'ছেলেমেয়েরা, এই আমার শেষ পড়ান; বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে আলসাস্-লোরেণের স্কুলে জার্মাণ ভাষা পড়াতে হবে। তোমাদের নোতুন শিক্ষক কাল আস্‌বেন। ফরাসী ভাষার শিক্ষা তোমাদের আজই শেষ। আশা করব তোমরা সকলেই মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুন্‌বে।'

বজ্রপতনের মত আকস্মিক ও প্রচণ্ড কথাগুলো। ওহো—হতভাগারা তাহ'লে এই খবর লট্‌কে দিয়েছে টাউনহলে। ফরাসীপড়া এই আমার শেষ! কিন্তু কেন? ভাল করে লিখতে শিখিনি পর্যন্ত। কেন আর ফরাসী পড়া হবেনা? তাহলে আজ… আজই শেষ! পাখীর ডিম খুঁজে, ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করার জন্য—দুঃখে, ক্ষোভে নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। কিছুক্ষণ আগে গ্রামার ছিল চরম ঘৃণিত আর 'সাধুসন্তদের ইতিহাস' ছিল দুর্বহ। প্রিয় পুরাতন বন্ধুর মতই মনে হল এই অযত্ন ছিন্ন বইগুলিকে। এই প্রথম ম্যসিয়ে হ্যামেলের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জাগল। তিনি চলে যাবেন—! ঘটনাটা বেদনাদায়ক। তাঁর সংগে জীবনে আর দেখা হবেনা—ভুলে গেলাম তাঁর ভয়ংকর লৌহদণ্ডকে, মন থেকে মুছে গেল তাঁর নিষ্ঠুরতার স্মৃতি। আহা বেচারা! শুধু 'শেষপড়া'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আভিজাত্যময় পোষাক প'রে এসেছেন। গ্রাম্য ভদ্রলোকের আগমনের কারণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল আমার কাছে। হোসারের মনে দুঃখ স্কুলে পড়েনি বলে। আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে এসেছে ম্যসিয়ে হ্যামেলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে—এতে স্বদেশ, মাতৃভাষার প্রতি ফুটে উঠেছে তাদের আন্তরিকতা। বিচিত্র ভাবনার স্রোতে ভেসে চল্‌ছিলাম। ম্যসিয়ে হ্যামেলের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। এইবার আমার পালা। কিন্তু গ্রামারের

ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিইনি পর্যন্ত······ওঃ যদি ভাল করে পড়া থাকত তাহলে কি সুন্দরই না হত। হেঁট হয়ে ডেস্ক ঘুঁটতে লাগলাম। এছাড়া আর কী করতে পারি? ম্যসিয়ে হ্যামেল স্নেহকোমল কণ্ঠে বল্লেন—"বকাবকি নিশ্চয় ভাল লাগবেনা তোমার, ফ্রাঁস। প্রতিদিন আমরা ভাবি যথেষ্ট সময় আছে হাতে—কাল পড়ে নিলে হবে। তার ফলাফল দেখছ তো? আলসাসের অধিবাসীদের আসল গলদ এইখানে। কাল-হরণের নীতি। ফ্রান্সের অন্যপ্রান্তের লোকেরা তোমাকে যদি বলে—'তুমি ফরাসী বল্‌ছ নিজেকে অথচ পড়তেও পারনা, লিখতেও পারনা।' তাহলে প্রতিবাদ করবে কী করে? আমি জানি তুমি একেবারে খারাপ নও পড়াশোনায়—তবু বলব এই ক্রটিগুলো সংশোধন করতে হবে।'—ম্যসিয়ে হ্যামেল শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন—'তোমার বাপ-মা তোমাকে শিক্ষিত কর্‌বার জন্যে খুব উৎসুক ছিলেননা—তাঁরা চাইতেন কোন গোলাবাড়ী কি মিলে চাক্‌রী করে দু'পয়সা রোজগার কর। আর আমি? দোষ আমারও আছে। অনেক সময় তোমাদের পড়ার ক্ষতি করিয়ে ফুলগাছে জল দিতে বলেছি। আমার মাছ ধরতে যাওয়ার ইচ্ছে হলে ছুটি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের। দোষ আমারও ছিল যথেষ্ট।' ম্যসিয়ে হ্যামেল এক প্রসংগ ছেড়ে অন্য প্রসংগ আলোচনা করতে লাগলেন। ফরাসী ভাষার মত মিষ্টিভাষা আরেকটি নেই পৃথিবীতে। সযত্নে আমাদের মাতৃভাষাকে লালন করতে হবে। গোলামীর বাঁধন তাহলে একদিন ছিঁড়তে সক্ষম হব আমরা ইত্যাদি।

তারপর গ্রামার পড়াতে লাগলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলাম—প্রতিটি কথাই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি—এত সহজ মনে হচ্ছে—। এ ধরণের ধৈর্য্যশীল তিনি কোনদিন ছিলেন না—সত্যি কী সুন্দর তাঁর কণ্ঠস্বর! যাবার আগে তিনি আজন্মসঞ্চিত বিদ্যা বিতরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যেন, অন্ততঃ একথাই আমার মনে হ'ল। একদিনে মাথায় সবকিছু ঢুকিয়ে দেবেন। ম্যসিয়ে হ্যামেল প্রত্যেককে একটি করে নোতুন খাতা দিলেন। তাতে গোল গোল অক্ষরে লিখে দিলেন আল্‌সাস্—লোরেণ—ফ্রান্স—

শ্রুতিলিখনের জন্য ম্যসিয়ে হ্যামেল একটি বই থেকে কিছু পড়লেন। সারা স্কুলময় অচ্ছেদ্য নিস্তব্ধতা। লেখার খস্ খস্ আওয়াজ শুধু শোনা যায়। কতকগুলো ফড়িং উড়ে এল ঘরের ভিতর। ছাত্রদের দৃষ্টি সেদিকে আজ আকৃষ্ট হ'লনা। এমন কি বাচ্চাছেলেরাও রইল অচঞ্চল! তা'রা গভীর মনোযোগ দিয়ে মাছ আঁকছে। চোখমুখের তন্ময়ভাব দেখে দূর থেকে মনে হবে—যেন তা'রা মাতৃভাষার চর্চ্চাতেই মগ্ন। কার্নিশের ওপর পায়রাগুলো নিস্তেজ কণ্ঠে বক্‌বকম্ করছে। শত্রুরা কি কবুতরগুলোকেও জার্মান ভাষায় গান করতে বাধ্য করবে? ম্যসিয়ে হ্যামেল নিস্পন্দ হয়ে চোখ বুলোচ্ছিলেন স্কুলের প্রতিটি জিনিষে।

সুন্দর! গত চল্লিশ বৎসরের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে এই বাগানওয়ালা বাড়ী আর ক্লাসের সংগে। এর প্রতিটি কোনাঘুপ্চি তাঁর জানা। খস্খসে নোতুন বেঞ্চগুলো বহুবৎসরের ব্যবহারে হয়ে গেছে মসৃণ। বাগানের ওয়াল্‌নাট্ গাছগুলো হয়েছে দীর্ঘতর—দ্রাক্ষলতায় ছেয়ে গেছে স্কুলের ছাদ। ফল ধরবে কিছুদিনের মধ্যে। কিন্তু এই সুপক্ক, সোনালী আংগুরগুলো তাঁর ভোগে আসবে না!

বিষণ্ণ ম্যসিয়ে হ্যামেলের দৃষ্টি সুদূরগামী-বেদনাতুর। তাঁর বোন পাশের ঘরে বাক্সতোরংগ গোছ-গাছ করছে। আগামী কালের মধ্যে তাঁদের এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে হ'বে। ম্যসিয়ে হ্যামেল ভেংগে পড়েন নি। ইতিহাসের পড়া দিলেন। ছোট্টছেলেরা সমস্বরে চিৎকার করছে—বি-এ—(ব্যা) বি-আই (বাই)। পিছনের বেঞ্চিতে বুড়ো হোসার বানান করে পড়ছে। আবেগকম্পিত তার কণ্ঠস্বর। এই অবস্থা দেখে কাঁদব না হাসব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। স্পষ্ট আমার মনে আছে সেই ফরাসীপড়ার শেষ দিন!

এমন সময় গীর্জার ঘড়িতে বাজল বারোটা। সংগে সংগে বেজে উঠল প্রাসিয়ানদের বিউগল। সৈনিকেরা ফিরে আস্‌ছে কুচকাওয়াজ থেকে। বিবর্ণ মুখে দাঁড়ালেন ম্যসিয়ে হ্যামেল। অসম্ভব দীর্ঘকায় মনে হল তাঁকে।

'বন্ধুগণ!' বল্‌লেন তিনি—'আমি-আমি' কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল তাঁর বেদনার ভারে। তারপর একখণ্ড চক্ দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন—

—'ভিভ্‌লা ফ্রাঁস'

এলিয়ে পড়ল তাঁর শরীর। অদ্ভুত সকরুণ ভংগিতে তিনি বললেন,

—'ছুটি।—তোমরা যেতে পার'।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্কট

শশধর সিংহ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হওয়ার পর হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে-সব সমস্যা উঠিয়াছে তাহাকে কেবল যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সহিত জড়াইয়া দেখিলে সেগুলির একটা সঠিক চিত্র পাওয়া যাইবেনা। অস্থায়ী সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া যায়; যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যে-সঙ্কটের কথা বলিতেছি তাহাকে জাগতিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল মিলাইয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের অনেক ঘটনা সহজে বোধগম্য হইবে। ব্রিটিশ শাসকবৃন্দের মনোজগতের বিচিত্র রহস্যেরও একটা কূল কিনারা পাওয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য যে, বৃটেনে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহার প্রধান কারণ ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা "Continuity of policy" বা পররাষ্ট্রনীতির পারম্পরিকতার দোহাই দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই হেতু মিঃ চার্চ্চিলের মত মিঃ বেভিনকেও বলিতে হইয়াছে যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার সাহায্যার্থে বৃটেনের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন নাই। মানুষের ধর্ম্মই এই যে, নিজের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সে চিরকাল নানা অজুহাত খোঁজে। মনোবিজ্ঞানে মনের এই ব্যবস্থাকে rationalization বা যুক্ত্যাভ্যাস বলা হয়। রক্ষণশীল নেতার মত মিঃ বেভিনও তজ্জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভূয়সী গুণগান করিয়াছেন। পৃথিবীর শান্তি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের অবয়ব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি কেবল স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, জগতের ইতিহাসের এই নূতন পর্য্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রূপান্তরিত করিতেও তৎপর হইয়াছেন। এই প্রচেষ্টা এখনও কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত হয় নাই সত্য, তথাপি ইহার গতি নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়।

এই নূতন সাম্রাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীকে চার ভাবে বিচার করা যাইতে পারেঃ (১) সাম্রাজ্যের আঙ্গিক (structural) পরিবর্ত্তন; (২) য়ুরোপীয় নীতি; (৩) সাম্রাজ্যরক্ষার সামরিক পরিকল্পনা ও (৪) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ। (২) ও (৪) দফা পূর্ব্বে পরোক্ষভাবে একবার আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ যাবৎ এইগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের পরিবর্ত্তনশীল অঙ্গহিসাবে দেখা হয় নাই। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে,

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অটুট রাখা যেমন প্রয়োজন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেও আমেরিকার সাহায্য তেমনি প্রয়োজন। এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বর্ত্তমান অবস্থায় বাড়িবে বই কমিবে না। তারপর আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ইতিমধ্যে বৃটেনের য়ুরোপীয় নীতিও একটা নূতন পথ খুঁজিতে সুরু করিয়াছে। এই পথ অনুসরণ করিয়া বৃটেন কতটা সাফল্য লাভ করিবে তাহা এখনও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাইবার জন্য যে বহুমুখী প্রচেষ্টা চলিতেছে এইখানে তাহার একটা ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া গেল।

বৃটেনের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জাগতিক শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যুদ্ধ-পূর্ব্বের অবস্থায় রাখিলে চলিবে না। দ্বিতীয় মহাসমরে বহির্জগতের উপর বৃটেনের নির্ভরশীলতা এমনভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যকে নিয়া যতই আস্ফালন করা হউক না কেন, ইহার আয়তন, লোকসংখ্যা ও কাঁচা মালের সম্ভারের তুলনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির কোন আনুপাতিক সম্বন্ধ নাই। Commonwealth ও Empire এর মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, মুখে স্বীকার না করিলেও বৃটেনের শাসকবৃন্দের নিকট এই দুইয়ের শক্তির তারতম্য বেশ জানা আছে। স্বাধীনতা ও পরাধীনতার তফাৎও যে এই প্রভেদের মূলে তাহাও ইঁহারা সম্যক উপলব্ধি করেন। এইজন্য আজ সমস্যা হইয়াছে এই দুইয়ের প্রভেদ ঘুচাইয়া কিভাবে শক্তির উৎস বাড়ান যাইতে পারে।

কিন্তু বিপদ হইল এই যে, বৃটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা Empire এর যে দাসত্ব-বন্ধন বহুশতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেবল মৌখিক আশ্বাস বা আবয়িক (structural) পরিবর্ত্তন দ্বারা সাধিত হইবে না। এতকালের অসম সম্বন্ধের নাগপাশে সাম্রাজ্যকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়াছে যে, এই সম্বন্ধ বদলাইবার সময় আসা সত্ত্বেও ইহাকে নূতন আকার দেওয়া সহজ হইতেছে না। নানা অজুহাতে পূর্ব্বের ক্ষমতাকে ছদ্মনামে রক্ষা করিবার বিপুল প্রয়াস চলিতেছে।

ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও অন্যত্র আজ যে-রাজনৈতিক বোঝাপড়ার চেষ্টা চলিতেছে তাহা মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের সহিত সাম্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, কি ভাবে কত কম ক্ষমতা দিয়া ইহাদের নিকট হইতে কত বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় এই হইল বৃটেনের বর্ত্তমান প্রয়াস। ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার ভিতর দিয়া যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসিবেনা তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের স্বার্থের মৌলিক ঐক্যের উপর জোর না দিয়া, বিভিন্ন পরস্পর

বিরোধী স্বার্থ ও স্বার্থান্বেষীদিগকে এমন ভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা চলিতেছে যে, বৃটেনের এই অভিসন্ধি সফল হইলে ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য পঙ্গু হইয়া থাকিবে। প্রশ্ন ওঠে, বৃটেন যদি নিজের ক্ষমতা তিলমাত্র ছাড়িতে নারাজ তবে এশিয়ার উপনিবেশগুলির সহিত বোঝাপড়া করার এই প্রহসন করা হইতেছে কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দুইভাগে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া বৃটেন এই দেশগুলির উপর এমন একটা ব্যবস্থা চাপাইতে চায় যে, ইহাতে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অন্যদিকে ইহাও সম্ভব যে, বৃটেন জানে যে, ইহাদের স্বাধীনতা-প্রয়াস চিরকাল ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না, সুতরাং বর্ত্তমান রাজনৈতিক সম্বন্ধ যতদিন জিয়াইয়া রাখা যায়, তাহাতেই লাভ।

ইজিপ্ট ও অন্যান্য আরব দেশগুলির সহিত বৃটেন যে-নূতন সম্বন্ধ খুঁজিতেছে তাহারও মূলে একই ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ না রাখিতে পারিলে সাম্রাজ্য রক্ষা জটিল হইয়া উঠে। সুতরাং আরবদের সহিত একাধারে বন্ধুত্ব ও অন্যদিকে ইহাদের উপর কি করিয়া প্রাধান্য রাখা সম্ভব হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-ইজিপ্ট সন্ধির পরিবর্ত্তন নিয়া বর্ত্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে বৃটেনের এই অভিসন্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে গত মহাযুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগরের সামরিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে কমিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইজিপ্ট ও সুয়েজখালের প্রাধান্যও কমিয়াছে। বৈমানিক সমরনীতি গত কয়েক বছরের মধ্যে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আণবিক বোমা উদ্ভাবন হওয়ার পর হইতে ইহার পরিসর এমন বাড়িয়াছে যে, ভবিষ্যতে সুয়েজের নিরাপত্তা রক্ষা অসম্ভব হইবে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অতএব ইজিপ্ট ছাড়িয়া আসা বা সুয়েজ হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করা অন্য কারণে যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, আজ ইহা না করার অন্ততঃ কোন সামরিক অজুহাত নাই। সিরেনেইকা (Cyrenaica) বা প্যালেষ্টাইনে সৈন্য মোতায়েন করিয়া এখনও ব্রিটিশদের পক্ষে মধ্য-প্রাচ্যের উপর সর্দ্দারি করা চলিবে। সঙ্গে সঙ্গে জগতের সামনে নিজেদের আরবদের মিত্র হিসাবেও জাহির করা চলিবে। সম্প্রতি প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণদের যে এক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহার মর্ম্ম হইল এই যে, প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থা চিরস্থায়ী হইল। আরবী-ইহুদী বিরোধের নজীর দেখাইয়া সেখানে বৃটেন ও আমেরিকা তাহাদের সামরিক ও আর্থিক প্রভাব চিরন্তন করিতে মনস্থ করিয়াছে। অপরদিকে প্যারিসের গত পররাষ্ট্র সচিবদের কনফারেন্সে মিঃ বেভিন ভূতপূর্ব্ব ইতালীয় উপনিবেশ সিরেনেইকা ও ত্রিপলিটেনিয়াকে স্বাধীনতা দানের যে-প্রস্তাব আনিয়াছিলেন তাহার কারণ বুঝাও শক্ত নয়। এই অজুহাতে

বৃটেন সেখানে কায়েম হইতে চায়। সম্প্রতি মধ্য-প্রাচ্যের যৌথ নিরাপত্তার যে-প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহারও আসল অভিপ্রায় ঐরূপ।

গত মাসে লণ্ডনে ডোমিনিয়ান প্রধান মন্ত্রীদের এক সভা হইয়া গেল। সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়া অনেক আলোচনার ফলে এক সামরিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। ইহার মূল কথা হইতেছে এই যে, ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে বৃটেনের পূর্ব্বের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। অর্থাৎ এখন হইতে সাম্রাজ্যরক্ষার ভার উত্তরোত্তর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে সরিয়া পরিধির উপর পড়িবে। ভবিষ্যতে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইহার তিনটি স্বাধীন সামরিক ঘাঁটি বা arsenal হইবে। আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে সামরিক কেন্দ্র হিসাবে বৃটেন আর মোটেই নিরাপদ নয়। বর্ত্তমান পরিকল্পনায় এই তথ্যটি সব সময়ে চোখের সামনে রাখা হইয়াছে। গত যুদ্ধে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা শিল্পে এত দ্রুত উন্নতি করিয়াছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নেতাদের মতে ইহারা সম্মিলিতভাবে সাম্রাজ্য রক্ষার ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নিতে সমর্থ হইবে। এই পরিকল্পনায় মধ্য-প্রাচ্যের কোন স্থান নাই; ভারতবর্ষকেও ইহার বাহিরে রাখা হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, সিংহল ও সিঙ্গাপুর এখন হইতে এই ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের স্থান অধিকার করিবে। ইহাদের সহিত অষ্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের সামরিক ব্যবস্থা জুড়িয়া দেওয়া হইবে। আর অন্যদিকে বৃটেন আত্মরক্ষার্থ নিজেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মারফতে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করিবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমেরিকা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ঐকত্রিকভাবে পরিকল্পিত হওয়াতে, নিজেদের নিরাপত্তা বর্দ্ধন করা ছাড়া ইহাদের বিশ্বের উপর আধিপত্য করারও সুযোগ বাড়িবে। কিন্তু বৃটেনের তুলনায় আমেরিকা ও ডোমিনিয়ানদের ক্ষমতা এবার অনেকাংশে বাড়িল। অর্থাৎ এই সামরিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation) ফল হইবে এই যে, ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যে বৃটেন উত্তরোত্তর গৌণ স্থান অধিকার করিবে।

য়ুরোপ ভূখণ্ডে একটা পাশ্চাত্য দল বা ব্লক গঠন করিয়া নিজের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টায় বৃটেন নানা কারণে এখনও সফল হয় নাই। ব্রিটিশ নেতারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এইরূপ দল কেবল সামরিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনের উপর দাঁড় করাইলে চলিবেনা। Ideological বা দৃষ্টিভঙ্গীর যে-বিভাগ পাশ্চাত্য সমাজে বর্ত্তমান আছে, তাহার উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তবে Western Bloc বৃটেনের প্রকৃত কাজে লাগিবে। সেইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি, অধ্যাপক জি, ডি, এইচ, কোল প্রভৃতি ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যাহাতে ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, ইতালী ও অন্যত্র বামপন্থীদের ঐক্য

চিরস্থায়ী না হয়। ইহাদের এখনও আশা আছে যে, ব্রিটিশ লেবারপার্টি য়ুরোপীয় সহকর্ম্মীদের লইয়া পশ্চিম য়ুরোপে একটি প্রবল Social Democratic পার্টি গঠন করিতে সমর্থ হইবে এবং ইহার সাহায্যে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট করিয়া বৃটেনের প্রভাব চলিবে। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই মতামত কেবল লেবারপার্টিতেই আবদ্ধ নহে। জার্ম্মেণী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লণ্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক Economist লিখিয়াছে: "No amount of backing of Dr. Schumacher, the leading socialist in the Western Zone, in his fight against fusion with the communists, will be effective so long as the communists compare the 'social backwardness' of the British Zone with socialisation and land reform in the eastern zone. Against the background of a socialist policy, the British authorities hope, in time, to build up a German administration that was both usable by the occupying power and acceptable to the inhabitants. ...Nor is it necessary to wait until the Social Democrats prove themselves to be a majority—but that does not mean that the present position has to be accepted as permanent or inevitable. The task is to turn the Social Democrats into a majority with the right policy and the half of the occupying power, a solid democratic could be rallied to them." (যতদিন কম্যুনিষ্টরা পূর্ব্ব অর্থাৎ সোভিয়েট অঞ্চলের সমাজীকরণ ও ভূমি ব্যবস্থার উন্নতির সহিত ব্রিটিশ অঞ্চলের "সামাজিক পশ্চাদ-পদতার" তুলনা করিতে পারিবে, ততদিন সব রকম সাহায্য সত্ত্বেও পশ্চিম অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সোসেলিষ্ট নেতা ডাঃ শুমাখের সোসেলিষ্ট-কম্যুনিষ্ট মিলনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে অসমর্থ হইবেন। কিন্তু সোসেলিস্ট নীতি অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কালে একটা জর্ম্মণ শাসনব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইতে পারেন যাহা যুগপৎ দখলকারী শক্তির কাজে লাগিবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদেরও মনঃপূত হইবে।...এই ব্যাপারে সোসেল ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যায় গরিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা সত্য যে, নাৎসী ও কম্যুনিষ্টরা একত্রে এখন সংখ্যায় বেশী, কিন্তু এই অবস্থাকে চিরস্থায়ী বা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিয়া লইবার কোন কারণ নাই। এখন কর্ত্তব্য হইতেছে সোসেল ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যায় গরিষ্ঠ পরিণত করা। সঠিক নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া ও দখলকারী শক্তির সাহায্যে সোসেল ডেমোক্র্যাটদের সাংখ্যিক গরিষ্ঠতা বহুলভাবে বাড়ানো চলিবে এবং কাজে লাগানো যাইবে।)

কিন্তু এই নীতির সাফল্য সম্বন্ধে বৃটেনের সবাই একমত নন। গতযুদ্ধের ফলে য়ুরোপীয় সমাজ এমনভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, যে-দলকে নিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে সোসেলিষ্ট পার্টি গঠন করা হইত তাহার ভিত্তি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয় শ্রেণীসংঘর্ষের বর্ত্তমান রূপ এমন যে, কেবল সোভিয়েট বিরোধী মতবাদ লইয়া বেশী দূর অগ্রসর হওয়া চলিবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান ভরসা আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। মিঃ চার্চ্চিল ইহার উপর ভরসা করিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন ; বৃটেনের শ্রমিক নেতারাও তাহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া আছেন। ভরসা না করিয়াও উপায় নাই, কারণ ব্রিটিশ-ডোমিনিয়ানগুলি সবাই মার্কিণপন্থী। ইহারা সবাই জানে যে পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বৃটেন একা সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করিতে অপারগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার যে-নূতন সামরিক পরিকল্পনা আলোচিত হইয়াছে তাহারও উৎপত্তি এই মানসিক আবহাওয়ায়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃটেনের সাম্রাজ্য আমেরিকা ও ডোমিনিয়ানদের সাহায্যে রক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষিত হইবে কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

দেখা গেল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্কট আজ এক নূতন পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে। ইহাকে অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টার বিরাম নাই এবং সাময়িকভাবে ইহা সফলও হইতে পারে। তথাপি ইহার কোন স্থায়ী সমাধান আছে বলিলে ভুল হইবে। যে-সমস্ত ভিত্তির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একে একে বিনষ্ট হইয়াছে। য়ুরোপ আজ একপ্রকার বৃটেনের আওতার বাহিরে। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতায় বৃটেন বর্ত্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সমকক্ষ নহে। যে-সমস্ত ঘাঁটি আগলাইয়া বৃটেন এযাবৎ তাহার সাম্রাজ্যের উপর সর্দ্দারি করিয়াছে সেগুলি আজ আগের মত কাজে লাগিতেছে না। পরিশেষে এশিয়ার স্বাধীনতার স্পৃহাকেও সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তন দ্বারাও আর বেশীদিন ঠেকাইয়া রাখা চলিবে বলিয়া মনে হয় না এখন হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্কটকে রোগের বাহ্যিক চিহ্নমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

মন্বন্তরোত্তর বাংলা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

যুদ্ধ থেমে গেছে, ফ্যানের জন্য সেই আকুল চীৎকার আর শোনা যায়না, কংগ্রেস নেতাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি হল, বাংলায় এসে গান্ধীজি দুঃখে অবিচলিত থাক্‌বার কথা বলে গেলেন, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল সমগ্র দেশ, তারপর আমরা আর কি করব জানিনে! আগেকার মতো হাতপা নাড়তে পরছিনে, কেবল এই বোধটুকুই কাঁটার মতো মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দিচ্ছে মন, হয়ত তাই ভেবে চলেছি যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় যাওয়া যায় কিনা। মনে হচ্ছে যুদ্ধপূর্ব্ব দিনে যেন সুখেস্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের যথেষ্ট সুবিধে ছিল! এই মনে হওয়ার মূলে যে শোচনীয় আত্মবোধ কাজ করে চলেছে যুদ্ধ বা মন্বন্তরের মতো প্রবল অর্থনৈতিক ঘূর্ণ্যাবর্ত্তও তার আসন টলাতে পারেনি। একটা ভয়াবহ অর্থনৈতিক স্রোতের মুখে আমরা ভেসে চলেছি অথচ নিজেদের গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। সেই পতন-শীল গতির ধাক্কায়ই যে আজ জীবনকে পঙ্গু, অবরুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে, ভাবতে অবাক লাগে, সে-সম্বন্ধেও আমরা অচেতন। পঞ্চাশের মন্বন্তরকে স্মরণ করে আমরা ব্যথিত হব, আত্মনিয়ন্ত্রিত পল্লীর স্বপ্ন দেখে সে-ব্যথা দূর করব তারপর দ্বিতীয় মন্বন্তরের আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আতঙ্ক ছড়াব, নয় চড়া দামে চাল কিনে ভাঁড়ার পূর্ণ করব। আমাদের কর্ত্তব্যের তালিকায় আর কিছু নেই, আর কিছু আছে বলেও ভাবতে পারিনে! পঞ্চাশের মন্বন্তর আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে—সেখানে শান্তির ললিতবাণীর কোন মানে আছে কি না, অবকাশ আছে কি না ঘেরাটোপ দিয়ে মন্বন্তরোত্তীর্ণদের বাঁচাবার—সাতশ' ত্রিশ দিনের একটিমুহূর্ত্তও সে ভাবনায় আমরা অপচয় করিনি। দুর্ভাগা দেশ হয়ত একেই বলে, আত্মবোধ স্ফীত হতে হতে যেখানে আত্মঘাতের রূপ নেয়। দেশের বাস্তব অবস্থা উন্নয়নের সচেষ্টতা যেখানে অনুপস্থিত, মন আর মনসিকতা নিয়েই যেখানে সবচেয়ে বেশি আস্ফালন, সেখানে প্রতি বছর মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক না মরে যে দুবছর অন্তর মরবে, সেইত আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা!

মন্বন্তর-ভীতিতে যারা সন্ত্রস্ত তাদের ক্ষমা করা গেলেও মানসিকদ্বন্দ্ববিলাসী সেসব পণ্ডিতম্মন্য লোককে কিছুতেই ক্ষমা করা যায়না যারা মন্বন্তর হবে কি না-হবে নিয়ে তর্কে মেতে আছেন। বাংলার গত দুর্ভিক্ষের জন্যে বন্যা, অনাবৃষ্টি বা পঙ্গপালের মতো প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দায়ী নয়—ঠিক তেম্নি যুদ্ধের ঘাড়ে সমস্তটুকু দায় ফেলে দিয়ে আমরা সারসত্য আবিষ্কার করেছি বলে ভূমানন্দ উপভোগ করতে পারিনে। যুদ্ধ মন্বন্তরের ঝাপসা ছবিটাকে

তীক্ষ্ণ, তীব্র রেখায় পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে মাত্র, তাই বলে যুদ্ধকে মন্বন্তরের উৎস মনে করে ভুল করা চলে না। বাংলার মন্বন্তরের চোরাস্রোতকে মাটী খুঁড়ে উপরে তুলে এনেছে যুদ্ধের শাণিত নখর—চোরা হলেও স্রোত একটা ছিলই, আমাদের চোখের আড়ালের জীবন মৃত্যুবিষে বিষাক্ত হয়েছে সে স্রোতে, নেপথ্যের সেই দৃশ্যকে যুদ্ধ চোখের সামনে টেনে এনেছে স্পষ্টতর এবং বৃহত্তর করে। সেই দৃশ্য অভিনীত হতে থাক্‌বে এখন বছরের পর বছর যদিনা বাংলাদেশ নূতন দৃষ্টি দিয়ে তার অর্থনীতির দিকে তাকায়।

পঞ্চাশ লক্ষ পল্লীবাসীর মৃত্যুর সাক্ষ্যেই আমরা মন্বন্তরকে চিনতে পেরেছি কিন্তু বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনি, তাই যে তার সবটুকু পরিচয় নয়। মন্বন্তরের হাত থেকে সাময়িক দান হিসেবেই এ মৃত্যুকে পেয়েছি আমরা, তাছাড়াও তার দান আছে এবং সে-দান অনেক গভীর, চিরস্থায়ী। সেই দানপত্র হাতে নিয়ে তার পাঠোদ্ধার করলে দেখা যাবে যে মন্বন্তর (১) নিঃস্বতা (২) অর্থনৈতিক অবনতি (৩) জমিবণ্টনব্যবস্থায় গুরুতর অসাম্য এবং (৪) হালবলদের ক্ষতি নামক চারটি মৃত্যুবীজের জন্যে বাংলার ফসলের ক্ষেত চষে দিয়ে গেছে। যুদ্ধ যেমন যুদ্ধকে জন্ম দেয়, মন্বন্তরও তেমনি মন্বন্তরের জননী হয়ে ওঠে। তার কারণ আজকের দিনের যুদ্ধ আর মন্বন্তর—দুটোই অর্থদুর্নীতির সন্তান।

কৃষিনির্ভর বাংলার অর্থনীতিতে বহুদিন হল এই চারটি মৃত্যুবীজ প্রবেশ-পথ করে নিয়েছে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সংখ্যা-নিরূপক হিসেব থেকেই এ-তথ্য আবিষ্কার করা যায়। বাংলার পল্লীতে ধান হয় আর ম্যালেরিয়া হয় জেনেই বহুকাল সুখেদুঃখে আমরা সহরের সুবিধাজনক আবেষ্টনীতে বাস করে এসেছি—পল্লীগ্রামে যে আরো কি-কি হয় তার খোঁজ রাখবার দরকার বোধ করিনি। সেখানে ভূমিবান সচ্ছল চাষী হয় বর্গাদার চাষী হয়, নয়তো একআধ বিঘার মালিক হয়ে কৃষিমজুরি করে, তারপর নির্জ্জলা ভূমিহীন কৃষিমজুর হয়ে শেষটায় কর্ম্মহীন নিঃস্ব হয়ে দাঁড়ায়! সেখানে জমির মালিকানা স্তূপীকৃত হয় মুষ্টিমেয়ের হাতে—যারা টাকা-আনা-পাইকেই একমাত্র জানবার বস্তু বলে জানে কিন্তু তা জমির বা ফসলের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে নয়। চাষের প্রধান উপকরণ হালবলদ সেখানে মরেহেজে, খাদ্য হয়ে একটা শঙ্কাজনক সংখ্যার দিকে এগিয়ে আসে! কিন্তু তাতে কোথায় আমাদের উদ্বেগ, কোথায় আতঙ্ক, কোথায় প্রতিকারের ব্যবস্থা? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কোনদিন আমরা তাকিয়েছি কি এদিকে—মনে করেছি কখনো কি একে জরুরী সমস্যা বলে'? দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় এই নৈরাজ্য নিয়ে যারা শান্তিতে বসবাস করতে চেয়েছি—মন্বন্তরের সিংহাসন রচনা করে যারা মন্বন্তরের অবির্ভাবে হাহাকার করে উঠ্‌ছি, মানুষের শ্রেণীতে তাদের পর্য্যায় হয়ত আজও নির্ণিত হয়নি। আমাদের অমানুষ বলে কেউ আখ্যা দিলে হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌ব—চাষীকে জমি বণ্টন করে দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রিত পল্লীর কথা

কি আমরা বলছিনে ?—বল্‌ছি সত্যকথা, কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থার বিষচক্র মুছে দিয়ে প্রাক্-বৃটিশ বাংলার সমৃদ্ধির স্বপ্ন কোন্ বাস্তব পদ্ধতিতে যে কার্য্যে পরিণত করা যায় সে-ঘোষণা আমাদের কথায় পাওয়া যাবেনা। পল্লীর উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিচিত্র মালিকানা রাজত্ব করে চলেছে; তার অবসান ঘটিয়ে একাকার করে দেবার শ্লোগান মুখে নিয়ে চলাফেরা করা খুবই সহজ কিন্তু অবসানের পরিকল্পনা করা কারো পক্ষে আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি।

মন্বন্তরোত্তর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকা ঘোষ পল্লী-অর্থনীতির বিভিন্ন উপকরণের যে সংখ্যানির্ণয় করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বাংলার বাস্তব অবস্থার খানিকটা নির্ভুল ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। গড় হিসেবের উপর নির্ভর করে এ-হিসেব তৈরী—অর্থাভাবে আর সময়াভাবে বাস্তব পর্য্যবেক্ষণের পরিধিও বিস্তৃত হতে পারেনি তাছাড়া দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল সম্বন্ধে রাজস্ব ও শিল্পবিভাগের মতানৈক্যও হয়ত নির্ভুল হিসেবের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে—কাজেই সংখ্যার এই তালিকা থেকে আমরা বাংলার যে-ছবি পাই, নিখুঁত বাস্তব ছবি হয়ত তারচেয়েও শোচনীয়।

এই গণনায় নিঃস্বের যে তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে মোটামুটি এ-তথ্যগুলো আবিষ্কার করে নিতে পারি: (১) তেরশ' পঞ্চাশের আগে থেকেই নিঃস্বের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল; (২) মন্বন্তর ৩ লক্ষ ৩০ হাজার নিঃস্ব তৈরী করেছে, যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের মিলিত শক্তি নিঃস্ব তৈরী করেছে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার এবং একপঞ্চাশের বাংলা অন্ধভবিষ্যতের দিকে যাত্রা সুরু করেছে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার নিঃস্ব সন্তানের হাত ধরে; (৩) পুরুষের চেয়ে মেয়ে-নিঃস্বের সংখ্যাই বেশি এবং তাদের বয়স পনেরো থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ভূমিহীন কৃষি-মজুরের শ্রেণীই নিঃস্বের দল ভারি করে তুলেছে। গণনা থেকে অর্থনৈতিক অবনতির যে ছবি পাওয়া যায় তার মোটা দাগগুলো এ-রকম: (১) প্রায় ৩৮ লক্ষ পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক অবনতি ঘটেছে—পরিবার হিসেবে ৭ লক্ষ পরিবারের; (২) ভূমিবান চাষীদের মধ্যেই অবনতির সংখ্যা বেশি কিন্তু অল্পপরিমাণ জমির মালিক যে-চাষীরা অবসর মতো কৃষিমজুরি করত তাদের অবস্থার অবনতিই সাংঘাতিক। অর্থনৈতিক অবনতির ফলে বাংলার ভূমিব্যবস্থার অসাম্য গুরুতর হয়ে উঠেছে: চারভাগের তিনভাগ পল্লীবাসী ঊর্দ্ধতম অবস্থায় ৬ বিঘা জমির মালিক এবং নিম্নতম অবস্থায় ভূমিহীন, তার মানে তারা আহার ও উপবাসের মাঝামাঝি ক্ষুরধার পথে বিচরণ করছে—তাই তেরশ' পঞ্চাশে দেখা যায়, ৯ লক্ষ ২০ হাজার পরিবার জমি-বিক্রী করে ফেলছে, এবং গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র সম্বল সবটুকু জমি বিক্রী করছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবার। জমিবিক্রীতেই মন্বন্তরের

চিত্র সম্পূর্ণ নয়—শেষ ব্যাপার হলেও বিশেষ ব্যাপার হল হালবলদ বিক্রী। মন্বন্তর-পূর্ব্ব বাংলায় হালবলদের সংখ্যা যা ছিল তা দিয়ে বাংলার ৬০০ লক্ষ বিঘা আমনের ক্ষেত কষ্টেসৃষ্টে চাষ হতে পারত—যুদ্ধ ও মন্বন্তরের ছোঁওয়া ১১-১২ লক্ষ হালবলদের ক্ষতি করে দিয়ে গেছে, তার মানে ৭৫ লক্ষ বিঘা আমনের ক্ষেত হালবলদের অভাবে হয়ত চাষ হ'তে পারবে না।

এ-গণনার সংখ্যাগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে পাওয়া যাবে যে কৃষিমজুর শ্রেণীই মন্বন্তরে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সেই শ্রেণী যারা অল্পপরিমাণ জমির মালিক বলে কৃষিমজুরি করতে বাধ্য। বাংলার মন্বন্তর সমগ্র পল্লীঅঞ্চলকে সমান তীক্ষ্ণতায় আঘাত করেনি—আঘাতের তীব্রতার তারতম্য বিচার করে তার যে কারণ আবিষ্কার করা যায় তা এই গণনার ফলাফল সম্পূর্ণ সমর্থন করে। দেখা গেছে যেসব পল্লীঅঞ্চলে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের বাস সর্ব্বাধিক, সেখানেই মন্বন্তরের আঘাত তীক্ষ্ণতম হয়েছে। মন্বন্তরের মুক্ত তরবারি ওসব অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করে দিলেও একটি তথ্য গোপন রাখা যায়না যে মন্বন্তর-পূর্ব্ব দিনেও ওসব অঞ্চলে মন্বন্তরের গুপ্ত ছুরীকাঘাত নির্ব্বিবাদে চলে এসেছে। ১৯৩৯-৪৩-এর চিত্রের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে এই দুই শ্রেণীতে আর্থিক অধঃপতন ও নিঃস্বীকরণের মরসুম এসে গিয়েছিল। তখনও কৃষিমজুর শ্রেণীতে ৬০ হাজার পরিবারের আর্থিক অবনতি ঘটেছে—আর নিঃস্ব হয়েছে ৩০ হাজার পরিবার; চাষী ও কৃষিমজুর যারা তাদের ১ লক্ষ ১০ হাজার পরিবার অবনত অবস্থায় চলে গেছে এবং তাদেরও ১০ হাজার পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। কাজেই একথা দুয়ে দুয়ে চারের মতোই সরল, যে-দুরবস্থার স্রোতে বাংলার পল্লী ভেসে চলেছিল—মন্বন্তর তাকেই একটা গভীর খাতে নামিয়ে এনেছে।

মন্বন্তরোত্তর গভীর খাতের স্বরূপ এই গণনার অঙ্ক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। যে অর্থনৈতিক যন্ত্র চাষীশ্রেণী থেকে ভূমিহীন কৃষিমজুর ও নিঃস্ব তৈরী করে চলছিল মন্বন্তরের বিদ্যুৎশক্তি তার গতিবেগ প্রখর করে দিয়েছে। এই গতিবেগ মন্দীভূত করবার কোনো ব্যবস্থাই বাংলার অর্থনীতি আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেনি। 'উৎপন্ন দ্রব্য' নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তা থাকলেও 'উৎপাদন ব্যবস্থা' সম্বন্ধে আমরা অতিশয় নীরব! আমাদের কৃষি-অর্থনীতির যন্ত্র তেরশ' পঞ্চাশের পরও নির্বিরোধে কৃষিমজুর ও নিঃস্ব তৈরী করে চলেছে—আজ ১৩৫৩-এ কোনো সংখ্যাতাত্ত্বিকের পর্য্যবেক্ষণ সুরু হলে নিশ্চয়ই আমরা একটা ভয়াবহ অঙ্ক দেখতে পাব। তাছাড়া ১০ লক্ষ হালবলদের কোনোপ্রকার ক্ষতিপূরণ আজ অবধি হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমরা ভেবে দেখিনি কৃষির কাজ করত যে-শ্রেণীর মানুষ সে-শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ লোক নিঃস্বীভূত হয়ে বেরিয়ে আসছে—এসে দয়ার দানে বেঁচে চলেছে নতুবা মরছে। এ যে কেবল শ্রমশক্তিরই বিরাট অপচয় তা নয়, এতে করে মন্বন্তর-বিধ্বস্ত অঞ্চলে কৃষি-মজুরের

পরিমাণ উদ্বৃত্তের মাত্রা থেকে নেমে অভাবের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ তাই সন্দেহ হয়, হিসেবে ধরা ৬০০ লক্ষ বিঘে আমনের ক্ষেত ১৩৫৩ সালে সম্পূর্ণ চাষ হবে কিনা! বাংলার অর্থনীতির শরীর থেকে আমরা মন্বন্তরের বিষ দূর করবার চেষ্টা করিনি কাজেই তিনবছর পর যদি পূর্ণপ্রভায় তার আবির্ভাব ঘটে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমরা মন্বন্তরোত্তর অবস্থায় এসেছিলাম, মন্বন্তরোত্তীর্ণ অবস্থায় আসিনি।

মনে হয় চাষীজীবনের নিরুৎসুক ঔদাসীন্য—সুখেদুঃখে কোনোরকমে বেঁচে যাওয়ার প্রবণতা সমগ্র বাংলাদেশেরই মজ্জাগত ধর্ম্ম। শূন্য ভাঁড়ার হাতড়ে যখন কিছুই আমরা পাইনে একমাত্র তখন মন্বন্তরের মুখোমুখি হয়েছি ভেবে খাদ্য-শস্যের জন্যে পরের কাছে হাত বাড়াই। ওই ভিক্ষাবৃত্তি যে চিরকালের ব্যবস্থা হ'তে পারেনা, নিজেদের চেষ্টায়ই যে সুপরিমিত খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্যবণ্টন আমাদের করতে হবে—পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ দৃশ্যের পরও সে-চেতনা আমাদের হলনা! উৎপাদন ও বণ্টনের বিকল ব্যবস্থার দিকে সামান্য মনোযোগ দেবার সময়ও আমাদের নেই! সবই কি স্বাধীনতার জন্যে তোলা রইল? স্বাধীনতা কি এমন আকাশ নিয়ে আবির্ভূত হবে পুরাকাহিনীর পুষ্পবৃষ্টির মতো যেখান থেকে নিয়মিতভাবে ধান্যবৃষ্টি হয়? আমাদের দিয়েই গড়ে উঠবে স্বাধীনরাষ্ট্রের স্বাধীন সমাজ—বাংলার এই শোচনীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আনতে হলে আমাদেরই কর্ম্মশক্তিতে তা আনতে হবে! সেই কর্ম্মশক্তির সামান্য আভাসও তবে আজ আমাদের মধ্যে কেন দেখা যাচ্ছে না? স্বাধীনতার আবহাওয়ায় যে আমরা নিশ্চেষ্ট, নিঃসাড় থাকবনা তার কি প্রমাণ দিতে পেরেছি? স্বাধীনতাও একটা অর্থ নৈতিক অবস্থা, অঘটন-ঘটনক্ষম দেবতার আশীর্ব্বাদ নয়।

তেরশ' পঞ্চাশ থেকে আজ পর্য্যন্ত—এ দুবছর সময়ের মধ্যে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম। আত্মপ্রীতির পাঁক থেকে গা ঝেড়ে উঠতে পারলে কিম্বা আত্মনিয়ন্ত্রিত পল্লীর সুদূর স্বপ্নে দুঃসহ বর্ত্তমানের গাঁয়ে মিথ্যা রঙ লাগাতে চেষ্টা না করলে ধরাছোঁওয়া যায় মতো খানিকটা কাজ হয়ত করা যেত। বাংলার ধানক্ষেতের এক বিঘাও যেন কোনো কারণে অনাবাদি পড়ে না থাকে—এই লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের মন্বন্তরোত্তর অর্থনীতি কাজ সুরু করে দিতে পারত। যখন তা হয়নি এবং যতদিন তা হবেনা—তখন প্রতি মুহূর্ত্তেই তা সুরু করবার অবকাশ থাকবে। অভাবের তালিকা আমাদের হাতের কাছেই আছে; যা নেই, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হলেই তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। আসল কথা—স্বপ্ন নয়, কল্পনা বিলাস নয়, আকাশচুম্বী আদর্শ নয়—আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্যে একটি করণীয় নীতি গ্রহণ। আমাদের মধ্যে যাঁরা কর্ম্মক্ষম, অসাধারণ কাজ করবার মোহই শুধু তাঁদের আছে—ফলে অসাধারণ কাজও বাস্তব রূপ গ্রহণ করেনা, সাধারণ কাজও

উপেক্ষিত হয়। হাত বাড়িয়ে তাঁরা বহু দূরের অর্থনীতির শরীর স্পর্শ করতে পারেন, বহু দূরের পলিটিক্সকে ঘরোয়া পলিটিক্স করে তুলতে পারেন এবং দলীয় নেতৃত্বের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রমও করতে পারেন, পারেন না শুধু বাংলাদেশের অতি স্থূল, অতি প্রত্যক্ষ সমস্যাটি হাতে নিয়ে সমাধানের পথে একটি পা এগিয়ে যেতে। ফ্যাসিষ্ট-বিতারণী সভা ডেকে যেমন ফ্যাসিষ্টদের হটান যায়নি—তেমনি দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সভা ডেকে দুর্ভিক্ষের পথ রোধ করা যাবেনা। আমরা সভা করি, চাঁদা তুলি, পোষ্টার লাগাই, ভিক্ষা করি—করিনে শুধু যা করবার।

আমাদের পল্লীর উৎপাদন ব্যবস্থা কেন এই বিরাট অঙ্কের নিঃস্ব তৈরী করে তুলছে—সামান্য অনুসন্ধানেই তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে দিব্যজ্ঞানের দরকার হয়না। কিন্তু এ-প্রশ্নটি মনে গ্রহণ করতে আমাদের মন কিছুতেই রাজী নয়। অব্যবস্থিত উৎপাদন ও অনিয়ন্ত্রিত বন্টনই বছরের পর বছর ভূমিবান চাষীকে আধা-কৃষিমজুর, আধা-কৃষিমজুরকে পুরো-কৃষিমজুর এবং পুরো কৃষিমজুরকে কর্ম্মহীন নিঃস্বে পরিণত করে দিচ্ছে—তাছাড়া ভূমিবান চাষী আর আধাকৃষিমজুর মধ্যেকার স্তর পার না হয়েও নিঃস্বের লাইনেও এসে দাঁড়াচ্ছে। ভূমির ক্ষয়িষ্ণু উর্ব্বরতা ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উপর যদি উৎপাদন ও বন্টনের নৈরাজ্য চলতে থাকে, যদি বেকার কৃষিমজুরের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা না রেখে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনফার পথ অবারিত, নিষ্কটক করে দেওয়া হয় তাহলে কাগজপত্রের গড় হিসেবে দেশের অবস্থা সচ্ছল দেখালেও দেশের অর্থ নৈতিক অধঃপতনের স্রোত রোধ করা যায়না—অনাহার আর অর্দ্ধাহার দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সমাজ-শরীর বিষাক্ত করতে সুরু করে। এই শোচনীয় অবস্থার সার্থক প্রতিকার হয়ত উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন দ্বারাই সম্ভব কিন্তু পল্লীসমাজ আজ সে-পরিবর্ত্তনের জন্যে তৈরী হয়ে উঠতে পারেনি। যে অর্থনীতি ভেঙে ভেঙে অসম মালিকানার এই গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করেছে, পেছন ফিরে তাকে হুবহু ফিরিয়ে আনার মনোভাবই তাই আজ স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কোনো দেশের ভবিষ্যৎ তৈরী হয়না—অতীত আর বর্ত্তমান নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিলোপ করে ভবিষ্যতের দেহ তৈরী করে তোলে। পল্লী-সমাজ বর্ত্তমানকে আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি—অতীতের ভগ্ন, জীর্ণ গৃহেই তার বসবাস চলেছে—অতীতের ভগ্নজীর্ণ অর্থনীতিই গুরুতর অসাম্য সৃষ্টি করে বর্ত্তমান জগতের অর্থনীতির জীর্ণদশার রূপ প্রতিভাত করছে। তার কারণ ব্যক্তিগত মালিকানামূলক সমস্ত অর্থনীতির অন্তিম অবস্থাই এক। বর্ত্তমান অর্থনীতির স্পর্শ না পেয়েও পল্লীসমাজের চেহারায় এই যে বর্ত্তমানের জীর্ণতার ছাপ, তাকে যদি আমরা বর্ত্তমানের দান বলে মনে করি তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। অথচ এ অন্যায় আমরা সচরাচর করে থাকি এবং পল্লীর

উৎপাদনপদ্ধতিতে বর্ত্তমানের স্পর্শকে প্রাণপনে ঠেকাতে চাই। বর্ত্তমান পদ্ধতি পল্লী-অর্থনীতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারবে না সত্য কথা, কিন্তু অতীতের নৈরাশ্যময় জীর্ণ অর্থনীতির খর্পর থেকে পল্লীসমাজকে উদ্ধার করে খানিকটা আলো-বাতাস নিশ্চয়ই আনতে পারবে। পল্লীসমাজ যদি ভবিষ্যৎ-প্রয়াসী হয়—ভবিষ্যৎকে যদি মনোরম করে তুলতে চায়—বর্ত্তমানের এ-স্পর্শটুকু তার দরকার। কেবল অতীত নিয়ে যদি আমাদের পল্লীসমাজ ভবিষ্যৎ তৈরী করতে চায় তবে সে ভবিষ্যৎ আজকের দিনের মতো দুঃসহতায়ই পর্য্যবসিত হবে, বিবর্ত্তনের নূতন কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

বর্ত্তমান যুগের উৎপাদন-পদ্ধতির প্রতি পল্লীসমাজের বিরূপ মনোভাব যতটুকু আছে এবং যতটুকু গড়ে উঠছে তা দূর করবার দায় তাঁদেরই যাঁরা এযুগের উৎপাদন-পদ্ধতিকে কার্য্যকরী নীতি হিসেবে গ্রহণ করবেন। তাঁরা যদি জনসাধারণের কর্ম্মসংস্থান করে নিঃস্ব তৈরীর স্রোত বন্ধ করতে পারেন, উৎপাদন বৃদ্ধি করে অভুক্তের সংখ্যা দিনের পর দিন কমিয়ে আনতে পারেন তাহলেই পল্লীসমাজ বর্ত্তমান উৎপাদন পদ্ধতিকে আত্মীয় ভেবে কোলে আশ্রয় দেবে। এ কাজ যতদিন চলতে থাকবে—ততদিন এ-উৎপাদনপদ্ধতির দিন ফুরোবে না কিন্তু কাজ ফুরোলে তার দিনও ফুরোবে। বর্ত্তমানকে গ্রহণ করতে হবে তার হাত ধরে আগামীকালে যাওয়া যায় বলে—তার হাতে ভবিষ্যতের মশাল আছে বলে'—তার পাঁকে ডুবে থাকবার জন্যে নয়। বর্ত্তমান সম্বন্ধে এই সচেতনতাই বাংলার কূপমণ্ডুক কৃষিনীতিকে সমুদ্রের সন্ধান দিতে পারে।

বাঁশের কেল্লা

মনোজ বসু

বাঃ, খাসা সাজিয়েছ তোমরা নিশিবাবু। বেছে বেছে বাঁশতলায় সভার জায়গা করেছ, ভারি ঠাণ্ডা জায়গা, রোদ লাগবে না মানুষজনের গায়ে। শেয়াকুল আর ন্যাড়াসেজির ঝাড় সাফসাফাই হয়ে গেছে, তেরঙা নিশান উড়িয়েছ দীঘির পাড়ে পোড়া-দালানের সামনে। আমরাও একটা নিশান বেঁধে দিয়েছিলাম ঐ দালানের ছাতে। সেটা অত বড় নয়—আর উড়েছিল বড় জোর পাঁচটা কি ছ-টা দিন।

যা ভাবছ, তা নয়। মাথা খারাপ হয়েছিল সত্যি জেলের মধ্যে, এখন সেরে গেছে। এখন ভালমানুষ আমি। বত্রিশ টাকা ভিজিটের বিলাতি খেতাব-ওয়ালা ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিল, পাগলামি ক'দিন থাকে? এমনি আমি মাঝে মাঝে বাঁশবনের ধারে এসে বসি, দীঘির পাড় পোড়া-দালান আর পোড়ো ভিটেগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। চুপচাপ বসে থাকি নিশিবাবু, আজকেই তোমায় পেয়ে মীটিঙের খবরাখবর নিচ্ছি।

লক্ষ্মণ মাইতি মশায়ের জায়গা বুঝি দীঘির পাড়ে ঐ ঢিবির উপর? না—উঁচুতে আলাদা হয়ে কেউ বসবে না তোমাদের সভায়। সপ পেতে দেওয়া হবে একসঙ্গে সকলের জন্য। কিন্তু সপই বা কেন? বাঁশপাতা ঝরে ঝরে স্তূপাকার হয়ে আছে, ও-ই কতক এনে ছড়িয়ে দাও—গদির মতো হবে, দিব্যি আরাম করে বসা চলবে। কতদিন নিশিবাবু বাঁশপাতার বিছানায় ঘুমিয়েছি আমরা! বেশ লাগত। প্রভাসটা বাইরে থেকে এমন কাটখোট্টা—কদম-ছাঁটা চুল, গেরুয়া পরত না বটে কিন্তু হাঁটুর নিচে কাপড় নামতে দেখিনি, বছর পনের নিরামিষ ধরেছে—তার মধ্যে নুন ছোঁয় না বছর পাঁচেক—প্রভাস-মহারাজ বলে ক্ষেপাতাম আমরা, স্ফূর্তির জোয়ার খেলতে লাগল ঐ সময়টা যেন তারও মনে। এক টুকরো বাঁশের গোঁড়া আতার ছোটা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দোলনার মতো করে নিয়েছিল। যেদিন পেটে ভাত পড়ত না দোল খাওয়ার শখ বেড়ে যেত তার সেইদিন।

ফুল নিয়ে নিয়ে আসছে—ঢিবির উপর ঢালবে? কিন্তু কতক্ষণ থাকবে বলো নিশিবাবু? বাতাস এলে ঝুর-ঝুর করে বাঁশপাতা ঝরে পাতার নিচে তোমাদের ফুলসজ্জা তলিয়ে দেবে। এই তো ক-বছর আগে রক্তের ছোপে রাঙা হয়ে গিয়েছিল পোড়া-দালানের সামনে দীঘির পাড়ের ঐখানটা। বাঁশপাতা সরিয়ে দেখ দিকি—তার কোন

দাগ আছে কিনা? লোকের মনে একটু-আধটু হয়তো আছে, তা-ও মিলিয়ে যাবে আর ক-বছর পরে।

মীটিং সন্ধ্যাবেলা—কত মানুষ আসতে শুরু করেছে এখনই এই সকাল থেকে। একজন দু-জন করে আসছে, আবার এক একটা মিছিল জমিয়ে আসছে। দূর-দূরান্তর থেকে খেয়া পার হয়ে আসছে। অনেকগুলো চাষী মেয়ে-বউ ফুলঝুরি ষ্টেশনে এসে নেমেছে, সেখান থেকে গরুর গাড়িতে চাকার ধূলোয় ধূসর হয়ে আসছে—ঐ দেখ। পোড়া-দালানে অনেকদিন পরে মানুষের সোরগোল। দরজা-জানলা পুড়ে গিয়ে ঘরগুলো হা-হা করছে—তারই একটায় বিজলী ডাক্তার খাবার জল আর তুলো-আইডিন নিয়ে অফিস সাজিয়ে বসেছে। ঐ ঘরেরই একপাশে একটুখানি বিছানা করা আছে, যদি বিশ্রামের দরকার মনে করেন লক্ষ্মণ মাইতি মশায় এসে পৌছবার পর। বুড়ো মানুষ, তার উপর শরীরের ঐ হাল—মানুষগুলো নেহাৎ নাছোড়বান্দা বলেই তাঁকে সভা করে বেড়াতে হয় এগ্রামে-সেগ্রামে। তিনি আসছেন শুনে পাঁচ ক্রোশ সাত ক্রোশ দূর থেকেও ভোরবেলা চাল-চিঁড়ে নিয়ে সব বেরিয়েছে। বক্তৃতা করতে পারেন না মাইতি মশায়—দুটো কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে কালঘাম ছুটে যায়, অ্যাঁ-অ্যাঁ করেন—সেই সময় পাশ থেকে কথা জুগিয়ে দিতে হয়। তবু তাঁর নাম শুনে, তিনি হাতে করে শহীদ-পদক পরিয়ে দেবেন সেই অনুষ্ঠান চোখে দেখবে বলে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ আসছে দেখ। মাইতি মশায়ের সঙ্গে একইদিনে জেল থেকে বেরুই আমি—গ্রামে এসে এদিক-ওদিক তিনি তাকাচ্ছেন, কোন জায়গায় ঘরবাড়ি ছিল চিনতে পারেন না। আর আমার কিন্তু ঠিক উল্টো অবস্থা, কিচ্ছু নেই—তবু সমস্ত জীবন্ত দেখতে পাই চোখের সামনে; সব কেমন চলে ফিরে বেড়ায়। পাগল হয়েছিলাম, আমি নিজে যা একবিন্দু টের পাই নি। সেই তারা সব রাতদিন যেন ঘিরে বসে থাকত আমায়, বড় আরামে ছিলাম। বরং মনে হয়, পাগল বুড়ো মাইতি মশায়ই। হাসতে লাগলে মনে হবে অমন সুখী লোক ভূ-ভারতে নেই। জেল থেকে বেরিয়ে ঘর উনি আর নূতন করে বাঁধলেন না। বললে হাসতে থাকেন, দরকার কি ভাই? কথা মিথ্যা নয়, ঘরের আর ওঁর কি দরকার? নিজে তো আজ এখানে কাল সেখানে এই করে বেড়াচ্ছেন। বউ জলে ডুবে মরেছে। তিন ছেলের মধ্যে প্রভাস ফাঁসিতে গেছে, আর দুটি জেলে—একটির নাকি এখন-তখন অবস্থা। কেন মিছে ঘর বাঁধার হাঙ্গামা করতে যাবেন বলো?

বাঁশবনের ভিতরে কোনদিন ঢুকেছ নিশিবাবু, ঢুকে কতদূর গিয়েছ? ইচ্ছে হলে ফুলঝুরি ষ্টেশনের লেভেল-ক্রসিং অবধি চলে যেতে পার বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায়। মাঝে মাঝে খানিকটা করে ফাঁকা, লম্বা উলুঘাস জন্মে আছে সেখানে—আর অজস্র কাশফুল। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এই দিক দিয়ে ষ্টেশনে, পথ অনেক কম—কিন্তু গ্রামের

মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে বাঁশবনে ঢোকে না, সহজে মাড়াতে চায় না এদিককার পথ।

একটা দিনের কথা বলি, বারো-তোরো বছর বয়স হবে তখন আমার। ঘোর হয়ে গেছে, গরু আসেনি গোয়ালে। দুধাল গরু—ঠাকুরমা উতলা হয়ে ঘর-বার করছেন। তখন বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই· গরু খুঁজে আনবার মতো। আমি বললাম, ব্যস্ত হয়ো না ঠাকুরমা, পাড়ার মধ্যেই আছে কোনখানে। ননীদের খামার-বাড়ি হয়তো ঢুকে পড়েছে তাদের গরু-বাছুরের সঙ্গে, দেখে আসছি—। ঐ যে ফাঁকা জায়গাটা নিশিবাবু, ক'টা ছেলে নুন-দাড়ি খেলা করছে—ঐখানে ছিল ননীদের খামার-বাড়ি। গিয়ে শুনলাম, শুঁটকি আমাদের সত্যিই খামারে ঢুকে পোয়াল-গাদা থেকে পোয়াল টেনে টেনে খাচ্ছিল। ওরা দেখতে পেয়ে বেহদ্দ পিটুনি দিয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁশতলার এদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, মনে হল—ঐতো সাদা মতো…শুঁটকিই। বড্ড রাগ হল, শিঙে একবার দড়ি পরাতে পারলে হয়। ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান হচ্ছি, আর হতভাগা গরু শুয়ে পড়ে দিব্যি জাবর কাটছে ওখানে!

জায়গাটায় এসে দেখি, কিছু নয়—ঝাড়ের ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে, সেইটে গরুর মতো মনে হচ্ছে দূর থেকে। ডাকছি, শুঁটকি-ই-ই! সামনের দিকে কি-একটা নড়ে উঠল—শুঁটকি না হয়ে যায় না…ছায়া দেখে দেখে এমনি অনেকটা এগিয়ে গেছি নিশিবাবু, হঠাৎ জোরে বাতাস এল, ক্যাঁচ কোঁচ কটর-কট আওয়াজ উঠল বাঁশঝাড়ে। সর্বাঙ্গ শির-শির করে উঠল। ছেলেমানুষ পেয়ে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অশরীরী বহুজন, চেপে ধরবে বুঝি বাঁশের আগা দিয়ে। রাস্তার দিকে দৌড় দিই। ঝাড়ে ঝাড়ে যেন ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে, বাঁশ নুয়ে নুয়ে পড়ছে আমার পথ আটকে—এই একবার মাটি ছোঁবার উপক্রম, পরক্ষণে আবার সটান উপরে উঠে যাচ্ছে। চাবুকের মতো সপাৎ করে কঞ্চির বাড়ি লাগল মুখের উপর। বাঁশপাতা ঝরছে, মুঠো মুঠো বাঁশপাতা যেন আমার গায়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাস্তায় পড়েও ছুটছি। বাঁশবনের আওয়াজ কানে আসছে। এক ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের গল্প শুনছিলাম, তারাই শাসাচ্ছে যেন আমায়। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়ে সুস্থির হলাম, লণ্ঠন নিয়ে আমার খোঁজে আসছিলেন। বললেন, শুঁটকি এসে গেছে রে। হুড়কোর ধারে এসে শিং নাড়ছিল, তাকে গোয়ালে তুলে তোকে ডাকতে বেরিয়েছি।

রাতে শুয়ে পরে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পীতাম্বর ঠাকুরকে দেখেছ তুমি—সেই যিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন?

কিন্তু ঠাকুরমা কেন—তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ শশিকান্ত নাকি হামাগুড়ি

দিতেন সেই সময়। অথচ গল্পটা ঠাকুরমা এমন গড়গড় করে বলে যান যেন আগাগোড়া চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন তিনি।

পায়ে পায়ে নিশিবাবু চলো না এগিয়ে, পীতাম্বর ঠাকুরের আসন দেখিয়ে দেব। পাকুড়-তলা—ভারি জাগ্রত স্থান ছিল ওটা, দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসত—আজকে যেমন আসছে লক্ষ্মণ মাইতি মহাশয়ের মীটিঙে। বাঁশঝাড় চারিদিকে চেপে ধরেছে পাকুড়গাছটাকে—আসল গাছ অনেকদিন মরে গেছে, খান দুই ডাল বেঁচে রয়েছে কোনপ্রকারে, আর ক'বছর পরে চিহ্ন থাকবে না এ গাছের। ঠাকুরমার গল্প শুনেছি, পীতাম্বর ঠাকুর স্নান-আহ্নিক সেরে দেড়প্রহর রাত্রে এই গাছতলায় এসে বসতেন, শিষ্য-সেবকেরা সেই সময় চারিদিকে ঘিরে এসে বসত।

কোম্পানির তখন প্রথম আমল। ঠাকুর তো আস্তানা গড়ে নিশ্চিন্ত আছেন। বাঁশবন নয় এটা তখন—নদীর প্রান্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। দো-চালা খোড়ো-ঘর বেঁধে সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হল সকলের আগে। তার চারিদিকে সংখ্যাতীত কুড়ে উঠল আশ্রমবাসী ও অতিথ-অভ্যাগত সাধুসজ্জনের থাকবার জন্য। মাঠের মাঝখানে গ্রাম গড়ে উঠল দেখতে দেখতে। তালুকদার এল একটা নিরিখ সাব্যস্ত করে বন্দোবস্ত দিতে, পঞ্চায়েত চৌকিদারি ট্যাক্সর তাগাদায় এল। ঠাকুর বলে দিলেন, রাজার প্রজা নই, সাধুরও খাতক নই। দেবীর কিঙ্কর—খসে পড়ো বাপধনেরা।

গ্রাম আরও জেঁকে উঠছে, নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ঘর বাঁধছে। ঢেঁকি-ঢেঁকিশাল তাঁত-চরকা হাপর-নেহাই—যা কিছু মানুষের দরকারে পড়ে। বিলের মধ্যে বিস্তীর্ণ ঐ যে ধানবন দেখতে পাচ্ছ নিশিবাবু, ওর বেশির ভাগই সে আমলে কারকিত করত ঠাকুরের লোকজন! এক খোলাটে ধান এনে তুলত, ঝেড়ে উড়িয়ে তুলে দিত ধর্মগোলায়। ট্যাক্স-খাজনার ধার ধারত না, দিব্যি ছিল।

বাঁধাঘাটে সবে তখন চৌকি বসেছে। সে এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূর, দুর্গম পথ ঘাট। এক বিকালে ঘোড়ায় চেপে দারোগা এল। ছোট রেল না হওয়া অবধি ও-অঞ্চল থেকে আসা-যাওয়া বড্ড মুশকিল ছিল নিশিবাবু। রাত থাকতে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, তা-ও প্রায় সন্ধ্যা লেগে গেল পৌঁছতে। গাঙে-খালে তিনটে পারাপার—ঘাটে এসে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হয়। মানুষ পার হলেও ঘোড়া পার করে আনা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।

দারোগা এসে গড় হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। ঠাকুর পূজার নির্মাল্য জবাফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পাথরের বাটিতে ঘোল আর রেকাবিতে করে খানকয়েক বাতাসা

দিয়ে গেল একজন। খেয়ে দারোগা ঠাণ্ডা হল। তারপর বলে, ট্যাক্স চাইতে এসেছিল—হাঁকিয়ে দিয়েছেন। কোম্পানির রাজ্য জানেন এটা ?

না বাবা, সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর রাজ্য। কারো তিনি ইজারা দিয়ে দেন নি পৃথিবীর জায়গা-জমি। বাজে কথা রাখো, অতিথ এসেছ—খাও-দাও থাকো দু-চার দিন—মায়ের নাম করো, আরাম পাবে। আমরা কারো তোয়াক্কা রাখিনে, কারো সঙ্গে গোলমাল করতে যাইনে। আমাদের কেন এসে জ্বালাতন করছ বাবা ?

দারোগা দিন পাঁচ-ছয় রইল সেখানে। ঠাকুরমা বলেন, চর্বচোষ্য খেয়ে দিব্যি মজায় ছিল। গিয়ে কিন্তু সদরে রিপোর্ট পাঠাল, জবরদস্তি করে আটকে রেখেছিল তাকে। গ্রামে সোরগোল পড়েছে, চওড়া পরিখা কাটা হচ্ছে চারিদিক ঘিরে। আস্ত বাঁশ পুঁতে পুঁতে প্রাচীর তৈরি হল—পর পর তিনটে প্রাচীর—দস্তুরমতো এক কেল্লা। আর ওদিকে অনিবার্য ভাবে যা ঘটবার কথা—এক দল গোরা সৈন্য এসে পড়ল।

লম্বা চওড়া ইয়া দশাসই জোয়ান, রক্তাম্বর-পরা—এই নাকি ছিল ঠাকুরের চেহারা। বুক ফুলিয়ে খালি গায়ে সৈন্যদের বন্দুকের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তারা অবাক হল। ঠাকুর বলেন, কেন গণ্ডগোল করতে এসেছিস ? ঘরের ছেলেরা ঘরে চলে যা। আমরা তো বাছা থুতু ফেলতেও যাইনে তোদের দেশে ঘরে।

কিন্তু ফিরে যেতে আসে নি তারা। বন্দুক ছোঁড়ে—ফাঁকা আওয়াজ, ভয় দেখাবার জন্য। ফলে উল্টা উৎপত্তি হল। প্রথমটা সকলের ভয় হয়েছিল—ভেবেছিল, ঠাকুর মরে পড়ে আছেন বুঝি নূতন-কাটা পরিখার ভিতর। কিন্তু হাসতে হাসতে ঠাকুর কেল্লায় এসে ঢুকলেন। লোহার গুলিও তাঁর গায়ে লেগে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। হবে না কেন—ধর্ম সহায়, কারও উপর অন্যায় করতে যান না তো তাঁরা—নিজের জায়গায় চুপচাপ নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

বাঁশের কেল্লা দেখে খুব হাসছে গোরা সৈন্যরা। এগিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করে তারা প্রাচীরের খানকয়েক বাঁশ খুলে ফেলল। সেই সময় এক কাণ্ড—পাকা মন্দির হবে, তার জন্য পাঁজা ভেঙে ইট স্তূপীকৃত করে রেখেছে, ঠাকুরের লোক আক্রোশে দমাদম সেই ইটবৃষ্টি করতে লাগল সৈন্যদের উপর। মাথায় লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

পরবর্তী ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠাকুর মরলেন বন্দুকের গুলিতে, আরও ষাট-সত্তর জন মারা গেল। কেল্লায় আগুন দিল, দাউ-দাউ করে সারা দিনরাত জ্বলল, ফট-ফট করে বাঁশের গিরা ফুটতে লাগল। বিয়াল্লিশ সনে দীঘির পাড়ের ঘরবাড়ি জ্বলতে দেখেছ নিশিবাবু ? ওই থেকে সেকালের ছবি আন্দাজ করে নিই। ঠাকুরের অতদিনের অত

আয়োজন নিশ্চিহ্ন হল দেখতে দেখতে। একটুখানি কেবল স্মৃতি আছে—এই বাঁশবন। প্রাচীরে কতকগুলো যে গোড়ার বাঁশ পোঁতা ছিল তাই থেকে নূতন নূতন বাঁশ জন্মেছে শতাব্দী কাল ধরে। কসাড় বাঁশঝাড় হয়ে পড়েছে এখন এই জায়গায়।

এত সব ব্যাপারের একটুখানি ইঙ্গিতও কিন্তু কোন ইতিহাসে নেই। ঠাকুরের অসমাপ্ত মন্দির কিম্বা সাত সাতটা যে পাঁজা সাজানো হয়েছিল, তার একটুকরা ইট দেখতে পাওয়া যায় না গ্রামের কোনখানে। পণ্ডিতজনেরা ঘাড় নেড়ে বলেন, গাঁজাখুরি গল্প—সামান্য একটু গ্রাম্যঘটনা লোকে মুখে মুখে রঙ চড়িয়ে এইরকমটা দাঁড় করেছে। যে যাই হোক, ছোটবেলায় ঠাকুরমার মুখে শোনা প্রতিটি কথা কিন্তু মনে গেঁথে গিয়েছিল আমাদের। ইট রয়েছে নিশ্চয় মাটির নিচে কোনখানে চাপা পড়ে, সেইসব মড়ার হাড় পাঁজরা ধূলো হয়ে বাতাসে উড়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। অহরহ বাঁশবনে কটর-কট আওয়াজ ওঠে—ছেলেবেলায় আমার মনে হত, সেকালের সেই রক্তাক্ত শিষ্য-প্রশিষ্যরা বাঁশের আগায় আগায় পা ফেলে শূন্য মার্গে চলাচল করছে। ছেলেমানুষ বলে নয়—বুড়োরাও নিতান্ত দরকার ছাড়া ঢুকতে চায় না এখানে। কেউ আসে না নিশিবাবু। দিনদুপুরে শিয়াল চরে বেড়ায়, খরগোস ছোটে দু-কান উঁচু করে, বাদুড় ঘুমোয় নিচেমুখো মাথা ঝুলিয়ে। তলায় ন্যাড়াসেঁজি ও শেয়াকুলের ঝোপ। কে আসতে যাচ্ছে বলো এদিকে, কার কি দায় পড়েছে?

দায় পড়েছিল আমাদের—খুব মুশকিলে পড়েছিলাম সেবার ঐ বিয়াল্লিশ সনের শেষাশেষি সময়টায়। আজকে নিশিবাবু ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি—সেদিন ঝোপের আড়ালে পাকা বাঁশপাতার উপর আমাদের দিনরাতের কায়েমি বিছানা হয়েছিল। শান্তি-বউদি তাকিয়া দিচ্ছিল মাথায় দেবার জন্য। তাকিয়ার বদলে একটা পাশবালিশ নিয়ে এলাম—ঐ এক পাশবালিশে এদিক-ওদিক মাথা রেখে অনেক লোকের শোওয়া চলে। ছিলাম অবশ্য মন্দ নয় নিশিবাবু। রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে ডেকে চুপ করত, তখনই উৎসব পড়ে যেত গ্রামের ঘরে ঘরে। আলো নিভিয়ে দিয়ে উৎসব। ছায়ার মতো এক একজন আমরা ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, দুয়োর খুলে তাড়াতাড়ি আপনজনেরা বেরিয়ে আসছে। ফিসফিস কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া—আমার দু-বছরের খুকি দেড়টা মাসের মধ্যে কোনদিন আমায় দেখতে পায় নি নিশিবাবু, আমিই তার ঘুমন্ত দু-চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে আদর করে যেতাম। সকাল হবার অনেক আগেই ঢুকতাম গিয়ে আবার বাঁশবনে। দেড়মাস বরাবরই যে এখানে ছিলাম তা নয়। সময় সময় ছোটলাইন ধরে দূরের কোন ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ি চাপতাম, আবার ফিরে আসতাম। এদিককার কাজের ভার আমাদের উপর, অঞ্চল ছেড়ে পালাবার জো ছিল না। রোজই যে ঘরে এসে খেয়ে যেতে পারতাম তা নয়। এক একদিন অচেনা মানুষ দেখা যেত গ্রামে—শাঁক বেজে উঠত এবাড়ি-ওবাড়ি।

সে রাতে নিরম্বু উপোস যেত। কাছাকাছি খেজুর-বনে ভাঁড় পেতে দিয়েছে, কিন্তু বেরিয়ে এসে খেজুর-রস নিয়ে যাবে তাতেও বড্ড কড়া রকমের মানা ছিল।

গোড়া থেকেই বলি শোন। বারটা মনে আছে—বিষ্যুৎবার। হাট বসেছিল সেদিন, হাটবার ছিল, তাই মনে আছে বারটা। সকালবেলা টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রভাসকে ধরল, হাত বেঁধে নিয়ে চলল। হাঁটু অবধি খদ্দর-পরা, মুখে প্রশান্ত হাসি আমাদের প্রভাস মহারাজ—তার হাতে দড়ি না দিলেও চলত নিশিবাবু। থানা এখন আর তো বাঁধাঘাটে নয়—আসামি পালিয়ে যাবে তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পালাবার হলে অপেক্ষা করত কি সে বাড়ি বসে? কত জনে সে বুদ্ধি দিয়েছিল, সে যায় নি। ওরা এলে প্রভাস বেরিয়ে এসে হাত দু-খানা এগিয়েই দিল একরকম। হাতে হাতকড়ি পরাল, কোমরেও এই মোটা এক দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ঐ পোড়া দালানটা তখন ছিল থানা—এখন ফুলঝুরির গঞ্জে নূতন দালানে থানা উঠে গিয়েছে। কিন্তু সোজাপথে না নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গ্রামের বাইরে হাটখোলা অবধি তাকে ঘুরিয়ে বেড়াল। তার মানে, সারা অঞ্চলের মানুষ দেখে নিক ওদের প্রতাপ। কাল হল এই প্রতাপ দেখাতে গিয়েই। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে মানুষ জমতে লাগল, সকলের মুখে ঐ এক কথা। ভোরবেলা এরা যে যার ঘরের মধ্যে ছিল, থানার লোক যেন ফাঁক বুঝে সেইসময় জুতো মেরেছে একা প্রভাসকে নয় অঞ্চলসুদ্ধ মানুষের মুখে। প্রভাসকে এমনি ভালবাসত সবাই। বাসবে না কেন নিশিবাবু, অত কে করেছে গ্রামের মানুষের জন্য? ফুলঝুরির চালের কলে হাজার দেড় হাজার মানুষ গিয়ে পড়ল বাইরের চালান বন্ধ করবার জন্য—তখন প্রভাসই ছিল সকলের আগে। বারাণ্ডায় ঐ যে আধ-পোড়া শাল খুঁটি, ঐখানে ঠিক দুপুরে প্রভাসকে বসিয়ে রেখেছিল। মালসায় করে গুড়-মুড়ি খেতে দিয়েছে, তা সে খায় নি। প্রহরখানেক একটানা জেরা করে ক্লান্ত অশোকবাবু সবে মাত্র খেতে গেছেন, খেয়ে দেয়ে এসে নব উদ্যমে আবার এক দফা চেষ্টা চলবে, তারপর পাঁচটার গাড়িতে সবসুদ্ধ মহকুমা শহরে রওনা হয়ে যাবেন, এই সাব্যস্ত হয়ে আছে। কাণ্ডটা ঘটল এই সময়। আশপাশ আট দশখানা গ্রামের বিস্তর লোক দলে দলে মিছিল করে এসে পড়ল। শঙ্খ বাজছে, শত শত নিশান উড়ছে, ভাবতে গেলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিবাবু। খাওয়া হল না অশোকবাবুর, এঁটো হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটলেন। হাটুরে মানুষও যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। তিনজন মারা পড়ল ঐ জায়গায়, আর একজন পরে হাসপাতালে। প্রভাসের হাতকড়ি ভেঙে কোমরের দড়ি কেটে কাঁধে তুলে লাফাতে লাফাতে নিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল অশোকবাবুর—জনতার নজর এড়িয়ে এঁদোপুকুরে কচুবনের ভিতর গিয়ে বসেছিলেন, চাঁদ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে হয়েছিল

নাকি তাঁকে। সত্যি, তাজ্জব ঘটে গেল নিশিবাবু—এক মুহূর্ত আগে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রভাসকে শুধু ছাড়িয়ে নিয়ে আসা নয়—জমাদার-কনেষ্টবল উর্দি-চাপড়াস ফেলে 'বাপ' 'বাপ' বলে পালিয়েছে, তাদেরই ক'জনকে তালাবন্ধ করে রেখেছে গারদঘরে। তে-রঙা নিশান পতপত করে উড়ছে থানার মাথায়। পাঁচ রাত চার দিন উড়েছিল ঐ ভাবে।

রাত্রি প্রহরখানেক অবধি এই সমস্ত চলল তো নিশিবাবু, তারপর চারিদিক স্তব্ধ হলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবছি, এ কি হয়ে গেল—ঠিক এমনটা চাই নি, আশাও করি নি এত সহজে এমন দখলে এসে যাবে এসমস্ত। কাগজে লড়াইয়ের খবর পড়ি—সে ব্যাপারও এইরকমটা নাকি? হঠাৎ বিজয় হয়ে যায়, যত মানুষ মরবে আর যত গোলাগুলি চলবে বলে আস্ফালন করা হয় আসলে তার সিকির সিকিও লাগে না। এর পরবর্তী অধ্যায়ের আঁচ করছি, এ ব্যাপার অবশ্য এখানেই চুকবে না। আমরা—বয়স যাদের বেশি—সাব্যস্ত করতে পারিনে, কি করতে হবে অতঃপর আমাদের। কিন্তু জোয়ান ছেলেগুলো বেপরোয়া, তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, হাসি-স্ফূর্তির অবধি নেই, খবর নিয়ে আসে শুধু এই একটা জায়গা নয়—সর্বত্র প্রায় এক অবস্থা। সাম্রাজ্যের হাজার ছিদ্র, সামলাবে ওরা আর ক'দিকে? কত মানুষ আছে শুনি, কত হাতিয়ার? আর হাতিয়ার হাতে পেয়ে কে কোনদিকে তাক করবে তারই বা ঠিক কি? ওদের নিজের ঘরের ছেলেরাই বিরক্ত হয়ে বেঁকে বসছে ক্রমে। সদর থেকে ফিরে এসে একজন গল্প করছে, সাদাসৈন্যর ব্যারাকের সামনে কয়লা দিয়ে লিখে রেখেছিল, কুইট ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়ো। সৈন্যদেরই একজন নাকি তার পাশে বড় বড় অক্ষরে জবাব দিয়েছে, ফর গড্স্ সেক—ঈশ্বরের দোহাই, ভারত ছেড়ে দেশে ফিরতে দাও তাদের। ছেলেগুলো মুখ নেড়ে নেড়ে আমাদেরই উপদেশ দিতে আসে, অত ভাবছেন কি দাদা? চালাও হুকুম, এবার, নেতার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পোষ্ট-অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে, খবরের কাগজ বন্ধ। ছেলেরা বলে, ভাল হয়েছে—বানানো গল্প আর সুকৌশলে পিছু-হঠার বাহাদুরি পড়তে হবে না এখন আর। কাগজ আসছে না, তা বলে খবরের প্রচার কিন্তু বন্ধ নেই। গাছে গাছে অলক্ষ্যে এঁটে দিয়ে যাচ্ছে সাইক্লোষ্টাইল করা খবর। হুলস্থুল কাণ্ড। বিদেশে ফৌজ গড়েছে আমাদের। আসছে, তারা এসে গেল বলে। পথ তৈরি করো তাদের জন্য।

রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে ফেলেছে, পগার কেটেছে দশ-বিশ হাত অন্তর। খেয়া-নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। ছোট রেললাইনও একেবারে বেমালুম মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পাঁচ-সাত জায়গায়। সদর থেকে সৈন্য নিয়ে আসা সহজ হবে না আর এখন। রোজই নূতন নূতন বাধা তৈরি করছে। আর দিন গুণছি নিশিবাবু, খবর নিচ্ছি সারা

ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে কি আগুন ? আগা-পাস্তলায় আগুন লেগে গেলে জল ঢালবে তখন কোন দিকে ?

কিন্তু আটকানো গেল না নিশিবাবু। রাস্তায় নূতন মাটি ফেলে গাছ সরিয়ে মেটে-রঙের সারবন্দি ট্রাক হিংস্র জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত্রি হেঁটে জন চারেক আমরা একবার রাণায়ের মোহনা অবধি গিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দূরের জায়গায় বেশি বিপদ। সবদিকে ডামাডোল চলছে, অচেনা লোক দেখলে সবাই কেমন এক ভাবে তাকায়। মুশকিলের কথা বলব কি সারাদিনের মধ্যে একমুঠো ভাত কি চিঁড়ে জোটাতে পারলাম না, সকলে চোখ-কটমট করে চায়, নূতন মানুষ দেখে সন্দেহ করেছে পুলিশের চর আমরা। অবস্থা দেখে আতঙ্ক হল, দিনের বেলা এই রকম—রাত্রে নিশ্চয় এরা ধরে পিটুনি দেবে। অথচ আত্মপরিচয় দেবার উপায় নেই—যত ঢাকাঢাকি করছি, সন্দেহ ততই বেড়ে যাচ্ছে সকলের।

চুপি-চুপি বলি তাহলে নিশিবাবু, জেলে গিয়ে যেন সোয়াস্তির শ্বাস ফেলেছিলাম ছ-সাত মাসের পর। নিশ্চিন্ত। মাথা খারাপ হল, শুনে তোমরা হায়-হায় করতে, আমার তার জন্য এতটুকু কষ্ট ছিল না। এক বিচিত্র অনুভূতি—স্বপ্নের মতো এখনো আবছা আবছা মনে পড়ে। মোটা মোটা গরাদে আর উঁচু পাঁচিলে যেন লোহার কেল্লা গড়ে রাজাধিরাজ হয়ে নিঃশঙ্কে ছিলাম ; পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে আর ঘুরতে হবে না। রাতে ঘুম হত না, তারাই সব ভিড় করে আসত। কত আনন্দ জানাত, কত দুঃখ করত ?

এখন সুস্থ হয়েছি, একটা ছেলের চেহারা বড্ড মনে পড়ে, এসে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। ফুটফুটে ছেলে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল বছর পাঁচেক বয়স, কথা সুস্পষ্ট হয়নি এখনো। শান্তি-বউদির ছেলে কাজলের মতো অনেকটা। মরবার সময় আমি কাজলের কাছে ছিলাম, গলার ঘড়ঘড়ানি আর অসহায়। এত বাতাস পৃথিবীতে, একটুখানি বাতাসের জন্য বার বার হাঁ করছিল অবোধ শিশু। সেই কাজলই যেন গিয়ে কাঁদত আমার কাছে।

শোন খোকা কাছে এসো—

না—

আরও সে সরে গিয়ে বসত।

এসো মাণিক আমার। সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে আজকে। খাবে ?

খাই কেমন করে ? দেখ, দেখ তো—

কান্নায় ভেঙে পড়ত। গলায় সিল্কের রুমাল জড়ানো। রুমাল খুলে দেখাত। গলা দিয়ে রক্তের ধারা ছুটল আবার, গলা ছেঁদা করে বুলেট বেরিয়ে গেছে।

খোকা বলে, আমি কত চেঁচিয়েছিলাম। শুনতে পাওনি ?

না ভাই, পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। মানুষের মুখে তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ থাকে কি লড়ায়ের মধ্যে ?

খোকা বল্‌ত, চেঁচামেচি শুনে রাস্তায় গিয়েছিলাম। সবাই ইট মারছে দেখলাম লরীতে। আমিও মারলাম। এই এতটুকু একখানা—বড় ইট তুলতে পারি কি আমি ? আমার ইট পৌঁছয় নি লরী অবধি। সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারিনি। সবাই মারছে, আমিও তাই মারলাম। আর অমনি খটাখট আওয়াজ করে তেড়ে এল।

কে ?

ফিরে দেখেছি নাকি ? কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছুটলাম। রোয়াকে উঠেছি, দরজায় ঘা দিচ্ছি, ও মাগো—বলে ডাকছি মাকে। ফটফট আওয়াজ হল, গলা আমার ফাঁক হয়ে গেল। পড়ে গেলাম, মনে হল। বলো তো, বলো—গলার এ ছেঁদা জুড়বে কি কোন দিন ?

আচ্ছা নিশিবাবু, সত্যি সত্যি ঘটেছিল এ রকম ! শুনেছ তোমরা কেউ ? না নির্জন্‌ সেলে বসে পাগলের উদ্ভট কল্পনা ?

এমনি যে কত লোক আসত। কত লোকের কত রকম কাহিনী। মনেও নেই সমস্ত, আর বলতে গেলে তোমার ধৈর্য থাকবে না। ব্যস্ত তুমি এখন মীটিঙের ব্যাপারে।

প্রভাসকে শেষ দেখা দেখেছিলাম গরাদের ফাঁক দিয়ে। সে দেখেনি অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সে তখন। উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে সেলের ভিতরটা অবারিত। ওয়ার্ডার পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে। ফাঁসি-কাঠে কালো বার্ণিশ লাগিয়েছে, চর্বি দিয়ে মেজেছে দড়ি। প্রভাসেরই ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে সকালবেলা। তারা তৈরি।

ঘুমুচ্ছিল, রাতের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে ঘণ্টার আওয়াজ এল। শোনা কথা আমার অবশ্য—ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে বলেছিল, দশটা মিনিট সময় চাই যে ভাই। একটু গীতা পড়ে নেব, প্রার্থনা করব একটুখানি।

উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, শেষ রাত্রের নির্মল আকাশে অজস্র হীরার কুচির মতো তারা দপদপ করছে—সেই সময় ঘুম ভেঙে উঠে বসে শুনতে পাচ্ছি, যার কাছে যে দোষ করেছি, মাপ চেয়ে যাচ্ছি ভাই। শুনতে পাও বা না পাও আমায় মাপ কোরো তোমরা—

চোখে দেখিনি কিন্তু ছবিটা আন্দাজ করতে পারি নিশিবাবু। পবিত্র আগুনের মতো প্রদীপ্ত মুখ, ফাঁসির মঞ্চে অচঞ্চল উঠে দাঁড়াল তেত্রিশ বছর বয়সের আমাদের প্রভাস মহারাজ।

যে সময় বিচার চলছিল, একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ মারতে পার তুমি? সত্যি কি মেরেছিলে।

খানিক হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, মানুষ কি মারা যায়? জানোয়ার মরেছিল কিনা খবর রাখিনে। তারপর একটু স্তব্ধ থেকে বলল, একটা কাজ কোরো ভাই দয়া করে, মহাত্মাজি বেরিয়ে এলে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

প্রশান্ত হাসি হেসে আবার বলল, কি অত ভাবনা করছ? জন্মেছি যখন, মরবই। যিনি জীবন দিয়েছেন, ফিরিয়ে নিচ্ছেন তো তিনিই।

প্রভাসের পদকটা মীটিঙের মধ্যে কে নিচ্ছে হাত পেতে? লক্ষ্মণ মাইতি মশায় নিজেই হয়তো কম্পমান হাতে বুকের উপর ঝুলাতে যাবেন। আর ভাল এক বক্তৃতা ফেঁদে বসবেন, রাজপুত ও শিখের ইতিহাস থেকে নজীর তুলে তুলে তুলনা করবেন। সামলে থেকো কিন্তু নিশিবাবু, পাশ থেকে সেই সময় কথা জুগিয়ে জুগিয়ে দিও। নইলে মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি অ্যাঁ-অ্যাঁ করবেন, কোটরগত চোখ বেয়ে জলের ধারা বইবে, যজ্ঞ পণ্ড হবে তোমাদের।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুড়ি

ঘরের কোণের অন্ধকারটা যেন বেশি স্পষ্ট মনে হল, বেশি নিশ্চল। কেমন-যেন ভারী একটা স্তব্ধতা জমে উঠেছে শক্ত হয়ে।

একটু ভয় পেল অধিপ। বললে, 'কে?'

কোনো উত্তর নেই।

হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল। তামসী! একটা ন্যাড়া কেঠো চেয়ারে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। যেন ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথভ্রান্ত একটা পাখি উড়ে এসেছে। ছিন্নপক্ষ। এ তার কি চেহারা, কি বেশবাস! অধিপ খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। সত্যিই চিনবে কিনা ঠিক করতে পারল না।

'এ কি, আপনি এখানে?'

'দরজা খোলা পেলুম আর অমনি ঢুকে পড়লুম।' তামসী শুকনো মুখে হাসল: 'আজ যে দিকে তাকাই দেখতে পাই দরজায় তালা আঁটা।'

ভাগ্যিস ঘর তখন খোলা রেখে গিয়েছিলুম! তাই কি বলবে অধিপ উচ্ছ্বসিত হয়ে? আত্মহারা হয়ে? না, বলবে, আবার কেন এই প্রত্যাখ্যাতের আস্তানায়? গলার স্বরে ফোটাবে নাকি সেই অভিমানের উগ্রতা?

কি বলবে বুঝতে পারছেনা অধিপ। শুধু বললে, 'আপনার কী হয়েছে?'

'সব চুরি হয়ে গিয়েছে।'

এবারও হাসতে চেয়েছিল তামসী, কিন্তু আশ্চর্য, হাসি ফুটল না। কেমন যেন নাকে-কাঁদুনে শোনাল কথাটা। নিজের কানে শুনে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। এত সব ঘটে যাবার পরেও তার শুধু সেই চুরি যাবার কথাটাই মনে হচ্ছে। আহা, কী এমন তার চুরি হয়েছে না-জানি। গিয়েছে তো ক'টা নোংরা গয়না, তার পাবলিসিটির পোস্টার। একজনের লেলিহচক্ষুর লোভোজ্জ্বল চাহনি। গিয়েছে তো বেঁচে গিয়েছে। পবিত্র হয়েছে, স্বাভাবিক হয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার মৌল অখণ্ডতা। প্রেম যখন যায়, তখনও প্রেমের মতই একটা বড় জিনিস এসে বুকে বাজে। সেই বাজাটাকে সে বাজনা করে দেখবে না কেন? যা সত্যিই মুক্তি তাকে সে চুরি বলবে কোন দুঃখে?

'কী চুরি হয়েছে?'

'না, চুরি নয়।' স্বচ্ছ মুখে হাসল এবার তামসী। বললে, 'চাকরিটা শুধু গেছে। আর, যে-বাড়িটায় ছিলুম সেখান থেকে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে বার হয়ে গেছি।'

'তার মানে?'

সংক্ষেপে সব বললে তামসী। শুধু রণধীরের কথাটা জোর করে চেপে গেল। উৎপীড়ক নিঃসহায়ের উপর প্রবল নির্যাতন করছে এ বর্ণনায় জৌলুস আছে, যে আসলে অক্ষম তারও তখন স্পর্ধার শেষ নেই। কিন্তু যাকে সমস্ত-কিছু দিয়ে দিতে পারি, সে সমস্ত-কিছু ফেলে তুচ্ছ ক'টা গয়নার টুকরো নিয়ে পালিয়ে গেল এ বর্ণনার মধ্যে লজ্জা ছাড়া আর কী আছে! একদিকে প্রপীড়ক অন্যদিকে প্রপীড়িত—এ কাহিনীর মধ্যে

নাটকীয় ঔজ্জ্বল্য আছে ; কিন্তু একদিকে এক চোর অন্যদিকে এক ভিক্ষুক—এ কলঙ্ক-কথা কাউকে বলতে যেয়ো না।

'তারপরে বেরিয়ে এসে দেখলুম যাবার কোথাও জায়গা নেই। ভাবলুম আপনি আছেন।'

ভাবলুম, আপনি আছেন! মুহূর্তে নিজেকে অধিপের অনেক বড় মনে হল, অনেক বলশালী। যেন অনেক ডাল-পালা-মেলে-দেওয়া বিশাল বনস্পতি। অনেক বেড়ে গেল তার দায়িত্ব, তার আশ্রিতসৌজন্য। তার ছায়ামণ্ডল। হৃদয়ের মধ্যে সে একটা নতুন শক্তি, নতুন স্তব্ধতা অনুভব করলে। নিষ্কামতার শক্তি, নিষ্কামতার স্তব্ধতা। আপনি আছেন! নিজের থাকার এত বড় স্বীকৃতি আর কখনো খুঁজে পায়নি নিজের মধ্যে।

'কিন্তু না, এ কিছুতেই সহ্য করা যাবে না।' তক্তপোষে বসা ছিল অধিপ, ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল ঃ 'এর শোধ নিতে হবে।'

'কী ভাবে ?' ফিকে চোখে জিগগেস করলে তামসী।

'চাকরি নিয়েছে নিক, কিন্তু বাড়ি থেকে মুখের কথায় তাড়িয়ে দেয় কোন আক্কেলে ? জানি, বাড়িতে থাকবার আপনার স্বত্ব ছিল না, তাই বলে নিজের হাতে আইনের লাগাম তুলে নিতে পারে না জ্ঞানাঞ্জন। ইচ্ছেমত মুখের উপর বন্ধ করে দিতে পারেনা দরজা। না, আপনি উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ? অধিকার সাব্যস্ত করে ঢুকব গিয়ে আবার সেই ঘরে ? সেই অসত্যের আশ্রয়ে ?'

'না, থানায় যাব আমরা। জ্ঞানাঞ্জনের নামে পুলিশ-কেস করব।'

'বসুন। উত্তেজনাটা বিফল হতে দেবেন না।' উদাসীনের মত হাসল তামসী।

না, উত্তেজনটা উপেক্ষা করবার নয়। এতদিন কোনো-কিছু কাজ পায়নি অধিপ যার মধ্যে সে মন লাগাতে পারে। ঢেলে দিতে পারে তার সমস্ত প্রকৃতি। বড় বেশি নিরর্থের মত তার দিন কেটেছে। ছন্দহীনের মত। আজ হঠাৎ যেন সে নিজেকে আবিষ্কার করল। খুঁজে পেল তার ভঙ্গির তেজস্বিতা। আপনি আছেন! রক্তের মধ্যে শুনতে পেল সেই জীবনের ঘোষণা।

অধিপ বসল না। যেন পরেবে না সে আর স্থির হয়ে বসতে। তার সেই মদিরমন্থর আলস্যের মুহূর্তগুলি যেন উড়ে গিয়েছে ঋতুবদলের পাখির মত। সে এখন মেঘলেশলীন তপ্ততাম্র আকাশের মত খাঁ খাঁ করছে। দুঃসহ একটা জ্বালা জ্বলছে তার রক্তের মধ্যে।

অন্যরকম জ্বালা। একটা প্রবল প্রতিপক্ষতার সঙ্গে ক্ষমাহীন সংঘর্ষে নিজেকে ব্যক্ত, পরিব্যাপ্ত করার আর্তনাদ।

'অন্যায়ের যখন দেখা পেয়েছি মুখোমুখি, তখন তাকে আর ছেড়ে দেয়া হবে না। হাতের কাছে মার দেবার মত অন্যায়ের দেখা পাওয়াটাও একটা সৌভাগ্য। না, আপনি উঠুন।'

তামসী এতটুকু গা করল না। একটি শান্ত স্থৈর্যে নিজেকে সংবরণ করে রইল। বলল, 'নিজের ছোট স্বার্থের গুজুহাতে নিজের লাঞ্ছনার বিজ্ঞাপন দিতে রুচি নেই। জিনিসটাকে বড় করে দেখি। নিজের মাঝে দেখি এবার জনতাকে। আমার উচ্ছেদের মাঝে সমস্ত বিতাড়িতের অপমান।'

'তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না আপনি। অন্যায় যত তুচ্ছ হয়েই আসুক তা অন্যায়। অন্যায় যে করে, তার চেয়ে অন্যায় যে সহ্য করে, তার অন্যায়টাই বেশি।' অধিপ ঘরের মধ্যে অস্থিরের মত কয়েক পা পাইচারি করে নিল। বললে, 'জনতা কবে আপনার জন্যে রাস্তায় এসে দাঁড়াবে তার অপেক্ষায় ঘরের মধ্যে বসে থাকলে চলবে না। নিজেকে আজ আপনার দাঁড়াতে হবে জনতার প্রতিভূ হয়ে। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে আপনাকে। মুখ বুজে যে সহ্য করা যায় না তার দৃষ্টান্ত। আপনি যে তাদেরই লোক, জনতা নইলে চিনবে কি করে ?'

তামসী প্রথম চন্দ্রলেখার মত একটু হাসল। বললে, 'আপনার চাকর কোথায় ?'

সমস্ত সুর যেন কেমন হালকা হয়ে গেল। অধিপ ঢোঁক গিলে বললে, 'বাইরে কোথাও গেছে হয়ত। কেন, কি দরকার ?'

'বা, একটু চা করে দেবে না ?' তামসী মোহমাখানো গলায় বললে। যেন বসবার ভঙ্গিটা আরো একটু শিথিল করলে। 'কতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছি বলুনতো।'

অলক্ষ্যে অধিপের ভয় করে উঠল। চকিত চোখে তাকাল তার মুখের দিকে। সম্পূর্ণ আলো পড়েনি মুখের উপর। মনে হল সেমুখে যেন গৃহকোণের প্রদীপের স্নিগ্ধতা, রৌদ্ররুক্ষ দিনের শুষ্কতা নেই। অধিপের ভয় করে উঠল। তার রেখা যেন নিস্তেজ, ভঙ্গি স্ফূর্তিহীন। অগ্নিকোণে যে-একটুকরো মেঘ দেখেছিল আকাশে, কে জানে, হয়তো তাতে ঝড় নেই সংহত হয়ে, আছে বা শুধু ঘুমপাড়ানির বৃষ্টি। পাখা-ঝাপটানো যে-একটা শিকারী শ্যেন দেখেছিল, সে হয়তো আসলে একটি কলহংস।

না, না, তা হতে পারে না। তা কি করে হয় ?

'চা-টা পথেই কোথাও খেয়ে নেয়া যাবে। চলুন, দেরি করে কোনো লাভ নেই।'

'কত দিন দেরী করতে হয় তার ঠিক কি।' তামসী বললে প্রায় তন্ময়ের মত। 'এক

পেয়ালা চায়েতেই তো শুধু চলবে না, রাত্রে ভাত খেতে হবে, ঘুমুতে হবে, নিশ্চিন্ত রাত্রির পর পেতে হবে নতুন দিনের আরম্ভ। এমন কত দিন তা কে বলতে পারে?' আলোয় মুখ সরিয়ে এনে চোখে ঝিলিক দিল তামসী: 'তার ব্যবস্থা করতে হবে না? আমাকে নিশ্চয়ই মেঝেতে শুতে দেবেন না, তাই আর একটা বিছানা দরকার। আর, দেখতেই তো পাচ্ছেন, দ্বিতীয় কাপড়-জামা নেই সঙ্গে, তাই—' অসহায়ের মত অনুচ্চারিত বেদনায় তামসী হাসল।

'এইখানে থাকবেন আপনি?' চারদিকে উত্তাল অন্ধকার দেখল অধিপ।

'নইলে আমাকে ফুটপাতে থাকতে বলেন? কেন, আমি কি ভিখিরি, না, চোর, না, গাঁটকাটা?'

'তা কেন। তাই বলে আমার এখানে? আমি একেবারে একা—'

'আপনার ভয় নেই। আমিও একেবারে মুক্ত।'

এত সাহস এত শক্তি কোত্থেকে পেল তামসী? পেয়েছে তার অপমানে, তার পরাভবে, তার সমস্ত-কিছু-হারিয়ে-ফেলার আকস্মিকতায়। তার আজ কিছুই যে নেই. এটাই তার প্রকাণ্ড অহংকার, প্রচণ্ড ক্ষমতা। আর, যার এত সাহস এত স্বাধীনতা, তার জন্যে অধিপের ভয় কিসের?

না, ভয় তার ঐ বেদনাবিদ্ধ চোখকে, রমণীয় রিক্ততাকে; কে জানে, হয়তো বা তার উদ্দীপ্ত ঔদ্ধত্যকেই। কে জানে, হয়তো ঐ চোখ নিয়ে আসবে অন্ধকারের মদিরা, রিক্ততা চাইবে প্রসন্ন পুষ্পভূষণ আর এই ঔদ্ধত্য নিয়ে আসবে হয়তো বা আবেগের আবিল্য। দুশ্চর তপস্যার কাঠিন্য যাবে কাদা হয়ে। প্রাণপণ শক্তিতে মনে যে মরুবিস্তার করেছিল হয়তো অলক্ষ্যে সেখানে শষ্পশয্যা রচনা হবে। অধিপ থমকে দাঁড়াল।

বললে, 'আমার ভয় কি। আমি পুরুষ। আমি নির্দায়িক।'

'আরো বলুন। আমি বাঘ, আমি ভালুক, আমি চোর, আমি ডাকাত। যাই বলুন, বাঘ-ভালুকও মানুষকে ভয় পায়, আর, চোর-ডাকাতের কথা বলবেন না দয়া করে। চোর-ডাকাত ঢের দেখা আছে আমার! জানা গেছে তাদের মুরোদ কত।'

'কিন্তু থাকবেন যে, কী বলে সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে? মৌখিক একটা চাকরির চুক্তিও আজ নেই আমাতে-আপনাতে।'

তামসী নির্মল মুখে হাসল। বললে, 'সেইটেই সান্ত্বনা। আজ আর কোনো ছদ্মবেশ নেই, গোঁজামিল নেই। আজ আমরা সমান-সমান। আমার-আপনার দুই পাশের দুই ঘরের মধ্যেকার দরজা আজ দুইদিক থেকে খোলা। একদিকে বিশ্বাস আরেক দিকে বন্ধুত্ব।'

অধিপ তামসীর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল।

তামসীই বললে, 'আজ আমরা মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি। আজ আর চাকরি নয়, কাজ, কাজ। আপনি মুনিব আমি চাকর, আপনি লুব্ধ আমি ক্ষুব্ধ—এ আমাদের পরিচয় নয়। আপনিও কর্মী আমিও কর্মী এই আমাদের বন্ধনহীন সম্বন্ধ। এই সমকর্মিতা, সহকর্মিতা। কি, রাজি ?'

রাজি, রাজি। উল্লসিত হয়ে উঠল অধিপ। কাজ, কাজ, কাজ। ছোট কাজ, বড় কাজ, অনেক কাজ। অনেক কাজেই দেশের কাজ। ভাঙবার কাজ, গড়বার কাজ। স্বপ্ন দেখার কাজ। স্বপ্নকে সত্য করার কাজ।

'তবে এখন থেকেই কাজ আরম্ভ করে দি।' অধিপ স্থিরপ্রতিজ্ঞের মত বললে।

'কি চায়ের জন্যে জল গরম করছেন ?'

'তা করছি। কিন্তু প্রথমেই থানায় চলুন। জ্ঞানাঞ্জনের নামে এজাহার করুন গে দারোগার কাছে। আমি আছি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান জোর করে।'

'আপনি থাকলেও যে উঠে দাঁড়াতে পারব এমন মনে হয় না।' তামসী হাসল। 'ডান পাটা আমার অসম্ভব কেটে গিয়েছে।' বলতে-বলতে বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা সে তুলে দিল। ডান পায়ের গোড়ালি ঘিরে মস্ত একটা ব্যাণ্ডেজ।

'কি করে কাটল ?'

'আর বলবেন না! ঘরময় ভাঙা কাঁচের টুকরো। তাণ্ডবের অবশেষ। ঝাঁট দিয়ে মেঝেতে একটু শোবার জায়গা করতে পারি এমন ফাঁক নেই। কোন ফাঁকে পদাঘাত করে বসেছি খেয়াল করিনি। রাগটা বেশি ছিল বলে পদাঘাতটাও প্রবল হয়েছে।'

নিচু হয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে অধিপ জিগগেস করলে, 'কি, ভিতরে আছে নাকি কাঁচের টুকরো ?'

'বোধহয় নেই। কিন্তু যন্ত্রণায় পা এখন ছিঁড়ে পড়ছে। সারাদিন এই কাটা পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর এখানে, এতক্ষণ এই পা ঝুলিয়ে বসে থাকার দরুন একেবারেই নাড়তে পারছি না। ও কি, পায়ে হাত দিচ্ছেন কি বলে ? মনে নেই, আপনার জ্বরের সময় আপনার কপালে আমি হাত দিইনি ?'

'আপনি বসুন, আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসি।'

'আপনার কি বুদ্ধি! ডাক্তার এসেই প্রথমে গরম জলের খোঁজ করবে। তাই আগে উনুন ধরিয়ে জল চাপান। আর, জল যদি গরমই হয় তবে চা এক বাটি খেয়ে নিতে দোষ কি।'

সত্যিই তো। কিন্তু নিশি কোথায় ? উনুন যে ধরানো হয়নি এখনো।

'কে ? আপনার চাকর ? আমাকে বসিয়ে রেখে চলে গেল বাইরে। বলে গেল, রাত্রে আজ আর রাঁধবনা, হোটেল থেকে বাবুর ভাত নিয়ে আসব।'

'কী সর্বনাশ ! আপনার তবে খাওয়া হবে কি করে ?'

'খাওয়ার চেয়ে পা টান করে শুয়ে পড়ারই আমি বেশি পক্ষপাতী। সত্যি, দিন না কোথাও একটা শোয়ার জায়গা করে। সমস্ত পাটা একেবারে খেয়ে যাচ্ছে।'

ঘরের চারদিকের আনমনা বিশৃংখলাগুলো তাকিয়ে রইল অসহায়ের মত। ব্যস্ত হাতে অধিপ তাদের সংস্কার করতে বসল, হয়তো বা একটু সুন্দর করতে বসল। বিছানাটা পেতে ফেললে। চাদর বদলাল। বালিশের অড় বদলাল একে-একে। তৃপ্ত চোখে তামসী দেখতে লাগল একটি সংগঠনের কাজ। একটা মৃত-মলিন ঘর কি ভাবে পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে। ভুলে যাচ্ছে তার অপরিচ্ছন্ন অতীত, গুরুভার বিষণ্ণতা। চলে আসছে নব জীবনের উপকূলে। চাই সেবার স্পর্শ, স্নেহের স্পর্শ, স্বার্থহীন কর্মের স্পর্শমণি।

আজ মধ্যরাত্রে থেকে-থেকেই অধিপের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। পাশের ঘরে মেঝের উপর শুকনো মাদুর পেতে শুয়েছে বলে নয়, বারে-বারে একটা কথা মনে করে নিজেকে চমকে দেবার জন্যে। কী যেন আশ্চর্য কী ঘটেছে যেটাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে অনুভব করার জন্যে, কী যেন আশ্চর্যতর আরো ঘটবে তাকে অস্পস্ট চেতনায় অন্বেষণ করবার জন্যে।

দুই ঘরের মাঝখানে দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজাটা বন্ধ হয় তামসীর দিক থেকে। তবু তামসী এতটুকু ব্যস্ত হয়নি। বলেছে একদিকে বিশ্বাস, আরেক দিকে বন্ধুত্ব। ভাবতে অদ্ভুত লাগে অধিপের। এত তেজ এত দীপ্তি সে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনল, আত্মার কোন রত্নাকর থেকে ? স্পর্শসংকোচপত্রিকা ছিল, আজ হয়ে উঠেছে নির্বারিত অসিপত্রিকার মত। রিক্ততার মধ্যে এত শক্তি এত সৌন্দর্য ছিল তা কে জানত ? কিন্তু অধিপকে তার বিশ্বাস হল কিসে, কিসের উৎসাহে ? ব্যাণ্ডেজশুদ্ধু পা যখন সে তুলে ধরেছিল তখন তা ছোঁবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়েছে, আর হাত রাখতে চেয়েছে পায়ের অনাবৃত অংশটুকুর উপরে। অবচেতন মনে হয়তো আজো সেই ইচ্ছাটিই আছে যে একটি অতর্কিত অথচ স্পন্দময় স্পর্শেই সে তার গভীর আকুতি প্রকাশ করতে পারবে। ডাক্তার যখন পা ধুয়ে বেঁধে দেবার পর প্রেসক্রপশানে কী নাম লিখবে জিগগেস করেছিল, তখন অধিপ কেন তার নাম বলেনি, কেন বলেছিল যা হয় লিখে দিন একটা ? তার গহন মনে তখন কি এই অজানিত ইচ্ছাই ছিল না ডাক্তার মিসেস মজুমদার লিখবে ? নইলে শুতে যাবার আগে বারে-বারে তামসীকে সে এই একই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল কেন, মাঝখানের দরজাটা তামসীর দিক থেকে বন্ধ হয়, কষ্টেস্যষ্টে হলেও যেন একবার উঠে খিল চাপিয়ে দিতে সে না ভোলে। না, বিশ্বাস নেই অধিপকে।

না, তেমন কিছু বিশ্বাস নিয়েও তামসী আসেনি। ধরা দেবার জন্যেই এসেছে। ঝড়ের তাড়া-খাওয়া দেয়ালের কোণ-ঘেঁষা পাখীর ছানার মত। এসেছে স্পর্শের উত্তাপে স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। তাই ডাক্তার যখন নাম লিখেছিল প্রেসকৃপশানে, তামসী মুখ টিপে হেসেছিল, বলেছিল, যা-হোক, মর্যাদা দিয়েছেন আমাকে, চিরন্তনী কুমারী ভাবেন নি। কে জানে, হয়তো বা এসেছে ফিরে-না-যাওয়া ঢেউয়ের মত, নিজের উত্তেজনায়। সীমাতিক্রান্ত হয়ে। তাই অধিপ যখন বলেছিল দরজাটা বন্ধ করে দিতে, তামসী বলেছিল উত্তরে, বন্ধ করতে হলে আপনাকেও চলে আসতে হয় এ-ঘরে। আমার এমন সাধ্য নেই বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াই।

'কী সাহসে আমার কাছে আপনি এলেন ?' স্পষ্টাস্পষ্টিই জিগগেস করেছিল অধিপ।

'আমি সেদিন যখন চলে যাই আপনার বাড়ি থেকে, আপনার মনে আছে কিনা জানিনা, আপনি অন্ধকার সিঁড়িতে আলো জ্বেলে ধরেছিলেন। অবাধে চলে যেতে পারি তার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। থেকে থেকে সেই সিঁড়িটাকে আমার মনে পড়েছে। ডেকেছে আমাকে সিঁড়িটা। মনে হয়েছে, আবার অবাধে সিঁড়ি বেয়ে চলে যেতে পারি আপনার ঘরে। কি, পারি না ?'

না, আর সিঁড়ি নয়, শুধু একটা দরজার ব্যবধান। তাও খোলা দরজা। অন্ধকারে চুপ করে বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই চৌকাঠটুকু পেরোবার তার শক্তি নেই। কে কবে তা ভাবতে পারত ? মদের বাক্সটা নিশি রেখে গেছে সরিয়ে। ঘুম না আসে, কিছুটা খেয়ে নিতে পারে স্বচ্ছন্দে। তারপর সে যদি নির্ভুল পায়ে চলে যায় ও-ঘরে, নেমে যায় সে ঘুমের সরোবরে, কে তাকে বাধা দেয়। কে যে তাকে বাধা দেয়, আশ্চর্য, কিছুতেই বুঝতে পারেনা অধিপ। একটা নিরাশ্রয় নিঃসম্পর্ক মেয়ের জন্যে কেন এত জবাবদিহি ? কেন একটা ক্ষীণ, দুর্বল মেয়ে তাকে তার ঘুমের পাহারায় বসিয়ে রাখে সারা রাত ? কেন তাকে বৈরাগ্যের মন্ত্র শোনায় ?

কে উত্তর দেবে ?

উত্তর তামসীই দেবে একদিন। বলবে, ধৈর্য ধরো। ঘুম যাও। অঙ্কুর থেকে কিশলয়, কিশলয় থেকে কোরক, কোরক থেকে ফুল। দাও কিছু শিশির, দাও কিছু রৌদ্রের মাধুরী। দেখবে তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠব দেখতে-দেখতে।

'কি করে আমার ঠিকানা জানলেন ?' জিগগেস করেছিল অধিপ।

'কে যেন বলেছিল সেদিন।'

'কে ?'

'কে বলেছিল সেটা তুচ্ছ, মনে করতে পারছি না। কিন্তু শুনে অবধি ঠিকানাটা

যে মনে করে রেখেছি সেইটেই লক্ষণীয়। কত দিন ভাবতুম আপনি চলে আসবেন নিজে থেকে। বক্‌সি কিন্তু ভাবত এসে চলে গিয়েছেন কোন ফাঁকে। কেন আসেননি বলুন তো? দরজা খোলা রাখলেও বুঝি আপনার নিষেধ মনে হয়?'

'আমি যদি এখানে না থেকে আজকে আমার বাড়িতে থাকতুম?'

'তা হলে তো আর কথাই থাকত না। হোটেল থেকে এনে ভাত খেতে হত না তা হলে। শুতে হত না পুরুষের হাতে-করা রুক্ষ বিছানায়। তখন সেটা স্থান হত না, ঘর হত।'

আজ ঘুম যাও। ধৈর্য ধরো ক'দিন। কুহেলিকা তরল হয়ে যাবে। দেখা দেবে সূর্যের সারল্য। উন্মাদ হাওয়া আসবে সমুদ্রের থেকে।

ভগবান, রক্ষা করো। অন্ধকারে নিঃশব্দে অধিপ আর্তনাদ করে উঠল। রক্ষা করো আমাকে। রক্ষা করো তামসীকে। রক্ষা করো নতুন দিনের যুযুধান যুবক-যুবতীকে। আমি বড়, বয়সে, অভিজ্ঞতায়, দুঃখসহনের প্রতিশ্রুতিতে। ত্যাগ স্বীকারের তপঃক্লেশে। আমাকে বড়ই থাকতে দিও। নামিয়ে নিয়ে এসো না উচ্ছিষ্টের আস্তাকুড়ে। যেখানে নিরেট দেয়াল সেখানে নয়, যেখানে খোলা দরজা, সেইখানেই তোমার নিষেধ থাক নিষ্ঠুর হয়ে। একটা ক্ষীণকায় দুর্বল মেয়ের কাছে যে হেরে যাচ্ছি তার মাঝে আর কোনো বৃহত্তর জয়ের জন্মপত্র যেন লেখা থাকে। ক্লান্ত, বিতাড়িত নির্যাতিত তামসী, তবু তাকে যেন রাখতে পারি জাগিয়ে। জাগরণের সেই জপমন্ত্র যেন ভুল করে না ফেলি। যে লাল মেঘে ঝড় আসবার কথা সে মেঘকে যেন সূর্যাস্তের স্বপ্নে সোনালি করে না দেখি। বিদ্যুতের বহ্নিতে না গৃহকোণের বাতি জ্বালাই। আমাকে তার দীক্ষাগুরু করো। রণগুরু।

ঠুন ঠুন করে কাঁচের পেয়ালার শব্দ হল। কখন নিশ্চিন্ত বিস্মৃতিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল অধিপ, চমকে চেয়ে দেখল, এক গা রোদ উঠে গেছে। কী যেন কী একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে মনে-মনে ঠিক আয়ত্ত করে নেবার আগেই দেখতে পেল, তামসী। হাতে চায়ের পেয়ালা। হাসিমুখ। কোথায় আগুন, কোথায় জল, নিজের চেষ্টায় একটা কিছু যে তৈরি করে এনেছে তার প্রতিভাস।

'কেমন আছেন?'

'যন্ত্রণা অনেক কমে গিয়েছে। হাঁটতে পারছি, খোঁড়ানোটা কমেছে অনেকটা। কিন্তু ভয় নেই', তামসী হাসল, 'এখনো পালাবার মত হয়নি।'

গোড়ালি উঁচু করে-করে এ-ঘর ও-ঘর চলাচল করছে তামসী। নানান কাজের অছিলায়। কাল অধিপ যেটুকু করেছিল তার চেয়ে অনেক বড় পরিকল্পনা।

অধিপ শুধু দেখছে আর ভাবছে, কাজটা কি ভাঙবার না গড়বার? (ক্রমশঃ)

আলোচনা

[জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বাশায় একটি কবিতার বই-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীজীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা বলেছেন যা সমর্থনযোগ্য নয়। সমালোচকের ব্যক্তিগত মতামতের কণ্ঠরোধ করা অনুচিত কিন্তু তার প্রতিবাদ যদি সম্ভব হয় তবে তা জানিয়ে রাখা উচিত। জীবনানন্দ স্বয়ং সে-প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর প্রতিবাদ প্রতিবাদমাত্র নয়—এ-যুগের কবিতার উপর একটি সুন্দর, সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ।—সম্পাদক]

(১) রামেন্দ্র দেশমুখ্যের বই রিভিয়ু করতে গিয়ে নীরেন বাবু বলেছেন: 'জীবনানন্দ দাশের আত্মঘাতী ক্লান্তি থেকে তিনি মুক্ত'। 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়, কোনোদিনই ছিল ব'লে মনে পড়ে না। 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি লাসকাটা ঘরের কবিতাটি বেছে বের করেছেন। এ কবিতাটি প্রায় ১২।১৪ বছর আগে রচিত হয়েছিল। কবিতাটি subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র; কবিতাটি পড়লেই তা' বোঝা যায়। Hamlet বা Lear বা Macbethএর 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র সঙ্গে সেক্স্‌পীয়রের যা সম্পর্ক ও কবিতার ক্লান্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটুকুও সেইরকম। কবিতাটিতে Subjective note শেষের দিকে ফুটেছে; কিন্তু সে তো লাসকাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে—অনেক দূরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে আনন্দিত করে রেখেছে কবিকে। তবু নীরেন বাবু লাসকাটা ঘরের নায়ককে নায়কের স্রষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোত করে না জড়িয়ে কবিতাটি আস্বাদ করতে পারেন না মনে হয়। তিনি কি সেক্স্‌পীয়রকে Macbeth বা Bardolph, Dogberry বা Gobbo মনে করেন?

তা ছাড়া লাসকাটা ঘরের কবিতাটিকে তো আমার সমগ্র কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ representative হিসেবে গ্রহণ করতে পারা যায় না। ঐ কবিতাটির নিকষে আমার সমস্ত কাব্য অধ্যয়ন করতে যাওয়া ভুল।

(২) 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' বা আজকের যুগের যে কোনোরকম ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে হ'লে শুধু 'আশাবাদী মনোভাব' কবচের মতন যে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানালয় থেকে কিনে আনলে চলবে না। সে মনোভাব আশাবাদী হতে পারে, কিন্তু তা আরোপিত ও আড়ষ্ট—স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীন নয়। 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়' বালভাষিত, কিন্তু কবিতা নয়; শস্য প্রচুর হলেই যে মরণের ভয় কেটে যায় না আজকের এই জটিল শতাব্দীতে শিশুকে এ কথা কে বোঝাবে? নীরেনবাবু হয়তো মনে করেন এ রকম কতকগুলো লাইন লিখতে পারলেই কবিতা হয়, আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আত্মঘাতী ক্লান্তির থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও উদয় হয়। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি এত সোজা নয়।

(৩) আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'র ব্যবহার করা হয়—যেমন 'ইতিহাসযানে' একআধটু করেছি—সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যে ভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা,—আধুনিক কাব্য পড়বার সময় অনেক সমালোচকই তা'

মনে রাখেন না; ফলে 'ইতিহাসযানের' জায়গায় জায়গায় যে ক্লান্তি—আত্মঘাতী কি না জানি না—সে সব কবির নিজেরই ব্যক্তিগত ক্লান্তি মনে করে ওঁরা কবিতা পাঠ করতে পারেন। কিন্তু এ রকম কাব্যপাঠ সমালোচকদের নির্ব্বিচার আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৪) জ্ঞান-বিজ্ঞানালয়ের প্রাচুর্য্য আজকাল অনেক। ওরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী, ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মালিক। কবি তা' জানে। নিজেও সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনেই চলে; না হলে সে কবি হিসেবে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু এ বিজ্ঞান প্লাকার্ড-মারা বড় বড় সাইনবোর্ড টানানো ফলিত বিজ্ঞানের নগরীর থেকে গৃহীত হয় না,—এ বিজ্ঞানকে ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির গতিপরিণতির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে স্থির করতে হয়েছে কবিমানসের ভিতর; আমি বলেছি কবিমাসসের ভিতর; সাধারণ যুক্তিবাদী মনের ভিতর উপরোক্ত গতিপরিণতির ধারা স্থিরীকৃত হয় ক্রমপরিণত জ্ঞানবিজ্ঞানে;—সমর্থন পায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির প্রচলনে; কিন্তু এই অনুরূপ মানসের সম্পর্কে এসে তা' হয়ে ওঠে কবিতা, সমর্থন পায় Vision এ, উজ্জ্বল কবিদৃষ্টির উৎসারণে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ ক'রলেই কবিতা আশাবাদী হয়ে ওঠে এ কথা মনে করা ভুল। Arnold-এর সে যুগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি ছিল, কিন্তু তাঁর কবিতা নিরাশাবাদী, অথচ facile আশাবাদের চেয়ে তা' কত উন্নত ও সংহত। মহৎ গ্রীককবিদের কাব্যে নীরেনবাবুর আশাবাদ কোথায়? Greek tragedyতে তখনকার শতাব্দীসহ পরম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-প্রতিভারই বা অভাব কোথায়? রবীন্দ্রনাথের 'শেষলেখায়' দৃষ্টিনীতি সব চেয়ে বেশি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক;—বইয়ের ১১ নং এর মহান কবিতাটি নীরেনবাবুর আশাবাদে সংশোধিত হতে পারল না; না হয়ে ভালোই হয়েছে; আমরা বিজ্ঞান কবিতা সবই পেয়েছি। Eliot অগস্ত্যের নীতি অবলম্বন করে পান করেছেন বিজ্ঞান;—দৃষ্টিরীতি অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে কে বলবে?—কিন্তু কবিতা তাঁর 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়'এর চেয়ে ঢের বড় নিরাশাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এতই তা' উজ্জ্বল ও আন্তরিক যে তাকে আশাবাদ ছাড়া কী আর বলতে পারা যায়।

আধুনিক অনেক সমালোচকই কতগুলো শব্দ, বাক্য ও শ্লোগানের দাস মাত্র, যুক্তিবিচার ও অন্তর্দৃষ্টির ধার ধারেন না। 'আশাবাদ' 'আশাবাদী মনোভাব' 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি' ইত্যাদির ছেলেমানুষী বাজারী অর্থ ঘুচিয়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট কবির সম্পর্কে—তাঁদের কবিতার প্রতিভানুষঙ্গে ব্যবস্থিত হয়ে এদের যথার্থ সত্য সংজ্ঞালাভ করা প্রয়োজন। এর মানে এ নয় যে কবিতায় ভাবপ্রতিভাই সব, বৈজ্ঞানিক চেতনা অবান্তর; তা নয়; বৈজ্ঞানিক ও অন্য নানা শ্রেষ্ঠ চেতনার ভিতর থেকেই মহৎ কবিতা জন্মলাভ করছে। সে কবিতা যদি আগামী প্রভাতের সূর্য্য সমাজ ঘোষণা করে তবে ভালই। কিন্তু এ ঘোষণা কাব্যশরীরী হয়ে এসেছে বলেই এর উৎকর্ষ; এ ঘোষণা রয়েছে, কাব্য নেই—তার কি মূল্য? এ ঘোষণা নেই, অন্য ঘোষণা রয়েছে কাব্যাত্মক হয়ে—এরও শ্রেষ্ঠ মূল্য।

জীবনানন্দ দাশ

সাময়িক সাহিত্য

গল্প

কুড়িয়ে ছড়িয়ে : প্রেমেন্দ্র মিত্র ; বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রিট, কলিকাতা ; দাম দু'টাকা।

'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম গল্পগ্রন্থ। নামেই বইটির প্রকাশনার ইতিহাস স্বপ্রকাশ : গত দু'এক বৎসরে লেখক বিভিন্ন মাসিকে, বার্ষিকে, সংকলনে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ছোট গল্প লিখেছেন আলোচ্য পুস্তকে তা-ই এক জায়গায় সংগ্রহ করা হয়েছে। 'ষ্টোভ,' 'জ্বর', 'চিরদিনের ইতিহাস,' 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা', 'চুরি', 'পিস্তল', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ও 'পটভূমিকা' এই আটটী ছোটো ও বড়ো আকারের ছোট গল্পে পুস্তকটির কলেবর পূর্ণ।

সফল গল্পরচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত লেখক। যে ক'জন লেখকের সাধনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথপরিক্রমা সুরু হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। কবিতায়, গল্পে, লঘুপ্রবন্ধে, শিশুরঞ্জন সাহিত্যে ও অন্যবিধ বিচিত্র ভাবের লেখায় প্রথম থেকেই যে কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা ভাষার তীক্ষ্ণতা নয়, প্রকাশভঙ্গির উগ্রতা নয়, ভাবের বৈপ্লবিকতা নয়, তা আটপৌরে ভাষার মধ্যে দিয়ে গূঢ়ার্থপ্রকাশের ক্ষমতা, পরিমিত বাক্যের প্রয়োগে অপরিমিত রহস্যের উদ্ঘাটনকুশলতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় বৈপ্লবিকতার স্বাক্ষর ছিল না একথা বলা হয়ত ঠিক হলো না, কেন না অবজ্ঞাত, অনাদৃত মানুষের জীবনের দুঃখবেদনার কাহিনী বাংলা সাহিত্যে যাঁদের রচনায় প্রথম স্থান পেয়েছে নানাদিক থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তাঁদের সকলের অগ্রবর্তী বলা চলে। বাংলা সাহিত্যের তদানীন্তন মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংস্কার অতিক্রম করে নিচু তলার জীবন নিয়ে লিখ্‌তে যাওয়াটাই এমন একটা দুঃসাহসের কাজ যে তাকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনার অন্তর্গত ভাব আশানুরূপ ঝাঁঝালো, আশানুরূপ তীব্র না হতে পারে, কিন্তু কবিতা ও গল্পে যে নতুন সাহিত্যিক সংস্কার তিনি প্রবর্তন করলেন (শেষোক্ত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সমধর্মী সাহিত্যিক বন্ধু শৈলজানন্দের দানও উপেক্ষণীয় নয়) তা সেই সময়ে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এসেছিলো এবং এইটেই প্রেমেন্দ্রবাবুর (এবং শৈলজানন্দের) পক্ষে সব চাইতে গৌরবের যে তাঁদের প্রদর্শিত সেই দুঃসাহসিক অভিযানের পথেই এখনও বাংলা সাহিত্যের পরিক্রমা চল্‌ছে। তাঁরা যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন ভাবের ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাকে অনেকদূর পেছনে ফেলে চলে এসেছে সেটা ঠিক কিন্তু একথা অপ্রতিবাদ্য যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাঁদের পথরেখাটাকেই দাগা বুলিয়ে অনেক মোটা করে তুলেছে, নতুন পথরেখার সন্ধান আজও সে দিতে পারে নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার বৈশিষ্ট্যের যে আভাস দেওয়া হ'লো সেটা আসলে কী বস্তু? এইখানেই এই অনন্যশক্তিধর লেখকের প্রতিভার বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনাকে সেই প্রারম্ভিক 'কল্লোল' 'কালি-কলম'-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমান অভিনিবেশের সঙ্গে আমি অনুসরণ করে আসছি। তাতে তাঁর সম্পর্কে এই একটি কথাই বরাবর সব ছাড়িয়ে আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছে যে জীবন ও জগৎকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন সেটা এমনই অদ্ভুত, অনন্যসাধারণ আর বিশেষ প্রকৃতিজাত যে তাঁর সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক অনাধুনিক কারুরও দৃষ্টিভঙ্গির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর ভাষার আটপৌরে ভাব এক এক সময় আমাদের অতিরিক্ত আধুনিকতাবিলাসী প্রত্যাশাকে ক্ষুণ্ণ করে; তাঁর রচনার দৈনিক সংযম প্রায়ই আমাদের স্থূল বাক্যের ক্ষুধা অপরিতৃপ্ত রেখে যায়; আয়োজনের আড়ম্বর ও প্রাচুর্যের প্রতি আমাদের সকলেরই মনে যে শিশুসুলভ প্রীতি লুক্কায়িত তাকে নিতান্ত উপহাস করবার জন্যেই যেন তিনি তাঁর রচনায় উপকরণবাহুল্যকে সর্বপ্রকারে ছেঁটে ফেল্‌তে বদ্ধপরিকর; কিন্তু সব জড়িয়ে তিনি তাঁর গল্পে (এবং কবিতায়) যে ভাবটি পরিস্ফুট করে তোলেন তা এমনি অনির্বচনীয় রসে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিসারী হন এবং জীবনের দার্শনিক তাৎপর্য উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবনবোধ থাকে, তা হলে তার দ্বারা আপনি অভিভূত হবেনই হবেন। লেখকের 'প্রথমা' ও 'সম্রাট'-এর অধিকাংশ কবিতা এবং 'পুতুল ও প্রতিমা', 'বেনামী বন্দর', 'মহানগর' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেকটি গল্প সম্পর্কেই আমার উপরের এই মন্তব্যটুকু প্রযোজ্য। 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে'ও তার ব্যতিক্রম নয়; তবে সেকথা পরে।

প্রেমেন্দ্রবাবু নিতান্ত কম লেখেন এইরূপ একটি অভিযোগ প্রায়শ শুনতে পাওয়া যায়: সেই অভিযোগ যে মিথ্যে তাও নয়। তবে উপরের বক্তব্যের মধ্যেই এই অভিযোগের একটি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন যে বিশেষ রস বা বিশেষ ভাবের দ্যুতি তাঁর মনের দিগন্তকে মাঝে মাঝে মাত্র উদ্ভাসিত করে তোলে, তার ভেতর ধারাবাহিকতা খুঁজতে গেলে বিফল হতে হবে। তাঁর সত্তা শুধু সৃষ্টির বেদনায় উদ্বেল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বিরল সোনালি মুহূর্তের কাছেই বাঁধা; সৃষ্টির প্রেরণাকে অভ্যাসের শাসনে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছেন তাঁদের তিনি কেউ নন। এককথায় তিনি 'মেজাজী' লেখক, mood বা মেজাজের দ্বারস্থ না হয়ে তাঁর মতো লেখকের উপায় নেই। একথার অর্থ এই যে প্রেমেন্দ্রবাবুর মনে সৃষ্টিশীলতার স্রোত নিয়ত প্রবহমান নয়; এক একটি বিশেষ মুহূর্তে এক একটি বিশেষ ভাব আবর্তের আকারে এসে তাঁর মনের রুদ্ধ স্রোতকে গতি না দিলে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সফল পরিণামের দিকে এগিয়ে যেতে পারতো কিনা সন্দেহ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রে এ না হয়ে উপায় ছিলো না। কেন না তিনি যে ধরণের গল্প বা কবিতা লেখেন তাদের প্রকৃতিটাই এমন যে মনের আকাশে ভাবের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎবিকাশের ফলেই শুধু তাদের জন্ম সম্ভব। আর যেহেতু কবিতা ও ছোটগল্প (উভয়েরই রসের প্রকৃতি অল্পবিস্তর এক) এ দুইই কম বেশি চকিত প্রেরণার মুখাপেক্ষী, সেই হেতু প্রেমেন্দ্র

মিত্রের প্রতিভা ঘুরেফিরে শুধু গল্প আর কবিতাকে আশ্রয় করেই বিকসিত হয়ে উঠ্‌তে চায়। উপন্যাস-শিল্প এই দম্‌কা হাওয়ার চঞ্চলতার অপেক্ষা রাখে না; উপন্যাস রচনায় লেখকের শক্তি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ, সঙ্কুচিত হবার বোধ করি এইটেই কারণ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার ভাবের উৎস কোথায়? বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গেই বা তাঁর কতোটা যোগ, পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই বা তিনি কতোটা প্রেরণা পেয়েছেন? এ সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর মন পশ্চিমের ধ্যানধারণার দিকেই অধিক ঝুঁকে আছে। অর্থাৎ, তাঁর চিন্তার ধাত, জীবন ও পরিপার্শ্বকে বিচার করবার প্রণালী, বিশেষ সৃষ্টির রসকে মনের মধ্যে সঞ্চারিত করবার প্রক্রিয়ায় পশ্চিমী ঢঙটাই যেন অধিক বলবৎ। ভাষা ব্যবহারে তিনি কমবেশি ঐতিহ্যাশ্রয়ী, বুঝি বা একটু গতানুগতিকতাপন্থী; গল্পের মধ্যে তিনি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন তা নিঃশেষে বাংলা দেশেরই পরিবেশ, সেখানে পাশ্চাত্য আবহাওয়ার লেশমাত্র চিহ্ন নেই কিন্তু যে বিশেষ ধরণে তিনি গল্পের রস জমিয়ে তোলেন, তাকে সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যান, সেইটে নিঃশেষে পশ্চিমী ধরণ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কোন এক প্রাণবান তীব্র অনুভূতিপরায়ণ পূর্বদেশীয় লেখকের ধরণ। ঠিক এই কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যেমন আধুনিক অনাধুনিক কোনো বাংলা লেখকেরই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি আর এক দিকে তাঁকে এই দুই শ্রেণীর অন্তর্বর্তী যোগসূত্র রূপেও বিচার করা চলে। তাঁর ভাষা, বাক্যপ্রয়োগ, শব্দের ব্যঞ্জনা রবীন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্যের অনুসারী, আবার রচনার আঙ্গিক ও ভাবের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় সংস্কারের বাহক, সেই হেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের আত্মার আত্মীয়। কিন্তু এতো সব বলার পরেও বলবো প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসংশয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রই; তাঁর সঙ্গে পুরাতন বা নবীন কারও তুলনা করতে যাওয়া ভুল।

পূর্বে গ্রন্থকারের চৈনিক সংযমের কথা উল্লেখ করেছি, এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখার আর একটি লক্ষণের উল্লেখ করতে হয় চৈনিক সংযমের সূত্র ধরে যাকে বলা যায় চৈনিক জ্ঞানের সংস্কার। আমার মনে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটি জ্ঞানবৃদ্ধ লুকিয়ে আছে যা তাঁর রচনাকে প্রগলভ হ'তে দেয়না, প্রতি পদে রাশ টেনে ধরে। বাংলার আধুনিক সাহিত্যিকদের পথপ্রদর্শক তিনি—তাঁর পক্ষে উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত হওয়ার পথে কোনোই বাধা ছিল না, বরং সেটাই তাঁর পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক হতো—কিন্তু তাঁর বৃদ্ধজনোচিত সংস্কার তাঁকে আশ্চর্যভাবে অতিরিক্ত ভাষণপ্রিয়তার হাত থেকে রক্ষা করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সত্যই জ্ঞানবৃদ্ধ এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে আছে সেই বৃদ্ধের সংস্কার, চিন্তাশীলের সংস্কার, যা সর্ব্বপ্রকার মুখর কলরবের বিরোধী, কাজেকাজেই ভাষার ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠ।

রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেরণার মুখাপেক্ষী সেকথা আগে বলেছি। এর যা দোষগুণ সবই তাঁর লেখায় বর্তমান। যে সমস্ত রচনায় mood বা মেজাজের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়না, কতকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করলেই চলে, সেইখানে আর আমরা সৃষ্টিকুশল প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পাইনা, পাই নিতান্তই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। সেইখানে রসপরিবেশনে তাঁর মন নেই, সাধারণ পাঠকের উপযোগী ঘটনার ভিত্তিতে গল্প তৈরী করাতেই তাঁর আনন্দ। যেমন তাঁর

সিনেমার গল্প। সাহিত্যের প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সিনেমার প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে কী আকাশপাতাল প্রভেদ! সিনেমায় তিনি গণমনতোষণকারী গতানুগতিক লেখক; সাহিত্যে তার উল্টো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভা নিঃশেষে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকের প্রতিভা; সিনেমা-শিল্প তাঁর মেজাজের পরিপন্থী।

আশঙ্কা হয়েছিল সিনেমা তাঁকে গ্রাস করবে, কিন্তু 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' পরে দেখা গেলো তিনি আশ্চর্যভাবে নিজের সাহিত্যিক সত্তা আজ পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে পেরেছেন। কালিকলমের সাহিত্যই যে তাঁর স্বধর্ম এইটেতে সে-কথার আরো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গেলো।

'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' বইতে উৎকৃষ্ট ছোট গল্প চারটি: 'ষ্টোভ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'চুরি' ও 'পিস্তল'। এই চারটি গল্পের রস ও প্রকৃতি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 'ষ্টোভ' গল্পের গঠনে ঘটনাবিন্যাসের চাইতে মনের সূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পরিমিত বর্ণনার সাহায্যে একটি বিশেষ ভাবকে গল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ষ্টোভ' অনবদ্য। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটি যখন বিগত বৎসরের 'শারদীয়া যুগান্তর'-এ প্রথম প্রকাশিত হয় এই নিয়ে পাঠকমহলে কিছু সাড়া পড়েছিল। গল্পটি নতুন কায়দায় লেখা অনেকটা চিত্রনাট্যের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু যাঁদের চোখে এর টেকনিকটাই শুধু ধরা পড়েছিলো তাঁদের কাছে এর সৌন্দর্য অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে বলে মনে হয়। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের সব চাইতে প্রশংসনীয় বিষয় হলো তার atmosphere, তার বলবার ভঙ্গি নয়। 'Far from the madding crowd' কথাটার যদি কোন স্পষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ মনে করা যায় তো সে এই তেলেনাপোতা গ্রাম। প্রসঙ্গত 'ভদ্র' নাগরিক জীবনের লঘুচিত্ততা ও হৃদয়হীনতাকেও লেখক সূক্ষ্ম আভাসে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি।

'চুরি' গল্পটিতে একজন সামান্য দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের সাংসারিক দুর্গতির চিত্র আঁকা হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তু, ততোধিক আটপৌরে ধরণের লেখা। কিন্তু আমার মনে হয় 'চুরি' গল্পটিই এ বইয়ের সার্থকতম গল্প। যে বিবেকবান প্যারীবাবু পানওয়ালা ফেরৎ দেবার সময় দুটি পয়সা ভুলে বেশি দিয়ে ফেলেছিল বলে সেটা ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন নানা অবস্থা-বিপর্যয় অন্তে তাঁরই ছোট ছেলে যখন পাশের বাড়ি থেকে না বলে জিনিষ নিয়ে এলো, ছেলেকে মারবার জন্যে হাত উঠাতে গিয়েও তিনি হাত উঠাতে পারলেন না—এতে ছেলের চুরির গ্লানির চাইতে আজন্ম সত্যনিষ্ঠ প্যারীবাবুর মনুষ্যত্বচুরির গ্লানিটাই পাঠকের চোখে বড়ো হয়ে ফুটে ওঠে। (প্রকাশকের প্রতি নিবেদন: আমার বইটিতে 'চুরি' গল্পের পানওয়ালা সম্পর্কিত ঘটনাটি নেই, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখে মনে হলো ও অংশটুকু ভুলে ছাপা হয়নি, সমস্ত বইতে এই ভুল ঘটে থাকলে সেটা অবিলম্বে সংশোধনীয়—আমি গত শারদীয় সংখ্যা 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত গল্পের মুদ্রণের উপর নির্ভর করে পানওয়ালার প্রসঙ্গের উল্লেখ করলুম। সেই সঙ্গে বইটিতে যে অজস্র বানান ভুল আছে তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।) 'পিস্তল' গল্প ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার বিশেষ একটি দিকের মর্মন্তুদ চিত্র দুর্ভিক্ষের জোয়ারে ভেসে-আসা সমাজের উচ্ছিষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল বেনামী ছেলেমেয়ের দঙ্গলের নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ততোধিক নিপীড়ন কাহিনী।

'জ্বর' গল্পটির টেকনিক লক্ষ্যনীয়। 'চিরদিনের ইতিহাস' গল্পে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

দুর্বিপাকের ইতিহাসটি প্রচ্ছন্ন। 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা' উপভোগ্য কিন্তু সাধারণ। 'পটভূমিকা' এই বইয়ের সব চাইতে বড়ো ছোটগল্প। নামানুযায়ী গল্পটিতে পল্লীর পটভূমিকাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু গল্পের কোন সুপরিকল্পিত শিল্পসম্মত পরিণতি চোখে পড়লো না; কাহিনীর পরিসমাপ্তিটুকু নিতান্ত আকস্মিক। তবে গল্পটিতে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ ভগ্নদশাগ্রস্ত বাংলার পল্লীজীবনের একটি সার্থক চিত্র পাওয়া গেলো।

নারায়ণ চৌধুরী

নতুন দিনের কাহিনী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য (প্রকাশক—পূর্বাশা লিঃ; দাম দুই টাকা।)

সাহিত্যের চিরাচরিত সীমানাকে অস্বীকার করে যে কয়েকজন সাহিত্যিক তাকে জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার পিছনে যে একটি প্রগাঢ় সমাজচেতনা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সমাজকে অস্বীকার করে সাহিত্যের যে উন্মার্গযাত্রা এখনো মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়, ভাষার দিক থেকে তা যতই না কেন ফুলঝুরি কাটুক, সেই অমূলতরুকে সাহিত্য বলে স্বীকার করে নিতে যে কোন আধুনিক মনই দ্বিধাগ্রস্ত হবে সন্দেহ নেই। 'আর্ট ফর আর্টস্ স্তেক'-ওয়ালাদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও। মোট কথা, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহিত্যও যদি অগ্রসর না হয়ে আসে, যদি তার পরিবর্দ্ধনশীল ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে অক্ষম হয়, তা হলে সেই অর্কিড-সাহিত্যকে অবান্তর বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নেই।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয়েকজন সাহিত্যিক এই সমাজপ্রগতির ছন্দকে নিঃসংশয়ে চিনে নিয়ে সাহিত্যের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতম। তাঁর সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ 'নতুন দিনের কাহিনী' এই মন্তব্যকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবে।

একটু আগেই বলেছি যে সাহিত্যকে নিজের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সমাজপ্রগতির ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে। এইটেই সাধারণ নীতি। কিন্তু এই সাধারণ নীতির উর্দ্ধেও কেউ কেউ উঠতে পারেন। সমাজবোধ তাঁদের সাহিত্যের উপরে যে পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যও ঠিক সেই পরিমাণেই প্রভাব বিস্তার করে সমাজমানসের উপরে। সমাজমানসের ধারাবাহিক বিস্তারের পিছনে এঁদের দান অনেকখানি কাজ করে যায়।

'নতুন দিনের কাহিনী'র যে কোনও গল্প বেছে নিয়ে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা যেতে পারে। একটি নতুনতর পথে বাঁচবার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বইখানির সর্বত্র। এই আশাবাদী মনোভাবের অধিকারী বলে, স্বভাবতই, সঞ্জয়বাবু মানুষের সমস্ত অসহায়তা, সমস্ত বিপর্যয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও একটি পথ উন্মুক্ত থাকে, সমস্ত গান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আরো একটি গান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই মনোভাবের অধিকারী বলেই ব্যর্থপ্রেমের হতাশাকে শেষ পর্যন্ত কোথাও তিনি 'Voluptuous irresponsibility'তে পর্যবসিত হতে দেননি। মানুষের সমস্ত সুখ দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন যে 'নিস্পৃহ জীবনস্রোতে'র কথা বলে গেছেন টমাস হার্ডি, আমাদের সাহিত্যে তার ক্রিয়া যখন বড় বেশীরকম মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই দুঃসময়ে এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হতাশামূলক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে যা বললাম কেউ কেউ হয়তো তার বিরোধিতা করবেন; বলবেন, স্বর্গরাজ্য অত অনায়াসলভ্য নয়। নিশ্চয় নয়। এবং নয় বলেই বিপর্যস্ত মানবজীবনকে সেই স্বর্গরাজ্যের স্পর্শ গ্রহণ করবার সুকঠিন দায়িত্বের একটি বিরাট অংশ সাহিত্যিককে গ্রহণ করতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণিত হবার পরে বহু লেখকের রচনায় যে হতাশাবাদ এবং ধোঁয়াটেপনা ফুটে উঠতে দেখেছি, তার পুনরাবৃত্তি হতে দেখলে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। যে সমস্ত সহজাত প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের অবচেতন মনের পিছনে আজও কাজ করে যাচ্ছে এই দিশেহারা মনোবৃত্তিকে তা হয়তো অনেক পরিমাণে উৎসাহিত করে তোলে, কিন্তু তাই বলে সামাজিক পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করে, রুগ্ন জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলবার দায়িত্বকে অস্বীকার করে, এই প্রাকৃতিক শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকবো আমরা, এই বা কেমন কথা?

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে দিয়ে এই সত্যই নিঃশেষে ফুটে উঠেছে যে লেখক সেই দায়িত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। 'নতুন দিনের কাহিনী'র দ্বিতীয় অংশে লেখক প্রাগৈতিহাসিক জীবনের যে দুর্বার সংজ্ঞা খুঁজে ফিরেছেন তার বলিষ্ঠতায় বিস্মিত হতে হয়। সভ্যতার চাপে পড়ে যে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির একটি শীর্ণ আভায় পর্যবসিত হয়েছে, এই অংশের গল্পগুলিতে আচমকা তার হৃতশ্বাস জীবনযাত্রার পাশে প্রাগৈতিহাসিক দিনের এক বেপরোয়া প্রতিনিধিকে তুলে ধরেছেন তিনি। সমাজব্যবস্থার দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে নয়, তার সঙ্গে সেই আদিম জীবনযাত্রার লুপ্তপ্রায় শোণিত-সম্পর্ক খুঁজে নেবার জন্যে। এই বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের স্পর্শে প্রত্যেকটি গল্পই মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

সঞ্জয়বাবুর রচনা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকসমাজের একটি অভিযোগ ছিল। তাঁর প্রাক্-'রাত্রি' গল্পরচনায় মননশীল প্রতিভার যতখানি পরিচয় পাওয়া গেছে—হৃদয়বৃত্তির পরিচয় ঠিক ততখানি হয়তো পাওয়া যায়নি। 'রাত্রি' উপন্যাসে এই মস্তিষ্কের মোড়ক থেকে যে প্রগাঢ় হৃদয়াবেগ আত্মপ্রকাশ করেছিলো 'নতুন দিনের কাহিনী'তেও তার সংবেদনশীলতা অব্যাহত।

আর কিছু না হোক, জীবনের একটি সুস্থ হাস্যোজ্জ্বল সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তিনি। জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তার দাম বড়ো কম নয়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপন্যাস :

মন্ত্রমুখর—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান : প্রগতি প্রকাশনী—২৲

বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে স্বাক্ষর রেখে গেছে তা যে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকেই স্মরণীয় হয়ে রইলো তা নয়, সে আন্দোলন, সমগ্র দেশের সামাজিক অবস্থাকে পর্য্যন্ত সেদিন এমন একটা বিপ্লবমুখী বাঁকের পথে এগিয়ে দিয়ে গেছে, যে পথের প্রান্তিক দিশারু লাভের আশায় আজো ভারতবর্ষের নরনারী মুক্তিমন্ত্রের ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারণ করে এগিয়ে চলেছে। সমাজ মানসের প্রতিবিম্ব পড়ে সাহিত্যে, এ কথাটা আজ সর্ব্ববাদীস্বীকৃত সত্য বলে গণ্য

হয়েছে। তাই, সামাজিক বিবর্ত্তনধারার ছোটোখাটো ঘটনাও যখন ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যরূপ পেয়ে ঐতিহাসিক প্রতীকরূপে ভবিষ্যৎ সমাজের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেছে, তখন এতবড় একটা আন্দোলন যা একদিন সমগ্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে উদ্বেলিত, উন্মুখ করে তুলেছিলো, বলদর্পীর আঘাতে অল্পকালের মধ্যেই দমিত হয়ে গেলেও, তা যে সমসাময়িক সাহিত্যিকের চোখে একটা বড় সাহিত্যবস্তুরূপে দেখা দেবে, তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

নারায়ণবাবুর 'মন্ত্রমুখর' সেই বিরাট আন্দোলনেরই এক টুক্রো সাহিত্যরূপ। শহরের পরিচয়কে সম্বল করে তিনি মফস্বলকে নিয়ে কল্পনাবিলাস করতে বসেননি, বাস্তব পরিচয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমস্ত বইটিতে। এই আন্তরিকতা আছে বলেই নারায়ণবাবুর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, লোকচক্ষুর প্রায় অন্তরালবর্ত্তী কোনো এক অখ্যাত শহরের বিপ্লববার্ত্তা আমাদের কাছে, যারা দৈনিকের মারফত মফস্বল-সংবাদ আহরণ করি, এমন স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।

সরকারের করুণাসিক্তস্নেহধন্য কোনো এক প্রখ্যাত শহর নয়, অবসন্ন মিউনিসিপালিটির অযত্নপালিত একটি ছোট্ট স্থান, নাম তার নিশ্চিন্তনগর। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়েছিল শহরটা। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগষ্ট সিদ্ধান্তের ফলে বন্দী হলেন নেতারা। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো দেশময়, তারই এক কণা স্ফুলিঙ্গ গিয়ে ছিটকে পড়েছে সেই বিবর্জিত শহরের বুকে। কিন্তু সমগ্র দেশের বিপ্লবকে যারা দমন করে ফেলতে পেরেছে অনায়াসে নিশ্চিন্তনগরে তাদের পদচিহ্নটুকুইতো যথেষ্ট।

এ ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিচয় সেদিন পেয়েছিল অনেকেই, কিন্তু একে আশ্রয় করে নারায়ণবাবু আর একটি অলক্ষিত ঘটনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। যাদের খবর আমরা কেউ কখনো রাখি না, যাদের সুখদুঃখের কথা আমাদের কাছে একান্তভাবেই প্রশ্নের অতীত, সেইসব অশিক্ষিত অসভ্য চাষাভূষার দলও যে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, 'বন্দেমাতরম' বলে নিঃশঙ্কচিত্তে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এগিয়ে যেতে পারে এবং এই ব্যাপক আন্দোলনে যে তারা কতখানি আত্মত্যাগ করেছে আমরা তার কতটুকু সংবাদ রাখতে পেরেছি দৈনিক পত্রিকা খুঁটে খুঁটে? নারায়ণবাবু শুধু আমাদের কাছে সেই মহৎ আত্মবলিদানের এক টুকরো খবর পৌঁছে দিয়েছেন। এমন কত যে 'রঙীর ঘাট' আর 'ভাতারমারীর মাঠ' সেদিন রক্তাপ্লুত হয়ে গিয়েছিল সে খবর কে রাখে।

নারায়ণবাবু ইতিমধ্যে অনেক গল্প এবং উপন্যাস লিখে পাঠকসাধারণের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে গেছেন সুতরাং এখানে তাঁর রচনার ধরণধারণ বিচার করতে যাওয়া অনাবশ্যক। বিষয়বস্তুর বিচারে 'মন্ত্রমুখর' নতুন করে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সদাজাগ্রত সমাজ-চেতনার পরিচয় দেয়। দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতায় তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক হলেও প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলদেরও মনের খবর যে তিনি ভালোমত রাখেন, এখানে তারও প্রমাণ মেলে। উকীল পূর্ণবাবু, স্কুল-মাষ্টার রমাপদবাবু বা অকাটমূর্খ সার্কেল অফিসার বিনোদবাবু—বড় বড় যুক্তিতর্কের অন্তরালে এঁরা আসলে যে কী, তা সূক্ষ্মদৃষ্টি লেখকের অজানা নেই। চরিত্রচিত্রনের দিক থেকে শুধু এক'জন মাত্রই নয়, প্রায় সব কয়টি চরিত্রই সার্থক হয়েছে।

'মন্ত্রমুখর' পাঠকমনকে মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই, তবু একটা কথা বলা দরকার। নারায়ণবাবুর বর্ণনা সুন্দর হলেও মাঝে মাঝে তা এত বেশী প্রলম্বিত হয়ে গেছে যে তাকে প্রায় অনাবশ্যক বলে মনে হয়। উপন্যাসে বর্ণনার সুযোগ থাকলেও সেখানে যোগসূত্রহীন বর্ণনাবাহুল্য যে অবান্তর হয়ে ওঠে লেখক তা স্বীকার করবেন আশা করি। অনিল চক্রবর্ত্তী

হাওয়ার নিশানা : চিত্তরঞ্জন রায় (প্রাপ্তিস্থান, বেঙ্গল পাবলিশার্স ; মূল্য ৩৲)

'হাওয়ার নিশানা' বিশ্লেষণপন্থী উপন্যাস। এই জাতীয় উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—মধ্যবিত্ত মানুষদের গার্হস্থ্যজীবনেতর সত্ত্বা অনুধাবনের ঝোঁক—লেখক কতকপরিমাণে আয়ত্ত করেছেন। চরিত্র-গুলির ধীশক্তি অতিসাধারণ নয় আবার অতি-অসাধারণও নয়। নানাধরণের আইডিয়ার সঞ্চরণে এঁদের মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই আচ্ছন্ন মন নিয়ে এঁরা পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছেন।

এই পারিপার্শ্বিকের আর্টে লেখক এখনও সিদ্ধহস্ত হতে পারেন নি। মানসিক প্রক্রিয়ার সংগে পার্থিব ঘটনার যথাযথ সংযোগের অভাব লেখকের দুর্বলতার পরিচয় দেয়। এই জাতীয় উপন্যাসে এই দুইজগতের পারস্পরিক অসংযোগ গুরুতর অপরাধ।

ঠিক এই কারণেই মনে হোল উপন্যাসটি যেন সফল হ'তে হ'তে কোথায় আটকে গেছে। চরিত্র ও সিচুয়েশ্যন্-এর সংযোগ দুর্বল বলে অনেক সময় মনে হতে পারে, চরিত্রগুলি শূন্যমনে যেখানে যাচ্ছে, যা' করছে তার মধ্যে খেয়ালীপনা ছাড়া অন্য কোন আকর্ষণীয় বৃত্তি যেন কাজ করছে না। (দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুপমের ফ্যাক্টরীতে চাকুরী গ্রহণ, তারপর যুদ্ধে যোগদান এবং বিকাশকে লক্ষ্য করে অপরিণত উচ্ছ্বাসের উল্লেখ করা যায়।) বিচ্ছিন্ন ঘটনার আলোছায়ায় 'অন্ধ' চরিত্রগুলি খাপছাড়াভাবে যেন পথ কেটে কেটে চলেছে। এইসব ঘটনার মূলে লেখকের নিছক লিখনস্পৃহা ছাড়া অন্য কোন স্বাস্থ্যকর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অত্যন্ত বিলোড়নকারী আইডিয়া-মূলক মনোবিশ্লেষণপ্রধান উপন্যাসে এই ধরণের বিশৃঙ্খল ঘটনা-সমাবেশ স্বাভাবিক (যথা, Aldous Huxleyর Point Counter Point.)। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, শক্তিশালী বিশ্লেষণকৌশল এবং প্রসারশীল ও তীক্ষ্ণ মনীষা না থাকলে এই ধরণের টেক্‌নিক 'গরীবের ঘোড়া রোগে'র মত মারাত্মক হ'তে পারে। লেখকের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। উপন্যাসটির স্থানে অস্থানে পুস্তকচর্বিত আইডিয়ার যে বিরক্তিকর কালোয়াতি দেখাবার চেষ্টা হয়েছে তা' না থাকলে উপন্যাসটি উন্নততর হতে পারতো। আশা করি, আগামী উপন্যাসে লেখক এই দোষ ঝেড়ে ফেলে আশাজনকভাবে পরিণতি দেখাবেন। রবি চক্রবর্তী

প্রবন্ধ :

সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পূরবী পাবলিশার্স—৩॥০

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়—॥০

প্রগতি-সাহিত্য বা সাহিত্যে প্রগতি বলে একটা বেশ গালভারী কথা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রগতি কি বা তার লক্ষণ কি সে সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ না হোক অন্ততঃ অভিজ্ঞ নন্। অনেকের ধারণা গণ-চেতনা-সম্ভূত কোনো রচনা হলেই তাকে প্রগতি-সাহিত্য

বলে অভিহিত করা চলবে। কিন্তু তাই কি ঠিক? সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও বিবর্তন চলে। শ্রীযুক্ত ভূপেন দত্ত বলেন, 'প্রগতি আপেক্ষিক বস্তু।' তার অর্থ অগ্রসরমান সামাজিক অবস্থাকে কোনো এক বিশেষ কালের সাহিত্য ধরে রাখতে সক্ষম নয়, এবং সাহিত্য বহু ধারায় প্রবাহিত হলেও যা সমাজ-সভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রতীত হবে তাই হবে 'প্রগতিমূলক'। সে সঙ্গে একথাটাও সত্য যে সমাজ-ব্যবস্থা স্থানভেদে এক নয়, সুতরাং সাহিত্যে প্রগতি বলতে শুধু কালভেদেই নয়, স্থানভেদেও তা আপেক্ষিক বুঝতে হবে। রাশিয়ার গণ-অভ্যুত্থান তার সমাজ-জীবনকে এমন এক স্তরে নিয়ে এসেছে, যেখানে আর রাজারাজড়ার দুটো মুখরোচক গল্প বলে বা পেলব-মধুর দুটো বিরহ-মিলন গাঁথা গেয়ে মন ভেজানো সম্ভব নয়। কিন্তু এমন দেশও কি নেই, যে দেশ আজও রাশিয়ার মত প্রত্যক্ষভাবে গণজাগরণের সম্মুখীন হয়নি? সে দেশের সাহিত্যের কি তবে স্থিতাবস্থা? তা যে নয়, তা যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করবেন।

ভূপেনবাবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাই সাহিত্যে প্রগতির সন্ধান করেছেন। ইতিহাস শুধু ঘটনা বলে না, বলে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশকাহিনী এবং এইজন্যেই 'সাহিত্যের মধ্যেই সমাজতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।' সেই সঙ্গে ভূপেনবাবু বিশেষ করে এই কথাটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সমাজপটের বিবর্তন অর্থনৈতিক কারণেরই ফল। এবং সমাজজীবনে যে উত্থান-পতন তার অন্তর্নিহিত হেতুটিকে খুঁজতে গেলে এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটিকে ভুলে গেলে চলবে না। তাই সাহিত্যকে সমাজপটের প্রতিবিম্ব বলতে হলে, তার পটভূমিকার এই ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে (Historical materialism)কেও মেনে নিতে হবে। তা যদি সম্ভব হয় তবে কালভেদে এবং স্থানভেদে সাহিত্যের প্রগতি কেমন করে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা ধরতে পারা সহজ হবে। তা হলে দেখা গেলো, সমাজকে পাবো তার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়ে, আর যে সাহিত্য হবে এই বিশ্লেষিত রূপের প্রত্যক্ষ প্রতীক তাকেই বলা চলবে প্রগতি সাহিত্য। ক্লাসিক-সাহিত্য, বুর্জোয়া-সাহিত্য বা গণসাহিত্য—এ সবই গড়ে উঠেছে সমকালীন সমাজকে আশ্রয় করে। সুতরাং, সামাজিক অগ্রগমনের ফলে একটা দেশের সাহিত্য যদি এক পা এগিয়ে যায় এবং তাকেই প্রগতি মনে করে আর একটা দেশ স্বকীয় সমাজধারাকে অস্বীকার করে যদি লাফ দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়, তবে সে সাহিত্যে প্রগতি পাবো না, পাবো আর্টিফিসিয়ালিটি।

এই বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে আশ্রয় করেই ভূপেনবাবু বাংলা, হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যে প্রগতির লক্ষণ বিচার করেছেন। ইতিপূর্ব্বে, যদ্দূর জানি, ঠিক এই ধারায় সাহিত্যের সমালোচনা বাংলা-ভাষায় আর কেউ করেন নি। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস নামে এর আগে কিছু কিছু রচনা হয়েছে বটে, কিন্তু তা হয়েছে নিছকই ইতিহাস, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার নয়। তাতে সন তারিখ পরম্পরায় একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় বটে কিন্তু সাহিত্যের নিরিখে যে সমাজপটের প্রকৃত স্বরূপটি পাওয়ার আশা করি তা থাকে প্রায় অজ্ঞাতই। এদিক দিয়ে ভূপেনবাবুর 'সাহিত্যে প্রগতি' পথিকৃৎ আখ্যা-লাভের দাবী করতে পারে সন্দেহ নেই। তবু একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। লেখকের একটা ত্রুটী বড় স্পষ্ট হয়ে পাঠকের চোখে পড়া স্বাভাবিক, সে তাঁর অতিকথনদোষ। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে এমনিভাবে ইতিহাসের

ধারাবাহিকতা বলে গিয়েছেন যে মনে হয়, আসল বক্তব্যের খেই বুঝি তিনি হারিয়ে ফেলছেন। সেই সঙ্গে লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকদের পক্ষ থেকে আর একটি ছোটো নালিশ আসা স্বাভাবিক। ব্যবহারিক প্রয়োজনের খাতিরে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আজকাল বাঙালীরা কথ্য বা সাহিত্যিক হিন্দীভাষার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়ে গেছে, কিন্তু সাহিত্যিক উর্দ্দু ভাষাতো তাদের কাছে ততখানি পরিচিত নয়। তাই সমালোচক যখন প্রামাণ্য হিসেবে মূল সাহিত্য থেকে পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধৃত করেন, তখন কি তাঁর উচিত ছিলো না, হিন্দী না হোক অন্ততঃ উর্দ্দু রচনার বাংলা তর্জ্জমা দিয়ে দেওয়া? আসল বক্তব্যটাই যদি স্পষ্ট করে বুঝতে পারা না গেলো তবে তাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবো কি করে?

সব শেষে এ সত্য কথাটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। সাহিত্যকে 'শাশ্বত ও সনাতন' বলে যে উন্নাসিক সাহিত্যরথিরা চোখ বুঁজে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ-সাপেক্ষ বাস্তব সমাজচেতনাকে নির্ব্বিঘ্নে অস্বীকার করে সাহিত্যে আতীন্দ্রিয়বাদ বা শুদ্ধ আদর্শের সন্ধান করে বেড়ান, 'সাহিত্যে প্রগতি' পড়ে তাঁরা হয়তো বিরক্তি বোধ করবেন, কিন্তু যাঁরা প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎকে স্বীকার করেন, যাঁরা মানেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্যকে বিচার করা অসম্ভব, এই বই তাঁদের কাছে মূল্যবান বলে স্বীকৃত হবে।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর 'সংস্কৃত সাহিত্যের কথা' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের আর একটি নতুন বই। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের উদ্দেশ্য আজ আর কোনো শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অবিদিত নেই এবং সেদিক থেকে এই নবতন পুস্তকটি সেই উদ্দেশ্যের সার্থকতা যে রক্ষা করতে পেরেছে তা নিঃসন্দেহ। এত অল্প কথায় এমন একটা বিরাট সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন সংবাদ বিতরণ করা যে যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে সহজ নয় তা আশা করি যে কেউ স্বীকার করবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আগাগোড়া এমন একটা সহজ সুন্দর ভাষায় এবং সাবলীল ধারাবাহিকতায় লেখক সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন যে মনেই হয়না, এতবড় সাহিত্যের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত কোনো এক পণ্ডিতব্যক্তির সত্যিকারের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেলাম। পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই বলেই বোধ হয় এমন একটা কঠিন কাজ লেখক এত সহজে সমাধা করতে পেরেছেন। অতি অল্প কথায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা কিছু জানতে চান এ বই থেকে তাঁরা অনেক সাহায্য পাবেন।

অনিল চক্রবর্ত্তী

চিত্র-পরিচয়

তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা

২৪ পরগণার নারকেলবেড়ে গ্রামে, তিতুমিঞা বা তিতুমীর নামে একজন ওহাবী নেতা আঠারো শতকের শেষভাগে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কোম্পানীর গোরা সৈন্যকে প্রতিরোধ করবার জন্য অদ্ভুত কৌশলে বাঁশের কেল্লা তৈরী করে লড়াই করে। এই লড়াইয়ে প্রথম কোম্পানীর পদাতিক সৈন্যদের হার হয়। পরে কোম্পানীর গোলন্দাজ সৈন্য এসে তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা দখল করে।



পূর্ব্বাশা | ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ | চিত্রাধিকারী :
শ্রাবণ—১৩৫৩ | | জাতীয় প্রদর্শনী

পূর্ব্বাশা

নবম বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ • ১৩৫৩

বিপ্লবের কথা

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমরা ও তাঁহারা

(নতুন স্তবক)

মধ্যে কয়েক বৎসর কংগ্রেস সরকারের চাকরী করলাম। তাকে অবশ্য ঠিক চাকরী বলে না, তবে কিনা বাঙালী, তাই কথাটা কলমের মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল। আমার কাছে ঐ তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার মূল্য আধ্যাত্মিক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কর্মের স্পৃহা সুপ্ত থাকে, এবং যাঁরা সুযোগ পেল তাকে জাগাতে, তারা গেল বেঁচে। মাষ্টারদের ঐ বিপদ, তাঁদের কপালে সুযোগ জোটে না। অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, দুটোই নিবৃত্তিমার্গের অভ্যাস, সেই জন্য তাঁদের কর্মপ্রবৃত্তিটা ফুটে ওঠে ছাত্র ও স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে। এমন মাষ্টার দেখিনি যিনি ক্লাশে ও বাড়ীতে ডিকটেটার নন, একমাত্র যাঁর গৃহিণী ডিকটেটার তিনি ছাড়া। তাই স্বভাবের ভারসাম্য খুঁজে পেলাম যখন হাতে যৎসামান্য হলেও প্রকৃত কর্তৃত্ব এল।

ব্যক্তিগত দায়িত্বজ্ঞান মিশেছিল স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদের সঙ্গে। সে মিশ্রণের তুলনা নেই। তার মোহে নবাব হয় পরিশ্রমী, বোকা হয় বুদ্ধিমান, মেয়েলী মানুষ হয় পুরুষ, কোলকুঁজো দাঁড়ায় খাড়া হয়ে, কাঁধের পেশী মাথাটাকে তুলে ধরে, আর মুমূর্ষুর চোখে আসে দীপ্তি। খানিকটা প্রথম যৌবনের প্রেমে পড়ার মত। আফশোষ এই, বাঙলা দেশে

জনসাধারণের মধ্যে এ অবস্থা আসে নি। এই অব্যক্ত আনন্দের আভাস যখন তারা পাবে তখন যে-সাহিত্য, যে-সঙ্গীত, যে-চিত্র তারা রচনা করবে তার তুলনায় গত একশ বছরের গড়পড়তা কৃতিত্বটা ছেলেমানুষী ঠেকবে। আমার একান্ত বিশ্বাস যে ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে বহু মহামান্য ব্যক্তি জন্মালেও ঐ স্বাধীনতার আস্বাদের অভাবে তাঁদের প্রতিভার যথোচিত স্ফূরণ হয়নি। কল্পিত স্বাধীনতা দিয়ে কতটাই বা সম্ভব? দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সেই কারণেই আবার আমাদের অনেক মহারথীরা এমন সব প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন যেখানে তাঁরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাটাও অর্ডিন্যান্স্। আমাদের যুগেই তার দৃষ্টান্ত একাধিক, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও আশুবাবু যাঁর আশ্রম ছিল আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়। তাঁদের একাধিপত্য স্বভাবের তাগিদে নয়, স্বাধীনতারই অভাবে। আমি মজ্জায় মজ্জায় কথাটা বুঝলাম গত কয়েক বৎসরে। ষাট টাকা মাইনের কেরাণী সুবিধা ও সাহস পেলে যোগ্যতার সঙ্গেই বড় অফিসারের কাজ করতে পারে। কংগ্রেসের চাকরী করে মানুষের ওপর আমার বিশ্বাস এসেছে। পোড়া বাঙলাদেশ কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল। কবে তার ভাগ্য ফিরবে কে জানে! একটা আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সেখানে, কেবল মন্ত্রীচক্রের ওলট-পালটে চলবে না। প্রায় পঁচিশ বৎসর প্রবাসে কাটালাম, তবু যেন বাঙলার কথা ভুলেও ভুলতে পারি না। বেঙ্গলী ক্লাবে দুর্গা পূজার দিনগুলিতে বহু বাঙালীর সমাগম হয়, কিন্তু ঠাকুরের সামনে যেতে আর ভাল লাগে না। গত বৎসর বিজয়া সম্মিলনীতে যাই একবার। পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেওয়া গেল। ছুটি ছাটার দিন আজকাল তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। বোধ হয় আড়ষ্টতা একটু ভেঙেছে। গত রবিবার সন্ধ্যার সময় তাঁরা এসেছিলেন, নানা কথাবার্ত্তা চলেছিল। কফিটা মন্দ হয় নি।

তাঁহারা-- ঘুম নষ্ট হয়না অত কফি খেলে?

আমি—অত কোথায় দেখলেন? য়ুনিভার্সিটির সবাই প্রচুর মনে হয় আপনাদের কাছে, জানি। তলব, সম্মান, ছুটি, থাকবার আরাম সবই আমাদের বেশী, কফিও খাই বেশী। পেয়ালা বড় অবশ্য। কিন্তু বৃহৎ সংস্করণে আপত্তি থাকা উচিত নয় আপনাদের মতন দেশপ্রেমিকের পক্ষে। ভারতবর্ষে সবই বৃহৎ; ভূমার রাজত্বে অল্পে সুখ নেই; উপনিষদ থেকে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, ইতিহাস, পোকামাকড় ম্যায় সাপ পর্য্যন্ত। আমি পাঁচ হাত গোখরো দেখেছি।

তাঁহারা—কিন্তু অন্নের বেলা? অত কমে মানুষ বাঁচে?

আমি—আরেকটি বৃহৎ সভ্যতাকে বাদ দিন। চীনদেশে ঘাস খেয়ে বহুলোক বেঁচে আসছে। কিন্তু কম ভাতই বা ভাবছেন কেন? কতদিন ধ'রে দেশ কম ভাতে চালাচ্ছে

দেখুন না? মুঠো কম, দম্ কচ্ছপের। ভূমা, ভূমা, ভূমা, তাই স্বাধীনতা আসতে প্রায় শতখানেক বছর লাগল, সেই সন সাতাওয়ান আর আজ ছেচল্লিশ! ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত। বুড়ি ঠাকুমা শ্বাসই টানতে লাগলেন তিন দিন ধরে। ওধারে মহেঞ্জদারো, হারাপ্পা ইতিহাসকে টেনে ফেললে তিন চার হাজার বছরের ওধারে। তাতেও আমরা অনেকে আবার খুশী নই। লক্ষ শ্লোকের মহাকাব্য আমাদের, দেবীদের আবার এক এক ডজন মূর্ত্তি, এক একটির হাতই বা কত, সেনা অক্ষৌহিণী, হাতি লক্ষ লক্ষ, রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক! মেয়েদের গয়না সংখ্যাতীত, চুল পড়ে ত' পড়ে গোড়ালিতে, আর নিতম্ব, বক্ষ সব যক্ষিনীর, মানুষের নয় মশাই। এটা বলবেন অনার্য্য সভ্যতার দান? বেশ, আমাদের সংস্কৃতির কোন অংশটা আর্য্য? সংস্কৃত সাহিত্য? এক মৃচ্ছকটিক, কিংবা ঐ রকম দুএকটা প্রাকৃত ঘেঁষা বই ছাড়া কোন্ কেতাবে অতিশয়োক্তি নেই? আমাদের সবই সাতিশয়, বক্তৃতা, কফির পেয়ালাটাও।

তাঁহারা—দেশও মহাদেশ।

আমি—সাধারণ মৃত্যুহারও মহামারীর।

তাঁহারা--তা বটে। এই সেদিন ঐ কাণ্ড হল বাঙলা দেশে। কত মশাই?

আমি—কেউ বলে পনের লাখ, কেউ বলে ত্রিশ লাখ। কিন্তু আমি বলি এমন কি বাহাদুরী? দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ এসেছে, লোক মরেছে, জন্মেছেও আবার। গড়পড়তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু মহামারীর কথা তুলবেন না, ঘুম হয় না।

তাঁহারা—তাই শুনছিলাম বটে। 'মাগো, মাগো,' কান্না যার কানে গেছে তার পক্ষে ঘুমোনো শক্ত, আমার কলকাতার শালাজ বলছিলেন।

আমি—সে আওয়াজ আমি শুনি নি।

তাঁহারা—তবু ঘুম হয় না, নিশ্চয়ই কফি।

আমি—আরে কফি নয়, কফি নয়। আমার ঘুম হয় না দুর্ভিক্ষের কবিতা, গল্প, নভেল, পড়ে আর তার ছবি দেখে।

তাঁহারা—আপনি অত্যন্ত sensitive!

আমি—তা একটু বটে; কিন্তু থাকতে দিলে কে? শিরা উপশিরার ওপর অমন উপর্য্যুপরি আঘাত পড়লে আর কি বাঁচব?

তাঁহারা—যাই বলুন না কেন, আমরা একটা মস্ত সুযোগ হারিয়েছি।

আমি—তাও এমন আর নতুন কি? কিন্তু ক্রীপস্ অফার-এ গলদ ছিল অনেক। লোকটা বড় ধুর্ত্ত, কেবল খাঁটি জল আর ফলমূল খায়, অথচ মস্ত ব্যারিষ্টার! আরে

ব্যারিষ্টারের কি অন্য পেয়, অন্য খাদ্য নেই! আমাদের ব্যবহারজীবিদের দৃষ্টান্ত···

তাঁহারা—ক্রীপ্‌স্‌ অফার নয়। এই বলছিলাম কি, ঐ দুর্ভিক্ষের সময় ভীষণ রকমের, কিছু একটা···

আমি—জলপ্লাবন? সেটা গোড়াতেই এসেছিল না?

তাঁহারা—এই ধরুন, ওলট পালট গোছের, একটা প্রকাণ্ড আভ্যন্তরীণ···

আমি—ওঃ বিপ্লব···

তাঁহারা—যাই নাম দিন না কেন, একটা কিছু আমূল পরিবর্ত্তন···

আমি—বিপ্লব কথাটা গলায় আটকাচ্ছে? ইংরেজদেরও আটকায় অমন, independence কথাটিতে, অতএব লজ্জা পাবেন না। আপনারা বলছেন দুর্ভিক্ষের সময় লোক ক্ষেপল না কেন? কারণ সোজা, যাঁরা ক্ষেপবেন তাঁরা ছিলেন জেলে। অবশ্য খবর যে পাননি জেলে বসে তা ঠিক নয়। কিন্তু ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবনের চেয়ে জাতীয় ইজ্জতের দাম অনেক বেশী। দেশ তখন নেতৃবিহীন। আমাদের দেশের ঐতিহ্যই এই, রাজহস্তীর ওপর যখনই রাজাকে সৈন্যরা দেখতে পায় নি তখনই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেগেছে।

তাঁহারা—কম্যুনিষ্টরা ত তখন বাইরে ছিল।

আমি—তারা ছোকরার দল, নতুন কাজে নেমেছে, এই সেদিন পর্য্যন্ত তারা ছিল লুকিয়ে। তবু চমৎকার কাজ করেছে মানতেই হবে। মরেছে হয়ত যত বাঁচিয়েছে তার প্রায় অর্দ্ধেক। সেচ্ছাসেবীরা অবশ্য কম্যুনিষ্ট ছিল না সকলে, কিন্তু কেন্দ্রে কম্যুনিষ্টদের উৎসাহ, পরিশ্রম, সংযম না থাকলে চাকা ঘুরত না। বাঙালী হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ঘৃণা করতে পারেন না মশাই; কৃতঘ্ন লোকের কুষ্ঠ হয়। অবশ্য আরো দু দশ লাখ গেলেই বা কি হত কিংবা উপকার হত দেশের যদি ভাবেন ত' ভিন্ন কথা। তা হলে নিশ্চয় বাপান্ত করতে পারেন।

তাঁহারা—ছোঁড়াগুলো খাটতে পারে বটে, কিন্তু বিপ্লবী নয় মোটেই, নইলে অমন সুবিধা ছাড়ে।

আমি—আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দিন। মড়া নিয়ে রেভলিউশন হয়? কখনও কোথাও হয়েছে জানেন?

তাঁহারা—কেন ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লব?

আমি—ঘোড়ার ডিম জানেন! ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় bread-riots হয় নি, সেগুলো হয় সূচনার পর, নিদর্শন হিসাবে। সেগুলো বোমা নয়, বারুদও নয়, মাত্র বিষ্‌ফোরণ। জোর আওয়াজে নাবালকেরাই মজা পায়, যেমন কালীপূজার রাত্রি আমরা সকলেই

এককালে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও বয়স বেড়েছে। নয় কি? আরেকটি খবর দিচ্ছি, মাপ করবেন। রুটি নিয়ে দাঙ্গা সুরু হবার বছর দুই আগে পর্য্যন্ত ফরাসী সাধারণ লোক ভাল রুটিই খেত। আর রুশ বিপ্লবের গোড়ার কথা কি আটার মহার্ঘতা? কি জানেন, মানুষ বে-পরোয়া হয় ভালো খাবারের হঠাৎ কমতি হলে। যারা চিরটাকাল একমুঠো ভাতে দুবেলা চালালে, হাত থেকে সে মুঠোটাও উবে গেলে তাদের চিত্তকে যে বস্তু অধিকার করে তাকে তুরীয় অবস্থা বলতে পারেন। দীর্ঘ উপবাসে ঝিমুনি আসে। মহাত্মাজীর এতগুলি অনশন ব্রত দেখলেন, তবু এটুকু জানলেন না? বাঙলার বাইরে বহু অ-বাঙালীর মুখে শুনেছি, যে-ঘটনা বাঙলায় ঘটল সেটা বাঙলা ছাড়া অন্যত্র অসম্ভব হত। এ ধরণের কথায় আমার গা জ্বলে ওঠে। ছ হাত লম্বা পাঞ্জাবী আর সত্তর ইঞ্চি ভুঁড়িদার শেঠ্‌জীর মুখে দুর্ভিক্ষের নাম পর্য্যন্ত শোভা পায় না। তারা কী বুঝবে বাঙালীর দুঃখের কথা। বিপ্লব, বিপ্লব, বিপ্লব চাই! খাচ্ছেন ভাল, লুটছেন মজায় আর কপচাচ্ছেন রেভলিউশন। বিপ্লব বুঝি আকাশ থেকে ঝরে পড়বে আলোর ঝর্ণাধারার মতন?

তাঁহারা—আকাশ থেকে কেন? অন্তর থেকে উৎসারিত হতে পারে না? যদি বুকের ভেতরে জ্বলতে থাকে তবে সে-আগুন সবখানে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা প্রয়োগ করছি বলে হাসবেন না…

আমি—না, না, তা হাসব কেন? তাঁর ভাষায় যেমন মনের ভাব ব্যক্ত হতে পারে অমনটি আর কি দিয়ে সম্ভব বলুন?

তাঁহারা—তাই, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে বিপ্লবী মনোভাব যদি বাঙলাদেশের মানুষের হৃদয়ে থাকত তবে লুটতরাজটা হত অন্ততঃ। তার খবর পাই নি।

আমি—আপনাদের একটি অঙ্গীকারও স্বীকার করি না। কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্, এমন কি ম্যাক্‌ডুগালের মত পুরাতনপন্থীও, বিপ্লবী-মনোভাবের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নি। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের রচনায় আছে অবশ্য, কিন্তু তাঁরা বিপ্লবকে রঙীন কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখেছেন। হাঁ, আর পেয়েছি বাকুনিনের জীবনে ও লেখায়। কিন্তু লোকটা কি রকম পাগল ছিল জানেন ত'? একবার প্রচার করলেন যে মধ্য য়ুরোপের একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবী দল তৈরী হয়েছে, সে-দল প্রত্যেক দেশের বিপ্লবীদের সাহায্য করবে দেশীয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্য। এই মর্ম্মে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি বিলি হল। সমিতির সভ্য কত' ছিল জানেন? একজন, বাকুনিন নিজে। এই বাকুনিন্ জেলের ভেতর থেকে 'জার'কে একটা চিঠি লিখেছিলেন ক্ষমা চেয়ে। চিঠিটা পড়বেন? আহমদ্‌নগরের কেল্লা থেকে যদি কেউ ঐ রকম হীন প্রত্যাহার করে বড়লাটকে

চিঠি পাঠাতেন তবে আপনারা তাঁর কি নাম দিতেন? অথচ, এই বাকুনিনের মতামত আপনাদের পেয়ে বসেছে।

তাঁহারা—বাকুনিন কে ছিল জানি না, অথচ দেখুন, তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল! অতএব বিপ্লবী মনোভাব চিরন্তন।

আমি—যেটা চিরন্তন সেটা বুড়োখোকাপানা।

তাঁহারা—কিছুতেই মানতে পারব না যে বিপ্লবী মনোভাব ব'লে কোন বস্তু নেই।

আমি—নাচার। একটু বোধ হয় ভুল বোঝা হল। বিপ্লবী মনোভাব জন্মায় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে; এবং শীৎকার প্রভৃতি বৈষ্ণবী ভাব তার চিহ্ন নয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত বাস্তব। অনেক ছোটখাট অপ্রিয়, কুৎসিত কাজ তাতে থাকে। আর থাকে আনুষ্ঠানিক সংযম, কর্ম্মকুশলতা, অধ্যবসায়। তাতে মাথার ঘাম পায়ে ঝরে পড়বে, মাথায় চিরুণি-তেল পড়বে না, স্ত্রী, পুত্র, সংসার, আদর্শ, খাবার, নিদ্রা, স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি যাবে, হাঁটতে হবে, ছুটতে হবে। আর সব চেয়ে প্রয়োজন কি জানেন?

তাঁহারা—জানি, পড়তে হবে বিস্তর।

আমি—অমন অট্টহাস্য নাই করলেন।

তাঁহারা—না, অমনি হাসি পেল, রুখতে পারলাম না।

আমি—আপনাদের সবই সহজ, হাসি থেকে বিপ্লব পর্য্যন্ত! বাঙালী কিনা, তাই ধর্ম্ম আপনাদের সহজিয়া। না মশাই, গুরুগম্ভীরভাবেই বলছি, ভীষণ পড়তে হবে। এককালে হয়ত না পড়ে, না ভেবে বিপ্লব হত, কিন্তু মূর্খতার সাহায্যে আজকালকার শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সে-রাষ্ট্রের প্রভু ধনিক সম্প্রদায়কে টলান যায় একথা মার্কস-লেনিনের পর বলা দুঃসাহসেরই পরিচয়, বুদ্ধির নয়। হয়ত মার্ক্‌স্‌-এর মতন বৎসরের পর বৎসর প্রতিদিন দশ-বার ঘণ্টা ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়বার দরকার নেই; এঙ্গেল্‌স-এর মত সর্ব্বগ্রাসী জ্ঞানপিপাসাও সকলের থাকে না; আবার লেনিনের মত অনুসন্ধিৎসা চর্চ্চা করলেও সকলের ধাতে আসে না। কিন্তু তাঁদের রচনাগুলোও ত' দেখতে হবে। প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব এসেছে, এবং তার বর্ণনা আছে, তার ইতিহাস আছে। সেগুলো, দেখলেই বুঝবেন যে জীবজগতে যেমন জন্ম, মৃত্যু উন্নতি, অবনতি, ক্রমবিকাশ এক একটি ঘটনা, যার গঠন আছে, গতি, বৃদ্ধি, হ্রাস আছে, হার আছে, নিয়ম আছে, তেমনই সমাজ-জীবনেও আছে সংস্থান, রক্ষণ, সৃষ্টি ও ধ্বংস। যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কখনও ব্রহ্মার রাজত্ব, কখনও বিষ্ণুর, আবার কখনও দেবাদিদেবের। চাইছেন শৈব হতে, অথচ শিবমন্ত্র জানেন না,

শিখবেনও না। তুলসীপাতায় আধুনিক আশুতোষও ভোলেন না; তাঁর রুচি বদলেছে। শিবের একটা তন্ত্র আছে, দর্শন আছে, তাঁর পূজার একটা অনুষ্ঠান আছে। ভাবুন অফিসের সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে কত সূক্ষ্ম আরাধনার প্রয়োজন, আর তাকে তাড়াবেন ফুৎকারে? ফুৎকার যত বড় হৃদয় থেকেই উদ্বেলিত হোক না কেন, সেটা ফুৎকারই, দম ফুরলেই গেল। বিপ্লব-সাধনা হাতুড়ে বিদ্যে নয় মশাই নয়। ধরুন আপনারা ডাক্তার, আপনাদের রোগীরা ওষুধ খাবনা বলে ধর্ম্মঘট করলে, সমবেত হয়ে প্রস্তাব আনলে, স্ব ইচ্ছায়, প্রাণধর্ম্মের জোরে বাঁচব, অতএব ডাক্তারী বিদ্যার কোনো প্রয়োজন নেই! আপনারা রোগীদের তখন কি বলবেন?

তাঁহারা—এম্ বি পাশ করতে বলব না।

আমি—নিশ্চয় নয়, নিজেদের অন্ন নিজেরা মারবেন না অবশ্য। তবে, যৎসামান্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান জানা, ডাক্তারের আদেশ মানা, এবং একটু ডাক্তারী বিদ্যায় বিশ্বাস, এগুলো থাকলে দেহের কষ্ট লাঘব হতে পারে এবং একটু তাড়াতাড়িও সারা সম্ভব, এই ধরণের উপদেশ নিশ্চয়ই আপনারা রোগীদের দেবেন। কিন্তু যারা বিপ্লব করবে, অর্থাৎ চাষা মজুর ছেলে ছোকরা, তাদের যৎসামান্য বিপ্লব বিজ্ঞান শিখতে দেবেন না কেন?

তাঁহারা—ওটাও বিজ্ঞান?

আমি—হাজার বার বিজ্ঞান। কম্ সে কম্ এক ডজন বাঘা বাঘা রেভলিউশন হয়েছে আমাদের চোখের সামনে, তাদের ঘটনা ঘেঁটে কোনো সাধারণ নিয়ম, কিংবা ঝোঁক্ আবিষ্কার করা যায় না বলছেন? লাটিন আমেরিকা ছেড়ে দিয়ে, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, চায়না, টার্কি, জার্মাণী, ইটালী, স্পেন, যুদ্ধের মধ্যে ফ্রান্স, যুগোশ্লোভিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া এগুলো নস্যাৎ করে, ভারতবর্ষে আপন মর্জিতে বিপ্লব সাধবেন? অবশ্য নিজস্বতা বজায় রাখার মোহ আছে, কিন্তু মশাই নিরালার ঠেলা সামলাতে পারবেন? তার চেয়ে বিপ্লবের সাধারণ নক্সাটা নিরীক্ষণ করুন না? যদি নিজের নিজত্ব থাকে তাকে মারে কে? যুক্তিটা অন্য ভাষায় প্লেস্ করছি। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষশিক্ষার মতই হোক, অবশেষে মেয়েমানুষ মেয়েই থাকবে।

তাঁহারা—অর্থাৎ, মনুষ্যত্বটা ঝরে যাবে, খসে পড়বে।

আমি—পুরুষালী শিক্ষায় মেয়েদের মনুষ্যত্ব বাড়ে, যদি অবশ্য তাঁদের মধ্যে পদার্থটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

তাঁহারা—আপনি বুঝি মানেন না?

আমি—না মেয়েদের মানুষ ভাবি না। ওঁরা দেবী। তবে কারুর মধ্যে চামুণ্ডার, কারুর মধ্যে ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি মহাবিদ্যার অংশ থাকে। তেমনই আপনাদের ঐ জিনিষটা। বিপ্লবের রূপভেদ থাকবেই। কিন্তু মূলে সেই আদ্যাশক্তি, মা কালী, নরমুণ্ডমালিনী, শিবের বুকের ওপর জিহ্বা মেলে মা আমার দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁহারা—এই বল্লেন আমরা শৈব ?

আমি—আরে শিব কি মরদ্ ছিলেন ? খুড়ি, শিব-শক্তি=যেন space-time। আমি ওঁদের যুগ্মপ্রত্যয় ভাবি। সে যাই হোক, বেশ একটু পড়াশুনো চাই বই কি ? পাশের জন্য আপনারা পড়েন নি ?

তাঁহারা—নিশ্চয়ই, তবে সেগুলো নোট্।

আমি—বেশ কথা। পাশ মানেটা কি ? না, বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুজনের নাগপাশ থেকে মুক্তি। তার জোরই বা কত ? অথচ সেজন্য পরীক্ষার ঠিক আগে দিনে দশ ঘণ্টা খাটুনি। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য কেবল চরকা চালান্! খাশা! আর যদি নোটের কথা তোলেন ত' তাও পাবেন। বিপ্লবের ভালো ভালো নোট বেরুচ্ছে, দামও সস্তা।

তাঁহারা—তা আর দেখিনি ? রাস্তাঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। সব মার্ক্সিস্ট লিটারেচার! আর কম্যুনিষ্ট দলের ছাপা। ঐগুলো পড়ে উচ্ছন্ন গেল ছোঁড়ারা। কেবল কপ্‌চাচ্ছে।

আমি—ওগুলো বিপ্লবের ক্লাসিক্স্, যাকে শাস্ত্র বলে তাই। যত হাতে হাতে ঘোরে ততই ভাল আমার মতে। লিট্‌ল্ লেনিন সিরীজ দেখেছেন ? অবশ্য যদি ও'রা পড়ে তবেই মঙ্গল। আমার ধারণা আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়ছে কিছু কিছু। অন্ততঃ, আপনারা যতটা উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ পড়ে আইডিয়ালিষ্ট, তার চেয়ে কম পড়ে তারা মার্ক্সিস্ট হচ্ছে মনে হয় না।

তাঁহারা—কি করে জানলেন ?

আমি—প্রশান্ত মহলানবীশকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমার ঐ ধারণা, ব্যস্।

তাঁহারা—তা হলে আপনি বলছেন যে বিদ্যার জোরেই ইংরেজ তাড়াব আমরা।

আমি—অনেকটা তাই দাঁড়ায়।

তাঁহারা—তবেই হয়েছে! ভারতবর্ষে একা আপনারা বিদ্বান নন।

আমি—আমি যে বিদ্যার কথা বলছি সে বিদ্যায় ওয়াকিবহাল কজন আপনাদের ভারতমাতা পয়দা করেছেন বলতে পারেন ? আপনারা দেখছি চটছেন। তাতে ফল হবে না। একটু সরবৎ দেব ? পুরোণো তেঁতুলের সরবৎ। নতুন ফ্যাসান মশাই,

তেঁতুল পুরোণো হলে হয় কি ? বোনের ননদ পাঠিয়েছেন।

তাঁহারা—বোনের ননদ ?

আমি—আপনাদের কলকাতার শালাজ থাকতে পারে, আর আমার বোনের অন্ততঃ একটা পাড়াগেঁয়ে ননদ থাকতে পারে না ?

তাঁহারা—থাক্। বিদ্যার অর্থটা কি ?

আমি—আমার বিদ্যা সুন্দরের নয়। যেটা জীবন থেকে বিচ্যুত তাকে আমি বিদ্যা বলি না। তার নাম রিসার্চ্চ, স্কলারশিপ, পাণ্ডিত্য সব কিছু হতে পারে কিন্তু সেটা বিদ্যা নয়। বিদ্যার জন্য কর্ম্ম চাই। আবার কর্ম্মের জন্য চোখ খুলে দেখা চাই। চোখ খুললে দেখবেন ঘটনার শ্রোতে গোটা কয়েক আবর্ত্ত রয়েছে। অন্য ভাষায় বলছি, ঘটনার একটি নক্সা, ছক আছে। সেই নক্সার আবার রীতি আছে, দেখবেন। নানা সূতো, নানা রঙের সূতোয় এই নক্সা তৈরী হচ্ছে। তাতে আবার জট পড়ে। জট খোলা যায়। কচি বাচ্চার মত হাঁতড়ালে চলবে না। সূতোটার কোন্ দিক মুখ ঠিক করা চাই। তারপর ধৈর্য্য। ঐ দিক নির্ণয়ের শক্তির নাম বিদ্যা। বিদ্যায় ধৈর্য্য দেবে, কারণ বিদ্যা কৌশল শেখায় জট খুলতে।

তাঁহারা—এবং পাকাতে।

আমি—সেটা ত' পাণ্ডিত্য বলেইছি। জট খোলাই বিদ্যার অর্থ, অর্থাৎ উদ্দেশ্য। যদি পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের সীমায় এসে না দাঁড়ান, যদি অন্ধ গলিতে ধাঁধাঁ না লাগে, যদি সেখান থেকে পালাতে প্রাণ আকুলি বিকুলি না করে, তবে যেমন রিসার্চ্চ হয় না, তেমনই দেশে একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত, একটা ক্রান্তি, একটা অসহনীয় পরিস্থিতি এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত বিপ্লবসাধনা বিলাস মাত্র।

তাঁহারা—একটা সাফ্ বাৎ শুনতে পারবেন ?

আমি—নিশ্চয়। তবে রাগব না শপথ করছি না ; বলুন।

তাঁহারা—আপনারা অত্যন্ত দাম্ভিক।

আমি—এ আর এমন নতুন কথা কি ?

তাঁহারা—তদ্‌ব্যতীত, আপনারা ভীষণ, ভয়ঙ্কর আইডিয়ালিষ্ট।

আমি—দুটি বিশেষণ প্রয়োজন ছিল ?

তাঁহারা—ভীষণ এই জন্য যে আপনারা আইডিয়ালিষ্ট হতে লজ্জা পান, এই যুগের আবহাওয়া উল্‌টো বলে। আর ভয়ঙ্কর তারই ফলে, অর্থাৎ লজ্জিত হয়ে কেবল আত্মরক্ষার জন্য উল্‌টো কথা কন। আপনাদের দেখলে মনে হয় সকলে আপনারা শীর্ষাসনে আছেন, মাথা মাটিতে পা দুটো আকাশে।

আমি—জওহরলাল প্রত্যহ ঐ হঠযোগের ক্রিয়াটি অভ্যাস করেন, এবং তাইতে ভাল আছেন নিজে লিখেছেন।

তাঁহারা—তিনিও কিনা আপনাদের দলের। সে যাই হোক, inverted idealism বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা।

আমি—মধ্যে মধ্যে মাথা মাটিতে রেখে দেখলে দুনিয়াটা বোঝা সহজ হয়। হেগেল নাকি এইভাবেই চিরটাকাল ছিলেন, মার্কস্ এসে মানুষের স্বভাবানুযায়ী দাঁড়াতে শেখাবার আগে। হেগেল মস্ত লোক।

তাঁহারা—এখনও শেষ হয়নি অভিযোগটা। মাত্র দুটি দফা হয়েছে। তৃতীয় দফা এই যে আপনারা অপদার্থ; চতুর্থ, আপনারা সমাজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, জানতে পারেন না, চান না। পঞ্চম, কর্ম্ম করবার প্রবৃত্তি আপনাদের রক্তে নেই; ষষ্ঠ, আপনাদের বিদ্যা, জ্ঞান কেবল অর্থকরী, জনসাধারণের উপকারের জন্য নয়।

আমি—নালিশের আর্জ্জি লম্বা হলে ভালো জজ প্রথমেই সন্দেহ করেন।

তাঁহারা—মোট কথা, আপনারা সব বুর্জ্জোয়া।

আমি—মোট কথাটা আগেও মেনেছি, এখনও মানছি। কিন্তু আমাদের একটু সদ্ব্যবহার করুন না।

তাঁহারা—আপনাদের সমূলে উৎপাটন করাই বিধেয়।

আমি—এমন কোন বিপ্লব হয়নি যাতে ইনটেলেকচুয়ালদের স্থান ছিল না। কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত। অবশ্য সেই রোমান যুগে স্পার্টাকাস-এর বিদ্রোহ ছাড়া। তবে আমাদের হাতে বিপ্লব পুরোপুরি এলে তাকে বাঁচতে দিই না বটে। কংসের মত শিশুকৃষ্ণকে মারতে আমরা সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তাই বলে আমরা কখনও কিছু করিনি বলা যায় কি ?

তাঁহারা—বিপ্লবের সময় আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই। বিপ্লব আনবে জনগণ।

আমি—এই রে! আবার বাকুনিনের ভূত ঘাড়ে চাপল রে। অলক্ষ্যে আবার একটি পেত্নীও রয়েছেন। রোজা লাক্সেমবুর্গ নয়? না, না, আপনারা ওঁদের দেখতে পাবেন না। এখন, এই জনগণ কি ভাবে রেভোলিউশন করবে ?

তাঁহারা—আগে থেকে তা কি বলা যায় ? জনগণ নিজেরাই তা জানে না।

আমি—না জেনে—

তাঁহারা—এ সব ব্যাপার পুঁথির বাইরে।

আমি—প্ল্যান গোছের একটা কিছু থাকবে না ?

তাঁহারা—তা হয়ত থাকবে। কিন্তু ঘটনার চাপে সকালের প্ল্যান বিকেলে বদলাবে। আর যদি না বদলায় বিপ্লব যাবে কেঁচে।

আমি—থামবেন না। বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়ে দিন তর্ক-বুদ্ধিটা।

তাঁহারা—পরপর যুক্তি সাজাবার দরকার দেখি না। মূল ব্যাপারটা এই ঃ জনগণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে আপনি বাধ্য।

আমি—নিশ্চয় বাধ্য।

তাঁহারা—এই জনগণ সাধারণতঃ বিপ্লবী।

আমি—নাঃ, বড় গুলিয়ে দিলেন আপনারা। জনগণ,—সাধারণতঃ,—বিপ্লবী—কোনটারই অর্থ ধরতে পারছি না। জনগণ মানে কি public opinion-এর public, না crowd, জনতা? সাধারণতঃ অর্থ কি শতকরা পঞ্চাশের বেশী? আর বিপ্লবী মানে কি বিদ্রোহী?

তাঁহারা—জনগণ মানে mass, এইত আজকালকার মানে।

আমি—অভিধানে কিন্তু mass এর অনেক অর্থ পাচ্ছি। ক্যাথলিকদের mass, কারুশিল্পে পাথরের mass, ছবির mass, আবার আপনাদের mass।

তাঁহারা—এই যারা দলিত, নির্য্যাতিত, প্রপীড়িত।

আমি—ওঃ বুঝেছি, যারা oppressed, suppressed, depressed; repressedদেরও ধরতে পারি? আচ্ছা, স্ত্রীজাতিরাও কি আপনাদের সংজ্ঞায় mass? কেরাণী বাবুরা?

তাঁহারা—কিষাণ মজুর, যারা হাল টানে, এই যাদের কবি 'মহামানব' বলেছেন।

আমি—রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দিন দয়া করে। কি নিগ্রহই না তাঁকে ভুগতে হয়েছে আপনাদের অনুগ্রহে! তা হলে, আপনাদের মতে কিষাণ মজুররা বিপ্লবী?

তাঁহারা—নিশ্চয়ই, তারা স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তন চায়।

আমি—তাদের স্বভাব সম্বন্ধে আমার খবর একটু ভিন্ন রকমের। কিষাণ চায় একটু ভাল ও বড় জমির মালিক হতে, আর মজুর চায় বেশী মাইনে, ছুটি, ভদ্র ব্যবহার, কাজের ও থাকবার ভাল জায়গা ইত্যাদি। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অন্ততঃ তাই; এবং ঐ দুটো দেশেই ধনিকতন্ত্র সবচেয়ে শক্তিশালী। জার্ম্মাণীতেও social Insurance দিয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত মজুরদের সন্তুষ্ট রাখা হয়েছিল। আজকের ভাবা হল social security, উদ্দেশ্যও তাই, এবং তার সাধনায় কর্ত্তৃপক্ষ বিফল হবেন বলে মনে হচ্ছে না ত।

তাঁহারা—কিষাণ মজুরদের বাদ দিচ্ছেন তবে?

আমি—মোটেই না। তবে তারা নিজেরা বিপ্লব করে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জোর তারা শাসনসীমা অতিক্রম ক'রে যায়। বেশী দূর গেলে কাজটিকে বিদ্রোহ বলা চলে। নেতা যদি ভাল জোটে তবে না হয় উপপ্লব এল। কিন্তু, বিপ্লব অর্থে শ্রমিকের রাজত্ব, অর্থাৎ বর্ত্তমান রাষ্ট্রের ধ্বংস ও নিজেদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। সে অপূর্ব্ব রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। অতএব তার প্রকৃতি সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল। সেটা অন্য জাতের administration হিসেবেই ধরা যাক আপাততঃ। আপনাদের কি বিশ্বাস যে শ্রমিকরা এই ধরণের প্রলয় আনতে পারে কেবল নিজেদেরই প্রেরণায়? তা হলে আর পৃথিবীতে দুঃখ থাকত না! দাসত্বের ইতিহাস সুরু হয় গুহা থেকে বাইরে আসা মাত্র। নৃতত্ত্বে যে সাম্যের সাক্ষাৎ পাই সেটা উলটে দিয়েছে এই দশ হাজার বছরের সভ্যতা। অতএব সাম্য আনতে গেলে সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। পারবে শ্রমিকরা নিজেরা? তারা জানেই না সভ্যতার বিষ চক্রান্ত কতদূর গিয়েছে। অথচ, বিপ্লব তাদের জন্য প্রধানতঃ; তাদের সংখ্যা বেশী বলে তাদের জোর বেশী, এবং ভুগতে হয়েছে বেশী বলে তাদের একটা রাগ, ক্ষোভ, ঈর্ষ্যা থাকে সর্ব্বদা। এ গুলো ভাব, এবং ভাবের শক্তি আছে। কিন্তু ভাব ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আবার পিছু হঠাতেও পারে, যেমন নাৎসী বিদ্রোহ হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হল অগ্রস্থতির দিক্ নির্ণয় করবে কে?

তাঁহারা—কেন, আপনাদের মত বুদ্ধিজীবিরা!

আমি—শ্লেষ ছাড়ুন। দিক নির্ণয় করবে পার্টি, তার মধ্যে বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবি উভয়েই থাকবে; পরে অর্থাৎ নতুন দিক্ নির্ণয়ের সময়ে, উঠবে নতুন বুদ্ধিজীবির দল।

তাঁহারা—রাশিয়ায় শুনছি নতুন শ্রেণী তৈরী হচ্ছে?

আমি—রাশিয়াটিকে ঐ রবিবাবুর মতনই দরজার বাইরে রাখুন আপাততঃ। রাশিয়া সম্বন্ধে এর মুখে এক কথা, ওর মুখে অন্য কথা, আর তাই নিয়ে কোঁদল। ষ্ট্যালিন যেন আমাদের বাপের ঠাকুর। একদল ছোক্রা দুদিন পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে পূজো করবে ওকে, আর দেশের সব বুড়োরা মন্তর ঝেড়ে দেশের স্কন্ধ থেকে ওর ভূত ছাড়াতে যাবে দেখবেন। একটা হুকুম জারি করতে চাই, দশ বছর কেউ আমাদের দেশে রাশিয়ার নাম উচ্চারণ করতে পারবে না। অবশ্য শীঘ্র তাই হবেও। গ্যেবেল্‌স্ মরেও মরে নি, চার্চ্চহিল গিয়েও যায় নি। এবং আমাদের একদল নেতা তাঁদের সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তখন ছোঁড়ারা খুব জব্দ হবে। সেটা কি চান আপনারা? অতএব আপাততঃ রাশিয়াকে সিকেয় তুলুন। যদি প্রত্যয় করেন মশাইরা, তবে বলি রাশিয়ায় শ্রেণী অর্থাৎ class হয় নি। কিন্তু vocational কিংবা

occupational group হচ্ছে। দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, প্রত্যেক সমাজতাত্ত্বিক জানেন। জানেন না কেবল আপনারা, আর রাজনীতিবিশারদেরা।

তাঁহারা—শ্রেণীটা কি?

আমি—শ্রেণী কথাটিতে একাধিক প্রত্যয় দানা বেধেছে, কিংবা বাধছে। প্রথমতঃ, উৎপাদনের যন্ত্র ও কলকব্জার মালিকানা; দ্বিতীয়তঃ, সেই অধিকারের জোরে আয়ের অসম বিভাগ; তৃতীয়তঃ, সামাজিক শ্রম থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত মূল্যের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি ও মূলধনে রূপান্তর; চতুর্থতঃ, সেই মূলধনের আবার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন; এবং পঞ্চমতঃ পূর্ব্বের সবগুলো পদ্ধতির সমাবেশে একদল পায় মজুরী, অন্যদল লোটে মুনাফা। এই হোলো শ্রেণীর ব্যাখ্যা। অতএব দুটি শ্রেণীতে সংঘাত হবেই, যতদিন না লুটনেওয়ালারা গতায়ু হন। শোষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একদিল্ হয়ে কাজ করতে পারে যারা তারাও mass-এর অন্তর্ভুক্ত। ট্রেণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কিংবা বড়লোকের পার্টিতে ভিড় হয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটা mass নয়। আবার দেখুন, আমি থাকি বাদশাবাগের বাংলোতে, আমার বাগানে গোলাপ মরশুমী ফুলের বাহার, আমি সিল্ক্ পরি, ভিড়ের ভয়ে কোনো সভা সমিতিতে যাই না, আমার বাড়ীতে আই-সি-এস্ থেকে নেতারাও আসেন, তবু আমার বিনীত নিবেদন যে আমি জনগণের একজন। কেবল তাই নয়, আপনাদের বিশাল বপুসত্ত্বেও আপনারা mass নন। অতএব আপনাদের দ্বারা আইন-ভাঙ্গা, বিদ্রোহ, উপপ্লবের উৎপাত সম্ভব; কিন্তু বিপ্লব! উঁহু!

তাঁহারা—আপনাদের দ্বারা 'উপ'-টাও হবে না।

আমি—তা না হোক, সে জন্য আরো ইয়ার লোক আছে। তবে চেষ্টা চরিত্তির করলে হয়ত আমরা বলে দিতে পারব কোনটা বিপ্লব হল, কোনটা হল না, কোনটা গেজে গেল আর কোনটার রসে প্রাণ সঞ্জীবিত হল, কিংবা হতে পারে। এর বেশী বোধ হয় আরেকটু পারা যায়; যেমন, ইতিহাসের কোন্ ধাক্কার জোর বেশী, আর কোন্টার কম, কোনটার সাহায্যে কাজ সহজ হয়, কোনটায় বাধা সৃষ্টি করে। অবশ্য, আজ আমরা যা তাঁদের দ্বারা কাজ পণ্ডই হবে। তবে তখনকার আমরা ত' আজকের আমরা থাকব না। হ্যাঁ, আরো কিছু পারি হয় ত। ঠিক ঐ বাঁকের মুখে কি থাকতে পারে সেটার আন্দাজও দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। যদি অবশ্য আমরা সকলে কোমর-বেঁধে লেগে যাই। তার বেশী যেটা সেটা আপনারাও পারেন, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, গরহজম, আরো বলতে হবে?

তাঁহারা—না। বিপ্লব সাধনার পর্ব্ব শেষ হল? এবার অনুমতি দিন।*

আমি—উত্তরের অনুমতি আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

তাঁহারা—আপনার উত্তর কে দেবে মশাই? বাড়ি যাবার অনুমতি দিন।

আমি—একান্তই যাবেন? যান্, নয়ত আবার বাড়ীতে বিপ্লব বাঁধবে। ফিরে গিয়ে দেখবেন হয়ত ভাত ঠাণ্ডা, মেজাজ গরম। ওটা রবিবাবুর, আমার নয়। সে যাই হোক, কবে আসছেন বলুন।

তাঁহারা—শীঘ্রই আসতে চেষ্টা করব। সেদিন কিন্তু আমাদের বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে।

সে রাতে ঘুম এল না। বিপ্লব-সংক্রান্ত যত বই আমার লাইব্রেরীতে আছে সব ঘাঁটতে লাগলাম। বিপ্লবকে কেউ সমাজের রোগ বলছেন, আবার কেউ দেখছেন সাহিত্যের দিক থেকে, রোম্যান্টিকভাবে। বিপ্লবের ঐতিহাসিকরাও নিজেদের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। কিন্তু বিপ্লব, যদি রোগ হয় তবে সাধারণ অবস্থাটা কি স্বাস্থ্যের? এই দারিদ্র্য, এই নিষ্পেষণ, এই অশিক্ষা, এই অপমান, এই যুদ্ধ, এই বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই উপনিবেশের অত্যাচার, এই বর্ণভেদ, সব সুস্থতার লক্ষণ? অন্যধারে বিপ্লবের সবটাই কি আত্মবলি, সবটাই সাহস আর আদর্শ-নিষ্ঠা? তা ত নয়। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, এমন কি কালাবাজার, সবই রয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ল রাইট্ নামে এক আমেরিক্যানের দু ভলুমে মোটা বইটা, যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ব্যাপারটা এক ভলুমে লেখা যেত। ঐ ধরণের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিপ্লবের বিচার কে করবে? মার্ক্‌স্, লেনিনের লেখায় অনেক জিনিষ আছে নিশ্চয়। ভারতবর্ষে একটা বহুদিন ধরে আন্দোলন চলেছে। ইদানীং মহাত্মাজী তাকে একটা রূপ দিতে চেষ্টা করছেন। তাকে রাশিয়ার ছকে ফেলা যায় কি? ইতিহাসের মধ্যে যাঁরা ঐক্য পান তাঁরা পারেন। আমি আবার পুরোপুরি তা মানি না। আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা ভারতের ইতিহাস। তার একটা নিজস্ব নক্‌সা তৈরী হয়েছে, নানা উপায়ে। সেটাকে বাদ দিতে চাইলেও সেটা যায় না। সারা পৃথিবীতে একাধিক ছক পাচ্ছি। সে-গুলোর ওপর একটা বড় ছক নিশ্চয় আছে। সেটা পরে বিবেচ্য। ঐক্য যদি থাকে ত' সেখানে। এই ত' মনে হয়। কিন্তু, নিজের যুক্তিতে কোথায় যেন গলদ রয়ে গেল। সন্দেহ হয়, ঐক্য, বৈচিত্র্য, টাইপ নিয়ে মাথা ঘামান স্থানু মনোভাবের চিহ্ন। অবশ্য তাতে বৈজ্ঞানিক বিচারের সুবিধা হয়। কিন্তু ব্যাপারটাকে চলন্ত হিসেবে দেখতে হবে। তাতে অবশ্য গোটা গোটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। না হয়, নাই এলাম। আমার আগ্রহ সিদ্ধান্তে, না সত্যে?

মার্ক্সীয় দর্শন

কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্লেটো তাঁহার 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থে সাম্যবাদীসমাজের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাকে ইউরোপের সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম দার্শনিক আলোচনা বলা যাইতে পারে। তবে প্লেটোর সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কতিপয় ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য ছিল। তিনি বলেন যে রাষ্ট্রচালকদের ভিতরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকিলে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের নায়কগণকে সম্পূর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ হইতে মুক্ত থাকা আবশ্যক, কারণ তাহাদের বুদ্ধি স্বার্থান্ধ হইলে, সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। যাহারা রাষ্ট্রের পরিচালক তাহাদের বুদ্ধি থাকিবে নিষ্কলুষ এবং তাহারা ন্যায়পরতাকেই করিবে রাষ্ট্রের ভিত্তি। সুতরাং তিনি তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞানের ও নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। প্লেটো ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। তাঁহার মতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞানই রাষ্ট্রের পরিচালক হইতে পারে। সুতরাং তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি ছিল ভাববাদ। তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান ভাববাদী। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রপরিচালকদের সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন ব্যক্তিরই সম্পত্তির অধিকার থাকিবে না। এই সমাজে সম্পত্তি, সন্তান ও স্ত্রী সাধারণের অধিকার ভুক্ত হইবে। কিন্তু প্লেটো তাঁহার দর্শনে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য সমাজব্যবস্থা কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদ ইতিহাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং এই সমাজতন্ত্রবাদ অবাস্তব ও কাল্পনিক। প্লেটোর পরে অনেকেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মার্ক্সীয় দার্শনিক ব্যতীত অন্য দার্শনিকদের সমাজতন্ত্রবাদ অবৈজ্ঞানিক। কারণ তাঁহারা সমাজের আর্থিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর তাঁহাদের সমাজতন্ত্রবাদ রচনা করেন নাই। ইংলণ্ডের স্যর টমাস মোর-এর সমাজতন্ত্রবাদও ভাববাদী ও কাল্পনিক। পরে সেণ্ট সাইমন (স্যাঁ সিম), ফুরিয়ার প্রভৃতি ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিকগণ এবং রবার্ট ওয়েন

প্রমুখ ইংরেজ সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিকগণও যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবৈজ্ঞানিক। জার্ম্মাণীতে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার হইয়াছিল। আধুনিক ইংলণ্ডে ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদীগণও রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক। ইহাদের মধ্যে সিড্নি ওয়েব, বার্ণার্ড শ ও এইচ জি ওয়েলসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফরাসীবিপ্লবের (খ্রীঃ ১৭৮৯-৯৪) পূর্ব্বগামী দার্শনিকগণ ভাববাদ হইতে মুক্ত ছিলেন না। ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডেরো প্রভৃতি দার্শনিকগণ চিরন্তন সত্যের ভিত্তির উপর সমাজকে ও রাষ্ট্রকে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে মানবসমাজের সাম্য শান্তি, ভ্রাতৃভাব, স্বাধীনতা, ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চিরন্তন প্রজ্ঞানের স্বরূপ জানা আবশ্যক এবং ন্যায়পরতার চিরন্তন স্বরূপ কি তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং এই সব দার্শনিকদের প্রত্যেকেই স্বকীয় ধারণার উপর নির্ভর করিয়া সমাজসংস্কারের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। রুশোর সুবিখ্যাত 'সোসাল কনট্রাক্ট' নামক গ্রন্থ কাল্পনিক ভাববাদের উপর রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। ইতিহাসে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি যে কোন বিশেষ রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। রুশোর ন্যায় ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী বিপ্লবী দার্শনিকগণও ভাববাদী ছিলেন। ইঁহারা ইতিহাসের গতি অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের দর্শন রচনা করেন নাই। তাই তাঁহাদের সমাজবাদ কল্পনাপ্রসূত।

ফরাসীবিপ্লবের ফলে যখন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ সাধিত হয় এবং তাহার ফলে বুর্জ্জোয়া অথবা ধনিক সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন এই সমাজ-শরীরের মধ্যে নানারূপ অসামঞ্জস্য ও অনাচার পরিলক্ষিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সাধারণ লোকের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, বিপ্লবের ফলে সমাজে স্থাপিত হইবে সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা। কিন্তু এই বিপ্লবের পর যে নূতন সমাজ গঠিত হয় তাহার মধ্যেও শ্রেণী-বৈষম্য ভীষণরূপে দেখা দেয়। বিপ্লবের পূর্ব্বে বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায় বলিত যে সামন্ততন্ত্র অথবা জায়গীরদারী সমাজব্যবস্থা যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সমাজব্যবস্থাকেই অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের ফলে যে সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হয় তাহার ভিতরে শ্রেণীবৈষম্য ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিচলিত হন। ইঁহারা সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিক মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে ফরাসীদেশের সেণ্ট সাইমন ও ফুরিয়ার এবং ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেণ্ট সাইমন ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে শ্রমিকশ্রেণী এবং অলস ধনিক শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য বর্ত্তমান তাহা

দূর করিতে হইবে শ্রমিকগণ যে ধনের উৎপাদক, ধনিক সম্প্রদায়ের ইহা স্বীকার করা আবশ্যক। ধনিক সম্প্রদায়কে হইতে হইবে সমাজের ধনের বিশ্বস্ত রক্ষক অথবা জিম্মাদার। ইহারা সমাজের ভিতরে ন্যায়পরতার নীতি অনুসারে সামাজিক ধন বণ্টন করিবে। তিনি আরও বলেন যে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে থাকা আবশ্যক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইবে অর্থবিজ্ঞানের শাখা স্বরূপ। অর্থোৎপাদন ও অর্থবণ্টনই হইবে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার থাকিবে। রাষ্ট্র মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব না করিয়া সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। আর্থিক সাম্য স্থাপন করাই হইবে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য্য। প্রুধোঁ-ও স্যাঁ সিম-র ন্যায় জমির উপর কৃষকের অধিকারের ভিত্তিতে সাম্যবাদী সমাজগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সমাজে বস্তু-বিনিময়ের সুবিধার জন্য তিনি একপ্রকার বিশেষ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মার্কস্ 'পভার্টি অব ফিলসফি' নামক গ্রন্থে প্রুধোঁ-র সাম্যবাদের সমালোচনা করিয়াছেন।

ফুরিয়ার বুর্জ্জোয়া সমাজের ভিতরে যে অন্যায় ও অবিচার বর্ত্তমান তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে কি প্রকারে অলস ধনিকগণ জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তিনি তীব্র ভাষায় শোষণ-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে এই ধনিকসমাজে জনসাধারণ ক্রমেই সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এই সমাজের স্ত্রীলোকগণের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। গণিকাগণ ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িয়া যাইতেছে এবং অসহায় স্ত্রীলোকদের অনেকেই গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কোন সুব্যবস্থা নাই। ফলে ক্রমেই তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে। তিনি তাই বলেন যে বুর্জ্জোয়া দার্শনিকদের সুন্দর বাক্যাবলীর সঙ্গে বাস্তব সমাজ-জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই। তাই ফুরিয়ারও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

রবার্ট ওয়েন স্কট্ল্যাণ্ডের নিউলেনার্ক নামক স্থানে একটি বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বের ভার (খ্রীঃ ১৮০০-১৮১৯) পাইয়া সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে লাগিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টারেও তিনি এইরূপ সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময় শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ কর্ম্মীগণ আপনাদের সম্পত্তির অধিকার হারাইয়া দলে দলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিশুদিগকে ও স্ত্রীলোকদিগকে অল্পবেতনে নিযুক্ত করা হইত। প্রত্যেককে দৈনিক ১৩।১৪ ঘণ্টা করিয়া সামান্য বেতনে মজুরের কাজ করিতে হইত। তখন ইংলণ্ডে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন শ্রমিক সংঘ গড়িয়া উঠে

নাই। জনসাধারণের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। জনসাধারণের নৈতিক ও মানসিক অবনতি চরম সীমায় উঠিয়াছিল। রবার্ট ওয়েন তাঁহার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ২৫০০ শ্রমিকের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শিশু-সন্তানের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। শ্রমিকদের যথেষ্ট বেতন বৃদ্ধি করেন, তাহাদের সামাজিক জীবন সুসঙ্গত করিয়া তোলেন। ফলে তাহাদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ মামলা মোকদ্দমার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনও শ্রমিক পরের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিত না। এইরূপ ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের যথেষ্ট লাভ হইতে থাকে। কিন্তু তিনি দেখিতে পান যে যান্ত্রিক যুগে ২৫০০ শিল্পী বহু লক্ষ শিল্পীর কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে বহুলক্ষ লোক যাহা আয় করিত ২৫০০ লোকের আয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে উদ্বৃত্ত মূল্য কোথায় যায়? তিনি বুঝিতে পারেন যে মালিকগণই উহা আত্মসাৎ করে। রবার্ট ওয়েন বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস করিতেন এবং তিনি মনে করিতেন যে প্রত্যেক মানুষের জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা এবং পূর্ব্বপুরুষের জীবন দ্বারা বহুলাংশে অবধারিত। তিনি যখন নিউলেনার্কে ছিলেন তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চনীচ সকলেই তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। পরে তিনি সাম্যবাদী সমাজের একটি সুন্দর পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং আয়ারল্যাণ্ডে তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে তিনি ধনিকসম্প্রদায়ের সহানুভূতি হারান। আয়ারল্যাণ্ডে তাঁহার সমস্ত ধন নিঃশেষিত হয়। পরে তিনি আমেরিকায় বহুদিন শ্রমিকদের সহিত কার্য্য করেন। অবশেষে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। তিনি স্ত্রীলোক ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থার কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট আইন পাশ করে। ইনি ইংলণ্ডের শ্রমিকদের অনেকটা শ্রেণীবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এনগেলস্ বলেন যে এইসব কল্পনাবাদী সমাজতান্ত্রিকগণ সমাজের সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, কোনও এক চিরন্তন সত্যের ভিত্তির উপর। ইহাদের প্রত্যেকের চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল। ইহাদের মতের ভিতর কোন ঐক্য ছিল না। কারণ ইহাদের প্রত্যেকের মত স্বকীয় ধারণার উপর নির্ভরশীল। ইঁহারা বাহ্যজগৎকে ও সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেন নাই। ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই ইঁহাদের সমাজতন্ত্রবাদ ভাববাদী। ইঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অবশ্যই চেষ্টাশীল ছিলেন। ধনিক সমাজ কি প্রকারে ধ্বংসের পথে চলিতেছে এবং

কি প্রকারে ধনিক-সমাজের ধ্বংসের উপর সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে ইহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ইঁহারা বিপ্লবের পরিপন্থী।

আমি পূর্ব্বেই রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। জার্ম্মানীতে প্রথম এই সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হয়। ইংলণ্ডের ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদীগণও কতকটা এই মতের সমর্থক। আমি এই স্থলে এই সমাজতন্ত্রবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনা শেষ করিব। ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদীগণ, কি প্রকারে জনগণ রাষ্ট্রের অধিকার গ্রহণ করিয়া সমাজের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে সমাজতন্ত্র স্থাপন করিতে হইলে প্রথম কর্ত্তব্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করা। সেইজন্য ইঁহারা বলেন যে প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও নারীকে ভোটের অধিকার দিতে হইবে। কোন ব্যক্তিরই একাধিক ভোটের অধিকার থাকিবে না। আইনসভার উপরস্থ কক্ষটিকে তুলিয়া দিতে হইবে এবং নিম্নস্থ কক্ষটিকে প্রকৃত জনসাধারণের আইন সভায় পরিণত করিতে হইবে। দেশের প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে। দেশের সমস্ত খনিজ ও সম্পত্তি, রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে আসিবে। দেশের জমি সমানভাবে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। অল্পায়তন শিল্পসমূহ মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। কায়েমী সম্পত্তির অধিকার লোপ করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিয়া অর্থোৎপাদন করিতে হইবে। রাষ্ট্রই পণ্যের মূল্য স্থির করিয়া দিবে। জাতীয়সম্পত্তির বণ্টনের ভার রাষ্ট্রের উপর থাকিবে। ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে, শ্রমিকরা পরিশ্রম অনুসারে বেতন পাইবে। সমাজ হইতে ধনিকশ্রেণীর প্রভুত্ব লোপ করিতে হইবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। শ্রমিকদের দৈনিক পরিশ্রমের সময় সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। শ্রমিকশ্রেণীর হিতার্থী হওয়া সত্ত্বেও এই সব সমাজতান্ত্রিকগণ বিপ্লবের পরিপন্থী। ইঁহারা মনে করেন যে আইনের সাহায্যে, আইনসঙ্গত উপায়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা সম্ভব।

মার্ক্স্ ও এনগেল্স্ বলেন যে ভাববাদী সমাজতন্ত্রবাদ অবৈজ্ঞানিক। ইহাতে সমাজের পরিবর্ত্তনকে ও সামাজিক সম্বন্ধকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়া দেখা হয় নাই। ইঁহারা কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিয়াছেন। ফলে ইহাদের সমাজতন্ত্রবাদ কার্য্যকরী হয় নাই।

এন্গেলস বলেন যে, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রচার হওয়ার পরে মানুষ প্রথমে অবহিত হয় যে প্রকৃতির ও ইতিহাসের স্বরূপ অনুধাবন করিতে হইলে, প্রথমে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। মানবসমাজও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত

হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে বিপরীতের দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের প্রকৃতরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক।

মার্কসীয় ঐতিহাসিক দর্শনের মূলকথা এই যে, মানবের সামাজিক সত্তার দ্বারা মানবের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবের সামাজিক সত্তা আবার অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা নবনব যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে যুগে যুগে পরিবার্ত্তিত হয়। মার্কস তাঁহার 'ক্যাপিটাল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অধুনিক ধনিকসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এনগেলসও মার্কসকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'সমাজতন্ত্রবাদ—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' নামক গ্রন্থে ধনিকসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন কি প্রকারে আধুনিক সমাজে ব্যক্তির হাত হইতে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা সমাজের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন অর্থোৎপাদনের ভার ব্যক্তির উপর ছিল, তখন তাহার সম্পত্তির অধিকার ছিল এবং ধনোৎপাদনের যন্ত্র তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু বাস্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রভৃতির আবিস্কার হওয়ার ফলে এবং অর্থোৎপাদনকার্য্যে ইহাদিগকে প্রয়োগ করার ফলে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হাতে অর্থোৎপাদনের কর্তৃত্ব চলিয়া যায়। সুতরাং আধুনিক সমাজে এক নূতন শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের হাতে কোন সম্পত্তি এবং অর্থোৎপাদনের কর্ত্তৃত্ব না থাকায় ইহারা হইয়া পড়িয়াছে নিঃস্ব শ্রমিক, তাই ইহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিক্রয় করিতে হয় আপনাদের শ্রমশক্তি। এই শ্রমিকগণ বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে হইয়াছে সঙ্ঘবদ্ধ। ইহাদের সহযোগিতায় সমাজের অর্থোৎপাদন হইয়া থাকে। সুতরাং আধুনিক সমাজে অর্থোৎপাদন ব্যবস্থা হইয়াছে সামাজিক। কিন্তু যাহারা সমাজের অর্থোৎপাদন করে মূলধনের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। ধনিক-শ্রেণীই হইয়াছে মূলধনের অধিকারী। শ্রমিককে ইহারা শ্রমের জন্য সমান্য পারিশ্রমিক দেয় যাহাতে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং শ্রমিকের কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়ের ফলে যে লাভ হয় তাহা ধনিকশ্রেণীই আত্মসাৎ করে। তাই আধুনিক ধনোৎপাদন ব্যবস্থা সামাজিক বটে, কিন্তু ধনের অধিকার ব্যক্তিগত; অর্থাৎ ইহা ধনিক-শ্রেণীর করায়ত্ত। ফলে দেখা দিয়াছে সমাজের ভিতরে শ্রেণীদ্বন্দ্ব। ইহা ছাড়া অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা করায়ত্ত করিবার জন্য ধনিকের সাথে ধনিকের দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য হইয়াছে। এই দ্বন্দ্ব প্রত্যেক রাষ্ট্রশরীরের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দেখা দিয়াছে। ফলে যুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে অনিবার্য্য। তদ্ব্যতীত ধনোৎপাদনের সঙ্গে মানব প্রয়োজনের সম্বন্ধ না থাকায়, কিছুদিন পরে পরে অর্থসঙ্কট দেখা দেয়। বহু সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজে

প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় আবশ্যক দ্রব্য পাওয়া যায় না। অনেক সময় প্রস্তুত মাল সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, যাহাতে জিনিষের মূল্য কমিয়া না যায়। ইহা ছাড়া ধনিকদের ভিতরে সহযোগিতা বজায় রাখিবার জন্য ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ব্যাঙ্ক সমূহ ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে এবং ইহাদের হাতে দেশের মুদ্রাদির আদান প্রদানের ব্যবস্থার ভার থাকায় ইহারা হইয়া উঠে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। লেনিন দেখাইয়াছেন যে ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিপত্তির ফলে এবং মুদ্রার উপর ইহাদের আবাধ অধিকার থাকায় অর্থোৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক-চালকগণই হইয়া পড়িয়াছে সমাজের প্রধান নায়ক। এই ধনিকসমাজের ক্রমবিকাশের ফলে আসিয়াছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ। প্রস্তুতমাল সমূহের বিক্রয়ের জন্য অন্যদেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এন্‌গেলস্ তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকে ধনিকসমাজের উদ্ভব ও প্রসার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

(১) জায়গিরদারী সমাজে ব্যক্তির হাতে অর্থোৎপাদনের ভার ছিল। অর্থোৎপাদনের যন্ত্র ছিল অপরিণত। যাহারা অর্থোৎপাদন করিত, তাহারা উৎপাদিত অংশের অধিকাংশ জায়গিরদারদের ও নিজেদের ভোগের জন্য ব্যয় করিত। এই শ্রমিকগণ ছিল ভূমিদাস। নিজেদের ও জায়গিরদারদের ভোগের পর সামান্য যা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহার বিনিময় হইত। এই সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও অরাজকতা বর্ত্তমান ছিল।

(২) শিল্পবিপ্লবের ফলে সহযোগিতার সাহায্যে বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উৎপাদনের যন্ত্রসমূহ ব্যক্তির হাত হইতে সমাজের হাতে আসিয়া পড়ে। ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা সামাজিক হইলেও মূলধন ধনিকদের করায়ত্ত হয়। সুতরাং একটি বিশেষ দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা হয় সামাজিক এবং অর্থের অধিকার হয় ব্যক্তিগত।

(ক) শ্রমিকগণ ধনোৎপাদনের যন্ত্রের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা হইয়া পড়ে নিঃস্ব শ্রমিক এবং শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সমাজ বিভক্ত হয় ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে।

(খ) পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিনিময় সম্বন্ধীয় আইন কঠোর হইতে কঠোরতর হয়। অর্থোৎপাদন ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া উঠে এবং অর্থোৎপাদন ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়।

(গ) প্রতিযোগিতার ও উৎপাদনযন্ত্রের উন্নতির ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ফলে পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। অর্থোৎপাদনে সঙ্কট দেখা দেয়। লাভ

না হইলে ধনিকশ্রেণী অর্থোৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়, বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। ধনিকগণ সমাজ শরীরে এই বেকার শ্রমিকদিগকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখে। কারণ এই রক্ষিত শ্রমিক সৈন্যদিগকে ভবিষ্যতে অর্থোৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইতে পারে।

(ঘ) ধনিকশ্রেণী অনুভব করে যে ধনোৎপাদন একটি সামাজিক ব্যাপার। সুতরাং তাহারা যৌথ কারবার, একচেটিয়া ব্যবসা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতির সাহায্যে ধনোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সামাজিক কাজের ভার আসিয়া পড়ে ভাড়াটে কর্ম্মচারীর উপর।

(ঙ) এইসব দ্বন্দ্বের ফলে নিঃস্ব শ্রমিকগণ আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারে এবং জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহারা মূলধনের অধিকার আপনাদের হাতে আনিয়া অর্থোৎপাদনকে বাস্তবিক সামাজিক ব্যবস্থায় পরিণত করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। শ্রমিকনেতাগণ শ্রমিকদিগের ভিতরে ঐক্যসাধন করিবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং বিপ্লবের সাহায্যে ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত অধিকার দূর করিয়া সমাজের হাতে অর্থোৎপাদন ও অর্থবণ্টনের ভার অর্পণ করিবার জন্য উন্মুখ হয়। সমাজে সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলন করিবার জন্য ইহারা পরিকল্পনা করে এবং উঠিয়া পড়িয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থায় উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আবশ্যকতা হ্রাস পায়। মানুষ যখন প্রকৃতিকে এবং বস্তুকে আপনার অধীনে আনিতে পারে তখনই সে হয় স্বাধীন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ জগতের নিঃস্ব শ্রমিকদিগকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রদান করে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেয় যে কি প্রকারে ঐক্যবদ্ধ হইয়া জগতে সাম্যবাদী সমাজ গঠন করিয়া ধনিকসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত করা যাইতে পারে।

কবিতা

পটভূমিকল্লোল

জীবনানন্দ দাশ

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীর বিচ্ছেদ ক'রে বর্শাফলার মত
সূর্য্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে দিগন্তরে;
সকলি চুপ কী এক নিবিদ প্রণয়বশত।
কমলা হলুদ রঙের আলো—আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য্য থেকে লুপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দেয়;—মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেল?
শতাব্দী কি চ'লে গেল!—হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাজ্য ভয় ভুল
সব কিছুকেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত—আরো শান্ত হতে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমানবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে,—
আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হ'তে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে,—
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মত
শান্তি দিতে মৃত্যু দিতে;—জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্য্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

সাপ

অজিত দত্ত

উজ্জ্বল, চিক্কণ, স্নিগ্ধ, লীলায়িত বিচিত্র জীবন
বিবরের অন্ধকারে খোঁজে পলায়ন।
বিশ্বের প্রথমজাত, ভবিষ্যের বিষাক্ত সন্তাপ,
পুরাণে অনন্তরূপী সাপ।

অমোঘ মৃত্যুর মতো ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়
কঠিন করাত-দন্ত যন্ত্রের নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়;
রাজধানী হ'তে ক্রমে শহরে পত্তনে
গঞ্জে ও বন্দরে হিংস্র বিতাড়ন মন্ত্র তা'রা শোনে।
খনিত্রে নিকুঞ্জ ধূলিসাৎ,
দুর্বাশ্যাম প্রান্তরের অন্তঃপুরে কে হানে আঘাত?
শেষজাত মানুষ সন্তান—
নিশ্ছিদ্র প্রস্তরে গড়ে সভ্যতার অলীক সোপান।

অরণ্যের মুক্তরাজ্যে শুষ্কপত্র আস্তীর্ণ নির্জনে
বর্ণের আলিম্প করি' পরিবর্তমান ক্ষণে ক্ষণে,
সৃষ্টির শাসন মানি' প্রজননে, গ্রাসে,
স্বধর্মে যে ছিলো প্রাণোল্লাসে—
ক্রমশ বিলুপ্ত তার স্বাধীন নিশ্বাস
নিয়ত আক্রান্ত—তবু আয়ুর প্রয়াস
প্রতিহিংসা খোঁজে বুঝি বিষে—
বিজিতের প্রতিশোধ তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র দংশনে নিমিষে।

যেন রৌদ্র আর ছায়া বিদ্যুতে ও জলধরে গড়ি'
কৃষ্ণ পীত স্বর্ণবর্ণে পৃথিবীর প্রথম কবরী

হয়েছিলো মণ্ডিত কখনো,
তারপর ফুরালো কি বাসুকির শেষ প্রয়োজনও ?
ধরিত্রীর মাতৃক্রোড় হ'তে ক্রমে বঞ্চিত যাত্রার
কুটিল সর্পিল চিহ্ন অন্তরের উত্তরাধিকার
মানুষেরে দানপত্র করি'
ধরণী-ধারণ-ফণা রসাতলে খোঁজে বিভাবরী।
গ্রাসদন্তে কনিষ্ঠের চরিত্রের লয়ে অভিশাপ
মৃত্যু-পথে অগ্রগণ্য সাপ।

উদ্ধত উদ্যত-ফণা, নির্বিষ সমাজ রক্ষা করি'
বিষদন্ত একাগ্নীতে, গর্বোন্নত, জাতির-প্রহরী
আজো কালান্তক বিষধর
দেহরজ্জু দিয়া বাঁধে জীবনের ভঙ্গুর নিগড়।
তবু কোথা পরিত্রাণ ? আগত মানুষ জন্মেজয় ;-
সভ্যতার সর্পযজ্ঞে খসে' পড়ে নাগের বলয়
পৃথিবীর বাহুমূল হ'তে,
রাজ্যগর্বী বিষকুম্ভ দীপ্তি পায় যজ্ঞের আলোতে।
প্রতিহিংস্র দুর্বলের লুক্কায়িত তীব্র অভিশাপ
পৃথিবীর অন্তেবাসী সাপ ॥

বাংলার সংস্কৃতি

বাঙালীর মন

নারায়ণ চৌধুরী

একটি জাতির মন আবিষ্কার করতে হ'লে সেই জাতির সাহিত্য ও শিল্পের শরণাপন্ন হওয়াই পন্থা। জাতির সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং অন্যান্য বিবিধ কলাশিল্পের মধ্যে জাতির মনকে যেরূপ সুস্পষ্ট ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় এমন আর কিছুতে নয়। দৈনন্দিন ব্যবহারগত জীবনে পরস্পার পরস্পারের সংস্পার্শ থেকে আমরা যে মনের আভাস পাই তা মনের এক একটি টুকরো ঃ এখানে তার খানিকটা আভাস পেলাম তো ওখানে আরও একটু আভাস ঝিলিক দিয়ে গেলো, কিন্তু একই কালে একই আধারে সম্পূর্ণ মন আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। তা পেতে হলে সাহিত্য-শিল্পকলার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তার সে চেষ্টাই আমরা এখানে করবো।

বাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্য অনুধাবন করলে দেখা যায় বাঙালীর মন কোন একটা বিশেষ চিন্তাধারার আশ্রয়ে গড়ে উঠছে না, তা কেবলি ভাব থেকে ভাবান্তরে দোল খেয়ে ফিরছে। এ সম্বন্ধে পূর্বেও আমি আভাস দিয়েছি, আবারও সেকথা বলছি। এই অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অনৈশ্চিত্যের একমাত্র কারণ এই যে আমাদের সাহিত্যিকদের সামনে সুস্পষ্ট কোনো আদর্শ খাড়া নেই। কখনও তাঁরা পশ্চিমী বামপন্থী চিন্তাধারার পেছনে ছুটছেন; কখনও ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রামীণ কৃষকতন্ত্রের জয়গান গাইছেন। কখনও 'সুসভ্য' ও সুক্ষ্মরুচিসম্পন্ন নাগরিক সাহিত্যের পালিশ পছন্দ করছেন; কখনও বাংলার লোকসাহিত্যকেই একমাত্র অকৃত্রিম সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার মনে করছেন। কখনও রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রপূর্ব পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে প্রেরণা খুঁজছেন; কখনও এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে 'কন্টিনেন্ট্যাল' সাহিত্যের নবতম গ্রন্থগুলির তালিকা হাতড়াচ্ছেন। কখনও নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন; কখনও লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ওপর আস্থা স্থাপন করছেন। কখনও বলছেন রাষ্ট্রশক্তিই সমাজের একমাত্র নিয়ন্তা; কখনও আবার

এর উল্টো পিঠে গান্ধীজিকে অনুসরণ করে বলছেন রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থাই ভারতের মুক্তির একমাত্র পথ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ওপরের ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি পোষণ করলে অবশ্য কথা ছিলো না। কিন্তু মুস্কিল এই যে একই সাহিত্যিক ব্যক্তির ও মননের মধ্যে আমরা এই পরস্পরবিরুদ্ধ চিন্তাগুলির সংমিশ্রণ দেখতে পাচ্ছি। শিথিলতার জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক, কোন একটা মতকে সজোরে আঁকড়ে ধরে থাকতে আমরা পারছি না; point ও counter-point মিলে আমাদের যুক্তি ও বিশ্বাসের জগৎকে তছনছ করে দিচ্ছে। আমাদের শিল্প-স্রষ্টাদের জীবনে বোধ করি এইটেই সব চাইতে বড়ো অভিশাপ যে কোন একটা মতকেই তাঁরা চরম নির্ভরতার আশ্রয়স্থল ব'লে মনে করতে পারছেন না, কেবলই ঘড়ির দোলকের মতো মত থেকে মতান্তরে দোল খেয়ে ফিরছেন।

এটা কেন হলো সেইটে বিচার করে দেখা দরকার। আমার তো মনে হয় যুদ্ধোত্তর (প্রথম) যুগে যেসব সাহিত্যিকের মন গড়ে উঠেছে তাদের জীবনে এ না হয়ে উপায় ছিলো না। যে যুগে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যে যুগে তাঁদের মানসিক বিকাশ হয়েছে তার আবহাওয়ার মধ্যেই এমন একটা অনৈশ্চিত্য ও বিরুদ্ধ নীতিসংঘাতজনিত অস্থিরতার ভাব ছিলো যে যাকে এড়ানো সম্ভব ছিলো না। তাঁরা তাঁদের চোখের ওপর দেখেছেন কত পুরাণো নীতি ও বিশ্বাস বানচাল হ'য়ে গেলো, কতো প্রচলিত আদর্শের সমাধি ঘটলো, তাদের জায়গায় এলো কতো নূতন নীতি ও বিশ্বাস, জীবনের মূল্যনির্ণয়ের ভঙ্গি গেলো বদলে—এ সবই তাঁরা নিজেদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। কাজেকাজেই অবধারিতভাবে তাঁদের জীবনবোধও গিয়েছিলো বদলে; তাঁদের দু'দশক আগের মানুষের জীবনেও যেখানে ছিলো স্থায়ী বিশ্বাসের নির্ভরতা, সেখানে দেখা দিয়েছিলো দোদুল্যমানতা, সংশয়, চিত্তদ্বন্দ্ব। এই বিশ্বাসের বিরোধেই আজকের মানুষের মন তৈরী—বিশেষ করে কবিসাহিত্যিকের অনুভূতিপরায়ণ মনে এই বৈষম্যের আবেগ যে আরো তীব্র হ'য়ে বাজবে তা অনায়াসে কল্পনা করে নেওয়া চলে।

যে যুগের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেইটে নিঃশেষে যুগসন্ধিকাল: পুরাতন বিশ্বাসের জগৎ লুপ্ত হয়ে অচিরেই সম্ভাবনাময় নূতন জগৎ আমাদের চোখের সামনে অবারিত হয়ে উঠবে এই লক্ষণ সমাজের প্রতিটি চিন্তায় ও কর্মে প্রকট। যুগসন্ধিকালের ধর্ম এই যে প্রত্যেকটি মতই নিজেকে সজোরে ঘোষণা করতে চায়, চায় ভিন্ন মতকে পরাস্ত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কথাটাকে চিত্ররূপ দিতে গেলে বলতে হয়, পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবগুলি যেন নিজেদের ভেতর ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করছে কে কাকে ছাড়িয়ে মানুষের মনের দরজায় আগে গিয়ে পৌঁছবে। আমাদের সাহিত্যে আজকের দিনে একদিকে যেমন

মার্কসীয় চিন্তাধারার বান ডেকেছে, অন্যদিকে তেমনি গান্ধীজির চিন্তাধারার ছাপও সুস্পষ্ট। গান্ধীজি আজ একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর ভারতীয় রাজনীতির ওপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করলেও তাঁর গঠনমূলক চিন্তাধারার দুর্নিবার প্রভাব সবেমাত্র অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে। এতে বোঝায় এই যে সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা নিজেদের মন খোলা রেখেছেন এবং কোনো কিছুকেই ভারতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই না করে গ্রহণ করছেন না তাঁরা পশ্চিমী বামপন্থী চিন্তাধারার মধ্যে যেমন সত্য (আংশিক) খুঁজে পেয়েছেন তেমনি গান্ধীজি-প্রচারিত আদর্শের মধ্যেও অনুরূপ আংশিক সত্য খুঁজে পেয়েছেন। মুস্কিল বেধেছে শুধু এইখানে যে এই দুই আংশিক সত্যের মধ্যে তাঁরা সমন্বয় সাধন করতে পারছেন না এবং তা না করতে পেরে দ্বিধাদ্বন্দ্বের বেদনায় কেবলই নিজেদের পীড়িত করে তুলছেন। মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদ-রূপ দুই বিরোধী অথচ দুই সমান জীবন্ত, শক্তিশালী চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিযোগিতাই যে প্রধানত এই দোটানার কারণ তা আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। যুক্তিবাদী, নিরপেক্ষ যাঁরা, যাঁরা কোনো দলীয় নীতির কাছে ধরা দেননি, তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন ইউরোপীয় ইতিহাসের নজীরে মার্ক্স-এঙ্গেল্স্-কথিত শ্রেণীসংঘর্ষের আদর্শ যেমন সত্য, তেমনি ভারতীয়, এবং ব্যাপকভাবে প্রাচ্যদেশের ইতিহাসের নজীরে গান্ধীজির Change of Heart নীতিও অভ্রান্ত। আবার অন্যদিকে ভগবানে বিশ্বাসই সমস্ত প্রগতির নিয়ামক—গান্ধীজির এই ধারণা যেমন তাঁরা মানতে পারছেন না, তেমনি বর্তমান ব্যবস্থার উৎখাত সাধনে হিংসার প্রয়োগই একমাত্র পথ এই পশ্চিমী সাম্যবাদী যুক্তিকেও গ্রহণ করতে পারছেন। মার্ক্স যেমন সমাজের objective conditions-এর ওপর অতিরিক্ত জোর দিচ্ছেন, গান্ধীজি সেখানে মন বা subject-এর ওপর অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ করছেন—কিন্তু কি হলে এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করা যায় অথবা আদৌ এদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে উভয়েই অল্পবিস্তর নির্বাক। আধুনিক যুক্তিবাদী মন সেই নির্দেশই চায়—সেই নির্দেশের অভাবেই তাঁর এই অস্থিরতা।

অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী যুগের বুদ্ধিজীবী, কবি ও সাহিত্যিকদের ভেতর এই সংশয়াকুলতা প্রায় অনুপস্থিত ছিল বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় পিতৃক্রোড়ে উপনিষদের যে শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষা তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রাচীন তপোবন সভ্যতার সুমহৎ পরিকল্পনা উত্তর জীবনে তাঁর মনকে যে থেকে থেকে নাড়া দিয়েছে তার মূল ছিলো অই উপনিষদের মন্ত্রবাণীর মধ্যে। ধ্রুবতারার অভ্রান্ত ও অবিচলিত নির্দেশের মতোই উপনিষদ তাঁকে কখনও নির্দিষ্ট পথরেখা থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। তাঁর জীবনদেবতাই বল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের

সমন্বয়ের নীতিই বল, বা কর্মজীবনের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের আদর্শই বল, সবারই মূলানুসন্ধান করলে দেখা যাবে একই উৎসমুখ থেকে তারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে : কোন্ সুদূর কালে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ পিতৃনির্দেশে ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করে পিতার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিয়মিত উপনিষদের দীক্ষা গ্রহণ করতেন, সেই দীক্ষার ছন্দে তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন বাঁধা পড়ে গিয়েছিলো ; আলোকের সন্ধানে তাঁকে আর পথ থেকে পথান্তরে তিমির বিদারণ করে ফিরতে হয়নি।

ঠিক এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সত্যিকার বিপ্লবী হওয়া এতো অসম্ভব ছিলো। একটি শান্ত সৌম্য সুপ্রাচীন আদর্শের আধার থেকে যাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ প্রেরণা উচ্ছ্রিত হয়েছে তাঁর পক্ষে বর্তমান সমাজব্যবস্থার বৈষম্যে লিবারল্ বুর্জোয়া-(যা তিনি ছিলেন) সুলভ কারুণ্য প্রদর্শন করাই স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেবার নির্দেশ যে তাঁর মতো প্রশান্ত ঋষিকল্প অতীতাশ্রয়ী দার্শনিকের কাছ থেকে আসতে পারে না সেটা বলাই বাহুল্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধ্রুব নৈশ্চিত্য রবীন্দ্র-নাথের কবিজীবনের পক্ষে আশীর্বাদ হয়েই এসেছিলো, কেননা আজকের দিনের সংশয়াকুল চিন্তাজীবীদের মতো তাঁকে কখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বজনিত মনঃপীড়ায় ভুগতে হয়নি। কিন্তু এ যুগের মানুষ যারা ঊনবিংশ শতকের আবহাওয়ায় মানুষ হয়নি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পিতৃপরিবারের আবহাওয়া যাদের অলভ্য শুধু নয়, ধারণার বাইরে, নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে পথ করে যাদের জীবনে এগোতে হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্য তাদের স্বপ্নকল্পনার জগৎকে তৃপ্ত করতে পারলেও তাদের বাস্তবানুসারী মনকে কিছুতেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারে না। যাদের জীবনে প্রতি পদে দ্বিধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, আদর্শের অনৈশ্চিত্য, তারা সেই সাহিত্যই বেশি ভালোবাসবে যাতে জটিলতা, রুক্ষতা, অস্বচ্ছতা, অত্যাবশ্যক উগ্রতা---রবীন্দ্রনাথের অনুগ্র শান্তশ্রীমণ্ডিত সাহিত্য আজকের দিনের মনকে একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত নাড়া দিতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের জন্যে আজকের মন তৈরী নয়, রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ মহিমা মাত্র সেইদিন উপলব্ধ হবে যেদিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের মন জটিলতার পাক থেকে মুক্ত হয়ে শান্তশ্রীতে ফিরে আসবে। আজকের বাঙালীর মনের তার মাইকেল বা নবীন সেনের কাব্যের সুরের সঙ্গে মিলতে পারে, ঊনবিংশ শতকের যুক্তিবাদী লেখকদের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি) গ্রহণ করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্ব পীড়িত এ যুগের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ আংশিকভাবে অন্ততঃ নিমীলিত পুস্তকের ন্যায় অসার্থক হয়েই রইলেন। এ যুগে রবীন্দ্রসাহিত্য বড়ো জোর রূঢ় বাস্তব-

বোধ পীড়িত মানুষের পলায়নী বৃত্তির খোরাক যোগাতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণ তাৎপর্যের উদ্‌ঘাটন অবশ্যতই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

শরৎচন্দ্রের মধ্যেও অল্প বিস্তর আমরা এই লক্ষ্যের স্থিরতা দেখ্‌তে পাই। বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘাত দূরে থাকুক, এইরূপ কোনো সমস্যাই শরৎচন্দ্রের জীবনে উঁকি দেয়নি। তাঁর ক্ষেত্রে একটি মাত্র প্রেরণা স্থায়ী সংস্কারের মতো বরাবর কাজ ক'রে গেছে: সেটি হলো নিপীড়িত ও দুর্গতের প্রতি তাঁর অপার সহানুভূতি। এই দরদ, এই সহানুভূতিই ছিলো তাঁর সাহিত্যের মূল সুর, সেইটেই একটা বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকে তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনকে চালিত করেছিলো। তা যদি না হতো তো শরৎচন্দ্রের পক্ষে বাংলার পল্লীবাসী দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সংস্কার কাটিয়ে উঠে ঔদার্যে ও মানবপ্রেমে বিস্ফারিত হয়ে ওঠা কঠিন হতো—চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় যে parochialism মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে উঠেছে দেখ্‌তে পাই সেই দৈন্যই তাঁকে বাধা দিতো। শরৎচন্দ্র পতিতার প্রতি দেবীত্বের আরোপ করেছিলেন, এবং এই বিষয়বস্তুটি তাঁর রচনায় বরাবরই যুক্তিহীন প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বলা যেতে পারে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের এইটেই ছিলো standing theme। যদিও আজ্‌কের মনের কাছে এই পতিতাপ্রীতির অনেকখানিই অবাস্তব, অসঙ্গত, হাস্যকর বলে মনে হবে, তা হ'লেও এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের আন্তরিকতা অস্বীকার করবার উপায় ছিলো না। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসাবেই শরৎচন্দ্র পতিতাকে গ্রহণ করেছিলেন, আর যেহেতু প্রতীকমাত্রেরই বর্ণনায় খানিকটা আতিশয্য খানিকটা যুক্তিহীন আদর্শবাদপ্ররোচিত অবাস্তব না এসে পারে না সেই হেতু পতিতার প্রতি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সদ্‌বৃত্তি আরোপ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিলো না। সে যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের অন্তরের দরদ ও করুণাই ছিলো তাঁর সৃষ্টির প্রধান উৎস এইটেই শুধু এখানে আমাদের বল্‌বার কথা, আর এ থেকেই প্রমাণ হয় যে তাঁর হৃদয়মননের প্রবাহটুকু একই খাতে বরাবর প্রবাহিত হয়ে গেছে, ভিন্নমুখী প্রবৃত্তি এসে তাতে যখন তখন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে নি।

শরৎ-রবীন্দ্রের সূত্র ধরে আরও আগে যদি চলে যাই তা হলে সেখানেও এই এক-মুখীনতাই আমরা লক্ষ্য করি। বিশেষ করে উনবিংশ শতকের সাহিত্যিকদের এক এক জনের মধ্যে এবিষয়ে চূড়ান্ত অভিনিবেশ চোখে পড়ে। আমরা দেখ্‌তে পাই সে সময়কার লেখকেরা, তা তিনি কবিই হোন্, আর কথাসাহিত্যিকই হোন্ আর প্রবন্ধকারই হোন্, একটি মাত্র ভাবকে আশ্রয় করে চলেছেন—সেই ভাব দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো না। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মূল প্রেরণা ছিলো ধর্মীয় সংস্কারের প্রেরণা, তার ভেতর আবার নব্য জাতীয়তার ভাব ওতঃপ্রোত হয়ে মিশে ছিলো। এই দুটি লক্ষণ ছাড়া আর কোনো লক্ষণ সেই সময়কার

সাহিত্যে তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি। তখনকার মূল ঝোঁক ছিলো সংস্কারের প্রতি, বিপ্লবের প্রতি নয়; তাই সমাজেই হোক্, সাহিত্যেই হোক্ আর অপর যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক্ মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়ায় বিচিত্র ভাবের কারিকুরি বা অসঙ্গতি তেমন বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে নি যেমন আজকে দিয়েছে। সে যুগ যদি বিপ্লবের যুগ হতো তা হলে অবশ্যই বিপ্লবী মানসজাত বিচিত্র ভাবদ্বন্দ্বের দ্বারা তখনকার সাহিত্য জটিল হয়ে উঠতো। কিন্তু তা হয়নি। যিনি জাতীয়তা পরিবেষণ করেছেন, তিনি জাতীয়তাই পরিবেষণ করেছেন (যথা নবীন সেন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি); যাঁদের মধ্যে ধর্মের উদ্দীপনা প্রবল ছিলো তাঁরা সাহিত্যে মূলত ধর্মগত প্রেরণাকেই অবলম্বন করে ছিলেন (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ; অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি)। অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এঁদের ভেতর চিত্তদ্বন্দ্ব ছিলো না তা বলি নে, তবে তাঁদের রচনার মূল ঝোঁকটি গিয়ে পড়েছিলো ধর্মের ওপর সেকথা অস্বীকার করা যায় না। এই দুই শ্রেণীর লেখক ছাড়া অবশ্য আর এক শ্রেণীর লেখক ছিলেন যাঁদের রচনা উপরোক্ত দুটি পর্যায়ের কোনো পর্যায়েই পড়ে না; বাংলা সাহিত্যে তাঁদের লেখাতেই প্রথম আমরা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের রচনা দেখতে পাই। এঁরা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায়ও এই যুক্তিবাদের লক্ষণ স্পষ্ট, তবে সে যুক্তিবাদকে তিনি সনাতন হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার সমর্থনে প্রয়োগ করেছেন, বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে নয় এই যা তফাৎ।

ইচ্ছে করেই আমি এতোক্ষণ মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের নামোল্লেখ করি নি। তার কারণ সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের ভেতর মধুসূদনই একমাত্র লেখক যাঁকে, কি আঙ্গিকের বিপ্লবের দিক থেকে কি ভাবের বিপ্লবের দিক থেকে, আধুনিক সাহিত্যিকদের সমগোত্রীয় করা চলে। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার বিপ্লব যদি কেউ এনে থাকেন তো তিনি মাইকেল। তাঁর বিপ্লবপ্রচেষ্টা শুধু কাব্যের প্রচলিত ছন্দের সংস্কার ভাঙার কাজেই নিবদ্ধ ছিলো না, তিনি ভাবের ক্ষেত্রেও ছিলেন মস্ত বড়ো বিপ্লবী। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি বিপ্লবী মনের একটা প্রধান লক্ষণই হলো অস্থৈর্য, স্বতোবিরোধ। আধুনিকদের মধ্যে এই স্বতোবিরোধ যেমন এযুগের বিপ্লবী আবহাওয়াকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তেমনি মাইকেলের মনের স্বতোবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ভেতরও সেই বৈপ্লবিকতার স্বাক্ষরকেই আমরা চিনে নিচ্ছি। মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস অনুধাবন করলেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ নির্ণয় সহজ হয়ে পড়ে। মাইকেল খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এতে তাঁর মন স্বভাবতই পশ্চিমের তদানীন্তন ভাবজীবনের সহিত ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়েছিলো। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভেতর আদর্শ চরিত্র রূপে রামের পরিবর্তে রামবৈরীকে চিত্রিত করার

মধ্যে তাঁর ভেতর একই সঙ্গে আমরা প্রচলিত সংস্কার খণ্ডনপ্রয়াস ও মিল্টনের প্রভাব লক্ষ্য করি। আবার এই বিপ্লবপ্রীতি ও ইউরোপীয় প্রভাবের আরেকপিঠে তাঁর মনে কোথায় যেন বাঙালীর ঐতিহ্য অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই লুকিয়ে ছিল। নইলে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' বিপ্লবী রচয়িতার পক্ষে অত্যন্ত সুমিষ্ট ছন্দ ও ভাবাত্মক 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এই বিসদৃশ ব্যাপারটির একমাত্র সুসঙ্গত ব্যাখ্যা তখুনি সম্ভব যখন আমরা মধুসূদনের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষার সংস্কার ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারকে মিলিয়ে বিচার করবো। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ঋজু বলিষ্ঠতা ও দার্ঢ্য যে হাতের সৃষ্টি সেই হাত থেকেই আবার ললিতমধুর রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' উদ্ভব—এই আপাত-বিরোধকে মধুসূদনের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই বাহ্যিক প্রতিফলন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাই মধুসূদন ইংরেজ অভ্যুদয়ের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক আদিগুরু হওয়া সত্ত্বেও ভাবের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিকদের আত্মার আত্মীয়; তাঁরই মানসসন্তান এ যুগের বিপ্লবী কবিকুল। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এযুগের কবিরা জান্তে-অজান্তে অনেককিছুই গ্রহণ করেছে, কাল্পনিকতার প্রসার, ভাবসৌকুমার্য, পদলালিত্য, ভাষাসম্পদ, ছন্দোকুশলতা এ সমস্তেরই দীক্ষাগুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু আধুনিকদের মধ্যে বৈপ্লবিকতার প্রেরণাটুকু রবীন্দ্রনাথ থেকে আসে নি, যদি সেই প্রেরণা কেউ জুগিয়ে থাকেন তিনি মাইকেল, আর কেউ নন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা এই বৈপ্লবিকতার সাক্ষাৎ পাই না। তিনি মূলত সংস্কারকামী ছিলেন; সেই সংস্কারকামিতাই তাঁর সাহিত্যে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ ধীসম্পন্ন লেখক ছিলেন; তাঁর লেখনীর শক্তিমত্তা শুধু রসসৃষ্টিতেই ব্যয়িত হয় নি, জ্ঞানগর্ভ চিন্তার পরিবেষণেও নিযুক্ত ছিল। পাণ্ডিত্যে তাঁর জুড়ি লেখক বাংলা সাহিত্যে এ যুগেও বেশি কেউ জন্মায় নি। নব্য জাতীয়তার তিনিই ছিলেন প্রথম ঋত্বিক, প্রধান হোতা। বাঙালীর চিন্তাধারায় মিল, বেন্থাম, কোঁতে প্রভৃতি ইউরোপীয় মণীষীদের আদর্শের প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে সাম্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি ভাব বহন করে এনেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর অত্যুগ্র মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে অতিক্রম করে তিনিই প্রথম সাহিত্যে চাষীর দুঃখদুর্দশাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন ('বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকের পরাণ মণ্ডল আখ্যান দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর লেখায় এই প্রশংসনীয় আদর্শগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই না। যে ভাবের বীজ তিনি বপন করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় অনায়াসে তিনি তাকে ফুলেফলে সুশোভিত করে তুলতে পারতেন, অর্থাৎ সেই ভাবকে তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তাঁর সংরক্ষণশীলতাই সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সংস্কারধর্মী মনের যা স্বভাব,

খানিকটা দূর এগিয়েই তিনি আর এগোতে সাহস পান নি, বিপ্লবের চেহারা মনশ্চক্ষে দেখে ভয়ে পেছিয়ে এসেছিলেন। এবং এই পিছু টানেরই ফল বিদ্যাসাগর-বিরোধিতা, 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' এবং সর্বশেষে 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। হিন্দুসমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার আত্যন্তিক উৎসাহে তিনি মুসলমান সমাজকে পর্যন্ত আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আজকের মুসলমান সমাজের যে অভিযোগ তাকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রশ্নে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই আমরা চোখকান বুজে নিজ নিজ কাজের সমর্থনে ব্যস্ত; নইলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভকে শুধু কথার তোড়ে উড়িয়ে দেবার চেস্টা না করে বঙ্কিমের হয়ে সেই ক্ষোভ অপনোদন করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হতো।

যাক্, আমার বল্‌বার কথা এই যে স্থিতাবস্থার রক্ষণপ্রয়াসই বঙ্কিমকে তাঁর স্বক্ষেত্রচ্যুত করেছিলো; নইলে নানা কারণে তিনি আজও আমাদের সাহিত্যগুরু হয়ে থাক্‌তেন। আমরা দেখি ভাবের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মনও একটি স্থায়ী লক্ষ্যকে অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলো। তার একটা প্রমাণ এই যে তিনি তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যিক জীবনের মোটা অংশটুকুই একটি বিশেষ ভাবের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একদিকে জাতীয়তার মন্ত্রের ঘোষণা, অন্যদিকে হিন্দুসমাজ রক্ষার আহ্বান, এ দুয়ের মিলিত আবেদনেই তাঁর তিন চতুর্থাংশ সাহিত্য তৈরী। একেবারে শেষ অধ্যায়ে তিনি এসব ছেড়ে দিয়ে ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন, তারই ফল 'কৃষ্ণচরিত্র' আর 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। অনেক বিচার বিবেচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে কৃষ্ণই একমাত্র আদর্শপুরুষ যাঁর ভেতর সমস্ত বিরুদ্ধ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য ঘটেছে, কাজেই তাঁকেই সকলের (হিন্দু সকলের) অনুসরণ করা উচিত। এই ধর্মানুশীলনের অধ্যায়েও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির একমুখীনতা আমরা লক্ষ্য করি। কেননা উনিশ শতকের আরও অন্যান্য অনেক লেখকের মতো তাঁর ভেতর যখন ধর্মভাব প্রবল হয়ে উঠলো তিনি তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসকে বর্জন করেই সেটা করতে চেয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পাঠে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে 'সাম্য' পুস্তকের প্রচার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা পীড়িত হওয়ার বিরোধী ছিলেন—হয় এই পথ নয়তো অই পথ এইরূপ চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করবার দিকেই তাঁর মনের প্রবণতা ছিল। এক কথায় তিনি সহজ পথের পথিক ছিলেন, আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে বল্‌লে, তিনি একদেশদর্শী ছিলেন।

আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই এই একমুখীনতারূপ বৈশিষ্ট্যটুকুর অভাব।

এটা গুণ কিম্বা দোষ যাই হোক্, এই দিয়েই আধুনিক বাঙালী লেখকের মন তৈরী। আজকের দিনের যে সব লেখক চিন্তার ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতার পক্ষপাতী তাঁদের সঙ্গে পুরাতন সাহিত্যিকদেরই ভাবের মিল, নতুন যুগের আবহাওয়া তাঁদের ধাতস্থ হয়নি।

আমরা অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রপূর্ববর্ত্তী যুগটিকে দেখে নিলাম। এবারে আমাদের রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের পরিক্রমা সুরু হবে। কিন্তু তার জন্যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের পরিসর দরকার। আমরা বারান্তরে সেই আলোচনার সূত্রপাত করবো।

প্রাক-আধুনিক নাটকের প্রকৃতি

করালীকান্ত বিশ্বাস

বাংলা প্রাচীন নাটকের পুঁথি বিশেষ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সুদূর অতীতকালেও যে অভিনয় হইত তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন যাত্রাভিনয়ের অনুকরণে আধুনিক কালে যে যাত্রাগান হয় তাহাতে নানা ভেজাল মিশিয়াছে বলিয়া এগুলিকে নিকৃষ্টতম রূপ বলিয়া গণ্য করা যায় না। অথচ বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন যাত্রার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও অপরিহার্য্য। এই ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই অনুমানের উপরে নির্ভর করিতে হয়, অনেক অংশ কল্পনা দ্বারা পূরণ করিতে হয়।

ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলা যাত্রাভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা হইতেই বাংলা যাত্রার উৎপত্তি। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কয়েকটি পুঁথি হইতে ও পরিচিত কয়েকজন অধিকারীর জীবনী ও তাঁহাদের দলের অভিনয়ের কাহিনী হইতে এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই ধারণা একান্ত ভুল। গীতাভিনয় সম্বন্ধে সাহিত্যে প্রথমে উল্লেখ পাওয়া যায় চরিতগ্রন্থগুলিতে। চরিতগ্রন্থগুলি অধিকাংশই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। উক্ত গ্রন্থগুলিতে অনেক স্থানেই অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তগণ অভিনয় করিতেন ইহার উল্লেখ আছে। অভিনয়গুলিতে শ্রীকৃষ্ণজীবনবৃত্তান্ত ও লীলাপ্রসঙ্গ বর্জ্জিত নহে বটে, কিন্তু অধিকাংশ

ক্ষেত্রে বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনীই অভিনয়ের বিষয় ছিল। ডক্টর কীথ যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে রামায়ণ মহাভারত আবৃত্তি ও গান হইতেই যাত্রার উৎপত্তি। ডক্টর কীথের উক্তির সমর্থন উপরে পাওয়া যাইতেছে।

কথকতা নাট্যাভিনয়ের নিকটতম রূপ। কথকতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু বাংলা দেশে কথকতা ও যাত্রার মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। আধুনিক কালেও দুইটিরই প্রচলন আছে। কীথের মত গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে কথকতাই প্রাচীনতম অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রমাণাভাবেই তাহাতে বাধা। যাহা হউক, কথকতার প্রভাব বাংলা যাত্রাভিনয়ে দেখিতে পাই। যে সব অভিনয়ে প্রাচীনতর আদর্শ অধিকমাত্রায় বজায় আছে—যেমন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গান প্রভৃতি, তাহাতে বক্তৃতার অংশ কম। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গীতাভিনয়ে বক্তৃতা অনেক বেশী, এমন কি কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ। কথকতার প্রভাবেই যে বক্তৃতার প্রসার সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অনেকে মনে করেন যে প্রথমে গীতাভিনয়ের লিখিত পুঁথি ছিল না। পুঁথি পাওয়া যায় নাই, কাজেই পুঁথি ছিল না এমন যুক্তি কেহ দিবে না। পুঁথি ছিলনা এরূপ মনে করিবার কারণ চরিতগ্রন্থগুলির বর্ণনা। বর্ণনা হইতে মনে হয় যে যদিও সাজ-পোষাক ও মেক-আপ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল তথাপি অভিনেতারা নিজেদের খুসীমত কথা বলিতেন অথবা গান করিতেন। লিখিত পুঁথির অভাবের স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবার মত। চৈতন্যগ্রন্থগুলির কয়েকটির প্রামাণিকতা স্বীকৃত। কিন্তু কোনটিতেই পালাগানের লেখকের পরিচয় অথবা উল্লেখ নাই। অথচ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকতর বর্ণনা এবং প্রমাণ উল্লেখ করিবার প্রয়াস আছে। হাস্যরস সৃষ্টি করিবার জন্য বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধার ভূমিকা অভিনয়ের যে সামান্য বর্ণনা আছে তাহা হইতে মনে হয় যে এই ভূমিকাগুলির বক্তব্য আদৌ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নহে। পুঁথি ছিল কিম্বা ছিলনা তাহা ভবিষ্যতে নিশ্চিতরূপে জানা যাইবে, কিন্তু এই একটি বিষয়ের অভাবে প্রাচীন নাটকের ফর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিবার পথে বাধা।

প্রাচীনতম লিখিত নাটকের বই পাওয়া গিয়াছে নেপালে। পালাগুলির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর এ ধারে নহে। "নেপালে বাংলা নাটক" নাম দিয়া যে নাটকগুলি সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভাষা এত বিকৃত যে অভিনয়-নির্দ্দেশ অনেক স্থানেই বুঝিতে পারা যায় না। মূল নাটকগুলি বাংলা ভাষায় রচিত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই নাটকগুলি হইতেও আদি বাংলা নাটকের প্রকৃতি বুঝিতে

পারা যায় না। একটি বিষয় মাত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ঐ নাটকগুলিতে কাহিনীর অংশ নিতান্তই কম, নাটকীয় রচনা নাই বলিলেই চলে। অসংখ্য গান আছে। চৈতন্য-ভাগবতে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে নাটকের বিষয় ছিল পৌরাণিক কাহিনী। উহাতে ঘটনা আছে, ঘটনার সংঘাত ও প্রবাহ আছে। ইয়োরোপীয় আদর্শে নাটক বলিতে যাহা বুঝায় বাংলা দেশে তাহার অনুরূপ কোনও আদর্শ গৃহীত হইলে একটি পরিপূর্ণ কাহিনী অথবা ঘটনাই নাটকের বিষয় হইত। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা হইতে মনে হয় রচয়িতা অথবা অভিনেতা ঘটনার সংঘাতের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। নাচ গান ও ছোট ছোট কথা এবং হালকা হাস্যরসের সৃষ্টিতে অতি মন্থর গতিতে নাটক অভিনয় চলিত। শরতের মেঘের মতই তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইত।

চৈতন্যচরিতামৃত অথবা ভাগবতে নাট্যাভিনয়ের যেটুকু বর্ণনা আছে তাহাই প্রাচীন নাটকের রূপ বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু আরও অন্যান্য প্রভাব এই অভিনয়ে ক্রমাগতই বাড়িয়াছে এবং অভিনয়ের রূপও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাংলা দেশে ঝুমুর গানের প্রসিদ্ধি ছিল। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন যে প্রাচীনতম নাট্যাভিনয়েরই ইহা রূপান্তর এবং যাত্রা বলিতে এখন যাহা তাহারই পূর্ব্বরূপ। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণাদি নিশ্চয়ই তাঁহার জানা আছে, তবে তিনি সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। ঝুমুর গানের প্রকৃতি হইতে মনে হয় তাহা যাত্রার পূর্ব্বরূপ হইতে পারে। কারণ তাহাতে রঙ্গভূমিতে কখনই দুইজন পাত্রপাত্রীর অধিক স্থান পায় না। যাত্রায় এককালে দুইয়ের অধিক অভিনেতা প্রবেশ করে। ঝুমুর গানে দুইজনের মধ্যে কথোপকথনের মত উত্তর-প্রত্যুত্তরে গান গাওয়া হয়। ডক্টর সেন বলেন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুর গানের প্রাচীনতম নিদর্শন।

আরও একটি অভিনয়ের কাছাকাছি একটি অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলাদেশে চলিত আছে। তাহা হইতেছে পাঁচালি। সংস্কৃত পঞ্চালিকা শব্দ হইতে কথাটি আসিয়াছে ধরিয়া লইলে পুতুল নাচের সঙ্গেই পাঁচালি গান গীত হইত। একজন গান গাহিত চামর ও মন্দিরা লইয়া, সঙ্গে নূপুর পায়ে নাচও চলিত। পাঁচালি ও ঝুমুর গানের মাধ্যমই প্রাচীন বাংলা কাব্য গীত হইত। আধুনিক পাঁচালিতে যাত্রার প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে এবং দুইটি ভূমিকা তাহাতে স্থান পাইয়াছে।

পাঁচালিও যাত্রার পূর্ব্বরূপ হইতে পারে। অনেকে অনুমান করেন যে মঙ্গলকাব্যগুলি পাঁচালি গানের সাহিত্যরূপ। পুতুল নাচের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলি গীত হইত। এই মত সত্য হইলে পাঁচালিকে ঝুমুর এবং যাত্রা অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে হয়। তবে প্রাচীন পাঁচালির নিদর্শন আদি নাটক অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য। আধুনিক পাঁচালিতে কৌতুক-

রসের প্রাধান্য বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আবার যাত্রাগানের প্রসার লাভ করিলে আধুনিক পাঁচালি হইতে অনেক উপাদান তাহাতে গৃহীত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে আধুনিক নাটকের সূত্রপাত। একদিকে যেমন ধনীদের গৃহে মঞ্চ বাঁধিয়া সমসাময়িক ইংরেজদের অনুসরণে নাটক অভিনয় চলিত তেমনি আর্থিক সঙ্গতিতে যাঁহারা হীন তাঁহারাও সখের যাত্রার দল গড়িয়া নাটক অভিনয় আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যাভিনয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় বেশী স্থান পায় নাই বটে, কিন্তু উহার প্রভাব পরবর্তীকালের নাটকে অত্যন্ত স্পষ্ট। সখের যাত্রায় জনপ্রিয় উপাদানগুলি প্রায় সবই স্থান পাইয়াছে। প্রাচীনতম নাট্যগীতের প্রভাবও তাহাতে বর্জ্জিত নয়। তেমনি ঝুমুর পাঁচালী হইতেও কিছু কিছু বিষয় ধার করা হইয়াছিল। সমসাময়িক কবি, খেউর, আখড়াই প্রভৃতির চিহ্নও তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই কারণে কবি, খেউর প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

খেউর গানের উৎপত্তি শান্তিপুর অঞ্চলে। হাল্কা সুরে আদিরসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে এই গান গাওয়া হইত। খেউর গানে তরজার মত প্রশ্নোত্তর চলিত। এই প্রশ্নোত্তর খেউর গানকে নাট্যাভিনয়ের কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে। শান্তিপুর নদীয়া হইতে পরে এই গান কলিকাতা আমদানী হয়। কলিকাতা আসিয়া খেউর কয়েকজনের চেষ্টায় কিছুটা সংস্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একটি যুগান্তে যে আর্টফর্মের উৎপত্তি তাহাতে জীবনীশক্তি কম হইতে বাধ্য। খেউরও পৃষ্ঠপোষকের অভাবে ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যায়।

কবি গান প্রাচীন অনুষ্ঠান বলিয়া অনুমিত হয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' গ্রন্থকার উনবিংশ শতাব্দীর কবি গানের বর্ণনা দিয়াছেন। তখনকার কলিকাতার লোকের রুচি আদর্শের বহু দূরে ছিল। কলিকাতায় কবিগানের প্রসিদ্ধি হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী ও ভোলা ময়রার নামে প্রচলিত যে দুই চারিটি শ্লোক এখনও প্রচলিত তাহাতেও রুচির বিকারের প্রমাণ আছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুইজনের witএরও প্রশংসা করিতে হয়। কলিকাতায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে কবিগানের প্রচলন হইয়াছিল তাহা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কবিগান হইতে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। কলিকাতায় উনবিংশ শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে। কলিকাতার কবিগান নিতান্তই কলিকাতার সৃষ্টি, বাংলাদেশের জনসাধারণের তাহার সহিত অল্পই সম্বন্ধ। এই সব কবিগানের বিষয় ও ভাষা সাধারণের অনধিগম্য।

কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে কবিগানের প্রচলন এখনও আছে। তথাকথিত

অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষ থাকিলেও গ্রামের লোকের কবিগানপ্রীতি নিন্দনীয় নহে। ইহার ভিতর দিয়াই গ্রামের লোকের কাব্যসৃষ্টিপ্রেরণা বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রামের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃত হইলে কবিগানের নিন্দনীয় বিষয়গুলি দূর হইবে আশা করা যায়।

কবিগানের প্রশ্ন ও উত্তরে Wit এর ব্যবহার লক্ষণীয়। নিছক কথা দিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিতে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী খুবই পটু। বাঙ্গালা দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সাধারণ কথাবার্ত্তাতেও লোকের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রা এবং নাটকে কবিগান হইতে ইহাই মাত্র গৃহীত হইয়াছে। যাত্রাগানে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া কখনও কখনও পাত্রপাত্রী সরস বাকযুদ্ধ করিতেছে। ইহা কবিগানেরই দান।

উপরের এই আলোচনা হইতে প্রাক-আধুনিক যাত্রাগানের রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না এ কথা সত্য। তবে বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা যায়।

বিষয়ের দিক হইতে দেখা যায় যে প্রথমে পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, চণ্ডীযাত্রা, শৈবযাত্রা, ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী প্রভৃতি অবলম্বনে নাটক অভিনীত হইত। হয়ত প্রথম যুগে কোনও লিখিত পুঁথি ছিল না। অভিনয়ে গানই ছিল প্রধান। হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ছিল। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রকার অভিনয়েই একটি বিশেষ ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করা হইত।

উপরোক্ত সবগুলি উপাদানই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব উপাদান অবলম্বন করিয়া ও তাহাতে থিয়েটারী বিষয় মিশ্রিত করিয়া আধুনিক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি আধুনিক যাত্রাকে বাংলা আদি নাটকের পূর্বতন রূপ বলা যায় না। আদি নাটকের কোনও নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে, তবু মনে হয় আধুনিক যাত্রা আধুনিক নাটকের নিকটতর আত্মীয়, আদি নাটকের নহে।

সামাজিক বিশেষ পরিবেশ হইতেই শিল্প উদ্ভূত হয় এবং শিল্পরাগের নিয়ন্তাও এই সামাজিক পরিবেশ। যে সমাজে আমাদের আদি নাটক উদ্ভূত হইয়াছে তাহার গঠন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নাটকের রূপও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন নূতন উপাদানের ভারে ফর্ম্মে পূর্ব্বাপর কখনই এক থাকিতে পারে না। অতীতের শিল্পকলার সহিত বর্ত্তমান যুগের যোগ স্থাপন সেই কারণেই একটি বিশেষ সমস্যা। আমাদের দেশে সে সমস্যা আরও জটিল। কারণ আমাদের সমসাময়িক সংস্কৃতির অনেক উপাদানই বিদেশ হইতে আমদানী করা, দেশজ সংস্কৃতির ধারার সহিত তাহার অত্যন্ত ক্ষীণ যোগ। জনসাধারণ এই সংস্কৃতির শুভাশুভের সহিত বিশেষ যুক্ত নহে। শিল্প উপভোগ করিতে

যতটুকু সৃষ্টিক্ষমতা স্পন্দিত হওয়া দরকার, জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক শিল্পকলা তাহার কিছুই পারে না। এই জন্যই সম্প্রতি দেশজ সংস্কৃতি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা চলিতেছে। পুরাতন আর্ট ফর্মে নূতন বিষয় প্রভৃতির প্রবেশপথেরও অনুসন্ধান চলিতেছে। আমাদের দেশে আদি নাটকের গুণ সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জানিতে পারি তাহারও পূর্ণতর বিকাশ সম্ভব। কিন্তু বাধা হইতেছে প্রকৃত গ্রামবাসীদের এইদিক হইতে চেতনা এখনও আদৌ আসে নাই। প্রকৃত নাটক ও আমাদের দেশের আদি নাটকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশজ নাটক অবজ্ঞাত হইয়াছিল, নূতন আদর্শেও সার্থক নাটক রচিত হয় নাই। জাতীয় নাটক বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অভাবের অন্যতম কারণ ইহাই। জাতীয় নাটক সৃষ্টির উপায় চিন্তা করিতে গেলে দেশের জনসাধারণের কথা স্মরণ রাখিতেই হইবে এবং জনসাধারণ যাহা সহজ পরিচয়ে গ্রহণ করিতে পারে তাহাই তাহাদের পরিবেশন করিতে হইবে।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একুশ

'কাজটা কি ভাঙবার না গড়বার ?

একটা লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার বিক্রির কাজ নিয়েছে অধিপ। আরো কটার সঙ্গে কথা বলেছে। সকালবেলা চা খেয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে প্রায় দুপুরের ধার ঘেঁসে। স্নান করে চারটি মুখে গুঁজে আবার বেরিয়ে যায় তক্ষুনি। এবার যায় ছোটখাট একটা আপিসে নগণ্য কেরাণিগিরি করতে। নিশ্চিত কিছু একটা রোজগার দরকার। তার এখন একটা সংসার হয়েছে। ঘর-দ্বার হয়েছে। ভাবতে হাসি পায়, ঘর-বসতে রুচি হয়েছে।

তবু, সন্ধে কাবার করে সুস্থভাবে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যাবৃত্ত পশুর মত ঘুমোয়।

একদিন বসে-বসে গল্প করার বড় সখ ছিল অধিপের। গা এলিয়ে, মন ভাসিয়ে দিয়ে। কথায়-কথায় কোথায় এসে পৌছুনো যায় তার অভাবন উদ্ভাবনের জন্যে বড় আগ্রহ ছিল তার। তার জন্যে চাকরি পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ সে গল্পের মানুষকে বাড়িতে ফেলে রেখে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাছে সে তাকে অলস মনে করে, অকর্মক মনে করে। মনে করে নতুন হবার অযোগ্য।

কিন্তু এই কি তার কাজের পরিচয়? তার নতুন হবার নমুনা? এই কেরাণিগিরি, এই উঞ্ছজীবিকা? ঠোঁটে করে খুঁটে-খুঁটে খড়কুটো কুড়িয়ে আনা? সে কি শেষকালে গৃহস্থবাড়ির আঙিনায় ভদ্র একটি গাছের কোটরে নীড় তৈরি করবে? তাইবা নয় কেন? অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে সে জীবনে, এখন কি পাবে না সে একটি পরিমিততার শান্তি? উজানের পর আসবে না কি ভাটার স্নিগ্ধতা? আগ-জোয়ারে অনেক দূর ঠেলে চলে এসেছে অধিপ, এবার সর্বশেষ ভাটায় নেমে যাবে না কি সমুদ্রের দিকে?

স্বস্তি পায় না অধিপ। দিন-রাত ছটফট করে। মনকে বোঝাতে পারে না। মনে হয় তার কাজ গড়বার নয়, ভাঙবার, নির্মূল করে নির্মল করবার। তাই এতদিন আর কিছু না পেয়ে সে যখন তার জীবনটাকে ভাঙছিল, তখন তার মাকেও পাচ্ছিল সে বিদ্রোহের আনন্দ। কিন্তু জীবনের কাছে এ বশ্যতাস্বীকারের ভদ্রতা দিনে-দিনে তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। অসহ্য এই মৃতুজীবীতা। এই অল্পপ্রাণ দিনযাপন। অধিপের ইচ্ছে করে নিজের হাতে বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাশের ঘরে গিয়ে তামসীকে জোর করে জাগিয়ে দেয় ঘুমের থেকে। এই মুখস্থ-করা মামুলি পৃষ্ঠার থেকে চলে আসে তারা আরেক জ্বলন্ত পরিচ্ছেদে।

কিন্তু কী আশ্চর্য-সুন্দর একটি ঘুম তৈরি করেছে তামসী! একটি নিটোল পদ্ম। বড় কষ্টের ঘুম তার। অনেক নির্ভর, অনেক নিবেদন মাখানো। মায়া করে অধিপের।

শেষকালে সে কি মায়ায় জড়িয়ে যাবে নাকি?

কাঁচের ফুলদানিটা অধিপ ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ফেলল মেঝের উপর। প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল।

রান্না করছিল তামসী। কি হল? ছুটে এল ব্যস্ত পায়ে।

'কী সব ঠুনকো বাবু জিনিস রেখে দিয়েছ ফিটফাট করে। হাতের একটু ঠেলা লাগলেই ভূমিসাৎ।'

'ভালোই করেছেন ভেঙে ফেলে। ওটা বিলিতি।' তামসী হাসল।

'বিলিতির জন্যে নয়। অনাবশ্যক বলে। ফুল নেই তো ফুলদানী! তা ছাড়া আজকের দিনে ফুলদানিতে দরকার নেই আমাদের।'

'কিন্তু ফুলে আমাদের চিরদিনের দরকার।' তামসী ঝাঁটা নিয়ে এল। বললে, 'ওটার মধ্যে ফুল রাখলে ফুলের চেয়ে ফুলদানিটাই বড় হয়ে উঠত। যেমন আমাদের দেশের স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেয়ে আত্মবুদ্ধিটাই বড় হয়ে ওঠে। এক গিঁঠ কাঁচা ভেলকো বাঁশের ফুলদানি এনে দিন আমাকে, দেখুন, ফুলে-পাতায় কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। জিনিসটা তখন দিশিও হবে মজবুতও হবে। আধার দিশি হলে আধেয়কেও তখন মনে হবে সহজ, স্বাভাবিক, কতকালের বান্ধবের মত। চেয়ে-চেয়েও চোখ আর ফিরতে চাইবে না। নিন,' ঝাঁটাগাছটা তামসী এগিয়ে দিল অধিপের দিকে: 'ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো এবার সাফ করুন। আমার রান্না পুড়ে যাচ্ছে।'

ভেঙেও নিবৃত্তি নেই অধিপের। ঝাঁটা হাতে করে পরিচ্ছন্ন করতে হয় ধ্বংসস্তূপ। এক গিঁঠ কাঁচা ভেলকো বাঁশ জোগাড় করে আনতে হয়। আনতে হয় ফুল। চেয়ে-চেয়েও চোখ আর ফেরানো যায় না।

শুধু কি ফুল? তামসীর হাসি? তামসীর পবিত্রতা?

মাকু ছুঁড়ছে তাঁতি, সানার টানে সুতো সরে-সরে এসে নক্সা ফুটে উঠছে। তেমনি এই মামুলি রান্নাবান্না ও ঘরকন্নার কাজে নিরন্তর একটি অলক্ষ্য সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকছে তামসী। দেখবেন কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে দেব! যেখানে হাত রাখছে সেখানে প্রাণ আনছে। সামান্যও আর তুচ্ছ থাকছে না। হর-রঙের নক্সা ফুটিয়ে তুলছে। দিন রাত্রির টানা-পোড়েনে সে যেন কোন নতুন শিল্পী। জীবনের নতুন তন্তুবায়। আমরা যারা দেশকে নতুন করব, সব আগে আমাদের নতুন হতে হবে। নতুন করতে হবে আমাদের দৃষ্টি। আমাদের বোধ। আমাদের সম্পর্ক।

চমৎকার নতুন হয়েছে অধিপ। ঠুঁটা-খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে কাঠ হয়ে। মজে থাকছে। ডুবে যাচ্ছে তিলে-তিলে। মধুর ভাণ্ডে পড়ে মক্ষিকার আত্মহত্যা হচ্ছে। উড়ন্ত হাউইর বদলে সে এখন শিশুর হাতের খেলনা নিরীহ ফুলঝুরি। আগে সে বয়ে যাচ্ছিল, এখন সে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যাচ্ছে। হয়ে উঠেছে কোলকুঁজো কেরানি। না, এ সে মেনে নেবে না। সে ভাঙবে। বিদ্রোহ করবে।

কী ভাঙবে? এই বাসা—তাসের বাসা? না, তামসীকে বলবে, হাঁটতে পারছ, এবার পথ দেখ। না, নিজেই চলে যাবে পালিয়ে?

মায়া লাগে, মানি। কিন্তু তাই বলে তামসীর জন্যে কি সে কেরানি হবে? তার বাইরে কি আর তার কাজ নেই? হয়ে-ওঠা নেই?

হ্যাঁ, জানি। বলবে, এর আগে কী হয়ে উঠেছিলে তা আর জানতে বাকি নেই। কিন্তু তার আগে? ধুলো জমে-জমেও বারুদের স্তূপকে ক্ষয় করতে পারে নি। সেই বারুদের স্তূপে তামসী কি হবে না অন্তরঙ্গ অগ্নিকণা?

'একটা দেশলাই দিন তো।' তামসী এসে হাত পাতে।

'এই না সেদিন দেশলাই নিলে।'

'আমি নিলুম না আপনি। দিনে কটা সিগারেট খান তার হিসেব রাখেন?'

পকেটের দেশলাইটা অকাতরে দিয়ে দেয় অধিপ। বলে, 'আগুন খুব শস্তা? তাই না? ফস করে কাঠি ঘসলেই জ্বলে উঠল! কিন্তু এ ভাবে কাঠি পোড়াতে থাকলে দু' দিনেই পুড়ে সাফ হয়ে যাব।'

'আমার জ্বলন্ত কাঠির আদ্ধেক দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারব আপনার মুখের সিগারেট।' আধ-ভর্তি বাক্সটা দু' আঙুলে করে নাড়তে-নাড়তে তামসী হাসতে থাকে।

'কিন্তু কী করবে এখন দেশলাই দিয়ে? এত রাতে নতুন করে ফের উনুন ধরাবে না কি?'

'না। আমার ঘরের আলোটা ফিউজ হয়ে গেছে। মোমবাতি জ্বালাব।'

তামসী মোমবাতি জ্বালায়। একটি থেকে আরেকটি। সেই ঠাণ্ডা নরম আলোতে বসে বই পড়ে।

উদ্বেল নেই, উচ্চাশা নেই। চাকরির খোঁজে টই-টই করে আর টহল মারা নেই। চড়ারঙের বিজ্ঞাপন হয়ে নিজেকে প্রকট করা নেই। ঘন সবুজ পাতার আড়ালে চাঁপা কলিটির মত যেন লুকিয়ে আছে। যেন সমস্ত সন্ধানের সমাধান মিলে গিয়েছে তার। যেন এর বেশি আর কিছু তার চাইবার ছিল না। বৈরাগীর হাতের একতারার মত এই একফালি সংসার। এই গৃহ রচনা। যেন সব কিছু সে পেয়ে গিয়েছে। এই যেন তার কীর্তি, তার কৃতার্থতা।

একেক সময় বিশ্বাস হয় না অধিপের। মনে হয় এক চমক ঘুমিয়ে নিচ্ছে নিরালায়। তন্দ্রার ঘোর কেটে যাবে এখুনি। দূর হতে একদিন ডাক শোনা যাবে মরণের। সেই ডাকের জন্যে কান খাড়া করে রয়েছে। তার সমস্ত শান্তির মাঝে জেগে আছে সেই উন্মনতা।

মাঝে-মাঝে বাইরে বেরোয় তামসী। একা-একা। কোথায় গিয়েছিলে? একটা বাড়ির খোঁজ করছি। বাড়ি? কেন, এটার কী হল? অধিপ অলক্ষ্যে চমকে ওঠে। এ বাড়িটা অনেক বড়, অকারণে ভাড়া বেশি। দুটি প্রাণীর জন্যে তিনটে ঘরের প্রয়োজন নেই। ছোট ফ্ল্যাট হলে ভাড়ার অনেক সাশ্রয় হয়। আজ এত দেরি হল ফিরতে? অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলুম। কী ঝোঁক হল, ফিরলুম পায়ে হেঁটে। পয়সা বাঁচালুম।

এক দিন অঢেল পয়সা ছিল অধিপের। উড়িয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। কোনো কল্পনা ছিল না, সংকল্প ছিল না। যখন যেমন খুশি তখন তেমন ব্যয় করেছে। আর সেটাতে সত্যিই সে খুশি কিনা ব্যয়ের প্রাবল্যে তাও বিচার করে দেখবার সময় পায়নি। আজ যদি সে পয়সার কিছু অবশিষ্ট থাকত, তবে কী করত অধিপ? চাল-ডাল কিনত? হাঁড়ি-কুঁড়ি? বিছানা-বালিশ? আরো কিছু বেশি থাকলে সঞ্চয় করত হিসেবীর মত? স্বার্থপর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে রাখত কৃপণ করে। আগের মত আরো অনেক থাকলে নিরিবিলি দেখে জমি কিনত এক টুকরো? তারপর তামসীকে বলত, 'তোমার মনের মত করে নতুন বাড়ির নকসা আঁকো এইবার!'

'জমি কিনেছেন?' তামসী এসে জিগগেস করে থেকে-থেকে। 'জমি কিনুন। পতিত হোক, অনাবাদি হোক, হাজাশুকা হোক, জমি কিনুন। একসঙ্গে অনেকখানি জমি, ঢালা জমি, মাঠ-ছাড়ানো মাঠ। তারপরে আসুন আমরা দলে-দলে লেগে যাই চাষ করতে, মাটি থেকে সোনা ফলাই। কি, পরের কোম্পানির শেয়ার বেচছেন? নিজে একটা কোম্পানি খুলুন। মাটি থেকে সোনা ফলাবার কোম্পানি। আর, শুধুই কি মাটি? মানুষ নেই তার সঙ্গে-সঙ্গে? আর সেই সব মানুষ কি এই মাটির মতই সব-কিছু-সহ্য-করা নির্বোধ জড়পিণ্ড নয়?'

শুধু মাঠের স্বপ্ন? ফসলের স্বপ্ন? জীবন্মৃতের জন্মান্তর।

অধিপ ঝাঁজিয়ে ওঠে: 'একলপ্তে গা-ঢালা জমি পেতে হলে অনেক ছাদ-দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে, উপড়ে তুলতে হবে অনেক গাছ-গাছড়া। পুরোনো ইমারত না ভাঙতে পারলে কী করে নতুন ভিত্তির পত্তন হবে? না, আমি ভাঙবার দলে, আমি—'

কিন্তু কী তুমি ভাঙছ জিগগেস করি? আমি ভাঙবার দলে, আমি নিজেকে ভাঙছি। ভাঙছি আমার আভিজাত্য। আমার শিক্ষাদীক্ষার অহংকার। আমার দেশপ্রেমের অহমিকা। ভাঙতে-ভাঙতে নামিয়ে আনছি নিজেকে।

একদিন দুপুরবেলা খুব উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরল অধিপ। হাতে একটা চাবুক। শংকর মাছের লেজ হয়তো।

'চলো। এক্ষুনি। ট্যাক্সি নেব একটা।'

তামসী সেলাই করছিল। নিচের ঠোঁটের উপর ছুঁচটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাপড়টা খুলে-খুলে দেখছিল আর কোথায়-কোথায় ছিঁড়েছে। ছুঁচটা আলগোছে তুলে নিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে তাকিয়ে রইল তামসী।

'শয়তানকে শায়েস্তা করতে হবে। ছাল-চামড়া তুলে দিতে হবে পিঠের। ওর প্রেস ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে আসতে হবে।'

'কার ?'

এই দেখ। একটা বাঙলা সাপ্তাহিক। কৃষ্ণগোবিন্দের কাগজ। আমাদের নিয়ে কী লিখেছে যা-তা, মাতালের মত, ইতরের মত। পাশ-কাটিয়ে যাবার বাইরে চলে গিয়েছে এবার। পাগলা শেয়াল যখন বেরিয়ে পড়েছে দিনের আলোয় তখন তাকে লাঠিতে ঘায়েল না করে উপায় নেই।

পড়তে-পড়তে তামসীর নাক-মুখ নরম হয়ে উঠল। হঠাৎ থেমে পড়ে জিগগেস করলে, 'কিন্তু আমি যাব কোথায় ?'

'ওর আফিসে। এই চাবুক হাতে নিয়ে। আচ্ছা করে কষে দেবে দু ঘা।'

'আপনি শুধু সঙ্গে যাবেন ? একজন ফটোগ্রাফার থাকবে না ?'

'ফটোগ্রাফার দিয়ে কী হবে ?'

'বা, এমন একটা দৃশ্যের স্ন্যাপ নেবেনা ? দেখানো হবেনা সিনেমায় ?' তামসী হাসতে লাগল। নিচের ঠোঁটের উপর সূঁচ কামড়ে ধরে কাপড়ের ছেঁড়া খুঁজতে লাগল।

'এততেও তুমি আগুন হয়ে উঠছনা ? এর মাঝে দেখতে পাচ্ছনা তুমি জ্ঞানাঞ্জনের কদর্য উল্লাস ?'

'না।' সেলাই করতে-করতে আনত চোখে তামসী বললে, 'আমি এর মাঝে কৃষ্ণগোবিন্দর কলমের শক্তির সম্ভাবনাকে দেখছি।'

সম্ভাবনা। এর মাঝেও তামসীর ফসলের স্বপ্ন। নতুন গ্রন্থরচনা।

'হ্যাঁ, দেখছি, একদিন এই কলম আমাদেরই কাজে লাগবে, আমরা যারা দেশের দীপবাহী হব। সেদিন আমাদের সঙ্গে সেও দেশের কুলকীর্তি গাইবে দেখবেন, কলমকে জ্বালাবে মশালের মত। কী হবে ঐ কলম ভেঙে দিয়ে ? এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসুন দেশকে যখন কৃষ্ণগোবিন্দ পর্যন্ত ব্যর্থ থাকবে না, যজ্ঞে সেও সমিধ এনে দেবে— তার এই কলম। ভেঙে ফেলে লাভ নেই, বদলিয়ে ফেলুন। ওর ভুলে-যাওয়া নাটকের পাঠটা ওকে ধরিয়ে দিন মৃদুস্বরে।'

মৃদুস্বরে। অসম্ভব। অধিপ বেরিয়ে গেল হতাশের মত। ছিন্ন বস্ত্রে জোড়াতালি দেবার তার সময় নেই।

কিন্তু কে-একটা লোক বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুর করছে না ?

'কে ? কী চাই এখানে ?'

'দত্ত-দিদি এখানে আছেন ?'

সে আবার কে। তুমিই বা কে।

বাসুদেবকে তামসী এক নজরেই চিনতে পারল। জ্ঞানাঞ্জনের আফিসে তাদের

কামরার বাইরে টুল পেতে বসে থাকত। কলিং-বেল টিপলে ছিটকে চলে আসত ভিতরে, হুকুম বাজাত। কিন্তু, ব্যাপার কী। কোথায় কে আজ ঘণ্টা বাজিয়েছে।

মন্ত্রীত্ব পাননি জ্ঞানাঞ্জন। সেই থেকে মেজাজ তেরিয়ান হয়ে আছে। বলছেন, মন্ত্রীত্ব ভেঙে দেবেন দু মাসে। কিন্তু তার আগে আমাদেরই মাথা ভাঙছেন। কলিং-বেলে এক আঙুলের বাড়িতে আমি ঘরে ঢুকিনি, শেষকালে হাতের তালুতে বাড়ি দিতে হয়েছে, সেই অপরাধে চাকরি গিয়েছে আমার। তারপর ? তারপর আফিসের আর-যত দারোয়ান সবাই ধর্মঘট করেছে। এ আফিসে মোটে তারা দশ জন। ধর্মঘট করার জন্য বাকি নয়জনকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। আশ্চর্য, নতুন লোক পাওয়া যাচ্ছে তাদের খালি জায়গায়। মোটে দশজন কিনা। এখন তবে কী ভাবছ ? জ্ঞানাঞ্জনের আরো যে তিনটে আফিস আছে সেখানে সবশুদ্ধু আছে জন পঁচিশেক। তাদের মধ্যে এই অসন্তোষ সংক্রামিত করে দিতে হবে। কিন্তু বিশেষ সুফল হচ্ছে না। কেউ-কেউ বলছে তোদের আফিস তো আমাদের কি। তাদের উপর চলছে যখন সমান মনিবানা তখন তাদেরও কি সমান সরিকানা নয় ? কিন্তু কে তাদের বুঝিয়ে বলে ?

'তা, আমার কাছে এসেছ কেন ?' তামসী অপ্রতিভের মত তাকিয়ে রইল।

'আপনাকেও তো আমাদেরই মত অন্যায় ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমাদেরই দলের লোক তো আপনি।'

তামসীর বুক আনন্দে উথলে উঠল। দলের লোক। এক মন্ত্রশিষ্য। এমনিতে কত নিম্নস্তরের লোক এই বাসুদেব, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে কোথায় সে পড়ে রয়েছে; সাধ্য কি সে দাঁড়ায় এসে তার সমতলে, কিন্তু আজ, কেন কে জানে, হঠাৎ মনে হল তারা প্রতিবেশী, তারা একধর্মা। তারা অভিন্ন পরিবার। এক রথের একই রশিতে তারা টান দিয়েছে। এক যুদ্ধে এক জয় তাদের কাম্য। বুকের মধ্যে দৃঢ় একটা সাহসের স্পর্শ পেল তামসী, এই অচেনা, অগণ্য বাসুদেবও তার সহায়, তার সুহৃদ, তার আপনার লোক। তার গুরুভাই। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল বাসুদেবের দিকে। তার ঐ শক্তি, ঐ স্বাস্থ্য, ঐ প্রতিজ্ঞা—এতে তামসীরও স্বত্ব আছে। আর, তার যা আন্তরিকতা তাতেও এই সর্ব্বস্বান্তদের অধিকার।

আমাকে কী করতে হবে ?

'তৈরী করতে হবে আমাদের। যাতে আমরা না ভেঙে পড়ি, হেরে যাই। যাতে বাড়তে পারি আমরা, দলে বড় হতে পারি। আমি কী বলব।'

অধিপের দিকে তাকাল তামসী। বললে, 'যাবেন ?'

'যাব।' অধিপ লাফিয়ে উঠল। দূর থেকে সে যেন জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছে। জলকল্লোল।

শান-বাঁধানো সারি-সারি খাপরেল, কোনোটা মাটির, কোনোটা বা টিনের বেড়া। ঘুপচি গলি, ঘেঁসাঘেঁসি চলতে গেলে একজনকে পাশের নর্দমায় পড়তে হয় পা মচকে। ডাষ্টবিনের জায়গা নেই বলে যেখানে-সেখানে আঁস্তাকুড় জমে আছে। এখন সন্ধে-বেলা, ধোঁয়া দিয়েছে ঘরে-ঘরে। ঘর? না এগুলো খুপরি? যেখানে কায়ক্লেশে দুজনে মাথা গুঁজতে পারে সেখানে গাদি মেরেছে প্রায় সাত-আটজন। তবু তো এটা সম্ভ্রান্ত বস্তি, থাকে ট্রাম-কণ্ডাক্টর, বাস-কণ্ডাক্টর, আপিসের দারোয়ান, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি। কেউ-কেউ বা একেকটা কুঠরিতে একেকটা পরিবার নিয়ে। দোকানের বেচনদার, কর্পোরেশন-ইস্কুলের মাষ্টার, খবরের কাগজের হরকরা। হর-রকমের মানুষের জনতা। তবু যেন এরা পদে আছে, জীবনে বহন করছে জীবিকার পদবী। মাষ্টারের বাড়ির ছেলেরা পড়া পড়ছে, খবরের কাগজের ফিরিওলা রাজনীতি বলছে, আফিসের দারোয়ানরা সুর ভাঁজছে রামায়ণের। সবাই নিজের মর্যাদায় পৃথক। তবু কেউ যেন ঠেলে উঠতে চাইছে না, ভদ্রতার যেটুকু অবলেপ এখনো লেগে আছে জীবনে তাই তারা রাখতে চাইছে বাঁচিয়ে। একেবারে কাঁচা মাটির বস্তিতে তো তারা বাসা নেয়নি, তারা তো বানভাসি নয়, নৌকোর তলা তো ফুটো হয়ে যায়নি তাদের, এই তাদের সান্ত্বনা। হয়তো বা একটু অহংকার।

চাঁই দু'জন দারোয়ান আছে এ বস্তিতে। নাথুলাল আর রামকরন। না, তারা কিছু গোলমাল করতে রাজি নয়। এ ব্যাপার তাদের এলেকার বাইরে। এক জাতের লোক হয়েছে বলে কী হয়েছে, সবাই মিলে জাত খোয়াবার মানে নেই। দেশে তাদের ভিটে আছে, সে ভিটেতে সর্ষের চাষ বসাতে চায়না তারা।

অধিপ বললে, 'এখানে হচ্ছে না। আরো নিচে চল।'

'সেখানেও কি কিছু হবে?' তামসী হাসল প্রায় পরাজয়ের লজ্জায়।

আরো নিচে নেমে এল তারা। খোলা, কাঁচা মাটি, কাদা আর চট। ইট-সুরকি বলটু-ইস্কুপের লেশ নেই। সব জায়গায় মাটির মালিন্য। কুলিমজুরের আস্তানা। যত নাজেহাল-নাস্তানাবুদ হায়রান-পারেশানের ভিড়। পদহীন, পদবীহীন পদাতিকের দল। একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। পানওয়ালা, ফিরিওয়ালা, কসাই, ঝাঁকামুটে, ছাতা-সারা, চাবি-সারা, ছুতোর, রাজ, গাড়োয়ান, চাকর, বেশ্যা, ভিক্ষুক। সমস্ত মিলে একটা অখণ্ড ভবিষ্যৎ। অধিপ উল্লসিত হয়ে উঠল: 'এইখানে।'

'এইখানে।' মুগ্ধের মত তামসী আবৃত্তি করলে। বললে, 'কিন্তু এইখানে কারা? ওরা না আমরা?'

এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল অধিপ। যেন কী পড়ে নিলে। বললে, 'হ্যাঁ, ওরাই। আমরা আগে কিছুই বুঝতে পারিনি কি দিয়ে কী হবে, কী হতে পারে। অহংকারই ছিল, শক্তি ছিলনা, কেননা অসংখ্য ছিলুম না আমরা। আমাদের অসংখ্য হতে হবে। অসংখ্য হতে পারলেই আমরা সত্যিকারের অশঙ্ক হব।'

আর, অসংখ্য হতে হলে মিলতে হবে এক সমতলে। এক অভাববোধের বেদনার তীব্রতায়। অধিপকে কথায় পেয়েছে। নিঃস্বতার মধ্য থেকে গড়ে তুলতে হবে পরম-প্রাপ্তির পৃথিবী। অনেক কাটাকুটি করে একটি পরিষ্কার পৃষ্ঠায় এসে লিখতে হবে নতুন পরিচ্ছেদ।

'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিলবেন কি করে? ওদের যা নেই তা কি আপনারো নেই?'

'একটা অসীম জিনিস আমাদের নেই। সেইটেই আসল জিনিস। সেইখানে আমরা সমান।'

এইখানেই বারে-বারে ঘোরাঘুরি করতে লাগল তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু যেন করে উঠতে পারছে না। কেবল তাল-তাল কাদা, প্রাণহীন। এত রোগ এত দুঃখ এত দারিদ্র্য, কিন্তু পচা ঘা, ব্যথায় যেন যন্ত্রণা নেই। মরে থাকবার মুখে থেকেও যেন মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না। সার-সার পিঁপড়ে। গর্ত থেকে বেরিয়ে নিরাশ্রয়ের মত আবার গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'হোক কাদা, কিন্তু এই কাদা থেকেই মূর্তি গড়ব আমরা। পুরাকালে দেবতা গড়েছি, এবার গড়ব মানুষ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র হবে প্রাণধারণের যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় ওদেরকে বাঁচিয়ে তুলব। হোলই বা না পিঁপড়ে, কিন্তু ওরা যে অগণন এইখানেই আমাদের মুক্তি। পিঁপড়ের মধ্যেও শৃংখলা আছে, সংঘশক্তি আছে। পিঁপড়েও ছোট নয়।'

'আপনি এখনো কথাতেই বিশ্বাস করেন।'

হয়তো তাই। কিন্তু কথা না হলে কাজেই বা বিশ্বাস আসবে কোত্থেকে? কোত্থেকে আসবে উজ্জ্বলতা? বারে-বারে বলতে-বলতে কথাই একদিন কাজ হয়ে উঠবে।

'আপনার কি মনে হয়না আমাদের গায়ের জামার থেকে ওদের গায়ের চামড়াটা ওদের কাছে বেশি মূল্যবান? আমাদেরকে তাই ওরা বিশ্বাস করতে পারছেনা পুরোপুরি। আমাদের দুঃখে ওদের দুঃখ পারছেনা জীবন্ত হতে।'

কিন্তু ইচ্ছার যদি সাধুতা থাকে, তবে একদিন খুঁজে পাব প্রতিধ্বনি। সেইটেই আমাদের আশা, বলতে পারো নেশার মতো। দলিত দ্রাক্ষার থেকে একদিন বেরিয়ে আসবে মদিরা। আর, সেদিন সেই মদিরায় দলিত দ্রাক্ষার দুঃখের কথা হয়তো ভুলে যাব।

হাতিকলের কুলিদের ক'জনকে মেরেছে ঠিকেদার। পাণ্ডা-প্রধান দুজনকে বরখাস্ত করেছে। আর যায় কোথা! হাতিকলের কুলিরা ধর্মঘট করলে। শুধু হাতিকলে হলে চলবে কেন. নিয়ে যেতে হবে ঘড়িকলে, ভাজাই কলে, বোম্বাইকলে। গাঁটঘর, সেলাইঘর, ভাইসঘর, ঢালাইঘর। ইঞ্জিনঘর, বাতিঘর, বাইলটঘর পর্যন্ত। এ রাজি হয় তো ও-রাজি হয় না, এ স্বার্থ ছাড়ে তো ও সুবিধে নিয়ে বসে।

মালিকের তরফ থেকে ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্যে তোলপাড় হচ্ছে, যাতে আর ছড়াতে না পারে তার তোড়জোড়। ভয়, প্রলোভন, যত রকমের কারসাজি। অনেক কর্মী এসে হাত মেলাচ্ছে অধিপের সঙ্গে। কিন্তু সমরেশ কই? কোথায় তাঁর চাঁদার বাক্স?

সমরেশ কী করছে কেমন আছে, জিগগেস করতে ইচ্ছে করত বাসুদেবকে। করেনি, কেননা আশা করত তামসী, ঠিক সময়ে দেখতে পাবে ঠিক জায়গায়। একদিন দেখতেও পেলে তাই। বৃষ্টি-ঝাপসা রাত্রে, কুলি-বস্তিতে। ঘাসী রামের পাশের ঘরেই রাজী রাম। রাজী রাম ধর্মঘটী, ঘাসী রাম উলটা-বুঝ। দুজনে ভাই, দুদিকের মাতব্বর। ঘাসী রাম মনিবের থেকে দেদার টাকা খাচ্ছে, আর আঁচড়ে-পিঁচড়ে কত কষ্টে ক'টা টাকা জোগাড় করে এনেছে রাজী রামের জন্যে।

অধিপ গেছে আরেক হাবেলিতে, রাজী রামের ঘরে বসে তামসী সবাইর খোঁজ-খবর নিচ্ছে, কে কবে ছিটকে পড়ছে বাইরে, দুষমনের খপ্পরে। বড় রাস্তায় মোটর দাঁড়াল বাব। কে অসমান পায়ে কাদা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলে এল ভিতরে। গা ঢাকা দিয়ে একেবারে ঘাসী রামের ঘরের মধ্যে।

'কে না জানে, এমনিই ওর হাল-চাল। বদমাস, মাতাল। বেটিচুরির জন্যে দায়মুল হয়েছিল।'

কান খাড়া হল তামসীর।

'আর ও তো তোমার সাদি-করা পরিবার নয়। বাদশার যেমন বাঁদি, বোষ্টমের যেমন ঠাকরুণ, তেমনি তোমার এই সূজ্জি বেওয়া। ওকে দিয়ে এক নম্বর নালিশ ঠুকে দিতে ক্ষেতি কি? তোমাদের ঘরে ঢুকে হল্লা করেছিল তো একদিন। এবার একদিন সূজ্জিকে হল্লা বাধাতে বলো। মনিবের হাতে ইনাম আছে ইলাহি।'

'মাপ করবেন বাবু। ধর্মঘট না মানি, কিন্তু ধর্মকে মানব।'

'রাখ তোমাদের মত অনাসৃষ্টির কথা। আর কিছু নয়—টাকা, চাকরী, প্রমোশন। ধর্মঘটই বা কিসের জন্য? সেই টাকা, চাকরী, প্রমোশন।'

তামসী উঠে দাঁড়াল।

'না, বাবু, তা পারবে না সুজ্জি। দত্ত-দিদি তাকে বহিন বলে।'

'আর তোমার দত্ত-দিদিটিই বা কি? খোদ মনিবের বাঁধা ছিল একদিন। এখন উড়ুক্কু হয়েছেন।'

তামসী বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

'না বাবু, মারপিট করতে বলেন করতে পারি। টাকা খেয়েছি, মার খেতেও ভয় করিনা। কিন্তু বেসরমের মত বেইমানি করতে পারবনা।'

'এটি কে? নতুন এসেছে বুঝি? এটিকে ধরো না। সুজ্জি বিবি না পারেন, চান্দ বিবি পারবেন। টাকা দেব এক মুঠো।'

'কে সমরেশবাবু না?'

বৃষ্টি-বুলানো অন্ধকারে ভালো করে ঠাহর করতে পারেনি সমরেশ। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা চাবুকের প্রহারের মত।

'আপনি—'ছিটকে লাফিয়ে পড়ল সমরেশ।

'খুব চুটিয়ে চাকরী করছেন বুঝি! হু হু করে বুঝি প্রমোশন হয়ে গেছে! যতক্ষণ নিজের কিছু ছিল না বা অল্প ছিল ততক্ষণ বুঝি গরিবের জন্যে বুকটা বিদীর্ণ হয়ে যেত! আর এখন কাজে বহাল হয়ে, মই বেয়ে উপরে উঠে গরিবকে কলা দেখাচ্ছেন! পালিয়ে যাচ্ছেন কি! ঘাসীরামদের এখনো দলে আনতে পারিনি; পারলে, ওরা কেউ আপনাকে আজ এমন করে পালিয়ে যেতে দিত না।'

এবার আর কাদা বাঁচাবার মানে হয় না। পা কি মাটিতে পড়ছে না শূন্যে থাকছে তাই বা কে লক্ষ্য করে।

এর পরে সত্যি-সত্যি একটা মারপিট হয়ে গেল।

মারপিট আর কিছু নয়, অধিপ আর তামসী যখন ফিরছে কুলি-বস্তি থেকে, অন্ধকার ডোবার ধার দিয়ে, তখন অধিপকে লক্ষ্য করে গায়ে-মাথায় কতগুলি লাঠি পড়ল আচমকা। সঙ্গে তামসী ছাড়া আর কেউ নেই, তামসীই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢেউয়ের মত। নিজের শরীর দিয়ে অধিপকে নিমেষে অবলুপ্ত করে দিলে। ঢেকে রাখল দুর্ভেদ্য বেষ্টনীতে। নিমেষে স্তব্ধ হল আক্রমণ।

তামসীর ঘরে, তক্তপোষে, মুহ্যমান হয়ে হয়ে আছে অধিপ। মাথায়, ঘাড়ে পুরু করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শিয়রে চিত্রাঙ্কিতের মত বিষাদমুখে বসে আছে তামসী। আর অধিপের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রমথেশ।

তিনি যে কী পাননি তাই যেন আজ দেখছেন স্বচক্ষে। তা মন্ত্রীত্ব নয়, নয় আরো প্রভুত্ব প্রতিপত্তি। ও-সব তুচ্ছ, ব্যঙ্গময়। কিম্বা কী পেলেন, তাই যেন দেখছেন অধিপের

মুখে। তাঁর সমস্ত আরাম-আলস্য, সমস্ত অশুচিতা তাঁকে ধিক্কার দিয়ে উঠল। একদিন তাঁরই উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে অধিপ রক্ত চেয়েছিল, আজ নিজের মাথার রক্ত দিয়ে তাঁর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

'ডাক্তার আবার আসবে বলেছে ?'

'দরকার হবে না বলেছেন।' তামসী কুণ্ঠিত-কাতর চোখে তাকাল প্রমথেশের দিকে। বললে, 'রাত এখন অনেক হয়েছে, আপনি বাড়ি যান। কিছু ভাবনা নেই, আমি জেগে আছি সারা রাত। কাল সকালেই আপনাকে খবর পাঠাব।'

'ওর ঘুম ভাঙলে বোলো না যেন আমি এসেছিলুম।'

'বলব না ?'

'না, এবার যখন আসব, ওর জাগার মধ্যে আসব। তখন আর আমার ভয় থাকবে না, ও আমাকে তখন ঠিক চিনতে পারবে।'

শেষ রাত্রের দিকে অধিপের ঘুম ভাঙল।

ঘুমের মধ্য থেকেই বললে, 'এবার নিশ্চয় ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি আমি। তাই না ? এবার নিশ্চয় ওরা আমাকে ঠিক চিনতে পারবে।'

শুধু কি ওদের কাছাকাছি ? তোমার কাছাকাছি নয় ? এ কার ঘর, কার বিছানা, কার প্রতিরাত্রির নির্জনতা ? তাকে আবৃত করে কার এই দেয়াল ? কার সেই তরঙ্গ-দুর্গ ? সেই আবরণের শক্তি, আবরণের উষ্ণতা ?

মৃদু একটা বেগুনি আলো জ্বলছে। অধিপ ডাকল: 'তামসী।'

'ভাল আছেন ?'

'আছি। তোমারও তো লেগেছিল নিশ্চয়। কোথায় ?'

'হাতে। ও কিছু নয়।'

'দেখি।'

দেখবার কথা নয়। তবু অধিপ তামসীর হাত ধরে রইল। যেখানে তার ব্যথা সেখানে রাখতে চায় তার স্পর্শের কোমলতা।

'তুমি ঘুমোবে না আজ ?'

'ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু আপনি জেগে থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনারই এক পাশে শুয়ে পড়ি কি করে ? হাত ধরে টেনে রাখলে কেউ ঘুমুতে পারে টান হয়ে ?'

অধিপ হাত ছেড়ে দিল। চোখ বুজে ধীরে-ধীরে গভীর নিশ্বাস টানতে লাগল।

ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে গেছে, ঘায়ের অবস্থা ভাল, তবে জ্বর যখন একটু

আছে, ভাত দেয়া যায় না আজ—নিশি এসে খবর দিল, কে একজন ভদ্রলোক ডাকছে তামসীকে।

কে আবার! সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসেই দেখতে পেল কালিকিংকর।

আমাদের আপিসে আপনার নামে একটা চিঠি এসেছে। তা আপনাকে পৌঁছে দিতে এসেছি। বলতে পারেন এ চিঠির সূত্র ধরেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি একটু। বলতে পারেন বক্সি-সাহেবই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতে চান আপনার সঙ্গে তাঁর কোনোই ঝগড়া নেই। যা আপনি চান, যা তাঁর সাধ্য। শুধু অধিপকে ছেড়ে—

স্তম্ভিতের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কালিকিংকরের মুখের উপর তামসী দরজা বন্ধ করে দিলে।

চিঠি? কার চিঠি? কে লিখেছে? ছদ্মবেশে জ্ঞানাঞ্জনেরই পুনঃপ্রবেশ নয় তো? ক্ষিপ্র আঙুলে খামটা ছিঁড়ে ফেলল তামসী। প্রথমেই দেখতে গেল ইতি। কে লিখেছে?

ইতি তোমার দেবিকা। সেই কত দিনের ভুলে-যাওয়া হস্তাক্ষর। দেবিকা চিঠি লিখেছে!

'তামসী।'

'বলুন।'

'তুমি—আপনি কে?' সন্ধের দিকে তন্দ্রা এসেছিল অধিপের, গলার স্বরে চমকে উঠল হঠাৎ।

'আমি নার্স।'

'তামসী কোথায়?'

তিনি কি-এক জরুরি চিঠি পেয়ে চলে গেছেন বাইরে।'

'বাইরে—বাইরে কোথায়?'

'কলকাতায় বাইরে। নাম বলে যান নি।'

'আপনাকে ডেকেছে কে?'

'তিনিই।'

'তিনিই! টাকা দেবে কে আপনাকে?'

'আপনার বাবা। সব তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন।'

অধিপ একবার উঠতে চেষ্টা করল। পারল না। শরীরে ব্যথার যেন আর শেষ নেই।

(ক্রমশঃ)

রাসের মেলা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ রাস পূর্ণিমা। রাসের মেলা বসেছে সহরতলীর খালধারের এই রাস্তা আর দু'পাশে যেখানে যেটুকু ফাঁকা ঠাঁই আছে তাই জুড়ে। নামকরা মস্ত মেলা, প্রতিবছর হয়। দোকানপাট বসে অনেক, দূর থেকে বহুলোক আসে কেনাবেচা করতে, অনেকে সারা বছরের দরকারী মাদুর পাটি বঁটি-দা হাতা খন্তি ঝুড়ি ধামা কুলো ঝাঁটা গেলাস বাটি থালা কেনে এই মেলাতে। মনোহারী কাজের জিনিষ ও সখের জিনিষ, জামা কাপড়, খেলনা পুতুল, খাবারদাবার এসব যতই কেনাবেচা হোক, আসলে গেঁয়ো কারিগরের তৈরী গেরস্তের ওইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কেনাবেচাটাই মেলার বৈশিষ্ট্য। পাশে ফাঁপতে পারে না, রাস্তা চওড়া কম, একপাশে নর্দ্দমার খাতটা আরও সঙ্কীর্ণ করেছে রাস্তাটাকে, মেলা তাই লম্বায় বড় হয়। হরদম লরীগাড়ীর চলনে এবরো খেবরো বড় রাস্তাটা খাল ডিঙ্গিয়েছে কংক্রীটের পুলে উঠে, পুলের খানিক এদিকে ডাইনে গেছে মেলার রাস্তা খালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আধমাইল দূরে রেললাইনের তল দিয়ে উত্তর মুখে সোজা। মেলা বসে রাস্তার এমাথা থেকে রেলের পুল ছাড়িয়ে আরও প্রায় পোয়া মাইল দূর তক! মেলা সব চেয়ে জমাট হয় মাঝামাঝি স্থানে, সেখানে ওদিকে আছে রাস্তা থেকে খাল পর্য্যন্ত অনেকটা ফাঁকা জায়গা, আর এদিকে আছে শাখা রাস্তার ফাঁপোলো মোড়। ফাঁকা জায়গায় থাকে নাগরদোলা, পুতুলনাচ আর সার্কাস, মজার খেলা ও নাচগানের তাঁবু। লোক গিজ গিজ করে এখানে।

রাস্তা আর খালের মধ্যে টিন-ছাওয়া ছোট বড় গোলা ও আড়ত, মাঝে মাঝে দু'একটি জরাজীর্ণ পুরাণো দালান। এখানে যে লাখ লাখ টাকার কারবার চলে, ভাঁটার সময় খালের কাদা ঠেলে সালতি ছাড়া ছোট নৌকা চলতে না পারলেও এও বন্দরতুল্য, তা মনে হয় না—ঠাকুরদাদার জীর্ণদশার শৈথিল্য যেন শুধু মরচে পড়ে মরছে এখানে, আর কিছু নয়! এ পাশের দোকান ও বাড়ীঘরগুলি অনেক উন্নত, যেহেতু আধুনিক।

লড়ায়ের আঁধার বছরগুলিতে মেলা জমে নি। আলো না জ্বালতে পারলে কি মেলা জমে, দিনে দিনে পাততাড়ি গুটোতে হলে। এ বছর শুধু ওই সাঁঝের বাতি না জ্বালবার হুকুমটা বাতিল হতেই মেলা জীবন্ত হয়েছে আশ্চর্য্যরকম। সবাই যেন হাঁ করে অপেক্ষা করছিল লড়াই শেষ হবার জন্য যতটা নয়, লড়াই শেষ হলে সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে জাঁকজমকের

সঙ্গে মেলা করার জন্য। গায়ে গায়ে ঘেঁষে দোকান বসেছে তিন পো মাইল রাস্তার যেখানে ঠাঁই মিলেছে সেখানে, ভদ্রলোকের বাড়ীর সামনের একহাত চওড়া রোয়াকটুকু পর্য্যন্ত ভাড়া নিয়ে। চৌকী পেতে, কাঠের তক্তায় কিম্বা স্রেফ বাঁশ দিয়ে মঞ্চ বেঁধে, চাঁচের বেড়া ও হোগলার চালা তুলে হয়েছে কোন দোকান, কারো ছাউনি একখানি কুড়িয়ে আনার মত মরচে পড়া ঢেউ টিনের, কারো দু'খানা রিজেক্ট পিপে, কেটেকুটে হাতুড়ি পিটে সোজা করা ছাদ, কারো খোলা আকাশের নীচে ড্যাম রোদবিষ্টি ড্যাম ফ্যাশনের দোকান—যেমন পটারী কারখানার নল-ভাঙ্গা কেটলি, চলটা-ওটা হাতলহীন কাপ ইত্যাদির দোকান—দোকানটাই যেন ঘোষণা যে বড়লোক বাবুদের জিনিষ, একটু খুঁতওলা জিনিষ, তাতে আর কি হয়েছে, এখানে কিনতে পাবে এমন সস্তায় তোমার পয়সায় কুলোয়, এ সুযোগ ছেড়োনা, টিনের মগে চা না খেয়ে বাবুরা যে কাপে খান সেই কাপে, শুধু একটু চলটা-ওঠা হাতলহীন কাপে চা খাও। আর সত্যি কথা, কাপ কেটলির দোকানে কি ভীড় মেয়েপুরুষের, চা খাওয়া যায় ন'মাসে ছ'মাসে সর্দ্দি কাসির ওষুধ হিসেবে, বিয়োনি মেয়ের ব্যথার জোর বাড়িয়ে তাকে রেহাই দেবার টোটকা হিসাবে।

•

খাদু বলে, 'মেলা নাকি? মেলা? মেলায় তো যামু তবে আইজ।'

দত্তগিন্নীর গা জ্বলে যায় শুনে,—প্রায় দেড়বছর কাজ করছে যে মন-মরা খাটুনে ভাল ঝিটা হঠাৎ মেলার নাম শুনেই তাকে আহ্লাদে উল্লাসে ডগমগিয়ে উঠতে দেখে।

মুখ ভার করে বলে, 'খাদু, কি করে মেলায় যাবি আজ? আমার শরীর ভাল না। উনি আজ একটায় আসবেন, খেয়ে দেয়ে উঠে আমায় একটু না পেলে, খোকা গোলমাল করলে—'

দত্তগিন্নী হেসে ফেলে, 'বুঝছিস তো খাদু? হপ্তায় একটা দিন দুকুরের ছুটি, তাও আধখানা। খোকা কাঁদাকাটা করলে বড্ড রাগেন। উনি বিকেলে বেরোবার আগে তো মেলায় তোর যাওয়া হয় না।'

'অ মা!' খাদু বলে অবাক হয়ে, 'তা ক্যান যামু? বেলা না পড়লে নি কেউ মেলায় যায়!'

মেলায় যাবার নামেই যেন বদলে গেছে খাদু। দুর্ভিক্ষের বন্যায় কুটোর মত ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই সহরে বাবুদের বাড়ী ঝিগিরিতে। কোথায় দেশ গাঁ আপনজন, জানাচেনা অবস্থায় অভ্যাসের ধাঁচে দিন কাটানোর সুখ আর কোথায় এই বিদেশে খাপছাড়া না-বনা মানুষের ঘরে দাসীপণা, এই দুঃখে সে একেবারে মিইয়ে ছিল। আজ যেন ডাক দিয়েছে আগের জীবন, ছেলেমানুষী ফূর্ত্তি আর উত্তেজনা জেগেছে। চুলে ভাল করে তেল

মেখে স্নান করে খাদু। দত্তগিন্নীর সাবানটা একফাঁকে মুখে হাতে ঘষে নেয় একটু। টিনের ছোট তোরঙ্গে তোলা সাফ থানটি বার করে রাখে। সেমিজটা বড় ময়লা হয়েছিল, স্নানের আগেই সাবান দিয়ে সাফ করে রেখেছে।

একটা কথা ভেবে খাদু একটু দমে যায়। এই ঘটির দেশের মেলা না জানি কেমন হবে! খোকাকে কোলে নিয়ে গিন্নীমার পিছু পিছু একজিবিসনে ঘুরে এসেছে সেদিন, সাজানো গোছানো আলোয় ঝলমলে চোখ ঝলসানো কাণ্ড বটে সেটা, থ' বানিয়ে দেয় মানুষকে, কিন্তু মেলার মজা নেই একফোঁটা, প্রাণ ভরে না ঘুরে ঘুরে। ওমনি একজিবিসনকে এদেশে মেলা বলে কিনা কে জানে!

বাবু বেরিয়ে যেতে না যেতে সেমিজ কাপড় পরে খাদু বলে, 'যাই মা?'

দত্তগিন্নী মুখ ভার করে বলে, 'যাবার জন্য তরপাচ্ছিস দেখি! যা, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি, দেরী করিস নে।'

কংক্রীটের পুলটার নীচে মেলার এ মাথায় পৌছে খুসীতে হাসি ফোটে খাদুর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে মিশিঘষা কালো মজবুত দাঁতে। এ মেলা মেলাই। গরীব গেঁয়ো মেয়ে-পুরুষের ভিড়, রঙীন কাগজের ঘুর্ণী, ফুল, বাঁশের বাঁশীর ফেরিওলা, মাটির ডুগডুগি, বেহালা, পুতুল, কাঠের খেলনা, তেলেভাজার দোকান, হোগলার নীচে মাটিতেই যা কিছু হোক বিছিয়ে পশরা সাজানো—সব আছে! পুলকে কেমন করে ওঠে মনটা খাদুর। হায় গো, কেউ যদি একজন সাথী থাকত তার।

পায়ে পায়ে এগোয় খাদু এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে থেমে থেমে ঘুরে ঘুরে পিছ ফিরে এপাশ ওপাশ গিয়ে গিয়ে। কিনবার জন্য, যা কিছু হোক কিনবার জন্য, মনটা তার নিসপিস করে। পিঠে সে অনুভব করে আঁচলে-বাঁধা কাঁচা একটা টাকা আর খুচরো এগার আনার চাপ। কোমরের আঁচলের কোণেও বাঁধা আছে একটাকার চারটে নোট। জীবনে আর কখনো কোন মেলায় খাদু এত টাকা পয়সা নিয়ে যায় নি, তাও আবার সব তার নিজের রোজগারের টাকা পয়সা। বাপভায়ের কাছে চেয়েচিন্তে, একরকম ভিক্ষে করে কয়েক গণ্ডা পয়সা নিয়ে সে মেলায় যেত, আজ এসেছে নিজের কামানো চার টাকা এগার আনা নিয়ে। টাকা থাকার মজাটা যেন খেয়ালও করে নি খাদু এতদিন, আজ যেন তার প্রথম মনে পড়ে যে দত্তগিন্নীর কাছে তার দেড় দু'বছরের মাইনের অনেক টাকা জমা আছে, দু'এক টাকার বেশী কোন মাসেই সে নেয় নি। সে কত টাকা হবে কে জানে! টাকার জোরে বুকের জোর যেন বেড়ে যায় খাদুর আজ মেলায় এসে নিজের পয়সা যেমন খুসী খরচ করতে পারবে খেয়াল হওয়ায়।

সেই সঙ্গে এতদিন পরে একটা ভয় ঢোকে খাদুর মনে। এতকালের মাইনের

টাকাগুলি জমা রেখেছে দত্তগিন্নীর কাছে, হিসেবও জানে না সে কত টাকা হবে, দত্তগিন্নী যদি তাকে ফাঁকি দেয়, যদি একেবারে নাই দেয় টাকা ? বোকার মত কাজ করেছে, খাদু ভাবে। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে নিজের কাছে টিনের তোরঙ্গে রাখে নি বলে আপশোষ করে খাদু। হায় গো, টাকাগুলি যদি মারা যায় তার !

কি কিনবে কি কিনবে ভাবতে ভাবতে সোণার একটা আংটি কিনে বসে খাদু বারো আনা দিয়ে। খাঁটি সোণা নয় কিন্তু ঠিক যেন সোণা, কি সুন্দর যে মানিয়েছে তার বাঁ হাতের সেজো আঙ্গুলে। বিয়েতে একটা আসল সোণার আংটি পেয়েছিল খাদু, বছর না ঘুরতে সে আংটি কেড়ে নিয়েছিল বরটা তার, ফিরে দেবে বলেছিল বটে কিন্তু আরও যে বছর খানেক বেঁচেছিল তার মধ্যে দেয়নি। ও মিছে কথা, বেঁচে থাকলেও দিত না, খাদু জানে। তারপর কতকাল আংটি পরার সখটা খাদু চেপে রেখেছিল, এতদিনে মিটল। কিন্তু না গো, মিটেও যেন মিটল না, প্রথম বয়সের সাধ কি আর মেটে মাঝবয়সে, নিজে নিজের সাধ মেটালে, কেউ আদর করে কিনে না দিলে।

বজ্জাতেরা তাকায়, গায়ে গা ঘষে যায় ছলে কৌশলে, খানিক আগে থেকেই পিছু নিয়েছে ওই বাবুসাজা লোকটা, ফিনফিনে পাঞ্জাবীর নীচে গেঞ্জিটা যেমন স্পষ্ট, ওর মতলবও স্পষ্ট তেমনি। খাদু ওসব গায়ে মাখে না, রাগ করে না, বিচলিত হয় না। মেলাতে এরকম হয়, কতগুলি লোক এই করতেই আসে মেলায়, মেয়েলোকের গায়ে একটু গা ঠেকিয়ে মজা পেতে, পুরুষ হয়ে চোরের মত এইটুকু নিয়ে বর্তে যায়, কি ঘেন্না মাগো ! আসল বজ্জাত ওই লোকটা, পিছু যে নিয়েছে একলা মেয়েলোক দেখে, গুণ্ডা না হলে কেউ কখনো দারোয়ান গাড়োয়ানের চেহারা নিয়ে বাবু সাজে। নিক পিছু, ঘুরুক সাথে সাথে। বোকা হাবা মেয়ে ভেবেছে খাদুকে, টের পাবে ভাব করতে এলে, এই ভিড়ের মাঝে খাদু যখন গলা ছেড়ে সুরু করবে গাল দিয়ে ওর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে।

পড়ন্ত রোদের মত তেজ কমে কমে আসে খাদুর আনন্দ ও উত্তেজনার, নিভে যেতে থাকে উন্মাদনা। একা আর কতক্ষণ ভাল লাগে মেলা, কথা কওয়ার কেউ একজন সাথে নেই।

খিদে পায়। এতলোকের মাঝে খেতে লজ্জা করে খাদুর। ভাজা পাঁপড় কিনে আঁচলের তলে লুকিয়ে ফেলে বাঁ হাতে, ডান হাতে এক এক টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে এমন ভাবে মুখে দিয়ে চিবোয় যে কেউ টেরও পাবে না পানসুপুরি মুখে দিয়ে চিবোচ্ছে না কিছু খাচ্ছে। এমন সময় কাণ্ড ছাখো কপালের, খাদু সোজাসুজি সামনে পড়ে যায় দত্তবাবুর।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে দত্তবাবু উদাসীনের মত এগিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে, আস্তে আস্তে থামে, ফিরে কাছে গিয়ে বলে, 'মেলা দেখতে এয়েছিস্ ?'

যেন, মেলাতে মেলা দেখতে আসে নি খাতু, এয়েছে ঘাস কাটতে। তিরিশের ওপরে বয়স হবে দত্তবাবুর, বিয়ের চার বছর পরে জন্মেছে খোকাটি, খোকার তিনবারের জন্মদিন বলে ক'মাস আগে খাওয়া দাওয়া হল বাড়ীতে। টুকটুকে ফর্সা রঙের না-মোটা না-রোগা সুন্দর চেহারা দত্তবাবুর, মুখখানা ফ্যাকাসে, চুপসানো। দেখে এমন মায়া হয় খাতুর। গিন্নীমা শুষে শুষে শেষ করে দিয়েছে বাবুকে, টাকার জন্য আপিসে খাটিয়ে আর বাড়ীতে নিজের রাক্ষুসী হিড়িম্বার খিদে মিটিয়ে। আড়ি পেতে সব শুনেছে সব জেনেছে খাতু। বৌ-বর খেলো দেলো শুতে গেল মিলল মিশল ঘুমলো, এই তো নিয়ম জানে খাতু, গিন্নীমা যেন মাগী মাকড়সার মত তাতে খুসী নয়, রাত বারোটায় শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসাদে মর মর বরটাকে যে করে হোক জাগিয়ে তুলে খাবেই খাবে, বেশী যদি নেতিয়ে পড়ে তো ঝাঁপিয়ে বলবে, মেয়ে বন্ধু তো গাদা গাদা, কার সাথে কারবার করে এলে আজ যে বিয়ে-করা বৌকে এত অবহেলা ?

আড়ি পেতে বাবুর কাতরতা দেখতে দেখতে যেন একশো বিছে কামড়েছে খাতুকে, চীৎকার করে বলতে সাধ গেছে, লাথি মেরে রাক্ষুসীকে বার করে দিয়ে ঘুমো না, কেমন ধারা পুরুষ তুই !

'এই ক' আনা পয়সা নে, কিছু কিনিস,' দত্তবাবু বলে খানিকটা কাচুমাচু ভাবে, 'আর শোন খাতু, বাড়ীতে যেন বলিস না আমায় মেলায় দেখেছিস।'

পয়সা পেয়ে খাতু মুচকে হেসে মাথা নাড়ে। দত্তবাবু এগিয়ে গেলে পিছু থেকে জিভের ডগাটুকু বার করে তাকে অবজ্ঞার ভেংচি কাটে। এমনও পুরুষ হয়, বৌয়ের ভয়ে মনখুশীতে মেলায় আসতে ডরায় !

মেলার মাঝখানের জমজমাট অংশে আটকে যায় খাতু, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এইখানেই। মোড়ের মাথায় মন্দিরের বদলে একটা চ্যাপ্টা ঘরের মধ্যে সিঁদুরলেপা দাঁত-খিঁচানো ভীষণাকৃতি দানবরূপী প্রকাণ্ড দেবতা, খাতু ভক্তি ভরে প্রণাম করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পুতুল নাচ দ্যাখে, রামায়ণ মহাভারতের রাজা রাণীদের চেয়ে দেখে তার মজা লাগে শণের দাড়িওলা মুনিগুলো আর হনুমানকে। নুলো খঞ্জ অন্ধ ভিখারীদের দিকে না তাকিয়ে সে দুটি পয়সা দেয় যোয়ান মদ্দ এক ভিখারীকে, কেঁদে কেঁদে ভগবান ভাল করবেন বলার বদলে সে হেড়ে গলায় সবাইকে শাসিয়ে ভিক্ষা চাইছে, তাকে না দিলে তুমি মরবে, তোমার সর্ব্বনাশ হবে। অনেক কিছু কেনার এত সাধ নিয়েও ওই আংটি আর একটি আর্শি ছাড়া কিছুই কেনা হয় নি খাতুর, কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়েছে, কার জন্য কিনবে, তার কে আছে, কি কাজে লাগবে তার জিনিষটা, তার ঘর নেই, সংসার নেই, সাজাগোজা নেই, আরামবিরাম নেই। কি করতে সে মেলায় এলো, কি সুখটা তার হল মেলায় এসে।

আপন মনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে কি ভাল লাগে মেলায়। এত লোকের হাসি আনন্দ উৎসবের মধ্যে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনটাতে ব্যস্ততা এনে শুধু খাঁ খাঁ করানো।

মেয়েছেলেরাও উঠছে নাগরদোলায়, দু'জন চারজনে একসঙ্গে, নয়তো পুরুষ সাথীর সঙ্গে, লজ্জাসরম ভুলে আওয়াজ ছাড়ছে অদ্ভুত, দিশেহারা হয়ে আকড়ে ধরছে সাথীকে, খিলখিলিয়ে হাসছে যেন ভূতে-পাওয়ার হাসি। একসঙ্গে ওই ভয় আর ফূর্তি, ওপরে উঠে নীচে নেমে দোল খাওয়ার ওই বিষম মজা আর তীব্র সুখের শিহরণ যে কেমন খাদু কি আর জানে না। সাথী কেউ থাকলে সে একটু নাগরদোলায় চাপত, অনেকদিন পরে একটু চেখে দেখত কেমন ভেতরের ওই শিরশির করা।

'কি ভাব ?'

মাঝখানে কোথায় সরে গিয়েছিল, আবার পিছু নিয়েছিল লোকটা পুতুল নাচ দেখার সময়, এখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে। ঝেঁঝেঁ উঠত খাদু সন্দেহ নেই, ফোঁস করে উঠে এক নিমেষে টের পাইয়ে দিত বাড়াবাড়ি করতে গেলেই বিষ দাঁতে ছোবল দেবে। কিন্তু কথা হল কি, লোকটার কথায় তার দেশী টান। দেশ গাঁয়ের চেনাজানা আপনজন যেন ছদ্মবেশে তাকে এতক্ষণ ঠকিয়ে এবার নিজেকে জানান দিল কথা কয়ে। তাই শুধু মুখটা গোমড়া করে বলতে হয় খাদুকে, 'কি ভাবুম ?'

'দেইখাই চিনছি দেশের মানুষ তুমি।'

'চিনছ তো চিনছ।'

পাতলা পাঞ্জাবীর নীচে শুধু গেঞ্জি নয়, গেঞ্জি আঁটা চওড়া মোটা শক্ত বুক আর কাঁধ আছে, ঘনকালো কিছু লোম দেখা যায় গেঞ্জির ওপরে। জবরদস্ত গর্দ্দান লোকটার। মুখের চামড়া ক্ষেতমজুরের মত পুরু আর কর্কশ। দু'এক নজরে দেখে নিয়ে খাদু আবার ভাবে আপশোষের সঙ্গে, চাষাভূষোর এমনধারা বেমানান বাবু সাজা কেন ?

'দোলায় চাপবা ?'

'না।'

'ডর নাই, আমারে কোন ডর নাই তোমার।' লোকটা বলে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে, পূবের আকাশের সন্ধ্যাকে যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাসে করে রেখেছে সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা বিড়ি ধরায়, সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার পকেটে রেখে বিড়িটা বার করে, 'তোমারে ভাবছিলাম বাবুগো মাইয়া বুঝি, কথা কইবার চাইয়া ডরে পারি নাই। তবু মনডা কইলো, না, বাবুগো ঘরের মাইয়ালোক সাহস পাইবো কই যে একা আসবো মেলায় ? কথা কমু ভাবি, ডরাই। শ্যাষে অখনে কইলাম। ডর নাই, আমারে ডর নাই।'

'ডরে তো মরি।' লোকটার কথা শুনে বিষম খটকা লাগে খাদুর মনে। সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মত? খাপছাড়া হাস্যকর লাগছে চাষাভূষো ঘরের মেয়ের বাবুর ঘরের রাঁড়ীর বেশ ধরা? ছোট একটা তাঁবুতে পরীর নাচ আর ম্যাজিক ভাখাচ্ছে। নাচের নমুনা ধরা হয়েছে সবার সামনে। রোগা ক্যাংটা কালো কুৎসিৎ তিনটি মেয়ে মুখ গলা হাতে পুরু করে রঙ লেপে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাঁবুর সামনে ছোট বাঁশের মঞ্চে ভঙ্গি করছে নাচের, গলা ছেড়ে মেশাল সুরে গান ধরেছে ভাঙ্গা হারমোনিয়ামের সঙ্গে,—একজন ওদের মধ্যে হিজরে। মাঝে মাঝে তাঁবুর সামনের পর্দ্দা সরিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শুধু এরা নয় আরও অপ্সরা আছেন ভেতরে, দু'আনা চার আনায় ওই পরীদের মজাদার নাচ দেখার সুযোগ ছেড়ো না, তার সঙ্গে ম্যাজিক, ভাঁড়ামি! চলা আও, চলা আও—দো দো আনা, চার চার আনা।

'আমার পয়সা আমি দিমু কইলাম।' গা্য়ে-পড়া ঝগড়ার সুরে খাদু বলে দু'আনা পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে। নাচ দেখতে ভেতরে যাবার কথাও হয়নি তখন, তার হয়ে লোকটির টিকিটের পয়সা দেবার কথা দূরে থাক।

'দিও, তুমিই পয়সা দিও।' লোকটি বলে আমোদ পেয়ে, 'কিন্তু অ্যানে কি দেখবা? খালি ফাঁকিবাজী, ঠকাইয়া পয়সা নেওনের ফিকির। দেখবা যদি, চীনাগো সার্কাস দেখি গা চল। খাসা দেখায়, পয়সা দিয়া খুসী হইবা।'

'দেখি না কি আছে।'

সব দেখবে কাদু এবার, ভালমন্দ যা কিছু দেখার আছে, এত মানুষ ঠকছে সাধ করে সেও নয় ঠকবে, বিশ্বাসী সাথী যখন পেয়েছে একজন। বিশ্বাস রাখবে কিনা শেষ পর্য্যন্ত ভগবান জানে, কি বিপদ আজ তার অদেষ্টে আছে তাও জানে ওই পোড়ার-মুখো ভগবান, মেলায় কোনরকম নষ্টামি গুণ্ডামি যে করবে না লোকটা এটুকু খাদু জানে। বুঝদার বিশ্বাসী সাথীর মতই, মনখোলা আলাপী কথায় হাসি তামাসায় খুসী থাকবে দু'জনেই, ভাল লাগবে মেলা দেখা। মতলব যা আছে তা মনেই থাক। পরে দেখা যাবে।

ঘেন্না জন্মে যায় সস্তা নাচ, বাজে ম্যাজিক, বগলে লাঠি খুঁচিয়ে কাতুকুতু দেওয়ার মত ভাঁড়ামি দেখে। তবু শেষ পর্য্যন্ত থাকে খাদু, উপভোগও করে। এও মেলারই অঙ্গ। জেনে শুনে কত বাজে জিনিষ কেনে লোকে পয়সা দিয়ে, অন্য সময় যেভাবে পয়সা নষ্ট করার কথা ভাবলেও গা জ্বালা করত, নইলে আর মেলার উন্মাদনা কিসের। নিজের ভেতরে উথলাচ্ছে আনন্দ আর উত্তেজনা, তাই দিয়ে ফাঁকিকেও সার্থকতা দেওয়া যায়। মেলায় না হলে একটা পয়সা দিয়েও কি কেউ দেখতে চাইত এসব!

বয়সের পাকামি আছে, সে যাবার নয়, তবে ছেলেবয়সের আবেগপুকলের বন্যাও থৈ থৈ করছে মনে। ফাঁকি যাচাই করতে করতেও উৎসুক লোভী মন নিয়ে খুসী হয়েই খাদু ছাখে হিমালয় পারের অজগর সাপ, এক ছেলের দুই মাথা, জন্ম থেকে জোড়ালাগা দুই মেয়ে।

অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কয় খাদু, ছেলে কাঁখে বৌটির সঙ্গে, কুলো আর পাখা হাতে বিধবাটির সঙ্গে, একপাল বৌ ছেলে নাতিনাতনী নিয়ে বেসামাল সধবা গিন্নীটির সঙ্গে। দেখা হয় চেনা মানুষের সঙ্গে। সুবলের মা, পাড়ার তিন বাড়ীতে ঠিকে কাজ করে। চুপি চুপি শুধোয় সুবলের মা, 'সাথে কে ?'

'ছ্যাশের মানুষ, কুটুম।' খাদু বলে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, নীচে অসংখ্য আলো জ্বলছে মেলার। একজিবিসনের চোখ ঝলসানো বাড়াবাড়ি আলো নয়, কাছে তেল মোম গ্যাসের শিখা, কোনটা কাঁচের মধ্যে কোনটা খোলা, তফাতে জ্যোস্নারাতের তারার মত।

'আরও দেখবা ?'

'দেখুম না, চীনা সার্কাস ? তুমিই তো কইলা।'

চীনা সার্কাসের তাঁবুটা অনেক বড়। চার আনা আট আনা টিকিটের দাম। লোক টানবার জন্য সামনে খেলার নমুনা দেখানো হচ্ছে এখানেও, ভিন্ন রকম নমুনা। মেয়ে আছে তিনটি, দু'জন হলদে রঙের চীনা, একজন কালো রঙের বাঙ্গালী। কালো হলেও ছিরি ছাঁদখানা মেয়েটির, রঙ মেখে ভূতও সাজেনি, সস্তা ঢংএর ভঙ্গিও নেই। চীনা মেয়ে দুটিকে বড় ছোট বোন মনে হয় খাদুর। পিছু বেঁকে পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে, হাতের ভরে শূন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে, ছোট লোহার চাকার ভেতর দিয়ে কৌশলে গলে গিয়ে, ওরা খেলার নমুনা দেখাচ্ছে। আঁটো সাঁটো যোয়ান বয়সী চীনাটি দু'হাতের সরু দুটি ছড়ির ডগায় বসানো প্লেট দুটিকে বন বন করে ঘোরাচ্ছে। আরেকজন, তাকে ওর ভাই মনে হয় খাদুর, পাঁচ ছটা লোহার শিকের আস্ত চাকা নিয়ে চাকার সঙ্গে চাকা আটকে আবার খুলে ফেলছে, কি করে কে জানে! ভেতরে গিয়ে খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় খাদু। পাঁচ ছ'বছরের একটা ছেলে, সে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে শূন্যে পাক খেয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বড় একজনের মাথায় হাতের ভর দিয়ে শূন্যে পা তুলে দিচ্ছে, এসব দেখে রোমাঞ্চ হয় খাদুর। টেবিলে কাঠের গোলায় বসানো তক্তার দু'পাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে দোল খাওয়া দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেজো চীনা মেয়েটিকে শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে টেবিল ডিঙ্গোতে দেখে,

আগুণের চাকার মাঝখান দিয়ে গলে যেতে দেখে, তার রোমাঞ্চ হয়। কত কাল ধরে কি ধৈর্য্যের সঙ্গে তপস্যা করে যে এসব কসরৎ আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে !

খাদু সব চেয়ে অভিভূত হয় যে এক সংসারের বাপ ছেলে মেয়েপুরুষ সবাই মিলে এমন চমৎকার সার্কাস দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দলের সবাইকে দেখার পর এতে আর তার সন্দেহের লেশটুকু নেই। চেহারার মিল নয় নাই ধরতে পারল সে ওদের, বয়স কখনো সবার খাপ খায় এমন ভাবে এক পরিবারের না হলে—বুড়ো একজন বাপ, মাঝবয়সী, যোয়ান, কিশোর আর ছেলেবয়সী এই চার ছেলে, তিন চার বছর বয়সের ফারাকের দুটি যোয়ান আর ন'দশ বছরের একটি, এই তিন মেয়ে। মা বুঝি নেই ওদের। বৌ বুঝি মরেছে বুড়ো বেচারার। আহা।

যোয়ান মেয়ে দুটির দু'জনেই মেয়ে না একজন ছেলের বৌ একজন মেয়ে কিম্বা দু'জনেই ছেলের বৌ, এই একটু খটকা থাকে খাদুর। সিঁদুরও দেয় না যে আন্দাজ করে নেবে। কালো মেয়েটা এদের সঙ্গে কেন সেও আরেক ধাঁধাঁ খাদুর।

'আমাগো মাইয়াটা কি করে চীনাগো লগে ?' সে শুধোয় লোকটাকে।

'ভাড়া করছে।'

এরা নাকি সাধারণত হয় অল্প বয়সে চুরি করা অথবা অনাথা মেয়ে, সংসারে যাদের দেখবার শুনবার কেউ নেই। বড় হলে কাউকে দিয়ে করানো হয় দেহের ব্যবসা, কেউ শেখে চুরি চামারির কায়দা, কেউ শেখে কসরৎ। এ মেয়েটা হয় তো ভাড়াও খাটছে, নতুন খেলাও শিখছে চীনাদের কাছে, পরে আরও দাম বাড়বে। অবাক হয়ে শোনে খাদু। বিরাট এ জগৎ সংসার, অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার সীমা নেই তাতে। কোথাকার এই বিদেশী পরিবার সার্কাস দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছে, কোথায় কার ঘরে জন্মে আজ ওদের সঙ্গে খেলা দেখাচ্ছে এই কালো মেয়েটা। এক দুর্বোধ্য বিস্ময়কর অনুভূতিতে বুকটা তার কেমন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার সে ভাবে, মানুষ কি যে করে সংসারে আর কি যে করে না !

নাগরদোলার বুক-শিরশির-করা সুখটা তিনচার পাকের বেশী সয় না খাদুর, কাতর হয়ে বলে, 'নামুম। থামান যায় না ?'

'যায় না ?'

জোরে হাঁক দিয়ে নাগরদোলা থামাতে বলে লোকটি, যেন হুকুম দেয়। আর এমন আশ্চর্য্য, তার হুকুমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামতে আরম্ভ করে দোলা। পাশ থেকে উঠে লোকটি

আগে নামতে গেলে খাদুর খেয়াল হয় লজ্জাসরম ভুলে দুহাতে কিভাবে ওকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

'ডর করে নাকি ?'

'না।' খাদু জোর দিয়ে বলে, 'গা গুলায়।'

মেলায় মানুষ কমতে সুরু করেছে। বিকালে মানুষের জোয়ার এসেছিল, তাতে ভাঁটার টান ধরেছে। মেলা আর ভাল লাগে না, শ্রান্তি বোধ করে খাদু। মেলায় ছড়ানো নিজেকে এবার গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়। ফিরে গেলে ঘ্যান ঘ্যান করবে দত্তগিন্নী, কৈফিয়ৎ চাইবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর দত্তবাবুর বুড়ী মায়ের ঘুপচি ঘরটির মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে শোয়া। সারারাত বুড়ী কাসবে, বার বার উঠবে। ভাবলেও মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় খাদুর।

কিন্তু বাড়ী সে যে যাবে, বিশ্রাম সে যে করবে, সে তো এতক্ষণের সাথীটি রেহাই দিলে তবেই! এবার সময় হল ওর মতলব হাঁসিলের। বেশ ভাল করেই জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁদে ফেলেছে তাকে। এতক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগিয়েছে, এবার কোন ভয়ঙ্কর স্থানে নিয়ে যাবে কে জানে, যা খুসী করবে তাকে নিয়ে, হয়তো ছেড়ে দেবে দলের খুনে গুণ্ডাদের হাতে, হয়তো শেষরাতে গলাটা ফাঁক করে ভাসিয়ে দেবে খালে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে খাদুর। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা কিছুক্ষণ থেকে, বার বার চোখ বুলোচ্ছে পা থেকে মাথা অবধি। গায়ে কাঁটা দেয় খাদুর।

'যাইগা অখন রাইত হইছে।' সে বলে ভয়ে ভয়ে।

'যাইবা ? রাইত হয় নাই বেশী।' ক্ষুব্ধ চিন্তিতভাবে লোকটা খাদুর নতুন ভাবসাব লক্ষ্য করে, 'চল যাই, দিয়া আসি তোমারে। কলাপাড়া নন্দলেন কইলা না ?'

'আমি যাইতে পারুম।' ক্ষীণস্বরে খাদু বলে।

'পারবা না ক্যান ? বাড়াটা চিনা আসুম, বুঝলা না ?'

বোঝে না ? সব বোঝে খাদু। চলুক সাথে, বড় রাস্তা ধরে সে যাবে, রাস্তা এখন গাড়ী ঘোড়া লোকজনের ভিড়ে। পাড়ায় গিয়ে নির্জ্জন গলিতে ঢুকবে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তার ভয়টা কি, লোকজন জেগেই আছে সব বাড়ীতে এখন।

'কি কিনা দিমু কও।'

'তিণ্যটি না।'

'তোমার খালি না আর না।' লোকটা বলে বেজার হয়ে।

কংক্রীটের পুলের গোড়ায় বড় রাস্তায় পড়ে লোকটা রিক্সা ডেকে বসে একটা খাদুকে চমকে আর ভড়কে।

'না না, রিক্‌সা লাগবো না।'

'লাগবো।' ধমক দিয়ে বলে এবার লোকটা, 'সব কথায় না না কর ক্যান? উইঠা বস রিক্‌সায়, কওতো হাঁইটা যামু নে আমি লগে।'

খাদু কিছু বলে না, কি আর বলবে। লোকটা তার পাশে উঠে বসে। আংটিপরা হাতে একবার হাত বুলিয়ে দেয় ধমক দেবার দোষ কাটিয়ে সান্ত্বনা দিতে। ঘেমে জল হয়ে গেছে খাদুর গা তখন, হাত পা যেন অবশ হয়ে এসেছে।

রিক্‌সা চলে ঘণ্টা বাজিয়ে, চলতে চলতে লোকটা হঠাৎ বলে রিক্‌সাওয়ালাকে, 'ডাইনে যাও।'

'না না, বড় রাস্তায় চলুক।'

'এইটা রাস্তা না?'

রিক্‌সা ঢোকে ডাইনের রাস্তায়। এটা সোজা পথ কলাপাড়া যাবার খাদু জানে, কিন্তু বড় রাস্তা ছেড়ে রিক্‌সা যখন ঢুকেছে এই গলিতে তখনি খাদু জেনেছে কলাপাড়ায় নন্দ লেনে দত্তবাড়ীতে আর সে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। দু'পাশে ঘিঞ্জি বস্তি, টিন আর খোলার চালে জ্যোস্না, সরু সরু গলিতে অন্ধকার। ওর মধ্যে কোথায় যেন জোরালো হল্লা চলেছে, মেয়েমানুষ গানও গাচ্ছ হারমোনিয়ামের সঙ্গে। এর মধ্যে নিয়ে যাবে কি লোকটা তাকে? এ অঞ্চল পেরিয়ে রিক্‌সা রাস্তায় বাঁক ঘুরলে খাদু একটু স্বস্তি পায়। এ অঞ্চলটা শান্ত, দু'পাশে কাঁচা পাকা বাড়ীতে গেরস্তের বাস।

কিন্তু খানিক এগিয়েই লোকটা থামতে বলে রিক্‌সাওয়ালাকে। ঘনিষ্ঠ সুরে বলে 'আমার ঘরখান চিনাইয়া দেই তোমারে, কি কও?

পুরাণো একটা পাকা গ্যারেজঘর, দরজা এখন তালাবন্ধ। এখানে সে থাকে, রাঁধে বাড়ে খায়, ঘুমোয়। পাশে গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনেটা শুধু দু'পাট কপাট, ওপরে নীচে দুটো তালা সাঁটা। ওপরে একটা তেরাবাঁকা সাইনবোর্ড, দু'পাশে সাইকেলের দুটো পুরাণো টায়ার ঝুলছে। এটা তার সাইকেল মেরামতি দোকান—দামোদর সাইকেল ওয়ার্কস!

'নাম কই নাই তোমারে? আমার নাম দামোদর।'

রিক্‌সার যোয়াল নামিয়ে রিক্‌সাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তাদের নামবার অপেক্ষায়। শক্ত করে হাতল ধরে ঝোঁক ঠেকিয়ে খাদু কাঠ হয়ে বসে থাকে।

'নামবা না?'

'না। তুমি নাম।'

চাঁদের আলোয় পথের আলোয় বেশ দেখা যায় মুখে যেন তপ্ত রাগের ছ্যাঁকা

লেগেছে দামোদরের। একহাতে সে খাতুর আংটিপরা হাতের কব্জি চেপে ধরে এতজোরে যেন খেয়াল নেই ওটা মেয়েছেলের নরম হাত, হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে মট করে, আরেক হাতে সে মুট করে ধরে খাতুর বুকের কাপড় সেমিজ।

'মার। আমারে মাইরা ফেলাও।' খাতু কেদে ফেলে হুস করে, জোরে নয়, চেপেচুপে, ক'হাত দূরে রিকসাওলাও টের পায় কি না পায়। আগে থেকে যেন তৈরী হয়েই ছিল এমনিভাবে কাঁদবার জন্য।

দামোদর ভড়কে গিয়ে বুকের কাপড় হাতের কব্জি ছেড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ। থ' বনে গিয়ে গুম খেয়ে থাকে কয়েক লহমা। তারপর রিক্‌সাওলাকে চলতে বলে কালীপাড়ার দিকে।

রিক্‌সা চলতে আরম্ভ করলে খাতুকে বলে, 'ব্যারাম স্যারাম নি আছে মাথার?'

সে রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় পড়ে রিক্‌সা, আবার ইটের রাস্তায় বাঁক নেয় সহরতলীর শান্ত নিঝুম উঠতি ভদ্রপাড়ার এলাকায়। মাঠ, পুকুর বাগানের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো নতুন বাড়ী, ছোট সীমায় ঢাকা গরীবের পুরাণো বস্তি। শরীর জুড়ানো হাওয়া বইছে অবাধে, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁর ডাক, কোন বাড়ীর ছাদ থেকে ভেসে-আসা বাঁশীর বাবুয়ানি মিহি সুর। আকাশে মুখ তুলে চাঁদ দেখতে হয় না, চারিদিকে চাঁদেরি আলো চোখের সামনে ছড়ানো।

নন্দ লেনের মোড়ে ঘন তেঁতুল গাছের ছায়া। খাতু দাঁড়াতে বলে রিকসাওলাকে।

'তোমার লগে দেখলে বাড়ীর লোক কি কইবো? আমি নামি।'

'নাম।'

খাতু রিক্‌সায় বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে দত্তবাবুর বাড়ীর হদিস তাকে বাৎলে দেয়, বলে, 'ডাইনা দিকে তিনখান বাড়ীর পরের বাড়ীখান, দোতালা বাড়ী। দেইখাই চিনবা।'

'বাড়ী চিনতে হাঙ্গামা কি।' দামোদর বলে উদাস গলায়, 'নন্দ লেনে দত্তবাবুর বাড়ী খুঁইজা নিতে পারতাম না?'

ফুরফুরে হাওয়ায় তেঁতুলগাছের ছায়া ঘেঁষে জ্যোস্নায় দাঁড়িয়ে খাতু যেন চোখের সামনে দেখতে পায় দত্তবাড়ীর অন্তঃপুর, খোকার কান্নায় স্বামীর পাশে শুতে দেরী হচ্ছে বলে রেগে গজর গজর করে শাপছে তাকে, মাছের মত মরা চোখে চেয়ে দেখছে ঘুম কাতুরে গাল চুপসানো দত্তবাবু, নীচের ঘরে চৌকীতে কাঁথার বিছানায় বসে দত্তবাবুর বুড়ী মা কেসে চলেছে খক খক করে আর মেজেতে শুয়ে খাতু ঝি এপাশ ওপাশ করছে অজানা কষ্টে। আজ রাতে কব্জিটা টন টন করবে।

'হাতটা মুচরাইয়া দিছ একেবারে, ব্যথা জানায়।' আহত কব্জি তুলে ধরে খাতু তাতে অন্য হাতের তালু ঘষে আস্তে আস্তে।

'ষাইট, সোণা ষাইট!' দামোদর বলে ব্যঙ্গ করে, 'কবিরাজী তাল আইনা লাগাইও, মাথায়ও মাইখো ঘইষা ঘইষা।'

লোক আসতে দেখে খাতু তেঁতুলগাছের ছায়ায় পিছিয়ে যায়। রিক্সা আর গাছের ছায়ায় তার আবছা মূর্ত্তির দিকে চাইতে চাইতে মানুষটা চলে গেলে এগিয়ে আসে। রিকসাওয়ালা তখন যোয়াল তুলে ধরেছে রিক্সার।

'আসি গো ঠাইরান।' বলে খাতুর কাছে বিদায় নিয়ে দামোদর রিক্সাওলাকে বলে, 'যাও, জোরসে চলো। বখশিস দিমু।'

খাতু বলে, 'শোন, শুনছ? একটা কথা ভাবতেছিলাম।'

রিক্সা থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে দেয়।

খাতু বলে, 'তুমি তো বাড়ী চিনা গেলা আমার। কই দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনলা আমারে, তোমার ঘর চিনা নিতে পারুম কিনা ভাবি।'

'কি করবা তবে?' দামোদর জিজ্ঞেস করে ভয়ে উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপিয়ে।

'গিয়া দেইখা চিনা আসুম?' খাতু বলে প্রায় অস্ফুট স্বরে। দামোদর স্পষ্ট শুনতে পায় প্রত্যেকটি কথা। রাসপূর্ণিমার বিনিদ্র উতলা রাত্রি হলেও সেখানে তাদের আশে পাশে আর তো কোন শব্দ ছিল না।

সর্বজনীন উত্তমপুরুষ

পুলকেশ দে সরকার

ব্যাকরণে যিনি নিজেকে উত্তম পুরুষ বলেছিলেন, তিনি কেবল বৈয়াকরণিক নন বহুকালজ্ঞ ঋষি। নিজের সম্বন্ধে এই উত্তম-বোধ কোন্‌কালে যে শেষ হবে তা বলার সময় আজও হয়নি। পুঁজিবাদের ভাঙা কাঠামোর ওপর যেখানে নয়া রুশ-সোভিয়েট-তন্ত্র গড়ে উঠেছে সেখানেও ঐ উত্তম পুরুষটি উত্তুঙ্গ। তাই এই সর্বোত্তম বৈয়াকরণিককে ত্রিকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বহুকালজ্ঞ ঋষি বলাই ঠিক হবে।

যুদ্ধোত্তর বাসে ভীড়ের চাপে শেষ হরিনাম নেব কিনা যখন ভাব্‌ছি তখনও দেখলাম

বহুকালজ্ঞ ঋষির এই উত্তম পুরুষটি ওই মধ্যে নাক জাগিয়ে তাঁর অস্তিত্ব কেবল তার সঙ্গীটিকে নয়, সঙ্গীটিকে উদ্দেশ করে আমার মতো কোণ-ঠাসা শেষ যাত্রীকেও জানিয়ে দিচ্ছেন: আমি শ্যাষটায় আর থাক্‌তে পারলাম না, বুঝলা সুনীল, কইয়া দিলাম। ভাবলাম, এইসব কথা না চাইপ্যা কইয়া দেওয়নই ভাল। সঙ্গীটি সায় দিয়ে বল্‌লে, না, ভালই করছেন। উত্তম পুরুষটি নিজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন।

আমি তলিয়ে গেলাম আরও বেশী। এই যে আমি, এই আমি কতই না সংযত, মানে অসীম সংযম আমার। এই সংযমের জোরেই এতক্ষণ চেপে ছিলাম। এ মস্ত কৃতিত্বের ব্যাপার। লোকটা অন্যায় করেছে আমার জানা আছে, অসীম সংযমবলে আমি তা চেপেছিলাম, সুনীল, আমার সেই সংযমটা লক্ষ্য কর, আমাকে ধন্যবাদ দাও, এ বিষয়ে মামেকং শরণং ব্রজ, আমি, আমি, আমার তুলনা নাই—সংযম, অগাধ অসীম। কিন্তু··· এই কিন্তু থেকেই মোড়টা ফিরে গেল, সুনীল, আমার সংযমের বেদীমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এস আমার সঙ্গে, এস সেই পর্যন্ত যেখানে আমি, ঠিক যেখানটায় দরকার, একটু আগেও নয়, পরেও নয়, একেবারে নিখুঁত হিসেব করা সীমানায়, সংযমের অপপ্রয়োগ সম্ভাবনায় সংযমের বাঁধ দিলাম খানিকটা ভেঙে, কেননা, নিজের সংযমের খানিকটা উপাদান দিয়ে অপরের অসংযমকে সংযত করতে হয়, অন্যায় সহ্য করতে নেই, তা সহ্য করাও অন্যায়, আমি অন্যায় করব এ হতেই পারে না, আমি, আমি···তাই সুনীল, আমার অসীম সংযম সত্ত্বেও শেষটায় আর চাপ্‌তে পারলাম না মানে এই নয় যে, নিজেকে আমি চাপতে অক্ষম, আমার অক্ষমতার কথা ওঠে না, শেষটায় আর চাপা উচিত মনে করলাম না, স্রেফ অকপট কর্তব্যবোধে আমি নিজেকে প্রকাশ কর্‌লাম। আমার প্রকাশ ভয়ঙ্কর, রুদ্র, তীক্ষ্ণ। তা কর্‌লাম, কারণ, অমন অবস্থায় তা না করলেই অন্যায় হত, অন্যায় যে আমি করি না তা তুমি জান সুনীল, সুতরাং।······

সঙ্গীটি বল্‌লে, বেশ করেছেন। অর্থাৎ, এই অবশ্য-করণীয় কর্তব্যটি আমিও করতাম। আমারও কর্তব্য-জ্ঞান আছে। আমার উচিত-অনুচিত জ্ঞানটিও টন্‌টনে। আপনার অবস্থায় আমি যা করতাম আপনি তাই করেছেন। অবস্থার ফেরে পড়ে আছি, নতুবা এ আমি আরও নিখুঁতভাবে করতে পারতাম। আপনি তো তবু অতটা সহ্য করেছেন, অতটা সহ্য করা আপনার উচিত হয়নি, আপনার বোধশক্তিটা কিছু ভোঁতা, নতুবা আপনি ভয় পাচ্ছিলেন, ভয়টা কিসের, ন্যায়ের দণ্ড নিয়ে অন্যায়ের মাথায় মারব তাতে আবার ভয়টা কিসের? বলা উচিত ছিল, আরও আগে বলা উচিত ছিল, আরও কড়া করে বলা উচিত ছিল, আরও গুছিয়ে বলা উচিত ছিল, মানে যা আপনি পারেন নি, আমি হলে তাও পারতাম, তবু যা হোক, মন্দের ভাল, শেষ পর্যন্ত যে বলেছেন এই ভাল, যাক্‌গে, give the devil······,

ভালই করেছেন, আমি হলে অবশ্য কোন খুঁতই থাকৃত না, তা যাকৃগে, তুমি মধ্যম পুরুষ, তুমি এর বেশী আর কি করবে, এইটুকু কনসেসন তোমাকে দিতে পারি, ভালই করেছ।

ওদিকে 'ভালই করেছেন'-এর বাতাস উত্তম পুরুষের সর্বাঙ্গ ব্লাডারের মতো ফুলে উঠেছে। উত্তম পুরুষ তখন চারদিকে অপরিচিতের দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করে বলছেন, হু হু, আমি ভাল করব না তো ভাল করবে তুমি গোবর-গণেশ, না, এই গর্দভগুলো। আরে, আমি যা করি তা ভালই করি, শত হ'লেও আমি, তুমি তো নও, মধ্যম পুরুষ, বা এরা তো নয়? আমার সংযম, সংযমের সীমানাবোধ, বলার ভঙ্গী সে একান্তই আমার। তবে হ্যাঁ, তুমি যে আমি ভাল করেছি তা বুঝতে পেরেছ তার তারিফ তোমাকে দি, কিন্তু সাবধান, মামেকং শরণং ব্রজ। মধ্যমের উত্তম হওয়ার একমাত্র উপায় আমাকে অনুসরণ করা।

অনুসরণ? তা করছি কিন্তু এজন্য নয় যে তোমাকে আমার অনুসরণ না করলে চলে না, ওটা আমার বিনয়, যেটা তোমার নেই, তুমি দাম্ভিক, তুমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, নিজেকে জাহির করতে চাও, আমি তা চাই না, আমার মতো নীরব কর্মী তুমি নও, ফাঁকা, হাল্কা, empty vessel, বড্ড শব্দ, আমি ধীর স্থির প্রশান্ত, নিস্কাম, তাই কারও পেছনে যেতেই আমার সঙ্কোচ নেই, আমি সঙ্কীর্ণ নই, আমি জানি আমি কি, তাই একথা মনে করি না যে, তোমার পেছনে গেলে আমি ছোট হয়ে গেলাম। আমি যা আছি, তাই আছি, আমি পূর্ণ, আমি ভরাট, আমি নিস্তরঙ্গ সমুদ্র।

বাস এসে থামল মোড়ে। উত্তম পুরুষ আর সুনীল নেমে গেল। আমিও নামলাম। গুমটির কাছে এসে কংগ্রেসকর্ম্মী নকুলদাসের সঙ্গে দেখা। সর্বাঙ্গে তার ত্যাগ আর স্বদেশীর ভঙ্গী। চুল অবিলাস ছন্দে কাটা। খদ্দর, পাঞ্জাবী আর চাদর আর স্যাণ্ডাল। হাতে একটা কাঠের হাতল দে'য়া খদ্দরের থলি, চামড়ার পোর্টফোলিওর স্বদেশী সংস্করণ (হনুকরণ?)। এক অখণ্ড নিষ্পাপ স্বদেশী প্রতিমূর্তি। হাসতেই হবে ভঙ্গীতে আমাকে দেখে হাসতেই নিম-দাঁতন দিয়ে মাজা দাঁতের পাটি বিকশিত হল।

নিখুঁত, নিখুঁত আমি। এস দেখ আমাকে। দেখ বাইরেটা দেখ, বাইরেটা দেখে ভেতরটা বোঝ, অবশ্য তোমার যদি বোঝার ক্ষমতা থাকে তবেই। আমার মাথায় এই দীন-দরিদ্র ছ'পয়সা আয়ের দেশে স্যালুনে অহেতুক দেরীতে ক্লিপে-ক্ষুরে কামানো কান-পাশা ঢেউ খেলানো ব্যাক-ব্রাশ নয়, অশোভন অসঙ্গত নির্লজ্জ কৃত্রিম শ্রী এই হতমান দুর্ভিক্ষের দেশে! আমার মাথায় কদম ছাঁটে গভীর দৃষ্টি তলিয়ে দেখ, মা যা হয়েছেন। আর দেখ যন্ত্রের বেদনায় কোণঠাসা শুষ্ক অঙ্গুলির তকৃলিকাটা সতরঞ্জি প্যাটার্ণের শুভ্র আবরণ—স্নানের সময় নিজ-হাতে সাবান দিয়ে কাচা, স্বাবলম্বীর সফেদ নিদর্শন। আর এই থলি, এতে আছে নিস্কাম ধর্মের একখানি গীতা, কুলগুরুর একখানি ব্রহ্মচর্য যার কৌপিন সজোরে আঁটা আছে

অদৃশ্য লোকে। দেখ একবার আমাকে। নিমদাঁতন দিয়ে মাজা নিষ্কলঙ্ক বিকশিত দাঁতের এই ভাষা, এই ইঙ্গিত। ইহ বাহ্য, আগে কহি শোন। ভোগকে উপেক্ষা করে এই যে আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এস এর অন্তরলোকে যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্যের মূল প্রেরণা পাবে, পাবে সদ্য কাটা-পাঁঠার অসহ ব্যথাবোধ, অনাদৃত দেশ-মাতৃকার মুক্তি-সাধনার ইস্পাত-সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের জোরে দেশের আহ্বানে এক কথায় দেড়শ টাকার চাকরীটা ছেড়েছি আজ বিশ বছর, তার মধ্যে জেলে কেটেছে তিন কিস্তিতে সাড়ে তের বছর। হে দর্শক, তুমি অতি সাধারণ, নিতান্ত বৈষয়িক, একান্ত স্বার্থসন্ধিৎসু, কেবলই স্ত্রীপুত্র-কন্যার জালে ঘুরপাক, স্যালুন আর পানের দোকান আর অফিসে ইয়েস স্যার। পুলিশের গুঁতো খাও নাই, জেলে যাও নাই, দেশের মুক্তির জন্য একরত্তি ত্যাগ কর নাই। হে মধ্যম পুরুষ, তুমি আমার মধ্যে তোমার অসার্থকতা উপলব্ধি কর, আমারই কল্যাণে তুমি স্বাধীনতা পাবে। আমি দেশের অতীত গৌরব, বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জীবন্ত কাঠামো, আমায় দেখ।

অভ্যস্ত চোখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে অবশ্য দেখলাম না। বল্‌লাম, নকুল বাবু এবার ইলেক্‌সানে দাঁড়ান নি ?

ইলেক্‌সান ?

অর্থাৎ ইলেক্‌সান কি এমন একটা প্রশ্ন যার জবাব আমাকেই দিতে হবে ? এজন্য কি রামাশ্যামা যথেষ্ট নয়। আর সেই ইলেক্‌সানে আমি দাঁড়িয়েছি কিনা ? বল্‌তে হবে। হয়তো আমার অভিমতটা তোমার দরকার। অবশ্য সেজন্য তোমায় আপ্যায়িত করব। শোন।

আপনি তো জানেন কংগ্রেস এ নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে। আর এওতো আপনি জানেন, নেহাৎ সুশৃঙ্খল সেনার মতোই আমরা এই পরিষদের লড়াইয়ে নাক গলিয়েছি। নইলে খোলাখুলি বল্‌ছি আপনাকে, আমরা সৈনিক, সংগ্রামই ভালবাসি। নির্ব্বাচনে গভীর বিশ্বাস থাক্‌লে আমি যদি চাইতাম তবে কি আমি মনোনয়ন পেতাম না। আমায় তো······বলেওছিলেন আমি দাঁড়াতে চাই কি না। আমি বল্‌লাম না। নইলে বুঝতেই তো পারছেন,······এর মতো, কি বলব, জানেনই তো ওর ক্রিয়াকলাপ, তার মতো, বল্‌তে কি ও পরিষদে গিয়ে কীই বা করবে, না বলতে পারে একটা কথা, মশাই ভাল ইংরেজী পর্যন্ত······থাক্‌গে, পরনিন্দা হ'য়ে যায় মশাই, সেও যদি মনোনয়ন পায় তবে কি আমি······

তাড়াতাড়ি বল্‌লাম, নিশ্চয়ই পেতেন।

স্বদেশী নকুলদাস সোৎসাহে বল্‌তে লাগলেন, তবু শুনুন মশাই, আরও বলি কেলেঙ্কারীর

কথা, ভগবানকে ধন্যবাদ ও সব ব্যাপারে যাইনি, এইমাত্র যার কথা বললাম, বুঝতে পারেন না সে কী করে মনোনীত হয়, কর্ম্মী হিসেবে ও কি?—এই মশাই এই, ব'লে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর ইসারায় টাকার নিঃশব্দ আওয়াজ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য জুরে দিলেন, ঘোরতর চোরাবাজারী, অহিংস মাড়োয়ারী হয়েও চর্বির······আচ্ছা আসি, ভয়ানক ব্যস্ত।

ত্রস্তে ভীড়ের মধ্যে মিশতে চাইলেন কিন্তু উত্তম পুরুষের এমনই একটা নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য যে এত ভীড়েও তাঁকে নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল, দুর্ভেদ্য অহমিকার বর্ম অসীম সমুদ্রের মধ্যে নূনের পুতুল হওয়ার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করছে। গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে বার বার উত্তম পুরুষকেই স্মরণ করতে লাগলাম।

নকুলদাসের জীবনটা কেমন একটা নির্ভুল ফরমূলায় বাঁধা। ওই শিবে নাপিতকে ডেকে তিনি যখন ঘড়ির কাঁটার মতো একটা নির্দিস্ট দিনে প্রতিবারই ক্রমবর্ধমান মাথার চুলকে এক ইঞ্চির ষষ্ঠাংশ পরিমাপে রেখে দেন তখন নাপিতের কাঁচির এক ইঞ্চির চতুর্থাংশ পরিমাপ নীচেই নকুলদাসের মগজে ঝড়জলের আগে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো এই কথাটাই খেলে যায়, আমি নেহাৎ রামা-শ্যামা নই, গারোয়ানী ছাঁট ছেঁটে পানের দোকানে আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্য নিজেই উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকি করা তাঁর কাজ নয়, সে তার উর্ধে, বহু উর্ধে মূর্খ শিবে নাপিত তা জানে। সতরঞ্চি প্যাটার্ণের অঙ্গাবরণ অঙ্গে চাপাবার সময় নকুলদাসের চেতনায় একথাটা টনটন করে যে, যারা কেশরঞ্জনে মাথার দীর্ঘচুল সযুৎ করে পাৎলা পাঞ্জাবীর নীচে স্যাণ্ডো গেঞ্জিটা আর বুক পকেটে দশটাকার নোটটা দেখিয়ে ৪৮ ইঞ্চি কোচাটাকে বার বার লোকের নাকের কাছে ঝাড়ছে বা ২৪৲ টাকার অর্ডার দেয়া নিউকাটের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে নকুলদাস, হ্যাঁ, দেশের জন্য সর্বত্যাগী নিষ্কলঙ্ক নকুলদাস তাদের কেউ নয়। ওরা অসংখ্য, নকুলদাস এক।

ড্যালহৌসী স্কোয়ার ঘুরে গ্যালিফ ষ্ট্রীটের যে দোলন-চাপা (চাঁপা নয়) পুরোণো মডেলের গাড়ীখানা এসপ্লানেডের ভীড় ঠেলে এসে দাঁড়ালো তাতে কোনগতিকে উঠে দেখি ম্যাজিকের মতো বেঁচে গেছি এবং ওঠবার ঠিক এক সেকেণ্ড আগে যে বাবুটি একটি কার্লটন সিগারেট ধরিয়ে উঠলেন তার জ্বলন্ত অগ্রভাগ আমার নাসাগ্রে লাগে লাগে করেও লাগেনি। একটু ফাঁকে হাঁফ ছাড়বার জন্য ট্রামের মাথা পর্যন্ত এগিয়ে উর্ধবাহু হয়ে গন্তব্যের কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবনায় ছেদ পড়ল :

অমন নোংরা হয়ে আমি থাকতে পারিনে বাপু, যাই বল, বিজয়, ও কী, যেন সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছে তেমনি করে চুলছাঁটা, মাথায় একছিটে তেল ছোঁয়াবেনা, চিরুণীর বালাই নেই, দাড়ি উঠল তো উঠল, কামাবার নাম নেই, এসব লোকের গায়ে, আমি, নির্ঘাৎ বলতে পারি, বিজয়, ঘাসের চামসে গন্ধ, পাউডার তো ব্যবহার করে না, বড় জোর

একগাদা সরষে তেল, নুইসেন্স, তার ওপর গায়ে ইয়া মোটা চট্ চাপিয়ে, না-না, বিজয়, এমন কৃচ্ছ্রসাধন, নো, নো, কোন মানে হয় না। আমার ভাই নোংরামি একেবারে সহ্য হয় না, ভোর বেলা উঠেই দাঁতটি আমার প্রথম মাজা চাই, ছি, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে গাছের ডাল নিয়ে বসে গেলাম আর কষ বেয়ে, ছি, জান বিজয়, আজকাল best and most up-to-date টুথ ব্রাশ হচ্ছে Dr. Wests, কাচের টিউব একটি থাকে, ঠিক দাঁতে দাতে ফিট্ করে, তাতে একটু লাগিয়ে নিলে ইউথাইমল, তারপর আপ্স এণ্ড ডাউন্স। সবাই জানেনা টুথ ব্রাশ ইউজ করতে, এবরো-থেবরো টানা হেঁচড়া করে, তাতে গাম ইনজিওর করে। চানটাও সকালে সেরে ফেলি, জ্যাবজোবে নয়, একটু তেল দিয়ে চুলটা ভিজিয়ে। অফ্ কোর্স আই প্রেফার লাইমজুস, চানের পর খানিকটা দিয়েই চিরুণী চালিয়ে দি— what a refreshing flavour, সাবান, ইয়েস, কিউটিকিউরা, মেডিকেটেড, টয়লেট, স্কীন তোমারগে এমন স্মুথ রাখে, তুমি কি সাবান ইউজ কর বিজয়……

একটা জবাব এল : ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো।

মার্গো? ঘৃণা-প্রকাশে মনে হল কে যেন আস্তাকুড় মাড়ালো। না, না, বিজয়, prevention is better than cure, একবার পাঁচড়া হয়ে গেলে, উঃ inconceivable! নো, নো, চানের পর সর্বাঙ্গে না হোক অন্তত জয়েন্টে জয়েন্টে কিউটিকিউরা পাউডার প্রফিউজলি দেবে, জান তো that is the best talcum. মোটা জামা কখখনো ব্যাভার করবেনা, জানি কাপড় পাওয়া মুস্কিল, কিন্তু who doesn't indulge in blackmarket to day, so no, scruple, ফিনলে, অরবিন্দো, ক্যালিকো……, তুমি দেখবে আলটিমেটলি এতে লাভ; পাৎলা জামা কাপড় টেঁকে বেশী, ফর্সা থাকে বেশী অথচ শরীরে ভেন্‌টিলেশন হয়। সস্তা জিনিষটাই খারাপ, take always a long view, comrade, এই ধর এজুতোটা, কত হয়েছে মনে কর, আন্দাজ?…….

১২-১৪৲ টাকা?

Twenty-four rupees, my dear friend, best and latest design, just mark!

আমি চক্ষুচড়কগাছ হ'য়ে কৌতুকের সঙ্গে যখন উত্তম পুরুষকে লক্ষ্য করছিলাম তখন তিনি ঘাড়টা একটু কাৎ করে একটা চোখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে বন্ধুটির উদ্দেশ্য কৃপাহাস্যে বল্‌লেন, Would you mind a peg or two?

বন্ধুটির আপত্তিতে উত্তম পুরুষ বল্‌লেন, rubbish, that echoes the age of Vivekananda, আজকে হচ্ছে new valuation of old morals, এবিষয়ে যোশীয়াইটদের

আমি প্রশংসা করি, তাদের একটা dash & push আছে, you mind a peg and I can stand four pegs at one sitting.........

আমার গন্তব্যস্থানের মাঝামাঝি এসেছি, আমিও ভীড় ঠেলে ট্রামটার মাঝামাঝি এসে থম্‌কে গেলাম।

দর্জিপাড়ার ছেলে বাবা, হু হু, আমার চৌদ্দপুরুষ মার্চেন্ট অফিসে কেরাণীগিরি করেছে, সাহেবের কামরায় ঢুকে বল্‌লাম, I touch your feet, sir, my father diseased sir, I to eat many men, five brothers, mother's own sons...... সাহেব বল্‌লে, Don't howl like a dog. আমি বল্‌লাম, I like I am your dog, your dog gets meat, I eat only rice য্যা, pulses, not বাঙাল, cannot take লঙ্কা মানে chilli. সাহেব বল্‌লেন, go go. আমি বল্‌লাম I prostrate here sir, not picketting, down with Gandhi, আমার চৌদ্দপুরুষেও anti-British নয়, take me take me, sir. সাহেব বল্‌লেন, go go. আমি বল্‌লাল, ও হো হো, then give me to your dog, I dogs meat, dog eat me. সাহেব বল্‌লেন, go, go, I shall speak to the Head clerk. আমি লাফ্‌ দিয়ে উঠ্‌লাম, বল্‌লাম, God save the king, তখন ঠিক বারোটা, বল্‌লাম Good Noon. হু হু বাবা ফোর্থ ক্লাশ অবধি পড়েছি। ইংরেজীতে ঠেকাবে কে, বাবার দে'য়া বাড়ী আছে, দুটো বাঙাল ভাড়াটে আছে, ফাদার কবেই পটল তুলেছেন, ভাই একটিও নেই, wife আর......

গন্তব্য স্থলে নেমে গেলাম।

বাড়ীতে আস্‌তেই স্ত্রী মধুবর্ষণ করতে লাগ্‌লেন! বড়ই যে নিজের ফূর্ত্তি-ফার্ত্তা নিয়ে আছ। আমার কি আর সাধ-আহ্লাদ নাই। তোমার হাতে পড়ে একেবারে যে ঝি-চাকরের সামিল হয়ে গেলাম। আমাকে বলেই পার্‌লে। অন্য বাড়ী দেখনা, স্বামী তার স্ত্রীর জন্য কি করে। আমিই তোমার দেওয়া মোটা কাপড় মুখ বুজে পর্‌লাম। তেমন স্ত্রী হলে দেখ্‌তে। গয়নাগাটি ক্রীম-স্নোতে তোমায় ব্যস্ত করে তুল্‌ত। কোথাও একদিন নিয়ে যাবার নাম করে না, পাড়ার কোন্‌ মেয়েটা না সিনেমা যায়? বড় যে অনাদরের বস্তু হয়ে গেলাম। অথচ জিগ্‌গেস করে দেখো আমার বাবা মাকে কী আদরেই আমি বড় হয়েছি," কি খেয়েছি, কি পরেছি, অথচ সংসারের কুটোটা নাড়িনি, তোমার হাতে পড়ে......বাক্যগর্জনের পর আঝোর ঝরে অশ্রুবর্ষণ।

আমি 'আদরিণী যা হয়েছেন'-মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম: আমি অসাধারণ, অসাধারণ। আমি একটা প্রিন্সিপিলের মানুষ, কড়া আদর্শ আমার, সত্যাশ্রয়ী আমি, বিরাট অসীম দৃষ্টি আমার, সমগ্র দেশের দুঃখদুর্দশায় কাতর আমার

মন, সেখানে স্ত্রী তুচ্ছ, সামান্য। স্ত্রী কাঁদ্‌ছেন? কাঁদুন! আমি সঙ্কল্পে কঠোর; ঘরে ঘরে এমন লক্ষ লক্ষ দুঃখকাতর স্ত্রী আমার চোখের সুমুখে, সেখানে আমার স্ত্রীর এই দুঃখ? মোটা কাপড়, তাও তো ঐ নগ্নিকা পায় না; কাঁকর ভাত? তাও তো ঐ বুভুক্ষুর জোটে না। গয়নাগাটি ক্রীম স্নো? অভিশপ্ত সমাজের বৈষম্য মুরদাবাদ, তারপর, তারপর! সিনেমা? লজ্জাকর বিলাস এই দরিদ্র পরাধীন দেশে। নিজের গৌরবে নিজে স্ফীত হয়ে উঠ্‌লাম। কি প্রিন্সিপিলের মানুষ, কি কঠোর, কি সংযমী অথচ মৃদুনি কুসুমাদপি, স্ত্রী কাঁদেন, চোখে জল আসে না, বিশ্বের দুঃখে আমার চোখে জলের ধারা আসে। আমি পূর্ণ, আমি আদর্শ, বিশ্বজনীন অহমিকার মধ্যে সকলকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উত্তীর্ণ ক'রে আমি······আমি উত্তমপুরুষ!

খ্যাতি

শ্রীসাধনা কর

বোসেদের মেয়ে নির্মলার সতেরো আঠারো বছরের জীবনের অনেক ঘটনা, অনেক কথাই পাড়া-পড়শীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। রসিয়ে রসিয়ে সে সব ব'লে মজা উপভোগ করত সবাই। সেদিন কনে সেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েও সে এমনি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। বরপক্ষ জিজ্ঞেস করেছিল তার নাম। লজ্জায় ভয়ে নির্মলা তখন জবু-থবু। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে নামটা। শোনা গেল না। আবার জিজ্ঞেস করা হল। এবার আরেকটু জোরে বললে নির্মলা। তার জিভ ছিল ভারী, স্বর ছিল মোটা, অনেক কথাই অস্পষ্ট উচ্চারণ হত। বরপক্ষ ভালোমতো না শুনতে পেয়েই হোক, কিংবা জিভের জড়তা সন্দেহ করেই হোক্, আরেকবার জিজ্ঞেস করলে নাম। এ পাশ থেকে এ পক্ষের লোকের অনবরত তীব্র সাবধনতা—জোরে বল্ স্পষ্ট করে বল্। ও পক্ষও বারবার বলছে—বলো, বলো, জোরে বলো—তোমার নাম।

ভয়ে লজ্জায় নির্মলার মেজাজ গেল বিগড়ে। হঠাৎ অস্বাভাবিক জোর দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললে—নিম্বলা গো নিম্বলা, ছি নিম্বলা দাছী।

গ-গ সুরে, জড়িত জিভে কথাগুলি অদ্ভুত আওয়াজে বের হল। বরপক্ষ অবশ্য পত্রে শেষ কথা জানাবে বলে বিদায় নিলে, কিন্তু ফল আন্দাজ করতে কারু কষ্ট হল না।

বিকেলবেলা এই নিয়ে পাশের বাড়িতে মস্ত জটলা। গ্রামের সবকারী ঠাকুর্দা রাসবেহারী মিত্র রসিক লোক, আমোদ-প্রিয়। নির্মলার সঙ্গে তাঁর রগড় জমে খুব। তিনি একেবারে ও বাড়ি থেকে নির্মলাকে পাকড়ে ধরে আনলেন—বেশ বলেছ নিম্বলা-দিদি, সুন্দর নামটি বলেছ। যে তোমাকে নেবে, ঐ নাম শুনেই মুগ্ধ হবে।

উপস্থিত জনতা মুখ টিপে হাসলে। নির্মলা কিন্তু তার ভুল কোথায় বুঝতে পারলে না। ফ্যাল ফ্যাল চোখে চারদিক তাকালে। পরেশ বোস্ নির্মলার নিকট-সম্পর্কীয় দাদা। নিশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, ওর হবে আবার বিয়ে। আমার তো বিশ্বাস হয় না।

নির্মলার মুখ ম্লান হয়ে উঠল। বিয়ে না হবার দুঃখে তত নয়, কিন্তু এতখানি বয়সেও তাকে বিয়ে দিয়ে উঠতে না পেরে বাড়ির সবাই যে কতখানি চিন্তিত, নির্মলা সে কথা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে। ঠাকুর্দা সোৎসাহে তার পিঠ চাপড়ে বললেন—হবে না আবার বিয়ে, বললেই হল। জজ্-ম্যাজিস্টর এনে বিয়ে দেবো, কিছু ভাবনা নেই।

সবাই সশব্দে হাসলে। নির্মলার মুখও একটু যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মাথাটা সে নীচু করলে। পরেশ বোস বললেন—জজ-ম্যাজিষ্টর চাইনে, কেরাণীপুত্রই জুটিয়ে আনুন, সেই আমাদের ঢের।

ঠাকুর্দা এক হাতের উপর আরেক হাতের থাপ্পড় মেরে বললেন—এই বলে দিলাম, নিম্বলা-দিদি, জজ-ম্যাজিষ্টর বর না আনি তো……! হা, আমার কপাল, আমার বয়েসটাই যদি আজ থাকত, ভাবনা ছিল কী। জজ-ম্যাজিষ্টর না হই, জমিদারের তহশিলদার তো…।

লজ্জায় রাঙা হয়ে নির্মলা ঠাকুর্দার হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইলে। ঠাকুর্দা ছাড়লেন না। আরো কতক্ষণ রঙ্গ করে তিনি বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—প্রস্তুত থেকো নিম্বলা-দিদি, একদিন দেখো ঠিক হোমরা-চোমরা এক বর এনে হাজির করব, তাক্ লেগে যাবে সব্বাইর।

সবাই হাসি চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেল। নির্মলা দেখে দেখে ভ্রু কুচকে ভাবলে—সবটাতেই এদের হাসি! কী এমন হাসির কথাটা ঠাকুর্দা বললেন?

এমনিতেই ঘরদোর ঝাড়-পোছ-করা নির্মলার স্বভাব। ঠাকুর্দার কথার পর থেকে সে নিজেরও যেন বিশেষ একটু তদারক সুরু করলে। খাবল খাবল তেল মাখে চুলে, যখন তখন গামছা দিয়ে হাতমুখ গগড়ে রগড়ে ধোয়। মস্ত একটা টিপ দেয় কপালে। দেখতে নির্মলা মন্দ নয়। রংটা ফর্সাই বলা চলে। বড় বড় গোল-ধরণের চোখ। মোটা সোটা পেটানো স্বাস্থ্য। সেদিন স্নানের ঘাটে মিত্রের বাড়ির রাঙা ঠাকুরমা বললেন—আজকাল নির্মলার যে ভারী বাহার খুলেছে গো……।

সরকারদের বাড়ির বৌদি হেসে বললেন—হবে না ঠাক্‌মা, বিয়ের কনে যে, সাজগোজের

দিকে নজর পড়েছে !

রাঙা ঠাকুরমা মুখ বাঁকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, কোন্ জমিদার তালুকদার এসে আমাদের নির্মলাকে পছন্দ করবে কে জানে।

বৌদিও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন—তপস্যা করছে বসে, কোন্‌দিন স্বয়ং এসে উপস্থিত হবে। নির্মলাকে দেখেশুনে কী আর সবুর সইবে তার…।

অত্যন্ত রাঙিয়ে উঠে নির্মলা মাথাটাকে একেবারে নুইয়ে ফেললে। লজ্জা-জড়িত মোটা গলায় কেবলই বলতে লাগল—তোমরা ভারী ইয়ে বৌদি, ভীষণ ইয়ে……যাও, —কী যে বলো, ধ্যাৎ……।

ঠাকুরমা-বৌদি সমস্বরে হেসে উঠলেন—ওমা, আমরা কী সত্যি বললাম নাকি লো……!

চাপা হাসি এবং নানা মন্তব্যে অনেকক্ষণ পরে নির্মলার উপলব্ধি হল ঠাকুরমা-বৌদি তাকে ঠাট্টা করছেন। ঠাকুর্দার কথাও কি তবে সে ঠিক বুঝতে পারেনি ! তিনিও হয়তো ঠাট্টা করেই থাকবেন ! অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেল নির্মলার মুখ। ঝুপ্ করে ড়ুব দিয়ে সে দ্রুত পায়ে চলে গেল বাড়ি। ঠাকুর্দার উপরে অভিমানে মন উঠল তার ভরে। কিছুতেই ভেবে পেলো না তাকে নিয়ে সবাই এমন হাসি-ঠাট্টা করে কেন। ঠাকুর্দাকে তার খুব ভালো লাগে। এলেই কত রঙ তামাসা করেন তিনি। নির্মলা আর কথা বলবে না তো তাঁর সঙ্গে, কিছুতে নয়।

* * * *

মাস ছ'সাত পরে সত্যি সত্যি একদিন মিত্তির ঠাকুর্দাই নির্মলার বর জুটিয়ে আনলেন। অবশ্য দোজবর। প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রথম সন্তান হতেই মারা গেছে। বরের বয়েস একটু বেশী। তবে অবস্থা ভালো। জায়গা-জমি গোরু-বাছুর আছে, ছোটোখাটো একটা দোকানও আছে। ঘরে শুধু বৃদ্ধা মা। একটি বড়ো-সড়ো কর্মী মেয়ের খোঁজ চলছিল। ঠাকুর্দা নির্মলার মা বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে চট্‌পট্ নির্মলার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। গ্রামের সবাই একবাক্যে সায় দিলে—নির্মলার আর যাই হোক, কপাল ভাল !

ঠাকুর্দা ঢঙ দিয়ে বললেন—বলো তোমরা, জজ্-ম্যাজিস্টর জমিদার-তালুকদারের থেকে ভালো বর এনেছি কি না। নিম্মলা-দিদি, আর রাগ নেই তো? কথা বলবে তো আমার সঙ্গে……।

খুসীতে নির্মলা উজ্জ্বল। হাসিভরা মুখে একটু বুঝিবা রসিকতা করেই বললে—কথা বলার কি আর সময় পাব !

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তুমুল কলহাস্যে নির্মলা পালিয়ে বাঁচল।

এমন রাগ ধরল তার। সব কথাতেই এদের হাসি! সব সময়ই এরা যেন তাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যেই প্রস্তুত। সে যেন একটা মানুষই নয়। হোক না আগে বিয়েটা কেমন হাসতে পারে সবাই দেখা যাবে। বরবর দেখে তাক্ লেগে যাবে সবাইর, ঠাকুর্দা তো তাই বললেন!

বিয়ের সভায় বর দেখে কিন্তু সত্যি সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি সুরু করলে। একী বর! রংটা আরেক পোচ কালো হলে যে অন্ধকারে আঁৎকে উঠতে হত! প্রকাণ্ড শরীর, ছোট ছোট চোখ, সামনের দুটো দাঁত উঁচু, প্রায় বের করা। অসম্ভব মোটা নাক, টাক পড়ে আসা কপাল। অল্প বয়সী মেয়েরা নির্মলার সামনেই ঠেশ-ঠিশারায় ইসারায়-ইঙ্গিতে হাসাহাসি করলে। বর্ষীয়সীরা' ধমক দিয়ে বললেন—এমন বর জুটেছে, ভাগ্যির কথা। দোল, দুর্গোচ্ছব, অস্টপ্রহর কীর্ত্তন, বারো মাসে তেরো পার্বন বাড়িতে বাঁধা, বলতে গেলে রাজার ঘর।

মেয়েগুলি মুচকি হেসে পরস্পরকে বললে,—হ্যাঁ, স্বয়ং রাজপুত্রই বটে, কী বলিস দিদি!

বধূর বেশে নির্মলা তখন ঘোমটা দিয়ে এককোণে ব'সে। অতিরিক্ত লজ্জার ভারে সে মাথা তুললে না। চোখ উজ্জ্বল দেখালো। বর কি আর সে ভালোমতো দেখেছে! তবে এরা যখন বলছে হয়তো রাজপুত্রের মতোই হবে! ধারণাটা বদ্ধমূল হল মিত্তির ঠাকুর্দ্দার কথায়। তিনি এসেছিলেন নির্মলার সঙ্গে হাসি-মস্করা করতে। মেয়েগুলি ছেঁকে ধরলে—এমন বর আপনি পেলেন কোথায় দাদু......?

ঠাকুর্দা হেঁকে উঠে বললেন—রাজপুত্তুর! সাত-জন্মের তপস্যায় মেলে। অমনটি তোরা পেলে বর্ত্তে যেতিস্।

নির্মলার মন গর্বে পরিপূর্ণ। এবার সঙ্গিনীরা দেখুক নির্মলার ভাগ্য! বড় যে হাসত তাকে নিয়ে! এখন হিংসে করবে! শ্বশুর বাড়ি তার রাজার ঘর বলতে গেলে, বরও রাজপুত্রের মতো,......খুসীতে নির্মলা হাসল।

দ্বিরাগমনে জোড়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে সেদিন নির্মলা গিয়েছিল এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরতে। সবাই এসে ঘিরে ধরল। কী দিয়েছে শ্বশুর বাড়ি থেকে। কেমন সে বাড়ি, বরের স্বভাব-চরিত্র কেমন,—নানা প্রশ্ন। গর্বোজ্জ্বল মুখে নির্মলা কথার উত্তর দিতে দিতে বললে—বাড়ি তো একেবারে প্রকাণ্ড রাজার বাড়ি। আর আপনাদের জামাইও...।

তার বিগলিত উৎসাহে শ্রোতৃমহলে সমবেত একটা চাপা হাসির লহর উছলে উঠল। মিত্রদের মেয়ে জ্যোৎস্না,—সুন্দরী বলে তার খ্যাতি, পরম রূপবান বর। অদম্য হাসি চাপতে চাপতে বললে—ভারী সুন্দর, নয় নির্মলা!

কেমন উঁচু দাঁত, বলি ও নির্মলা······? বড়দের আড়ালে জ্যোৎস্না একটা মন্তব্য করলে। সম-বয়সী মহলে দমকা হাসির ঢেউ খেলে গেল। নির্মলাও দেখাদেখি হাসলে বটে কিন্তু মনটা তার খচখচ করতে লাগল। জ্যোৎস্নার উপরে মেজাজ উঠল খিঁচড়ে। নিজে সুন্দর, বর সুন্দর বলে আর সবাইকেই সে বড় অবহেলা করে। কিন্তু অন্য মেয়েরাই বা কেমনতরো। বরের দাঁত না হয় একটু উঁচুই, তাই বলে বর তো আর তার কুচ্ছিৎ নয়। অত হাসির কোনো মানে নেই! একটু ক্ষুণ্ণ মনেই সন্ধ্যাবেলা নির্মলা বাড়ি ফিরছিল, শুনলে খিড়কির ঘাটে ও-বাড়ির জেঠাইমার সঙ্গে তার পিসিমা কথা বলছেন—বরের আর সবই তো ভালো ছিল বৌঠান, অবস্থা ভালো, বুদ্ধিও খুব, স্বভাব চরিত্রেও কোনো খুঁৎ নেই, শুধু চেহারাতেই সব মাটি করেছে। দেখতে যদি আরেকটু ভালো হতো, একেবারেই যে······।

নির্মলা থমকে দাঁড়াল। তার বরের চেহারা খারাপ, কোনোদিন তো একথা তার মনে হয়নি। জ্যোৎস্নার কথা, হাসি মনে পড়ল। অসহ্য একটা দুঃখাবেগ নিয়ে নির্মলা বাড়ির ভিতরে ঢুকলে। ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বালা হয়ে গেছে। নির্মলা এ-ঘর ও-ঘর উঁকি মেরে দেখলে—দক্ষিণ দিকের ঘরটাতে জানলার সামনে ইজিচেয়ার পেতে দুহাত মাথার নীচে রেখে রমাপতি চোখ বুজে শুয়ে আছে। নির্মলার আর সবুর সইল না। বারান্দার লণ্ঠনটাকে উস্কিয়ে নিয়ে একেবারে রমাপতির কাছে এসে দাঁড়াল। লণ্ঠনটা তুলে ধরলে মুখের একান্ত কাছে। অকস্মাৎ তীব্র আলোর তেজ, গরম তাপে রমাপতি ধড়মড় করে উঠে বসল। ঠক্ করে লণ্ঠনটার ঠোকা লেগে গেল কপালে। ছ্যাঁকা লাগল নাকে। রমাপতি বললে—কে?

নির্মলা ততক্ষণে লণ্ঠনটা ধুপ করে নাবিয়ে রেখেছে। ব্যস্ত শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—আমি গো আমি, নির্মলা। আহা, ব্যথা লাগল তোমার! কোথায় লাগল গো, দেখি, দেখি। খুব লেগেছে নাকি গো?

বিস্মিত রমাপতি নির্মলার সেই ত্রস্ত শঙ্কিত হত-বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথা অনুভব করলে। কেমন একটা মায়া লাগল। নিশ্বাস ফেলে বসে পড়ে বললে—মুখের এত সামনে লণ্ঠন আনে কেউ? কী দেখছিলে লণ্ঠন নিয়ে?

নির্মলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে তাকিয়ে একটা ঢোক্ গিলে চুপ করে রইল। রমাপতি তার দুহাত ধরে কৌতূহলের সুরে বললে—বল না গো, কী দেখছিলে?

নির্মলা আর থাকতে পারলে না। অভিমান-ক্ষুব্ধ নালিশের সুরে বললে—ওরা কেন বলে তুমি সুন্দর নও? তুমি তো ভালোই দেখতে।

অতি সহজ সরল অভিমান-ভরা নালিশের সুরটা রমাপতির প্রাণে গিয়ে বাজল।

মুখের বিষণ্ণতাও লক্ষ্য করলে সে। একটু থেমে সস্নেহে রমাপতি নির্মলাকে কাছে টেনে এনে বললে— ওরা কি আর তোমার মতো করে আমাকে দেখে নিমু, ওদের কথা ছেড়ে দাও। তোমার সম্বন্ধে আমাকেও ওরা অনেক কিছু বলেছে। বলুক গে, আমরা দুজনে যা আছি, বেশ আছি, কী বলো ?

বলতে বলতে অতি ধীরে রমাপতির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিয়ের পর থেকে তার মনে একটা ক্ষোভ জমে উঠেছিল, সেটা যেন হাল্কা হয়ে গেল। নিবিড় স্নেহে নির্মলাকে একান্ত কাছে টেনে নিলে সে। আনন্দের সীমা রইল না নির্মলার। এমন করে কেউ তো কোনোদিন তার কথার মর্যাদা দেয়নি। চিরদিন সে শুধু লোকের উপহাস পরিহাসই শুনে এসেছে। দেখুক এসে এখন ওরা নির্মলাকে! আর হাসতে হবে না। দীপ্ত আনন্দিত মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে সে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সুরে রমাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ওরা কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু বোঝে না গো, শুধু শুধুই কেবল হাসতে পারে। এমন রাগ ধরে আমার!

ব্যাপারটা নির্মলা অসীম আনন্দে গোপন রাখতে পারলে না। পরদিনই জ্যোৎস্নাদের কাছে গর্ব করে বলে ফেললে। অদম্য সশব্দ হাসির ধুম পড়ে গেল। মিত্তির ঠাকুরদার কানে যেতে রঙে রসে ব্যাপারটা হল চরম। নির্মলা অবশ্য দিন দুয়েক পরেই শ্বশুর ঘরে চলে গেল। কিন্তু নামটা তার চির-বিখ্যাত হয়ে রইল নল্‌তা গ্রামে। বুদ্ধিহীনতার উল্লেখ করতে হলেই লোকে ব'লে বসে—"একেবারেই নিম্মলা!"

দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ পরিকল্পনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

বাংলার কীটদষ্ট অর্থনীতি অতি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত নয় কিন্তু তার অসুস্থতা উপলব্ধি করবার প্রচুর অবকাশ আমাদের রয়ে গেছে। সেই নেপথ্যচারী নীতি আমাদের আর্থিক সমৃদ্ধি বিধান না করে দিনের পর দিন অসংখ্য মানুষকে সম্পদহীন, জীবিকাহীন নিঃস্বতার গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে কর্ম্মহীন এই দুরবস্থার যিনি বিধাতা—যাকে বাংলার অর্থনীতি ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না, তিনি আজ অকর্ম্মণ্য, রোগাক্রান্ত, মৃত্যুপথযাত্রী! অকর্ম্মণ্য অর্থনীতিকে বাতিল করাই উচিৎ, না কি তাকে সুস্থ করে তোলা দরকার, এ নিয়ে তর্ক করবার অবসর আর বাংলাদেশের নেই। কর্ম্মহীনতার সমস্যাটাকেই জরুরী মনে করে তার সমাধানের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—এবং একবার যাত্রা সুরু হলে আমরা দেখতে পাব ছোটখাট ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে বাংলার অর্থনীতি নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে। অর্থনীতির ভালত্ব আর মন্দত্ব যখন তার কর্ম্মসংস্থানের শক্তির উপরই নির্ভর করে তখন এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র যে কর্ম্মসংস্থানের পথেই তার রূপায়ন সম্ভব।

আজকের দিনে বাংলার সামাজিক অবস্থার দিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে তাকালে আমরা দেখতে পাব যুদ্ধোদ্যমের কৃপায় গত পাঁচবছর যারা কর্ম্মচ্ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছিল তারা আজ নিরেট বেকার। তার কারণ, শিল্পহীন বাংলাদেশ তার নিজস্ব শিল্পকে যুদ্ধ-শিল্পে পরিবর্ত্তিত করেনি অথবা কোনো যুদ্ধ-শিল্প অসামরিক শিল্প রূপের সম্ভাবনা নিয়ে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাময়িক শিল্প হিসেবেই এখানে যুদ্ধশিল্পের আমদানী করা হয়েছিল, কাজেই গত পাঁচবছরব্যাপী বাঙালীর যে কর্ম্মব্যস্ততা তা তাদের সামাজিক শরীরের কোনো অংশেরই স্থায়ী সুস্থতার লক্ষণ নয়। এই চোরাস্বাস্থ্য আজ মুখোস খুলে তার বাস্তব অবস্থাকে উদ্ঘাটিত করছে। তাছাড়া বাংলার যা নিজস্ব অর্থনীতি—যা তার সম্পদ উৎপাদনের একমাত্র যন্ত্র সেই কৃষি আজ বেকার তৈরীর একটি বিরাট কারখানা। আমাদের সম্পদের উৎস কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে এই অতি প্রয়োজনীয় ঔৎসুক্য ছিল না বলেই আজ বেকারের শোভাযাত্রায় আর দুর্ভিক্ষে আমাদের বিস্ময় লাগে।

বাংলার দুর্ভিক্ষ মানে কর্ম্মহীনের অনাহারে মৃত্যু। এই দুর্ভিক্ষ রোধ করবার জন্যে আমরা চাঁদা তুলে, ক্যান্টিন খুলে আহারের ব্যবস্থা করতে চাই, আমাদের হৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্যের

উৎসমুখ খুলে দিই। এ-ব্যবস্থায় একটা সাময়িক অন্নকষ্ট হয়ত দূর করা যায় কিন্তু সামাজিক অর্থনীতি যখন অবিরত এমন পরিবার তৈরী করে চলে যারা অন্নসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তখন দয়াদাক্ষিণ্যের দাওয়াই-এ সমাজের এই কঠিন রোগ সারাবার সঙ্কল্প ছেলে-মানুষিরই নামান্তর। অনাহারে মৃত্যু বা দুর্ভিক্ষ রোধ করার একমাত্র উপায় কর্ম্মহীনের কর্ম্মসংস্থান করা। অন্নসংস্থান করতে না পেরে যারা মরে যায় তাদের অন্নদান করে নয়, কর্ম্মদান করে অন্নসংস্থানের পথ করে দেওয়াই দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধক। কোন্ পথে, কি উপায়ে এই কর্ম্মদান সম্ভব তা-ই আমাদের আজকের দিনে সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয়।

এই যুদ্ধোত্তর অবস্থায় সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীই যে আর্থিক অবনতির পথে নেমে গেছে তা নয়। অনুসন্ধান করলে এমন একটি শ্রেণী আবিষ্কার করা যায় যারা স্ফীতমুদ্রার ধারক ও বাহক। এ শ্রেণীর অন্ধকার তহবিলে যে-পরিমাণ মুদ্রা সঞ্চিত আছে—তা যদি সূর্য্যের আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে পায়, বলাবাহুল্য, সে-প্রক্রিয়া থেকে অজস্র মানুষের কর্ম্মসংস্থান হয়। এদের সঞ্চিত অর্থ মানে কর্ম্মদানের সব চেয়ে বেশি সুযোগ এদের হাতেই সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থের বাইরে আত্মপ্রকাশ নিয়েই আসল সমস্যা। আয়কর তার নাগাল পায়নি, নাগাল পেতে পারে না। শিল্পোন্নতির বন্ধুর পথও এই সঞ্চিত অর্থ সযত্নে পরিহার করেছে। হাতের একটি পাখী যে বনের দুটো পাখীর চেয়ে ভালো এই মহাবাক্যের অনুশাসনেই বাঙালী মন শম্বুকবৃত্তিতে অভ্যস্ত কাজেই শিল্পোদ্যমে হাতের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে অনিশ্চিত অর্থ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠেনা। যা হয়নি তা কেন হয়নি, এ-নিয়ে তর্ক করবার চেয়ে আপাতত এমন একটি পথের সন্ধান করতে হবে যে পথে সহজভাবে সঞ্চয়ী শ্রেণীর সঞ্চিত অর্থ বাইরে চলাফেরা করবার ভরসা পায়। সহরে-নগরে গৃহনির্ম্মাণই একমাত্র পথ যাতে সঞ্চয়ীর অর্থনাশের মহদ্ভয় প্রশমিত হয় এবং সেই সঙ্গে অজস্র কর্ম্মহীনের কর্ম্মসংস্থানও হয়ে যায়। কৃষি বা শিল্পের প্রতি সন্দেহাত্মক দৃষ্টি নিয়ে তাকাবার অভ্যাস যখন সঞ্চয়ীদের মনে দৃঢ়মূল, তখন সাদাসিধে হিসেবের মুনফাই একমাত্র তাদের অসূর্য্যম্পশ্য অর্থকে বাইরের আলোতে টেনে আনতে পারে। ব্যাঙ্কের খাতায় একটা সংখ্যা হয়ে বা সিন্দুকের গহ্বরে অচলা লক্ষ্মী হয়ে না থেকে যদি রাশি-রাশি টাকা শতশত সুদৃশ্য-গৃহের রূপ নিতে থাকে, যদি তাতে সহর-সজ্জা শোভন ও সুপরিসর হয়ে ওঠে এবং নাগরিক বাসস্থানের কদর্য্যতা ঘুচে যায়—যদি নির্ম্মাণের কাজে সহস্র সহস্র লোকের অন্নসংস্থান হয় এবং যদি গৃহের আয় ব্যাঙ্ক-আমানতের সুদের চেয়ে কম না হয়, তাহলে সঞ্চয়ীদের এ-কাজে অগ্রসর হতে কি ক্ষতি ? এক-আনা স্বার্থও ক্ষুণ্ণ না করে তারা যদি সামাজিক কল্যাণের একটি পথ খুলে দিতে পারে, তাতে ত তাদের আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু মুস্কিল বোধহয় এই যে সঞ্চয়ীর মন মুনফার সাদাসিধে হিসেবে আগ্রহ

দেখালেও যুক্তির সাদাসিধে হিসেব গ্রহণ করতে পারে না। সে-ক্ষেত্রে এধরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সঞ্চয়ীর তালিকা সংগ্রহ করে তাদের উপর গৃহনির্ম্মাণের নির্দ্দেশ জারি করা রাষ্ট্রের পক্ষে তখন বিন্দুমাত্র অসঙ্গত নয়। রাষ্ট্রের আদেশ-নির্দ্দেশের কঠোরতা কখনো অসহ্য মনে হয় না, যদি তাতে সামাজিক কল্যাণ নিহিত থাকে।

কর্ম্মদান-প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের এই পরোক্ষ কর্ত্তব্য ছাড়াও নিজের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে—যা ব্যাক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের মাধ্যমে ফলপ্রসূ করা একরকম অসম্ভব। কর্ম্মদানের জন্যে রাষ্ট্র যে পদ্ধতি অবলম্বন করবে বলাবাহুল্য যে তার ভিত্তি থাকবে দেশের মৌলিক অর্থনীতির উপর এবং তার ফল হবে অধিকতর সুদূর-প্রসারী। তার মানে কৃষির উন্নয়নকে লক্ষ্য করেই রাষ্ট্রের কর্ম্মদান-পরিকল্পনা অগ্রসর হবে। শ্রমের অর্থমূল্য যেন অফলপ্রসূ কাজে ব্যয়িত না হয়—যাতে সামাজিক শ্রম-নিয়োগ ভবিষ্যৎ ধনোৎপাদনের সহায়ক হতে পারে—রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মূলনীতিই হবে তা-ই।

এই মূলনীতি গ্রহণ করে আসন্ন কর্ম্মহীনতা বা দুর্ভিক্ষের সঙ্কটকে প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমত পল্লীঅঞ্চল রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। কৃষিজাত দ্রব্যের সুচারু চলাচলের জন্যই যে সুগম রাস্তাঘাটের দরকার তা নয়, কৃষিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় দানগুলোকে কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যেও সুব্যবস্থিত রাস্তাঘাট থাকা চাই। শস্য-চলাচলের অসুবিধা ও অব্যবস্থা যে গত মন্বন্তরের জন্যে কতকাংশে দায়ী—একথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থান এবং বারিপাতের পরিমাণ এমন কিছু আশঙ্কাজনক নয় যাতে কোনো বছর তার সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শস্যাভাব ঘটতে পারে। এক অঞ্চলে শস্যের ঘাটতি পড়লেও অন্য অঞ্চলের বাড়তি দিয়ে অনেক সময়ই ঘাটতি পূরণ সম্ভব, কিন্তু রাস্তাঘাটের অভাবে এই সম্ভাব্যতার পরীক্ষা কোনো সময়ই সম্ভব হয়ে উঠছেনা। কেবল এটুকুই রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের বৃহৎ সার্থকতা নয়—আবাদী ক্ষেতের আয়তন-বৃদ্ধিও সুব্যবস্থিত রাস্তাঘাটের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের আবাদী ক্ষেতের প্রায় একষষ্ঠমাংশ আবাদযোগ্য অনাবাদী এবং একষষ্ঠমাংশ পতিত হয়ে আছে।* মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলে আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ আবাদী জমির একতৃতীয়াংশ, ঢাকা ও ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলে ও নদীয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের মধ্যাঞ্চলে একনবমাংশ—রাজসাহী, পাবনা, বগুড়ায় একদশমাংশ এবং ত্রিপুরা, নোয়াখালিতে একষষ্ঠমাংশ।† পতিত ও অনাবাদী জমিকে দ্রুত আবাদী জমিতে পরিণত করার কোনো-রকম ব্যবস্থা অবলম্বনই পল্লীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। যে-কাজ প্রচুর শ্রমসাধ্য ও ব্যাপক

* Agriculture Department's Statistics of 1937-38.

† Land System of Bengal—By M. N. Gupta

এবং অণতিবিলম্বে যা সম্পন্ন করা দরকার তার দায়িত্ব সম্পদহীন, উপায়-উপকরণহীন, নিরুৎসাহ, মন্থর পল্লী-জীবনের উপর ফেলে রাখা যায়না। বিজ্ঞানের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে যে-স্বাবলম্বী পল্লীর চিত্র আমরা কল্পনায় এঁকে চলেছি তার পক্ষেও এ-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপক কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে হলে যন্ত্রবিজ্ঞানের শরণ নেওয়াই উচিত। যন্ত্রবিমুখদের একটি প্রিয় প্রশ্ন এখানে উঁকি দিতে পারে: তাঁরা বলতে পারেন, 'যন্ত্র ত বেকারসমস্যাই তৈরী করে, সে সমস্যার সমাধান কি তার দ্বারা সম্ভব?' তার উত্তরে বলা যায়, যে-উৎপাদন-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত নয়, অনিয়মই যার পরিচালক সেখানে যন্ত্র সত্যি সত্যি বেকার তৈরী করে চলে—কিন্তু সুপরিকল্পিত অর্থনীতিতে যন্ত্রব্যবহার কোনো সময়ই বেকার তৈরী করে না। উদাহরণত যুদ্ধ-পূর্ব্ব ইংলণ্ড ও যুদ্ধকালীন ইংলণ্ড এবং বিপ্লবপূর্ব্ব রাশিয়া ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কথা উপস্থিত করা যায়।

বাংলাদেশের আর্থিক ও বেকার সমস্যা হাতে নিয়ে সরকারী ব্যয়নীতি রাস্তাঘাট নির্ম্মাণান্তে আরেকটি প্রশস্ত পথ ধরে চলতে সুরু করতে পারে। তাতে যে কেবল প্রচুর কর্ম্মসংস্থানেরই অবকাশ আছে তা নয়, পথচলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে পল্লীঅঞ্চলে স্থায়ী অর্থসমৃদ্ধির চিত্র ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। এ-পথ খননের পথ, পূর্ত্তবিভাগের অনলস উদ্যমে তৈরী হ'তে পারে যে-পথ। সরকারী পূর্ত্তবিভাগ শ্রম এবং অর্থব্যয় করেছেন, ১৯৩৮-৩৯-এ ১৫২৮০ লক্ষ টাকা পূর্ত্তকর্ম্মে ব্যয়িত হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের বরাদ্দ ছিল প্রায় ১১৪½ লক্ষ টাকা কিন্তু তা থেকে আয় হয়েছে ৫·৮৯%, তাছাড়া মোট ৬২৭০ লক্ষ বিঘে চষা জমির মধ্যে মাত্র ৯৬০ লক্ষ বিঘে সরকারী পূর্ত্তকর্ম্মের জল-ব্যবস্থার সুযোগ পেয়েছে। ভারতীয় নদী-নালাগুলো ৫১ বিলিয়ন কিউবিক ফিট জল বহন করে থাকে, সে জলের ১৩% মাত্র চাষের কাজে নিযুক্ত হয় বাকি ৮৭% অযথা সমুদ্রে বয়ে যায়।* কাজেই পূর্ত্তবিভাগ আজ পর্য্যন্ত যা করেছেন বা যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেছেন অথবা যে-নীতি অনুসরণ করে আসছেন তা যে খুব ফলপ্রসূ হয়েছে একথা বলা যায় না। জাতীয় সরকারের অধীনে ভবিষ্যৎ পূর্ত্তকর্ম্মের কর্ম্মসূচি তাই একটি নূতন ভিত্তিতে তৈরী হওয়া দরকার। একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধনের মতোই পূর্ত্তকর্ম্মের ব্যয় অবারিত, অজস্র ও অবিচ্ছিন্ন হওয়া চাই, সাময়িক প্রয়োজনে সাময়িকভাবে ব্যয় ভস্মে ঘি ঢালার সামিলই হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, জলপথকে একটি কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা না করে তিনটি কাজের উপযোগী করে তোলা উচিত—জলপথ, জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, চাষের কাজের সহায়ক হবে, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করবে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক অনুশাসনে পূর্ত্তনীতি পরিচালনার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নদী দ্বারা বিধৌত।

* The Eastern Economist—Jan. 1946.

কোনো একটি বিশেষ নদীর দ্বারা সর্ব্বভারতীয় ভূখণ্ড জলসিক্ত হতে পারেনা আবার ঠিক তেম্নি ভারতবর্ষের বড় বড় নদীগুলোর একটিও কোনো বিশেষ প্রদেশের সীমায় আবদ্ধ নয়। যুক্তপ্রদেশ, বিহার আর বাংলা এই তিনটি প্রদেশই গঙ্গামাতৃক—বাংলা আর আসাম এদু'টি প্রদেশকেই ব্রহ্মপুত্র পুত্রবৎ দেখে আসছে। পূর্ত্তকর্ম্মের উপাদান যখন নদী—তখন নদীকে অনুসরণ না করে পূর্ত্তকর্ম্মসূচী তৈরী করা দুঃসাধ্য। যে অঞ্চল একটি বিশেষ নদীদ্বারা বিধৌত সে-অঞ্চলের পূর্ত্তকর্ম্মের সহায়ক হবে সে নদী এবং পরিচালক হবে সে নদীতীরের অধিবাসী। গঙ্গাকে পূর্ত্তকর্ম্মে নিয়োগ করতে হলে যুক্তপ্রদেশ, বিহার আর বাংলার একযোগে কাজ করা চাই; ব্রহ্মপুত্রকে জলের উৎস মনে করলে উত্তর আসামের সঙ্গে উত্তর ও পূর্ব্ব বাংলার হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এই নূতন নীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণের চেষ্টা দেখা না গেলেও তার খানিকটা ইঙ্গিত যে পূর্ত্তবিভাগের সাম্প্রতিক কর্ম্মসূচিতে পাওয়া যাবেনা এমন নয়। দুর্ভিক্ষ-কমিশন সরকারী ব্যয়-বিভাগের কাছে পূর্ত্তকর্ম্মকেই দুর্ভিক্ষের বীমা হিসেবে গ্রহণ করবার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। কেন না যে-টাকা পল্লী-অঞ্চলে ব্যয় হবে ঠিক সেই পরিমাণ ক্রয়-ক্ষমতা বা অর্থসমৃদ্ধিই পল্লীসমাজ অর্জ্জন করতে পাবে। সরকারী-ব্যয়-বিভাগ দুর্ভিক্ষকমিশনের আবেদন গ্রাহ্য করেছেন এবং সে-ইঙ্গিত থেকেই দামোদর উপত্যকা নিয়ে একটি পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। আমেরিকার টেনেসী উপত্যকার লোকদেরও একসময় মেদিনীপুরের অধিবাসীদের মতো বন্যা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, আজ সেখানে শস্যক্ষেতের জলব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত, বন্যা প্রতিরুদ্ধ; তাছাড়া ব্যবহারিক বিদ্যুৎ-শক্তির প্রাচুর্য্যে এবং সুগম জলপথের সুবন্দোবস্তে টেনেসী উপত্যকা আজ একটি শিল্পোন্নত ভূখণ্ড। এ-পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে টেনেসী উপত্যকা তার উদ্বৃত্ত আয় থেকে সে-টাকা সুদসহ ষাট বৎসরে শোধ করে দিতে পারবে। টেনেসী পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত থেকেই দামোদর-পরিকল্পনার উৎসাহ এসেছে—এ-পরিকল্পনায় ২২½ লক্ষ বিঘে জমিতে নিয়ন্ত্রিত জলব্যবস্থা হবে, বন্যার সম্ভাবনা থাকবেনা, এবং তিন লক্ষ কিলো-ওআট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যাবে।* বাংলার পক্ষে পরিকল্পনাটি বৃহৎ সন্দেহ নেই। অন্তত এই হিসেবে বৃহৎ যে পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হলে এবং দ্রুতগতিতে কাজটি সম্পন্ন করবার ইচ্ছা থাকলে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে আজ পর্য্যন্ত সে-কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি। গত বছর থেকেই সরকারী, বে-সরকারী মহল জেনে আসছেন যে মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি হতে পারে—বাংলার মন্বন্তরকে কি উপায়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা যায় তা-ও তাদের অবিদিত নেই অথচ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি এসেও

* The Eastern Economist—June 1946.

আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই কার্য্যে রূপলাভ করছে না। খাতাপত্তরে প্রতিরোধের হাজার দফা তৈরী করে বাক্সবন্দী করে রাখা এ হতভাগা দেশের চিরাচরিত রীতি, পরিকল্পনার কাল্পনিক আবাসে বিচরণ করতেই আমাদের যতো আনন্দ—বছরের পর বছর আমরা নিরলস উদ্যমে পরিকল্পনা করে যেতে পারি, পারিনে কেবল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্যে একটি সপ্তাহেরও শ্রম স্বীকার করতে !

যে-দেশে ষাট দিনে ধান হয়, নদী-নালার সামান্য সংস্কারে যেখানে প্রচুর ফসল হবার সম্ভাবনা—যেখানকার দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ মানে কয়েক মাসের জন্যে কয়েক লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান—সেদেশের লোক আমরা দুর্ভিক্ষ আস্‌বে বলে মাসের পর মাস পায়তারাই কষে চলেছি, কার্য্যকরী কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করছিনে। দামোদরের কর্ম্মসূচী কেন অবিলম্বে গ্রহণ করা হচ্ছেনা বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতারা কি কোনোসময় এ-প্রশ্ন করেছেন ? বাংলার আউসধান রক্ষার বা বৃদ্ধির চেষ্টা কি তাঁদের কর্ম্মতালিকায় কোনদিন স্থান পেয়েছে ? যুদ্ধবিরতিতে যে কর্ম্মহীন নিঃস্ব চাষী ছাড়াও আরেকটি বেকারশ্রেণী তৈরী হবার সম্ভাবনা আছে এবং তাতে যে দেশের দুস্থ অর্থনীতিকে দুঃস্থতর করে তুলবে এ ভাবনাও জননেতাদের একটি দিনের ঘুমের ব্যাঘাত করে নি ! তাছাড়া ব্যক্তিবিশেষের তহবিলে জমা স্ফীতমুদ্রার মোটা মোটা অঙ্কগুলো যে প্রয়োজনীয় বস্তুর অনটনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ঘোরতর কালোবাজার তৈরী করতে পারে সে-চিন্তাও আমাদের চিন্তানায়কদের মুহূর্ত্তের জন্যে বিচলিত করেনি ! আমরা শুধু সঙ্কল্প করেছি দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করব—বাহবা কুড়োনোর প্রদর্শনীবৃত্তি ছাড়া এ-সঙ্কল্পে সারবস্তু বলে কিছুই নেই। কথার এবং শপথের মিথ্যাব্যবহারে আমাদের চরিত্র এতো নীচে নেমে গেছে যে মানুষের বিরাট দুঃখও আমাদের কাছে আন্তরিক আবেদন পৌছিয়ে দিতে পারে না, লক্ষ লক্ষ লোকের অনশন-মৃত্যুও জীবনকে জীবনের সত্যিকারের মূল্য দিতে শেখায় না ! বস্তুবাদকে ঘৃণা করে ভাবাশ্রয়ী ভারতবর্ষ আজ এখানেই নেমে এসেছে !

হত। অথচ যৌন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা হল বয়সের ধর্ম। অকারণ শালীনতার দোহাই দিয়ে প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির অবদমনের প্রয়াস অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। যৌন বিষয়ে অজ্ঞতার ফলে অনেকে রতিজ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জীবন্মৃত জীবন যাপন করে—অনেকের পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়—জন্মান্ধ, শিশু-মৃত্যু ও অকাল-মৃত্যুর হার ক্রমেই বর্দ্ধিত হতে থাকে। এই অজ্ঞতার পরিণাম বিষময় হওয়ার ফলেই হোক্ অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আজকের দিনে যৌন-বিষয়ে টাবু বা বিধি-নিষেধের প্রাচীর বহুলাংশে অন্তর্হিত হয়েছে। এই ব্যাপারকে আমরা সুখের বিষয় বলে অভিনন্দিত করছি। সংস্কারমুক্ত উত্তেজনাহীন সংযত মন নিয়ে যৌন-বিষয়ে আলোচনা করতে হবে, কারণ সমাজ-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনেকখানি নির্ভর করে জীব-বিজ্ঞান ও যৌন-বিজ্ঞানের উপরে। বিজ্ঞাপনের যুগে সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে দুষ্ট কুৎসিৎ ব্যাধির মহৌষধির ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়, অথচ প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর ভূমিকা সম্বলিত আবুল হাসানাৎ প্রণীত বইখানি তথ্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক। মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, নৃ-তত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের অনেক মনোজ্ঞ এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই বইটিতে পাওয়া যায়। আবুল হাসানাতের বহু শ্রম-স্বীকার এবং একাগ্র অধ্যয়নের ফলে এই সুখ-পাঠ্য ও সমাজসমস্যা সমাধানমূলক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। এই অতি প্রয়োজনীয় পুস্তকটি প্রণয়ন করে লেখক বাঙালীসমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করেছেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১৪৮ পৃষ্ঠায় তিনটে প্রবন্ধ।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা লেখক মার্ক্স-লেনিনীয় মতবাদের আলোকপাতে আলোচনা করেছেন। দল-নিরপেক্ষ মার্ক্স-লেনিনীয় আলোচনা ও সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার প্রয়োগ দুর্লভ। বিমলবাবুর বইটি সেই দুর্লভদের একটি।

বিগত যুদ্ধকে ভারতবর্ষে যারা জনযুদ্ধ বলে চালাতে চেয়েছিলেন এবং মুসলিম লীগে প্রবেশাধিকার ব্যতিরেকেও যাঁরা পাকিস্থান ব্যবস্থাকে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমস্যা-সমাধানের যুক্তিযুক্ত উপায় বলে মনে করেন—শ্রীযুত সিংহের প্রবন্ধ কয়টি তাঁদেরি কিছু কিছু যুক্তি খণ্ডনের দিকে নির্দিষ্ট।

শ্রীযুত সিংহ তাঁর বইয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী দিয়েছেন,—তা'তে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের জন্য জাতীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু, জতীয় বিপ্লব যে বর্তমান পরিবেশে কোন বৈপ্লবিক শ্রমিকদলের এবং বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া সার্থক হতে পারে না—তার উল্লেখ নেই। আশা করি, তাঁর কর্ম্মসূচীর এ বিরাট ফাঁকটা তিনি ভরে তুলবেন।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রবন্ধে শ্রীযুত সিংহ আয়ার্ল্যাণ্ড ও চীনে সাম্রাজ্যবাদের আত্মসম্প্রসারণ ও প্রভুত্ব কায়েমী রাখবার কৌশলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভারতের অনুরূপ ইতিহাসের সঙ্গে তা'র মিল খুঁজে বার ক'রেছেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কৌশলটি খুব উল্লেখযোগ্য। সে হচ্ছে

অধীন দেশে বিপ্লব সম্ভাবনাসম্পন্ন শক্তিগুলির মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে দে'য়া এবং সে' ভেদকে সুকৌশলে জিইয়ে রেখে বাড়তে দে'য়া। আয়ার্ল্যাণ্ডে ফ্রিস্টেট থেকে বিচ্ছিন্ন আলষ্টার ও ভারতবর্ষে পাকিস্থানী উস্কানী এ' ভেদনীতির চরম প্রয়োগ। রাখাল ঘোষ

কবিতা

আগামী কালের কাব্য : রমাপতি বসু। (শ্রীহর্ষ : দাম দেড় টাকা।)

কয়েকটি কবিতা : সম্পাদক, শামসুল হুদা। (তাজ লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম ; দাম দুই টাকা।)

মুষ্টিমেয় কয়েকজন নামজাদা কবিকে বাদ দিলে আধুনিক কবি-গোষ্ঠির পর যাঁরা বাকি থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে নিদেনপক্ষে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, স্বতঃস্ফূর্ত ও কবিজনোচিত আবেগ এঁরা প্রায়শ যেন আস্বাদ করেন না ; অন্তত এঁদের কবিতায় তার পরিষ্কার প্রতিফলন নেই। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এই কবির দল গুচ্ছ বেঁধে বেরোচ্ছেন সেই শ্রেণীব্যাপী কোন আন্তরিক ও সুস্থ জীবনবেদের অভাব এর কারণ কিনা, সমাজবিজ্ঞানীরা তার পাতি দিতে পারেন। তবে একটা জিনিস বেশ বোঝা যায় যে, কোন দৃঢ় বিশ্বাস এবং তদনুসারী কাব্যমুখীন অনুভূতির বালাই যেন এঁদের নেই। তা নাহলে এঁদের কবিতায় এতো নিষ্ফল ধ্বনি-নিনাদ কেন, কেন এতো অনুভূতিহীন ভাষার পরাকাষ্ঠা? আধুনিক মনের হতাশা এই কাব্যিক নির্বীর্যতার কারণ, এই কৈফিয়তে কেউ কেউ হয়তো বর্তমান অবস্থাকে গৌরবভূষিত করতে চাইবেন। যে কোন অনুভূতির মতো হতাশাবোধ তীব্র হলে তার থেকে এলিয়টের মতো শক্তিশালী কবিরও সৃষ্টি হতে পারে সেকথা ভুললে চলবে কেন? হতাশা-বোধের পেছনে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া থাকে মধ্যাহ্ন-সুলভ নিস্পৃহ মনে বুঝি তাও নাকচ হয়ে গিয়েছে।

আধুনিক তরুণ কবিদের এই রকম শিথিল মনোরাজ্যে জার্ণালীষ্টিক মনোবৃত্তির অসুস্থ সংক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রচুর পরিশ্রম করে আভিধানিক কৌশল ও কর্মের অনুকৃত কসরৎ দেখিয়ে রচিত এঁদের কবিতায় সাময়িকী রচনাশৈলীর ঘ্রাণ আবিষ্কার করা যায়। কবিতাগুলো হয়তো আধুনিক হয়, পুরাতন একঘেঁয়ে কবিতার (সব পুরাতন কবিতাই তাই বলে একঘেঁয়ে নয়!) পাশে এঁদের স্বাতন্ত্র্য হয়তো বজায় থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা, আমরা সেই সময় বিচার করে দেখতে ভুলে যাই আধুনিক কবিতা আধুনিক হবার আগে কবিতা হলো কিনা। আধুনিক কবিতার প্রতি এই অন্ধ ভক্তি সমাপ্ত করবার সময় এসেছে। সময় এসেছে আত্মবিচার করে নিজেদের আন্তরিক দুর্বলতা অনুভব করার এবং সেই সংগে অযৌক্তিক ঔদ্ধত্যসংযমের।

আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সবটুকু হয়তো রমাপতি বাবুর প্রাপ্য নয়। তবু অস্বীকার করে লাভ নেই যে 'ইতর' আধুনিক কবিগোষ্ঠির কয়েকটি দোষ রমাপতিবাবু বোধ হয় নিজের অজান্তেই আয়ত্ত করে ফেলেছেন। স্বাস্থ্যকর ও পরিমিত আবেগের গাঢ় স্পর্শ তাঁর কোন কবিতার কোনো কোন্ থেকেই হাত বাড়ায় না। এমন কি প্রখর অনুভূতির অভাবকে হয়তো

অনেক সময় কষ্টকৃত ভাববিলাস বলেও মনে হতে পারে। যুবক-কবির কাছ থেকে নারীর মতো লিখিতব্য বিষয়ও কেবল অসংলগ্ন বাক্য-বিন্যাসই তৈরী করলো, কোন হৃদয়স্পর্শী কবিতা রচনা করতে পারলো না।

রামাপতিবাবুর সম্বন্ধে কেবল একটা আশার কথা এই যে, ভাষার খেয়ালীচয়নে ভাবের দৈন্যকে ঢাকবার সৌখীন আর্ট তাঁর এখনো মজ্জাগত হয়নি। ভাবের স্পষ্টভাষিতার জন্যে তাই যেমন একদিকে 'কবি, বর্ষা ও বিধাতা' ও 'কোন রাত্রির মুহূর্তে' ভাল কবিতা হয়েছে, অন্যদিকে 'যক্ষে'র মত এমন সুন্দর আইডিয়া অত্যন্ত সাধারণ বাক্যভংগিমার জন্যে প্রশংসনীয় কাব্যে রূপ পেতে পারলো না।

ঢাকার আধুনালুপ্ত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের উদ্যোক্তা ও অনুরাগীরা মিলে 'কয়েকটি কবিতা' এই কবিতা-চয়নটি বের করেছেন। এই গ্রন্থের কবিরা সকলেই মুসলমান। গ্রন্থটি আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত 'কাব্য-মালঞ্চের' মত প্রামাণিক সংকলন গ্রন্থ না হলেও সংকলয়িতার উৎসাহের প্রশংসা করা যায়। সাম্প্রদায়িক কলুষের দিনে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যে পরিশীলিত মুসলমান-হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া গেল তার সংগে একাত্মতা অনুভব করতে কোন বাধা নেই। সেই হিসেবে সংকলনটির "মূল্য আছে—কাব্যকলার দিক থেকে নিখুঁৎ কবিতার সন্ধান এতে যাঁরা করবেন" (কাজী আবদুল ওদুদের ভূমিকা) তাঁদের হতাশা সত্ত্বেও।

একটা জিনিষ বড় ভালো লাগলো, কবিরা কবিতা লিখতে বসে সাম্প্রদায়িক হননি; কয়েকটি মুসলমান পত্রিকার কবিতায় চেষ্টাকৃত সাম্প্রদায়িক ছাপ দেখা যায়, বিশেষ করে ভাষার দিক থেকে। 'কয়েকটি কবিতা'র কবিরা সত্যি "অকৃত্রিমতা, ঋজুতা আর অর্থপূর্ণতার" জন্যে সমাদরের পাত্র।

রবি চক্রবর্তী



পূর্ব্বাশা | বাংলার মা | শিল্পী :
ভাদ্র, ১৩৫৩ | | উমারঞ্জন দত্তগুপ্ত

পূর্ব্বাশা

নবম বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা
ভাদ্র • ১৩৫৩

সমন্বয়

হুমায়ুন কবির

সমন্বয় ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। সমন্বয়ের এ প্রবৃত্তি কেবলমাত্র দর্শনে নয়, ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি সমাজসংস্থানেও আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের পরিব্যাপ্তি তুলনাহীন, এবং মানুষের চিন্তায় যা কিছু অধিগম্য, তার প্রত্যেকটি নিদর্শনই দর্শনের সে সমুদ্রের মধ্যে মেলে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের চেষ্টা তো ভারতবর্ষে আবহমান কাল হতে চলে এসেছে, তাই এক হিন্দু ধর্ম্ম-দৃষ্টির মধ্যেই চরম জড়পূজা ও আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠার পরিচয় মেলে। হিন্দুসমাজে জাতিভেদেরও ভিত্তি এইখানে। সূচনায় বৃত্তিমূলক হলেও জাতিভেদের মুখ্য কারণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার চেষ্টা। মুষ্টিমেয় আর্য্য যখন এ দেশে আসে, তখন স্ববর্ণ সম্বন্ধে তাদের যে অহঙ্কার, তাই ভারতের আদিবাসীদের থেকে তাদের স্বতন্ত্র রেখেছে। ঔপনিবেশিক অভিযাত্রীর সামনে দুটি পন্থা দেখা দেয়। তারা আদিবাসীদের সবংশে নিধন করে উপনিবেশকে স্বদেশ করে তুলতে পারে। ইয়োরোপিয় অভিযাত্রী উত্তর আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় এই পথই অবলম্বন করেছে। অন্যথায় আদি-বাসীদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করেও অভিযাত্রীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ তারই নিদর্শন—বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায়ও সেই পদ্ধতিরই পরিচয় মেলে।

সমন্বয়ের স্বপক্ষে যুক্তির অন্ত নেই, কিন্তু সমন্বয়ের বিপক্ষেও যে যুক্তি আছে, সে কথা সহজে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সমন্বয়ের চেষ্টা উদার মনোবৃত্তির পরিচায়ক, মতের বিভিন্ন প্রকাশ ও লক্ষণের স্বীকৃতি। কাজেই সমন্বয়ের আদর্শ সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে। সমন্বয়ের বিরুদ্ধবাদী তাই প্রথমে আমল পায় না, কিন্তু একটু বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেও বলবার কথা অনেক। সমন্বয় বিভিন্ন ও বিচিত্র তথ্য ও সত্যকে সমানভাবে গ্রহণ করে বলে তথ্য বা সত্যের বিশেষ প্রকাশের প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই।

অপক্ষপাত কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সত্যের সহায়ক নয়। সত্যের মধ্যেও ভেদ আছে। এক স্তরে যা সত্য, অন্য স্তরে তা হয়তো সত্য নয়। শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূর্য্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতায় কিন্তু পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। শিশুকে বিজ্ঞানের তথ্য বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। তার কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অথবা রূপকথার বর্ণনাই বাস্তব। সমন্বয়ের দোহাই দিয়ে যদি আমরা শিশুর ও বৈজ্ঞানিকের দুজনের অভিজ্ঞতাকেই সমান মূল্য দিতে চাই, তবে তাতে কিন্তু বিপর্য্যয়েরই সম্ভাবনা।

কেবল সত্যের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের নামে এ রকম বিড়ম্বনা ঘটতে পারে। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরকে একত্র বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় বিলোপের উপযোগী বহু ব্যবস্থা বা সংগঠন টিকে থাকে। যে সময়ের যা উপযোগী, সময়ান্তরে তাই ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। অথচ সমন্বয়ের নামে তাকে জিইয়ে রাখা চলে, এবং ভারতবর্ষে যে তা বারবার ঘটেছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সমন্বয়ের মনোবৃত্তির মধ্যে খানিকটা আলস্য ও জড়তার আভাস মেলে। নিষ্ঠুর কঠিন সত্যকে স্বীকার করে বাকী সমস্ত কিছুকে বর্জ্জন করবার জন্য যে উদ্যোগ, একাগ্রতা ও উদ্যমের প্রয়োজন, সকলের মধ্যে তার পরিচয় মেলে না। এটাও ভাল ওটাও ভাল, বলা যত সহজ, এটাই ভাল ওটা ভাল নয়, বলা তত সহজ নয়। আমরা যা বর্জ্জন করতে চাই, তাকে বর্জ্জন করবার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে হয়। অথচ সমস্ত কিছুকে স্বীকার করে নিলে কোন যুক্তিরই প্রয়োজন নেই।

সমন্বয় মনোবৃত্তির ফলে কেবল যে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা নয়, এ রকম সমন্বয়ের ফলে বিচারশক্তিও অনেক সময় ক্ষীণ হয়ে আসে। যদি সব কিছুই গ্রহণ করি,

তবে স্বভাবতঃই বিচারের কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে কোনোটা গ্রহণ, কোনোটি বর্জ্জন করতে হলেই বিচারের প্রয়োজন। ভারতীয় চরিত্রে যে বিচারের খানিকটা অভাব মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়, অপ্রশস্ত সমন্বয়ের চেষ্টাই যে তার অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনে যে কোন প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করলেই এ কথার সত্যতা ধরা পড়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এদেশে প্রাচীনপন্থা ও বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গির যে অপরূপ সমাবেশ দেখা দেয়, ভারতবাসী না হলে তা হয়তো আমাদের হাসিরই উদ্রেক করত, কিন্তু তার ফল আমাদের নিজেদের ভোগ করতে হয় বলে হাসির বদলে তাতে কান্নাই পায়। তাকে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম্মনীতির জগাখিচুড়ী বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সমন্বয়ের নামে জড়তা বা আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যত সহজ, অন্য কোন ভাবে তা সম্ভব নয়। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও তাই। যে জিনিষ যত ভাল, তা পচনে তত খারাপ হয়। আদর্শের নামে যত অবিচার বা অত্যাচার সম্ভব, আদর্শের চুণকাম বাদ দিয়ে তার সিকিও মানুষ সহ্য করবে না। ধর্ম্মের নামেই তাই অধর্ম্ম বেশী। ভারতবর্ষে সভ্যতার সমন্বয়ের দোহাই দিয়ে আমরা সমস্ত রকমের আচার, কুসংস্কার ও বিড়ম্বনাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

মার্ক্সীয় দর্শন

মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ

(ডায়লেক্‌টিক্‌স)

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

হেগেলই প্রথম ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌কে একটী সর্ব্বব্যাপী বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সময় হইতে একটি জ্ঞানবিজ্ঞানে (এপিস্‌টেমলজি) পরিণত হইয়াছে। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণও ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌কে জ্ঞানবিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ ডায়লেক্‌টিক্‌স্ একটি বিশেষ দার্শনিক পদ্ধতি। এই চিন্তা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দার্শনিক মূলসত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে বৈজ্ঞানিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতেও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির (ডায়লেক্‌টিক্ মেথড) সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। এই দার্শনিকদের মতে বিজ্ঞানের ও দর্শনের চিন্তাপদ্ধতি একই। হেগেলের দর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি নৈয়ায়িক চিন্তার, প্রকৃতির, ইতিহাসের, রাষ্ট্রের, ধর্ম্মের এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে সর্ব্বত্রই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়াছেন। মার্ক্সীয় দার্শনিক-গণও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং হেগেলের সময় হইতে অনেক দার্শনিকদের নিকট ডায়লেক্‌টিক্‌স্ হইয়া উঠিয়াছে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আহরণের একটি অপরিহার্য্য চিন্তা-পদ্ধতি।

কিন্তু মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স্ হেগেলীয় ডায়লেক্‌টিক্‌সের বিপরীত। মার্ক্‌স্ বলেন যে, তাঁহার দ্বন্দ্ববাদ যে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ হইতে কেবলমাত্র বিভিন্ন তাহা নহে, তাঁহার দ্বন্দ্ববাদ হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের বিপরীত। হেগেল চিন্তাধারাকে মূলভাবে পরিণত করিয়া সেই ভাবকেই বিশ্বস্রষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মার্ক্‌স বলেন যে মানুষের মনের চিন্তাধারার অথবা ভাবধারার উদ্ভব হয় মনের বাহ্যজগৎ জানার প্রচেষ্টার ফলে। মানবমন পারি-পার্শ্বিক বাহ্যজগতের সম্মুখীন হইয়া মানসিক বৃত্তির সাহায্যে এই বাহ্যজগতের স্বরূপ জানিতে

চাহে এবং এই প্রচেষ্টার ফলেই নানারূপ ভাবের উদ্ভব হয় এবং এই ভাবধারাকে ধারণার ভিতরে সুবিন্যস্ত করার জন্য নৈয়ায়িক চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে ভাববাদী হেগেলের নিকট ভাবই মূলসত্য, বাহ্যজগৎ ভাবের ছায়ার স্বরূপ। হেগেল তাঁহার দর্শনে ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে নৈয়ায়িক চিন্তাধারার গতি অনুসরণ করিয়া কি প্রকারে প্রকৃতির ও ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারিত হয়। অন্যদিকে মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে কি প্রকারে বস্তুজগতের ক্রমবিকাশ হয় এবং এই ক্রমবিকাশের ফলে কি প্রকারে জীবনের ও মনের উদ্ভব হয়। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জীবনের ও মনের ক্রমবিকাশের ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে মনের ও বাহ্য জগতের সংঘাত হইতে কি প্রকারে প্রত্যক্ষের ও ভাবধারার উদ্ভব হয় এবং কি প্রকারে চিন্তাজগতকে সুবিন্যস্ত করিয়া ন্যায়শাস্ত্র গড়িয়া উঠে, এইজন্যই মার্ক্সবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে ভাববাদী হেগেলীয় দর্শন মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং মার্ক্সীয় দর্শন দর্শনকে পদের উপর স্থাপন করিয়াছে। তাই মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে তাঁহারা হেগেলীয় ডায়লেক্‌টিকের যুক্তিযুক্ত সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার খোলস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মার্ক্সের মতে দ্বন্দ্ববাদ প্রকৃতির, মানব চিন্তার ও ইতিহাসের গতির নিয়ম অনুধাবন করে। সুতরাং এই ডায়লেক্‌টিক্ শাস্ত্র প্রত্যেক বস্তুর উদ্ভবের ও ক্রমবিকাশের ধারার নিয়ম-সমূহ লিপিবদ্ধ করে। হেগেল ও মার্ক্স, এই উভয়ের মতেই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। কোন বস্তুই সম্পূর্ণ স্থিতিশীল নহে।

আধুনিক বিজ্ঞানও ডায়লেক্‌টিকের সমর্থক। পদার্থবিজ্ঞান বলে যে শক্তির রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আলোক, উত্তাপ, চুম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি প্রভৃতি পরস্পরের সঙ্গে যোগযুক্ত। ইহারা একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। জীববিজ্ঞানও জীবজগতের ভিতরের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। একটি জীবাণু বহু হইয়া জীব-শরীর গঠন করে। ডারউইন দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন স্তরের জীবগণ মূলে অভিন্ন জীবকোষ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমবিকাশের ফলে নানাপ্রকার জীবজাতিতে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ, বৈজ্ঞানিক সত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ক্রমবিকাশের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রমবিকাশের পদ্ধতি হইতে ডায়লেক্‌টিক পদ্ধতি ব্যাপকতর। সেইজন্য মার্ক্সীয় ধারায় যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য এবং সত্যের যথাযথরূপ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স্ তত্ত্ববিজ্ঞানের পরিপন্থী। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে জগতের বস্তুসমূহ একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন বস্তুই নিরপেক্ষ নহে।

সুতরাং কোন সত্যই চিরন্তন নহে। গতির সাহায্যে স্থিতিকে বুঝিতে হইবে এবং স্থিতির সাহায্যে গতিকে বুঝিতে হইবে। গতি ও স্থিতি আপেক্ষিক (রিলেটিভ)। সুতরাং লেনিন বলেন যে আপেক্ষিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কোন স্থায়ীসত্যের স্বরূপ জ্ঞানগম্য হয় না। যাহা স্থায়ী তাহাই আপেক্ষিক। স্থায়িত্ব ও আপেক্ষিকতার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাও আপেক্ষিক। তত্ত্ববিজ্ঞান বহুদিন পর্য্যন্ত অদৃশ্য অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু মার্ক্‌সীয় দর্শন এরূপ কোন চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে ডায়লেক্‌টিক্‌স্ গতি ও পরিবর্ত্তনকেই চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে। গতিশীল বস্তুই জগতের চরম বাস্তব সত্য।

অ্যারিষ্টটেলীয় ন্যায়শাস্ত্রের মতে 'হাঁ' 'না' হইতে পারে না এবং 'না' 'হাঁ' হইতে পারে না। নৈয়ায়িক চিন্তার প্রধান তিনটি সূত্র এইকথা বলিয়া থাকে। সূত্র তিনটির নাম ন্যায়শাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রের নিকটই সুপরিচিত। তাহারা হইল (১) ঐক্যসূত্র (ল অব্ আইডেণ্টিটি), (২) বিরুদ্ধ সূত্র (ল অব্ কনট্রাডিক্‌স্‌ন্) এবং (৩) মাধ্যমিকতা বর্জ্জিত বিরুদ্ধ সূত্র (ল অব এক্সক্লুডেড্ মিডিল্)। প্রথম সূত্র অনুসারে নৈয়ায়িক চিন্তাকে ধরিয়া লইতে হয় যে, একটি বস্তু যাহা, তাহাই থাকে। সুতরাং রাম নামক ব্যক্তিটি পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একই থাকিবে। তাহার সত্ত্বা অপরিবর্ত্তনীয়। দ্বিতীয় সূত্রটী বলে যে কোন বস্তুই, তাহার বিপরীত রূপ অবলম্বন করিতে পারে না। শ্বেতবর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের ঐক্য সম্ভব নহে। তৃতীয় সূত্র বলে যে দুই বিরুদ্ধ সত্যের মধ্যবর্ত্তী কোন সত্য থাকিতে পারে না। শ্বেতবর্ণ ও অশ্বেতবর্ণ, এই দুইএর মধ্যে অন্য কোন বর্ণের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অ্যারিষ্টটেলীয় ন্যায়শাস্ত্র মানব-অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। আমরা প্রত্যক্ষ জগতে দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বস্তু রূপান্তরিত হইয়া পরিবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত হয়। সাদা কাল হয় এবং কাল সাদা হয়, শিশু যুবকে এবং যুবক বৃদ্ধে পরিণত হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়শাস্ত্র গতিকে অস্বীকার করে। বিখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিক জেনো, সত্য চিরন্তন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন; তাই তাঁহার মতে, চলমান শর সর্ব্বদাই স্থির। এই সব দার্শনিকগণ গতিশীল বাস্তব সময়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিপন্থী। ডায়লেক্‌টিক ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তি প্রত্যক্ষ সত্যের উপর। এই ন্যায়শাস্ত্র সর্ব্বদাই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহা সত্য হইলেও, অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না, কারণ ইহাদের আপেক্ষিক সত্য আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আপেক্ষিকতার ও স্থায়িত্বের ভিতরে যোগ বর্ত্তমান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ডায়লেক্‌টিক্‌স একটি বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক পদ্ধতি।

মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ মনে করেন যে এই চিন্তা পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। লেনিন, হেগেলের ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, এই পদ্ধতির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ডায়লেক্‌টিক্‌সের প্রধান সূত্র হইল বিরুদ্ধের ঐক্যের সূত্র। ইহাই ডায়লেক্‌টিক্‌সের সারমর্ম্ম। তিনি এই মূলসূত্রকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিম্নলিখিত ১৬টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

(১) চিন্তা করিতে হইলে প্রত্যেক বস্তুর গুণসমূহকে ঐ বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক এবং এক একটি বিশেষ গুণের স্বরূপ জানিবার জন্য উহার উপর মনোনিবেশ করা আবশ্যক। কিন্তু এই পদ্ধতি ডায়লেক্‌টিক্‌সের বিরুদ্ধ পদ্ধতি। ইহা সত্ত্বেও আমাদের প্রথমে বস্তু সমূহকে ও গুণসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আবশ্যক। তাই আমরা সমাজকে, ধনোৎপাদনের ব্যবস্থাকে, অর্থবন্টন প্রভৃতিকে বিচ্ছিন্নভাবে জানিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা এইরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি না।

(২) ইহার পরে আমাদের আবশ্যক, এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতনভাবে চিন্তা করা। অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইল বস্তুসমূহের ও গুণসমূহের মধ্যে যে যোগ আছে সেই যোগসূত্র আবিষ্কার করা। আমাদের তখন দেখিতে হইবে কি প্রকারে বস্তুসমূহ ও গুণসমূহ একে অন্যের সঙ্গে অভেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ।

(৩) প্রত্যেক বস্তু, জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। তাই আমাদের আবশ্যক প্রত্যেক বস্তুর পরিবর্ত্তনের ধারাকে অনুসরণ করা। কি প্রকারে প্রত্যেক বস্তু রূপান্তরিত হয় তাহা আমাদের জানা আবশ্যক।

(৪) প্রত্যেক বস্তুর পরিবর্ত্তনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে উহার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান সেই দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। প্রত্যেক বস্তুর গতি বাহ্যবস্তুর দ্বারা ও উহার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫) তদ্ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান সেই দ্বন্দ্বের ভিতরে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

(৬) প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে যে বিরুদ্ধ শক্তি আছে, তাহাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব হইতে নব শক্তির উন্মেষের ধারা অনুধাবন করা আবশ্যক এবং এইরূপ উন্মেষের ফলে দ্বন্দ্ব কি প্রকারে ব্যাহত হয় তাহা জানা আবশ্যক।

(৭) প্রত্যেক বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক এবং একবস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর যোগসূত্র আবিষ্কার করা আবশ্যক। সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুর গুণসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং সংযোজিত করিয়া দেখা আবশ্যক।

(৮) বস্তুসমূহের ভিতরে যে সব বিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তাহারা কি প্রকারে

একটি সাধারণ ঐক্য সূত্রে সংযোজিত তাহা জানা আবশ্যক। বিশেষের সঙ্গে সামান্যের যোগ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

(৯) কেবল দ্বন্দ্বের ভিতরে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। কি প্রকারে একটি বিশেষ গুণ তাহার বিপরীত গুণে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাও জানা আবশ্যক।

(১০) প্রত্যেক বস্তু কি প্রকারে অগণিত নবনব রূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা জানা আবশ্যক।

(১১) ইহা জানা আবশ্যক যে মানুষের জ্ঞান ক্রমান্বয়ে গভীর হইতে গভীরতর হয়। উহা বাহ্য দৃশ্যের জ্ঞান হইতে সারসত্তার জ্ঞানে উপনীত হয় এবং সারসত্তার জ্ঞান হইতে গভীরতর সারসত্তার জ্ঞানে উপনীত হয়।

(১২) সমসাময়িকতার জ্ঞান হইতে মানুষ কার্য্যকারণের জ্ঞানে উপনীত হয়, কার্য্যকারণের জ্ঞান হইতে পারস্পরিকতার জ্ঞানে উপনীত হয় এবং এইরূপ গভীরতর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া মানবমন জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়।

(১৩) ক্রমবিকাশের ফলে নিম্নস্তরের গুণসমূহ উর্দ্ধতর স্তরে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

(১৪) ক্রমবিকাশের ফলে যাহা ব্যাহত হয় তাহা পূর্ণতররূপে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয় (নিগেসন্ অব্ নিগেসন্)।

(১৫) বস্তুর বিশেষগুণের সঙ্গে সাধারণ ধর্ম্মের সংঘাত ঘটিয়া থাকে।

(১৬) সংখ্যা গুণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং গুণ সংখ্যায় পরিবর্ত্তিত হয়।

আমাদের আলোচনা হইতে উপরোক্ত আলোচনা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

মার্ক্সপন্থী দার্শনিকগণ ডায়লেকটিকসের তিনটি সূত্রের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ইহাদের দুইটি সূত্র পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধের ঐক্যসূত্রের অনুবর্ত্তী। আমরা এখন এই সূত্র তিনটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

(১) সংখ্যা গুণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং গুণ সংখ্যায় পরিবর্ত্তিত হয়

ক্রমবিকাশের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে কোন বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, উহা একটি সীমারেখায় (নোডাল লাইন) আসিয়া উপস্থিত হয়, যে রেখা অতিক্রম করিলে একটি নূতন গুণের আবির্ভাব হয়। ক্রমবিকাশের গতিভঙ্গী কুটিল ও বক্র। এই গতিকে সরলরেখা দ্বারা অঙ্কিত করা যায় না। ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে এই গতি সরলপথে চলিয়া থাকে। তাই তাঁহারা বিপ্লববাদের পরিপন্থী। হেগেল ও মার্ক্স উভয়েই বলেন যে বস্তুজগতের, প্রাণীজগতের এবং ভাবজগতের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে।

উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে করিতে জলের এমন একটি অবস্থা আসে যখন উহা বাষ্পে পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন আকস্মিক। সেইরূপ উত্তাপ হ্রাস করিতে থাকিলে এমন একটি অবস্থা উপস্থিত হয় যখন জল বরফে পরিণত হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ ঘটিয়া থাকে। 'অক্সিজেনের' দুইটি পরমাণু বাড়িয়া তিনটি হইলে উহা 'ওজনে' পরিবর্ত্তিত হয়। এই ওজনের গুণ অক্সিজেনের গুণ হইতে বিভিন্ন। সেইরূপ অক্সিজেন নাইট্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে উহা একটি বিশেষ পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু উহা সালফারের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে অন্য আর একটি পদার্থে পরিণত হয়। সেইরূপ কোন পরমাণুর অন্তস্থিত বিদ্যুৎকণার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে উহার গুণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। জলবিন্দুর সংযোগেই পুষ্করিণী, নদী ও সমুদ্র প্রভৃতির উদ্ভব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে গুণের তারতম্য যথেষ্ট। জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আমরা এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। ডারউইনও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ক্রমবিকাশের যে নিয়মাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহাদের একটি হইল 'আকস্মিক পরিবর্ত্তন' (চান্স ভেরিয়েসন্)। চিন্তা-জগতেও আমরা এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। নিউটন্ যখন একটি আপেল-ফলের পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার চিন্তাজগতে একটি বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমরা অনুধাবন করিলেও দেখিতে পাই যে সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজশরীরে বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থোৎপাদনের বিস্তারের ফলে এমন একটি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যখন উহার ভিতরে বিপ্লব দেখা দেয়। সেইরূপ গুণের পরিবর্ত্তনের ফলেও সংখ্যার পরিবর্ত্তন ঘটে। কোনও একটি কারখানায় যদি সর্ব্বপ্রকার সুচারু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে তাহার ফলে ঐ কারখানা বৃহত্তর হইয়া থাকে।

(২) বিরুদ্ধের ঐক্য

লেনিন বলেন যে প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে যে বিরুদ্ধের ঐক্য আছে এবং প্রত্যেক বস্তু যে বিরুদ্ধ অংশে বিভক্ত হয় উহা জানাই ডায়লেক্‌টিকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে আমাদের দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে—ঐক্যের ভিতরে বিরুদ্ধ শক্তি বর্ত্তমান এবং ঐ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয় একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়া বস্তুর ঐক্য রক্ষা করে। উত্তর ও দক্ষিণ বিপরীত হইলেও যে পথে উত্তরে যাওয়া যায় সেই পথেই আবার দক্ষিণে যাওয়া যায়। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা বিরুদ্ধ শক্তিযুক্ত হইলেও উহাদের ভিতরে ঐক্যসূত্র থাকায় পরমাণুর ঐক্য রক্ষিত হয়। প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে যে বিরুদ্ধশক্তি আছে তাহা একে অন্যকে প্রতিহত করে অথচ উহাদের ভিতরে আভ্যন্তরীণ যোগ থাকায় বস্তুর ঐক্য রক্ষিত হয়। হেগেল বিশেষভাবে বিরুদ্ধের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ ঐক্য ও বিরুদ্ধতা এই উভয়ের উপরেই জোর দিয়াছেন। বিরুদ্ধের

সংঘাতের ফলেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ধনিক সমাজে ধনোৎপাদন ব্যবস্থার ভিতরে ঐক্য আছে। কিন্তু এই ঐক্যের ভিতরেই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান এবং এই দ্বন্দ্বের ফলেই ঘটিতে পারে বিপ্লব এবং বিপ্লবের ফলে উদ্ভুত হইতে পারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

লেনিন নিম্নলিখিত বিরুদ্ধশক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে যোগ ও বিয়োগের দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান; যন্ত্রবিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব; পদার্থবিজ্ঞানে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক ও বিদ্যুৎএর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়; রসায়নবিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ; সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণীদ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। আমরা ন্যায় বিজ্ঞানে সামান্যের ও বিশেষের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। রাম, মানুষ এই প্রতিজ্ঞার ভিতরে বিশেষের সঙ্গে সামান্যের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ ইহারা বিপরীত-ধর্ম্মী। জগতের পরিবর্ত্তন অনুধাবন করিতে হইলে বিরুদ্ধের ঐক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিরুদ্ধের সংঘাতের ফলেই ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুর আত্মগতির কারণ জানা আবশ্যক। বস্তুর এই আত্মগতির ফলেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিপর্য্যয় দেখা দেয় এবং নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। লেনিনের মতে বিরুদ্ধের ঐক্য আপেক্ষিক, কিন্তু বিরুদ্ধের সংঘাত চিরন্তন। ভাববাদী ডায়লেক্‌টিক্‌সের মতে যাহা আপেক্ষিক তাহা আপেক্ষিক এবং যাহা অনাপেক্ষিক তাহা অনাপেক্ষিক। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনের মতে যাহা এক অর্থে আপেক্ষিক তাহা অন্য অর্থে অনাপেক্ষিক এবং ইহাদের সম্বন্ধও আপেক্ষিক। মার্ক্‌স তাঁহার 'ক্যাপিটল' নামক গ্রন্থে ডায়লেকটিক-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া তিনি ধনিকসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি সহজ বিষয়ের আলোচনার পর জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞান ক্ষুদ্র বৃত্তের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর বৃত্তে চলিয়া যায়। দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিক ভাববাদকে অসত্য বলে না। ইহার মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দ্বান্দ্বিক ভাববাদের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সত্যের সন্ধান দেয় এবং এই সত্যের ভিতরে ভাববাদের লুক্কায়িত সত্য গৃহীত হয়।

(৩) অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি

এই সূত্রের অর্থ এই যে, যে সত্য কোন এক সত্যকে অস্বীকার করে তাহা আবার অস্বীকৃত হয়। একটি বীজ তাহার বীজত্ব হারাইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। এই বৃক্ষ এই বীজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কিন্তু এই বৃক্ষ হইতেই আবার বহু বীজের ও ফলের পুনরাবির্ভাব হয়। যাহা অস্বীকৃত হয় তাহা আবার পূর্ণতর নবরূপে উদ্ভুত হয়। ধনিক সমাজ শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অর্থের অধিকার লোপ করিয়াছে। কিন্তু যখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয় তখন প্রত্যেক শ্রমিকই সমাজের ধনের অংশীদার হয়। যে যান্ত্রিক বস্তুবাদ ভাববাদ দ্বারা ব্যাহত হইয়াছিল, তাহার মুলসত্য দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বিত হইয়াছে।

কবিতা

একটি হারানো ছবি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নাছোড় কলম পিষি, এইখানে জীবন নাকাল।
সাম্‌নে লেজার খোলা ঃ মাথার উপরে পাখা ঘোরে,—
একসার ধূলো ওড়ে নিয়মমাফিক্‌!
কোনোখানে মেঘ তবু জমে ওঠে ঠিক্‌,
আর কোনো মনের কিনারে।
সে মন, সে মেঘ নেই, এইখানে জীবন নাকাল
কোনো এক আকাশের, পাহাড়ের স্মৃতির আঁচল চেপে ধরে'

সাঁওতাল পরগণা ঃ এই ছোটো গ্রামে রাত নেমে এলো
সাদা চাঁদ, মহুয়ার ছায়া কাঁপে হঠাৎ হাওয়ায়;
একটি বিষণ্ণ নদী—আকাশ সেখানে ঝুঁকে থাকে;
রাত্রির ট্রেন চলে, ছেঁড়াখোঁড়া মনের খেয়াল এলোমেলো।
জ্যোৎস্নায় ধূলোর ঝড় ওড়ে—
সেইখানে মাঠেরা ঘুমায়।
সে মন সে মাঠ নেই, এইখানে জীবন নাকাল
কোনো এক আকাশের, পাহাড়ের স্মৃতির আঁচল চেপে ধরে'

একটি মেয়ে

এজ্রা পাউণ্ড

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

বাহুভুক্ত হয়েছে বৃক্ষ আমার,
বাহুর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে বৃক্ষরস।
আমার বুকের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে বৃক্ষ—
নীচের দিকে।
তার শাখা ছড়ানো—বাহুর মতো।

বৃক্ষ হচ্ছো তুমি,
শ্যাওলা হচ্ছো তুমি,
তুমিই কম্পমান লতা বাতাসের ঘায়ে।
একটি শিশু—কত উঁচু—সে তুমি,
আর জগতের কাছে এ তো সমস্তই মূর্খতা।

ফসল

অনিল চক্রবর্ত্তী

এখনও ধানের শীষে সোনালী ইশারা জাগে,
শিমুলের ডালে আর ঝাউএর দোলায়
আজো বাজে হাওয়ার নূপুর।
রূপালী মেঘেরা বুঝি চুপিসারে কয়ে যায়
এখনও তো আছে সেই তোমাদের রূপালী দুপুর

আজিকার এইখানে একদার হাট
সেদিনের তোমাদের সাতরঙা মন আর
জীবনের ঘরে ঘরে খুলেছে কপাট।
তোমরা গিয়েছ ভেসে
রূপালী মেঘের মত
সোনালী ধানের শীষে
সাতরঙা মনগুলি ছুঁয়ে ;
আমাদের মনগুলি কান পেতে শোনে তাই
হাওয়ার নূপুর বুঝি কোনো কথা
আমাদের কানে যায় কয়ে !

ফসলের ঘ্রাণ লয়ে কেটেছে জীবন
তোমাদের আমাদের,
মাঝখানে সময়ের
বৃথা অঘটন,
ধানের শিশুর নাচে খেয়ালী দুপুর কত হল অপরূপ।
সেদিন সে জীবনের হাট
তোমাদের ঘরে ঘরে খুলেছে কপাট !
(তোমাদেরো ছিলো নাকি আমাদের মত আঁটা মনের কুলুপ ?)

ফসলের ঘ্রাণ যারা পাবে এই পৃথিবীর আমাদের পরে,
আমাদের পরে যারা রূপালী মেঘের নীচে
ফসলের শীষে শীষে রেখে যাবে জীবনের ঘ্রাণ,
তাদের নিটোল প্রাণ লুটে যেন নিতে পারে
তোমাদের জীবনের সবটুকু দান !
মনের কুলুপ-আঁটা স্বাদহীন হৃদয়ের অবসাদ ছিঁড়ে
তারা যেন রেখে যায় জীবনের হাট,
আরো পরে আসে যারা
তারা যেন পেয়ে যায়
তোমাদের খোলাপ্রাণ আর খোলা মনের কপাট।

নোঙর

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ফুলে, ফুঁসে, গর্জ্জে ওঠেনি জনসমুদ্র বিহারের মতো—মেদিনীপুরের মতোও অশান্ত বিক্ষোভ নয়—সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তের উদ্দীপনায় নিয়মরক্ষা মাত্র করেছিল এ-সহর। বাংলাদেশেরই একটি জিলা সহর, একত্রিশের আন্দোলনে অনেক ত্যাগ, অনেক সাহস, অনেক দীপ্তি দেখিয়েছে কিন্তু তখন আর একত্রিশ সন নয়, উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সন। গান্ধীজির ডাক এসেছে কিন্তু যুদ্ধের ঘন হাওয়ায় তা যেন খুবই অস্পষ্ট—কানে এসে পৌঁছয় না, ছুঁয়ে যায় না মনের কিনার। আগেই মন আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে যুদ্ধের কাছে—যুদ্ধের ভয়ের কাছে বা যুদ্ধের আয়োজনের কাছে। গান্ধীজি অ্যারেষ্টেড্?—কিন্তু চাটগাঁতে যে বোমা পড়ছে—এখানে পড়তে আর কতক্ষণ—ক'মিনিট ক'সেকেণ্ড আর লাগবে ওদের প্যারাসুট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে? সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে সত্যি তাহলে এবার যেতে হবে—কোথায় যাব? যাযাবর হ'তে হবে ক'দিন, ক'মাসের জন্যে কে বল্‌বে? বর্ম্মা আর মালয়ের লোকদের মতো যাযাবর! ভাবা যায় না—কল্পনা করা যায় না সে-অবস্থা। এক ফোঁটা জলের জন্যে মারামারি—তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো অচেনা পাহাড়-জঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটে পালানো—সামান্য অসুখে নির্বান্ধব হয়ে কোনো ঝর্ণার ধারে বা গাছের নীচে পড়ে থেকে মৃত্যুর অপেক্ষা! এর চেয়ে ভীষণ বিভীষিকা আর কি হ'তে পারে? এ-বিভীষিকার কলরবে ভরে আছে মন—শব্দব্রহ্মও সেখানে পৌঁছুবার সাহস করবে না! গান্ধীজির গ্রেফতারের খবর সূক্ষ্ম একটি হাওয়ার রেখার মতো কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল। ভয়—ভয়! আত্মরক্ষার বৃত্তি কেবল সজাগ হয়ে আছে—আদিম দিনের মানুষের মতো নিজেকে বাঁচাবার বৃত্তি! ইভাকুয়েশন। বর্ম্মার মতো কথাটা দেবতার অভিশাপের মতো অজানা আকাশ থেকে অতর্কিতে ঝরে পড়ল না, সমস্ত সহরের মনের আকাশে অনেকদিন ঝুলে থেকে একদিন ধীরে ধীরে নির্ঘোষিত হল ম্যাজিষ্ট্রেটের গম্ভীর, নিরালা কুঠি থেকে। ইভাকুয়েশনে চলে যাচ্ছে ফৌজদারী-আদালত। সহযাত্রী হচ্ছে জিলাস্কুল আর কলেজ। স্থির পদবিক্ষেপে ইভাকুয়েশন। চিচিংফাক আওয়াজে যেন অন্ধগুহার বন্ধদরজা খুলে গিয়ে হীরা-জহরতের আলো ঠিকরে পড়ল। আলো-উজ্জ্বল প্রসারিত দিগন্তের ছবি! বর্ম্মা আর মালয়ের লোকদের মতো অবস্থা কেন হবে আমাদের? সবটাই ত সমতল বাংলাদেশ, পাহাড় নেই, জঙ্গল নেই—আছে ট্রেন আর ষ্টীমার—গাছের নীচে পড়ে থেকে মৃত্যুর

অপেক্ষা কেন করতে হবে আমাদের ? চলো ইভাকুয়েশনে, যেখানে কোর্ট যাচ্ছে সেখানে, যেখানে স্কুল-কলেজ বস্‌বে সেখানে।

আদিম আত্মরক্ষার বৃত্তিতে যারা পালিয়েছে পালাক, তারচেয়েও আদিমতম বৃত্তি আছে। শুধু সে বৃত্তিই বেঁচে আছে যাদের কোথায় পালাবে তারা ? প্যাঁচাকে ইঁদুর ধরতেই হবে—রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে সংগ্রহ করতে হবে খাদ্য। কোর্টের দালানে এম্‌-ই-এস্‌ অফিস। বারান্দায় উঁকি দিতে সুরু করল ইঁদুর-ধরা দল—প্রথমে একটি দু'টি, পরে অসংখ্য, অজস্র। খামে-পোরা টেণ্ডার হাতে নিয়ে ছুটোছুটি, হৈ-হুল্লোড়—কোর্টের মতোই জমজমাট এম্‌-ই-এস্‌ অফিস। ত্রিশ-একত্রিশ সনে না কি কোর্ট-পিকেটিং হয়েছিল ? এখন উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সন।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সন। তবু সহরের ছোট একটা ময়দানে হঠাৎ বেসুরো ভাবে বেজে উঠ্‌ল 'বন্দেমাতরম্‌'। তিনটি মিলিত কণ্ঠের ক্ষীণ ধ্বনি : 'বন্দেমাতরম্‌'। চারদিকে ব্যর্থ-ইভাকুয়ীর আর ইঁদুর-ধরার চকিত, শঙ্কিত চোখ। আবারো সেই ক্ষীণধ্বনির উদ্দীপনা জাগাবার চেষ্টা। আবারো 'বন্দেমাতরম্‌'। উদ্দীপনা হয়ত জাগল—চারদিকের কয়েকটি কম্পিত কণ্ঠের এলোমেলো বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে—কিন্তু ত্রিশ-একত্রিশ সনের প্রেতকণ্ঠ ছাড়া তাতে আর কোন সুর শুনতে পাওয়া গেলনা।

ওরা কারা ? একজন ত সুধীরবাবু—খদ্দরের দোকান 'মহাত্মা-স্টোর্সে'র মালিক—আর দু'জন ? তারা সহরের কেউ নয়। গাঁ-থেকে ধরে এনেছেন—ভলান্টিয়ার। সমস্ত স্বদেশী আন্দোলনেই আছেন সুধীরবাবু—লোক ক্ষেপাতে জানেন। কিন্তু এবার আর ক্ষ্যাপা লোক নেই। যুদ্ধ সুমুখে রেখে কি আর আন্দোলন নয় ? উনি একাই ভুগ্‌লেন এবার। এক বছর জেল—আর দোকানটির সর্ব্বনাশ ! মেয়েদের নিয়ে ওঁর স্ত্রী এখন কোথায় দাঁড়াবেন ?—এবার আর বন্ধুবান্ধবরাও হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না। বলে নিজের পরিবার নিয়েই একেক জনের ঠাঁইকূল নেই, তার উপর তিন তিনটি মেয়ের দায়িত্ব !

লোকবিরল সহরে গুঞ্জন উঠল—দু'চার দিন। সুধীরবাবু আর তাঁর পরিবার তারপর সেই গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন—মিশে গেলেন হাওয়ায়। নতুন হাওয়ায় তখন পেট্রলের গন্ধ, মদের গন্ধ আর নতুন নোটের খস্‌খসে আওয়াজ।

এক বছর পর মহকুমা-সহরের প্ল্যাট্‌ফর্মে এসে দাঁড়ালেন সুধীরবাবু শিশুর মতো অপার বিস্ময় চোখে নিয়ে। এখানে এসে ঠাসবুনোট ভীড়ের গাড়িটাকেও ফাঁকা ময়দান বলে মনে হচ্ছিল। ষ্টেশনটার কথা স্মরণ করতে একটা নির্জ্জন দারিদ্র্যের ছবিই মনে পড়ে, কয়েকটি কুলীর বিষণ্ণ-মুখ আর লোহার গেটের ওপারে জীর্ণ ঘোড়ার-গাড়ির গারোয়ানদের

প্রতীক্ষা-উৎসুক চোখ! সে-ছবির সঙ্গে এখনকার ছবির কোন মিল নেই, অভাবে আর কর্ম্মাভাবে জড়সড় ষ্টেশনমাষ্টারের পাপক্ষয়ের দিনগুলিও, মনে হল, যৌবনবেদনারসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। এই প্রচণ্ড ভীড় নিয়ে তাঁর ব্যস্ততার আর সীমা নেই—যার সাদা জীনের কোটে সেলাই-এর উঁচু পাড়গুলো কয়লায় আর ময়লায় কালো ষ্ট্র্যাপের আকার ধারণ করে থাকত, তাঁর গায়ে ইস্ত্রি-দুরস্ত ফর্সা খাকি! সুধীরবাবু নিজের ধূলিধূসর রুক্ষ মুখটার উপর হাত বুলিয়ে আনলেন। এই ভীড় আর ব্যস্ততা খুব খারাপ লাগ্‌ছিল না। খারাপ লাগ্‌ত হয়ত নিঃসঙ্গ কারাবাসের পর এখানে এসে নির্জ্জনতা দেখলেই।

"বাবা—"

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সুধীরবাবু খুসীর কাকলির দিকে চোখ ফেরালেন। সীতা আর গীতা তাঁর জন্যে স্টেশনে আস্‌তে পারে না জেনেও পিতৃত্বের বৃত্তিকে রোধ করা গেল না—ডাকশুনে তাকাতেই হ'ল ওদিকে। এই সাধারণ স্বাভাবিক ভুল শুধ্‌রে নিতে যাচ্ছিলেন সুধীরবাবু—দেখা গেল ভীড় ঠেলে সত্যি সীতা আর গীতা তাঁর দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। সীতা আর গীতা—নির্ভুলভাবে ওরাই, আর কেউ নয়। একটু পরিচ্ছন্ন, একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওদের—হয়ত ষ্টেশন-মাষ্টারেরই মতো—তবু—সুধীরবাবু ভুরু কপালে তুলে চোখদুটো একটু প্রসারিত করে তাকালেন—ভুল তিনি করেন নি।

"তোমরা এসেছ?" সুধীরবাবু ম্লানমতো হাস্‌লেন।

কাচের কঙ্কনের একটু টুং-টাং—টাঙ্গাইল-শাড়ির খস্‌খস্‌ একটু:

"বা রে, আস্‌ব না বুঝি?" অভিমানী হয়ে উঠ্‌ল সীতার চোখ।

"আমরা ত রোজই স্টেশনে বেড়াতে আসি—"দাঁড়িয়েই শরীরটাকে দোলাতে সুরু করলে গীতা: "তোমাকে নিয়ে যেতে আসব না?"

সীতা তাড়াতাড়ি গীতার মুখ্‌ থেকে কথাটা লুফে নিয়ে অন্যদিকে ছুঁড়ে দিতে চাইল: "তোমাকে নিয়ে যেতে তোমার বন্ধুরা কেউ আসে নি, বাবা!"

একটা অসহায় হাসি মুখে নিয়ে সুধীরবাবু এগিয়ে যেতে লাগলেন কয়েক পা'। যে-ছেলেটি ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সুধীরবাবুকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে সে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল।

"বিমল?" সুধীরবাবু একটু উজ্জ্বল দেখালেন: "ও, তোমার সঙ্গেই বুঝি এসেছে এরা!"

"বিমলদা তাঁর ক্যাম্পে যাচ্ছেন—এ-গাড়িতেই—" গীতা একটু ঠাট্টার হাল্কা হাওয়া ছড়িয়ে দিলে।

"ক্যাম্পে?" উৎসুক হয়ে উঠল সুধীরবাবুর কণ্ঠ।

"চাঁটগাঁ—কাজে যাচ্ছি—" নিজেকে কেমন একটু বিপন্ন মনে হ'ল বিমলের—তাড়াতাড়ি গাড়ির কামরার দিকে পা চালিয়ে দিলে সে।

"ফিরছ কবে, বিমলদা ?" সীতার কণ্ঠ বিমলের পেছনে ছুটল।

কি বলে যে কামরার ভীড়ে মিশে গেল বিমল, ঠিক বোঝা গেল না।

প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হাল্কা হয়ে গেছে। ভীড়টা গাড়ি গলাধঃকরণ করতে পারে নি, উগরে ফেল্‌তে চায়—তবু প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে এখন আর ফিরে আসবে না ভীড়। সুধীরবাবু হাঁটতে সুরু করলেন—অনেকক্ষণ পর একটু ফাঁকা জায়গা। সিণ্ডাসে'র উপর সুধীরবাবুর ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের ফিকে আওয়াজ মেয়েদের জুতোর শক্ত গোড়ালির আওয়াজের সঙ্গে মিশে যতিপতন করছিল পদে পদে।

ছ্যাকরা গাড়ির তুলুনির সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুল্‌লেন সুধীরবাবু: "কনট্রাক্‌টারি করছে বুঝি, বিমল ?'

"এরোড্রামের বিরাট কনট্রাক্ট—" গীতা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সুধীরবাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, মেয়েদের মুখের দিকে চোখ তুল্‌তে তাঁর সঙ্কোচ হচ্ছিল সত্যিকথা। কিন্তু তাছাড়াও বাইরের শূন্যতায় তাকাবার যেন দরকার ছিল! ত্রিশ সনে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল বিমল—সে তখন কলেজে পড়ে। আত্মত্যাগের কি দীপ্তি, কি উজ্জ্বল আভাই না বিমলের মুখে তখন দেখতে পেয়েছিলেন সুধীরবাবু। আগুনের টুক্‌রো ছেলে! তারপর ? অহিংসার পবিত্র হুতাশন হিংসার উচ্ছৃঙ্খল বহ্নি হয়ে উঠল! দেউলির মরুভূমিতে নির্ব্বাসন তার পর। দেউলি থেকে ফিরে এলো বিমল চোখে রাশিয়ার স্বপ্ন নিয়ে। সত্যাগ্রহের সৌরভ ম্লান হয়ে হয়ে মুছে গেছে তার মন থেকে—সুধীরবাবু বুঝ্‌তে পারলেন। কিন্তু বুঝ্‌তে পারলেন না, কেন! আদর্শ কি মেঘের রং? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলে যেতে পারে ? না কি কোনো আদর্শই ছিল না বিমলের—আবেগ ছাড়া কোনো প্রগাঢ় নিষ্ঠাই ছিল না কিছুতে ? কম্যুনিষ্টও হতে পারে নি সে, কিন্তু কম্যুনিষ্টদের টাকা দিত—টিউশনিতে রোজগারের টাকা! অপচয়! শক্তির অপচয়! বিমলের মতো কত সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে--যারা এগিয়ে দিতে পারত দেশকে অনেকখানি, পেছনে ঠেলে দিচ্ছে অনেকদূর! বিমলের আজকের চেহারাটা সরীসৃপের মতো কিলবিল করে উঠ্‌ল সুধীরবাবুর চোখের উপর—চক্‌চকে কাব্‌লি স্লিপার থেকে কড়াইস্ত্রির পাৎলুন—ঝক্‌ঝকে জুটো আংটি আর ব্যাকব্রাশড্‌ চুলের মসৃণতা, সবমিলে একটা পিচ্ছিল বীভৎসতার ছায়া এনে দিল মনে। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সেই বীভৎসতার আক্রমণে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন সুধীরবাবু। তারপরই তাঁকে আত্মস্থ হতে হল—এ অবস্থা তাঁকে মানায় না বলে তিনি আত্মস্থ হলেন। বিমল ছেলে মানুষ—সুধীরবাবুর কি উচিত তার ছেলেমানুষিতে উঁকি

দেওয়া ? আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হলে বয়েসের স্থৈর্য চাই—সে-স্থৈর্য্য ছেলেমানুষ বিমলের কোত্থেকে আসবে ? কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ কি করে বুঝবে ওঁর কাঁচা মন ?

"এখানে লোক বেড়ে গেছে খুব, না ?" বাইরে মুখ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন সুধীরবাবু।

"হাট হয়ে গেছে সহরটা—" সীতার স্বর একটু গম্ভীর হয়ে এসেছে বাবাকে বুঝবার চেষ্টায়।

"ভাঙা সহরগুলোর ভীড়ই নয়, বাবা—" একটু সময় চুপ থেকেই যেন দম আট্‌কে আস্‌ছিল গীতার : "বর্ম্মা থেকেও অনেক বাঙালী এসে পাকাবাড়িগুলো দখল করে বসেছে ! রুবি-ওরা বল্‌ছিলনা দিদি, রেঙ্গুনে ওদের মস্ত কাপড়ের কারবার ছিল ? বিলিতি কাপড়—ব্লাউস্‌গুলো দেখেছিস্ ওদের—ও বিলিতি কাপড় না হয়ে যায় না !"

"বর্ম্মার লোকদের ত টাকা হবেই—" সুধীরবাবু গাড়ির ভেতরে চোখ নিয়ে এলেন।

"সুষমাকে যদি দেখো বাবা, অদ্ভুত মেয়ে—" ঠোঁট ভেঙে দিল গীতা : "লুঙি পরে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে—দেখাতে চায় বার্ম্মিজ বনে গেছে ! বলে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ—ডাক্তারি পড়বে ! বাবা না কি ওর মান্দালয়ে মস্ত ডাক্তার ছিলেন—কলকাতা গেছেন প্র্যাকটিস্ করতে—আলিয়েন্ট অপরচ্যুনিটিতে ওরাও না কি কলকাতা চলে যাবে ! কি অদ্ভুত উচ্চারণে আলিয়েন্ট অপরচ্যুনিটি কথাটা বলে সুষমা, দেখেছিস্ দিদি—?"

"যাঃ—"সুধীরবাবুর শিথিল ঔদাসীন্যে সীতা থিঁতিয়ে পড়ছিল।

গীতা সুধীরবাবুর মুখের দিকে তাকাল—সুধীরবাবু আবার বাইরে নিয়ে গেছেন মুখ।

অপরাধীর মতো একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে চল্‌ছিলেন সুধীরবাবু—যে-ভয়কে বাইরে টেনে এনে ছিঁড়েখুঁড়ে দেওয়া যায় না—স্নায়ুর জটে লুকিয়ে রাখতে হয় যাকে আর তাই যার বিষক্রিয়ায় দুর্ব্বল হতে থাকে মন। শুধু সীতা আর গীতাই নয়, স্ত্রীকে দেখেও আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি মনে-মনে। এ কী হয়েছে এরা ? তাঁর আদর্শ—বহুদিনের লালিত আদর্শ ভেঙে চূরমার করে দিয়েছেন তাঁরই সহধর্ম্মিণী। অথচ তিনি ভেবেছেন—ভেবে তৃপ্তি পেয়েছেন যে তাঁর রত্নগর্ভ আদর্শের কোলে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠ্‌ছে তাঁর পরিবার—ঝুটা জহরৎ নয়, সাচ্চা হীরা। যা তিনি ভেবেছিলেন তা যে নয়, এই রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার শক্তি আর নিজের মনে খুঁজে পেলেন না তিনি—হটে যেতে হল তাকে পেছন দিকে—পশ্চাৎপটে সরে যেতে সুরু করলেন সুধীরবাবু। খিচুরি-উৎসবের ব্যবস্থায় বাইরেই এখন কাটিয়ে আসেন সমস্তদিন—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আস্‌তে চান, প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই যেন, অন্নদান সেবায়। শুভ্র উজ্জ্বল বলাকার পাঁতি থেকে

একটি ঝড়ো কাক যেন চুপিচুপি সরে যায়—পরণে আধময়লা আটহাতি খদ্দরের ধুতি, ঘাড়-ছেঁড়া খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, পায়ে গোড়ালি-ক্ষয়ে-যাওয়া স্যাণ্ডেল। কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িগোঁফে কি অপরিচ্ছন্ন মুখ! অথচ তাঁর স্ত্রীর মুখে এসেছে আশ্চর্য্যরকম মসৃণতা—সীঁথি ভেঙে সামনের চুলগুলোকে একটু ফাঁপিয়ে তুলেছেন তিনি মেয়েদেরই মতো, চুলের বুনোট ঢিলে হয়ে গেছে, তবু। শান্তিপুরী ধব্‌ধবে হাল্কা শাড়িতে আগের চাইতে ঢের সুডৌল দেখায় শরীর। সুধীরবাবু অবাক হয়েছেন, এই পরিবর্ত্তনে স্ত্রীর মনে একটুও সঙ্কোচ নেই—একটু হাঁপিয়ে উঠ্‌ছেন না তিনি—যেন এ একটা ঝাঁপ নয়, মসৃণ, মন্থর, স্বাভাবিক গতি।

রিফিউজির জোয়ার ফুলে উঠ্‌ছিল সহরে—যুদ্ধের রিফিউজি নয়, মন্বন্তরের। সকালের চা-টাও ছাঁটাই করে বাইরে বেরুচ্ছিলেন সুধীরবাবু, একটা মিহি খদ্দরের পাটকরা কাপড় দুহাতে তুলে ধরে খুসী-খুসী চোখে স্ত্রী এসে সামনে দাঁড়ালেন।

"তোমার জন্যে ঢাকা থেকে নিয়ে এল বিমল—"

"আমার জন্যে?" নির্ব্বোধের মতোই তাকাতে হল সুধীরবাবুকে।

"ছেলের কতো সঙ্কোচ, বল্‌লে, কাকাবাবু কি নেবেন? বল্‌তে হল, 'তুমি আগ্রহ করে দিচ্ছ—নেবেন না কেন'?"

"আমার জন্যে অত মিহি কাপড়?" সুধীরবাবু আপত্তিটাকে সজোরে ফোটাতে পারলেন না।

"ছেলেমানুষ ও দিচ্ছে—"

পরনের কাপড়টার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুধীরবাবু বল্‌লেন: "এতেই ত চলে যায়! না হয় সূতো কেটে নিতাম—ক'দিন আর লাগ্‌ত?"

"একটা কাপড় নিয়ে অত কথা বলো না ত!"

সুধীরবাবু আর কথা বলেন নি—খিচুরির জন্যে কলকাতা থেকে নিয়মিতভাবে চাঁদা সরবরাহ করানো যেতে পারে কি না তারই চেষ্টায় বেরিয়ে গেছেন। সত্যি ত, একটা কাপড় নিয়ে এতো কথা তিনি কেন বলতে গিয়েছিলেন? বিমলের পয়সায় কি এ-পরিবারের অন্তত এক ডজন শাড়ি কেনা হয় নি? শুধু কি তাই? একবছরের বাড়িভাড়া যোগায় নি বিমল? তাছাড়া রুটি, বিস্কুট, মাখন, দুধ, চিনি, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম? কে দিয়েছে সাবান-স্নো, পাউডার-পেষ্ট, ঝুমকো-কঙ্কন, সায়া-সেমিজ, জুতো-ব্লাউসের পয়সা? কি দিয়ে গিয়েছিলেন সুধীরবাবু এদের? আজও বা ফিরে এসে কি দিতে পারছেন? প্রত্যেকটি গ্রাসের সঙ্গে কি তিনিও বিমলের পয়সাই তুল্‌ছেন না মুখে—বিমলের পয়সায় কেনা আলো-বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছেন না শুয়ে-বসে? সুতো কাটবেন তিনি—তুলোর বাণ্ডিল

কিনে আনতে বিমলের কাছে না হোক, কারো কাছে ত হাত পাততেই হবে তাঁর? স্বাবলম্বন! কোথায় বেঁচে আছে তাঁর স্বাবলম্বন? আদর্শের কোল ঘেঁষে থাকতে পারছেন না ত তিনি—কাকে আর অপরাধী করবেন তবে—স্ত্রীকে, মেয়েদের? কি তারা করতে পারত—তাদের জন্যে তিনি কি করতে পেরেছেন?

যাক—কপাল থেকে ঘামের বিন্দুগুলো কেচে নিলেন সুধীরবাবু। পরিবারের আর্থিক খুঁটিনাটির কথা কোনদিনই ত ভাবেন নি তিনি—আজ এই অসহায় অবস্থায় তা ভেবে আর কি হবে? এদিকে চোখ বুঁজেও যদি আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন কোনো রকমে—তাঁর কাছ থেকে মানুষ যা আশা করে, দিয়ে যেতে পারেন তা-ই তাদের হাতে তুলে, একদিন হয়ত তার পুরস্কার আসবেই—আজকের দিনের সব ক্ষত, সব ক্ষতি, সব গ্লানি মুছে যাবে সেদিন—বলিষ্ঠ চোখে তাকাতে পারবেন তিনি পরিবারের মুখের দিকে—তাঁর পরিবারের দিকে তাকাবে সহর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে। দেশের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যখন, তখনও ত তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যে পরিবারের কথা চিন্তা করেন নি—আজ যখন দেশের নিঃস্ব পল্লীবাসীর মুখে গ্রাস তুলে দেবার সংগ্রাম, আজও পরিবারের কথা চিন্তা করে তাঁকে পেছিয়ে থাকলে চলবে না। রিলিফ-ওআর্কের স্তম্ভ হিসেবেই দাঁড়াতে হবে তাঁকে—জনসাধারণের মনে নিশ্চিন্ততা বোধ এনে দিতে হবে, সুধীরবাবু এসে পড়েছেন, সুধীরবাবু আছেন, যা করবার তিনিই করবেন এবার।

কিন্তু কিছুই সেদিন করতে পারলেন না সুধীরবাবু—কোনোদিনই কিছু করতে পারবেন বলে মনে হল না। ইউ-পির সংবাদদাতাকে ধরে একটি টেলিগ্রাম মাত্র পাঠিয়ে এলেন কলকাতায় সাহায্য চেয়ে। সাহায্য করবে কে—নিজেকেই প্রশ্ন করলেন সুধীরবাবু। এ-জেলার যাঁরা কলকাতায় আছেন তাঁরা? তাঁরা কি এ-সহরের লোকদের মতোই নন? কঙ্কালের শোভাযাত্রা আশঙ্কার সহস্র হাত বাড়িয়ে কি তাঁদের হাত চেপে ধরেনি? চল্লিশ টাকায় চাল কেনার দুর্ভাবনা, মড়ক আর লুটতরাজের দুশ্চিন্তায় কি তাঁরাও কুঁকড়ে যাননি এ-সহরের লোকদেরই মতো? সবাই সহমরণে যাব বলে কে বিলিয়ে দিতে আসবে তার ভাণ্ডার! কেউ এ-প্রস্তাবে রাজী নয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখলেন সুধীরবাবু সহরের বদান্যরাও দানের হাত গুটিয়ে ফেলতে চাইছেন। আতঙ্ক আর আশঙ্কার বিরুদ্ধে কি করে আর যুদ্ধ করা যায়!

তবু নিজের হাতে চাঁদার খাতা নিয়ে সুধীরবাবু ট্রেন চাপতে সুরু করলেন—ঢাকা থেকে চাটগাঁ পর্য্যন্ত টহল—তাড়া করলেন মিলিটারী কনট্রাকটারদের পেছনে। চাঁদার খাতায় বউনি করল বিমল একশ' টাকার দুখানা নূতন কড়কড়ে নোট দিয়ে কিন্তু সমস্ত

পূববাংলায় বিমলের মতো উদারহৃদয় কনট্রাকটার আর একটিও জুটলনা। দেখা গেল কুড়িয়ে-কাচিয়ে যা হয় সপ্তাহান্তে তা দিয়ে একবেলা একহাতা করে খিচুরি বিলি করা যায় মাত্র। তারপর আর তাও নয়। মনের বিমর্ষতার উপর শরীরের ক্লান্তি আর অসুস্থতার রং বুলিয়ে একেক দিন সুধীরবাবু বাড়িতেই বসে থাকেন। দৈনিকপত্রিকার উপর একাগ্র হয়ে থাকে তাঁর চোখ—একটু আলো, একটু আশ্বাস খুঁজে পেতে চায় মন—কংগ্রেসের কারাবাসের দিন কি শেষ হয়ে যেতে পারেনা হঠাৎ কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ? পাশের ঘরে গীতার হাসি কিলবিলিয়ে ওঠে, রুবির সঙ্গে নতুন দেখা কোন সিনেমার গল্পে জমে আছে কখন থেকে—সামনের বারান্দায় কার যেন অবিরত যাতায়াতের আলোছায়া পড়ছে, হয়ত সীতার—হয়ত বিমলের আজ আসবার কথা ! সীতার সঙ্গে সঙ্গে বিমলের নাম মনে মনে স্মরণ না করে থাকতে পারলেন না সুধীরবাবু—অথচ তাতে তাঁর চেষ্টা ছিলনা। বরং সবসময়ই চেষ্টা থাকে তাঁর বিমলকে পাশে থাকা পরিজনের মতো ভুলে থাকতে। বিমলের উদার হৃদয়কেই ছুঁয়ে-ছুঁয়ে থাকতে চায় তাঁর মন, সে-হৃদয়ে অভিপ্রায়ের ছায়া তিনি আবিষ্কার করতে চাননা। কিন্তু কখন যে মন উদার আশ্রয় থেকে পালিয়ে অন্ধ গলিঘুঁজিতে পা বাড়িয়ে দেয়—ভাবতে অবাক হয়ে যান সুধীরবাবু। তারপর তাকে সৎপথে আনবার চেষ্টা চলতে থাকে আবার।

মনের সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব আলস্য-ভুঞ্জন ছাড়া আর কি ? কাজেই একদিন এই আলস্য-ভুঞ্জনের দাম দিতে হয় সুধীরবাবুকে। স্ত্রী এসে বলেন : "তুমাসের বাড়ি-ভাড়া জমে আছে—"

মাত্র ত্ব'মাসের, একবছর তু'মাসের নয় কিন্তু তাতেই চমকে উঠলেন সুধীরবাবু : "কত ?"—

"ষাট টাকা। টাকাটা যোগাড় করতে হবে। তুমি এসেছ তাই বিমলের হয়ত দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে—"

"না-না, বিমল কেন দেবে ?" পৌরুষের তাড়া খেয়ে সুধীরবাবু মেরুদণ্ড খাড়া করে সোজা হয়ে বস্‌লেন।

"তুমি আসবার দিনে জোর করে তিন শ' টাকা গছিয়ে দিয়ে গেল—তাইতে আজ অবধি বাজার খরচ চলছে—"

স্ত্রীর কণ্ঠকে ভগ্নদূতের নির্ব্বিকার কণ্ঠ বলে ধরে নিতে পারলেন না সুধীরবাবু—তাতে যেন শ্লেষের মৃদু একটু আমেজ মেশান ছিল। আজ অবধি বাজার খরচ কি করে চলছে জানতে চেষ্টা করলে কি নিজে থেকেই জানতে পারতেন না তিনি, এতো স্পষ্ট করে কি তা বুঝিয়ে বলবার দরকার ছিল ? সুধীরবাবু অন্ধ নন, বধির নন—আস্ত মানুষ—সবই দেখতে পারেন, শুনতে পারেন সব কিছু। শুনতে পেয়েছিলেন তিনি সুষমারা কলকাতা

যাচ্ছে—তাদের বাসায় সীতা গীতার নিমন্ত্রণ—দেখতে পেয়েছিলেন রূপোলি বুঁটিদার ঢাকাই শাড়ি এসেছে সীতার জন্যে, গীতার জন্যে বাটার উঁচু-গোড়ালির জুতো। দেখতে পেয়েছিলেন সুধীরবাবু—কিন্তু দেখতে পাওয়া দরকার মনে করেন নি। ওদের নোংরা ময়লা শাড়ির দিকে তাকানো যেমন দরকার ছিলনা, ঠিক তেম্নি কয়েক মুহূর্ত্ত আগেও দরকার ছিলনা, ওদের শাড়ির ফর্দ্দ চোখের সামনে তুলে ধরবার।

"বিমলকে ফিরিয়ে দিলেই হবে টাকাটা—" মনে-মনে খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করলেন সুধীরবাবু—ফিরিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য জেনেও ফিরিয়ে দেবার উত্তেজনাকে দমন করতে পারলেন না।

"ছিঃ, তুমি কি বলছ ?—ও ফিরিয়ে নেবে না কি এ-টাকা ?"—

সত্যি ত, ফিরিয়ে তিনি কি দেবেন—কতো টাকা ফিরিয়ে দেবার শক্তি আছে তাঁর ?

"তুমি ছিলেনা বলেইত এগিয়ে এসেছে ও—আমরা নেব কি নেব না ভেবে কতো সঙ্কোচ ওর !" উত্তেজনা আর অবসাদের জোয়ার ভাটা ঠেলে সুধীরবাবু স্বাভাবিকতায় ফিরে এলেন: "এখন আর ওর টাকায় দরকার কি ?"—স্ত্রীর মুখের দিকে তিনি প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

"ওর কাছে আর কি চাওয়া যায় !" স্ত্রীও আত্মনির্ভরতায় ফিরে আসতে চাইলেন।

কিন্তু কার কাছে চাওয়া যায় ? চাইতে পারেন হয়ত সুধীরবাবু অনেকেরই কাছে কিন্তু পাওয়া যায় কার কাছে ? তাছাড়া এম্নি পাওয়াটা কি খুব বড়ো পাওয়া ? পেয়েছেন ত তিনি—পাচ্ছেন ত বিমলের কাছ থেকেই ! সে পাওয়ার ফাঁস থেকেইত বেরিয়ে আসা দরকার ! বেরিয়ে আসা কি আর যায়না—বেরিয়ে আসা যায়—কিন্তু বেরিয়ে এসে কোথায় তিনি দাঁড়াতে পারেন ? সুধীরবাবু দৈনিককাগজটাতে নিবিড় চোখে আত্মনিবদ্ধ করলেন—তাঁকে ভাবতে হবে আর তাছাড়া স্ত্রীকেও আপাতত বিদায় করে দিতে হবে এখান থেকে। স্ত্রী চলে গেলেন, তাঁর যা জানাবার ছিল জানানো হয়ে গেছে। কিন্তু স্ত্রী চলে যাবার পরও সুধীরবাবু কাগজটাই নাড়াচাড়া করতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে এবং কি যে করতে হবে হঠাৎ মনে পড়তেই দেখতে পেলেন অন্যমনস্কতায় দেড়ঘণ্টা সময় কেটে গেছে।

ষাট-টা টাকা যোগাড় করে আনতেই হল সুধীরবাবুকে—তাঁরই এক উকীল বন্ধু ধার দিলেন, মানে দাদন দিয়ে রাখলেন। কিন্তু কালক্রমে প্রমাণ হল টাকা যোগাড় করা সুধীরবাবু যতোটা জরুরী মনে করেছিলেন আসলে তা মোটেই নয়। নিঃস্বদের জন্যে সরকারী দুশ্চিন্তার সঙ্গে নিজের দুশ্চিন্তা মিশিয়ে দিয়ে একদিন তিনি পারিবারিক ব্যাপারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে গেছেন দেখতে পেলেন। বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতিটাই যে আসল কথা তাতে আর সন্দেহ রইলনা।

টাকার দাবী নিয়ে স্ত্রী আর তার সামনে এসে বিভীষিকার মতো দাঁড়ান না—শোনা যায় না সংসারের চাকা ঘোরবার আওয়াজ। দুঃস্থদের কম্বল বিতরণের কাজ নিয়ে বাইরে বাইরেই আবার ঘুরতে সুরু করলেন সুধীরবাবু—ফিরে এলো তার সুপ্ত উৎসাহ—কেননা দানের উৎস এখন আর শুষ্ক নয়।

"সপ্তাহে সপ্তাহে ও-কটা কম্বলের হিসেব নিয়ে আসা কি দরকার?" সরকারী দফতরের কর্ত্তা হাসতে থাকেন: "হিসেব দেখে কি করব, আপনারা যে কাজ করছেন সেই কি যথেষ্ট নয়?"

"তবু হিসেব থাকা ভালো—" সুধীরবাবুর কণ্ঠ নির্বিকার—সেবাকাজের প্রশংসায় খুসী হয়ে উঠবার বয়েস আর নেই তাঁর।

খুসী হবার বয়েস নেই বরং আছে দায়িত্ব। প্রশংসাকে অম্লান রাখবার দায়িত্ব। দফতরের কর্ত্তার কথায় সেই দায়িত্বজ্ঞানই দুশ্চিন্তার মতো সুধীরবাবুর কপাল কুঞ্চিত করে তুলল। তারপর বিমলের দেওয়া সরু সূতোর খদ্দরের কাপড়টা ধূলো আর ময়লায় মোটা এবং মহৎ হয়ে উঠল—ঘামে ক্ষয়ে যাওয়া ফতুয়ার পিঠে পড়ল প্রকাণ্ড এক তালি—স্যাণ্ডেল জোড়া অচল করে খালি পায়েই অক্ষুণ্ণ প্রশংসার পথে হাঁটতে সুরু করলেন সুধীরবাবু। মনের খানিকটা সাচ্ছল্যও ফিরে পেলেন তিনি—ক্ষুধার্ত্তদের আহারের ব্যবস্থা করতে পারেন নি বলে যে অপরিসীম গ্লানি জমে উঠেছিল, শীতার্ত্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ করে তা যেন ধুয়ে মুছে গিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল মন।

কিন্তু অনেকদিন ধরে এ প্রায়শ্চিত্ত করবার বুঝি সুযোগ ছিলনা তাঁর। হাত বাড়াবার মতোও খুব বেশী হাত ফেলে রেখে যায়নি মন্বন্তর। বস্তা-বস্তা কম্বল জড় হয়ে উঠছিল সুধীরবাবুর ঘরে—দেবার লোক নেই, হাত পেতে এসে আর দাঁড়ায় না কেউ। গাঁয়ে গিয়ে বিতরণ করবেন কি না তাই ভাবছিলেন তিনি এখন। কিন্তু এ'কটা কম্বলে গাঁয়ের চাহিদা যদি না মেটে? কাকে দিয়ে, কাকে বাদ দেবেন? যা দিয়ে সবাইকে খুসী করা যায়না তা নিয়ে কি করে তিনি গাঁয়ে ঢুকবেন? বরাদ্দ বাড়াবার দরবার চলতে পারে, হয়ত খানিকটা বাড়তেও পারে বরাদ্দ কিন্তু সমস্ত গাঁয়ের লোককে খুসী করবার মতো ত বাড়তে পারে না! আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়তে সুরু করেন সুধীরবাবু—বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকেন কম্বলগুলোর দিকে—আবর্জ্জনার মতোই তাঁর ঘরের অনেকটা জায়গা দখল করে আছে কতোগুলো অকেজো বোঝা! চোখে বিরক্তি আসে—বিরক্তির বিষ ছড়িয়ে যায় মনে। তারপর মনে উঁকি দিতে থাকে যেখানকার বোঝা সেখানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবার কথা।

সুধীরবাবু কম্বলগুলো গুণতে সুরু করে দিলেন। শাণিত সততার সতর্ক আঙুল কাজ করে চলল অনেকক্ষণ ধরে। একি? তাঁর ভুল নয়—দুটো কম্বল নেই। খাতাপত্তর চিট-চিরকুট নিয়ে খানিকটা সময় কেটে গেল—দরকার ছিলনা, নির্ভুল হিসেব তাঁর মনেই আছে—তবু মনকে বিশ্বাস করতে চাইলেননা তিনি। মন বিশ্বাসহন্তা হয়নি—সত্যি একজোড়া কম্বল কম।

উত্তপ্ত হয়ে উঠতেন সুধীরবাবু, হিসেবের জট খুলে দিলেন এসে স্ত্রী।

"দুটো কম্বল পাওয়া যাচ্ছেনা—" উদভ্রান্ত চোখে সুধীরবাবু স্ত্রীর কাছে নালিশ জানালেন।

"তারি জন্যে এতো ছট্‌ফট্ করছিলে এতোক্ষণ ধরে?" স্বামীর ছেলেমানুষিতে স্ত্রীদের স্বাভাবিক হাসি হাসলেন স্ত্রী।

"ও, তুমি তুলে রেখেছ?"

"বিমল সিলেট যাচ্ছে—ওর বোনের বিয়ের পাকা কথা আনতে—শীতে কষ্ট পাবে ভেবে দিয়ে দিলাম—"

"দিয়ে দিলে—পরের কম্বল—" একটা ঢোঁক গিলতে ইচ্ছা করছিল সুধীরবাবুর কিন্তু তাতে বোধহয় নিজেকে বড় বেশি অসহায় করে তোলা হয়, তাই তিনি সামলে গেলেন।

"দুটোত কম্বল—ও আর কি?—বিলিয়েছও ত কতো—" এই সামান্য ব্যাপারে অনেক কথা বলতে রাজী নন স্ত্রী—তিনি চলে গেলেন।

সুধীরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন—একই ভাবে, অনেকক্ষণ। মনে হচ্ছিল তাঁর, যেন হাঁটতে পারবেননা,—একতাল লোহা বুঝি কেউ জড়িয়ে দিয়েছে পায়ের সঙ্গে।

চাকলাদারের কাপড়ের দোকানে এসে পৌঁছুলেন যখন সুধীরবাবু, তখনও পায়ে তাঁর অসীম ক্লান্তি। চাকলাদারের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়, তবু যেন চোখ তাঁর চিনতে পারছিলনা সমকর্ম্মীকে। যেন কোথায় যেতে যেতে অন্যমনস্কতায় হঠাৎ তিনি ঢুকে পড়েছেন এইখানে।

চাকলাদার কিলবিলিয়ে উঠল—খুসীতে কি ব্যবসায়িক তড়িৎশক্তির গুণে বলা যায়না—বসে থেকেই দুহাত বাড়িয়ে সুধীরবাবুকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন: "কি ভাগ্যি—আসুন আসুন সুধীরবাবু—"

সুধীরবাবু গদীর উপরই ছড়িয়ে বসে পড়লেন: "এক জোড়া কম্বল দেখাতে পারো ভাই—"

ফোঁস করে একটু হেসে মাথা নুইয়ে ফেলল চাকলাদার—যেন লজ্জায় আর সঙ্কোচে সে

মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাচ্ছে : "কম্বল ! শীতের কাপড় বলতে একটা ছেঁড়া ন্যাকরাও কি আছে দোকানে ? আপনার কাছে আর কি বলব—কাপড়চোপড়ের অবস্থা ত আপনার জানতে বাকি নেই !"

কাপড়-চোপড় নিয়ে কি অবস্থা যে চাকলাদাররা করে তুলছে তা জানতে সত্যি বাকি নেই সুধীরবাবুর। সমস্ত দেশের উপরই যখন অন্ধকার—বাজারের উপর সে অন্ধকারের ছায়া পড়বেনা কেন ! অবুঝের মতো সুধীরবাবু তাকিয়ে থাকেন—আলমারিগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে আনেন—প্রায় খালি আলমারি—খানকতক তাঁতের শাড়ি সন্তর্পণে সাজানো আছে শুধু।

"নেই ?" অবসন্ন চোখে বাইরে বিকেলের রোদের দিকে তাকালেন সুধীরবাবু।

"দেখছেন ত—দুটো চারটে তাঁতের শাড়ি ঝুলিয়ে দোকানের ইজ্জৎরক্ষা করছি—"

সুধীরবাবু মাথা নাড়তে লাগ্‌লেন।

"তা-ও কোয়ালিটি-শাড়ি নেই। এক-আধখানা যা ছিল তা-নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি !" চক্‌চক্ করে উঠল চাকলাদারের চোখ—যেন কাড়াকাড়ির দৃশ্যটা সে চোখের সামনে উপভোগ করছে।

"আচ্ছা—" উঠে দাঁড়ালেন সুধীরবাবু।

সঙ্গে-সঙ্গে চাক্‌লাদারও দাঁড়িয়ে গেল। দোকানের বাইরে এসে সুধীরবাবু জান্‌তে পারলেন, শুধু দাঁড়ানই নয়, তাঁর পেছনে-পেছনেও আস্‌ছে চাকলাদার। আপ্যায়নের ঘটায় কেমন একটু সঙ্কোচই অনুভব করলেন তিনি মনে-মনে।

"খুকীরা এসে আজ একটা শাড়ি নিয়ে গেল—বল্‌লে আপনার একাউন্টে দামটা লিখে রাখতে—ভালো শাড়ি—কার বিয়েতে দেবে বল্‌ছিল—ওরা বলেই যোগারযন্তর করে এনে দিলাম—এ-মাল ঢাকার বাজারেও আজকাল পাওয়া যাবে না !" পরার্থপরতায় দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা পর্য্যন্ত মোলায়েম করে আন্‌লে চাকলাদার।

"কতো দাম ?" সুধীরবাবুর গলা থেকে একটা ফাঁপা আওয়াজ বেরুল।

"ওরা বল্‌লে কি না দামের জন্যে ভাববেন না !—তবু আমি ত আর কালোবাজারের দাঁতবসানো দাম নিতে পারিনে, আর কিন্‌ছেন যখন আপনি—পঁয়ষট্টি টাকা—ও শাড়ির দাম, আপনাকে কি বলব, কলকাতায় দেড়শ' টাকা থেকে একটি পাই নড়চড় হবে না !"—

"টাকাটা কবে চাই—" নিজেকে সুস্থ করে নিয়ে হাল্কা গলায় বলতে চাইলেন সুধীরবাবু।

"টাকার জন্যে ভাবনা কি ছিল—" চকিতে মুখটা অপরাধীর মতো করে তুল্‌ল

চাকলাদার: "ময়নামতী আর টাঙ্গাইল থেকে দু'দুটো চালানি এসে পড়েছে এ সপ্তাহে—মুস্কিলে পড়ে গেছি একটু—"

"আচ্ছা দেখছি—" জোর করে অনেকখানি উত্তেজনা এনে বল্‌তে হল সুধীরবাবুকে। সেই উত্তেজনার বশেই তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেখান থেকে চলে আস্‌তে পারলেন। কিন্তু সেখান থেকে এসে কোথায় যে যাওয়া যায় তা ভাবতে গিয়ে মনে হল পা'দুটো ভারি হয়ে উঠেছে। কোথাও যাওয়া যায় না—যাবার শক্তিই ফুরিয়ে গেছে যেন। সরকারী পুকুরের ধারে বেঞ্চিটার কথা মনে পড়্‌ল সুধীরবাবুর। হয়ত ওতে একটু জায়গা পাওয়া যাবে—ওখানে বসবার দরকার হয়ত তাঁর মতো আজ আর কারো নেই।

বাসায় ফিরে এলেন সুধীরবাবু সন্ধ্যার অনেক পরে। পাশের ঘরে তীব্র আলো জ্বল্‌ছে—শোনা যাচ্ছে গীতার তীব্রতর হাসি। আর কে-কে আছে ও-ঘরে? অদ্ভুত এই প্রশ্নের উত্তরে সুধীরবাবুর মনে পড়্‌ল রুবির নাম—রুবি, আর সীতা, বিমল—তাঁর স্ত্রী-ও হয়ত আছেন। চুপিচুপি সবার অলক্ষ্যে এসে তিনি নিজের ঘরে ঢুক্‌লেন। অন্ধকারে, কম্বলের বস্তায় ঘরটাকে চোরাবাজারের গুদামের মতোই দেখাচ্ছিল।

ধর্ম্মের স্বরূপ

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস্-সি.

ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নানাজনে এত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন যে অতি আগ্রহশীল মানুষের শেষ পর্য্যন্ত তা জানবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হয়। যাঁর যা খুসী তিনি তা-ই বলেছেন, আর আমরাও আমাদের পছন্দমত একের বা অন্যের পক্ষাবলম্বন করে যুক্তির বেড়াজালে নিজেদেরকেই জড়িয়ে ফেলেছি। সাধারণতঃ যিনি যখন যা বলেছেন আমরাও তা-ই মেনে নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছি।

সন্দেহবাদী ডেভিড হিউম যখন বলেছেন **দর্শনই ধর্ম্ম**, আমরাও তাতে সায় দিয়েছি। আবার ইমানুয়েল কান্টের 'সমালোচনী' পড়ে আমাদের ধারণা হয়েছে **ধর্ম্ম কেবল নীতিবোধ**। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন **ধর্ম্ম হল জ্ঞানের অনধিগম্য**, অগাষ্ট কোঁতের মতে তা হল শুধু **কুসংস্কার**; আর অগাষ্টিন স্মেটানার যুক্তিতে **মানবতা এবং সৃজনী স্পৃহাই ধর্ম্মের স্বরূপ**। আমরাও সংস্কারহীন চিত্তে একটির পর একটি মতকে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন বিরোধ নেই—সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কোন আপোষ-মীমাংসা বা সংহতি সংস্থাপনেরও প্রয়োজন নেই।* অনেকে কাল্পনিক বিরোধ ধরে নিয়ে তারই আপোষের প্রচেষ্টায় অকারণ বাক্য-বিন্যাস করে থাকেন। ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানীকে নিয়ে কোন গোলযোগ নেই। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত হয়ে থাকে তার জন্যে সাধারণতঃ দার্শনিকই দায়ী। ফলে নাস্তিক এবং আস্তিকের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু মাসারিক বলেছেন, সত্যিকারের নাস্তিক বলে কেউ নেই—আমাদেরই পরিকল্পিত দেবতাটিকে মেনে নিতে না পারলে আমরা তাকে নাস্তিক বলে অভিহিত করতে পারি। 'Surely the rejection of God is not yet atheism. Real atheism, positive atheism is a rare herb'.

আমরা অবশ্য নাস্তিকতা নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার করতে বসি নি। বিজ্ঞানী নাস্তিক অথবা আস্তিক তা-ও আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ সেটা তাঁর বা তাঁদেরই

* জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বাশায় "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য।.........লেখক

নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করার ইতিহাসটি ভারী সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন কোঁতে। তাঁর 'law of three stages' বা 'তিন স্তরে ঈশ্বর' হল এই :—

সূচনায় আদিম মানুষ সকল পদার্থের মধ্যে—এমন কি জড়ের মধ্যেও—প্রাণবস্তের অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করত।

দ্বিতীয় স্তর হল, যা কিছু তার বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হত তাকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করত। এইভাবে বহু ঈশ্বরবাদের জন্ম হয়েছিল।

পরবর্ত্তী স্তরে চিন্তাধারার ক্রম-বিবর্ত্তন অনুযায়ী মানুষ একেশ্বরবাদী হয়ে উঠেছে।

কোঁতের প্রত্যক্ষবাদে (Positivism) বিশ্বমানবই একমাত্র উপাস্যদেবতা। 'প্রেম আমাদের মূল তত্ত্ব, শৃঙ্খলা আমাদের ভিত্তি এবং উন্নতি আমাদের লক্ষ্য'। কোঁতে কার্য্য-কারকের অনুসন্ধান থেকে নিবৃত্ত হতে চেয়েছেন। কারণ জ্ঞান হল প্রধানতঃ অনুমান।

ফরাসী-বিপ্লবের কালে রুসোর মুখে আমরা শুনতে পেলাম—কৃষকের উন্নতিবিধানই ধর্ম্ম। সংস্কৃতিতে কাজ নেই,—আরণ্য প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তনই শ্রেয়ঃ।

এর পর এলেন হার্ডার নূতনতর ধর্ম্মের বাণী নিয়ে। তিনি বলেছেন মনুষ্যত্বই ধর্ম্ম। জ্ঞান এবং শিক্ষার দ্বারা এই মনুষ্যত্ব অর্জ্জিত হয়ে থাকে। কাব্য, দর্শন ও ইতিহাস এই ত্রয়ীর (sacred triangle) মধ্যেই জাতি তথা মানুষের আত্মা নিহিত থাকে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই ধর্ম্ম ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে—কল্পিত দেবতা পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে সরে গেছে অনেক দূরে—দেবতা কখনো দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় কখনো এই পৃথিবীরই সুখ-দুঃখ কাতর মানুষ হয়ে উঠেছে।

অথচ ধর্ম্ম শুধু অলস চিন্তা মাত্র নয়—শুধু বাক্-চাতুর্য্যপূর্ণ হিতোপদেশ নয়—এ হল সমগ্র জীবন। জীবনের সমস্ত আবেগ এবং অনুভূতি সকল উচ্ছলতা ধর্ম্মের আশ্রয়ে শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে। মানুষ যে শুধু কল্পনা-প্রবণ বলেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করে থাকে তা নয়। চির-চঞ্চল কর্ম্মব্যস্ত স্নেহপ্রবণ মন ধর্ম্মের মধ্যে পরম পরিতোষ লাভ করে। ধর্ম্ম শুধু যে তার যুক্তিতর্কগুলিকে নিবৃত্ত করে তা নয়, তার চিন্তা এবং অনুভূতি ধর্ম্মের সাগরসঙ্গমে চরম পরিণতি লাভ করে। মাসারিক বলেছেন, "Religion is equally scientific, aesthetic and practical, uniting radically philosophy, poetry and politics ; by a universal synthesis of religion, the study of truth is systematized, the instinct of beauty is idealized and finally good is done. In religion all reality is condensed". ধর্ম্ম সমানভাবেই বিজ্ঞানসম্মত রসপূর্ণ এবং বাস্তব। দর্শন, কাব্য ও রাজনীতি মূলগতভাবে ধর্ম্মের দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ। ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন সংমিশ্রণী থেকে সত্যানুশীলনের ধারা নিরূপিত হয়, সৌন্দর্য্যবোধের

উদ্ভব হয় এবং বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়, ধর্ম্মের মধ্যেই সমস্ত বাস্তবতা অন্তর্নিহিত থাকে।

ধর্ম্মের মতবাদটাই মুখ্য নয়, সামাজিক কার্য্যধারাই ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ নিরূপণ করে থাকে। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী যা-ই কেন বিশ্বাস করুক না তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু সকলকেই একত্রীভূত হতে হবে কোন এক প্রতীক পূজায়— সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শগুলিকে সফল এবং কার্য্যকরী করে তুলতে হলে তাদের সকলকে একসঙ্গে হাত মেলাতে হবে। যতক্ষণ তারা এই ধর্ম্ম পালন করছে ততক্ষণ তাদের ব্যক্তিগত রুচি এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

স্যেটানার মতে ধর্ম্ম কালক্রমে আর্ট বা কলাবিশেষে পর্য্যবসিত হবে—এই কলা-সৃজনীর মধ্যেই ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হবে। ললিতকলা সৃষ্টিতে যে আনন্দ তা নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির নয়—তা হল প্রাণময়, সক্রিয়, চঞ্চল। ধর্ম্মের যুগে মানুষ যেমন দেবতা তৈরী করেছে, ধর্ম্ম-যুগের অবসানে (post-religious period) সে তেমনই সৃষ্টি করবে জড়পদার্থ—পৃথিবী। মানুষ তার এই চারু-শিল্পকে নিয়ে সমগ্র জগৎকে মহিমামণ্ডিত করে তুলবে—সর্ব্বোত্তমের, পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁদের মধ্যে কোন গোঁড়ামি নেই, আবার কোন রকম ঔদাসীন্যও নেই, তাঁদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে যিনি ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন তিনি দেখতে পান ধর্ম্ম হল মানুষের এমন এক ধরণের কার্য্যাবলী যা মানুষের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে তার আবেগময় (emotional) জীবনের সংহতি স্থাপনের প্রয়াস করছে। তিনি ধর্ম্ম-জীবনকে মনোবিজ্ঞানীর অভিনব প্রক্রিয়া দিয়ে বিশ্লেষণ করে থাকেন। উইলিয়ম জেম্‌স্-এর "Varieties of religious experience" থেকে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে যিনি ধর্ম্মকে অনুশীলন করে থাকেন তাঁর কাছে ধর্ম্ম হল এমন এক ধরণের কাব্য বা কবিতা যার মধ্যে মানব-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মরূপ কাব্য—এই বিরাট কল্পনাময় সৃষ্টি দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরকে আকাশের ন্যায় দিগন্তব্যাপী বিস্তৃতির সুযোগ প্রদান করে, বৃহত্তরের সন্ধান দেয়। সান্তায়নের লেখায় আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। তাঁর মতে ধর্ম্ম হল একটা কল্পিত পাওয়া—একটা বড়োদরের শিল্প—একটা চমৎকার কবিতা যার আবৃত্তি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। ধর্ম্মের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা যা আছে তা হল তার গৌরববর্দ্ধনকারী অলঙ্কার বিশেষ—তার মধ্যেই তো ধর্ম্ম-শিল্পের সৌন্দর্য্য রয়েছে নিহিত। ধর্ম্মকে আনুষ্ঠানিক বলে

বর্জ্জন করতে হবে ? কেন ? ধর্ম্ম তো রূপকথা—রূপক মাত্র। যুগ যুগ ধরে যে কাব্য-কাহিনী মানুষের মনে আনন্দ-রস পরিবেষণ করে এসেছে তার মধ্যে সত্য যদি কিছু না-ও থাকে, তবু কি আমরা পারি তাকে বর্জ্জন করতে ? অন্ততঃ শিল্প হিসাবেও কি তা গ্রহণ-যোগ্য নয় ? ধর্ম্মের ইতিহাস তো জীবনের অভিযাত্রারই কাহিনী—সে ইতিহাস সময়ের অনুপাত অর্থাৎ সন তারিখ নিয়ে রচিত নয়, চিরন্তন সুখ-দুঃখ ভাঙা-গড়া নিয়ে লেখা। ধর্ম্ম হল সম্পূর্ণ জীবনের পূর্ণ পৃথিবীর আদর্শ নিয়ে দক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি—সেই ছবি দেখে যেন সকল সঙ্কীর্ণতা সমস্ত সীমারেখা বিলীয়মান হয়ে যায়। এই ধর্ম্মের সঙ্গে এই কল্পনার সঙ্গে সত্যের বা বাস্তবের সংস্রব না-ও থাকতে পারে, তবু গবেষণাগারে এ ছবির কোন মূল্য নেই বলে আমরা যদি অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালবোধে ছিঁড়ে ফেলি, তাহলে মূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হবে। সবই যখন রূপকমাত্র কোন ধর্ম্মই যখন যথার্থ সত্য নয়—তখন প্রাচীন কাল থেকে যে সমৃদ্ধশালী সুন্দর শিল্পটি চলে আসছে তাকে অন্ততঃ প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক সম্পদের মধ্যে গণ্য না করে হারাতে যাই কেন !

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ধর্ম্ম হল প্রধানতঃ সামাজিক আদর্শবাদ। এই আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা নূতন জগৎ গড়ে তোলবার প্রয়াস পাই—ভুলে যাই পার্থিব সম্পদ-আনন্দ উপভোগের কথা--ব্রতী হই বিশ্বজনীন প্রেমের সার্ব্বজনীন কল্যাণের সাধনায়। এই ধর্ম্ম আমাদের স্বর্গের পথকে সুগম করবার জন্যে নয়, অথবা অতীত যুগের কাব্যশিল্পেরও প্রতীক নয়—এই আদর্শবাদ শেখায় মানুষকে শ্রদ্ধা করতে, রচনা করে এই মাটির পৃথিবীতেই ঈপ্সিত মোক্ষধাম।

নীতি এবং প্রেম (Law and Love) উভয়ের কাজ প্রায় একই রকম। দুই-ই মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। নীতির অনুশাসনে পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, আবার প্রেমের উচ্ছ্বাসে সব ভুলে গিয়ে মানুষ শত্রুকে আলিঙ্গন করে। নীতির দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় মানুষ গণ্ডীবদ্ধ, তাই তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেও একটা নির্দ্দিষ্ট ধরণের সীমারেখা অঙ্কিত থাকে। কিন্তু প্রেমের দিক থেকে দেখলে মনে হয় মানুষ যেন স্বর্গীয়—তাদের সম্বন্ধ যেন সীমাহীন ধরা-বাঁধা নিয়ম-কানুনের বহির্ভূত। তাই প্রেম হল ধর্ম্মের প্রাণ আর নীতি হল তার প্রাণময় রূপ।

পঙ্গু

রমাপদ চৌধুরী

"চমকে উঠবে জানি। ভাববে হয়তো, আনুর এ আবার এক নতুন খেলা। বিশ্বাস করো তুমি, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় পল্‌কা সূতোর বাঁধন নয়। অনেকগুলো বছর পিছনে ফেলে এসেছি বলেই যে আমার মন থেকে মুছে গেছে সেই সব সুমধুর দিনগুলো তা ভেবো না। আজো অনেক নির্জ্জন রাতে অতীতের স্মৃতি জেগে ওঠে মনের কোণে। বিগত প্রেমকে রোমন্থন করে কোনদিন পাই উজ্জ্বল আনন্দ, আবার কোনদিন বা নিজেকে বিচার করি রূঢ় আবেগে। ওগো, আমার কথাটা আজ অন্ততঃ বিশ্বাস করো, আজতো আমার আর কোন স্বার্থ নেই, যাচ্ছিনা তোমার দোরে ভিক্ষার ভাঁড় হাতে। তবু শোনো, আজো নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। অবিচার তোমার ওপর হয়তো করেছি, কিন্তু তার চেয়ে বেশি অবিচার করেছি নিজের ওপর। বাইরের লোকের মত তুমিও দেখেছো শুধু সাড়ী চাদরের সামাজিক গাঁটছড়া, তুমি তো জানো না বাইরের খুশীর মুখোস এঁটে আমি এগিয়ে চলেছি আত্মধ্বংসের পথে। বহুদিন থেকে ভাবছি তোমাকে জানাবো আমার সত্যি পরিচয়, খুলে দেখাবো আমার সত্যিকারের রূপ। কিন্তু, জানো তো আজ আমাকে হেঁটে বেড়াতে হয় আর একজনের পায়ে ভর করে ভর দিয়ে। অতীতের সে আনু কি আর বেঁচে আছে! আনুর যেটুকু বেঁচে আছে সেটুকুকে তিল তিল করে আত্মাহুতির আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্যেই তো আমার এ সাধনা। কিন্তু তুমি এ কি করছো, একাকীত্বের অভিশাপে নিজেকে টেনে আনার মধ্যে কিসের সার্থকতা দেখতে পেয়েছো তুমি। ওগো লক্ষীটি, না এ ভাবে নিজেকে নষ্ট করো না তুমি। তোমার আশা, তোমার আকাঙ্ক্ষা,—তোমার পার্থিব জীবনের সুখদুঃখের ভার দাও আর একজনকে, হাল্কা মনে এগিয়ে চলো তুমি তোমার শিল্পসাধনার পথে, সম্পূর্ণতার দিকে, তবেই তো আমি বুঝবো তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো।

তোমার বিদ্রূপের ভয়ে নয়, ভালবাসা জানাবার অধিকার নেই বলেই সে বিষয়ে নিশ্চুপ রইলুম। ইতি তোমার আনু"

আনু! নামটা যেন ভুলেই গেছে অপর্ণা। আর শঙ্কর? হ্যাঁ, শঙ্করকেও তো ভুলেই গিয়েছিল সে এতদিন। নতুন করে গড়ে তুলেছিল সংসার। একটা যুগ কেটে

গেছে। এক মাটি থেকে আর এক মাটিতে, বনিয়াদের ভিত্তি ভেঙে বনস্পতির আওতায়। অতীতকে ভুলেছে অভ্যাসের অভিসারে, ঘন পরিচয় ভুলিয়েছে জীবনের ঘনিষ্ঠতর প্রেম। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে এসে লাগলো নতুন হাওয়া, নিরেট ভিৎ কেঁপে উঠলো আচমকা ঝড়ের দাপটে। তৃতীয় পক্ষের কাছে শোনা এক টুকরো উড়ো খবর। হয়তো মিথ্যে। আর হোক না কেন সত্যি, তাতেই বা অপর্ণার কি? তবু কেন জানি অভিমানের অশ্রু নামে চোখ ছাপিয়ে। না, অপর্ণা কাঁদবে না। বয়স হয়েছে তার, আছে স্বামী, আছে পুত্র কন্যা। হাওয়াই শাড়ী আর জর্জ্জেটের যুগ কেটে গেছে তার। কিন্তু, আঘাত দিয়ে আহতের জন্যে বেদনা বোধ করেনা কে! না, অবিচার সে করেছে শঙ্করের ওপর, প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। সংসার সে ভাঙবে না, অবিশ্বাসী হবে না স্বামীর কাছে, গ্লানিময় পৃথিবীতে ভাসাবে না ছেলে আর মেয়েকে। শুধু এক টুকরো চিঠি, দেবে নতুন উদ্দীপনা, জীবনের প্রথম প্রেমিককে ফিরিয়ে আনবে ব্যর্থতার পথ থেকে। প্রেম নয়, দেবে দূরের বন্ধুত্ব, হবে প্রোষিতসখী।

নীল কলমটা দাঁতে কামড়ে ভাবতে থাকে অপর্ণা আনমনে দোলাতে থাকে চঞ্চল পা দুখানা। মনে জড়ো হয় অনেক কথা, অনেক কাহিনী, অনেক কবিতা। চাঁদ আর পাহাড়, আকাশ আর আগুন।

চোখের সামনে, কল্পনায় দেখতে পায় সে নিজের চেহারা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাওয়া। নিজেরই সঙ্গে রসিক দৃষ্টি বিনিময়। হ্যাঁ, সে সব দিনের কথা আজো বেশ মনে পড়ে অপর্ণার। দুপাশে ফিতে বাঁধা একজোড়া সুপুষ্ট বেণী। কপালে কাঁচপোকার টিপ।

আচ্ছা, আজকাল তো কৈ আর কাঁচপোকার টিপ পরে না মেয়েরা! কাঁচপোকার টিপ হয়তো আধুনিক মেয়েদের কপালে মানান সই হবে না। সেই যে তাদের বেতফলের মত নীল চোখ। এরা আয়তনয়না নয়, এদের চটুল চাহনীতে নেই দুর্ব্বলতার সাড়া। তন্বী শ্যামা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠিদের যুগ কেটে গেছে। এ যুগ বহ্নিশিখার মত আতপ্ত, গণবধূদের নিলাজ সারল্য এ যুগের চোখে। তাই। তাই হয়তো ম্লানবিচিত্র কাঁচপোকার টিপ খাপ খায় না এদের কপালে। কে জানে এখনকার পুরুষরা হয়তো প্রশংসা করে ঐ সোনালী চাকতিগুলোকে।

শঙ্কর কিন্তু—

শঙ্করকে মনে পড়ে যায় অপর্ণার।

দোল-উৎসবের আবীর-আগুনের মত্ততায় আলাপ হয়েছিল ওদের পরস্পরের। আলাপের পর ভালো লাগা, ঘনিষ্ঠতা থেকে ভালবাসা।

প্রেম-জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আজো মনে আছে অপর্ণার। ভোলেনি কিছুই। শুধু বাইরের কর্ম্মকোলাহলের কুয়াশায় ব্যথিতস্মৃতির কণিকাগুলো চাপা পড়ে থাকে। দিনানুদৈনিক প্রয়োজনের তাগিদে অনেক অবিস্মরণীয় ঘটনাই ঢাকা থাকে বিস্মৃতি বাষ্পে।

ইস্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে কলেজ। বাইরের আলো-বাতাস মেখে সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকাতে শিখেছে তখন। সে দিনগুলো শঙ্করও কি মনে করে রেখেছে আজো? রেস্তরার কেবিনে পর্দ্দা টেনে দিয়ে গোপন আলাপ। পাশাপাশি গায়ে গা লাগিয়ে ট্রামবিহার। চওড়া ফুটপাথের ওপর দিয়ে তাদের যুগ্মযাত্রা। দোকানের শো-কেস, হ্যাঁ মার্কেটে কনফেকশনার্সের দোকান। চকোলেট আর চানাচুর। 'লষ্ট হরাইজনের' কোমল অন্ধকার থেকে কার্জ্জন পার্কের পাম গাছের উজ্জ্বল ছায়া। সত্যিই কি দশটা বছর কেটে গেছে তারপর? সন্দেহ হয় অপর্ণার।

—আচ্ছা, রোজ তো কলেজ পালিয়ে চলে আসছি, যদি বাড়ীতে জানতে পারে। কৌতুকের হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিল আনু।

—সত্যি কথাটা শুনিয়ে দিয়ে তাঁদেরই চোখের সামনে দিয়ে চলে আসবে।

—যত সহজ ভাবে বললে কাজটা কিন্তু তত সহজ নয়।

—আমার ওপর তোমার যদি সত্যিকারের ভালবাসা থাকে, কাজটা তা'হলে সহজই হয়ে দাঁড়াবে।

—ইচ্ছার জোরে দেড় ইঞ্চি চওড়া সেগুন কাঠের কপাট ভাঙা যায় না।

—প্রায় সাবালিকা কোন মেয়েকে তার বাপ মা তালা চাবি দিয়ে আটক রাখতে পারে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে এ উপদেশ তুমিই দিতে।

দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে, অপর্ণার যদ্দুর মনে পড়ে, এই একটিবারই সে শঙ্করকে তর্কে হারিয়েছিল। কথাটা খুব সত্যি বলেই হয়তো উত্তর দিতে পারে নি শঙ্কর। কথা ঘুরিয়ে বলেছিল, ইচ্ছার জোরে কপাট ভাঙা না যাক্, খোলা যায়। সত্যিকারের ভালবাসার জোরও কম নয়।

তা ঠিক। কিন্তু যে কথাটা সেদিন তার মনের মধ্যে পাক দিচ্ছিল তা কি শঙ্করের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো? বলতে চেয়েছিলো, মেয়েমানুষের মন হল পরগাছার মত। আশ্রয় আর অবলম্বন না হলে বাঁচে না। তাই দোসরকে বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে দাসী হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করে তারা।

আজকালকার মেয়েরা কিন্তু দাসী হয়ে থাকতে চায় না। সেবিকা নয়, হতে চায় সুখদুঃখের ভাগীদার। না, দশটা বছরের মধ্যে পৃথিবীটা এগিয়ে এসেছে অনেকখানি।

হ্যাঁ, এগিয়েই এসেছে। আজকের মত প্রাণ খুলে হাসতে পারতো সেদিনের মানুষ? জীবনটাকে অনেক হাল্কা চোখে দেখতে শিখেছে এরা। ভবিষ্যতের ভয়ে বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করে না। সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে এরা নিঃসন্দেহ। বিগত সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বর্ত্তমান সমাজকে বিচার করলে তো চলবে না। সংস্কৃতিটা বটের গুঁড়ির মত স্থিতিবান নয়। অটল অনড় পাহাড় নয়। চৈত্রের শেষে সংস্কৃতিরও পাতা ঝরে পড়ে, গজায় নতুন পাতা। গলে গলে পড়ে তুষারপুঞ্জ, জীবন পায় নতুন ঝর্ণা।

শঙ্কর কিন্তু বলতো অন্য কথা। বলতো, বাইরে যার অজস্রতা, অভাব তার অন্তরে। আনন্দের আতিশয্যটুকু নাকি লুকোনো ছদ্মবেশ। হয়তো সত্যিই তাই। তা না হলে— সেও তো বিয়ের পর পরেছে লাল বেনারসী, সেজেছে অজস্র অলঙ্কারে, মেখেছে প্রসাধন সামগ্রী। স্বামীর চোখে আর পৃথিবীর লোকের সামনে নিজেকে উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়াস তার মধ্যেও তো কম ছিল না। সুখী দম্পতির ছদ্মবেশ এঁটে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে পড়শিদের। কিন্তু, তার নিজের অন্তরকে তো সে ভালভাবেই জানে।

না। অপর্ণা ভেবে দেখে, সুখী না হোক্, অসুখীও সে এমন কিছু নয়। অন্ততঃ শঙ্করের সম্বন্ধে যে খবরটা পেলো আজই, তাতে মনে হয় না অপর্ণা তার বিগত দিনের প্রেমিকের চেয়ে বেশী অসুখী।

শঙ্করের জন্য আজ আপনা থেকেই কেমন যেন একটা ব্যথাবোধ জেগে ওঠে ওর মনে। অবিচার করা হয়েছে শঙ্করের ওপর, নিঃসন্দেহ। মাসখানেকের মধ্যে আসবে বলেই শঙ্কর বিদায় নিয়েছিল। আর, বিদায় নিবার সময় কৈ তাদের প্রেমে তো ধরে নি এতটুকু ভাঙন! প্রতিশ্রুতিও রেখেছিল শঙ্কর, মাসখানেক না হোক বছরখানেক পরে তো ফিরেছিল সে। অথচ—। না, শঙ্করের দোষ নেই। অপর্ণা তো জানতে চায় নি কি বিপর্য্যয় ঘটে গেছে তাদের পরিবারে। শুনতে চায় নি শঙ্করের আত্মস্খালনের যুক্তি। চিঠির দৌত্যে জানাবার উপায় থাকলে কি নিশ্চুপ থাকতো শঙ্কর। নির্যোগ পড়ে থাকতে দিতো তাদের ভালবাসা!

অভিমান! হ্যাঁ, অভিমান হয়েছিল অপর্ণার, আজো স্পষ্ট মনে পড়ে তার। কিন্তু এতখানি রূঢ় অভিমান, এমন আত্মধ্বংসী আক্রমণের তেজ কোথায় পেয়েছিল সে।

সতীর্থ শোভনলালের সঙ্গে আলাপে রত ছিল অপর্ণা। এমন সময় বাচ্চা চাকরটা এসে জানালে শঙ্করের আগমন।

শঙ্কর। নামটা শুনেই বহুদিনের চাপা-পড়া অনুরাগটা ক্রোধে পরিণত হ'ল। শঙ্করকে ডেকে আনতে বলে ধীরে ধীরে নিজের আসন ছেড়ে শোভনলালের পাশে গিয়ে

বসলে লম্বা কুশনটায়। ইচ্ছে করেই বোধ হয় আঁচলটা ঠেকিয়ে রেখেছিল শোভনের গায়ে।

—বস্থন শঙ্করবাবু।

শঙ্কর যেন একটু চমকেই উঠেছিল। এই নতুন সম্বোধনে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়েছিল শঙ্কর। ধীর স্থির লম্বা দেহটা তার কেদারায় ডুবিয়ে দিয়ে শঙ্কর মৃদু হেসে বললে, যাক্ চিনতে পেরেছো তা হলে?

অপর্ণা উত্তর দিয়েছিল, পরিচয় যত অল্প দিনেরই হোক্, আর চেহারার পরিবর্ত্তন যতখানিই থাক্, চাকরের মুখে নামটা আগে জানিয়ে দিলে চিনতে অস্থবিধা হয় না।

শোভনলাল বললে, আমাকে কি বোবার পাঠটাই—

—আরে তাই তো। উচ্ছ্বসিত হয়ে অপর্ণা বললে, ইনি শঙ্করবাবু, আর—শোভন-লালের দিকে অদ্ভুত মুদ্রায় হাতখানি বেঁকিয়ে বললে, শোভন, আবার—খানিকটা সময় নিয়ে, আমার বন্ধু।

শোভনবাবু নয়, শোভন। এবার শঙ্করের মত শোভনও চমকে উঠলো। পরক্ষণেই সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো তার চোখে। অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে পালাতে চাইলে সে।

বললে, আমি উঠছি, একটু কাজ আছে।

অপর্ণা বললে, উঠবে? আচ্ছা, তোমার জন্যে টিকিট কাটা আছে সিনেমার। সন্ধ্যের আগেই এসো, দু'জনে যাবো।

এ কথার জবাব দিলো না শোভন। দ্রুত চলে গেল সে।

মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবছিলো অপর্ণা। বেশ মনে পড়ে তার আজও।

হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরলো শঙ্কর। —কি মনে করেছো তুমি, দুটো নাটুকেপণার জোরে আমাকে বোকা বানাতে চাও?

—হাত ছাড়ো।

সত্যিকরেই হাত ছাড়াবার জন্যে একটা টান দিয়েছিলো অপর্ণা।

—না; আমার সব কথা না শুনলে ছাড়বো না।

—ছেড়ে দাও আমার হাত। বাড়ীতে বানিয়ে রাখা কথাগুলো গ্রামোফোনের মত বলে যাবে—তা শোনবার সময় নেই আমার।

হাতটা সত্যিই এবার ছেড়ে দিয়েছিলো শঙ্কর। মৃদু হেসেছিলো হয় তো সে অপর্ণার ব্যবহারে। কে জানে, মুখ তুলে তো দেখেনি অপর্ণা।

খানিক কেটেছিল বিশ্রী নীরবতায়।

তারপর শঙ্করই বলেছিল, তোমার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক আমু। কিন্তু রাগভঞ্জনের সুযোগটাই বা আমাকে দেবে না কেন?

—প্রয়োজন নেই, তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার ভেঙে গেছে।

—তাকে জোড়া লাগিয়ে নিলেই চলবে।

—না। যা ভেঙেচে তাকে জোড়া লাগিয়ে কাজ চালানো যায়, কিন্তু তা নতুনের মত হয় না।

এ কথার কোন উত্তর দেয় নি শঙ্কর।

অপর্ণা আবার বলেছিল, এইখানেই শেষ হয়ে যাক্ আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না আমি। অনেক যজমান তোমার, বছরে একবার করে প্রত্যেকের কাছে দক্ষিণা আদায় করে চলে যায় তোমার। আমার কিন্তু ভক্তি নেই তোমার ও গুরুগিরির ওপর।

শঙ্কর হয়তো শোনে নি এ কথা। হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, সত্যিই তুমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাও না আর ?

—না। ছোট বেলাকার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।

—আজকের ভুলটা আবার কবে বুঝবে ? শঙ্কর হেসেছিল প্রশ্ন করে।

অপর্ণা উত্তর দেয় নি।

এরপর অনেকক্ষণ গল্প করে কাটিয়েছিল শঙ্কর। সহজ মানুষের মত কথা বলেছিল, টানতে চায়নি অতীতের অন্তরঙ্গতা।

যাবার সময় একবার ফিরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়েছিল শঙ্কর। অপর্ণাও আর অনুরোধ জানায়নি, বলেনি, আবার এসো।

কিন্তু। আশ্চর্য্য ! অপর্ণা ভাবে, যে লোকটা তার প্রথম অভিনয়টুকু এত সহজে ধরতে পেরেছিল, সে আবার তার শেষের কথাগুলি কি করে ভাবলে সত্যিকারের মনে কথা !

বসে বসে ভাবতে থাকে অপর্ণা। চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ায়। পর্দ্দা সরিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের রাস্তার দিকে।

দূরের ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়েছে। এখনি আসবে তার ছোট ছেলে।

ছোট্ট মেয়েটিকে পেরাম্বুলেটরে বসিয়ে রেখে আয়াটা কোথায় গেল ! চারদিকে খুঁজলে অপর্ণা।

কিন্তু বুকের ভেতর এ ঝড়টা থামাবে কি করে ?

হ্যাঁ। চিঠি সে লিখবেই শঙ্করকে। ঠিকানার অভাবে বহুদিন ক্ষমা চাইতে পারে নি। আজ লিখবে সে চিঠি।

ঘড়িটার দিকে তাকালে অপর্ণা।

স্বামীর ফিরতে এখনো অনেক দেরী।

দ্রুত পায়ে এসে বসলে ছোট্ট টেবিলটার সামনে। টেনে নিলে কাগজ আর কলম।

নীল রঙের মোটা কাগজের ওপর সযত্নে সাজিয়ে চললো সুন্দর কয়েকটি বেগুনী রঙের আখর। অনুশোচনার সুর ঢেলে দিলে লেখনীর ডগায়।

চিঠি শেষ করে বার কয়েক পড়লে সেখানা। রঙিন ভারী খামের ভেতর পুরলে চিঠিখানা; ঠোঁটে ভিজিয়ে নিয়ে এঁটে দিলে খামটা। দেরাজ থেকে ষ্ট্যাম্প বের করে লাগালে। গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে ঠিকানা! তার নিজের ঠিকানা? না, চিঠির গায়েও না, খামের পায়েও না, লিখবে না কোথাও। আজ তো আর সেদিনের মত স্বাধীন নয়। তার স্বামী আছে সংসার আছে। আছে পুত্র কন্যা, সমাজ সংসার।

তাই। তাই হয়তো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল তার বুকটা।

ডাক দিলে বেয়ারাটার নাম ধরে। না, লিখেই যখন ফেলেছে তখন পাঠাবেই সে চিঠিখানা। কিই বা লিখেছে। অতি সাধারণ কয়েকটি কথা। এটুকু স্বাধীনতাও কি তার থাকবে না?

বেয়ারাটার খোঁজে নীচে নেমে এলো অপর্ণা। ঢুকলো রসুইখানায়। বাবুর্চিটা যদি থাকে তাকে দিয়েই পাঠিয়ে দেবে চিঠিটা।

ঐ তো চোখের সামনে চিঠির বাক্স। একবার মনে হয় নিজেই ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু। না, বাবুর্চিটাও বোধ হয় নেই।

গ্যাসের উনুন জ্বলছে গনগন করে। সুইচটা অফ করে দিয়ে যায় নি। দু'বার নাম ধরে ডাকলে বাবুর্চিকে। সাড়া পেল না।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো অপর্ণার। খোলা দরজাটার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে গ্যাসের আগুনে ধরলে চিঠিখানা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সেটা। আধপোড়া টুকরো একখানা উড়ে এসে পড়লো মেঝেতে। সেটা তুলে নিয়ে আবার ভালো করে আগুনে গুঁজে দিলে।

নিজেকে বেশ শান্ত বোধ করলে সে এতক্ষণে। মুক্ত বিহঙ্গের মত অদ্ভুত এক আনন্দ পেল অপর্ণা।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার বর্ত্তমান যন্ত্রসঙ্গীত

মণিলাল সেনশর্ম্মা

বাংলাদেশে যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চ্চা কেবল বর্ত্তমানে আরম্ভ হয়েছে বলবার আগে একটি কথা বিশেষ করে বলে দেওয়া দরকার যে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলায় যন্ত্রসঙ্গীত বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু সবেমাত্র তার চেষ্টা চলছে যা এতকাল উপেক্ষিত হয়েই এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "বাংলার বৈশিষ্ট্য যে অবিমিশ্র সঙ্গীতে নয় তার একটা প্রমাণ মেলে যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে। সঙ্গীতের বিশুদ্ধতম রূপ কিসে ? —না, যন্ত্র সঙ্গীতে। এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না ? কিন্তু দেখ, বাংলা দেশ কখনও …দের মত যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি ?" গানের চর্চ্চা বাংলায় যেমন হয়েছে যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চ্চা বাংলায় পূর্ব্বে কোন কালেই তেমন হয় নি। সব সময়েই যন্ত্রের চেয়ে গানের চর্চ্চাই বেশী করে হয়েছে। যন্ত্রের চর্চ্চা যতটুকু আমরা দেখি তা-ও কণ্ঠের অনুকরণ, অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করে নিয়েছে। শুধু যন্ত্রের স্বাধীন রূপ দেওয়ার চেষ্টা এখানে পূর্ব্বে হয় নি।

অনেক পূর্ব্বে কি ছিল সে বিষয় এখানে আলোচনা করব না। গত শতকের মাঝামাঝি হতে ইউরোপীয় ঐক্যতান বাদনের ঝোঁক তখনকার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এসেছিল। কিন্তু সেটি ছিল একেবারে তাদের নকল। তাদের যন্ত্র দিয়ে তাদের সুরকারের রচনা বাজিয়ে নেওয়ার দিকেই বিশেষ করে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। এখনও বাদ্যকরশ্রেণী বিয়ের মিছিলে পাশ্চাত্য মিলিটারী ব্যাণ্ডের বাজনা বাজিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটা সময়ে বাংলা দেশে তাদের যন্ত্র সঙ্গীতকে হুবহু নকল করার উৎসাহ এসেছিল। কিন্তু সে উৎসাহ বেশী দিন থাকেনি। কেন না বাংলাদেশ সে-সঙ্গীত গ্রহণ করে নি। অথচ তারা যন্ত্রসঙ্গীতের অন্য একটা বিশেষ রূপও দিতে সক্ষম হয় নি।

যন্ত্রসঙ্গীত একেবারেই ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়ীতে একক বাজনার যন্ত্র বাজনো চলেছিল। আর সে বাজনা-পদ্ধতি আমরা কিন্তু আগে মুঘল রাজত্ব কালে

হতে পেয়ে এসেছিলাম। রাজামহারাজাদের বাড়ীর মধ্যে দু একজন বাজিয়ে যাঁরা থাকতেন তাদের মধ্যেই সে বাজনা সীমাবদ্ধ ছিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তার প্রচলন ছিল না বললেই ঠিক বলা হবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যন্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-গণদের মধ্যে সঙ্গীতের আলোচনা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে ক্রমে যন্ত্র সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টি পড়েছে এই জন্যে যে সুকণ্ঠ না হলে গান না গেয়েও বাজনা নিয়ে সঙ্গীতালোচনা সম্ভব।

যন্ত্রসঙ্গীত চর্চ্চার পথেও নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হচ্ছে। তার প্রথম বিঘ্ন হচ্ছে এই যে, বাংলার সব সহরে যন্ত্র তৈরীর বা যন্ত্র মেরামত করার ব্যবস্থা নেই। যন্ত্র বাজিয়েদের পক্ষে তা একটি বিষম সমস্যা। তাছাড়া, যন্ত্র শিক্ষক কম, নেই বললেও চলে। একটি সহরে হয়ত একটি বেহালা বাজিয়ে আছেন, অথচ একজন সেতার শিখবেন বলে সেতার কিনে বসে আছেন। শেষ পর্য্যন্ত শিখবার আগ্রহ রইল না; সুরের উৎস শুকিয়েই গেল। মহানগরীতে সব ব্যবস্থা থাকলেও বাংলার অন্যান্য স্থানে ক্রমে যত দিন না সেরূপ ব্যবস্থা হবে ততদিন যন্ত্র সঙ্গীতের প্রসার হবে না। গান শিক্ষার্থীর পক্ষে যন্ত্র, যন্ত্র নির্ম্মাতা ও যন্ত্র মেরামত করার প্রশ্ন আসে না। অবশ্য সঙ্গৎকরার যন্ত্রটির মেরামত করা দরকার হয়। কিন্তু স্বরজ্ঞান হওয়ার পর স্বরলিপির সাহায্যে গান শিক্ষায় ব্যাঘাত হয় না এবং আগ্রহ থাকলে বেশ সহজে সাধারণ গান শিক্ষা সম্ভব হয়।

এসরাজ ও সেতার বাংলা দেশে এই শতকে মধ্যবিত্ত মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে চল্‌ছে। মাদ্রাজে কিন্তু বীণা ও বেহালা মধ্যবিত্ত মেয়েদের হাতে হাতে। সেখানকার ছেলেদের এগুলি ছাড়া বাঁশীও বিশেষ ভাবে শিক্ষা চল্‌ছে। দিনেন্দ্রনাথ এসরাজকে গানের সঙ্গে বাজাবার পক্ষপাতী ছিলেন। সে থেকে এসরাজ একটি ফ্যাসন হয়ে উঠেছিল—তার প্রয়োজনীয়তাকে আমি উপেক্ষা করছি না। কণ্ঠের সঙ্গে একটি যন্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে রয়েছে, আর যে যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাজানো হয় এমন যন্ত্র হলেই কার্য্যকরী হয়। তিনটি যন্ত্রকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সেগুলি হলো—সারেঙ্গী, এসরাজ ও বেহালা। এই তিনটি যন্ত্রের মধ্যে সারেঙ্গী নারীকণ্ঠের উপযোগী উৎকৃষ্ট সঙ্গৎ যন্ত্র। সে জন্যে উত্তর ভারতীয় সব গায়িকাগণই সারেঙ্গীকে তাদের গানের সহযোগী করে রেখেছেন। এক কালে এই সারেঙ্গী দক্ষিণ ভারতীয় গায়িকাদের সহযোগী থাকলেও বর্ত্তমানে সেখনকার সকলেই বেহালাকে তাদের সঙ্গৎ যন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে। হয়ত অনেকে ভুল করতে পারেন যে এই সারেঙ্গী যন্ত্রটি কেবল উত্তর ভারতীয় যন্ত্র কিন্তু Capt C. R. Day লিখিত The Music and Musical Instruments of Southern India (1891)

পুস্তকে এই সারেঙ্গীর বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে আর ত্রিবর্ণের হাতে-আঁকা ছবিও রয়েছে। তাছাড়া কলকাতার যাদুঘরে যে সব ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে তার গাইড (Guide to the Musical Instruments exhibited in the Indian Museum.) পুস্তিকাটিতেও সারেঙ্গীর ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লেখা আছে। সারেঙ্গীর আওয়াজ মেয়েসুলভ আর ইউরোপীয় Viola যন্ত্রের অনুরূপ। যা হোক বর্ত্তমানে সারেঙ্গী উত্তর ভারতীয় বাইজিদের মধ্যেই আবদ্ধ; সে জন্যে ভদ্রঘরের মেয়েদের এই যন্ত্রটির উপর একটু ঘৃণা থাকাও অসম্ভব নয়। যে কারণেই হোক সারেঙ্গীকে বাংলার ঘরে স্থান দেওয়া হয় নি। বাংলায় এসরাজই মেয়েদের কণ্ঠের সঙ্গৎ যন্ত্র। এসরাজের আওয়াজ বেহালার মত জোরালো নয় অথবা সারেঙ্গীর মত মেয়েসুলভও নয়। কিন্তু তা হলেও এসরাজের নিজস্ব একটি স্বর আছে। বর্ত্তমানে এই এসরাজের সঙ্গে ইলেক্টিট তার জুড়ে দিয়ে তার স্বরটুকুকে জোরালো করতে গিয়ে দেখা গেল তার স্বর 'সানাই'এর অনুরূপ হয়ে পড়েছে, সে জন্যে নামকরণ হয়েছে 'তার সানাই'।

বাংলায় সঙ্গীত শিখবার আগ্রহ আসবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাংলায় যন্ত্রসঙ্গীতের প্রসার করার ইচ্ছায় সেতারী এনায়েত খাঁকে স্থায়ীভাবে বাংলায় রাখবার ব্যবস্থা করেন। এই এনায়েত খাঁ বাংলা দেশে বিশ বৎসর থাকবার ফলে বর্ত্তমানে বাংলায় সেতার বাজনা বেশী চলছে। এনায়েত খাঁ কয়েক জন ছাত্র তৈরী করে রেখে গেছেন। আর এই ছাত্রগণ বর্ত্তমানে অনেক সেতার বাজিয়ে ছাত্রছাত্রী তৈরী করে নিয়েছে। তার ফলে বাংলায় বর্ত্তমানে এসরাজ বাজনার প্রচলন সেতার বাজনার চেয়ে কমে গিয়েছে। বর্ত্তমানে বাংলায় সেতার বাজনার ঝোঁকই বেশী। এনায়েত খাঁ সুরবাহার শিক্ষা দিয়ে দু একজন ছাত্র তৈরী করেছেন যারা বর্ত্তমানে ভারত-বিখ্যাত বাজিয়ে হয়ে উঠেছেন। এই সুরবাহার বাজনাও হয়ত এককালে ব্যাপকত্ব পাবে। বাংলাদেশ যদিও ভাল একটি সরোদ বাজিয়ের জন্ম দিয়েছে তবু তিনি (আলাউদ্দিন) মাইহর ষ্টেটে—বাংলার বাইরে থাকাতে বাংলায় সেতারের মত সরোদ বাজনার প্রচলন হয় নি। তবুও দু এক জন সরোদ বাজিয়ে ভারত-বিখ্যাত হয়েছেন। এক কালে সরোদ বাংলায় ছিল না বললেও চলে! বর্ত্তমানে সরোদ বাজনা শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু সেতারের মত কবে যে ঘরে ঘরে সরোদের বাজনা চলবে কে জানে!

বাংলায় সেতার চলছে খুব। খুবই বল্‌ব, কেন না তার আগে কোন কালে এত ছিল না। মাদ্রাজে কিন্তু সেতারের পরিবর্ত্তে বীণা বাজনারই বেশী প্রচলন। সেতার নেই বললেও চলে। সেতারও বীণা জাতীয় যন্ত্র। তার প্রাচীন নাম—চিত্রা বীণা। চিত্রা হতে চিতার, পরে সেতার হয়েছে অনুমান করা সহজ। অন্ততঃ সঙ্গীত রত্নাকরে

চিত্রাবীণার যে রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে সেতারের রূপের মিল রয়েছে। যা হোক—বীণা বাজনা বাংলায় নেই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর উত্তর ভারতের বিখ্যাত বীণা বাজিয়ে—দবীর খাঁকে বাংলায় স্থায়ীভাবে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু এখনও তেমন ছাত্র তৈরী সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া বীণা বাজনা সহজ নয় আর সে যন্ত্রটি সেতার এসরাজ হতে দুর্ম্মূল্য আর কষ্টলভ্য। কিন্তু বীণা বাজনার প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালোরের বীণা বাজনা পদ্ধতি বাংলায় বিশেষ করে প্রচলন হওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল।

বাংলায় বেহালা বাজিয়ে নেই। এমন কি উত্তর ভারতের কোথাও ভাল বেহালা বাজিয়ে নেই। দক্ষিণ ভারতে বেহলার বেশ প্রচলন—যেমন বাংলায় এসরাজের। দক্ষিণী যন্ত্রী অন্ততঃ অন্যান্য প্রদেশের বাজিয়েগণ হতে ভাল বেহালা বাজায়। কিন্তু একমাত্র গোয়ার অধিবাসীগণই বলতে পারে ভারতে তারাই বেহালা বাজিয়ে হিসাবে শ্রেষ্ঠ। ইউরোপীয় বাজিয়েগণ বেহালা বাজনার মান এত উঁচুতে বেঁধে রেখেছেন যে তাদের বাজনা শুনে অভ্যস্তদের কানে বাংলার বাজিয়েদের ছড় ঘসা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে; অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

সানাই বাংলায় নেই। পেশাদার বাজিয়ে দলের দুএকজন সানাই বাজানো শিখে থাকে—পূজা পার্ব্বণে বিয়েতে ও উৎসবে রসন চৌকি একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে বলে। মহানগরীতে ভাল সানাই বাজিয়ে উত্তর ভারত হতে ভাড়া করে আনা হয় আর সে বাজনা শুনে সঙ্গীতজ্ঞগণ সানাই বাজনার মানটুকু ধরে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলার জেলা সহরে বা গ্রামে সানাইএর আওয়াজ কোলাহলেরই সৃষ্টি করে মাত্র। এই সানাইএর পরিবর্ত্তে বাজিয়েদলগুলি ক্লেরিওনেট, কর্ণেট, ব্যাক্‌পাইপ গ্রহণ করেছে। এতে সানাই বাংলা হতে উঠে গিয়েছে। কিন্তু মাদ্রাজে সানাই নাগস্বরম (সেখানে সানাই বলে না) বাজিয়ে আছে আর বাংলার তুলনায় সেখানকার নাগস্বরমের মান অনেক উঁচুতে। মাদ্রাজে মুরলী—বাঁশের বাঁশী বাজনার বেশ প্রচলন। বাংলায় এক ত্রিপুরা ছাড়া অন্য কোন জেলায় সেরূপ নেই। ত্রিপুরার বাঁশীর বিশেষত্ব আছে। সেগুলি আড়বাঁশী বা সাধারণ বাঁশী হতে বিভিন্ন। বাংলায় কলেজ হোষ্টেলে সুররসিক ছাত্রদের হাতে দুএকটি বাঁশী দেখতে পেলেও পেশা হিসাবে বাঁশীর চল খুব কম নিয়েছে। বর্ত্তমানে সারা বাংলায় দু'একজক মাত্র বাঁশী বাজিয়ে আছেন। বাংলায় ফুংকার যন্ত্রের প্রচলন নেই বললেও চলে। দক্ষিণ ভারতে সে তুলনায় তা খুবই বেশী।

গানের সঙ্গে অথবা বাজনার সঙ্গে তাল যন্ত্র বাজিয়ে ছন্দ রাখবার রীতি এতকাল প্রচলিত থাকাতে পাখোয়াজ, বায়া-তবলা ও খোল বাজনার চর্চ্চা প্রায় প্রতি গ্রামে গ্রামেই

আছে। কিন্তু পাখোয়াজ যন্ত্র বাজনা পূর্ব্বে থাকলেও বর্ত্তমানে ধ্রুপদ গান রীতি লোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখোয়াজ বাজনার চর্চ্চা আর নেই। খোল বাজনায় বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ বাজিয়ে—নবদ্বীপ ব্রজবাসীর ও তাঁর গুটি কয়েক ছাত্রের জন্য খোল বাজনায় বাংলা সম্মান পাবার যোগ্য। কিন্তু বাংলার অন্যান্য স্থানে কীর্ত্তন পঙ্কিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোল বাজনার মানও অনেক নীচুতে নেমে এসেছে। বাংলা বায়া তবলা বাজিয়ের জন্ম দিয়েছে। পূর্ব্বেও দু একজন বিখ্যাত বাজিয়ে ছিলেন এখনও বেশ কয়েকজন আছেন। তালযন্ত্র বাজিয়েদের 'খুলি আওয়াজ' ও 'মুদি আওয়াজ' দুরকম চেষ্টা আছে। খুলি আওয়াজ বল্‌লে উন্মুক্ত ধ্বনি—অর্থাৎ খোলা আওয়াজ আর মুদি আওয়াজ বলতে চাপা আওয়াজ বুঝায়। বাংলায় বারাণসী বৃন্দাবন মথুরার মত খুলি আওয়াজ পদ্ধতিরই প্রচলন। দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ-এর মুদি আওয়াজ পদ্ধতিই বৈশিষ্ট্য।

সেতার, এসরাজ, সরোদ প্রভৃতি যন্ত্র একক বাজনা এতকাল বাংলায় এক রীতিতে চলে আস্‌ছে। প্রথমে একটুখানি আলাপন তারপর গৎ ধরবে, সঙ্গে বায়া তবলার ঠেকা চলবে। ক্রমে বাজনার গতি দ্রুত হতে থাকবে ক্রমে দুনে, চৌদুনে বাজাবে। এ পদ্ধতি বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ছে। বর্ত্তমানে তিমিরবরণের একক সরোদ বাজনা বাজাবার পদ্ধতির পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য। একঘেয়েত্ব নষ্ট করার দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রশংসনীয়।

আমাদের যন্ত্রগুলির আওয়াজ জোরালো নয়। কি করে যন্ত্রের ধ্বনি বাড়ানো সম্ভব সেদিকে কেউ আজ পর্য্যন্ত চেষ্টাই করেনি। বীণা সেতার এসরাজ প্রভৃতির সাধারণ আওয়াজ ক্ষীণ হওয়াতে ঘরের কোণে বাজানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক ধ্বনিবর্দ্ধক সংযোগ করে বাদ্যধ্বনি সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচর করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এতে যন্ত্রের স্বরের কোমলত্ব থাকে না। Dr. A, M. Meerwarth এককালে লিখেছিলেন "On the other hand—and this is also typically Indian and totally different from European usage—he lavishes much care and skill on the decoration of his instruments. It is not rare to find an instrument the sound qualities of which are far from satisfactory, covered with beautiful carvings or inlaid with ivory and mother of pearls". কথাটি সম্বন্ধে সকলেরই একমত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যন্ত্রের ধ্বনিগুলির একটা সমতা, সামঞ্জস্য আনবার কোন চেষ্টা না থাকাতে—যন্ত্রীসঙ্ঘ তৈরী হয়নি এত কাল।

বাংলায় যন্ত্রসঙ্ঘ তৈরীর দিকে চেষ্টা চলে মাত্র পনর বৎসর আগে। তার আগে যে সব কনসার্ট হতো সেগুলি "কর্ণ-সাট্" করেই দিত। মধুরত্ব কিছু ছিল না। এই পনর বৎসর আগে নৃত্যের পুনরুত্থান হওয়ার এবং পরে সিনেমার তাগিদে

অর্কেষ্টা তৈরীর চেষ্টা চলতে থাকে। এ যুগে প্রথম আলাউদ্দিন মাইহর ব্যাণ্ড তৈরী করলেও বাংলা দেশের বাইরে তার উৎপত্তি হওয়াতে বাংলা তার কোন ফল পায়নি। উদয়শঙ্কর তাঁর নাচের সঙ্গে ভারতীয় যন্ত্রে নতুন ধ্বনি সংযোগ করার মানসে যখন তিমির-বরণকে যন্ত্রসঙ্ঘ তৈরীর জন্য গ্রহণ করেছিলেন সে সময় হতে বাংলায় অর্কেষ্ট্রা তৈরীর চেষ্টা চলতে থাকে। এই সম্প্রদায় প্রায় সারা পৃথিবীতে ভারতীয় যন্ত্র ও তার ধ্বনিমাধুর্য্যকে পরিচয় করিয়ে দেয়। সমসাময়িক অর্কেষ্ট্রা পরিচালক অম্বিকা মজুমদারও 'মেনকা'র নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরে অনেক স্থানে ভারতীয় যন্ত্র সমাবেশ প্রদর্শন করেছেন।

তারপর দেখতে পাই শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস তাঁর যন্ত্রসঙ্ঘ রচনা করে রেডিয়ো ও রেকর্ড প্রতিষ্ঠানগুলিতে যন্ত্রধ্বনি সংযোগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমবেত যন্ত্রধ্বনি বিশেষ করে বর্ত্তমান কালে আসে সবাকচিত্রশিল্পের তাগিদে। রাইচাঁদ বড়াল সিনেমায় পর পর নানাবিধ যন্ত্রী দিয়ে এদিকে নানারূপ চেষ্টা করতে থাকেন। তার ফলে অর্কেষ্ট্রার যন্ত্রধ্বনি ক্রমে অজ্ঞাতে সাধারণের মনে স্থান করে নিয়েছে। সুরেন্দ্রলাল শুধু ভারতীয় প্রচলিত যন্ত্র নিয়ে যন্ত্রসঙ্ঘ গঠন করাতে সেটি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। আমাদের যন্ত্র গুলির অক্ষমতাও তার কারণ হতে পারে। সে ভুল যে অন্যেরা প্রমাণ না করেছিলেন তা নয় তবে পরে সকলেই বিদেশীয় যন্ত্র গ্রহণ করে সেগুলির ধ্বনির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের যুক্তধ্বনির অভিজ্ঞতা এখনও গ্রহণ না করাতে তুলনায় আমাদের সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত সুরজ্ঞের প্রাণে আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলায় নৃত্যের পুনরুত্থান করাতে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমিত হলেও—তিনি নৃত্যে সঙ্গীত রচনা করার দিকে দৃষ্টি দেননি। তাঁর রচিত নৃত্যের সঙ্গে যে সব যন্ত্রের সমাবেশ করা হয়েছে তাকে অর্কেষ্ট্রা বলা চলে না আর সে সব যন্ত্র-ধ্বনি নৃত্যের ভাবকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম তো হয়ইনি বরং বাধারই সৃষ্টি করেছে। তিমিরবরণ নৃত্যের সঙ্গীত রচনায় তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন নানাভাবে। কি ছন্দে, কি ধ্বনির রঞ্জনায়, কি নৃত্যের গতির সঙ্গে সঙ্গীতের গতির মিলনে, অথবা নানাবিধ ধ্বনি নানাভাবে ছোটখাট অবজ্ঞাপ্রাপ্ত যন্ত্র দিয়ে মূল সুরে জুড়ে দিয়ে নৃত্যের ভাবকে বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মত আর একটি সুররচয়িতা আজ পর্য্যন্ত এদেশে দেখা যায় নি।

রাই বড়াল তাঁর অর্কেষ্ট্রা দিয়ে যে রচনা আমাদের পরিবেশন করেছেন সেগুলি গানের সঙ্গে চললেও সেগুলিকে কেবল সঙ্গীতের পর্য্যায় ভুক্ত করা চলে না। তাঁর অর্কেষ্ট্রা সমবেত যন্ত্রধ্বনির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বিশেষভাবে কার্য্যকরী। তাঁর সুর রচনায় সব চেয়ে ভুল হলো এই যে তিনি উত্তর ভারতীয় তালের বন্ধনীকে আঁকড়ে

ধরে রেখেছেন, মায়া কাটাতে পারেন নি। তিনি এবিষয়ে রক্ষণশীল। বায়া তবলা বা যে কোন তালযন্ত্র না বাজিয়েও ছন্দের কারুকাজ যে করা সম্ভব অথবা এই যা এতকাল একটানা বাজিয়ে যাওয়াই আবশ্যক মনে করা হয়েছে তা একটানা না বাজলেও যে গান বাজনায় সঠিক ছন্দ রাখা সম্ভব সে কথা তিনি নিজে ভাল তবল বাজিয়ে হওয়াতে মানতে হয়ত রাজি নন। কিন্তু তিমিরবরণের ছন্দের গোঁড়ামি নেই। তিনি তালযন্ত্র একটানা বাজাবার প্রয়োজন মনে করেন। প্রয়োজন বোধে গতির ও ছন্দের—পরিবর্ত্তন করাতেও তাঁর কিছুতেই বাধে না। তাছাড়া সুরচয়নে রাই বড়াল কেবল উত্তর ভারতীয় ঠুংরীর বা গীত শ্রেণীর সুর গ্রহণ করেই ক্ষান্ত। কিন্তু তিমিরবরণের সেরূপ কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, তাঁর সুরে স্পেনীয় মেলডি এবং মিশরীয় মেলডিও শোনা সম্ভব, স্পেনীয় নৃত্য ছন্দও গ্রহণে তাঁর বাধে না, অথচ সেগুলি হুবহু অনুকরণ নয়। সেগুলির ব্যবহার-নৈপুণ্য সত্যিকারের রসসৃষ্টি।

দক্ষিণা ঠাকুর যে অর্কেষ্ট্রা রচনা করেছেন তাকে পুরো অর্কেষ্ট্রা বলা চলে না। তাঁর যন্ত্রীদল পাশ্চাত্যের Trio, Quartet অথবা Quintet ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর সুর রচনায় অভিনবত্ব আছে। এককালে ক্লেরিওনেট, হারমোনিয়ম, বেহালা ও বায়া তবলা নিয়ে যে Quartet থিয়েটারে হতো দক্ষিণাঠাকুরের Quartet তারই অনুরূপ মনে হয় না শুধু তাঁর সুর রচনার কৃতিত্বে। গিটার, তার সানাই প্রভৃতির সমাবেশ করা হয়েছে বলেই যে তাঁর যন্ত্রীদলের সুরযোজনা মধুর হয়েছে তাও নয়। যন্ত্রের সুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মেলডির এক এক অংশ যে যে যন্ত্রে ব্যবহার, সে অনুযায়ী মেলডি চয়ন, যন্ত্রের নিজস্ব ধ্বনিটি গতি-প্রকাশে ব্যবহার, এসবের সূক্ষ্মজ্ঞান দক্ষিণাঠাকুরের আছে বলেই তাঁর অর্কেষ্ট্রার আবেদন মধুর। ইউরোপীয় সঙ্গীত Timbre এ যা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সব যন্ত্রের স্বর ও ধ্বনি মেলডি ও ছন্দ মিলে যে একটা সমতা, সে বস্তুটি দক্ষিণাঠাকুরের যন্ত্রীদলে পাওয়া যায়।

সমবেত যন্ত্র সঙ্গীতের জন্ম হলেও সেটি বর্ত্তমানে আতুর ঘরেই রয়েছে। তার ব্যাপকত্ব সম্পুর্ণ নির্ভর করছে যারা তার লালন পালন করছে তাদের উপর। আমাদের এখানে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত নতুন হলেও তার বহুল উৎকর্ষ পাশ্চাত্য হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে সে দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের গ্রহণ করে নিয়ে ক্রমে অগ্রসর হলে অচিরেই কেবল-সঙ্গীতের চরম অভিব্যক্তি পাওয়া আমাদের দেশেও সম্ভব হবে। কিন্তু সে সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

বাঙালীর মন

("ভারতী" ও সবুজপত্রের" কাল)

নারায়ণ চৌধুরী

বিশেষ বিশেষ ঘটনার দ্বারা এক একটি যুগকে চিহ্নিত করার যে প্রথা চলে আস্ছে তা যদি কমবেশি সত্যি হয়, তা হ'লে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথপরিক্রমা 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকে সুরু হয়েছে একথা স্বীকার করতে কারও আট্‌কাবে না নিশ্চয়। সন তারিখ মিলিয়ে ঠিক 'কল্লোল' প্রকাশের দিন থেকেই বাংলাসাহিত্যের ঈশান কোণে আধুনিকতার ঝড়ো হাওয়া দেখা দিয়েছে তা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সুবিধার খাতিরে এবং একটি স্থূল ঘটনার স্মারকরূপে 'কল্লোল'কেই আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রেরণার মূল উৎসরূপে নির্দেশ করা চলে।

তবে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রযুগের ঠিক পরেই কল্লোলযুগের সূচনা হয় নি; এর মাঝে আরো একটি অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে যাকে রবীন্দ্র ও আধুনিকের যুগের মধ্যবর্তী হাইফেন আখ্যা দেওয়া যায়। এক কথায় যদি এই হাইফেনটিকে পাঠকের চোখে তুলে ধরতে হয় এবং এইমাত্র বর্ণিত প্রক্রিয়াকেই যদি যুগনির্দেশের নির্ভরযোগ্য উপায় ব'লে মনে করা যায় তা হ'লে এই যুগটিকে বল্‌তে হয় "ভারতী" ও "সবুজপত্রের" যুগ। আমরা এইবারে এই স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তী যুগটি সম্বন্ধেই সবিস্তার আলোচনা করতে চাই।

অল্পবিস্তর সমসাময়িকতার নজীরেই এখানে "ভারতী" ও "সবুজপত্রের" নাম একত্রে যোজনা করা হয়েছে, নইলে ভাবের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সাযুজ্য খুব সামান্যই ছিলো। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত 'সবুজপত্রে'র সাহিত্য-আন্দোলন খুব অল্পসংখ্যক নব্যতন্ত্রের সাধক সাহিত্যিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো বলে তার প্রভাব অন্তত তদানীন্তনকালে খুব বেশি ব্যাপক হতে পারে নি; 'বীরবল' ও মুষ্টিমেয় 'বীরবল'-শিষ্যদের মধ্যেই সেই সাহিত্যের অনুশীলন ও অনুধাবন মূলত কেন্দ্রীভূত রয়েছে। আজকে 'সবুজপত্রে'র প্রভাব বাংলা-সাহিত্যে সুপ্রকট, কিন্তু 'সবুজপত্রে'র প্রকাশকালে ঠিক অবস্থা এরূপ আশাপ্রদ ছিলো না। তখন দলবলসহ "ভারতী" পত্রিকাই আসর জাঁকিয়ে ছিলো, এবং আধুনিকতার পুরোধারূপে সর্বত্র অভিনন্দিত হচ্ছিলো। যথার্থ আধুনিকতার নিকষে সত্যই 'ভারতী'র এই দাবী টেঁকে কিনা তা অবশ্য আমরা পরে বিচার করবো, তবে আপাতত বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ প্রশ্রয়েই এই গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা জনসাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করছিলেন

এবং তাদের মনোযোগের ওপর নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিলেন। "ভারতী"র সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সাহিত্যমহলে সুবিদিত; বল্‌তে গেলে রবীন্দ্রপ্রভাবের সুবিশাল ছত্রছায়াতলেই 'ভারতী'র সাহিত্যচক্রের অভ্যুদয়, বিকাশ এবং— বিনাশ। কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালো, কিন্তু আমার বক্তব্যের সূত্র ধ'রে আরেকটু অগ্রসর হ'লেই বোধ করি আর তাকে তেমন হেঁয়ালি ব'লে মনে হবে না। 'সবুজপত্রের' প্রতিও রবীন্দ্রনাথের উদারতা অকুণ্ঠ ছিল, কিন্তু সেখানে প্রমথ চৌধুরীর লেখনীর মধ্যে তিনি যে প্রচণ্ড শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে ঠিক প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে পিঠচাপ্‌ড়ানো গোছের পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়ে 'সবুজপত্র'কে তিনি কখনও অপমান করতে চান নি। বুদ্ধিমানের কার্যের প্রতি আরেকজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের যে সপ্রশংস সাগ্রহ অনুমোদন থাকে, প্রমথ চৌধুরীর কার্যধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঠিক সেই ধরণের অনুমোদন ছিল। চৌধুরী মহাশয় কবির আত্মীয় ছিলেন এই আদানপ্রদানের মধ্যে সেই পরিচয়টি ছিল গৌণ; প্রমথ চৌধুরীর লেখার 'বীরবলী' ভঙ্গি, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর কালচার এ সবই সব ছাড়িয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট করেছে।

কিন্তু 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ঠিক এরূপ ছিলো না সে কথা বলাই বাহুল্য। সেখানে খতিয়ে দেখলে প্রশ্নটা দাতা ও গ্রহীতার প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়—ঋণদাতা ও ঋণীর সম্পর্কের প্রশ্ন—; এক স্বাধীনচেতার প্রতি আরেক প্রবল স্বাধীনচেতার সপ্রশংস মনোভাব সেখানে লুকিয়ে নেই। ফলে দেখতে পাই "ভারতী গোষ্ঠী" আজীবন রবীন্দ্রনাথের ঋণশোধই করে গেছে, অধমর্ণের খোলস ভেদ করে নিজের স্বাতন্ত্র্যে কখনই তারা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে নি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে "ভারতীর" যুগকে সম্পূর্ণ পরবশ্যতার যুগ রূপে অভিহিত করা যায়। "ভারতী"-র সংস্কৃতি রবিকরদীপ্ত চন্দ্রের ন্যায় পরনির্ভর, পরাশ্রয়ী, শূন্যগর্ভ। তার নিজের বলে দাবী করবার মতো কিছু নেই— একমাত্র কলঙ্কলাঞ্ছনটি ছাড়া। রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়কাল থেকে আরম্ভ করে আজকের দিন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালকে একটি একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা চল্‌তে পারতো যদি "ভারতী"-র অধ্যায়টুকু ছন্দোভঙ্গ না ক'রে দিতো। একথা আজ প্রতিবাদের ভয় না করে বলা চলে যে "ভারতী"-র যুগ সর্বাংশে mediocreদের যুগ; রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়াপুষ্ট সাধরণমেধাসম্পন্ন তল্পীবাহকদের যুগ। শুধু mediocre হলেও বোধ হয় অতোটা আপত্তি ছিলো না, কিন্তু তার চাইতেও যা মারাত্মক, "ভারতী"-গোষ্ঠীর লেখকের সকলেই অল্পবিস্তর প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক, চটুল মানসিকতার পরিপোষক এবং পলায়নবাদের পূজারী। আধুনিক কালে এসে রবীন্দ্রযুগের ঠিক অব্যবহিত পরেকার এই যুগটাতেই বোধ হয় বাংলা সাহিত্য প্রথম এবং শেষবারের মতো set-back খেয়েছে।

আশার কথা বাংলা সাহিত্য সেই ধাক্কা সাম্‌লে উঠেছে। আজ্‌কের সাহিত্যিক মানসে "ভারতী"-যুগের মানসিকতার ছিঁটেফোঁটাও বেচে নেই, প্রভাবের দিক থেকে "ভারতী"-যুগ নিঃশেষে গতাসু।

'সবুজপত্রে'র প্রভাব আজও বেঁচে আছে। কিন্তু এখানেও একটি কথা থেকে যায়। ভাষারীতির বিপ্লবসাধনে 'সবুজপত্র' যতোটা কার্যকরী হয়েছে, ভাবের বিপ্লবসাধনে তার প্রভাব ততোটা ফলপ্রদ হয় নি। বলা যেতে পারে 'সবুজপত্র' ভাবের বিপ্লবের দিকে আদপে চেষ্টাই করে নি; তার সমস্ত ঝোঁকটা গিয়ে পড়েছিলো নতুন নতুন রীতিসম্মত ভাষাবিন্যাসের প্রতি, শব্দচয়নের প্রতি, বল্‌বার কায়দার মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রস ফুটিয়ে তোলবার প্রতি। সবুজপত্রের প্রবর্তিত বিপ্লব মুখ্যত ভাষার বিপ্লব, গঠনরীতির বিপ্লব, ফর্মের বিপ্লব; প্রচলিত ভাবের ক্ষেত্রে তা বিশেষ আঁচড় কাট্‌তে পারে নি। আর এদিকে তার চেষ্টারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবের ক্ষেত্রে 'সবুজপত্র' বিপ্লব-পরাঙ্মুখ ছিল এ কথা বল্‌লে বোধ হয় খুব বেশি সত্যের অপলাপ করা হয় না। আমরা এ সম্বন্ধে প্রবন্ধের শেষাংশে আরও আলোচনা করবার সুযোগ পাবো, আপাতত "ভারতী" যুগটিকে নিয়েই আলোচনা হোক।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। "ভারতী"-যুগের লেখক বল্‌তে যদিও একটি বিশেষ শ্রেণীর লেখকদের বোঝায় (যথা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কবি সত্যেন দত্ত প্রভৃতি), এখানে কিন্তু শুধুমাত্র সেই বিশেষ সাহিত্যচক্রটিকেই আমরা বোঝাচ্ছি না—তাঁরা তো আছেনই, সেইসঙ্গে সেইসময়কার অন্যান্য যাঁরা "ভারতী"র সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না থেকে অল্পবিস্তর এককভাবে সাহিত্যসাধনা করেছেন তাঁদেরও বোঝাচ্ছি। "ভারতী"-যুগের লেখক বলতে "ভারতী"র সমসাময়িক কালে যাঁরাই সাহিত্য অনুশীলনে ব্রতী ছিলেন তাঁদের সকলকে নির্দেশ করাই (একমাত্র 'সবুজপত্রের' লেখকদের ছাড়া) আমার এ আলোচনার লক্ষ্য। হয়ত এইভাবে সকলের নাম একসঙ্গে তালগোল পাকাবার কোনই যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, কিন্তু যুগলক্ষণ নির্ণয় করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে এরূপ সাধারণীকরণ ছাড়া উপায়ও নেই। সুবিধার খাতিরেই এই পন্থার শরণ নিতে হয়েছে, এতে হয়ত সন তারিখ এবং অন্যান্য তথ্যগত দিক থেকে খুঁত রয়ে গেলো, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সাধনের দিক দিয়ে তাতে কিছু আটকাবে না এইটুকুই যা বলবার।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভার ছায়াতলে বসে সেই সময় যাঁরাই কাব্যচর্চা করেছেন (যথা কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি) তাঁদের সকলকেই আমি আমার বক্তব্যের

অন্তর্ভুক্ত করেছি। এঁদের কেউ "ভারতী"-গোষ্ঠীর কবি ছিলেন কেউ ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার সাক্ষাৎ আওতায়ই এঁদের অভ্যুদয় ও বিকাশ, সেইহেতু তাঁদেরকে 'ভারতী' যুগের কবি বলতে কারও আপত্তি হবে না নিশ্চয়। 'ভারতী'-যুগ বলতে এখানে মূলত (এবং স্থূলত) রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নগগনে সমাসীন হবার ঠিক অব্যবহিত পরবর্তী যুগটিকে বোঝাচ্ছে। সেই নজীরে বাংলায় যে কেউ যেখানে সেইসময়ে সাহিত্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন তঁাদের সকলকেই 'ভারতীর যুগ' এই ব্যাপক নামের পরিধির মধ্যে টেনে আনা যায়।

প্রথমে 'ভারতী'-গোষ্ঠীব সাহিত্যিকদের এক নজর দেখে নেওয়া যাক। মণিলাল সৌরীন্দ্রমোহন হেমেন্দ্রকুমার প্রেমাঙ্কুব প্রভৃতির রচনা অনুধাবন করলে দেখা যাবে তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গিতে কেমন যেন একটা তারল্য, কেমন যেন একটা ফুরফুরেপনার ভাব আছে। এঁরা রবীন্দ্রনাথের আওতায় বিকাশলাভ করেছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার কঠোর সংযম ও শাসনের দিকটি এঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি, নিয়েছেন শুধু তাঁর হাল্কা দিকটিকে। কবির বন্ধনমুক্তির আহ্বান ও ছুটিতে ছুটিতে জীবনটাকে ভোর করে দেবার নির্দেশকে এঁরা সম্ভবত বড়ো বেশি আক্ষরিক অর্থে (কাজে কাজেই মোটা অর্থে) গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁদের সকলেরই রচনায় একটা বোহেমীয় মনোভাব, নিছকই প্রবৃত্তি-মার্গকে অনুসরণ করার একটা প্রবণতা উৎকট হয়ে ফুটে উঠেছে। জীবন সম্বন্ধে যথাযথ দায়িত্ববোধের পরিচয় এঁদের লেখায় ততটা পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় দায়িত্ব পরিহার করবার অসামাজিক ঝোঁক। একদিকে রবীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক লিবার‍্ল্ চিন্তাধারা অন্যদিকে তদানীন্তন ইউরোপীয় সাহিত্যের আবহাওয়া সম্পর্কে একটা মনগড়া কল্পনা (যাতে নিজেদের মনোভাব সমর্থন করা যায়) এই মিলে "ভারতী"-গোষ্ঠীর লেখকেরা কেমন যেন এক কিম্ভূত শ্রেণীব জীব হয়ে উঠেছিলেন, যার প্রমাণ তাঁদের রচনার ছত্রে ছত্রে বর্তমান। এঁরা নিছকই অর্কিডের মতো, বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁদের সত্যিকার কোন যোগাযোগ ছিলো না। তা ছাড়া নিঃশেষে কল্‌কাতা সহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাঢ় সংস্কারপ্রসূত হিন্দুপ্রভাবিত যে সঙ্কীর্ণ নাগরিক সংস্কৃতি কিছুদিন আগেও metropolitan সাহিত্যের নামে এখানে শিকড় গেড়ে বসেছিল তাঁদেরকে সেই সংস্কৃতিরই প্রতীকরূপে বর্ণনা করা চলে। কলকাতার বাইরে অগণিত গ্রামে ও ছোট শহরে যে অগণিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালী জনসংখ্যা পড়ে আছে তার সঙ্গে তাঁদের না ছিলো ভাবের মিল, না ছিলো সহানুভূতির সূত্রে আত্মীয়তা। ফলে "ভারতী"-গোষ্ঠীর লেখকেরা কেবলই বিরামহীনভাবে ঠুন্‌কো নাগরিকতার পালিশকে বাংলাদেশের কালচ্যর বলে চালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের এই ফাঁকী ও মেকী ধরা পড়তো না যদি না যথাসময়ে 'কল্লোল'-যুগের লেখকদের আবির্ভাব ঘটতো, কিন্তু ততোদিনে বাংলা

সাহিত্যের যতোটুকু ক্ষতিসাধন করবার তাঁরা তা করে ফেলেছিলেন, তাকে আর পরিপূরণ করবার পথ ছিলো না।

'ভারতীর' লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট প্রতিভার পোষকতা সত্ত্বেও কেন এই আত্মঘাতী পথের আশ্রয় নিয়েছিলেন? তার একটি কারণ এই হতে পারে যে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের কল্পিত সংস্কার রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তেরও ওপর দিয়ে তাঁদের মনে অধিক মোহ বিস্তার করেছিলো। হেমেন্দ্রকুমার রায় বোধ হয় ভেবেছিলেন তিনি গী দ্য মোপাসাঁর মানস-সন্তান, কিন্তু জীবনে খানকয়েক যৌবনধর্মী কবিতা, কতকগুলি তরল উপন্যাস অনেক অপাঠ্য গান ও কিছু নাট্যসাহিত্যসংক্রান্ত পঠিতব্য প্রবন্ধ এবং শিশুদের মনোরঞ্জক এবং তাদের মেরুদণ্ডবক্রকারী গুচ্ছের অ্যাডভেঞ্চারমূলক বই লেখা ছাড়া তিনি জীবনে আর কীই বা করতে পারলেন! জীবনযাপন সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণা (তখনকার কলকাতার মানসিক আবহাওয়ায় যার সমর্থন ছিলো) পোষণ করার ফলে যতোটুকু তিনি দিয়ে যেতে পারতেন ততোটুকুও তিনি দিয়ে যেতে পারলেন না, এখন তো একেবারে স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে তিনি শিশুদের রঙীন নেশার খোরাক জোটাবার যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত sober ছিলেন—কিন্তু তিনিও তদানীন্তন আত্মঘাতী সাহিত্যিক সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর রচনার পরিমাণ বেশি না হলেও তাদের সবকটিতেই তারল্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। প্রেমাঙ্কুরবাবুর গল্পলেখার হাত বরাবরই সুন্দর কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিককালে রচিত তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা স্মৃতিচারণমূলক 'মহাস্থবিরজাতক' ছাড়া তিনি 'ভারতী'র যুগে স্থায়ীমূল্যের কিছু লিখেছেন বলে তো মনে হয় না। সৌরীন্দ্র-মোহনের গল্পলেখার হাতটিও মিষ্টি, কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের মেয়েদের দ্বিপ্রহরযাপনের ফলপ্রদ উপকরণ সরবরাহ করা ছাড়া তাঁর গল্পোপন্যাস আর বেশি কিছু কি করতে পেরেছে?

"ভারতী"-গোষ্ঠীর লেখকদের তরল মনোভাবের আরেকটি কারণ যা আমার মনে হয় তা হচ্ছে এঁদের অনেকেই সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নাগরিক শিল্পপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যার ফলে তাঁদের সাহিত্যে তাঁদের অজ্ঞাতসারেই একটা হাল্কা আমুদে ভাব প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠেছে। যেমন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নাটকের নৃত্যকলা সংগঠন-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; হেমেন্দ্রকুমার শিশিরকুমারের নবনাট্যআন্দোলনের সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন আর প্রেমাঙ্কুর আতর্থী শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের বিবরে গিয়ে ধরা দিয়েছিলেন। এতে বোঝায় এই যে এঁদের সাহিত্যপ্রীতি অবিমিশ্র আন্তরিক ছিলো না। একই কালে ক্ষেত্রান্তরে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার তাগিদকে সবসময়ই বহুমুখী প্রতিভার লক্ষণ বলে মনে করলে ভুল হতে পারে, সেটা বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর না হয়ে একনিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়ের

অভাবও হ'তে পারে। 'ভারতীর' লেখকদের সম্পর্কে বোধ হয় শেষোক্ত কারণটিই ঠিক। এঁদের প্রত্যেকেরই লেখার হাত ঝরঝরে ছিলো, কিন্তু তবু যে তাঁরা সাহিত্য-সাধনায় বিনিঃশেষে আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি তার মূল সন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁদের ভাবের দৈন্য, কলকাতায় আবদ্ধ নাগরিক জীবসুলভ চিন্তার সঙ্কীর্ণতা এবং আত্মরতির মোহ।

কিন্তু আশ্চর্য, এঁদের মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো একাগ্র কবিসাধকের বিকাশ সম্ভব হয়েছিলো! 'ভারতীর' যুগের এইটেই বোধ হয় সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা যে অই সর্ব্বব্যাপী তারল্যের আবহাওয়ার মধ্যে বসেও কবি সত্যেন দত্তের নিরলস, একলক্ষ্যাভিমুখী, আন্তরিক কাব্যসাধনা অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছিলো; বাহ্যিক কোন ঘটনাই তাঁর অবিচলিত স্থৈর্য ও নিষ্ঠাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে নি। তিনি যেন পণ করেছিলেন কিছুতেই তিনি বন্ধুদের (যদিও তিনি সরল, অমায়িক, বন্ধুবৎসল ছিলেন) প্রভাবিত হাল্‌কা হাওয়ায় নিজেকে উড়তে দেবেন না; কাব্যসাধনার কঠিন, আয়াসসাধ্য, ধৈর্য্যসাপেক্ষ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তিনি শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়ে পড়ে ছিলেন এবং সেই মন্ত্রের সাধনেই দেহপাত করলেন। সত্যেন দত্তের কবিপ্রতিষ্ঠা খুব উচ্চাঙ্গের সৃজনধর্মী প্রতিভা না হলেও তাঁর এই ঐকান্তিকতা ও সীরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গির অবিমিশ্র প্রশংসা না করে পারা যায় না। "ভারতী"-প্রভাবিত অই পাশ্চাত্যপন্থী তরল আবহাওয়ার মধ্যে তিনি যে তাঁর স্বাজাতিকতার অভিমান নিয়ে চিন্তায় ও বিশ্বাসে জাতীয়তাকে আঁকড়ে ছিলেন সেইটেই এমন একটা কীর্তি যার জন্যে কবি সত্যেন দত্ত আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বেন; তাঁর আর সব কৃতিত্বের বিচার না হয় পরে হলো।

যাঁরা সত্যেন দত্তের ছন্দের দিকটা নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি করেন তাঁরা তাঁর প্রতি নিঃশেষে অবিচার করেন। কেননা ছন্দ কবিতার একটি প্রধান আশ্রয় হলেও শুধুমাত্র ছন্দ দিয়ে কবিতার বিচার হয় না। ছন্দের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া যে কথা, গানের আসরে বসে গান না শুনে তবলার চাঁটির দিকে লক্ষ্য রাখা একই কথা। ভাব ও ছন্দের সুসমঞ্জস সমন্বয়েই মাত্র কবিতা কবিতা হয়, যেমন সুর ও লয়ের অঙ্গাঙ্গী কিন্তু অগোচর মিলনে গান গান হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, সত্যেন দত্তের কাব্যের সাফল্যের গোপন রহস্যটুকু অনুধাবন করলে আমরা দেখবো তার মূল রয়েছে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার মনোভাবের মধ্যে, তারই অনুপ্রেরণার অগ্নিশিখা থেকে তিনি তাঁর কাব্যের মশাল জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। কবির মনটুকু ছিলো সর্বাংশে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত; ক্লাসিক্যাল ভাবই তিনি তাঁর কাব্যে প্রধানত পরিবেষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতার ফর্মটুকু ছিলো হাল্‌কা, তাতে ছন্দের অতিরিক্ত টুংটাং শুনে অনেক

সময়ই এই ভুল হওয়া স্বাভাবিক ছিলো যে তিনি বুঝি "ভারতী"-প্রবর্তিত চটুল সংস্কারকেই আশ্রয় করে চলেছেন। কিন্তু ছন্দের অনুরণন ভেদ করে যদি তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদের মুখোমুখি হওয়া যায় তা হ'লে আর এই ভুল করার অবসর থাকে না। সমুদ্রপারের ঢেউ দেখে যেমন মাঝদরিয়ার সুগভীর প্রশান্তি অনুমান করা যায় না তেমনি সত্যেন দত্তের কাব্যের ঝঙ্কার থেকে তাঁর গাম্ভীর্য ও সৌম্যভাবটুকু অনুমান করা শক্ত।

তাঁর 'জাতির পাঁতি' কবিতাটিই ধরা যাক্। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত নিতান্তই হাল্‌কা ছাঁদে লেখা —কিন্তু ছন্দটাই যা চটুল ভাবাশ্রিত, ছন্দের চটুলতা সেখানে ভাবের ঘরে হানা দিতে পারে নি। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে দেখালেই একথার প্রমাণ মিলবে ঃ

"রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি';
কুলদেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রামদেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।
পরিবর্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এম্‌নি ক'রে
মহাভুজঙ্গ খোলস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধ'রে
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে'
যেই দিন মহা-মানব ধর্মে
মনুর ধর্ম বিলীন হবে।"

ক্রমাগত কোটেশনের ফলে যে সব কবিতার জাত মারা গেছে তাদের মধ্যে 'জাতির পাঁতি' কবিতা একটি, তা জেনেও তার থেকে কতকটা সবিস্তারে এই যে উদ্ধৃতিটুকু সঙ্কলন করলাম তা শুধু এই দেখাতে যে সত্যেন দত্ত কতো ভাবগম্ভীর কথা কতো হালকা ভাবে বলতে জান্‌তেন—ভাবজগতের evolution-এর তত্ত্বটি এরমধ্যে কী সুন্দরভাবেই না বিধৃত রয়েছে। তাঁর 'কয়াধু' কবিতাটি হালকা ছন্দের বাহনে ভাবমধুর কাব্যসৌন্দর্য-প্রকাশক্ষমতার আরেকটি সফল দৃষ্টান্ত। কবি সত্যেন দত্তের বৈশিষ্ট্যকে যদি কয়েকটি কথায় মাত্র প্রকাশ করতে হয় তা হলে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি লাইন সকলকে স্মরণ করতে বলি ঃ

"তুমি সত্য বীর, তুমি সুকঠোর, নির্মম,
করুণ কোমল।"

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, কালিদাস রায়, করুণানিধান প্রভৃতি কবিরা মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আলোকে আলোকিত—কাজেই বাংলা সাহিত্য তাঁদের কাছ থেকে নিজস্ব বল্‌তে বেশি কিছু পেলো না। রবীন্দ্রনাথের ভাব, রবীন্দ্রনাথের ভাষা বৈশিষ্ট্য, তাঁর শব্দচয়ন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সবই উপরোক্ত কবিদের রচনাকে প্রভাবিত করেছে, এবং এই

প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াটিতে নির্জ্ঞান মনের চাইতে সজ্ঞান মনের কার্যকারিতাই বেশি প্রকট। এই চক্রের কবিদের মধ্যে কুমুদ মল্লিকের তবু খানিকটা নিজস্বতা রয়েছে। তার কারণও সুস্পষ্ট। কুমুদ মল্লিকের কবিতায় sophistication অপেক্ষাকৃত অনুপস্থিত; পল্লীসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকেই তাঁর মনের সহজ ঝোঁক। তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবাধীন হয়েও তিনি নিজের কাব্য-সাধনার পথ নিজে খানিকটা কেটে নিতে পেরেছেন; সহধর্মী অন্যান্যদের তুলনায় পরাশ্রয়ের গ্লানি তাঁরই সবচাইতে কম হওয়া উচিত। যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস রায়, করুণানিধান, কুমুদ মল্লিক এবং এঁদের শ্রেণীর আর সবাই মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিরীহ ভদ্রলোক কবির দল—এঁদের রচনায় না আছে বলিষ্ঠতা, না বিপ্লবগন্ধী মনোভাব, না বা কাব্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য। কম বেশি সকলেই এঁরা খানিকটা জ্যালজেলে, জোলো ও স্থবির ভাবাপন্ন। এঁদের দলের মধ্যে আবার কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি নিতান্তই ঠুন্‌কো কবি—কবিতার রূপ ও বস্তু উভয়কেই হাল্কা করতে করতে এঁরা তাকে প্রায় ছড়ার ছন্দের শিশুরঞ্জন কবিতায় পরিণত ক'রে ফেলেছিলেন।

তবে এই যুগের সকল কবিই কিছু আর রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী বিরাট প্রতিভার দ্বারা ছায়াগ্রস্ত হ'য়ে যান নি; অন্তত চারজন কবির রচনার ক্ষেত্রে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। এঁরা হলেন: মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও সুকুমার রায়। বর্তমানের মোহিতলাল আর "স্বপনপসারী" "বিস্মরণী" যুগের মোহিতলালের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তখনকার প্রচলিত সাহিত্যিক সংস্কার খণ্ডন করার মধ্যে দিয়েই মোহিতলালের কাব্যসাধনা সুরু হ'য়েছিলো এবং শুধুমাত্র এইদিকে তাঁর উদ্যম থাক্‌লে তিনি আজ বাংলার একজন বিশিষ্ট কবিরূপে স্বীকৃত হ'তে পারতেন—কিন্তু কী কুক্ষণে তাঁর ধারণা হলো বাংলাসাহিত্যের শুচিতা রক্ষার দায়িত্ব ভগবান শুধু তাঁরই ওপর ন্যস্ত করেছেন, সুতরাং ছাড়ো কলম, ধরো অস্ত্র। এই আত্ম-আরোপিত যুযুধান মনোবৃত্তির ফল সাহিত্যের পক্ষে (এবং তাঁর নিজের পক্ষে) কী শোচনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে তা তাঁর সাম্প্রতিক রচনাবলী পাঠ করলেই বোঝা যায়। এককালে 'কালাপাহাড়'এর মতো শক্তিশালী কবিতা যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তিনি এখন শুষ্ক, উদ্ধত, অহং-সর্বস্ব প্রাদেশিকতাদুষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধোঁয়াটে সাহিত্য-সমালোচনা লিখে পূর্ব-কৃতিত্বের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। মোহিতলাল শুধু স্বধর্মভ্রষ্টই হননি, সাহিত্যের মধ্যেও যে 'পীড়নবাদ' সম্ভব তিনি তারই একটি দৃষ্টান্ত। সেই হিসেবে তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যের মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হবে। মোহিতলালের গদ্য পদ্য উভয়েরই রচনাভঙ্গি বলিষ্ঠ, দৃঢ়—রবীন্দ্রপ্রভাবিত মৃদুলমধুরতাকে তিনি খণ্ডন করেছিলেন এটা

আশার কথা, কিন্তু বলিষ্ঠতা অনিয়ন্ত্রিত এবং কেবলই আত্ম-আবর্তিত হলে যে দুর্দশা হয় মোহিতলালের রচনাবলী সেই অবস্থাটাকেই শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলা কবিতায় realism আমদানী করার অনেকখানি কৃতিত্ব একা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রাপ্য। এই শক্তিমান কবি কবিতার শব্দপ্রয়োগে ইচ্ছে করেই এমন একটা রুক্ষতা, বন্ধুরতা এনেছিলেন যা আজও অনেক আধুনিক কবির প্রেরণা-স্থল হয়ে রয়েছে। কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি অভাবনীয় নতুনত্বের স্বাদ এনেছিলেন। তাঁর "কালবৈশাখী" "ডাক-হরকরা" প্রভৃতি রচনা নূতন ভঙ্গির সার্থক কবিতারূপে অনেকদিন আদৃত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইঞ্জিনিয়ার, বোধ হয় তাঁর কবিতার বাস্তবানুসারী দৃষ্টিভঙ্গিটুকু তারই থেকে পাওয়া যায়; তাঁর diction-এর অমসৃণতার মূলেও বোধ করি এই ঘটনাটি অপরোক্ষভাবে কাজ করেছে। কিন্তু কারণ যাই হোক, বাংলা কবিতার বিবর্তনে তিনি সামান্য হলেও রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত বিশিষ্ট দান রেখে যেতে পেরেছেন এইটে কম কথা নয়। পরিতাপের বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁর কবিতা বড়ো একটা দেখছি নে—পূজাসংখ্যাগুলির মহোৎসবে মাত্র বৎসরে একবার করে তাঁর দর্শন পাচ্ছি।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের অনন্যতা ও সৃষ্টিকুশলতা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে এই নিয়ে সবিস্তারে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কালের হিসাবে কাজী নজরুল যদিও 'কল্লোল'-যুগের পূর্বে সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেছেন কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকাল কল্লোলযুগেও প্রসারিত হয়েছিলো। শুধু তাই নয় কল্লোলযুগকে অতিক্রম করে একেবারে আধুনিক কালে এসে মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর লেখনী সাময়িকভাবে বিরাম লাভ করেছে। এই বিবেচনায় নজরুলের রচনার বিচার আমরা বারান্তরের জন্য তুলে রাখলাম—'কল্লোল'-যুগের প্রসঙ্গেই আমরা তাঁর মূল্য নির্ণয় করবো।

সুকুমার রায় জীবিতকালে যতো না আদৃত হয়েছেন বর্তমানে বোধ হয় তার চাইতে অনেক বেশি আদৃত হচ্ছেন এবং তাঁর এই সদ্যলব্ধ জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর একান্ত অনুরাগী কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিকের নিরলস প্রচেষ্টা কাজ করছে একথা মান্‌তেই হবে। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' আপাতদৃষ্টিতে আবোল-তাবোল বলে মনে হয় কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি, সমাজের মাথাওয়ালা রাশভারী মোড়লদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও হাস্যকরতার প্রতি তার অধিকাংশ কবিতা সূক্ষ্ম বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। Nonsense Verse-এর মাধ্যমেও যে কতো সাংঘাতিক তাৎপর্যপূর্ণ, সমাজপ্রধানদের সুনামের পক্ষে হানিকর মারাত্মক সব ব্যঙ্গ করা যায় সুকুমার রায়ের কবিতা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

ভাষারীতির আন্দোলন 'সবুজপত্রে'র খাত বেয়ে এসেছিলো একথা আমরা আগেই

বলেছি। কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রধানত গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে, কাব্যের ভাষার বিপ্লবসাধনের দিকে তার মনোযোগ তেমন আকৃষ্ট হয় নি। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অবশ্য তাঁর সনেটগুলিতে ও অন্যান্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক কবিতায় নতুন ভাষায় কাব্যরচনার প্রচেষ্টা পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর গদ্যসাহিত্যের পরিমাণ ও সম্ভাব্যতার তুলনায় সেই প্রচেষ্টাকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর আখ্যা দিতে হয়। 'সবুজপত্রের' লেখকেরা সবাই আগে গদ্যলেখক পরে অন্যকিছু—প্রমথ চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সবার সম্পর্কেই একথা খাটে। সবুজপত্রের গদ্যরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত পণ্ডিচেরীর সুরেশ চক্রবর্তী (হসন্ত) এককালে কিছু কবিতা লিখেছিলেন বটে কিন্তু গদ্যই বোধ করি তাঁর ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন। চমৎকার গদ্যের হাত তাঁর, যদিও ১৯৪২ সালের ক্রীপ্‌স দৌত্যের হয়ে ওকালতি করার পর থেকে আমি তাঁর ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছি। পরলোকগত সতীশ ঘটক 'সবুজপত্রের' গোষ্ঠীর লেখকদের অন্যতম। তিনি কিছু কবিতা লিখেছিলেন তবে অধিকাংশই তার 'লালিকা' (parody)।

সবুজপত্রের লেখকদের সকলের সম্পর্কেই যেকথাটি অল্পবিস্তর খাটে তা হচ্ছে এই যে এঁরা বলবার কায়দার দিকে যতো ঝোঁক দিয়েছেন, বিশ্বাস ও মতামতের consistency বজায় রাখবার দিকে ততো ঝোঁক দেন নি। অর্থাৎ যখন যে রকম ইচ্ছে হয়েছে যে কোন বিষয়ের ওপর যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা চমৎকার ভঙ্গিতে লিখেছেন, কিন্তু সেই লেখার মধ্যে দিয়ে একটি বিশিষ্ট মত বা একটি বিশিষ্ট কনভিকশ্যন ফুটিয়ে তোলার দিকে তেমন চেষ্টা তাঁরা কখনই করেন নি। সবুজপত্রের লেখকদের কাছে লেখার আর্টটুকু একটা মজার খেলা হয়েই রইলো, চিন্তার দিকটিকে এঁরা তেমন সমৃদ্ধ করে তুলতে পারলেন না। এঁদের সকলেরই পড়াশুনো বিস্তর, বহুমুখী ও ব্যাপক। কিন্তু কিছুই কোনো কাজে এলো না। সবুজপত্র সমাজতন্ত্রের সমর্থক, কি অভিজাততন্ত্রের পরিপোষক কি ইভল্যুশন-বিশ্বাসী কি বিপ্লবপন্থী কিছুই বোঝবার যো নেই, শুধু এইটুকুই বোঝা যায় যে তাঁরা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী। এবং সেই অনুরাগের প্রাবল্য থেকে কেবলই এঁরা ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে বিচরণ করে ফিরেচেন। রচনার রূপটাই তাঁদের কাছে সব, বস্তু কিছু নয়।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার atmosphere, তাঁর অনুপ্রাস, 'প্লান' আর 'উইট' এমন একটি মনের পরিচয় দেয় যা বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় আগাগোড়া লালিত হয়েছে। সে মন সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন, পাণ্ডিত্যপুষ্ট ও যথার্থ কালচার দ্বারা পরিশীলিত, কিন্তু তা হলেও সেই মনের কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যৎ-সমাজের গতিপথের নির্দেশ পাই না। 'বীরবলে'র অভিজাত শিক্ষাসংস্কৃতি শুধু ভাষার বিপ্লবসাধনেই ব্যয়িত হলো; ভাবের

বিপ্লবসাধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো না। এই নিয়ে অবশ্য আক্ষেপ করা বৃথা—কেননা যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'সবুজপত্র' বেরিয়েছিলো সামাজিক বিপ্লবসাধন অন্তত তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

ধূর্জটিপ্রসাদের কথাই ধরুন। তাঁর রচনাভঙ্গি কী সুন্দর, কী প্রীতিপ্রদ! কিন্তু তিনি তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনার অধ্যায়ে আমাদের শুধু আনন্দই দিলেন, নির্দিষ্ট কোন পথের সন্ধান দিতে পারলেন না। তাঁর রচনায় এইটে স্পষ্ট যে তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত বুদ্ধিগতভাবে সজাগ, কোন চিন্তার আন্দোলনই তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারে না; কিন্তু তাঁর রচনা থেকে কি কোন বিশেষ পথের নির্দেশ আমরা পাই, না তিনি তা কখনও আমাদের দিতে চেয়েচেন? তাঁর রচনা থেকে এইমাত্র শুধু আমরা বুঝি তিনি 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের পক্ষপাতী নন, বামপন্থী চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণসম্মত সাহিত্যের তিনি অনুরাগী, হৃদয়ের চাইতে মস্তিষ্কের প্রেরণা তাতে প্রবল, ঘটনা অপেক্ষা মনোবিশ্লেষণে তাঁর অধিক আনন্দ—কিন্তু অই পর্যন্তই। বাঙালীর সম্মুখে পথ কি, সে সম্বন্ধে তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট নির্দেশ কোথায়? চিন্তাশীল লেখক হিসেবে তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করলে বোধ হয় খুব অন্যায় করা হয় না।

বরং অতুল গুপ্ত মহাশয়ের কাব্যসমালোচনায় কিছু স্থায়ী দান আছে। চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বেশি কিছু দেননি, কিন্তু তাঁর মনটি যে প্রগতিশীল যুক্তিবাদীর মন রাও বিলের ওপর লিখিত প্রবন্ধগুলিই তার প্রমাণ।

পাঠক লক্ষ্য করবেন বর্তমান আলোচনায় শরৎচন্দ্রের নাম আমরা একবারও উচ্চারণ করি নি। যদিও সময়ের দিক থেকে তিনি এই অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত, তবু তাঁর প্রতিভা এমনই একক, স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও দলনিরপেক্ষ যে তাঁর বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের জন্যে স্বতন্ত্র পরিসর দরকার। শরৎচন্দ্র কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন না; দলীয় চক্রের আওতায় তিনি কখনও আসেন নি। তাই তাঁকে এই আলোচনায় টেনে আনা অসঙ্গত হতো। আমরা আগামীবার শরৎ-প্রসঙ্গ দিয়েই আলোচনা সুরু করবো।

সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি

শশধর সিংহ

এশিয়ার ইতিহাসে বর্ত্তমান জাপানের উত্থান একটা স্মরণীয় ব্যাপার। ইহার বাহ্যিক দিকটা নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া দেখিলে ইহা এশিয়াবাসীদিগকে একটা নূতন পথ দেখাইয়াছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের যুগে এশিয়ার কোটি কোটি নরনারীদের মনে যে-একটা ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, তাহারা কোন বিষয়েই য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ নহে, সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। জাপানের উত্থান ও এশিয়ার জাগরণ সময়ের দিক দিয়াও যে একই পর্য্যায়ভুক্ত ইহা তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ। তারপর ওকাকুরা প্রভৃতি জাপানী মনীষীদের লেখার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইঁহারা ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানকে লইয়া একটা ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ নেতাও এই আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন এবং স্বদেশীযুগের জাতীয় প্রেরণার পিছনে যে জাপানের আদর্শ বর্ত্তমান ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সময়ে চীনের উপর জাপানের প্রভাব কিভাবে কাজ করিয়াছে তাহাও অনুধাবন যোগ্য। চৈনিক সাহিত্যের উপর জাপানী সাহিত্যের গভীর ছাপ পড়িয়াছে। চীনের কর্ম্মচারীদের মধ্যেও জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা কম নয় এবং কিভাবে জাপান নবীন চীনকে নানাদিক দিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছে তাহাও ভাবিবার বিষয়। চীনের জাতীয়তাবাদের পুরোহিত সান ইয়াৎ-সেনের জীবনী আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, তিনি চীনের রাজনৈতিক জাগরণের কার্য্যে জাপানের নিকট কতভাবে ঋণী। ১৯০৫ সালে তিনি টোকিওতে তাঁহার বিপ্লবী সঙ্ঘ "চুং-কুও-টুংমেঙ্গ হুই" স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত "মিন পাও" নামক সাময়িক পত্র শিক্ষিত চীনা মহলে খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

কাউন্ট ওকাকুরা তাঁহার একপুস্তকে একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, যে-যে যুগে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান সহযোগে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই সেই যুগগুলিই এশিয়ার গৌরবময় যুগ। এই চিন্তাধারার পিছনে যে, অনেকখানি সত্য নিহিত আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যুগে চীন ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী বর্ত্তমান থাকিলে যে আজ সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা অন্যরূপ হইত তাহা নিঃসন্দেহ। এই যোগসূত্র ধরিয়া ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও যে আমূল রূপান্তরিত হইত তাহা ধরিয়া

লওয়া যাইতে পারে। আধুনিক পর্ব্বে জাপানীরা যে—"Co-prosperity" বা অর্থনৈতিক সহযোগ খুঁজিয়াছিল তাহারও পিছনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মৌলিক ঐতিহাসিক ঐক্যের ধারণাটা সব সময়েই উপস্থিত ছিল, যদিও জাপান ইহাকে যে-রূপ দিতে চাহিয়াছিল তাহা জাগতিক বিবর্ত্তনের এই পর্য্যায়ে সাফল্য লাভ করে নাই, হয়ত করিতেও পারিত না। তাহার কারণ কেবল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদীদের তুলনায় জাপানের সাম্রাজ্যিক প্রচেষ্টার ক্ষীণতা নহে, মূলতঃ চীন-জাপানের বিরোধ।

এই দুই দেশের মৈত্রীর ভিত্তির উপর পূর্ব্ব এশিয়ার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল—এবং ভবিষ্যতেও এই দুই দেশের সম্বন্ধ কিভাবে গড়িয়া ওঠে তাহার উপর পূর্ব্ব এশিয়ার সুখ-শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করিবে। এই গোড়ার কথাটি সবসময়ে মনে রাখিলে পর প্রাচ্যের গত অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাসের একটা হদিস পাওয়া যাইবে। কি করিয়া জাপান বৃহৎশক্তিদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, কি হেতু এখনও চীনের অশান্তি ও অনৈক্য বর্ত্তমান এবং কেনই বা পাশ্চাত্য শক্তিগুলি পুনরায় প্রাচ্যে তাদের পূর্ব্বের ক্ষমতা ফিরাইয়া পাইবার উদ্যম করিতেছে, তাহার একটা যথাযথ উত্তর না পাইলে জগতের ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, বর্ত্তমান জাপানের উত্থান কেবল জাপানীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। ইহা সত্য যে, জাপানের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও সামরিক ঐতিহ্য জাপানীদের জাগরণে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে এবং ইহাও মানিতে হইবে যে, মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর জাপানী নেতারা এশিয়া ভূখণ্ডের ভাগ্য বিপর্য্যয় হইতে নানা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, এইগুলি মূলতঃ নঙর্থক সত্য। জাপানের তুলনায় চীনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য কোন অংশে নিকৃষ্ট তাহা কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে। অন্যদিকে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চীনের রাজনৈতিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের তুলনায় জাপানের আভ্যন্তর অনৈক্য নানাদিক দিয়া বেশী বই কম ছিল না। তখন জাপানের বিভিন্ন অভিজাত বংশীয় পরিবারের গোষ্ঠীগত বিরোধ জাপানী জাতীয় জীবনের একটা অঙ্গ বিশেষ ছিল বলিলেও ভুল হইবে না।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ নৌ-সেনাপতি পেরী কামান দাগাইয়া যখন জাপানীদের আড়াইশত বছরের ঘুম ভাঙ্গাইলেন এবং জাপানকে বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন, তখন জাপানের আসল কর্ত্তা ছিলেন টকুগাওয়া সগুনদের পরিবার। আর জাপানের সম্রাট পরিবার ছিলেন ইঁহাদের হাতের পুতুল। এই দীর্ঘ জাতীয় "বনবাস" পর্ব্বে জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। টকুগাওয়ারা ছিলেন

প্রবল বিত্তশালী জমিদার। কিন্তু ইঁহারা ক্রমেই সহুরে হইয়া পড়িতেছিলেন। সহরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইঁহাদের যোগাযোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। ইঁহাদের সহিত মাটির যোগ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সহরে অর্থের প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ফয়দালী (feudal) ব্যবস্থার মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিল। বিখ্যাত মার্কিন লেখক Owen Lattimore তাঁহার "Solution for Asia" (1945) পুস্তকে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "The urbane English historian Sansom, beautifully describes how the feudal standard of revenue from the land in grain interacted with the merchant standard of revenue from profit on the turnover of capital. Markets and prices were upset and all values confused to the point where some samurai surrendered their social privileges for the sake of economic advantage, while on the other hand so many prosperous merchants were attracted by the prestige of an aristocratic connection that there came to be 'a regular tariff for the entry of a commoner into a samurai family'. [ঐ সময়ের ফয়দালী মাপকাঠিতে দেওয়া ভূমিকর আর ব্যবসায়ীদের সহুরে মাপকাঠিতে দেওয়া রাজস্বের পরস্পর সম্বন্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক সুলেখক স্যানসম সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটি দেওয়া হইত শস্যের আকারে আর দ্বিতীয়টি দেওয়া হইত বণিকদের পুঁজির লাভের অংশ হইতে কাঁচা টাকায়। ফল হইল এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের দরের কোন ঠিক ঠিকানা রহিল না এবং মূল্য নির্ণয়ের সর্ব্বপ্রকার পন্থা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল যে, অনেক সামুরাই পরিবার আর্থিক সুবিধা পাইবার আশায় সব রকম সামাজিক অধিকার ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। অন্যদিকে বহু ধনী বণিক-পরিবারের ও অভিজাত বংশীয়দের সহিত যোগাযোগের সম্মান লাভের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কালে এমন হইল যে 'সাধারণ লোকের পক্ষে সামুরাই পরিবারে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে একটা প্রবেশিকার তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল'।]

এই সব কারণে টকুগাওয়া গোষ্ঠীর ক্ষমতা ক্রমেই কমিতে লাগিল। বহিঃশত্রুর হাত হইতে জাপানকে রক্ষা করিবার যখন সময় আসিল তখন ইঁহাদের শক্তির উৎস শুকাইয়া আসিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে ইঁহারা অন্যের হাতে ক্ষমতা না ছাড়িয়া পারিলেন না। এইবার যাঁহাদের উপর জাপানের নেতৃত্বের ভার পড়িল তাঁহারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল দলের লোক এবং ইঁহাদের ফয়দালী ভিত্তি তখনও বিনষ্ট হয় নাই। ল্যাটিমোর লিখিয়াছেন: "They had unimpaired feudal control

over their own retainers and peasants, whereas changes had grown up slowly around the Tokugawa until it embarrassed them like heavy ivy on an old oak." [ইঁহাদের নিজস্ব অনুচর ও কৃষকপ্রজাদের উপর এইসব ভূস্বামীদের কয়দালী কর্ত্তৃত্ব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল, অথচ অন্যদিকে টকুগাওয়াদের চারিদিকে আস্তে আস্তে এমন সব পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল যে, ইঁহারা মোটা আইভিলতা বেষ্টিত বৃদ্ধ ওক গাছের মত নিজেদের ভারাক্রান্ত বোধ করিতে লাগিলেন।] ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের বর্ত্তমান বা মেইজি (meiji) যুগের সূচনা হইল।

এই সময় হইতে সুরু করিয়া ১৯৪৫ সালে যুদ্ধে পরাজিত হওয়া পর্য্যন্ত জাপান্ নানাদিক দিয়া যে অভিনব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার মোটামুটি ইতিহাস শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রগতির একটা বিশেষ দিক আছে যাহার সঙ্গে সাধারণতঃ লোকের পরিচয় খুব কম। মনে রাখিতে হইবে যে, অতি অল্পকাল আগে পর্য্যন্ত জাপানীরা পাশ্চাত্য জাতিদের কাছ হইতে যত বহুমুখী সুযোগ ও সাহায্য পাইয়াছে তাহা অন্য কোন প্রাচ্য জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। এই সহযোগিতা যে জাপান প্রীতিপ্রসূত নহে তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক প্রীতির আসল উৎস সব সময়েই স্বার্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুদূর প্রাচ্যের শক্তি-সাম্য যে-পর্য্যায়ে ছিল তাহাতে বিশেষতঃ বৃটেনের নিজের স্বার্থের পূরক হিসাবে জাপানকে সাহায্য করাই তাহার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় মনে হইয়াছিল—দুই কারণে। রাশিয়ার পূর্ব্বমুখী প্রসার রোধ করিতে গিয়া জাপান ইহার বিরুদ্ধে লড়িয়া কেবল যে নিজের ক্ষমতা বর্দ্ধন করিয়াছিল তাহা নহে, পরোক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও সাহায্য করিয়াছিল। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে যে-সন্ধি ছিল ইহা তাহার প্রমাণ দেয়। জাপানকে সাহায্য করার পিছনে চীনকে অক্ষম রাখাও পাশ্চাত্য শক্তিদের আরেকটা অভিসন্ধি ছিল। চীন ঐক্য লাভ করুক ও শক্তিশালী হইয়া উঠুক ইহা ইহারা চায় নাই, এখনও চায় না। ইহারা ভাল রকমেই জানে যে, চীনের লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক ধনসম্ভার ও চীনাদের কর্ম্মের ক্ষমতা এমন যে, চীন শক্তিশালী হইয়া উঠিলে সুদূর প্রাচ্যের শক্তিসাম্যের রূপ আমূল বদলাইয়া যাইবে। এই অবস্থা ঘটিলে সেখানে পাশ্চাত্য শক্তিদের ক্ষমতা কমিয়া আসিতে বাধ্য। অতীতে জাপানকে সাহায্য করার ব্যাপারে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিদের এই দিক দিয়া কোন ভয়ের কারণ ছিল না। নিজের শক্তিবিকাশের সম্ভাবনার দিক দিয়া চীনের সহিত জাপানের তুলনা হয় না। সেই হেতু নিজের গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে গিয়া জাপানকে বহির্মুখী হইতে হইয়াছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত হইল দেশের

প্রাকৃতিক অপ্রাচুর্য্যের এই পটভূমিকায়। বলাবাহুল্য ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা এই অবস্থার যথাযথ সুযোগ নিতে ছাড়ে নাই। চীনের প্রতি জাপানের ব্যবহার হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া চীনে যে-যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বৃটেন ও তাহার অনুবর্ত্তী শক্তিদের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ মন্ত্রী মিঃ এমেরি (Amery)র কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। এই বিষয়ে মিঃ লেটিমোর যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য : "Foreign interests in China also had their interests and their compromisers. The extremists were the die-hards who believed that there would be no peace and security in the Far East until the Chinese were 'taught a lesson', and that the lesson ought to be military. As time went on, these die-hards tended to link up more and more openly with the Japanese. They were loud in justfying the Japanese invasion of Manchuria in 1931 and the savage Japanese attack on Shanghai in 1932. They continued to find excuses for Japan even in 1937 and later. Many of them were British, but some were American, and they had considerable influence with their Governments". [চীনের বিদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে উগ্রপন্থী ও আপোষকারী দুই দল ছিল। ইঁহাদের মধ্যে রক্ষণশীল দল ছিলেন উগ্রপন্থী এবং তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, চীনাদের 'বিশেষ ভাবে শিক্ষা না দিলে' সুদূর প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিবে না এবং এই শিক্ষাটা সামরিক রূপ লউক ইহাও তাঁহারা চাহিয়াছিলেন। কালে এই জবরদস্ত দল জাপানীদের সহিত উত্তরোত্তর প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ১৯৩১ সালের জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩২ সালে সাংহাইয়ের উপর বর্ব্বরোচিত আক্রমণকে চড়া গলায় সমর্থন করিতে লাগিলেন। এমন কি ১৯৩৭ সালে ও তাহার পরেও তাঁহারা জাপানের পক্ষ হইয়া নানা অজুহাত খুঁজিতে লাগিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ব্রিটিশ, কেউ কেউ আমেরিকান এবং তাঁহাদের সবারই নিজেদের সরকারের উপর বেশ প্রভাব ছিল।]

এখন বুঝা সহজ হইবে কেন এখনও চীনের গৃহবিবাদ মিটিল না। চীনকে বিভক্ত রাখা বিদেশী স্বার্থের সহায়ক এবং জাপানের পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শক্তিদের মনোভাব বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গৃহযুদ্ধের সাম্প্রতিক তোড়জোড় হইতে ইহার বেশ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মার্কিন বৈদেশিক নীতির পক্ষে জাপানকে

জিয়াইয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা ও চেষ্টা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অধ্যাপক স্পাইম্যানের লেখা সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের বর্ত্তমান জাপানী-নীতি একই সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে চীনে চিয়াংকাইশেকের দলকে আমেরিকা বিপুল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া যে ভাবে সাহায্য করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে চীনে শান্তি বা ঐক্য স্থাপিত হইবার আশা করা বৃথা। মার্কিন রাজদূত জেনারেল মার্শেল যে কুওমিনটাং ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বোঝাপড়া করাইতে নিষ্ফল হইয়াছেন তাহাতে আসলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কম্যুনিস্টরা বেশ বোঝে যে, যতদিন আমেরিকা চিয়াংকাইশেককে সাহায্য করিতে থাকিবে ততদিন ইহাদের পক্ষে কুওমিনটাং দলের সহিত সমভাবে কোন আলোচনা চালান অসম্ভব। কুওমিনটাঙ্গীরাও তাহাদের বর্ত্তমান প্রাধান্য ছাড়িতে নারাজ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, চীন সম্বন্ধে মার্কিন নীতির রাজনৈতিক দিক ছাড়াও একটা আর্থিক দিক আছে। মার্কিন পুঁজিবাদীদের পক্ষে চীনের ঐক্য স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন, যে-কারণে ভারতবর্ষে ইংরেজরা পাকিস্থানী মতবাদ অনুমোদন করা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট করিতে গররাজী। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই সঙ্কটকালে পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে আধুনিকতার নাগপাশে বাঁধিয়া পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের সহিত জুড়িয়া দিতে পারিলে অনেকের বিশ্বাস এই সঙ্কট অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অতিক্রান্ত হইবে। চীন দেশের ঐক্য সাধিত হইলে মার্কিনোদ্ভূত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ও উদ্বৃত্ত পুঁজি খাটাইবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোথায় মিলিবে? আর এই বিশ্বাসের পিছনে যে অনেকটা সত্য আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মার্কিন সাংবাদিক 'এডগার স্নো'র কথায় বলিতে গেলে "Anglo American capital and technique" অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজি ও যান্ত্রিকতাকে চীন প্রভৃতি পশ্চাৎপদ দেশের কাজে লাগাইতে পারিলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা সম্ভব হইবে।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কিনের চৈনিক নীতির মধ্যে যে-দ্বন্দ্বটি বর্ত্তমান তাহার এখনও কোনও কূল কিনারা পাওয়া যায় নাই। ১৯৪৫ সালের সোভিয়েট চীন সন্ধি-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ও মস্কো সিদ্ধান্তের পর একবার মনে হইয়াছিল যে, সুদূর প্রাচ্যে ক্রমে মার্কিন-রুষ বিরোধ প্রশমিত হইবে এবং চীনের আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই বিরোধ দেখিতে দেখিতে জগদ্ব্যাপী রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ আজ গৃহবিবাদ কেবল চীনে নহে সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। সুতরাং যতদূর দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান পর্ব্বে চীনের আভ্যন্তরীণ কলহ তিন ভাবে শেষ হইতে পারেঃ (১) কুওমিনটাং-কম্যুনিষ্ট মৈত্রী; (২) কম্যুনিষ্টদের উচ্ছেদ সাধন ও (৩) সোভিয়েট-মার্কিন মৈত্রী। এ

যাবৎ নানা কারণে কম্যুনিষ্ট-কুওমিনটাং মৈত্রী সাধিত হয় নাই এবং বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে হইতে পারেও না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সম্প্রতি কুওমিনটাংএর পক্ষ হইতে যে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অভিযান সুরু হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, মার্কিন নেতারা মুখে স্বীকার না করিলেও ইঁহাদের প্ররোচনায় সমস্ত ব্যাপারটা ঘটিতেছে। ইদানীং চীন হইতে ইয়াঙ্কী সৈন্য অপসারণের জন্য যে-রব উঠিয়াছে ইহাও তাহার আভাস দেয়। এই ঘটনাবলী হইতে আরও একটা কথা প্রমাণিত হইতেছে যে, সুদূর প্রাচ্যে সত্বর মার্কিন-রুষ মৈত্রীর ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

চীন হইতে রাশিয়ার প্রভাব দূরে রাখিবার চেষ্টার বিপদ কম নয়। চীনবাসীরা কোন্ শক্তিকে বন্ধু হিসাবে বরণ করিবে তাহা জবরদস্তি করিয়া স্থির করা যাইবে না নিশ্চয়। এশিয়া জুড়িয়া আজ সর্ব্বত্রই লোক বিশেষ বিশেষ দেশের আন্তর্জাতিক আচরণ সঠিকভাবে বিচার করিতে শিখিতেছে। "Politics of attraction" বা আকর্ষণ-নীতিতে আমেরিকা যে চীনকে নিজের দিকে টানিতে পারিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ল্যাটিমোর লিখিয়াছেন: "A power of attraction is not, however, in itself a policy of attraction. In order to practise a policy, there must be an objective." [আকর্ষণের ক্ষমতাকে কিন্তু আকর্ষণের নীতি বলিলে ভুল করা হইবে। কোন একটা নীতিকে অনুসরণ করিতে হইলে, সেই নীতির গন্তব্যটা জানা দরকার। [ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একদল লোক চিরকালই মার্কিনের দিকে আকৃষ্ট হইবে। আমেরিকার ধনদৌলত ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির আকর্ষণ মার্কিনদের ক্ষমতার একটা বড় বিজ্ঞাপন। কিন্তু ইহাই সব নয়। ল্যাটিমোর এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "In Asia, the soviet union has a major power of attraction, locked by a history of development and a body of precedents.

There was one striking difference between Tsarist Russia and all other colonial empires. Russia's Asiatic possessions were not divided from it by sea, but formed part of the same vast stretch of land in which lay Russia proper. The Russians were therefore in contact with their conquered subjects as a whole people, not merely through an overseas class of administrators and managers of colonial enterprises. When the Revolution broke out, it involved at the same time and in interaction with each other both those who had been masters and those who had been subjects or powerless minorities.

Because of this interaction the Bolshevik Revolution, especially in Asia, was a triple process of disintegration, integration and reintegration. The revolutionaries needing every ally they could attract to make possible the overthrow of tsarism, resorted to disintegration of the imperial structure by proclaiming equality of political rights for all subjects and minority peoples. These peoples then integrated themselves into new political units of their own, according to their numbers, the size of their territory, the extent of their resources and other factors which condition the ability of any people to live unto itself."

[এশিয়ায় সোভিয়েট সম্মিলনের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন ও কর্ম্মের আদর্শের ভিতর দিয়া একটা বৃহৎ আকর্ষণী শক্তিলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তির সহিত জারিস্ট রাশিয়ার একটা আশ্চর্য্য রকমের প্রভেদ ছিল। এশিয়ার রুষীয় উপনিবেশগুলি রাশিয়া হইতে সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত ছিল না। এইগুলি খাস রাশিয়ার একই বৃহৎ অঙ্গের সামিল ছিল। সুতরাং তাহাদের বশীভূত প্রজাদের সহিত রাশিয়ানদের সম্বন্ধ একটা সমস্ত জাতি হিসাবে ছিল, অন্যদের মত এই যোগাযোগ কেবল স্বজাতীয় এক শ্রেণীর শাসকদল বা ব্যবসায়ীদের দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। এই কারণে যখন সোভিয়েটবিপ্লব আসিল, তখন ইহার কবলে শাসক ও শাসিতদের দুই শ্রেণীকেই যুগপৎ জড়াইল।

এই পারস্পরিকতার দরুণ বলশেভিক বিপ্লব, বিশেষতঃ এশিয়ায়, ভাঙ্গন, গড়ন ও নূতন ভিত্তিতে পুনর্গঠনের রূপ নিল। বিপ্লবীরা জারের রাজত্ব বিনাশ-সাধনের জন্য চারিদিকে সাহায্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সব পরাধীন ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ জাতিদের রাজনৈতিক অধিকারের সমত্ব ঘোষণা করিল এবং এইভাবে সাম্রাজ্যের বন্ধন চুরমার করিতে সচেষ্ট হইল। তারপর এই সমস্ত জাতি নিজেদের সংখ্যা, প্রদেশের আয়তন, ধনদৌলত ও অন্যান্য অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে লাগিল।]

এইস্থানে বক্তব্য এই যে, আমেরিকান বা যতদিন পুঁজিবাদের বনিয়াদের উপর নিজেদের চৈনিক নীতি দাঁড় করাইতে সচেষ্ট হইবে ততদিন চীনাদের মাঝে ইহাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা স্থাপিত করিবার চেষ্টা টিঁকিবে না। এই হেতু ইতিমধ্যেই চীনে ও অন্যত্র মার্কিন-প্রীতির ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। লোকে স্পষ্টই দেখিতেছে যে, আমেরিকার কথা ও কাজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। লেটিমোর প্রভৃতি অনেক চিন্তাশীল মার্কিণবিশেষজ্ঞ এই মার্কিণ বিরোধী বিবর্ত্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

সচেতন কিন্তু এখনও ইঁহাদের কথায় বড় কেহ কান দিতেছে না। আমেরিকার ক্ষমতা এখনও অপ্রতিহত এবং যতকাল আরেকটা আর্থিক সঙ্কটের ধাক্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় আন্দোলিত না হইবে ততদিন ঐ দেশের ক্ষমতা ও সমাজ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে অটল থাকিবে। কেবল ভয়ের কথা এই যে, মার্কিণের বৈদেশিক নীতি একবার ভুল পথে গেলে ইহার জের অনেককাল চলিবে।

ওয়ালটার লিপম্যান তাঁহার "U. S. War Aims" গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "...I hold that our true policy with Russia does not require us to prejudge the question whether Russia is to be a dynamic expanding power or a satisfied and quiet one. On either hypothesis, or any variation between extreme optimism and pessimism, will severe our vital interests by maintaining and perfecting the Atlantic community". [আমি মনে করি যে রাশিয়ার প্রতি আমাদের নীতি স্থির করিতে হইলে রাশিয়া গতিশীল প্রসারী শক্তি অথবা সন্তুষ্ট শান্তিপ্রিয় শক্তি, এই প্রশ্ন আগে হইতে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। এই দুই অনুমানের মধ্যে যেটাই সত্য বা আধা সত্য হউক না কেন আমাদের আসল স্বার্থ নির্ভর করিতেছে আতলান্তিক গোষ্ঠী রক্ষা ও দৃঢ়ীকরণের উপর।] আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন: "Russia and America can have peace if they use their alliances to stabilize the foreign policy of their allies. They will have war if either of them reaches out for allies within the orbit of the other, and if either of them seeks to incorporate Germany or Japan within its strategical system". [রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি বজায় থাকিবে যদি ইহারা দুইজনেই ইহাদের মিত্রশক্তিদের বৈদেশিক নীতিকে সুদৃঢ় করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইবে যদি ইহারা একে অন্যের এলাকায় বন্ধু খুঁজিবার প্রয়াস করে এবং জার্ম্মেণী বা জাপানকে নিজেদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থার সামিল করিয়া লইবার চেষ্টা করে।"]

বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মার্কিণ নেতারা সমস্ত জগতকে একদিকে আতলান্তিক গোষ্ঠী ও ইহার অনুগত দেশগুলি এবং অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া আর ইহার বন্ধুবর্গের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইতে চান। পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান ও চীন আতলান্তিক গোষ্ঠীর অনুগত হইবে এই ইঁহাদের কাম্য। এই দেশগুলি যে কখনও সত্যিকারের স্বাধীনতা পাইবে তাহা ইঁহাদের অভিলষিত নহে। এই হেতু জাপানের ভবিষ্যৎ লইয়া রাশিয়া ও মার্কিনের

মধ্যে যেমন মন কষাকষি, চীনের ভবিষ্যৎ লইয়াও ইহাদের মধ্যে তেমনি বিরোধ চলিতেছে।

আতলান্তিক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাশালী করিবার আরেকটা দিক হইতেছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্য উপনিবেশগুলির উপর য়ুরোপীয় প্রাধান্য আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা মার্কিনের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। বস্তুতঃ ফিলিপাইনের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা ঘোষণা হইতে আমেরিকা এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ফিলিপাইনের স্বাধীনতা নামে মাত্র, কার্য্যতঃ ইহাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোনি বলিলে ভুল হইবে না।

ভারতবর্ষের নিজের ভবিষ্যতের দিক দিয়া সুদূর-প্রাচ্যের যুদ্ধোত্তর বিবর্ত্তন মোটেই আশাপ্রদ নহে। জাপানের পরাজয়ের ফলে পূর্ব্ব এশিয়ার শক্তি-সাম্য সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চীন যদি সত্য সত্য শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব এশিয়ার শক্তি-সাম্যে আরেকটা নূতন ভিত্তি গড়িয়া উঠিত যাহা কালে ভারতবর্ষ তথা সমস্ত এশিয়ার পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইত। জাপানের শক্তি কোন কালেই বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকা ও তাহার মিত্রশক্তিদের সমকক্ষ হয় নাই। জাপানের সহিত আমেরিকার সম্বন্ধ চিরকালই পরিপূরক, পরস্পর-বিরোধী নয়। অন্যদিকে চীনের স্বাধীনতা প্রাচ্যে পাশ্চাত্য স্বার্থের পরিপন্থী। বলাবাহুল্য এংলোস্যাকসনদের চীন-প্রীতি একটা ভাণ মাত্র। তাই গৃহযুদ্ধ উসকাইয়া চীনকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাময়িক সাহিত্য

প্রবন্ধ

অহিংসা ও গান্ধী: অতুল্য ঘোষ; দি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড, ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য দুই টাকা।

গান্ধীজির চিন্তাধারার বিচিত্র দিক নিয়ে গত কয়েক বৎসরে ইংরিজিতে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সকলেই যে গান্ধীপন্থী তা নয়, লেখকদের নামের তালিকায় গান্ধীবাদে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এই দুই শ্রেণীর মানুষেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে যেমন শ্রদ্ধাবান, নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত আছেন, তেমনি অবিশ্বাসী বা অর্ধ-বিশ্বাসী লেখকেরও অভাব নেই। পেশাদার ভারতীয় সাংবাদিক, বিদেশাগত সাংবাদিক, কংগ্রেসসেবক, লীগপন্থী, কম্যুনিষ্ট, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, ধনতন্ত্রের পোষক বা ধনীর দালাল লেখক, স্বতন্ত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকা ও মতের লোক মিলেই গান্ধীজিসম্পর্কিত আলোচনাকে বিচিত্রায়িত করে তুলেছে। এতে এই শুধু বোঝায় যে গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার আদর্শ ব্যাপকভাবে গৃহীত হোক বা না হোক, তা বিভিন্ন ধারার আধুনিক মানুষের মনে সুগভীর চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং এঁদের সম্মিলিত আলোচনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে "গান্ধীবাদ" (যদিও "গান্ধীবাদ" কথাটিতে গান্ধীজির নিজের বড়ো আপত্তি) বস্তুটি কি তার একটা আভাস ক্রমেই মানুষের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এটাকে সাম্প্রতিক জীবনের একটা paradox বলেই ধরে নিতে হবে যে আণবিক বোমা ও গান্ধীবাদ দুই-ই আজ আমাদের মনে সমান সক্রিয়।

গান্ধীজির চিন্তাধারাকে যাঁরা সশ্রদ্ধ চিত্তে অনুধাবন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিনোবা ভাবে ও শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবাল এবং বাংলাদেশের অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও অতুল্য ঘোষের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জনের লেখার পেছনে গান্ধীজির সাক্ষাৎ অনুমোদন রয়েছে; অধ্যাপক বসু কিম্বা অতুল্যবাবুর ক্ষেত্রে এই অনুমোদন নেই সত্য তবে তাঁদের বিশ্লেষণকেও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে বাধা নেই। বিশেষ করে অতুল্যবাবু বহুদিনের কংগ্রেস সেবক; গান্ধীজির আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা বিশ্বাস ও কর্ম এই উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত—কাজেই গান্ধীবাদের বিচিত্র দিকের সুশৃঙ্খল, বিধিবদ্ধ আলোচনা তাঁর কাছ থেকে আমরা সহজেই আশা করতে পারি।

সেই আশা তিনি অনেক পরিমাণে পরিপূরণও করেছেন। তাঁর 'অহিংসা ও গান্ধী' গান্ধীবাদের একটি নির্ভরযোগ্য ভূমিকারূপে বাংলাভাষা-ভাষীর নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে

বলে আমাদের বিশ্বাস। অতুল্যবাবুর সমস্ত বিশ্লেষণই যে আমরা মেনে নিতে পেরেছি এমন নয়, তাঁর অনেক বক্তব্য সম্পর্কেই আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে গেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির যে পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারা তিনি তুলে ধরেছেন তাতে ব্যক্তির ভূমিকাকে তিনি নিতান্তই খাটো করে দেখেছেন বলে মনে হয়; তৎকৃত মার্ক্‌স্‌বাদের ব্যাখ্যাও আমাদের চোখে ভাসাভাসা বলে বোধ হয়েছে। 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশন'-এর প্রশ্নটিরও যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি করেছেন বলে আমাদের মনে হল না। তবু এ সব সত্ত্বেও বল্‌বো, সমগ্রভাবে গান্ধীবাদ সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু আভাস বইটির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীযুক্ত অগ্রবালের লেখাগুলিতে তাঁর নিজস্ব চিন্তার পরিস্ফুটনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না; উদ্ধৃতিজালে কেবলই তা সমাচ্ছন্ন। আচার্য বিনোবা ভাবের "স্বরাজ্য-শাস্ত্র" (ভারতন কুমারাপ্পা কর্তৃক ইংরিজিতে অনূদিত) পুস্তকে মৌলিকতার চিহ্ন আছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগের অভাব তাতে নিতান্তই স্পষ্ট। অতুল্যবাবুর রচনা এই দ্বিবিধ ত্রুটি থেকে অন্তত কিছু পরিমাণে মুক্ত। তবে গান্ধীবাদকে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন একথা বল্‌লেও ভুল করা হবে—তাঁর বইয়ের যথার্থ বর্ণনা বোধ হয় এই যে তাতে গান্ধীবাদ-সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে বিশদীকৃত করা হয়েছে। তবে অন্যান্য অনেক বই থেকে তাঁর বইয়ের সুস্পষ্ট তফাৎ এইখানে, তিনি বিষয়টিকে আগাগোড়া সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন: তাঁর লেখার ছাঁদটুকু যেমন চমৎকার, তেমনি তাঁর বাংলা বিশুদ্ধ, পরিমার্জিত অথচ প্রাঞ্জল। নারায়ণ চৌধুরী

গ্রীক দর্শন: শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী

হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা: শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ (প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। দাম—প্রতিখণ্ড আট আনা)

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের আরো দুখানি নতুন বই আমাদের হাতে এসেছে—গ্রীক দর্শন এবং হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা।

শ্রীযুক্ত শুভব্রত রায়চৌধুরী থালেস থেকে শুরু করে অ্যারিষ্টটলের কাল পর্যন্ত গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; পৃথিবীর জন্ম-রহস্য, তার বুকে প্রাণের আবির্ভাব এবং পূর্ণতম বিকাশের পথে প্রাণময় পৃথিবীর ক্রম-অভিসারের ইতিহাস তাঁর এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। "জড় পৃথিবীর বুকে ক্রমে জেগে উঠল প্রাণের স্পন্দন,—এল তরুলতাপাতা, এল পশুপাখী; তারপর ধীরে ধীরে জীবজন্তু বিবর্তিত হলো মানুষে।" অব্যক্ত প্রজ্ঞা তার অভিব্যক্তি পেলো মানুষের বিচারবুদ্ধির ভিতর দিয়ে। ঈশ্বরের মধ্যে এই প্রজ্ঞারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি খুঁজেছেন অ্যারিষ্টটল।

শুভব্রতবাবু যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই এই দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমানুসারী সংবদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াস পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও বিষয় পরিবর্তনের সময় দুএক জায়গায় হোঁচট খেতে হয়। বিষয়ের পরিধির তুলনায় আলোচনার পরিসর বড়ো বেশী ক্ষীণায়তন বলেই হয়তো।

শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাশ 'হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা' গ্রন্থে আর একটি জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিন্দুমাত্র অনুদার নয়; আলোচনার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছেন তিনি। ভাষার প্রাঞ্জলতায় বিষয়বস্তুর কাঠিন্য যে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবীভূত হয়ে এসেছে—এ কথা অনস্বীকার্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গল্প

ইমারত : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—এগারো সিকা।

সাহিত্যিকের সাহিত্যসাধনার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক ওতঃপ্রোত। লেখকের মূল্যনির্ণয়ে যেসব সমালোচক তাঁকে পাঠকের মনস্তুষ্টিবিধানের একটি নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রমাত্র মনে করেন, তাঁর সমাজিক সত্তাকে হিসেবের মধ্যে ধরেন না, তাঁরা লেখকের যথাযথ পরিমাপ করেন বলে মনে হয় না। উত্তরজীবনে লেখক যে সাফল্য অর্জন করেন তার মূল গিয়ে একেবারে বাল্যজীবনের প্রান্তে মিশেছে : বাল্যের সংস্কার, বাল্যের আবেষ্টনী, বাল্যের প্রভাব এই দিয়েই সাহিত্যিকের সাহিত্যসাধনার মূলপ্রেরণাটুকু তৈরী। উত্তরজীবনে তিনি যে শিক্ষাগ্রহণ করেন, সংস্কৃতির আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন, কিম্বা বিভিন্ন চিন্তাধারা ও আদর্শের সংস্পর্শে এসে নিজের রুচিকে বিকশিত করার সুযোগ পান, সেগুলিও তাঁর ব্যক্তিত্বের অংশ বটে, কিন্তু তারা বাল্যজীবনের সংস্কারের মতো দৃঢ়মূল নয়। অবস্থাভেদে পরিবেশভেদে পরিণত জীবনের রুচি ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটতে দেখা যায়, কিন্তু শৈশবের কতকগুলি সংস্কার লেখকের জীবনে আমরণ স্থায়ীপ্রভাবেব মতো কাজ করে যায়। বাল্যজীবনের আবেষ্টনীই লেখকের প্রেরণার আদি ও একমাত্র অকৃত্রিম উৎস।

লেখকদের মধ্যে কথাসাহিত্যিকদের সম্পর্কে একথা আরো বিশেষভাবে খাটে। আপাতত 'ইমারত' গল্পগ্রন্থটির সমালোচনাপ্রসঙ্গে তারাশঙ্করবাবুর দৃষ্টান্ত আমার হাতের কাছে রয়েছে, তাঁকে দিয়েই এই কথাটি আরো বিশেষভাবে প্রমাণ করা যায়। তারাশঙ্করবাবুর মানসিক গঠনে শৈশবে অর্জিত পল্লীজীবনের কতকগুলি শুভপ্রভাব অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে রয়েছে, সেই কল্যাণকর আবেষ্টনীজাত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যকে সর্বাংশে অনুরঞ্জিত করেছে আমরা দেখতে পাই। বাল্যের প্রভাব সমস্ত লেখকের ক্ষেত্রেই যে আশীর্ব্বাদ হয়ে দেখা দেয় তা নয়, কারও কারও বেলায় তা বিপরীত ফলও প্রদান করে। কিন্তু তারাশঙ্করবাবু এই দিক থেকে ভাগ্যবান যে তাঁর প্রথম-জীবনের পরিপার্শ্ব তাঁর উত্তরজীবনের সাহিত্যসাধনার পক্ষে অশেষ কল্যাণের আকর হয়েছে। গ্রামের বাড়ীর সঙ্গে যাঁর যোগ নেই, পল্লীবাসীর অন্তরের মধ্যে নেবে যিনি দেখেন নি, যাঁর বাল্যজীবন কেটেছে কল্‌কাতার খুপ্‌ড়ির মধ্যে, বড়ো হয়ে ইচ্ছে করলেই তিনি পল্লীজীবনের গল্প লিখতে পারেন না—প্রচলিত সাহিত্যিক প্রভাবের বেড়ের ভিতর পড়ে তিনি সেইদিকে চেষ্টা করলেও তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর সেই ভয় নেই—আজ যদিও তিনি সাহিত্যিক জীবিকার উপলক্ষে সহরবাসী, সহরের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো বিচিত্র কর্মস্রোত ও ততোধিক বিচিত্রভাবপ্রবাহের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুটিতে অবস্থিত, তা হ'লেও অন্তরে তিনি আজও নিঃশেষে পল্লীর মানুষ বলায় তারাশঙ্করবাবুর প্রতিভাকে সঙ্কুচিত করা হয় না, এতে বোঝায় শুধু এই কথা যে পল্লীতেই তাঁর ভাবরূপের অধিষ্ঠান; পরবর্তী জীবনে তিনি সৃষ্টির ধারাকে বিচিত্র স্রোতে প্রবাহিত করেছেন বটে কিন্তু পল্লীপ্রাণতাই তার উৎস। পল্লীর ঐতিহ্যে যা কিছু সুন্দর, মহৎ ও কল্যাণময় তাই তারাশঙ্করবাবুর অগণিত শাখাপত্রজালসমাচ্ছন্ন সৃষ্টিতরুর কাণ্ড।

'ইমারত' বইটিতে সবশুদ্ধ গল্প আছে ছয়টি—'ইমারত', 'নারী', 'তৃষ্ণা', 'আরোগ্য', 'তমসা' ও 'শবরী'। এর মধ্যে 'নারী' গল্পটিকে বাদ দিলে আর সবগুলি গল্পকেই পল্লীজীবনের বিচিত্র আলেখ্য-

রূপে অভিহিত করা যায়। অবশ্য 'তমসা' গল্পে না-গ্রাম না-সহর রেলওয়ে ষ্টেশনকে পারিপার্শ্বিকরূপে খাড়া করা হয়েছে কিন্তু যে মানুষটিকে নিয়ে গল্পটির কারবার সেই অন্ধ 'পঙ্খী' নিঃশেষে গ্রামের দান—গ্রাম থেকেই সে ছিটকে এসেছে। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এলেও তার আচরণ ও আবেগে পল্লীর ছোপটাই এখনও বলবৎ।

এই বইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প চারটি—'ইমারত', 'আরোগ্য', 'তমসা' ও 'শবরী'। 'ইমারত' গল্পে জনাব সেখ রাজমিস্ত্রীর যে চরিত্র আমরা পাই তাতে দোষেগুণে মানুষটিকে ভালো না বেসে আমরা পারি না। জনাব কোনোদিন কাজে ফাঁকী দেয় নি, কারও অনিষ্ট করে নি, অন্যায়ভবে অর্থোপার্জন করে নি, শুধু তার দোষের মধ্যে ছিলো তার কাজের যোগানদার মজুরণী মেয়েদের প্রতি একই সঙ্গে তার প্রগাঢ় অন্তরের টান ও যৌন-দুর্বলতা। এই 'গোনাহ্' সম্পর্কে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতনও ছিলো—তাই 'আল্লাতায়লার' কাছে এর জন্যে সে প্রতিনিয়ত ক্ষমাভিক্ষা করেছে। যৌন ব্যাধির মধ্যে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্তও তাকে করতে হয়েছে, কিন্তু সারাজীবনে নিজে হাতে বিচিত্র ছাঁদের অসংখ্য ইমারত গ'ড়ে অন্তিমে যখন সে ইচ্ছে করেই বুড়ো বটগাছের পাতায় ঢাকা চাঁদোয়ার নিচে শেষ শয্যা পাতলে সংসারে তাকে মাথাগুঁজবার ঠাঁই না দিলেও ভগবানের করুণার আশ্রয় সে পেয়েছিলো এইটেই আমরা দেখি। সেই ইমারৎই তার জীবনে সত্যিকার ইমারৎ—আর সব ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট। 'আরোগ্য' গল্পে অর্থের ক্লেদ ও তজ্জনিত মানসিক সঙ্কীর্ণতার চিত্রটি কি নিপুণভাবেই না আঁকা হয়েছে! রাসুঠাকরুণ অর্থের ক্লেদ থেকে মুক্তি পেয়ে এই যেন জীবনে প্রথম গভীর শান্তি ও তৃপ্তি পেলেন। গল্পের 'আরোগ্য' নামটি স্পষ্টতই তাৎপর্যপূর্ণ। 'তমসা' গল্পে সুন্দরীর গানের আবেদন 'কালা'র হৃদয়ে গিয়ে ঠিক পৌঁচেছিল কিন্তু সংসারের এই অজস্র মানুষের মেলায় 'কালাকে' চিনে বার করা এতো সহজ নয়—নইলে 'পঙ্খীকে' অপরিসীম মনোবেদনা ও আকুতি নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে কেন? শবরীর প্রতীক্ষার একটি শিল্পরূপ পেলাম 'শবরী' গল্পটিতে—নতুন দিনের আশায় অজস্র ব্যথা বেদনা লাঞ্ছনা আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই যে অগণিত ভারতবাসীর সুদীর্ঘ দুঃখবরণের পর্ব চলেছে উৎসুক প্রতীক্ষারতা সরলাপিসী যেন তারই প্রতীক আর 'মহারাজ গান্ধী'র আবির্ভাব যেন সেই নতুন দিনেরই পূর্বসূচনা। পৌরাণিক কাহিনীর শবরীর মতো আধুনিক শবরীর প্রতীক্ষাও ব্যর্থ হবার নয়, ব্যর্থ হয় নি। পিরান্দেলোর একটি গল্প পড়েছিলুম, জনৈক সৎলোক সারাজীবন পরের ভালো করতে চেয়েছে কিন্তু নিজে সে জীবনে কোনোদিন শান্তি পায় নি, একটা না একটা বিপর্যয় তার জীবনে লেগেই ছিলো। 'তৃষ্ণা' গল্পের ক্ষুদিরামের ভেতর তারই একটি এদেশীয় প্রতিরূপ পাওয়া গেলো। কিন্তু পরের মন পাওয়ার তৃষ্ণা ক্ষুদিরামের ব্যর্থ যায় নি, শ্রেণী-বৈষম্যের বেড়া ডিঙিয়ে কোনরূপ সঙ্কোচ না রেখে ব্রাহ্মণসন্তান ক্ষুদিরাম যখন সত্যিসত্যি মূলগায়েনরূপে জেলের দলে এসে মিশলে তার আজন্মের তৃষ্ণা নিশ্চয়ই সার্থকতার তৃপ্তিতে ভ'রে উঠেছিলো—পরের মন সে পেয়েছিলো।

নারায়ণ চৌধুরী

কবিতা

নষ্টচাদ—অজিত দত্ত। প্রকাশক: গ্রন্থকার। ২০২ রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা। দাম—১।০।

'কল্লোল' ও 'প্রগতি'-র যুগকে কেন্দ্র করে যে কয়জন কবি-সাহিত্যিক এককালে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং সেদিন কিঞ্চিৎ প্রশংসা পেয়ে এবং অপর্য্যাপ্ত অপ্রশংসার

বাধা ঠেলে অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন অজিত দত্ত তাঁদের অন্যতম। ইতিমধ্যে কোনো কোনো মহল থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এই কবিগোষ্ঠী নাকি আজ প্রাক্তন হয়ে পড়েছেন। তার কারণ বোধ হয় প্রথমতঃ এই যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে কাব্যক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিদায় নিয়েছেন বা নিচ্ছেন এবং কেউ বা রচনাশৈলী ও ভাবকল্পনার আবহগতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পুনরায় রবীন্দ্ররীতি ও মানসে আবর্ত্তিত হতে সুরু করেছেন; দ্বিতীয়তঃ, নতুনতর কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব। দুটি কারণের মধ্যে যোগাযোগ না থাকলেও, কারণ দুটি যে একেবারে মিথ্যে নয় তাও স্বীকার্য্য। নবতন যুগে নতুন সাহিত্যিকের উদ্ভব যে কোনো সাহিত্যের পক্ষেই মঙ্গলজনক, কিন্তু নতুন যুগকে আবাহন করতে গিয়ে পূর্ব্বতন সাহিত্যিকদের সাধারণভাবে প্রাক্তন আখ্যা দিয়ে সরিয়ে রাখলেও সুবিচার করা হবে না। পক্ষপাতিত্বের গ্লানি লাগবে তুলাদণ্ডের উভয় দিকেই। সুতরাং এই একচক্ষু বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়েও আধুনিকতম কবিতার ক্ষেত্রে যদি প্রাচীনতর কোনো কোনো কবিকে সসম্মানে প্রবেশাধিকার দেয়া যায়, আধুনিকতার গোঁড়ামী নিয়ে কেউ কেউ সোচ্চার প্রতিবাদ জানালেও, তা দোষাবহ হবে না। প্রাক্তন কবি-গোষ্ঠীর অন্যতম হয়েও অজিত দত্ত সেই সম্মানলাভের অধিকারী সন্দেহ নেই।

কোনো বিশেষ মত ও পথকে অবলম্বন করে মতবাদ প্রচার করার নাম যদি সাহিত্য-রচনা হয়, তবে হয়ত অজিত দত্ত কবি হিসেবে সমতালে এগিয়ে আসতে পারেন নি, কিন্তু ভরসা এই, প্রচার-প্রচেষ্টা সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম রীতি বলে কারো কারো কাছে স্বীকৃত হলেও তা সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। এবং এই কথাটিকে মানতে যদি বাধা না থাকে তবে কবি হিসেবে অজিত দত্ত এবং তাঁর কাব্যকে বুঝতে পারা সহজ হবে।

আসলে অজিত দত্ত কাব্য-বিশ্লেষণ ও বিচারে কোন কোঠায় পড়েন তা তাঁর পূর্ব্বতন কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' এবং 'পাতালকন্যা'তেই প্রকাশ। রোমান্টিক মনোভাব নিয়ে তিনি জীবনকে এবং তাঁর পারিপার্শ্বিককে দেখেছেন এবং বিচার করেছেন। আর সব চেয়ে আশার কথা তাঁর সে প্রেমানুভূতি কখনও ব্যবহারিক জীবনকে অতিক্রম করে কোনো এক অতীন্দ্রিয়লোকে প্রয়াণ করার চেষ্টা করেনি। যে যুগে সচেতন মন নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে এগিয়ে চলতে হয়, সে যুগে তা সম্ভবও নয়।

কবিমনের দলিলস্বরূপ আগের কবিতাগুলোর কথা মনে রাখলেই পাঠকের পক্ষে 'নষ্টচাঁদ'কে বুঝতে পারা সহজ হবে। তা না হলে 'নষ্টচাঁদে' কবিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। 'নষ্টচাঁদে'র সবগুলো কবিতাই যুদ্ধকালীন রচনা। যে বিশ্বব্যাপী আলোড়নে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে গত কয়েকটি বৎসর নিতান্ত অব্যবস্থায় দিনযাপন করতে হয়েছে, যার রেশ আজো পর্য্যন্ত কেটে ওঠেনি, সেই বিরাট বিশৃঙ্খলার সুস্পষ্ট স্পর্শ যে যে-কোনো কবির তৎকালীন রচনায় এসে লাগবে তাতে আর সন্দেহ কি! বিশেষ করে, রোমান্সধর্ম্মী কবির পক্ষে এ শুধু স্পর্শমাত্রই নয়, প্রচণ্ড আঘাত বলা চলে। 'নষ্টচাঁদের' মূলকথাও তাই এবং তার নামের সার্থকতাও এইখানেই। এখানে কবির আহত রোমান্টিক মনেরই আকুল মর্ম্মবেদনা শুনতে পাওয়া যায়, প্রেমের মৃদু গুঞ্জরণ আর নয়। কবিকে তাই বলতে শুনি,

'বহুপ্রতীক্ষমানা বাঞ্ছিত হে বীরবর
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।'

একে পলায়নী-মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়ে কবির রচনাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করতে গেলে ভুল হবে। সমাজ-চেতনা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক বিশৃঙ্খলায় নতুন অভিজ্ঞতালাভ এক জিনিষ নয়। আগেই বলেছি, সামাজিক বা ব্যবহারিক জীবনকে অতিক্রম করে অজিত দত্ত কখনও উন্মার্গযাত্রা করবার প্রয়াসী নন। তথাপি এই যে এখানে তিনি কিছুতেই সমাজ-জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না, তার কারণ যুদ্ধকালীন অব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা। মনোধর্ম্মে যে কবি রোমান্টিক, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর পক্ষে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, কিন্তু 'নষ্টচাঁদে' অজিত দত্ত সেদিক থেকে অনেকখানি স্থৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাই একসময় স্থির আশাবাদে নিশ্চিতরূপে পৌঁছুতে না পারলেও, তাঁর মুখে অন্ততঃ একটু সংশয়ের বাণী শুনতে পাওয়া যায়ঃ

'মনে হয় যেন এখনও কোথাও গুহার তলে
আগামী দিনের অগ্নি জ্বলে।

* * *

কোথা যেন শুনি কাকলীর ধ্বনি নতুন স্বরে,
ছেলেরা কি এসে বালু-সৈকতে শহর গড়ে?
কীর্তিনাশার চরে কি আবার নৌকা ভিড়ে?
কে এলো ফিরে?'

আঙ্গিকের দিক দিয়ে 'নষ্টচাঁদ' নতুনত্বের দাবী নিয়ে আসে নি! সনেট-রচনায় অজিত দত্ত সিদ্ধহস্ত, এবং এখানে যে কয়টি সনেট স্থানলাভ করেছে, তারা তাঁর পূর্ব্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থও হয়েছে। আর একটা জিনিষ এ বইতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সে হচ্ছে কবির ছড়ার ছন্দের প্রতি বিশেষ একটা আকর্ষণ। সনেটগুলোকে বাদ দিলে বাকী কবিতার অধিকাংশই ছড়ার ছন্দে রচিত। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও শিশুকাব্য ছাড়া ছড়ার স্থান বড় ছিলো না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন দেখালেন, তার এমন একটা রূপও আছে, যা শুধু শিশু নয়, বয়োপ্রাপ্তদেরও মুগ্ধ করতে পারে, তখন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দু' একজন কবি নেমে এলেন এ পরীক্ষায়। অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু সহজেই উৎরে গেলেন। এবং 'নষ্টচাঁদ'এ অজিত দত্তও প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, লাস্যময় হয়েও এ ছন্দ চটুলতায় শুধু মুখরই হয়ে ওঠে না, সাম্যরক্ষার জ্ঞান থাকলে তার গতিধারায় ভাববস্তুর গভীরতাকেও স্বচ্ছন্দে বহিয়ে দেয়া চলে।

শব্দচয়ন ও ভাষাপ্রয়োগ ব্যাপারে অজিত দত্ত চিরদিনই মধুসন্ধানী। 'নষ্টচাঁদ'ও সে সাক্ষ্যই দেবে। কিন্তু 'হেথা নয়, হেথা নয়' কবিতাটিতে যেন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেলো। শব্দচয়নের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে, এখানে ভাষাপ্রয়োগেও কেমন যেন আড়ষ্টতা এসে গেছে। সত্যিকার কবিতার পক্ষে ওকালতি করতে যেয়ে তিনি যা দাঁড় করিয়েছেন, তা তো খাঁটি কবিতা হয়ে ওঠেনি। এ কবিতাটিকে এ গ্রন্থে স্থান না দিলেই বোধ হয় ভালো হতো।

অনিল চক্রবর্ত্তী

উপন্যাস

এলোমেলো : আবু রুশ্‌দ্ (মূল্য—২৲; পৃঃ ২২৩)

আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে একটা জিনিষ বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উপন্যাসে নিছক ঘটনার আকর্ষণ যেন ধীরে ধীরে কমে আসছে। ঘটনার ক্ষীণ ভিত্তির উপর মনোবিশ্লেষণ, পটভূমি, সমাজবোধ বা লিরিকমনোবৃত্তির প্রাসাদ রচিত হচ্ছে। ভাল করে গল্প বলার ডিকেন্সীয় রীতি আজকাল ঔপন্যাসিক সমাজে প্রায় অচল। আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে গল্প বলার ঝোঁক যদি কোথাও দেখা যায় তবে তাও প্রায়ই আবেগপূর্ণ নাটকীয়তা অথবা ষ্টান্টের রূপ গ্রহণ করে।

রুশ্‌দ্ সাহেবের 'এলোমেলো'তে আধুনিক উপন্যাসের এই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঘটনার কোন আকর্ষণীয় মোড় বা সংঘাত আমরা সারা উপন্যাসের মধ্যে পাই না—একটি ক্ষীণ শান্ত অনুল্লেখ্য স্রোত ধীরে ধীরে বয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দেখা শোনা, প্রেম এবং একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু—কলকাতার দুটি মুসলমান পরিবারের মধ্যে এই নিয়ে সংঘটিত একটি প্রায় নিরাবর্ত কাহিনী।

ঘটনার আকর্ষণহীনতার জন্যে আমার কোন অনুযোগ নেই। কারণ বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'রাত্রি' এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তেও (যে কটা নাম চট্ করে মনে এলো করে গেলুম) ঘটনার অবকাশ অল্প। অথচ সেই ক্ষীণ কাঠামোর ওপর যথাক্রমে লিরিকবৃত্তি, সমাজবোধ ও মনোবিশ্লেষণের যে চমৎকার বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে তা' সত্যিই বিস্ময়কর।

রুশ্‌দ্ সাহেবের উপন্যাসে সেই রকম কোন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না। মধ্যে মধ্যে মনোবিশ্লেষণে ও লিরিকবৃত্তিতে তিনি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেখিয়েছেন বটে, (তাহেরার 'চাল্লিশা'-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাজ্জাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পর সুফিয়ার মনের বর্ণনা আমার মতে উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ)—কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায়ই অনিপুণ রচনার ফাঁক দিয়ে ঘটনাস্রোতের দৈন্য অনাবৃত হয়ে পড়েছে। ফলে অনেক বর্ণনা অবান্তর মনে হয়েছে, অনেক মনোবিশ্লেষণ

শিশুসুলভ। ঘটনা ও মানসিক প্রক্রিয়ার সুসমঞ্জস সংযোগ অনেক জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রেইন্‌বো ক্লাবের তর্কসভা সম্বন্ধে অত বিশাল এবং অত সাধারণ বর্ণনা মোটেই ভাল লাগবার কথা নয়। সারাহ্‌র সংগে সাজ্জাদের প্রথম পরিচয় ছাড়া রেইন্‌বো ক্লাবের অন্য কোন ঔপন্যাসিক সার্থকতা আছে কিনা রুশ্‌দ্‌ সাহেবের ভেবে দেখা উচিত ছিল।

আগেই বলেছি জায়গায় জায়গায় রুশ্‌দ্‌ সাহেব উৎসাহজনক ক্ষমতার পরিচয় দেখিয়েছেন। "নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করাতেই আমার সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। আমার একমাত্র পরিচয় যে আমি মানুষ। আমি প্রশ্ন করব, ঘৃণা করব, দ্বিধায় আমার মন ভরে যাবে। আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করব, আমি ভালবাসব, আমি দুঃখের তিমিরে ভাসবো, সূর্যের কিরণে আলোক গ্রহণ করব।"—যে লেখক নায়কের মুখ দিয়ে এই ধরণের বলিষ্ঠ কথা উচ্চারণ করতে পারেন, তিনিই যে আবার মজিদকে সাজ্জাদের foil খাড়া করবার মতো দুর্বল কৌশল এবং রফিক সাহেবকে গোঁড়া মুসলমানের প্রতিনিধি বানিয়ে গালাগালি দেবার মতো বালকসুলভ রীতি ব্যবহার করতে পারেন এ'যেন বিশ্বাসই করা যায় না। ভাল উপন্যাস লিখতে হলে রুশ্‌দ্‌ সাহেবকে আরো অচটুল আরো সতর্ক হতে হবে।

উপন্যাসটিতে রুশ্‌দ্‌ সাহেবের যে মন প্রতিফলিত হয়েছে তা' স্বাস্থ্যকর, অনুভূতিশীল এবং মনীষার আলোকে প্রোজ্জ্বল। তাঁর ভাষা স্বচ্ছল, রচনাভংগী অনায়াস।

বলতে ভুলে গেছি, উপন্যাসটির সবগুলি চরিত্রই মুসলমান (কেবল অজয় ছাড়া)। নিম্ন-স্তরের মুসলমান চরিত্র নিয়ে গল্প লেখার রেওয়াজ আজকাল বেশ চালু হলেও নিছক মুসলমান চরিত্রসম্পন্ন গোটা উপন্যাস বেশী পড়বার সুযোগ হয়নি। শুধু তাই নয়, 'এলোমেলো'র মানুষরা রেওয়াজমাফিক্ নীচুশ্রেণীর নয়—শ্রেণী হিসেবে সকলেই সহুরে বুর্জোয়া। বইটির এ' আর একটি নতুন স্বাদ।

পরিশেষে একটি কথা, সাহিত্যের ভেতর দিয়ে পরিশুদ্ধ মুসলমান হৃদয়ের যে ছবি এখানে পেলাম তা' সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিক্ষীণতায় বিকৃত নয়।

রবি চক্রবর্তী

পূর্ব্বাশা

নবম বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন • ১৩৫৩

২রা সেপ্টেম্বর

"আমাদের চোখ আর কান রাখব আমরা ভারতবর্ষের মাটির কাছাকাছি—নয়া দিল্লীতে কি করে মানুষ থাকছে, কি তারা ভাবছে কেবল তা-ই দেখা নয়—বুঝ্‌তে চাইব গাঁয়ের লোক আর কারখানার শ্রমিকদের মন।"

"কী আমাদের লক্ষ্য ? স্বাধীনতা ? নিশ্চয়। জীবনযাপনের উঁচু মান ? হ্যাঁ, তা-ই। কিন্তু আসলে আমাদের লক্ষ্য চল্লিশকোটি লোকের অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষাস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা। সমস্যাটির দিকে এই বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে তাকালে, বৃহৎ হলেও তার এই বাস্তব রূপই দেখা দেয়। তারপর তাকে পাঁচবছর বা দশ বছরের মধ্যে ভাগ করে ফেলা যায় এবং এ ধরণের একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে আমরা এতোটা খাদ্য, এতোটা বস্ত্র তৈরী করব, শিক্ষার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করব এতোটুকু। সরকারের পরিবর্ত্তন হয়েছে বলেই—বা আমরা চাই বলেই ত সব কিছু পাওয়া যাবেনা।"

"ভারতবাসী সবাই আমরা ভারতবর্ষেই থাক্‌ব, একজন আরেকজনের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেও একসঙ্গেই আমাদের বাস করতে হবে—একসঙ্গে কাজ করতে হবে—সহযোগিতা করতে হবে। কাজেই অচিরেই আমাদের সবাইকে ব্যাপকতর সহযোগিতা খুঁজে নিতে হবে। একাজে সর্ব্বতোভাবে আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার, কেননা স্বাধীনতা-অর্জ্জনের প্রধান ও প্রথম সমস্যা ছাড়াও আমাদের সামনের সমস্যাগুলো বিরাট এবং অত্যন্ত জটিল। চল্লিশকোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উঁচুতে তুলবার সমস্যা—একে অর্থনৈতিক সমস্যাও বল্‌তে পারেন—কার্য্যত অত্যন্ত কঠোর। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কাল্পনিক দিক থেকেই নয়, কোটি কোটি মানুষ নিয়ে কার্য্যকরী দিকটির কথা ভেবেই এ সমস্যাগুলোর দিকে আমাদের তাকাতে হবে।" —জওহরলাল

রাশিয়া সম্পর্কে ব্রিটেন

লর্ড বিভারিজ

সম্প্রতি যখন আমি রাশিয়ার প্রতিবেশী নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্কেণ্ডেনেভীয় দেশগুলোতে ছিলাম—তখন বারবারই একটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ আমরা ব্রিটেনে এখন রাশিয়া সম্বন্ধে কি ভাবছি ?

এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় ব্রিটেনে আমাদের সবার চিন্তাধারা একখাতে প্রবাহিত নয় অথবা সবাই আমরা একই রকম কথা বলিনে। রাশিয়া সম্পর্কে মন্তব্যের যতোপ্রকার বৈচিত্র্য সম্ভবপর তার সবই ব্রিটেনের বই-সংবাদপত্র-বক্তৃতাবলী খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীনভাবে আমরা তর্ক করতে পারি এবং তর্ক করে থাকি এবং যেহেতু আমরা পরস্পর সংবদ্ধ একটি জাতি বহু শতাব্দী যাবৎ একটি ছোট দেশে একত্র বসবাস করছি, তারই জন্যে কোনো একটি সমস্যা সম্বন্ধে একটি সাধারণ বক্তব্য তৈরী করবার ইচ্ছা আমাদের প্রবল।

ব্রিটেনে জনমত বলা যায় এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে। আমাদের অনেকেই আজ রাশিয়া সম্বন্ধে যা ভাবছেন তারই একটা আভাস দেবার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত রাশিয়ার কার্য্যাবলীর প্রতি আমরা সপ্রশংস ছিলাম কিন্তু ইদানীং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাশিয়া সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে উঠতে হচ্ছে যদিও তার সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যের আকাঙ্ক্ষা এখনও অম্লান।

রাশিয়ার কার্য্যাবলীর প্রশংসা নিয়েই সুরু করা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার-শাসিত রাশিয়া পশ্চিমসীমান্তে যুদ্ধরত জার্ম্মেনীর একটি অঙ্গুলি হেলনেই ধ্বসে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন জার্ম্মেনীর সমগ্র শক্তির বিপুল অংশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে অজেয় প্রমাণ করেছে। ব্রিটেন এবং আমেরিকা রণসম্ভার যুগিয়ে তাকে যে প্রচুর সাহায্য করেছে তা ধরে নিলেও জারশাসিত রাশিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য্য বৈষম্য দেখা যায়। এই বৈষম্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

ব্রিটেনের অধিকাংশ লোক—সবাই নয়, কেননা এখনও এখানে পরিকল্পনা-বিরোধী বহু লোক আছেন—প্রধানত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেই এই বৈষম্যের কারণ বলে নির্দ্দেশ করেন। বাস্তব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে প্রচুর সামর্থ্য থাকার দরুণই সোভিয়েট রাশিয়ার সমরশক্তির দিকটি প্রচণ্ড। অভূতপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতায় নেতারা সেখানে যন্ত্রবিপ্লব সংঘটিত

করেছেন আর তাই তার পক্ষে এ শক্তিসঞ্চয় সম্ভবপর হয়েছে। রাশিয়ার সমরশক্তি তার সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর কতোটা নির্ভরশীল তা তার যন্ত্রশিল্পসংস্থানের উদাহরণটি গ্রহণ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

পরিকল্পনাহীন ব্রিটেনে, দুটি যুদ্ধের অবকাশে আমরা নূতন কারখানার ছয় ভাগের পাঁচভাগ দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলে তৈরী করেছি—এ অঞ্চলটি সমস্ত দিক থেকে নিকৃষ্টতম; সবচেয়ে ঘিঞ্জি এবং য়ুরোপীয় আক্রমণের সামনে সর্ব্বাধিক অবারিত। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন কারখানাগুলো দূরে দূরে অবস্থিত—তাদের বেশির ভাগ কারখানা জার্ম্মেন সীমান্ত থেকে বহু দূর—রাশিয়ার অনেকখানি গ্রাস করেও জার্ম্মেনী তার দাঁড়াবার শক্তি নষ্ট করতে পারেনি।

একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এমন নয়। এক্ষেত্রে ধীরশান্তভাবে সবার আগে এগিয়ে গেছে সুইডেন। হিটলার-শাসিত জার্ম্মেনীও তা-ই দেখিয়েছে; ১৯৩৩-এর সঙ্কটের পর জার্ম্মেনীর যন্ত্রশিল্পের পুনরুত্থান সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়ের চেয়েই শুধু কম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট ও অভিনব অর্থনৈতিক পদ্ধতি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাকে একটি বিশিষ্ট আসন দান করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীকে একটি শিক্ষা দিয়েছে: দেখিয়েছে, কেন্দ্রিক পরিকল্পনাদ্বারা প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে বিশবছরে একটি বিরাট শৈল্পিক শক্তি আবির্ভূত হতে পারে। আর দেখিয়েছে সংগ্রাম ও শান্তিতে বাস্তব জীবনের মান উঁচুতে তোলা যায় এবং তাতে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়। দুটি যুদ্ধের অবকাশে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের বহুলোক সোভিয়েট রাশিয়াকে নূতন সভ্যতার অগ্রদূত বলে মনে করেছ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ও অন্যান্য বহু ব্যাপারের নেতা বলে ভেবে নিয়েছে।

আজ আমাদের প্রায় সবাই, এমন কি আমাদের মতো যাঁরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের চেয়ে পরিকল্পনাকে কল্যাণকর বলে মনে করেন তাঁরাও, সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে নৈরাশ্যের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রগামী হয়ে তবু একদিকে রাশিয়া সামাজিক সুবিচারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্যান্য দিকে এই দেশ এবং তার সরকার বর্ত্তমান যুগ থেকে একশ বছর পিছিয়ে আছে: সেদিকগুলোর দুটো দিক: মানুষের স্বাধীনতার সম্মানদান এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ।

মানুষের স্বাধীনতা-প্রসঙ্গই প্রথম ধরা যাক। ব্যক্তিস্বাধীনতার কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যাদের বাদ দিয়ে ব্রিটেনে আমরা জীবনকে জীবন বলে মনে করতে পারিনে। আর

বৈষয়িক জীব হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, এই ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলোর নিরাপত্তার জন্যে কয়েকটি রাষ্ট্রিক অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এমন একটি আইন থাকা দরকার যার জোরে বিনা বিচারে আমাদের কয়েদ থাকতে হবেনা—যার জোরে স্বৈরশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ান যাবে। গুপ্ত পুলিশ থাকতে পারবে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই। শৈল্পিক বা রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্যে মুক্ত দলগঠনের অধিকার থাকবে, একদল-শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা নামঞ্জুর করব। রাষ্ট্রনৈতিক প্রায় সব দিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়া আজ এমন জায়গায় আছে, ফরাসী বিপ্লবের আগে আমরা যেখানে ছিলাম।

রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে, নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার আজ অনেক কিছু শিখবার আছে, শিখাবার প্রায় কিছু নেই বলেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু ওটা রাশিয়ার জনসাধারণের ব্যাপার ; নিয়ন্ত্রিত সংবাদে যদি তারা খুসী হয়, একদল শাসিত রাষ্ট্র ও গুপ্ত পুলিশে যদি আপত্তি না থাকে, যদি এ ধরণের বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে না চায় তবে তা তাদেরই অন্তিম সূচনা করবে—আমাদের নয়। কিন্তু সোভিয়েট সরকারী নীতির আরেকটি দিক আছে যাতে সবারই অন্তিম ঘনিয়ে আসতে পারে—আমাদের মনে সে ভয়েরই সঞ্চার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের প্রতি সোভিয়েট মনোভাবের কথাই বলছি।

ব্রিটেনের আমরা সবাই এবং সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও দুটি যুদ্ধ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছে যে কোনো রাষ্ট্র এমন ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারে না যাতে খুসী মাফিক চলা যায় এবং কোনো রাষ্ট্র পরের শান্তি উপদ্রুত না করে নিজের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে শক্তি সঞ্চয়ও করতে পারেনা। তাতে পারস্পরিক ভীতির ফলে একদিন না একদিন যুদ্ধ বেধে যায়। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিপুঞ্জ যদি নিজ নিজ স্বার্থসাধনে শক্তির প্রয়োগ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেন, যদি ছোটবড় সমস্ত জাতির মধ্যে আইনের সমনিয়ম প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন, তাহলেই শুধু শান্তির আশা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আটলান্টিক সনদে আমাদের বিশ্বাস আছে—সোভিয়েট রাশিয়াও তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়া যে অন্যদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা না করবার ঘোষণার সঙ্গে আজকের দিনের কার্য্যকলাপের কি করে বনিবনাও করছে তা আমরা ভেবে পাইনে। আটলান্টিক সনদে এ ঘোষণাও ছিল যে কোনো ভূখণ্ডবাসীর সোচ্চার ইচ্ছা ব্যতীত সে ভূখণ্ডের কোনো পরিবর্ত্তনে রাশিয়া ইচ্ছাপ্রকাশ করবেনা—তাতে এ কথার উল্লেখ ছিল যে সমস্ত জাতিকে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘকে আন্তর্জাতিক সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার যন্ত্র তৈরী করার সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে 'ভেটো' প্রয়োগের বনিবনাও-ও বা রাশিয়া কি করে করছে তা বুঝতে পারিনে।

অবশ্য এ কথা আমরা মনে করিনে যে সোভিয়েট সরকার আরেকটি যুদ্ধ চান।

কিন্তু আমাদের মনে হয় দুটি মহাযুদ্ধের আরো একটি শিক্ষা সে সরকার লাভ করতে পারেন নি। তা'হল যদি তুমি শান্তি চাও তাহলে সে সব জিনিষ পাওয়ার ইচ্ছা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে যা শুধু যুদ্ধ বা যুদ্ধের হুমকিতে পাওয়া যায়।

সোভিয়েট রাশিয়া কয়েকটি দিকে অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে গিয়েও যে কয়েক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে আছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। উদাহরণত, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতার কার্য্যকরী নিরাপত্তা বিধান করতে এবং কার্য্যক্ষম রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে ব্রিটেন অদ্বিতীয় এবং আমার মনে হয় আজও অনেক দেশের চেয়ে অগ্রবর্ত্তী। কিন্তু একসময়ে যন্ত্রবিপ্লবের নেতৃত্ব করে আজ আমরা যন্ত্রগঠন শিল্পে অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে আছি, তাছাড়া অন্যান্য দেশের মতো যন্ত্রোৎপাদনের জঘন্য দিকটাকে বর্জ্জন করবার উপায় আবিষ্কার করতে পারছিনে। এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন এবং আরো অনেক দেশ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।

পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় না করে, প্রকৃতিকে বশে এনে এবং রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করে সমস্ত মানুষের আনন্দ বিধানের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে একটা উদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা উচিত। তা করতে হলে প্রত্যেক দেশকে জ্ঞান বণ্টন করে দিতে হবে, অপর থেকে শিখতে হবে, অপরকে শেখাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে যাতে ব্রিটেনে আমরা এবং হয়ত অন্যান্য দেশও বিশেষ দুঃখিত আছি। রাশিয়ার জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাদের কাছে আমাদের কথা বলা বা তাদের কথা শোনা আজ সম্ভব হয়ে উঠছেনা। আমরা জানি, নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রেডিয়ো এবং বই-এর মারফৎ রাশিয়ার জনসাধারণকে রোজ বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যেকথা শোনান হয় তা সত্যি হাস্যকর, অথচ সেসব খবর সংশোধন করবার আমাদের উপায় নেই; রাশিয়ার লোকরা দেশ ছেড়ে বাইরে এসে দেখতে পারেনা আমরা কেমন; আমরাও যে সেখানে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। রাষ্ট্রভুক্ত জনসাধারণের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে একটি রাষ্ট্র জনসাধারণের এবং পৃথিবীর যে মহৎ অনিষ্ট সাধন করতে পারে তার পরিমাণ প্রায় যুদ্ধেরই মতো। সোভিয়েট সরকার যখন এ অপকার সাধন থেকে বিরত হবেন, তখনই মানুষ প্রথমবারের মতো চিরশান্তির আশা করতে পারবে।

মার্ক্সীয় দর্শন

মার্ক্সীয় বস্তুবাদ

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মার্ক্সীয় দর্শন বস্তুবাদী দর্শন। সুতরাং ইহা ভাববাদী দর্শনের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে এই দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে যখন মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ধূলিসাৎ হইয়া যায় এবং তাহার ভিত্তির উপরে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠে এবং ফলে সমাজ যখন ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে তখনই এই মার্ক্সীয় দর্শনের আবির্ভাব হয়। ফরাসী বিপ্লব, হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদী দর্শন এবং ফয়ারবাকের বস্তুবাদী দর্শন বিশেষভাবে মার্ক্স ও এন্‌গেলসের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। গ্রীসের মাইলেটাসবাসী দার্শনিকগণ এবং লুসিপাস, ডিমক্রাইটাস, এপিকিউরাস প্রভৃতি দার্শনিকগণ বস্তুবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন। তৎপরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে একদল বস্তুবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে লামেট্রি, দিদেরো ও ডহলবাকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের বেকন্, হবস্, লক্ প্রভৃতি বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন। মার্ক্সীয় বস্তুবাদ এবং উপরোক্ত দার্শনিকদের বস্তুবাদ একরূপ নহে। মার্কসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদের জড়বাদ যান্ত্রিক কিন্তু মার্ক্সীয় জড়বাদ দ্বান্দ্বিক। যান্ত্রিক বস্তুবাদের মতে এই জগৎ একটি বৃহৎ যন্ত্রের ন্যায়। এই যন্ত্রের অংশসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা বাহ্যিক। কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে এই যন্ত্রের কার্য্য চলিয়া থাকে। জীবজগতের কর্ম্মধারাও যান্ত্রিক। প্রত্যেক জীব একটি যন্ত্র স্বরূপ। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ত এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের সমর্থক। তাঁহার মতে মানুষ ব্যতীত প্রত্যেক জীবই একটি যন্ত্র স্বরূপ। তিনি মনে করিতেন যে, সমস্ত বস্তুজগতের এবং নিম্নস্তরের জীবজগতের কর্ম্মধারা যান্ত্রিক নিয়মে চলিয়া থাকে। ডেকার্তের পরবর্ত্তী ফরাসী দেশীয় যান্ত্রিক বস্তুবাদীগণ মনে করিতেন যে, মানুষও একটি যন্ত্রবিশেষ। সুতরাং পরিণত যান্ত্রিক বস্তুবাদের মতে জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনই যান্ত্রিক নিয়মে চলিয়া থাকে।

মানুষের চেতনা, তাহার চিন্তা প্রভৃতি সমস্তই বস্তুর গতির নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং জীবনের কার্য্যাবলী ও মানবমনের ক্রিয়া, জীবশরীরের কার্য্যাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দর্শনের মতে মানবমস্তিষ্কের কার্য্যাবলীর দ্বারা, মানবমনের চিন্তাধারা, ভাবসমূহ, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এই দর্শন নিয়ন্ত্রনবাদের সমর্থক। সুতরাং এই দর্শনের চিন্তাধারা ডায়লেকটিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। এই দার্শনিকগণ ইতিহাসের ধারাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেন নাই।

কিন্তু ইহার পরে রসায়ণবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এবং পদার্থবিজ্ঞানের নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কারের ফলে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হয়। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের ফলে কতিপয় দার্শনিক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জগতের চিন্তার ও ইতিহাসের গতি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এদিকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইন্ ক্রমবিকাশবাদ প্রচার করায় মানুষের চিন্তার গতি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির স্থলে দ্বান্দ্বিক ও ডারুইনীয় ক্রমবিকাশের চিন্তাপদ্ধতি বৈজ্ঞানিকগণ ও দার্শনিকগণ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। চিন্তাজগতে এই সব ঐতিহাসিক বিপ্লবের ফলে মার্ক্‌সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উদ্ভব হয়। মার্ক্‌সও এন্‌গেলস্ বিশেষভাবে হেগেলের ও ফয়ারবাকের দার্শনিক মত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহারা দেখিতে পান ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ তাঁহাদের দার্শনিক মতের সমর্থক।

বস্তু চেতনার পূর্ব্বগামী অথবা চেতনা বস্তুর পূর্ব্বগামী, এই সমস্যা সমাধান করাই হইল দার্শনিকের প্রধান কার্য্য। ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেন চেতনাই বস্তুর পূর্ব্বগামী। অন্যদিকে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে বস্তুই চেতনার পূর্ব্বগামী। বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বার্কলে, যে ভাববাদের সমর্থন করেন, তাহা আত্মকেন্দ্রিক (সাবজেকটিভ)। তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষের বাহিরে বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই। যাহা কিছু অস্তিত্বশীল, তাহা ভাবের সমষ্টি মাত্র। যে সব প্রত্যক্ষ সত্য সর্ব্ববাদীসম্মত, তাহাই বৈজ্ঞানিক সত্য। এই সব সত্য ভগবানের চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত এবং মানুষ এই সব সত্যকে জানিতে পারে তাহার প্রত্যক্ষজাত ভাবধারার সাহায্যে। বার্কলে বলেন যে ভাববাদকে সমর্থন না করিলে, জগতে নিরীশ্বরবাদের প্রাদুর্ভাব হইবে এবং সমাজে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে। লক্ যদিও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তথাপি তিনি বলেন যে ইহা অজ্ঞেয়। হিউম্‌ও এই অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক। তাঁহার মতে অভিজ্ঞতার বাহিরে কোনরূপ বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই। তিনি বলেন যে জগৎ মানবের প্রত্যক্ষজ্ঞান, ভাব ও কল্পনাসমূহের সমষ্টি মাত্র। হিউমের দর্শনকেও অজ্ঞেয়বাদ বলা যাইতে পারে। বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হাক্‌স্‌লিও এই অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বলেন যে আমরা উহার

বাস্তব স্বরূপ জানি না। ক্যাণ্ট, হিউমের প্রত্যক্ষবাদের এবং জার্ম্মান দর্শনের প্রজ্ঞানবাদের সমন্বয় করিয়া এক নূতন অজ্ঞেয়বাদের (এগনষ্টিসিজিম) সমর্থন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষকে করিয়াছেন জ্ঞানের ভিত্তি এবং প্রজ্ঞানকে করিয়াছেন জ্ঞানরাজ্যের নিয়ামক। প্রজ্ঞান আপনার নিয়ম অনুসারে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। জ্ঞান প্রত্যক্ষের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। বাস্তবসত্তা প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু এই বাস্তবসত্তা অজ্ঞেয়। ভাববাদী হেগেল কি প্রকারে তাঁহার মূলভাবের সাহায্যে জগতের ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

এন্‌গেল্‌স্ অজ্ঞেয়বাদকে 'লাজুক বস্তুবাদ' বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। কারণ বস্তুবাদ স্বীকার করিলে তাহাদিগকে ভাববাদ ছাড়িয়া দিতে হয় এবং অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকগণ স্থিতিশীল দার্শনিক এবং বৈপ্লবিক সত্যকে তাঁহারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চান। এন্‌গেলস্ বলেন যে কোন খাদ্যদ্রব্যকে আস্বাদ করিলেই, উহার স্বরূপ জানা যায়। মানুষ চিন্তা করার পূর্ব্বে কাজ করিয়া থাকে এবং তাহার কর্ম্মজীবন হইতেই সে বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে। ব্যবহারই জ্ঞানের নির্দ্ধারক। নিম্নস্তরের জীবগণ ব্যবহারের সাহায্যেই বস্তুর সত্তা জানে। তাহারা চিন্তার দ্বারা বস্তুর সত্তা নির্দ্ধারণ করে না। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞান সুশৃঙ্খলিত হইলে আমরা উহার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিলে আশানুরূপ ফল পাইয়া থাকি। তৃতীয়তঃ আমরা চিন্তার সাহায্যে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকি তাহা অনেক সময়ই ফলবতী হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারে না। কারণ এই চিন্তার ফলে জগতে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। পরমাণুবাদ অথবা আধুনিক ইলেক্ট্রনবাদ গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মানবজ্ঞানকে সুসঙ্গত করিতে পারিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে জগৎ-ব্যাপারের ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জগদিতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বস্তুবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে চিন্তা বিধেয়, উদ্দেশ্য নহে এবং বস্তুই চিন্তার উদ্দেশ্য। বস্তুজগৎ হইতেই চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে এবং এই জগতের ধারা অনুসরণ করাই চিন্তার কার্য্য। এক সময় ছিল যখন জগতে কোনও জীব ছিল না। বস্তু-জগতের পরিবর্ত্তনের ফলে জীবনের উদ্ভব হইয়াছে এবং জীবের ক্রমবিকাশের ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে আছে শরীরের উপর বাহ্যবস্তুর প্রভাব এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কের আলোড়ন হয়। মস্তিষ্ক ক্রিয়া হইতেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উদ্ভব। এই জ্ঞান-দর্পনের সাহায্যে এবং আমাদের

ব্যবহারিক জীবনের সাহায্যে আমরা বাহ্যবস্তুর স্বরূপ জানিয়া থাকি। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে যদিও বাহ্যবস্তুর ও শরীরের ক্রিয়া হইতে মানসিক বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি মনের এমন একটি স্বকীয় সত্তা ও গুণ আছে, যাহা বাহ্যবস্তুতে ও মানবশরীরে দেখা যায় না। ইহা হইতে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে সংখ্যা গুণে পরিণত হয়। শরীর যেরূপ মনের উপর ক্রিয়াশীল, মনও সেইরূপ শরীরের উপর ক্রিয়াশীল। তাই মানুষ বিজ্ঞানের ও দর্শনের সাহায্যে জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করায় তাঁহারা নিয়তিবাদী দার্শনিক নহেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বস্তুবাদের সমর্থক। হাক্স্‌লীও বলিয়াছেন যে মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানবের মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাহ্যবস্তু কি প্রকারে শরীরের উপর ক্রিয়া করে এবং ইহার ফলে কি প্রকারে মানবমস্তিষ্ক আলোড়িত হয় তাহা না জানিলে মনের বৃত্তি সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। পরিক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ সেই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকে।

আমরা সাধারণভাবে বস্তুবাদের আলোচনা করিলাম। এখন আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। আমাদের বস্তুবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান কথা মনে রাখা আবশ্যক।

(১) বাহ্যসত্তা অথবা প্রকৃতি চেতনার পূর্ব্বগামী।

(২) প্রাণহীন বস্তু, জীবজগৎ ও মন একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ।

(৩) প্রকৃতি ও মন, এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে; ইহারা অভিন্ন নহে।

(৪) ভাববাদী দার্শনিকগণের অনেকে অহং-সর্ব্বস্ববাদী। তাহারা 'আমি'কে স্বীকার করে, কিন্তু 'তুমি'কে স্বীকার করে না। কিন্তু বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে 'আমি' ব্যতীত 'তুমি' এবং 'তুমি' ব্যতীত 'আমি' থাকিতে পারে না। ইহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। 'আমি' অন্যের কাছে 'তুমি'। 'আমি' আমার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু অন্যের কাছে 'আমি' একটি শরীরমাত্র।

(৫) শরীর হইতে মনের উদ্ভব হইলেও মন শরীরকে ও বাহ্যবস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। মনের স্বাধীন সত্তা আছে।

ফয়ারবাক্ হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছিল না। তিনি মনে করিবেন যে মানবের সারসত্তার ভিত্তির উপর, বিজ্ঞান, দর্শন,

শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হয়; কিন্তু তাঁহার এই সারসত্তা হইল অপরিবর্ত্তনীয়। ইহা হইল সেই গুনসমূহ যাহাতে সমস্ত মানুষের ভিতরে ঐক্য বর্ত্তমান। ইহা মানব জাতির অপরিবর্ত্তনীয় সাধারণগুণ। মার্ক্‌স বলেন যে মানুষের সারসত্তা অপরিবর্ত্তনীয় নহে। উহা সামাজিক সম্বন্ধের অথবা সমাজের আর্থিক সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। মার্ক্‌সই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান রচনা করেন। তাঁহার চিন্তাপদ্ধতি ছিল ডায়লেকটিকাল এবং তিনি যে ইতিহাস বিজ্ঞান রচনা করেন, তাহা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মার্ক্‌স বলেন যে পদার্থবিজ্ঞান যে প্রকার বস্তুজগতের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞানপ্রদান করিতে পারে সেইরূপ সমাজবিজ্ঞানও আমাদিগকে সমাজগতির নিয়ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিতে পারে। সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

মার্ক্‌সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা হইল এই যে ধনোৎপাদনের শক্তির দ্বারা মানুষের সামাজিক অথবা আর্থিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। যুগে যুগে এই ধনোৎপাদনের শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ইহার ফলে সমাজশরীরেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে সমাজের আর্থিক সম্বন্ধের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থার। তৃতীয়তঃ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে মানুষের চিন্তাজগৎ তাহার বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, তাহার রাষ্ট্রিক ধারণা প্রভৃতি সমাজের আর্থিক সম্বন্ধ ও সমাজের বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ এই বিধিব্যবস্থার দ্বারা মানুষের মানসিক বৃত্তি, ভাব ও কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মানুষের মনোবৃত্তি হইতেই তাহার চিন্তাধারার উদ্ভব। সুতরাং মার্ক্‌স বলেন যে সামাজিক সত্তার দ্বারা সামাজিক চিন্তা নিয়ন্ত্রিত। মার্ক্‌সের এই ঐতিহাসিক মত বস্তুবাদী।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ ইতিহাসের পর পর চারটি যুগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) প্রাচীন এশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা।

(২) পুরাকালীয় দাস-প্রথা-প্রচলিত সমাজব্যবস্থা।

(৩) মধ্যযুগীয় জায়গিরদারী সমাজব্যবস্থা।

(৪) আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

অবশ্য মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে চতুর্থ পর্য্যায়ের সমাজব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপন করিবে।

এন্‌গেল্‌স্‌, মরগানের সমাজ বিজ্ঞান পাঠ করার পর, তাঁহার 'সম্পত্তি, পরিবার এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব' নামক সুবিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে আর্থিক

ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পুরাকালে অর্থের উপর সকল মানুষের সমান অধিকার ছিল। এই সমাজ ছিল সাম্যবাদী। অর্থোৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সরল ও সহজ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমানভাবে অর্থোৎপাদন করিত। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোনও বৈষম্য ছিল না। কিন্তু পরে অর্থোৎপাদন ব্যবস্থা জটিল হওয়ায় সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়। পশুপালন, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি ব্যাপারে পুরুষ স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করে এবং ইহার ফলে পুরুষের অধিকার বাড়িয়া যায়। বিশেষ প্রাচীন সমাজে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের যুদ্ধ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। এই যুদ্ধ ব্যাপারেও পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায় তাহারা সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। পুরুষদের ভিতরে যাহারা যুদ্ধকার্য্যে এবং অর্থোৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে, সমাজে তাহাদের অধিকার বাড়িয়া যায়। অর্থোৎপাদনের যন্ত্রসমূহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজশরীরে বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়। সমাজে যাহারা থাকে নিঃস্ব, দুর্ব্বল তাহারা সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। স্ত্রীলোকেরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইয়া পুরুষের হাতের পুতুল হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজনে পরিবারের উদ্ভব হয়। ব্যক্তির সম্পত্তি পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তির সম্পত্তির উপর সমাজের আর কোনও অধিকার থাকে না। এই ব্যক্তিসম্পত্তি রক্ষা করার জন্য গড়িয়া উঠে রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্র, আপনার শক্তির দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার উপযোগী আইন প্রস্তুত করে এবং উহা সমাজশরীরে প্রয়োগ করে। এনগেলস বলেন যে রাষ্ট্রশক্তি প্রযুক্ত হয় জোর করিয়া কোনও একটি সমাজ ব্যবস্থা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এই বিশেষ সমাজব্যবস্থার দ্বারা মানুষের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তদনুরূপ সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এনগেলসের মতে শ্রেণী-বৈষম্যই হইল রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রধান কারণ এবং পশুবলের সাহায্যে এই বৈষম্য রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য্য। তাই এনগেলস্ বলেন যে জগতে আবার যখন সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হইবে তখন আর রাষ্ট্রের আবশ্যকতা থাকিবে না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন বিলুপ্ত হইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ কর্ত্তৃত্ব করিবে বস্তুর উপরে, মানুষের উপরে নহে।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন যুগে সমাজব্যবস্থার মূলে ছিল বিভিন্ন রকমের ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা। প্রাচীন এশিয়ার ধনোৎপাদনের ব্যবস্থানুসারে তৎকালীন এশিয়ার সমাজ গঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীস, রোম ও অন্যান্য স্থলে দাসপ্রথার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কারণ তৎকালীন ধনোৎপাদনের

জন্য এইরূপ ব্যবস্থা উপযোগী ছিল। দাসেরা পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করিত এবং স্বাধীন নাগরিকগণ রাষ্ট্রচালনা ও সংস্কৃতির উন্নতির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বাধীন নাগরিকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। প্রাচীন ভারত-সমাজেও আমরা দেখিতে পাই যে কেবল ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের রাষ্ট্র-চালনার ও জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার ছিল। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে এইরূপ সমাজব্যবস্থার মূলে ছিল তৎকালীন অর্থোৎপাদন ব্যবস্থা।

জায়গিরদারী সমাজে ভূমিদাসদের কতকটা স্বাধীনতা ছিল বটে, কিন্তু সে সমাজেও যথেষ্ট শ্রেণী-বৈষম্য ছিল। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, তৎকালীন অর্থোৎপাদন-ব্যবস্থার উপযোগী ছিল। এই যুগে ধনোৎপাদনের যন্ত্রসমূহ, দাসযুগের ধনোৎপাদনের যন্ত্রসমূহ হইতে উন্নততর ছিল। জায়গিরদারদের হাতে সম্পূর্ণ ভূম্যধিকার থাকায় তাহারাই ছিল রাষ্ট্রের পরিচালক। জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা তাহারাই পাইত। কি প্রকারে জায়গিরদারী ব্যবস্থার বিলোপ সাধিত হয় এবং কি প্রকারে জায়গিরদারী সমাজের স্থলে ধনতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এ সম্বন্ধে আমরা 'কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' নামক অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলে উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

মার্ক্স্ ও এন্গেল্স্ বিশেষভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরে মার্ক্সীয় সমাজবৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বতন সমাজ-ব্যবস্থা সমূহের আর্থিক ও বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এখনও এইরূপ আলোচনা করিতেছেন। অবশ্য মার্ক্স্ ও এন্গেল্স্ এই আলোচনা পদ্ধতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

প্লেখানভ্ 'মার্ক্সীয় দর্শনের মূল সমস্যা' নামক পুস্তকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য, শিল্প প্রভৃতিরও বাস্তব ভিত্তি আছে। তিনি বলেন যে অর্থোৎপাদন কার্য্যে নানারূপ সুসংবদ্ধ শারীরিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে। অর্থোৎপাদন করিতে মানুষের নানারূপ শরীর চালনা করিতে হয় এবং এইরূপ কার্য্য হইতে সঙ্গীতের অথবা ছন্দের ধারণা জন্মে। সঙ্গীত, নৃত্যকলা, কাব্য, শিল্প প্রভৃতি ছন্দের ধারণার উপর নির্ভরশীল। ইহাদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন আর্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। এই সম্বন্ধে যাহারা বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তাহারা প্লেখানভের উপরোক্ত পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। ঐ পুস্তকে অন্যান্য যাহারা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নামের ও মতের উল্লেখ আছে।

আর দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করিতে পারি। অনেক বাস্তববাদী ঐতিহাসিক বলেন যে মানবের অর্থোৎপাদনের কর্ম্মধারার

ও সমাজব্যবস্থার মূলে আছে ভৌগোলিক পরিস্থিতি। ইহা সত্য যে ভৌগোলিক পরিস্থিতির দ্বারা মানুষের কর্ম্মধারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মার্ক্সীয় দার্শনিকদের মতে এই ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে ভৌগোলিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের গতি মন্থর। কিন্তু সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতি উহা অপেক্ষা বহু গুণে বেগবান। একই ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থার বিভিন্নতার ফলে নব নব সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়। তদ্ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই যে বিভিন্ন ভৌগোলিক সমাবেশের ভিতরে একই প্রকার সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। আবার কোন কোন বাস্তববাদী ঐতিহাসিক বলেন যে লোকসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে জনসংখ্যার উপর সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নহে। ইহারা ভৌগোলিক পরিস্থিতির ও জনসংখ্যার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার করেন, কিন্তু ইহারা বলেন যে সমাজব্যবস্থা প্রধানতঃ ধনোৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে যদিও মানুষের চিন্তাধারা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তথাপি এই সামাজিক চিন্তাধারা আবার সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে পারস্পরিকতা-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। আমরা এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেইজন্যই মার্ক্স্ বলেন যে জগৎকে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করাই দার্শনিকদের প্রধান কার্য্য।

আসমুদ্র

জেমস্ জয়েস্

অ্যাভিনিউতে সন্ধ্যা ছড়িয়ে পড়ছে—জানালায় বসে তাই দেখছিল ও। মাথাটা জানালার পর্দ্দার গায়ে হেলান'—ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

দু'একজন লোকের চলাফেরা। শেষ বাড়িটার একজন হয়ত বাড়ি ফিরে এলো ; কংক্রীটের উপর তার জুতোর শব্দ বাজছে, তারপর নূতন লাল বাড়িটার সামনে কয়লার গুঁড়োতে মরমর আওয়াজ—সবই শুনতে পাচ্ছে ও। ওখানে একটা মাঠ ছিল আগে,

ছেলেবেলায় খেলতে যেত ওখানে। তারপর বেলফাষ্টের এক ভদ্রলোক এসে মাঠটা কিনে নিলেন, বাড়ি তৈরী করলেন, ওদের মেটে-রংএর ছোট বাড়িটার মতো নয়, ঝকঝকে ছাদ-অলা, ইটের চমৎকার একখানা বাড়ি। অ্যাভিনিউর বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো সবাই খেলত ও মাঠটায়—'ডেভিন'রা, 'ওয়াটার'রা, 'ডন'রা, খোঁড়া 'কেউ'টাও—আর ওরা ভাই-বোনরা! আর্নেষ্ট খেলতে যেতনা—বড় হয়ে গিয়েছিল তাই। কালোকাঁটার লাঠিটা হাতে নিয়ে বাবা প্রায়ই মাঠে যেতেন ওদের খুঁজতে—বাচ্চা 'কেউ' বাবাকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠত। তবু তখন ত ওরা বেশ ভালোই ছিল। বাবা এতোটা খারাপ হয়ে ওঠেননি তখনও—তাছাড়া মাও তখন বেঁচে ছিলেন। তা যেন অনেকদিনের কথা; ও আর ওর ভাইবোনরা বড় হয়ে উঠেছে তারপর—মা মারা গেছেন। তিজ্জি ডানও মারা গেছে—ওয়াটাররা ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেছে। বদ্‌লে গেছে সব। আর সবার মতো ও-ও চলে যাচ্ছে এখন—বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

বাড়ি! ঘরের চারদিকে তাকাল ও। পরিচিত আসবাবগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে আনলে। একটানা কতো বছর সপ্তাহে একবার করে ঝেড়েপুছে রেখেছে ও এগুলোকে! কোত্থেকে যে এতো ধূলো এসে জড় হত! এতো চেনা যাদের সঙ্গে আর ও তাদের দেখতে পাবেনা! কোনোদিন কি ভাবতে পেরেছে ও এসব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে একদিন চলে যাবে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ-ক'বছরেও ত ও-পুরুৎঠাকুরের নামটা জানা হয়নি—ঈশ্বরজানিত মার্গারেট মেরি আলাককের কাছে দিব্যি-করা কথাগুলোর রং-চংএ প্রতিলিপির পাশে—ভাঙ্গা হারমোনিয়ামটার উপরে—দেয়ালে ঝুলান' আছে তাঁর হলদে ফটোগ্রাফখানা। বাবার সঙ্গে ইস্কুলে পড়েছেন তিনি। অতিথি অভ্যাগত কাউকে ফটোটা দেখালেই তিনি বলে উঠতেন: "মেলবোর্ণে আছে সে এখন।"

চলে যেতে রাজি হয়েছে ও—বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। ঠিক হল কি? প্রশ্নটাকে উল্টে-পাল্টে ও দেখতে চেষ্টা করেছে। বাড়িতে ত তবু মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই ছিল—ছিল খাবার জায়গা—ছিল যাদের জড়িয়ে ওর জীবন, তারা। অবশ্য খাটতে হয়েছে ওকে খুব—বাড়িতেও, চাকরিতেও। ষ্টোর্সের ওরা যখন জানবে একটি ছেলের সঙ্গে ও পালিয়ে গেছে—কি বলবে তখন? হয়ত বলবে, বোকা মেয়ে! বিজ্ঞাপন দিয়ে ওরা ওর জায়গায় আরেক জনকে নিয়ে নেবে। মিস্ গ্যাভেন খুব খুসী হবেন! খোঁচানই ছিল তাঁর চিরকেলে অভ্যাস—বিশেষ করে শুনবার কেউ থাকলেত কথাই ছিলনা।

"মিস্ হিল্—দেখছনা এঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন?"

"মুখ অমন গোমরা করে থেকোনা, মিস্ হিল্—দোহাই তোমার!"

কিন্তু অজানা দূর দেশে—নতুন বাড়িতে আর এ ইতিহাস নয়! ও তখন বিয়ে

করেছে—ও, ইভলিন। লোক তখন তাকে সমীহ করবে। মায়ের মতো অবস্থা নিশ্চয়ই হবেনা তার। এখন পর্য্যন্ত—এই উনিশ বছর বয়সেও তার ভয় হয় বাবা কখন মারতে আসেন! বুক যে তার ধড়ফড় করে—তার কারণইত তাই। তিনি ত আগে তার দিকে ফিরেও তাকান নি—কারণ সে মেয়ে, নজর ছিল তাঁর হ্যারি আর আর্ণেষ্টেরই উপর। পরে তিনি তাকে শাসাতে সুরু করেছিলেন, বললেন—মা মরে গেছেন বলেই তার প্রতি তাঁর একটা কর্ত্তব্য আছে! আর এখনত তার পাশে দাঁড়াবার কেউ-ই নেই। আর্ণেষ্ট মারা গেছে—হ্যারি করে গীর্জ্জা সাজানোর কাজ, প্রায়ই গাঁয়ে গাঁয়ে থাকতে হয় তাকে। তাছাড়া প্রত্যেক শনিবার টাকা নিয়ে খিটিমিটি অকথ্য অসহ্য হয়ে উঠেছে। সমস্তটা মাইনেই—সাত শিলিং--দিয়ে আসছে সে আজ পর্য্যন্ত, হ্যারিও পাঠাচ্ছে যা পারে তাই কিন্তু বাবা একটি পাই পয়সা দেবেন না। তিনি বলেন, সব বাজে খরচ করছে না কি সে—তার মাথাই নেই কাজেই রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে ত আর তিনি তাঁর কষ্টার্জ্জিত টাকা তার হাতে সঁপে দিতে পারেন না আর আসল কথা হল শনিবার রাত্রিতে তিনি ভালো থাকেন না। শেষটায় দেন তিনি টাকা আর জিজ্ঞেস করেন রবিবারের খাবার কেনবার মতলব আছে কি না। বাজার করতে বেরোতে হয় তাকে তাড়াতাড়ি—কালো চামড়ার ব্যাগটা শক্ত মুঠোতে ধরে খাবারের বোঝা নিয়ে ভীড় ঠেলে বেশি রাত্রিতে বাড়ি ফিরে আসে। ঘরের কাজকর্ম্মে দুর্দ্দান্ত খাটতে হয়—দুটো বাচ্চাকে রাখা হয়েছে তার তত্ত্বাবধানে—নিয়মিত তাদের ইস্কুলে পাঠাতে হয়—খাবার তৈরী করে দিতে হয়। বড়ো পরিশ্রম—কঠিন জীবন—কিন্তু একে পেছনে ফেলে যাবার আগে এখন মনে হচ্ছে, এর সবটুকুই যেন আবাঞ্ছিত নয়।

ফ্রাঙ্কের সঙ্গে সুরু হবে এখন নতুন জীবন। মায়া মমতা আছে ফ্রাঙ্কের—আছে পৌরুষ—খোলা মন! রাত্রির নৌকোয় তার সঙ্গে পালাতে হবে—তারপর ব্যুনোস আয়ারে গিয়ে ঘর বাঁধবে তারা—স্বামী আর স্ত্রী। প্রথম যখন ফ্রাঙ্কের সঙ্গে দেখা হল—সে দিনটি স্পষ্ট মনে আছে তার। সদর রাস্তার উপরে একটা বাড়িতে থাকত ফ্রাঙ্ক—সে বাড়িতে যাতায়াত ছিল তার। মাথার উঁচু ক্যাপটা পেছন দিকে টেনে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল ফ্রাঙ্ক—তামাটে মুখের উপর চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর তাদের জানাশুনো হয়ে গেল। রোজ বিকেলে ষ্টোর্সের বাইরে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত ফ্রাঙ্ক—তাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিত। ফ্রাঙ্ক তাকে বোহেমিয়ান গার্ল নাটকটা দেখাতে নিয়ে গেছে, থিয়েটারের একটা অনভ্যস্ত কোনায় ফ্রাঙ্কের পাশাপাশি বসে থেকে নিজেকে খানিকটা উঁচু মনে হয়েছে তার। গান এতো ভালোবাসে ফ্রাঙ্ক—গায়ও একটু একটু নিজে। লোকরা জানত যে তারা প্রেমে পড়েছে—আর ফ্রাঙ্ক যখন তাকে একজন-নাবিকের-সঙ্গে-প্রেমে-পড়া একটি

মেয়ের গান শোনাত খুসীতে খানিকটা বিব্রতই হয়ে পড়ত যেন সে। মজা করে তাকে 'পপেন্স' বলে ডাকত ফ্রাঙ্ক। একটি ছেলেকে পাওয়ার প্রথম অনুভূতিটা ছিল তার মনে শুধু একটা উত্তেজনার মতো। তারপর সুরু হল ভালো লাগা। ফ্রাঙ্কের মনে মজুত ছিল যতো সব দূর দেশের গল্প। মাসে এক পাউণ্ড মাইনেতে একটা কানাডা-গামী জাহাজে ডেক-বয় হিসেবে সুরু করেছিল সে কাজ। যে-যে জাহাজে গিয়েছে সে একটি-একটি করে তাদের নাম বলত—বলত জাহাজে যতো রকম কাজ আছে তার কাহিনী। ম্যাগেলান প্রণালী দিয়ে গেছে তারা—দুর্দ্ধর্ষ প্যাটাগোনিয়ানদের গল্প করত সে। বলত, ব্যুনোস আয়ার থেকে পুরোনো দেশে এসেছে সে ছুটির ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে। ইভলিনের বাবা সব জানতে পেরেছিলেন—নিষেধ করে দিয়েছিলেন তাকে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আলাপ করতে।

"এসব জাহাজী ছোকরাদের আমি চিনি—' বলেছিলেন তিনি।

একদিন তিনি ঝগড়াও করলেন ফ্রাঙ্কের সঙ্গে, আর তারপর তার সঙ্গে ইভলিনকে লুকিয়ে দেখা করতে হত।

অ্যাভিনিউতে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসছে। তার কোলের উপর চিঠি দুটোর সাদা আভা ঝাপসা দেখাচ্ছে। একটি চিঠি হ্যারিকে লেখা—আরেকটি বাবাকে। আর্নেষ্টকেই বেশি ভালোবাসত ইভলিন, অবশ্য হ্যারিকেও ভালোবাসে। বাবা তার ইদানীং বুড়ো হয়ে চলেছেন—লক্ষ্য করছিল ইভলিন—তাকে না পেয়ে অসহায় হয়ে পড়বেন। একেক সময় তাঁকে মনে হয় চমৎকার মানুষ। কিছুদিন আগেও, একদিন যখন অসুস্থ হয়ে ছিল ইভলিন, তিনি ভূতের গল্প পড়ে শুনিয়েছেন তাকে, রুটি সেঁকে দিয়েছেন আগুনের তাপে বসে। আরেক দিন, মা তখন বেঁচে ছিলেন, হাউথের পাহাড়ে তারা সবাই পিকনিক করতে গিয়েছিল। মায়ের উড়নিটা দিয়ে ঘোমটা পরেছিলেন বাবা ছেলেমেয়েদের হাসাবার জন্যে।

সময় এগিয়ে আসছে, তবু মাথাটা জানালার পর্দ্দার গায়ে হেলিয়ে চুপচাপ বসে আছে ইভলিন। দূরে রাস্তায় কোথায় একটা অর্গ্যান বাজছে। স্বরটা সে চেনে। আশ্চর্য্য, আজ রাত্রিতেই কিনা ওটা ভেসে এলো মায়ের কাছে তার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। মায়ের কাছে শপথ করেছিল ইভলিন, যতোদিন সে পারে এই ঘরদোর সামলে রাখবে। মায়ের অসুখের শেষ রাত্রিটার কথা মনে পড়ে তার, হলঘরের ওপাশে অন্ধকার বন্ধ ঘরটাতে সে ছিল—একটা ইতালীয় ব্যথার সুর বেজে চলেছিল বাইরে—তা-ই শুনছিল ইভলিন। বাজিয়েকে বিদেয় করে দেওয়া হয়েছিল ছ'পেনি দিয়ে। মনে আছে তার, রোগিণীর ঘরে ফিরে এসে বাবা বলেছিলেন: "ওটা এসে জুটেছে এখানে!"

মায়ের জীবনের করুণ ছবিটা মনের উপর ভেসে উঠল তার—অত্যন্ত সাধারণ, আত্মত্যাগের জীবন। তাঁর মৃত্যুর সময়কার কণ্ঠ যেন বেজে উঠল তার কানে—শিউরে

উঠ্‌ল ইভলিন। একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পালাবে। নিশ্চয় পালাবে সে। ফ্রাঙ্কই বাঁচাতে পারে তাকে। তাকে জীবন দিতে পারে—আর দিতে পারে হয়ত ভালোবাসাও। সে বাঁচতে চায়। চায়না অসুখী হতে। সুখী হবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। ফ্রাঙ্ক তাকে জড়িয়ে ধরবে—মিশে থাকবে সে ফ্রাঙ্কের শরীরে—ফ্রাঙ্ক তাকে বাঁচাবে!

নর্থ-ওয়াল ষ্টেশনের চলন্ত ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ইভলিন। ফ্রাঙ্ক তার হাত ধরে আছে—ফ্রাঙ্ক যা বল্‌ছিল তাও সে শুনছে—বারবার প্যাসেজের কথা বলে যাচ্ছিল ও। খাকি লটবহর নিয়ে সৈন্যরা ভর্ত্তি করে ফেলেছে ষ্টেশন। ঘরের চওড়া দরজার ভেতর দিয়ে জাহাজের কালো ছায়াটা চোখে পড়ছে—জেটির দেয়ালে ঘেঁসা, আলোর বিন্দু আঁকা। ফ্রাঙ্কের কথার জবাবে কিছুই সে বললে না—সমস্ত মুখটা যেন ফ্যাকাসে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মনে হল। বিপন্ন মন তার বিমূঢ়ভাবে ঈশ্বরের শরণ নিল—আমাকে পথ দেখাও—বলে দাও কি করব। কুয়াশার ভেতর থেকে জাহাজের দীর্ঘ আর্ত্তনাদ বেজে উঠল। আজ যদি যায়, কাল তবে ব্যুনোস্ আয়ারের পথে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে সমুদ্রে ভেসে চলবে সে। প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে। তার জন্যে ফ্রাঙ্ক যা করেছে তারপর কি আর সে পেছনে হটে যেতে পারে? দুর্ভাবনায় গা-বমি করতে লাগল তার, নিঃশব্দ আকুল প্রার্থনায় ঠোঁটগুলো অবিরত নড়তে লাগল।

ঘণ্টা বেজে উঠল—যেন তারই বুকের উপর। ফ্রাঙ্কের শক্ত মুঠো অনুভব করলে সে হাতে।

"এসো।"

বুকের চারদিকে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র যেন ছল্‌কে উঠ্‌ছে—ফ্রাঙ্ক তাকে ভেতরে টেনে নিতে চায়—ডুবিয়ে দিতে চায়। দুহাত বাড়িয়ে সে লোহার রেলিং শক্ত করে চেপে ধরল।

"এসো!"

না-না-না! অসম্ভব। ক্ষিপ্তের মতো হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এলো রেলিং-এর উপর। একটা যন্ত্রণার কান্না ছড়িয়ে দিল সে সমুদ্রের দিকে।

"ইভলিন! ইভি—'

ফটকের বাইরে চলে এসে ফ্রাঙ্ক ডাকতে সুরু করল তাকে। এগিয়ে যাবার জন্যে চীৎকার চলল তার পেছনে—তবু সে ডাকতে লাগল ইভলিনকে। তার দিকে সাদা মুখে তাকিয়ে রইল ইভলিন—অনড়—অসহায় জন্তুর মতো। চোখ তার ভাষাহীন—সেখানে প্রেম নেই, নেই বিদায় সম্ভাষণ বা পরিচয়ের আভাস।

কবিতা

ব্যর্থ

সুধীরকুমার গুপ্ত

এক সীমান্তের পারে এখনো তেমনি জেগে রয়
প্রতিকূল সীমান্তের ভয়।
পুরানো যে পৃথিবীর মাটি আর আকাশের রূপ
হৃদয়ের পটে নানা আকাঙ্ক্ষার নানা বৃন্তে ফোটে,
এত প্রেম বুকে নিয়ে তবু তার সকল প্রয়াস
আবার রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।
জানিনা সে সব প্রেম মুখোমুখি আবার হঠাৎ
কী ব্যর্থতা ঢাকার আশায়
মৃত্যুর স্তব্ধতা পেতে চায়!
যে ঘৃণার প্রেমে রূপান্তর
আবার সে ফিরে ঘৃণা হয়;
এবার সার্থক প্রেমে জ্বল্‌বার আসে কি সময়?

ইতিহাস

অজয় মিত্র

কোন দিন আকাশের দূত এসে
মেঘে মেঘে ছেয়ে দেবে নাকি
বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ দিন,
এনে দেবে অনাবাদী মাঠে মাঠে

জীবনের গান আর ফসলের ঘ্রাণ
আর ভরে দেবে নাকি
শত শত জীবনের চরম বিলাস ?
কোন এক হেমন্তের ঘুমভাঙা ভোরে
দিগন্তের জনহীন প্রান্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে
মনে মনে উজ্জীবিত হয় দেখি
অর্থহীন অপরূপ অদ্ভুত জিজ্ঞাসা—
যেন কোন অতীতের অঘ্রাণের ধানক্ষেত হতে
সুগন্ধ হাওয়ার স্রোত ছুঁয়ে যায়
চেয়ে থাকা চোখের তারায়।

মাঝে মাঝে মনে হয় তবু
নিদ্রানীল সমুদ্রের বহুবর্ষ পারাপার শেষে
হয়তো একটি ভোরে জেগে
যেন দেখি মিলে গেছে আকাশের নীলিমায়
বহুদূর বিস্তারিত প্রান্তরের শস্যশ্যামলিমা
আর দেখি—
গ্রীক ভাস্কর্যের মতো খৃষ্টপূর্ব মানুষেরা
চলাফেরা করে ফের হলুদ ধানের ক্ষেতে
আলে-খালে নদীটির নীল জল ঘিরে
যেন কোন এক শতাব্দীর
দুঃস্বপ্নের ছায়া কালো মেঘ
উড়ে গেছে মুহূর্তের ইশারায় দৃশ্যলোকে থেকে
(কী আশ্চর্য তখন কী মনে হবে নাকি
এই সব সুস্থদেহী উচ্চস্কন্ধ প্রাণী
কোনদিন ছিলো মৃত বুভুক্ষু কংকাল !)
সময়ের ইতিহাসে আঁকাবাঁকা পর্যটন শেষে
সেই সব আগাছায় ভরা মাঠে ঘাটে

সোনালী রেখায় আঁকা মার্গশীর্ষ শস্যের সীমানা
পৃথিবীর এখানে ওখানে—
সেই সব মারাত্মক দুর্ভিক্ষের ঝড়ে
নিরাশ্রয় কোন এক পাখি
হয়তো আবার এসে শিষ দিয়ে যাবে
সেই সব পৌরানিক নির্জন প্রান্তরে
আর বুঝি এনে দেবে জীবনের রূপরসস্বাদ
অথবা কেবল শুধু
পরিহাস-পর্যুদস্ত হবে
এই সব পরিণত হৃদয়ের মননবিলাস!

অবশেষ

আশীষকুমার বর্ম্মণ

বিনয়বাবু বিশ্রামের জীবন যাপন করছেন।

চাকরীর বছরগুলো কাটিয়ে এসে পেনসান-ভোগীতে পদার্পণ করেছেন। প্রথম প্রথম বেশ লেগেছিল এই নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তা; বেশ আরাম করে উপভোগ করতেন এই নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ততা।

ক্রমে কেমন দুঃসহ হয়ে উঠল। সময় কাটতে চায় না। কিছু একটা করতে হয় জীবনে, ক্রিয়াই জীবনের লক্ষণ, এটা উপলব্ধি করতে থাকেন তিনি।

অথচ তাঁর কী করার আছে? তিনি কী করবেন ভেবে ভেবে আর খুঁজে খুঁজে পেলেন না তার ঠিক ঠিকানা। পড়াশুনোর অভ্যেস তাঁর নেই; লেখালেখি ঐ আফিসের ফাইল পর্য্যন্তই; চিঠি লেখাই ওঁর এক বিরাট বিড়ম্বনা। বাড়ীতে বাগানও নেই যে মাটি কুপোবেন, ফুল ফলাবেন, ফল ফলাবেন। আর ধাঁই করে যে রাজনীতিতে নেমে যাবেন সে সাহসও নেই; পেন্‌সানটা পান এবং বয়সও ওঁর বেশী। ব্রীজ খেলা জাহান্নমে যাক, ওটাকে উনি চিরটাকাল শাপ দিয়ে দিয়ে শেষ করে দিতে চেয়েছেন।

তবু জুটে যায় কাজ। জুটে ঠিক যায় না, জড়িয়ে যায়। স্বভাবের আঁতে-আঁতে জড়িয়ে যায়।

উনি সংসার দেখাশুনো করতে লাগেন। ম্যানেজ করেন যত আন্‌ম্যানেজেবল্‌দের! আর চাকরটার উপর ভয়ানক সন্দেহ হয়। ঐ মিন্‌মিনেটার উপর; ভিজে মানুষটিকে!

স্ত্রীকে বলেন—রামের লক্ষণটা দেখেছো?

স্ত্রী সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন, বলেন—কী বলছ!

—বললাম যা শুন্‌তে পেলে না?

—শুনলাম তো, বুঝলাম না।

—আমি কী খুব হেঁয়ালী করে বললাম?

—বল্লে সোজ-সোজা কটা কথা, কিন্তু অর্থ যার খুঁজে পেলাম না।

—চোখ বুজে থাকলে কোনো দিন পাবেও না।

স্ত্রী নিশ্চুপ! জানেন কিছু বলা মানে কথা বাড়ান, স্বামীর রাগ বাড়ান।

—আজকাল ওর লক্ষণটা কেমন চোরা-চোরা—বিনয়বাবু বলেন—রীতিমত সিনিষ্টার!

তবুও স্ত্রী নিরুত্তর! নয় রইলেনই। চোখ বুজেই থাকুন উনি, চুপ করেই থাকুন; তাই বলে বিনয়বাবু নিজে তা পারেন না। আর নিজে তিনি চুপ থাকেনও না। অনাহুতভাবে এগিয়ে আসেন যখন-তখন।

—কতো বললে এক পো রুই ছ' আনা! স্ত্রীকে চাকরটার হিসেব দেয়া শুনে বিনয়বাবু উঠে আসেন চেয়ার থেকে।

—আজ্ঞে।

—আজ্ঞে! ছ'আনা!!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছে তো ছ'আনা! স্ত্রী চটে ওঠেন।

—বলছে তো আমিও শুনছি, কিন্তু......

—কিন্তু কী? ভয়ানক বিরক্ত শোনায় স্ত্রী হৈমন্তীর স্বর—বল বল কিন্তু কী?

—বলছি কিন্তু মফঃস্বলেও ছ'আনা?

—আজকাল চাদ্দিকেই বড্ড দাম। রাম নীচুস্বরে বলে।

বড্ড দাম! এ যে একেবারে গলায়···

—তুমিই হিসেব নাও, আমি চলি। স্বামী শেষ করার আগেই হৈমন্তী বলে ওঠেন।

—আঃ, চট কেন অমন চট্ করে, আমিই নয় যাচ্ছি; কিন্তু······তিনি ধীরে ধীরে চলে যান। বেশ অনিচ্ছা তাঁর যাবার ভঙ্গীতে।

উনি চলে গেলে রামকে হৈমন্তী বলেন—কিছু মনে করিস্‌নে, বুড়ো হয়ে মাথার আর কিছু নেই।

বোঝান—তুই তো সবই জানিস্ তোকে আর কী বলব।

সান্ত্বনা দেন—তোরও গুরুজনের মতই তো, ছুটো নয় বল্লেনই, তাই বলে তুই কিছু মনে করবি ?

রাম একটু বোকা বোকা হাসে। একটু অপদস্ত অপদস্ত।

তবু শেষ নেই অভিযোগের, সন্দেহের। বিনয়বাবু কেবল খুঁজছেন ছেঁদা। যেন রেঁদা দিয়ে কুরে-কুরে তিনি বার করবেন ছেঁদা ; তাই তাঁর শপথ, অঙ্গীকার।

—শুনছো ? কেমন লঘু পায়ে এসে কেমন লঘুস্বরে বিনয়বাবু একদিন হৈমন্তীকে ডাকেন।

—শুন্‌ছি বল। উল বুনতে বুনতে হৈমন্তী বলেন।

—আমার সোনার বোতামগুলো দেখেছো ?

—কেন, ড্রেসিংটেবিলে নেই ?

—না ! বিনয়বাবুর মুখে কেমন চাপা উত্তেজনা।

—নেই তার মানে !

—নেই মানে নেই।

—ভালো করে দেখেছো তো ?

—তোমার কী মনে হয় ?

—মনে-হওয়া-হুইর কী আছে, জিগ্যেস করছি ; তুমিও করতে।

—আমি বলব কী তুমি স্বয়ং গিয়ে ছাখো। মন্তী উঠে আসেন, ড্রেসিং টেবিল দেখেন, খোঁজেন।

—কী, এখন বুঝ্‌ছো তো ?

মন্তী ব্যস্তভাবে খুঁজতে খুঁজতে বলেন—কী বুঝবো ?

—এখনো তা বুঝলে না !

—কী বুঝবো—কী ?

—যা এতো দিন ধরে বল্‌ছি তা ঠিক।

মন্তী বিরক্ত দৃষ্টি হেনে অন্য ঘরে খুঁজতে যান।

আর বিনয়বাবু হাঁকেন—রামরতন।

রাম আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ায়, বলে—কিছু বলছেন ?

তীব্র দৃষ্টি রেখে তার মুখের উপর বিনয়বাবু কিছুক্ষণ চুপ ; তারপর বলেন—হ্যাঁ। তুমি শোবার ঘরে কখন গেছিলে ?

—সকালে।

—হুঁ, কী করতে ?

—মা-কে ডাকতে।

—মা ছিলেন সেখানে ?

—না।

—অন্য কেউ ?

—কেউ না।

—তুমি ঘরের মধ্যে কতক্ষণ ছিলে ?

—মা নাই দেক্ষিয়াই বাইর আইসাছিলাম।

—আর কেউ ও ঘরে গেছিল ?

—জানিনি।

—জান-না ! ড্রেসিং টেবিলে আমার সোনার বোতাম ছিল কোথায় গেল, জান ?

আর পারে না রাম ; মুখ তার বেগুনি হয়ে আসে, কোনোক্রমে বলে—আজ্ঞে না।

—না—জান না !

—না।

—ফের না ঃ মিথ্যুক-পাজী—চো……

—আঃ, কী করো, এই তো বোতাম। মন্তীর স্বর। আর সে স্বর উত্তেজনায় হিম-হাওয়ার মত এসে লাগল। অথর্ব হয়ে গেলেন একেবারে বিনয়বাবু।

প্রথম প্রথম এমন হলে রাম কালো হয়ে যেত। ভয়ানক কষ্ট বোধ আর অপমান বোধ করত। মন্তী কী করে সামলে-সামলে ছিলেন তাই টিকে ছিল সে ; নইলে সেই সব প্রথম আঘাতেই ভেগে যেত। চোর বলে তাদের বংশে কেউ কোনো দিন অপমানিত হয় নি। চুরি তারা জীবনের নিম্নস্তরের লোকে করে বলে জানত, বিশ্বাস করত। নিজেরা চুরি করা তো দূরের কথা, চুরি যারা করে তাদের তারা ঘেন্না করত।

অমন সংবেদনশীল রামকে কম ঝক্কি করে মন্তীকে রাখতে হয় নি। কম সামাল দিতে হয় নি। পুতুপুতু করে রাখা নয়, অন্যায় হলেই সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে অন্যায়টাকে মানিয়ে নিতে হয়েছে ; স্নেহে সহজরূপে ঢেকে দিতে হয়েছে।

দু'একবার নয়, বহু-বহুবার। কতো সময় কতো কোণ থেকে যে দুর্য্যোগ এসেছে তার অন্ত নেই। আর এসেছে এবং আসে তাঁর কাছেই।

—কী-রে অমন মুখ গোম্‌ড়া করে দাঁড়ালি কেন? প্রশ্ন করার আগেই অবশ্য মন্তীর জানা থাকত কেন দাঁড়িয়েছে।

—মোকে ছাড়িয়া দ্যান। ভার-ভার মুখে রাম বলত। মন্তী বুঝ্‌তেন আসন্ন বিপদ। একদিকে এই সত্যবান চাকর অন্যদিকে ঐ উদ্ভট লোকটি! মাঝে উনি কী করেন—কী করেন: ভগবান! আচ্ছা যন্ত্রণায় পড়েছেন। সে লোকটিকে নিয়েও নিরুপায়, তাঁকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না; আর এদিকে···

এর আর কী দোষ; মন্তী ভেবে পান না।

—সে কী, কী হল? অবশেষে বলেন।

কিছুক্ষণ রাম চুপ, পরে জড়ান গলায় বলে—বাবু মোকে চোর কইলেন, মোরা অমন কাজ কক্ষণো করি নাই।

—আহা-হা, কেন তুই পাগলের কথা শুনিস্? বাবুর পাগ্‌লামীর জন্যে তুই আমায় কষ্ট দিবি, বিপদে ফেলবি?

রামের ঐখানেই দুর্ব্বলতা, সে ঐখানেই চুপ করে যায়।

ইদানীং কিন্তু রাম আর তেমন লজ্জা—অপমান বা জ্বালা অনুভব করত না অমন অহেতুক অপবাদেও। বরং ক্রমশঃ কেমন হয়ে উঠল। বাজার নিয়ে পথে আসতে আসতে বুক দুরদুর করত; বেশী দরের মাছটার হয় তো দাম কমিয়ে দিত দু-এক আনা, অন্য জিনিসের মুল্যে সেটা পূরণ করে নিতো দু-চার পয়সা করে।

এসে হয় তো হিসেব দিল—আধ সের মাছ আট আনা। এনেছে যদিও পাঁচ সি'কে সের। কিন্তু কেনার সময়ই ভয় ভয় করেছিল, মনে হয়েছিল, দামটা বড্ড বেশী, বড্ড অবিশ্বাস্য বাবুর কাছে।

তা হোক: তখন আবার কেমন একটা মনে-মনে ভরসা পেত, সান্ত্বনা আর সরলতা পেত মাছটা বাস্তবিকই ভালো দেখে। কিনে নিয়ে কিন্তু আশ্বস্ততা আস্তে আস্তে ভুর-ভুর করে উড়ে যেত: ভীরুতা ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলত মন।

অনেক সময় খুচরো টাকা পয়সা এদিকে ওদিকে ছড়ান-গড়ান দেখে তুলে নিয়ে দিয়ে আসার জন্যে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ দুর্দ্ধর্ষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে। আর বিচলিত হয়ে আরো বিবশ হয়ে গেছে প্রাণমন—পিছনে যখন দেখেছে বাবুকে।

—কী হল, অমন ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠলি কেন? বাবু বলেন। কিছুক্ষণ জিব-তালু-মালু সব কিছু আড়ষ্ট কাঠ হয়ে থাকে রামের। তারপর প্রায় মরে গিয়ে বন্ধ হয়ে আসা স্বরে বলে—কিছু নয়, এম্নি।

—এম্নি!

—হ্যাঁ। রাম ঘর ছাড়তে ছাড়তে বলে। আর বেরিয়ে গিয়ে যেন পা চলে না। নিথর হয়ে যায়ঃ সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

বহুবার মায়ের রাত্রে বালিশের-তলায়-রাখা হার দেখেও সে গিয়ে সে কথা বলেনি, তেম্নি থাকতেই দিয়েছে। হারটা নিয়ে হয় তো খোঁজাখুঁজি হয়েছে বিস্তর, এন্তার বকা-ঝকা।

—কোথায় যে আজকাল জিনিষপত্তর ফেল তার ঠিক নেই! বাবু বলেছেন ব্যস্ত হয়ে, বিরক্ত হয়ে।

—জিনিষপত্তর ফেলি মানে? তোমার সংসারের কটা জিনিস কোথায় গেছে, শুনি? মন্তীর অসন্তোষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটে।

বলেন—শুধু শুধু অমন বলবে না বলে দিচ্ছি যখন তখন। তোমার সব কিছু যদি উচ্ছন্নেই দিলাম তো আমাকেই আবার সব কিছু দেখাশুনো করতে হয় কেন? এবার থেকে আমি কিচ্ছু পারব না—সোজা কথা! মন্তী অনেকগুলো কথা বলেন, অনেকখানি উষ্ণতা সেগুলোয়।

অবশেষে পাওয়া গেছে অবশ্য হার খোঁজাখুঁজির পর পরিশ্রান্ত হয়ে। তবুও বলেনি রাম সে যে জানে হার কোথায় সে কথা।

এক অশান্ত সন্তর্পণে সে থাকত।

তাছাড়া চোর শুনলে তেমন চমকে উঠত নাঃ ব্যাপারটা কেমন জানি গায়ে মাখো-মাখো হয়ে গেল, সয়ে গেল।

আর তেম্নি মন নিয়ে সে একদিন দেখল টেবিলে খোলা আংটি। গুছিয়ে রাখার জন্যে হাত বাড়িয়ে একটা শব্দে দুরন্তভাবে বিপর্য্যয় হয়ে হাত সরিয়ে নেয় রাম। বুকের মধ্যে অসহ্য অস্থিরতা কাঁপতে থাকে তোলপাড় করে।

পরমুহূর্ত্তে, চকিতে সব দিক চেয়ে অকস্মাৎ টুক্ করে সে সেই আংটি তুলে লুকিয়ে নিয়ে লঘু পায়ে সেখান থেকে সরে গেল।

আধুনিক সভ্যতায় ধর্ম্মের স্থান

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস্-সি

আধুনিক সভ্যতা কোন কোন প্রাচীনপন্থীর কাছে ধর্ম্মলেশ বলে অনুভূত হলেও আজকের সভ্য জগতে ধর্ম্মের স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না কিংবা কোন সংশয়ও থাকতে পারে না। র‍্যাণ্ডেলের ভাষায় 'man is incurably

religious'. ধর্ম্মপ্রবণতা মিশে আছে তার রক্ত-স্রোতে তার অস্থি-মজ্জায়। সমাজে তথা সভ্যতার প্রাণ হল যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্মের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্ত হবে কেমন করে? মানুষের মন সবসময়েই কোন না কোন ধর্ম্ম-বাখ্যাকে আঁকড়ে ধরবার প্রয়াসী, একটা অবলম্বন তার চাই-ই। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় যন্ত্রশিল্পের যুগে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যদিও পুরাতন ধ্যান-ধারণাগুলি একে একে ভেঙে ভেঙে পড়ছে তথাপি তার অন্তরলোকে সে সৃষ্টি করে চলেছে নূতন ধর্ম্ম ও নবীন দেবতার। কী সেই ধর্ম্ম? কোথায় তার স্থান? কতখানি সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে আত্ম-গোপন করে?

সভ্যতার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তার রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। তাই সূচনায় যে ধর্ম্মকে মানুষ বরণ করে নিয়েছিল, আজকের নূতনতর পারিপার্শ্বিকতায় প্রগতিশীল ক্রমোন্নীত জীবনে সে ধর্ম্মের প্রাচীনত্বটুকু বজায় না থাকলে বিস্মিত বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন সময়ে কী ধর্ম্ম ছিল এবং কেনই বা তা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল এ নিয়ে গবেষণা করতে হবে না। বিশেষ বিশেষ জাতির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি অনুভব করে চিন্তাশীল দার্শনিক ও মহাপুরুষ কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ধরণের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়ে এসেছে। এই ধর্ম্মের মুলে অবশ্য যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ব্যক্তিগত দূরদর্শিতা এবং কৃতিত্বই প্রধান, কারণ তাঁরা হৃদয়বীণার ঠিক তারটিতেই ধ্বনি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আজকের ধর্ম্ম এমন এক যুগসন্ধির পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানুষের পূর্ব্বেকার চিরপুরাতন বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণা বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। আজকের ধর্ম্ম এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে যেখানে আগামীকাল সে-ধর্ম্ম কোন রূপ পরিগ্রহ করবে সে সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোন কিছু বলা যায় না। আমরা শুধু জানি বিরাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়ে চলেছে, তারই সঙ্গে সংহতি বজায় রেখে চলতে হবে আজকের এবং আগামীকালের ধর্ম্মকে।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা—মানুষের আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারা ধর্ম্মকে করছে চ্যালেঞ্জ। আধুনিক সভ্যতাজনিত এই ইন্টেলেকচ্যুয়াল চ্যালেঞ্জকে ধর্ম্ম আজ কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারে না—তাকে তার সম্মুখীন হতেই হবে। আধুনিক সভ্যতা প্রশ্ন করে, পরমাণু বোমার যুগে মানুষ যে অমিতশক্তির অধিকারী হতে চলেছে তার চেয়েও কি বেশী শক্তি আছে কোন কল্পিত ঈশ্বরের? এই প্রশ্ন অতি সাধারণ কিন্তু অতিশয় ভ্রমাত্মক। ধর্ম্মের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি করতে হবে কেন? সামাজিক আদর্শবাদ তথা নীতি এবং প্রেম যা ধর্ম্মের প্রাণ এবং মূলমন্ত্র তা কোনদিনই কোন সভ্যতা থেকে দূরে থাকতে পারে না। পরম কারুণিক ঈশ্বরের সৃষ্টি যে যুগে হয়েছিল সেই যুগে বিজ্ঞানের

বালাই ছিল না। আজকের প্রাকৃত বিজ্ঞান যদিও ঈশ্বরকে স্বর্গচ্যুত করে মানুষকে এই বিশ্বের নিভৃত সৌন্দর্য্যে একক পরিব্রাজক বলে নির্দ্দেশ করে তথাপি অতি-আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের কল্যাণে জানা যায় কেমন করে এবং কেনই বা সেই স্বর্গবাসী দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমাজ-বিজ্ঞানই আবার ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ধর্ম্ম হল মানব জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ধর্ম্মের ভিত্তি পুরাকালের ধারণানুযায়ী রহস্যময় প্রদেশ থেকে অপসৃত হয়ে মানুষের মধ্যে তার আস্তানা পেতেছে। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় আর কোন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের আন্দোলনে সেই সুদৃঢ় ভিত্তিতে কোন অনুকম্পন জাগবে না। নৃতত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেছে যে, দেবতার জন্যে ধর্ম্ম তৈরী হয় নি—ধর্ম্ম শুধু মানুষেরই জন্যে। ধর্ম্ম শুধু সেই মানুষেরই জন্যে যে মানুষ অস্তিত্ববিহীন কল্পনা মাত্র নয়, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব ধর্ম্ম শুধু সেই মনের জন্যে যে মন চিন্তাশীল, ধর্ম্ম শুধু সেই হৃদয়ের জন্যে যে হৃদয় অনুভূতিশীল, ধর্ম্ম শুধু সেই আত্মার জন্যে যে আত্মা উচ্চাভিলাষী। যে নূতন এবং অনন্ত বিশ্বের অবগুণ্ঠনখানি বিজ্ঞান উন্মোচিত করে দিয়েছে সেই বিজ্ঞান-জগৎ থেকে যদি কোন ধর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তি দূরে সরে থাকতে চান এই ভেবে যে সে-জগতে ধর্ম্মের অবলোপ ঘটেছে, কিংবা এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী, তাহলে আমরা তাঁকে উপরোক্ত সমাজবিজ্ঞানগুলি একবার অনুশীলন করতে অনুরোধ করি। তিনি দেখে আনন্দিত হবেন সেই একই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গী মানুষেরই মধ্যে সকল ধর্ম্মের ভিত্তি ও উৎস নির্ণীত করেছে।

আধুনিকতম বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে যিনি যত পরিচিত হবেন তিনি ততই দেখতে পাবেন বিজ্ঞানই ধর্ম্মের প্রকৃত উৎস নিরুপণ করেছে, বিজ্ঞানই মানুষের ধর্ম্মানুভূতিকে সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করে নিয়েছে এবং ধর্ম্মপ্রবণতাকে চেষ্টা করেছে অভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে। তিনি দেখতে পাবেন ব্যক্তিবিশেষের কোন বিশেষ "Scientific world view" বা বিজ্ঞানসম্মত ধারণার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন বাধ্যতামূলক সংস্রব নেই। He comes to see that religion is a way of life, not a kind of belief or a particular organization, and so he seeks to live "the life that is life indeed". ধর্ম্ম কোন বিশেষ ধরণের বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়,—ধর্ম্ম হল জীবনের একটা ধারা একটা পথ একটা উদ্দেশ্য যা মানুষের আবেগময় এবং কর্ম্মময় জীবনকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতার শীর্ষদেশে অধিরোহণ করতে সাহায্য করে—যাকে আশ্রয় করে মানুষ বাঁচার মত বাঁচতে পারে।

মানুষ ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থলের যে কোন এক প্রান্তভাগে (extremes) বিচরণ করে।

আকাশচুম্বী কামনার বশবর্ত্তী হয়ে সে কখনও নিজেকে মনে করে বুঝি মহাশক্তিধর কোন দেবতা—সারা পৃথিবী বুঝি তার আজ্ঞাধীন। আবার যখন এই মোহমরীচিকা বিদূরিত হয় তখন দারুণ হতাশায় পার্থিব সব কিছুতেই তার গভীর ঔদাসীন্য জাগে—সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, দূরে সরিয়ে নেয় বাসনা রঙীন এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যময় পুষ্পিত কানন হতে। কিন্তু যে অন্ধ নয়ন বিজ্ঞানের আলোক-স্পর্শে গেছে খুলে, যে নিয়মানুগ মন অভিজ্ঞতায় হয়েছে পূর্ণ, সে জানে কত ক্ষুদ্র মানুষের সামর্থ্য, কত অপরিসর তার জ্ঞান, কত ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল তার বিশ্ব ও বিশ্ববাসী সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা। তবু সে জানে, যেটুকু সামান্য আবিষ্কার সে করেছে, যেটুকু শক্তির সে অধিকারী হয়েছে, তা স্বপ্নবৎ অসার নয়—তা হল এমন একটা সুস্পষ্ট ছন্দ যা সমগ্র বিশ্ব-ছন্দের সঙ্গে একত্রে অনুরণিত হয়ে ওঠে। তার সেই সামান্যতম দানই বিশ্বকে প্রগতির পথে করবে পরিচালিত।

বিশ্ব-প্রকৃতি যে নিয়মে কাজ করে চলে সেই নিয়মগুলি পর্য্যালোচনা করে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে আমরা কাজ করতে চাই প্রকৃতিরই অনুকরণে, যেন কোথাও অপূর্ণতা না থাকে। কিন্তু যেখানে আমরা বারবার ব্যর্থকাম হই সেখানে সেই অপূর্ণতাকে ভরিয়ে তুলতে আমরা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকি। এই কল্পনা থেকেই দেবতার ধারণার উদ্ভব হয়ে থাকে। সেই কল্পনার বস্তুকে পাবার জন্যে আমরা সত্যিকারের সাধনা করি। কিন্তু কেন করি? তার কারণ আমাদের সে-সাধনা প্রাকৃতিক ঘটনাবলিরই অঙ্গীভূত। এ সম্বন্ধে র‍্যাণ্ডেল ভারী চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন: "The striving of man for objects of imagination is a continuation of natural processes ; it is something man has learned from the world in which he occurs, not something which he arbitrarily injects into that world. When he adds perception and desires to these endeavours, it is not after all he who adds ; the addition is again the doing of nature and a further complication of its domain."

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত এবং তারই প্রতিক্রিয়া-তরঙ্গে আলোড়িত, তখন সে বুঝতে পারে তার কাজ ও চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য-রেখা অঙ্কিত করবার প্রয়োজন নেই—শুধু অন্ধ দাসমনোবৃত্তিমূলক, অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কাজকে স্বচ্ছন্দ দায়িত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক কাজ থেকে আলাদা করে নিতে হবে।

আধুনিককালের চিন্তাশীল ব্যক্তি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য খুঁজতে যাবেন না—পুরাতন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের খুঁটিনাটি ধারণাগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কেমনভাবে কতখানি নিহিত আছে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান কিভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধবদ্ধ, উভয়ের মধ্যে কতটুকু আপোষ রক্ষা হতে পারে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনই সার্থকতা তিনি দেখতে

পাবেন না—তিনি আজকের ইণ্টেলেকচুয়াল চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করে নিয়ে তারই প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করবেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান এবং দর্শন যে আলোকসম্পাত করেছে সেই আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর নিজের জীবনে ধর্ম্মকে আনন্দের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্গঠন করবার প্রয়াসী হবেন। কিন্তু তাই বলে পুরাতন সব কিছুকেই তিনি অপ্রয়োজনীয়-বোধে পরিত্যাগ করবেন না। পুরাতনের মধ্যে যা সর্ব্বোত্তম, যা আগামী যুগেও সমধিক ঔজ্জ্বল্যে বিকশিত থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়, তাকে নিয়ে আধুনিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তিতে তিনি এক নূতন এবং দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করতে সক্ষম হবেন।

আজ আমরা বুঝতে পারি ধর্ম্ম বলতে এতদিন যে মনোরম রূপকথা প্রচলিত হয়ে এসেছে—মেয়েদের ব্রতকথা বইতে যার নিদর্শন পাওয়া যায়—তার সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মের কোন যোগ নেই। ধর্ম্মের অধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীটুকুই হল আসল।

কিন্তু এই স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক কথাটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে যে তার সরলার্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। স্বার্থসিদ্ধিমূলক কুসংস্কার থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার ভাবপ্রবণতা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই আমরা এই আধ্যাত্মিক কথাটাকে জড়িয়ে থাকি। এইভাবে আধ্যাত্মিকতা এমন সুলভ হয়ে পড়েছে যে তার গুরুত্ব এবং মূল্য লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে।

আধ্যাত্মিকতা কোনক্রমেই ভাবপ্রবণতা, সম্মোহনশক্তি বা প্রার্থনার সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়; কিংবা বিচার-বুদ্ধিহীন লক্ষ্যহীন কোন অন্ধ বিশ্বাস মাত্র নয়। আধ্যাত্মিকতা হল মানব-অভিজ্ঞতার এমন এক বিশেষ স্তর, মানুষের এমন এক বিশেষ গুণ, যা নিজ আত্মার এবং সকলের কল্যাণাভিলাষী।

আধুনিক সভ্যতায় এই অধ্যাত্মমূলক ধর্ম্ম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে—উচ্চাভিলাষ, প্রেম, প্রীতি ও সেবার মধ্যে নিহিত রয়েছে তার মহিমা।

আজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ষোলই আগষ্ট এবং তারপর কয়েকটা দিন বাংলাদেশের রাজধানীতে যা হয়ে গেল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার উল্লেখ বিশেষভাবে থাক্‌বে বলেই আশা করা যায়। একে মধ্যযুগীয় হত্যালীলা আখ্যা দিয়ে আমরা কেউ কেউ নিজেদের শতাব্দীকে ভদ্র এবং শালীন মনে করতে চাই কিন্তু তার আগে একবারও ভেবে দেখতে চাইনে, আজ হঠাৎ একটি তিথিতে কি করে এমন মধ্যযুগ নেমে আসে যখন মানুষ তার প্রতিবেশীকে ক্ষমা

করতে পারেনা, যৌথ জীবন যাপনের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত স্মৃতি ভুলে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে! মধ্যযুগে এ-উদাহরণ মিল্‌বেনা—বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করে মধ্যযুগের মানুষও হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গিয়ে একে অন্যের টুঁটি চেপে ধরেনি। এ-ক্ষ্যাপামি নিছক বিংশ-শতকের দান, যে-বিংশশতক রাষ্ট্রবোধকে সমাজ-বোধের ঊর্দ্ধে স্থাপন করেছে। ষোলই আগষ্টের ঘটনার জন্মে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব বা সমাজনীতি দায়ী নয়, দায়ী রাষ্ট্রনীতি। আর মানুষকে রাষ্ট্রনীতির ভৃত্য করে তুলবার কুফল বাংলা দেশেই প্রথম ফললনা—এ শতাব্দীর প্রতি পদক্ষেপেই য়ুরোপে তা ফলে এসেছে।

আঠারো-উনিশ শতকের য়ুরোপেই মানুষের যৌথ-প্রয়াসের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সমাজ-জীবনের মৈত্রীবন্ধনের উপর সেখানে অনাস্থা গড়ে উঠ্‌তে বাধ্য। শোষিত ও শোষকশ্রেণীতেই যে সমাজ তৈরী এবং শোষকশ্রেণীর শাসন-যন্ত্রের নামই যে রাষ্ট্র এ-তথ্যগুলো ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই পরিচ্ছন্নরূপে দেখা দিতে সুরু করল। সমাজের প্রতি মানুষের প্রীতিবোধকে নষ্টভ্রষ্ট করে দিয়েই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিরস্ত হয়নি—তার শোষণলিপ্সা নিজ দেশে শোষণ শেষ করে অপর দেশের দিকেও লোভাতুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের এই সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি উনিশ শতকীয় য়ুরোপের শ্রদ্ধা এবং ঘৃণা সমানভাবেই অর্জ্জন করেছে—কিন্তু রাষ্ট্র যে সর্ব্বশক্তিমান এ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় মন মোহমুক্ত হ'তে পারেনি। তাই, বিংশশতকের শৈশবে যখন য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সাংঘাতিকতায় প্রথম মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল—তখনও য়ুরোপীয় সমাজ রাষ্ট্রের সর্ব্বশক্তিমানত্ব ঘুচিয়ে দেবার কামনা করেনি, রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধে সমাজকে স্থাপন করবার জন্মে সচেষ্ট হয়নি—রাষ্ট্রপিষ্ট মানুষের দল রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করবারই চেষ্টা করেছে। রুশ-বিপ্লব সে-চেষ্টার সাফল্য সূচনা করে। আর পাশাপাশি নাৎসী অভ্যুদয় পুরোণো রাষ্ট্রকেই নগ্ন হিংস্রতায় সমাজের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রকে ক্ষয় করে ফেলবার ইচ্ছা যে রুশ-বিপ্লবে ছিলনা তা নয় কিন্তু যে-কারণেই হোক—রাষ্ট্র সেখানে ক্ষয় হয়ে যায়নি বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে।

মানুষের জীবনের এবং সমাজের উপর রাষ্ট্রকে আসন দেবার রেওয়াজ ভারতবর্ষের শিক্ষায় ছিলনা—আমরা য়ুরোপের কাছেই এ-শিক্ষা গ্রহণ করেছি। হাতেকলমে ছাড়াও পুঁথিপত্রের মারফৎ সর্ব্বাঙ্গীন ও সুচারুভাবে এ-শিক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। আমাদের চোখের সাম্‌নে সমাজের ছবি ততটা ভেসে ওঠেনা যতটা স্পষ্ট ভেসে ওঠে রাষ্ট্রযন্ত্রের চেহারা। দুশো বছর যাবৎ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি রাষ্ট্রদ্বারা আমাদের সুখসমৃদ্ধি, আশাআকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; বুঝতে পারছি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ন্যায়-অন্যায় বোধ সব কিছুরই বিধাতা রাষ্ট্রযন্ত্র; কাজেই য়ুরোপের মতো রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার

করবার বৃত্তিও আমাদের মনে ধীরে-ধীরে জন্ম নিয়েছে। আমরাও মনে-মনে রাষ্ট্রকে সর্ব্বাধিনায়ক ভেবে তার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি। সমাজের এই দাস্য, রাষ্ট্রের এই প্রভুত্ব আধুনিক সভ্যতারই দান, প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার নয়।

কিন্তু যা বাস্তব তা-ই কি যুক্তিসম্মত? হেগেলের মতো নির্ব্বিবাদে কি এ-কথা মেনে নেওয়া যায়? মানুষকে আর মানুষের সমাজকে রাষ্ট্রের হাতের পুতুল তৈরী করে মানুষের সত্যিকারের সভ্যতাকে য়ুরোপ যা দিয়েছে তা পঁচিশ বছর অন্তর দুটো মহাযুদ্ধ। প্রভুত্বের ক্ষুধায় আত্মহারা হয়ে রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে গুলিগোলা, বোমা-বারুদের খাদ্য হিসেবে বলি দিয়েছে, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, অতি সাধারণ সুখশান্তি নিয়েও তাদের বাঁচতে দেয়নি। রাষ্ট্রের এই সংহারক ইচ্ছার কাছে নিজেদের ইচ্ছাকে বলি দেবার বাধ্যতা গত পনেরো বছর যাবৎ য়ুরোপে চরমে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব-লীলায় এসে সাময়িক বিশ্রাম লাভ করেছে। সর্ব্বশক্তিমান নৃশংস রাষ্ট্র এবং যুদ্ধের ব্যাপক মৃত্যুযজ্ঞ সমাজ-মানসে যে একটি অনুভূতি সজীব করে তোলে তা হ'ল ভয়। প্রাণের ভয়েই মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, জীবন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই মানুষকে জীবনের মূল্য ভুলে যেতে শেখায়। আজ যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের জন-মানসে তার ইঙ্গিত মুহুর্মুহু পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজ-মানসেও আজ জীবনের মূল্য ম্লান হয়ে গেছে। তার কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাংলাদেশ কৌতূহলী দর্শকমাত্র ছিলনা, যুদ্ধের আগুনের প্রত্যক্ষ তাপ এসে তার গায়ে লেগেছে। পশুর মতো প্রাণ নিয়ে ছুটে পালানোর নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, যুদ্ধেরই প্রসাদে মন্বন্তরের গ্রাসে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুযাত্রার দৃশ্যও বাংলাদেশের বুকে জমা হয়ে আছে। শান্তির নীড় ভেঙে গেছে বাংলায়—ছেড়ে দিতে হয়েছে জীবনের জন্যে ব্যাকুল মমতা। অনিশ্চয়তা, ভয়, অভাব যখন মনের উপর প্রহরীর মতো জেগে থাকে, সেখানে তখন স্থৈর্য্য, সংযম, ন্যায়অন্যায় বিচারবোধ প্রবেশ-পথ খুঁজে পায়না। আঘাতের সামান্য আশঙ্কাতেই—আঘাতের আতঙ্কেই সমাজ-মানস তখন বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রনীতির যে-কোনো প্রকার ছায়াপাতেই বাংলাদেশের স্পর্শকাতর সমাজ-মানস অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়ে। গত নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারীর ছাত্র-আন্দোলন তাই রাষ্ট্রনীতির মধুচক্র বাংলার রাজধানীকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল—ডাক ধর্ম্মঘটের সহানুভূতিতে তাই সমগ্র কলকাতা সাড়া দিয়ে উঠল। এই স্পর্শকাতর মনকে যে ষোলই আগষ্ট উত্তেজিত করে তুলবেনা যদি কেউ এমন আশা করে থাকেন—তাঁর আশাবাদিতাকে প্রশংসা করা যায় না। দেহে হিন্দুমুসলমানের রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধিতার চিহ্ন বহন করে আসছে যে-দিন, আজকের দিনের বাংলাদেশে তা সুদিন হতে পারেনা। সুদিন তা হয়নি এবং যে ধরণের দুর্দ্দিন হয়ে তা দেখা দিয়েছে তার নির্ম্মমতার তুলনা নেই। বাংলাদেশের

হিন্দুমুসলমান আজ অতিমাত্রায় রাষ্ট্রের পুতুল ; তাদের জীবন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, বাস্তব জীবনের দারিদ্র্য, আতঙ্ক ও আশঙ্কাগ্রস্ত মনই ষোলই আগস্টের অমানুষিকতার জন্ম দিয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজমানস যেখানে এসে পৌঁচেছে ষোলই আগষ্ট তার নগ্ন প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রকে যারা জীবনের বিধাতা বলে মানতে বাধ্য হয়, এই ধরণের শোচনীয় পরিণামই তাদের জন্যে তৈরী হয়ে চলে। সমাজ-বিধাতার শুভাশীষেই কেবল মানুষের জীবন রমনীয় হতে পারে—যতো কিছু কল্যাণকর, যতো কিছু মানবীয়, একমাত্র সমাজসংবদ্ধতা থেকেই পাওয়া সম্ভব। মানুষের যে-সমাজ সমাজের প্রগতিশীল বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারে রাষ্ট্র সেখানে সমাজের দাসত্বে নিযুক্ত হয়—গড়ে ওঠে মানুষের শান্তশ্রী জীবনের নীড়। শান্তি-প্রীতি-মৈত্রীর বন্ধনে মানুষ সেখানে মানুষের মতো বাঁচতে পারে। এ ছবি আকাশ-কুসুমের নয়—একদিন ভারতীয় জীবনে সমাজের এ-রূপই ছিল। সমাজই ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় মন সমাজকেই পূজো করতে শিখেছিল, রাষ্ট্রকে নয়। সেই মনের ভগ্নাংশ এখনও ভারতীয় পল্লীতে খানিকটা বেঁচে আছে—যদিও ভারতীয় নগরবন্দর আজ রাষ্ট্রদীক্ষায় দীক্ষিত।

আজ ভারতবর্ষ শাসন-ব্যবস্থার একটি সংক্রান্তির সম্মুখীন। বৈদেশিক শাসন অপসৃত করে স্বায়ত্তশাসনের ছায়াতলে এসে আমাদের দাঁড়াবার সময় এসেছে। ক্রান্তি-কালেই শাসন-যন্ত্র বা রাষ্ট্রের প্রকৃতি যাচাই করে নেওয়া দরকার। বৈদেশিক শাসন-যন্ত্রের উত্তরাধিকার থেকে নানাদিকেই স্বায়ত্তশাসনযন্ত্রের মুক্তি পাওয়া চাই—নীট্‌শের একথাটা জাতীয় সরকারের মনে রাখতে হবে : **Dangerous it is to be an heir**। অবশ্য জওহরলাল আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন :

"India is on the move and the old order passes. Too long have we been passive spectators of events, the playthings of others. The initiative comes to our people now and we shall make the history of our choice. Let us all join in this mighty task and make India, the pride of our heart, great among nations, foremost in the arts of peace and progress."

এ-আশ্বাস একমাত্র তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে যখন ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার ভারতীয় সমাজের প্রভু না হয়ে সেবক হয়ে উঠবে, যখন শাসন-ধর্ম্ম নয়, পালন-ধর্ম্মই প্রেরণা দেবে তার কর্ম্মসূচীকে, ভারতীয় সমাজবদ্ধতা আবার যখন সজীব, সঘন হয়ে গড়ে উঠবার অবকাশ পাবে আর মৈত্রী-মিলন-সৌভ্রাত্য-মানবতাকে ফিরে পাব যখন আমরা সমাজেরই আশীর্ব্বাদ হিসেবে। আজ আমাদের শেষবারের মতো বোঝা উচিত—রাষ্ট্রের শাসানিতে বা রাষ্ট্রচেতনায় যে মৈত্রীর ছবি ফুটে ওঠে মরীচিকার মতোই তা ফিকে, মিথ্যা।

বাংলার সংস্কৃতি

বাঙালীর মন

(শরৎচন্দ্র)

নারায়ণ চৌধুরী

শরৎচন্দ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না একথা আগে বলেছি। শরৎচন্দ্রের রচনাশক্তির অনন্যতার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নজীর থেকেও এর কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। শরৎচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়েছে কল্‌কাতার বাইরে— এর ভেতর, কৈশোর ও প্রথম যৌবন শুধু কল্‌কাতার বাইরে নয়, বাংলার বাইরে; তিনি ভাগলপুরে আমাদের কাছে থেকে পড়াশুনো করেছিলেন— কল্‌কাতায় যখন এলেন, এসেছিলেন সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রনির্ব্বাচনের সুবৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিতান্তই দেহধারণের তাগিদে, অন্নসংস্থানের দুটি উপায় করতে। যদিও কল্‌কাতার মাসিকপত্রে এরই মধ্যে দুটি চারটি গল্প লিখে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তবু, দুঃখের বিষয়, কল্‌কাতায় তাঁর জায়গা হ'লো না। সামান্য একটি চাকরির জন্যে তাঁকে পাড়ি দিতে হ'লো সুদূর বর্মায়। বোধ করি কল্‌কাতার তৎকালীন মোড়লশ্রেণীর কালচ্যরগর্বী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শরৎচন্দ্রকে তেমন মনে ধরেনি। হৃদয়হীন শহুরে বাবুদের ভাবখানা হয়ত এই ছিল যে গেঁয়ো ছেলের লিখ্‌বার ক্ষমতা হ'লেই বা আর কতো হবে, তাঁদের মতো 'শিক্ষার' পালিশ তো আর নেই, তাই কল্‌কাতার হালচালের সঙ্গে অপরিচিত এমন একটি নামগোত্রহীন ছেলেকে আর ইচ্ছে করলেই নিজেদের সাহিত্যিক চক্রের ভেতর এনে ঢোকানো যায় না, তাতে কৌলীন্য নষ্ট হবে, অপযশ বাড়্‌বে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের জীবিকার প্রশ্নটিও সেই সঙ্গে অমীমাংসিত রয়ে গেলো। কল্‌কাতা তাঁর জন্যে অন্ন মাপেনি মনে করে শরৎচন্দ্রও কালবিলম্ব না করে, সুপ্ত যাযবরবৃত্তিকে পুনরায় ঝালিয়ে নেবার জন্যেই হয়ত, বর্মায় গিয়ে ডেরা বাঁধলেন এবং বহুদিন ফিরবার নামটি না করে স্বদেশবাসীর ওপর শোধ তুল্‌লেন।

বল্‌বেন এ সমস্তই আমার মনের বিকৃত কল্পনা; ফাঁকি ও মেকির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কল্‌কাতার শিক্ষিত নাগরিক জীবন তাকে এক হাত নেবার জন্যেই শরৎচন্দ্রের নামের

সঙ্গে জড়িয়ে এই অভিযোগটি ফেঁদেছি। কিন্তু কার্য দিয়ে যদি কারণ নির্ণয় সম্ভব হয় তা হ'লে এই অভিযোগকে নিতান্ত অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের পুস্তক প্রকাশকেরা শরৎচন্দ্রকে দেশে ফিরিয়ে আন্‌বার বহু চেষ্টা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র রাজী হননি। পরে তাঁদের অনেক সাধ্যসাধনায় তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন তাও কল্‌কাতায় রইলেন না, বাজে শিবপুরের মতো কল্‌কাতার অনতিদূরে অথচ কল্‌কাতার বিষনিঃশ্বাসবর্জিত একটি প্রায় অখ্যাত জায়গায় গিয়ে গৃহনির্ম্মাণ করলেন। যদিও এইসব ঘটনাবলীকে একটি অখণ্ড কার্যকারণের মালা ভাববার কোন যুক্তিসহ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, তা হলেও একথা মনে করা কি খুবই অসঙ্গত যে কল্‌কাতার দলীয় সাহিত্যের আওতা থেকে দূরে থাক্‌বার জন্যেই তিনি কল্‌কাতার সংস্পর্শ বহুদিন এড়িয়ে চলেছিলেন ?

শরৎচন্দ্র যেমন এককভাবে গড়ে উঠেছেন তেম্‌নি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাও নিঃশেষে একক প্রতিভা—দলীয় প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। এ না হয়েই যায় না। ঘটনার চক্রেই হোক, কি নিজের ভেতরকার কোন দুর্দমনীয় জিদের বশেই হোক্‌, শরৎচন্দ্র তার সাহিত্যসাধনার বিশেষ ধারাটিকে নিজের ভেতর থেকেই উদ্বোধিত করে তুলেছিলেন, পরের কাছ থেকে সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা, সাহায্য বা নির্দেশ কিছুই তিনি পাননি। বোধ হয় পরের দ্বারস্থ হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধও ছিলো। এর ভালোমন্দ দুটি দিকই আছে এবং তাঁর রচনায় সেই দুটি দিকই প্রতিফলিত। সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ ভাবে নিজের ব্যক্তিত্বের পথ নিজে কাট্‌তে গিয়ে এক একটি বিষয়ে যেমন তিনি অভূতপূর্ব সাফল্যের চুড়ায় গিয়ে পৌচেছেন, আবার এক একটি বিষয়ে বিনিঃশেষ দীনতার সানুদেশে আট্‌কে রয়েছেন। নিজের ওপর নিজে ষোল আনা নির্ভর করতে গেলে এইরূপই হয়ঃ কোনো কোনো দিক অসম্ভব উৎরে' যায়, কোনো কোনো দিক একেবারেই কাঁচা থেকে যায়। শরৎচন্দ্রের রচনাবলী বোধ করি একথার সব চাইতে বড়ো প্রমাণ।

দলীয় সাহিত্যের আর যতো দোষই থাকুক তার একটি লাভ এই যে বিভিন্ন সাহিত্যিকের পরস্পরের মত-বিনিময়ের আলোকে ও দৃষ্টান্তে নিজের নিজের দোষত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে নেওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যিক চক্রের প্রত্যেকের রচনায় অল্প-যে ভাবসাম্য চোখে পড়ে তা হয়ত তৎকালপ্রচলিত সাহিত্যিক সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত কাজে কাজেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী, কিন্তু দলীয় সাহিত্যিকদের চোখের সাম্‌নে পরস্পরের দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকায় তাঁরা কোথাও রচনার একটা নির্দিষ্ট সুনিরূপিত মান থেকে নেমে যান না; পরস্পরই সেই ক্ষেত্রে পরস্পরকে স্খলন থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনে এই সুবিধাটুকু ছিলো না। কিম্বা সেই সুবিধা তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে দেখতে পাই শরৎচন্দ্র কোথাও অপরিসীম উজ্জ্বল, কোথাও

অপরিসীম নিষ্প্রভ। মানবতাবোধ ও দরদের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তেম্‌নি কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে চিত্তের সঙ্কীর্ণতায়ও বুঝি তাঁর দোসর মেলা শক্ত। একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক সম্পর্কে আমরা এইটেই আশা করি যে তিনি মনের মালিন্য কাটিয়ে এমন একটি স্তরে এসে পৌচেছেন যেখান থেকে সমালোচ্য জীব বা বিষয়কে সম্পূর্ণ উদার দৃষ্টিতে না দেখা সম্ভব হলেও গ্লানিমুক্ত ভাবে অন্তত দেখা চলে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বোধ করি একথা বলা যায় না। আমরা একথা কিছুতেই স্বীকার করবো না যে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ ছিলো; তাঁর মানবপ্রীতি এমনই অকৃত্রিম, তাঁর সর্বপ্রকার দুঃস্থ ও দুর্গতের প্রতি করুণা এতোই স্বতঃসিদ্ধ, তাঁর লাঞ্ছিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রপীড়িতা নারীত্বের প্রতি সহানুভূতি এমনই সহজাত হৃদয়বেদনায় পরিপূর্ণ যে এই নিয়ে মুহূর্তেকের জন্যেও সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। কিন্তু যে কথা আমরা এইমাত্র বল্‌তে চেয়েছি, নিজের ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বল্‌তে গেলে তিনি প্রায় কারও আনুকূল্যই পাননি, সাংসারিক অজস্র প্রতিকূলতা ও নাগরিকভাবাপন্ন শিক্ষিতম্মন্যদের নীরব অবজ্ঞার মধ্যে দিয়ে নানা জায়গায় পোড় খাওয়া কুঁচকোনো নিজের নির্বান্ধব জীবনকে তিনি নিজ হস্তেই গড়ে তুলেছিলেন। ফলে কোন কোন বিষয়ে তাঁর চরিত্রে এমন ক্লেশদায়ক অসঙ্গতি ও সাধারণজীবসুলভ অসহিষ্ণুতা থেকে গেছে যা শরৎচন্দ্রের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল রচনাকে জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত ম্লান করে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ এর একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর ব্রাহ্মবিদ্বেষের ধরণের মধ্যে এমন একটি গ্লানি লুকিয়ে আছে যা মনকে রীতিমতো পীড়িত করে। 'দত্তা', 'গৃহদাহ', ও 'নব-বিধান'-এর মধ্যেই বিশেষ করে আমরা শরৎচন্দ্রের মনের এ দিকটির পরিচয় পাই। শেষোক্ত দুটি বইয়ের কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু 'দত্তা' বইতে রাসবিহারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে হেয় করতে চেয়েছেন তাতে এই ধারণাই হয় শরৎচন্দ্র যতো বড়ো কুশল কথাশিল্পীই হোন না কেন, বাঙালীর সামাজিক জীবনের কোনো কোনো দিক সম্পর্কে তিনি বালকোচিত সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এটাকে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের সহজাত সঙ্কীর্ণতা বললে ভুল করা হবে; এটা তাঁর পরিপার্শ্বের ফল, অন্যের প্রভাবের মধ্যে ধরা না দিয়ে নিজেকে নিজের হাতে নিঃশেষে ছেড়ে দেওয়ার ফল।

উনবিংশ শতকে ব্রাহ্মবিদ্বেষের একটা সামাজিক যুক্তিযুক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়, কেন না হিন্দুত্বের প্রচলিত সংস্কার নস্যাৎ করবার আত্যন্তিক উৎসাহে প্রথম যুগের ব্রাহ্মরা যে অসহিষ্ণুতা, ঔদ্ধত্য ও অহেতুক শ্রেষ্ঠত্ববোধের পরিচয় দিয়ে চলেছিলেন তাতে তখনকার হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য ছিলো না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কালে সেই পারস্পরিক বিদ্বেষের ভিত্তি তো কই উপস্থিত দেখিনে। আর উপস্থিত থাকলেও

তা নিয়ে অন্তত তিন তিনটি বইয়ে পুরনো ক্ষতকে খুঁচিয়ে তোলার মতো provocation নিশ্চয়ই ব্রাহ্মদের তরফ থেকে তখন আসে নি। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মদের সংস্কারকামিতা ও উৎসাহ অনেক পরিমাণে থিতিয়ে এসেছিলো, বলতে গেলে একেশ্বরবাদটুকু ছাড়া তারা সর্ববিষয়ে হিন্দুসমাজেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিলো। তাই যদি হয় তো গায়ে পড়ে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টাটুকু যে কোন মনোবৃত্তির ফল তা তো আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না, যদি না অবশ্য উপরের বিশ্লেষণের আলোকে তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

আমরা বিগত এক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের ভেতর কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছি। সেই কারণটিও হয়ত তাঁর ব্রাহ্মবিদ্বেষের পেছনে কিয়ৎপরিমাণে লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মনে হয় সেটা প্রত্যক্ষ কারণ নয়; শরৎচন্দ্র জীবনের ধাপে ধাপে বৈদগ্ধ্যগর্বী উন্নাসিক শিক্ষিতদের কাছ থেকে যে আঘাত খেয়েছেন তারই প্রতিক্রিয়া থেকেই অপরিসীম স্পর্শালু শরৎচন্দ্রের মনে অই বিকৃত একদেশদর্শিতা জন্ম লাভ করেছিলো বলে মনে হয়।

তবে তাঁর কুলীন ব্রাহ্মণের সংস্কার যে তাঁকে সত্যিকার বিপ্লবী হ'তে দেয়নি এটা প্রায় জোর ক'রে বলা চলে। শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকটি উপন্যাসেই বিদ্রোহী চরিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু তাদের বিদ্রোহকে তিনি কোথাও তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে টেনে আনেন নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাঝপথে তাদের ছেড়ে দিয়ে রণে ক্ষান্ত দিয়েছেন। যেমন ধরুন কিরণময়ী। কি উদ্ধত, উজ্জ্বল, লজ্জাকুণ্ঠাসঙ্কোচহীন প্রখর নারীচরিত্র। অন্য যে কোন বাঙালী মেয়ে হলে স্বামীর পাণ্ডিত্যের তাপে ঝলসে যেতো, কিন্তু কিরণময়ী তার ভোগসুখপরাঙ্মুখ স্বামীর চক্ষুর আগোচরে নিতান্ত সজ্ঞানেই তার অপরিতৃপ্ত ক্ষুধাকে অনির্বান দীপশিখার মতো জ্বালিয়ে রেখেছিলো, আর অনঙ্গ ডাক্তারকে হাতের নাগালের মধ্যে পেতেই তাকে সেই অনলে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করতে তার এতোটুকু বাধেনি। অনঙ্গ ডাক্তারকে দিয়ে যে কামাচারের সুরু তারই সূক্ষ্ম, শোধিত রূপ নিলো শেষে উপেন্দ্রের প্রতি উদ্দাম ভালোবাসায়, এবং উপীনদা'কে কুক্ষিগত করতে না পারার তীব্র আক্রোশে শেষে নিতান্ত বেচারা দিবাকরকে নিয়ে চললো তার নিষ্ঠুর খেলা। কিন্তু এই যে অপরিসীম জটিল চরিত্র কিরণময়ী তার ভালোবাসার অদম্য ইচ্ছাকে কি সমাজের প্রচলিত বেড়ের মধ্যে কোনভাবেই পরিতৃপ্ত করার উপায় ছিলো না? পাগল হওয়াটাই কি তার একমাত্র বিধিলিপি ছিলো? ধিক্কৃত বঞ্চিত নারীজীবনের বিরুদ্ধে কিরণময়ীর বিদ্রোহকে সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় সুস্থ পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হয়ত অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু রক্ষণশীল মনোভাবের পোষক শরৎচন্দ্র তা কিছুতেই হতে দেবেন না—বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রোহিনীকে

ভ্রষ্টা প্রতিপন্ন করে এবং সর্বশেষে মেরে সমগ্র বিধবাসমাজের মধ্যে সুগুপ্ত মৃতস্বামীনিরপেক্ষ আত্মবিকাশের স্পৃহাকে কড়া হাতের মার লাগিয়েছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রও কিরণময়ীকে পাগল করে বাঙালী সমাজের শতসহস্র স্বামীসোহাগবঞ্চিতা সম্ভাব্য কিরণময়ীদের কঠোরহস্তে দমন করলেন।

'শেষপ্রশ্নে'র কমল মুখে ক্ষণিকবাদ (Hedonism), ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের অস্বীকৃতি, চিরন্তন প্রেমের অস্থায়িত্ব, প্রবৃত্তিমার্গকে অনুসরণ করার যুক্তিযুক্ততা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কতো কী গালভরা কথাই বললো, কিন্তু খেতে সেই আলো চালের ভাতে ভাত। তার কথার সঙ্গে কাজের কোন সঙ্গতি নেই। কমল বড়োজোর বড়ো বড়ো ধারকরা বুলির ফুলঝুড়ি—তার জীবনযাপনপদ্ধতির মধ্যে প্রশ্নও নেই, উত্তরও নেই। 'পথের দাবী'র নবতারাকে দিয়ে শরৎচন্দ্র বিদ্রোহ করালেন, অত্যাচারী স্বামীর ঘর ছেড়ে সে এসে যখন 'পথের দাবী'র সভ্যারূপে নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়ালো 'পথের দাবী'র সভানেত্রী সুমিত্রার অকুণ্ঠ অভিনন্দন সে পেয়েছিলো। তা থেকে এবং 'পথের দাবী' বইয়ের বিপ্লবাত্মক আদর্শের প্রচার থেকে এই ধারণা করাটা বোধ হয় খুব অসঙ্গত হতো না যে নবতারার বিদ্রোহের মর্যাদা অন্তত শরৎচন্দ্র রাখবেন। কিন্তু কার্যত আমরা কী দেখি? নবতারা শশী কবিকে হেলায় ত্যাগ করে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে একটি সুদর্শন মুসলমান যুবকের হাত ধরে বিনাদ্বিধায় বেরিয়ে গেলো। (পাঠক লক্ষ্য করবেন সমস্ত 'পথের দাবী' বইতে আর কোনো মুসলমান চরিত্র নেই, অই একটিমাত্র বারের জন্যে একজন মুসলমান চরিত্রকে টেনে আনা হয়েছে এবং কেন আনা হয়েছে তাও খুব সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের মুসলমানপ্রীতি উৎসারিত হয়েছিলো মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি পাবার পর।) নবতারার বিদ্রোহের স্পৃহাকে এইভাবে ব্যঙ্গ করবার যে কী সার্থকতা থাকতে পারে আমি অন্তত তা বুঝি নে—হয়ত বাস্তব জীবনে এইরূপই হয়, কিন্তু যেখানে একটি সুমহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা, যেখানে অগ্রসরপন্থী যুবসম্প্রদায়ের নিকট বিদ্রোহের বাণী প্রচার লেখকের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যের অন্যতম, সেখানে এইরূপ আদর্শের বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত করে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহিণী নারীচরিত্রের একমাত্র সফল দৃষ্টান্ত বলা যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অভয়া চরিত্রটিকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রসৃষ্ট বিচিত্র চরিত্রের ভিড়ে তেজোদৃপ্তা অভয়া আর কতোটুকু জায়গাই বা জুড়ে আছে? স্বামীসোহাগিনী সতী (সুরবালা, বিরাজবৌ), স্বামীসোহাগবঞ্চিতা সতী (অন্নদাদিদি), আত্মদ্বন্দ্বপ্রপীড়িত জটিল নারীহৃদয় (অচলা), সেবাময়ী নারী (মাধবী, ভারতী, বন্দনা), সুনিবিড় প্রেমে উদ্বেল অথচ সমাজশাসনে সঙ্কুচিতা বিধবা (রমা), প্রেমময়ী পতিতা নারী (চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী,

রাজলক্ষ্মী, বিজলী), স্বামীত্বরূপ আইডিয়ার প্রতি চিরসমর্পিতা (ষোড়শী)—প্রভৃতি বিচিত্রভাবের ব্যর্থ, আধা ব্যর্থ, ব্যর্থতাবোধজর্জরিত, সমাজশাসনের ফলে অপচিত নিরীহ গোছের নারীচরিত্র এঁকে শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী নারীর অভিপ্রায় ও সাধনাকেই প্রায় ভোঁতা করে দিয়েছেন। যাঁর লেখায় নারীর ব্যর্থতার হাহাকার, বা নীরব নিরুদ্ধ বেদনা বা সেবার উচ্ছ্বাসটাই বড়ো কথা, তিনি বিদ্রোহকে মর্যাদা দেবেন এটা আশা করা যায় না। শরৎচন্দ্রসৃষ্ট নারীচরিত্রের অধিকাংশই পরাজিতের মনোভাবযুক্তা, আত্মক্ষয়কারী ব্যর্থতার পীড়নে পীড়িতা—তিনি নারীকে তার স্বমহিমায় কোথায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে বাঙালী নারী গদগদ হয়ে কেবলই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ছুটে যায়?

অনেকে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয় 'শ্রীকান্তের' খণ্ড খণ্ড চরিত্র ও চিত্রগুলি (যেমন প্রথম ভাগের ইন্দ্রনাথ পর্ব, দ্বিতীয় ভাগের নন্দ মিস্ত্রী ও অভয়া পর্ব, তৃতীয় ভাগের সুনন্দা পর্ব, চতুর্থ ভাগের গহর ও কমললতা পর্ব) বাদ দিলে 'শ্রীকান্তের' উপজীব্য মূল বিষয়টি অতি অপকৃষ্ট স্তরের রচনা। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের উপাখ্যানটি পাঠকপাঠিকার মনে যতো মধুর রসই সঞ্চার করুক না কেন, আসলে ব্যাপারটি কী একবার তলিয়ে দেখা দরকার। কী, না একটি সমর্থ, উপার্জনক্ষম, যুবক কারণে অকারণে বাঈজীর ওপর পড়ে পড়ে খাচ্ছে। সে যুবকটির কোন বিশিষ্টতাই পাঠকের চোখে ধরা পড়বে না একমাত্র তার বাউণ্ডুলে ভবঘুরে স্বভাবটি ছাড়া (অবশ্য শ্রীকান্ত চরিত্রটিকে যদি শরৎচন্দ্রের প্রতিরূপক বলে ধরা যায়—যেমন অনেকে ধরে থাকেন—তা হলে অবশ্য অন্য কথা), কিন্তু দেখ্‌ছি উপন্যাসটির চারটি খণ্ড জুড়ে ফিরে ফিরে কেবলই রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের ভালোবাসার গাওনা চল্‌ছে। কবে কোন বাল্যকালে বৈঁচি ফল কুড়োবার উপলক্ষে শ্রীকান্তকে উপলক্ষ করে বালিকা রাজলক্ষ্মীর মনে ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছিলো তারই জের চল্‌ছে সমগ্র উত্তরজীবন ধরে এবং সেই জেরে পাঠকপাঠিকাদেরও প্রায় জেব্‌বার হবার উপক্রম। পরাশ্রয়ী, পরার্থভুক্ উপার্জনঅক্ষম শ্রীকান্তকে নিয়ে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের বন্যা ছুটুক, তাতে আপত্তি দেখিনে, কিন্তু এই ধরণের প্রেমকে কখনই সুস্থ, সামাজিক আদর্শ বলে তুলে ধরা যেতে পারে না! বাঈজি না হয়ে রাজলক্ষ্মী যদি কুলস্ত্রী হ'তো তা হলেও নয়। একজন আপাতসমর্থ যুবক বাল্যপ্রেমের সূত্র ধরে চিরটা কাল পরশ্রমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে এই দৃষ্টান্ত সুস্থও নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়।

আমাদের মনে হয় 'গৃহদাহ'ই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যদিও গৃহদাহের আখ্যানবস্তুতে 'ঘরেবাইরে' ও অন্যান্য ইউরোপীয় এই ধাঁচের গল্পের ছাপ সুস্পষ্ট তা হলেও কলাকুশলতা, আঙ্গিক ও অভিপ্রায়চরিতার্থতার দিক দিয়ে 'গৃহদাহের' তুলনা হয় না।

গৃহদাহের প্রত্যেকটি চরিত্রই তার পরিমিত সুষ্ঠু রূপ পেয়েছে এবং গল্পটিও তার যথাযথ পরিণতিতে এসে থেমেছে। এমন চমৎকার রচনার নিদর্শন শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বড়ো ছোট গল্পের বই হলো 'নিষ্কৃতি', সব চাইতে সুখপাঠ্য গল্প হলো 'দত্তা' আর উৎকৃষ্ট ছোটো ছোট গল্পের সব চাইতে চমৎকার নমুনা বোধ হয় 'রামের সুমতি' ও 'মহেশ'। সফলতম পল্লীচিত্রের বই 'পল্লীসমাজ'।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যেটা সব চাইতে বিস্ময়কর, তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা। গল্পের রস জমিয়ে তোলায় তাঁর ন্যায় কুশলী কলাকার বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কেউ দেখা দেয়নি। ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাস নিঃশংসয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে দরিদ্র, কিন্তু শুদ্ধমাত্র কাহিনীটি মনোমুগ্ধভাবে বলার কায়দায় এই সিদ্ধহস্ত গল্পকার আজও অদ্বিতীয়। ভাবের ঘরের ফাঁকি ও দৌর্বল্য তিনি গল্পের জাদু দিয়ে ঢেকেছিলেন—শরৎচন্দ্র আর কোন কৃতিত্বের দাবী করতে পারুন বা নাই পারুন, কথাশিল্পের সুনিপুণ কলাকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম সবার ওপর দিয়ে জ্বলজ্বল্ করবে।

তবে শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভাষাটি ঠিক বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিকের ভাষা নয়। না ভাষায় না ভাবে তিনি রিয়ালিজ্‌মের ধার ঘেঁষে গেছেন। তাঁর ভাষার শিল্পে অত্যন্ত সাজান, লিপিকুশল, নিখুঁত একটি ওস্তাদের দেখা মেলে যার লেখার ধরণধারণের সঙ্গে বাস্তবানুসারী ঔপন্যাসিকদের আটপৌরে ভাষার ধরণধারণের কিছুমাত্র মিল নেই। চরিত্র-চিত্রণেও তিনি বাস্তবনিষ্ঠা খুব বেশি মেনে চলেছেন বলে বোধ হয় না। তাঁর অনেক চরিত্রেরই (বিশেষ করে পতিতা চরিত্রগুলির) অসঙ্গতি ও হাস্যকরতা অত্যন্ত স্পষ্ট। 'পথের দাবী'র ভারতী, 'শেষ প্রশ্নের' কমল চরিত্র-হিসেবে অস্বাভাবিক শুধু নয়, অবিশ্বাস্য। তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিকা হিসেবে তিনি যে সব সংস্থান ব্যবহার করেছেন তাদের আবহাওয়ার মধ্যে বাস্তবতার ছাপ থাক্‌লেও অবাস্তবতার রঙও কম লেগে নেই। পল্লী-চরিত্রগুলির (যাদের সম্বন্ধে তিনি সব চাইতে ওয়াকিবহাল ছিলেন) ব্যাপারেও তিনি এই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। তিনি যে ভাবে পল্লীকে তুলে ধরেছেন তাতে পল্লীজীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না—বরং এই দিক দিয়ে আধুনিক সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পল্লীর চিত্র ও পল্লীর সাধারণ মানুষ অনেক বেশি স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের সৃষ্ট সাধারণ পল্লীর মানুষগুলিকে তাদের অজস্র দোষ সত্বেও ভালোবাস্‌তে ইচ্ছে হয়, শরৎচন্দ্রের আঁকা দলাদলি ও ঈর্ষাপরায়ণ, সঙ্কীর্ণচেতা পল্লীবাসীদের সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। অবশ্য 'নিষ্কৃতি'র গিরীশ, 'বিন্দুর ছেলে'র যাদব, 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর গোকুল, 'বিরাজ বৌ'-এর নীলাম্বর প্রভৃতি মহৎ চরিত্রগুলির কথা আলাদা। তবে মনে রাখতে হবে এঁরা কেউ গ্রামের চাষাভূষো শ্রেণীর মানুষ নন; সাধারণ শ্রেণীর পল্লীবাসী সম্পর্কে

শরৎচন্দ্রের উদাসীন মনোভাবটি প্রকট। 'দেনাপাওনা'র সাগর সর্দার এর একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

সব চাইতে যেটা অস্বাভাবিক, শরৎচন্দ্রের নায়কনায়িকাদের ভেতর শরীরগত কামনাবাসনার এতোটুকু চিহ্নও নেই—যেন সবাই দৈহিক আকর্ষণকে জয় করে শুদ্ধমাত্র আত্মিক প্রেমের সাধনায় মেতেছেন। এর চাইতে পিউরিট্যান, এর চাইতে অবাস্তব মনোভাব আর কিছু হতে পারে না। অচলার সঙ্গে সুরেশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ঝড়ের রূপকের সাহায্যে কতো বা ইঙ্গিত, কতো বা ব্যাখ্যান—যেন রহস্যটুকু আরেকটু উদ্‌ঘাটিত হলেই শ্লীলতাসুন্দরী লজ্জায় কালো হয়ে উঠতেন—ইউরোপীয় প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের নিকট এইরূপ অতিমাত্রিক শালীনতা বিকৃতির নামান্তর বলে প্রতিভাত হবে। দিবাকরের সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে তারপর কিরণময়ী একই শয্যায় কাঠ হয়ে পড়ে রইলো এঘটনা যৌনবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রের বিরোধী। শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মী স্নেহ ও প্রেমে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দেখতে পাই ; লেখক এইজন্যে কোন শরীরগত ভিত্তি প্রস্তুত করেন নি, কেবলই বাল্যপ্রেমের স্মৃতির দোহাই পেড়েছেন।

শরৎচন্দ্র মুখ্যত বাংলার মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। রবীন্দ্রনাথের অভিজাতসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী আর আজকের লেখকদের বামপন্থী চিন্তাধারার ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্তরে তিনি অবস্থান করেছেন। শরৎচন্দ্রকে ভালোবেসেছে, আত্মীয় বলে জেনেছে বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা (বিশেষত মেয়েরা), তাদের রোমান্টিক মনের খোরাক জোটাবার বিস্তর উপকরণ শরৎসাহিত্যে রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী 'অভিজাতকুল থেকে যেমন তিনি ইচ্ছে করে দূরে ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত বা হাটের আর বাটের মানুষের ভিড় থেকেও তিনি তেমনি আলাদা ছিলেন। কালচ্যরগর্বী পণ্ডিতম্মন্য অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা অবশ্য তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে অন্ত্যজ জ্ঞানে দূরে ঠেলে এর শোধ তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের অকৃত্রিম আত্মীয়তায় সেই ক্ষতি তাঁর পুষিয়ে গেছলো।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে আলোচনা ওপরে করা হলো তাকে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলা চলে না। হয়ত অনেকদিকই বাদ পড়লো, কিন্তু খানিকটা অন্তত আলোচনা হলো তাতে আর সন্দেহ কি! বোধ করি দাঁড়িপাল্লার ওজনে শরৎসাহিত্যের দোষের দিকটার প্রতিই আমি সমধিক ঝুঁকেছি। এ সম্বন্ধে আমার সাফাই এই যে প্রশংসা তো অনেকেই করেন (এ দেশের সাহিত্যসমালোচনায় নির্জ্জলা প্রশংসাটাই রেওয়াজ), মাঝে মাঝে একটু আধটু স্বাদবদল করতে দোষ কি। বিশেষ করে মহাজনদের রচনা সম্পর্কে এই স্বাদবদলের প্রয়োজন আছে—এখানে পাঠক পাঠিকাদের সেই স্বাদবদল করতে খানিকটা সাহায্য করলুম এইমাত্র।

বাংলার রূপরস সাধনা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

আধুনিক যুগে বাঙালী জাতিকে কঠোর আত্মপরীক্ষায় মগ্ন হতে হয়েছে নিষ্ঠুর রাষ্ট্র-সমস্যার ধূমায়িত আবহাওয়ায়। এজন্য বাঙালী জাতি যদি নিজেদের সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হয়—তা' কিছু অস্বাভাবিক হয় না। তাতে আত্মাদর দেখান হয় না মোটেই—কারণ প্রাক্‌ভারতীয় সভ্যতা যাদের নিয়ে বিকাশলাভ করে তাদের মূলতঃ ঐক্য থাকলেও ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাতে তাদের মধ্যে ক্রমশঃ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সংক্রামিত হয়। এই বৈচিত্র্যকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়েছে—কারণ প্রাক্‌ভারতীয় সভ্যতা স্থূলতঃ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে কতকগুলি স্বতন্ত্র রসরীতি সৃষ্টি করেছে। এতকাল বাঙালী এসম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলনা—কারণ সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার ভারকেন্দ্র ছিল কলিকাতায়। কাজেই প্রাদেশিকতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তরে বাঙালীর বিরাট হৃদয় অবতরণ করতে চায়নি। আজ ইংরাজরাজের দেওয়ানী. খাস রচিত হয়েছে দিল্লীতে এবং অন্যান্য জাতি এদেশের সভ্যতা ও শীলতা-(cultue) গত দানকে অতি সামান্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। এজন্য ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাংলার কৃতিত্ব বিচার অপরিহার্য্য।

প্রাক্‌ভারত চিরকালই ভারতীয় সভ্যতার বাহন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মৌর্য্যযুগ হতে পালযুগ পর্য্যন্ত পাটলীপুত্র ও গৌড় প্রভৃতি জনপদ ছিল ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারে বিরাটতম নগরী। মুসলমান যুগেও দিল্লীর ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবকে হীনপ্রভ করে বাংলার গৌড় ও মুর্শিদাবাদের প্রগল্‌ভ সম্ভার। কাজেই বাংলার দান ভারতে সামান্য হয়নি কোন কালেই। এই অসামান্যতাকে উদ্ঘাটন করা আলোচকদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

গোড়াতেই বাঙালী জাতির আদিম ইতিহাসের কিছু সূত্রপাত না করলে বাংলার রসসাধনা ও রূপসৃষ্টির বিচার সম্ভব হবেনা। বাঙালী জাতি হঠাৎ কোন আকস্মিক ঘটনায় দুনিয়ায় দেখা দেয়নি। ভারতের ইতিহাসে রাজপুত, মহারাষ্ট্র, উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাবের সম্পর্ক যতটা কোলাহল সৃষ্টি করেছে—প্রাক্‌ভারত সম্বন্ধে ততটা যে কেন সৃষ্টি হয়নি ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলাদেশ ভারতের আভ্যন্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাতে বার বার অংশ গ্রহণ করেছে অকুণ্ঠভাবে। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, রাজপুতানার গুর্জ্জর প্রতিহার

এবং বাংলার পালদের ভিতর কঠিন ও অফুরন্ত সংগ্রাম হয়েছে অষ্টম হতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত। কাজেই এ জাতি কখনও অলসভাবে দিন কাটাতে পারেনি। ক্ষুরধার শাণিত জীবনের মর্য্যাদা চিরকালই বাঙালীকে রেখেছিল সচেতন ও কর্ম্মক্ষুব্ধ। অথচ এসব কথা সকলের চোখে পড়েনা।

গোড়াতেই বলতে হয় বাঙালী জাতির প্রাচীনতাও সামান্য নয়। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটা বিস্ময়জনক উক্তি উদ্ধৃত করতে হয়। তিনি বলেন: "বাঙ্গালা Nineva ও Babylon হতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা চীন হতেও প্রাচীন অথবা নূতন। যখন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হ'তে পঞ্জাবে আসেন তখন বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ এলাহাবাদে এসে বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও ভাষাশূন্য পক্ষী বলে' বর্ণনা করেছেন।"* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। এদের বাসভূমি যদি পুণ্ড্রবর্দ্ধননামে পরিচিত হয়ে থাকে তবে উত্তর বঙ্গ আর্য্যগণের অজ্ঞাত ছিলনা একথা স্বীকার করতে হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গশব্দের উল্লেখ আছে অথচ অঙ্গ বঙ্গ বা মগধ এ সময় আর্য্যজাতির লীলাভূমি ছিল না। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির উল্লেখ আছে —এরা যে আর্য্য নয় একথা স্বীকৃত। চের জাতিরা দ্রাবিড়। দ্রাবিড় জাতিরা বঙ্গ ও মগধের প্রাচীনতম অধিবাসী এরূপ অনুমানের পক্ষে বহু যুক্তি আছে। আবার ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয়ের একটা বিবরণও আছে। বিজয় সিংহ ছিলেন আর্য্য—কাজেই বাংলা দেশে একসময় আর্য্যদের কেউ কেউ বাস করেছেন একথা অস্বীকার করা চলে না। এতে প্রমাণ হয় বাঙালী একটা নূতন জাতি নয়।

এ সত্যও গৃহীত হয়েছে যে গৌড়ের পাল রাজগণ রাজপুত ছিলেন না। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ মত পোষণ করেন।† সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে পালদের সমুদ্র হ'তে উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। এতে মনে হয় বিহারের বিশুষ্ক প্রান্তরে বা শৈলবক্ষে পালদের উৎপত্তি হয়নি বরং সমুদ্রধৌত বাংলাতেই এ বংশের উদ্ভব হয়েছে। সে যাই হোক পাল রাজগণের নিবিড় সম্পর্কে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য যেমন সৃষ্ট হয়েছিল তেমনি একটা সুসংস্কৃত কলাসংগ্রহও একালে একটা অপরূপ বৈচিত্র্য গ্রহণ করেই আত্মপ্রকাশ করে। এ দুটি রসসৃষ্টির পৃষ্ঠভূমি ছিল অসামান্য—কারণ পাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ ছিল অতি বিরাট। পাল রাজগণের আমলের একটি প্রাচীন লেখে ইদানীং নূতন সংবাদ পাওয়া গেছে:—

* সাহিত্য সম্মিলন সপ্তম অধিবেশন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা।

† রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৬ পৃঃ ৭৫০

"ভোজৈর্মৎস্যৈঃ কুরু-যদু-যবনাবন্তী-গন্ধারকীরৈঃ
ভুয়াৈয় ব্যালোল মৌলি প্রণতিপাবনতৈঃ
সাধু সঙ্গীর্য্যমানঃ।"*

অর্থাৎ সম্রাট ধর্ম্মপাল কুরু (মধ্যপঞ্জাব) যদু (মথুরা) যবন (পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত), মৎস্য (উত্তর রাজপুতানার জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য) অবন্তী (মালব দেশ), ভোজ (মধ্যপ্রদেশের বেরার বা বহ্রাড) গন্ধার (পেশোয়ার ও কাবুল নদীর উপত্যকা) এবং কীর (কড়িডা বা জ্বালামুখ) প্রভৃতি দেশ জয় করেছিলেন। তা' হলে গৌড়ের গৌরব সেকালে অসাধারণই ছিল বল্‌তে হবে। এ পৃষ্ঠভূমির পুরোভাগে যে কলাসৃষ্টি সম্ভব হয় বাংলাদেশে তা' সাহিত্যের মতই একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জীবন্ত প্রাকৃত ভাষাকে নানাভাগে বিভক্ত করে ভাষাবিদ্‌গণ পূর্ব্বাঞ্চলের সাহিত্য-চক্রে তিনটি ভাষাকে প্রবর্ত্তিত দেখতে পান। এগুলি হচ্ছে যথাক্রমে মৈথিলী, গৌড়ীয় ও আসামী ভাষা। এসব ভাষার ভিতরকার রস সমাবেশ এবং বাইরের রূপাদর্শ সেকালে হয়ে পড়েছিল বিভিন্ন। কলালীলা প্রসঙ্গেও বিহার, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার রচনা তিন রকমের মূর্ত্তি ধারণ করে প্রাক্‌ভারতে। এই রূপারণ্যে প্রবেশ করে' দেখতে পাওয়া যায় এখানকার সব ফুলগুলি এক রকমের মোটেই নয়। এর ভিতরকার বাংলাদেশের সৃষ্টির একটা যে বিশিষ্ট রূপ-গৌরব আছে তা' অস্বীকার করা চলে না। এ গৌরব প্রাচীন ঐতিহাসিকদেরও চক্ষুগোচর হয়েছে।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ লিখেছেন রাজা দেবপালের যুগে [নবম শতাব্দীর অন্তে] বারেন্দ্রভূমিতে [উত্তর বঙ্গে] একজন সুদক্ষ শিল্পী বাস করত—তার নাম ছিল ধীমান। ধীমানের পুত্রের নাম ছিল বিট্‌পাল। এরা দুজনেই ধাতু ও অন্যান্য উপাদানে বহু মূর্ত্তি ও চিত্র রচনা করে। এসব রচনা প্রাচীন নাগচক্রের রচনার মতই ছিল। এদের ভিতর ধীমানের পুত্রের দ্বারা মগধের রচনা প্রভাবিত হয়, ধীমান স্বয়ং বাংলার শিল্পের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারানাথের এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রাক্‌ভারতীয় সমগ্র রচনাই বাঙালীর প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে। বিহার ও বঙ্গের বিরাট রূপকৃত্যের গৌরব বাংলাদেশ হ'তেই সূত্রপাত হয়। তারানাথের উক্তি হতে দেখা যায় বিটপাল মগধে একটা বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিল, একে মধ্যদেশীয় পদ্ধতি বলা হ'ত। নেপালেও বাঙালী শিল্পী ধীমানের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

কাজেই গৌড় ও মগধের কলাসৃষ্টির জনক ও পরিচালক ছিল বাঙালী। এ উভয়

* R. D. Banerjee : "Dharma Pala's sovereignity was accepted by the Kings of Eastern Afganisthan, Punjab, Rajputna and Kangra Valley" History of India P. 103

দেশ এককালে আচারে, ব্যবহারে এবং ভাষায় এক ধরণেরই ছিল। পরে প্রাকৃতিক আবেষ্টন ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিচিত্র পরম্পরায় এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু সাহিত্যে নয় কলালীলায়ও এ সত্য প্রমাণিত হয়। প্রাক্‌ভারতীয় জাতি-গুলির নৃতাত্ত্বিক পটভূমি ক্রমশঃ নানা কারণে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। ইদানীং পূর্ব্বপ্রচলিত নৃতাত্ত্বিক বিভাগগুলিকে পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে আর প্রস্তুত নন। আর্য্য-ভাষা বা সাহিত্য থাকলেও আর্য্যজাতি ছিল কিনা তাঁদের এবিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। তেমনি Von Eickstedt ও Von Luschan প্রমুখ জাতিতত্ত্ববিদগণ দ্রাবিড় জাতি বলে কোন বিশিষ্ট জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করেনা। না করলেও আর্য্যভাষা বা দ্রাবিড় ভাষার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করে না। এ সমস্ত ভাষার প্রভাবও সামান্য ছিলনা। ইংরাজী ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তাশক্তির গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। কাজেই ভাষার ক্ষমতার দিক থেকেও আর্য্য ও দ্রাবিড় প্রভাব অসামান্য ছিল বলতে হবে। ইদানীং নৃতাত্ত্বিকগণ যে কটি মুখ্যজাতিকে অধ্যয়নের বিষয়ীভূত করেছেন তার ভিতর অষ্ট্রিক, নৈগ্রিক, আল্পোদিনারীয় আর্য্যনর্ডিক ও ভূমধ্যসাগরিক জাতিদের নিয়ে একটা শ্রেণীবিভাগ হয়েছে। বাঙালী জাতির রক্তসম্পর্ক নিয়ে এখনও আলোচকগণকে ধাঁধাঁগ্রস্ত দেখে আবাক হতে হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলার ইতিহাসে আছেঃ "We must therefore admit that we cannot yet satisfactorily solve the problem of the origin of the Bangalee race." এটা খুব লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু নৃতত্ত্ব ছেড়ে, ভাষাতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিক হতেও এ প্রশ্নের একটা বিচার যে চলেনা তা নয়। আধুনিক বাঙালীর ভিতর পাওয়া যাচ্ছে "non mongoloid Brachycephalic types"। এর সঙ্গে পূর্ব্ব ইউরোপের 'dinaric' জাতিগুলির সমানধর্ম্ম আছে। শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের তালিকায় বাঙালীকে আত্মীয় করা হয়েছে ভূমধ্যসাগরিক ও আল্পোডিনারিক জাতিগুলির। অপরদিকে আমাদের বৃহত্তর পৃষ্ঠভূমিতে অষ্ট্রিক জাতির সম্পর্কও আছে। ফলে দাঁড়াচ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এবং রক্তের সম্পর্কে বাংলার সভ্যতায় আর্য্য, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাব কাজ করেছে। এ ছাড়া মঙ্গোলীয় ভাষার সতীর্থতাও বাংলাদেশ তুচ্ছ করতে পারেনি। বাংলা দেশকে বেষ্টন করে' মঙ্গোল জাতি একটা অর্দ্ধবলয় সৃষ্টি করেছে—এজন্য মঙ্গোল সভ্যতার সহিত নিবিড়ভাবে বাঙালী জাতি সামাজিকতা করেছে। বিশেষতঃ বাংলার ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় এক সময়ে এক মোঙ্গল বংশের নৃপতি এদেশে রাজতক্তে আসীন হয়ে ক্রমশঃ শৈবধর্ম্মগ্রহণ করেন এবং পরে হিন্দু হয়ে যান। গৌড়ের কাম্বোজ নৃপতির বংশ এক সময় উত্তরবঙ্গের প্রভুত্ব লাভ করে। এদের বংশ ছিল তিব্বতব্রহ্মীয়—অর্থাৎ মঙ্গোলীয়।

ফলে আর্য্য প্রেরণায় বিরাটের সারসঙ্কলনপটুতা অর্থাৎ বিরাটের ভিতর মুখ্যবস্তুর উপলব্ধির ক্ষমতা (abstraction) বাঙালীর আছে। দ্রাবিড় শীলতার (culture) বৈপরীত্যবোধ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির একটা বিরাট ভৌমের উপলব্ধির ও সৃষ্টির ক্ষমতা বাঙালীর রচনায় পরিস্ফুটভাবে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় কলালীলার নির্ভয় ও দুর্ব্বার উদ্যোগের তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন—বাংলার রচনায় এই প্রভাবেরও ছাপ আছে প্রচুর। দ্রাবিড়ের রহস্য এবং উদ্দাম আতিশয্যপ্রীতি এদেশে রূপবিদ্যার অন্যান্য প্রভাবে সংহত হয়ে পড়ে; অপরদিক অষ্ট্রিকের ধৈর্য্য ও আনুগত্যপ্রীতি বাঙালীর রূপের ভাবকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দেয়নি। এ সমস্ত উপকরণ ছাড়া মঙ্গোলীয় প্রেরণা-সুলভ সূক্ষ্মতাবোধ বাঙালীকে করেছে বিচারে ক্ষুরধার এবং রচনায় সুকুমার ও তীক্ষ্ণ। বাংলার ন্যায়শাস্ত্রের চুলচেরা বৈচিত্র্যবোধ এ উপাদান হতেই শক্তিলাভ করেছে। এজন্য বাংলার শিল্পসম্পদে সঞ্চারিত হয়েছে অফুরন্ত বৈচিত্র্য, সংযম ও বিরাটের কল্পনামুখরলালিত্য। এসব প্রস্ফুট হয়েছে অভ্রান্ত রেখার দক্ষতম লীলাপ্রসঙ্গে। এ অবস্থায় প্রাক্‌ভারতীয় শিল্পের প্রধানতম আচার্য্যেরা বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছে দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণই পাওয়া যায়না।

বাংলাদেশের মনস্তাত্ত্বিক এই গূঢ় আবহাওয়া বিচার করে বাংলার রূপসম্পদ ও রসকীর্ত্তি বিচার করতে হবে। নানা রক্ত ও প্রভাবের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতি এক অসামান্য ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়েছে। মঙ্গোলীয় বা ত্যুরেণীয় প্রভাব জাতিকে অমরত্বের ঐশ্বর্য্য দান করতে সমর্থ। চীনদেশে এখনও জাগ্রত ও জীবন্ত অতি সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি ও অবচেতন সংস্কার প্রতিমুহূর্ত্তে উর্ণনাভের মত তন্তুজাল সৃষ্টি করে নিজেকে স্খলিত হতে দেয়না। হাজার হাজার বছরের চিত্রকলা অনুকরণ করেও সেখানকার শিল্পেরা অমর হয়ে যায়। মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতের সূক্ষ্ম প্রতিবিম্বকে মঙ্গোল চিত্ত দেখে আশ্বস্ত হয়—ঘাতপ্রতিঘাতে সহজে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েনা। এমন কি মঙ্গোলীয় রসভাণ্ডার কখনও অপূর্ণ বা রিক্ত থাকতে দেখা যায় না। বাঙালীর ভিতর এই প্রেরণা আছে বলে বারবার ঘাত প্রতিঘাতেও বাঙালী মরে' যায় নি, পলাশী প্রাঙ্গনেও বাঙালীর নবজন্ম হয়েছিল মাত্র। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আয়োজন ও উদ্যোগে একে একে ভারতের সব জাতিগুলি ম্রিয়মান পড়ে—পঞ্জাব মহারাষ্ট্র রাজপুতনা ও অন্ধ্র প্রেরণা যখন প্রোথিত হয়ে যায় মৃত্তিকার গর্ভে তখন বাঙালীই বুক পেতে নেয় ইউরোপের অষ্টবজ্রকে—বাঙালীই পোষ মানায় সে সভ্যতার অজগরগতিকে। একথা অস্বীকার করা চলেনা। এ সম্ভব হয়েছিল বাঙালীর সূক্ষ্মবোধশক্তির সাহায্যে। এই জাগ্রত জীবনবত্তা বাঙালীকে চিরকাল একটা বিশ্বসম্পর্ক দান করেছে—সে কখনও ক্ষুদ্র হয়ে থাকবার স্পৃহা করেনি। বাংলার জাহাজগুলি বহুকাল হ'তে সমুদ্রগর্ভ দিয়ে

দিকদিগন্তে ছুটে গেছে! বাঙালীর পণ্ডিতরা সমগ্র এসিয়ার গুরুপদে আসীন হয়েছে প্রাকভারতীয় বিশ্ববিদ্যাপীঠগুলিতে। বাংলার তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছে সমগ্র এসিয়ায়, চীন ও জাপান পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। দু'টি দেশ হ'তেই জগতে রেশমের রপ্তানি হ'ত সমগ্র ভূগোলে, তার ভিতর একটি হ'ল চীনদেশ অন্যটি হ'ল বাংলা দেশ। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগেও বাংলার মস্‌লিন সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে। এত সূক্ষ্ম রচনা ও সুকুমার সংগ্রহ জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দেখা দেয়নি।

বস্তুতঃ বাংলার সূক্ষ্ম মননশক্তিই মসলিনকে জন্মদান করেছে—তা' মনের তাঁতেই সৃষ্ট হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চর্য্যাপদের কবিদের সূক্ষ্মতার সহিত সঙ্গত হয়েছে জয়দেবের রণন ও বৈষ্ণব কবির উষা কাকলি! এর ভিতর দাঁড়ি টানবার জো' কোথাও পাওয়া যাবেনা। রস রচনায় বাংলার এই সাধনার প্রভাবে বিস্তৃত রূপের রামধনু সমগ্র বাংলাদেশকে বেষ্টন করে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যুগে যুগে জাগরণের দুন্দুভি নব নব ভাবের তীরে বাংলা দেশের সভ্যতাকে উপস্থিত করেছিল। কোথাও তা' আড়ষ্ট ও দারুভূত হয়ে যায়নি। বৈচিত্র্যবোধই সকল জাতিকে নবীনত্ব দান করে—একঘেয়ে জীবনযাত্রা বা ভাবের পৌনঃপুনিক আন্দোলনের অভাব জাতিকে করে কঙ্কালিত ও মূঢ়। বাংলা দেশ প্রতি যুগে এর পাশ কাটিয়ে গেছে। বাংলাদেশ তান্ত্রিক শক্তিবাদকে ভৌমরূপ দান করেছিল অতি সূক্ষ্মভাবে—তাতে শঙ্করের আত্মবাদের সহিত বুদ্ধের অনাত্মবাদকে সঙ্গত করা হয়েছিল অপূর্ব্বভাবে। তাতে করেই পালরাজদের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয় হয়। স্বাধীনতার পশ্চাতে যে-রকম বলিষ্ঠ তত্ত্ব থাকা প্রয়োজন তা পূর্ব্বভারত হতেই সমগ্র এসিয়া লাভ করে। কাজেই রূপরচনা প্রসঙ্গে বাংলার কৃতিত্ব অনুধাবন করতে হলে বাঙালীর মনোরাজ্যের খবর জানা প্রয়োজন। তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ প্রাক্‌ভারতে এগারটি বিশ্ববিদ্যাপীঠের উল্লেখ করেছেন—তার ভিতর বাংলাদেশে ছিল ছয়টি। বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণ এসব কেন্দ্রে অধ্যক্ষতা করতেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশা, বিভূতিচন্দ্র, চন্দ্রগোমিন, লুইপাদ, ভূষক প্রভৃতির পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা সেকালে ছিল অতুলনীয়।

বাঙালীর সভ্যতা ও প্রভাবের বিস্তৃতিও হয়েছিল অসামান্য। বিরাট বিশ্বসম্পর্ক বাংলার চিরকালই প্রিয় ছিল। জাপানের হরউইজি মন্দিরে বাংলার লিপি পাওয়া গেছে—চীনদেশের উ-তাও-মিয়াও মন্দিরেও বাংলার মত অক্ষরে মন্ত্রাদি লিখিত আছে। কাই-ফেং নগরের লৌহ মন্দিরে চীনে মাটির সাহায্যে বাংলা দেশের একটা কীর্ত্তনের চিত্র বাংলার প্রভাব সেকালে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তা প্রমাণ করবে। তিব্বতে অতীশা ধর্ম্মগুরু হয়ে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন—নেপালে বাংলা দেশের প্রভাব যে অফুরন্ত ছিল তা

Sir Charles Eliot বারবার বলেছেন। তিনি বলেন: "In Nepal and Tibet Tantric Buddhism fully developed but they represent late Indian Tantrism as imported ready made from Bengal.........I find little evidence that a definite Sakti cult arose elsewhere than in Bengal and Assam.* The birth place of Saktism as a definite sect seems to have been in North Eastern India".

বস্তুতঃ প্রাক্‌ভারতীয় তান্ত্রিকধর্ম্ম জাপানের হেইয়ান যুগের [৭৮২ খ্রীঃ-৮৮৮ খ্রীঃ] শিল্পকলাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন: "Tantrikism Lamaism reaching China and Japan as the Esoteric doctrine created the art of Heian period"† এ দুটি ধর্ম্মই বাঙালীর সৃষ্টি। এদের ভিতর শক্তি-বাদের স্ফুলিঙ্গ সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রখর এবং জীবনযাত্রাকে গতিশীল করে তোলে। Encyclopeadia Britannica এ প্রসঙ্গে বলছে: "Tendai and Shingnon infused a new life into the sculpture of the early Heian period"‡ চীনের ট্যাঙ্গ যুগও ভারতীয় প্রভাবে হয়েছিল ভরপুর। ওকাকুরার মতে ট্যাঙ্গযুগের আর্টে [৬১৮ খ্রীঃ-৯০৭ খ্রীঃ] তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ যুগে চ্যাঙ্গ-য়ান (Chang-an) ছিল রাজধানী। ট্যাঙ্গ দরবারে ভারতীয় তান্ত্রিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ছিল।

তান্ত্রিক ধর্ম্মের বহু মূর্ত্তি বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। যখন মুসলমান আক্রমণে প্রাক-ভারতের গৌরব অস্তমিত হয় তখন এখানকার পণ্ডিত ও শিল্পীগণ নেপালে চলে যায়।§ ফলে তান্ত্রিক তত্ত্ব নেপালের ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার একটি নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটন করে। নেপালী শিল্পীরাই তখন নব্য শিল্পের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। নেপাল বাংলাদেশ দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত একথা বলা হয়েছে। নেপাল হতেই শিল্পীরা ক্রমশঃ তিব্বত ও চীনদেশে গিয়ে কলালীলার নব নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে একাদশ শতাব্দীতে ধীমানের প্রাকভারতীয় শিল্পচক্র নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রাদি বাংলা দেশের শিল্পাদর্শেই রচিত হয়েছিল বলতে হয়। K. de B Codrington বলেন: If they date from the eleventh century, they may represent the Eastern

* Sir Charles Eliot, Hindusim and Buddhism Vol II. p. 278

† K. Okakura, Ideals of the East p. 77

‡ Encyclopaedia Britannica 14th Edition Vol 12. p. 928.

§ Oldfield Nepal P. 170.

School of Dhiman which according to Taranath was favoured in Nepal at about that time.*

বাংলার শিল্পপ্রতিভাকে অবজ্ঞা করা অসম্ভব। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খুঁজতে হলে এলোরা এলিফেন্টা বা মামলপুর গেলে পর্য্যাপ্ত হবেনা—পূর্ব্বাঞ্চলকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। এ অঞ্চলে এক শতাব্দীতে যত মূর্ত্তি তৈরী হয়েছে ভারতের অন্যান্য সব জায়গায় সকল শতাব্দী মিলেও ততটা সৃষ্টি করতে পারেনি। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন: "Medieval sculpture have been discoursed in varying numbers in Maharashtra, Gurjars, Rajputana and Antarvadi but nowhere is their total number comparable to the output of a single century in Bengal and Behar"। এই বিরাটসৃষ্টির মধ্যমণি হচ্ছে বাংলার সৃষ্টি। বাঙালী জাতির বিশিষ্ট অধিকার ও ঐশ্বর্য্য বাংলার রচনাকে করেছে তীব্র ও রসোজ্জ্বল মানবিকতায় ভরপুর। সব যেন জাগ্রত, জীবন্ত এবং উষ্ণ বাস্তবতায় ওতঃপ্রোত। এর উৎস খুঁজতে হবে বাংলার দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং স্বাধীন রসসমাবেশ প্রসঙ্গে। কিন্তু বাঙালী জাতির রক্তের ইতিহাস বর্জ্জন করলে কিছুই বোঝা যাবে না। বাঙালীর মানসিক সঙ্গতি ও ঐশ্বর্য্য বিশ্লেষণ না করলে শিল্পকলার লীলামূলক উপাদানের যথার্থ প্রেরণা কোথা তা' দুর্বোধ্য হবে।

সাহিত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে ও সঙ্গীতে বাঙালীর রূপছন্দ একই তালে হিল্লোলিত হয়ে এসেছে। শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর না হলে এই ঐন্দ্রজালিক পুরীর সন্ধান পাওয়া যাবেনা।

বন-তুলসী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেলিগ্রাম এল বিমলেন্দুর তৃতীয় কন্যা নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠা হয়েছে। পত্নী এবং নন্দিনী দুজনেই সম্পূর্ণ কুশলে আছে, সুতরাং বাবাজীবনের উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো হেতু নেই।

টেলিগ্রাম করেছেন পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়—আশা করেছেন কন্যালাভের সংবাদে জামাতাবাবাজী একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে উঠবে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আসলে দেখাচ্ছিল একটা চতুষ্পদের মতো। অদ্ভুত রকমের বোকা হয়ে গেছে মুখের চেহারাটা, ঘোলা চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘানির জোয়াল ঘুরিয়ে সের তিনেক খাঁটি শর্ষের

* V. Smith & Codrington H. F. C. I. P. 168.

তেল বের করে এল। খুব সম্ভব আসন্ন কন্যাদায়ের সম্ভাবনাটাই বেচারার মানস-চক্ষে এসে দেখা দিচ্ছিল।

পুরো পাঁচমিনিট পরে এঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ফোঁস করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিমলেন্দু। বললে, গেল।

আমি বললাম, কী গেল ?

—যৌবন। প্রেম।—কর্তিত-পকেট অসহায় পথচারীর গলায় বিমলেন্দু বলে যেতে লাগল : রোমান্স। ফ্রম এ ম্যান উইথ ফিউচার টু এ ম্যান উইথ পাষ্ট।

আমি বললাম, যাওয়াই ভালো। বোকামির পালাটা চটপট মিটে গেলেই ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারবে।

হয় কথাটা বিমলেন্দুর কানে গেলনা, অথবা কান দিলেনা। নাটকীয় ভাবে বলে যেতে লাগল, এখন দেখতে পাচ্ছি প্রেমটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকাই ভালো। প্রিয়া গৃহিণী হলেই জীবন-স্বপ্নে বারোটা বেজে গেল। তার চাইতে কবিদের অশরীরী প্রেম, অতীন্দ্রিয় মিলন—

আমি মন্তব্য করলাম, ক্লীবের সান্ত্বনা।

বিমলেন্দু ক্ষেপে উঠল। নাটক ক্রমশ মেলোড্রামার রূপ নিতে লাগল : বৌ, ছেলেমেয়ে, বাঁধা রুটিনের চাকরী, যক্ষ্মার মতো জীবন। তার চাইতে অনেক ভালো একটা খোলা আকাশ, একটা অবার দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে—

হাসি চাপাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। কলকাতার বাইরে জীবনে বিমলেন্দু কখনো পা বাড়িয়েছে কিনা জানি না। হয়তো বড় জোর মধুপুর দেওঘর অথবা পুরী, কিংবা শ্রীশ্রীবারাণসীধাম। সুতরাং অবারিত দিগন্ত আর মহুয়া ফলের স্বপ্ন দেখাটা তার স্বাভাবিক অধিকার।

বললাম, ভুল করলে। মহুয়ার ফল মিষ্টি নয়, তেতো। সে কথা যাক। আসলে প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস—ওর একমাত্র উপমা ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। সোপেন-হাওয়ের পড়লে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়—প্রকৃতির প্রেমও ওই রকম সর্বগ্রাসা।

—আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলছ ?

—না। বাংলা দেশের মাঠ ঘাট, তার অবারিত দিগন্ত, তার ধানের ক্ষেত, তার বন-তুলসীর ঝাড়—তার শরতের সোণা-ঝরানো আকাশ—

—কথাটা বিশদ করো।

আমি বলতে সুরু করলাম।

কৈশোরের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছে বাংলা দেশের একটুকরো পাড়া গাঁয়ে।

মনে রেখো, কৈশোরের কথা বলছি। যে বয়েসে মানুষের জীবনে প্রথম নেশার মতো প্রথম প্রেম আবির্ভূত হয়, যখন চোখের সামনে পৃথিবীটাকে আরব্য-ঔপন্যাসের মতো বলে মনে হতে থাকে। যখন জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, জলের ঝাপটায় চোখমুখ ভিজে গেলেও ভালো লাগে বৃষ্টি পড়া দেখতে। ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় থাকে, সদ্য-ফোটা আকন্দের বুনো গন্ধ পর্যন্ত রক্তে রক্তে কথা কইতে চায়।

সেই বয়েসে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে অনেকগুলো দিন আমি কাটিয়েছিলাম। জায়গাটা কোন এক অখ্যাত ব্র্যাঞ্চ লাইনের অখ্যাততর একটি ষ্টেশন। ঝিমিয়ে-চলা প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো পর্যন্ত সেখানে এক মিনিটের বেশি দাঁড়াতনা। তিন চার মাইল দূরের গ্রামগুলো থেকে যেসব যাত্রী আসত বা যে দু চারজন নামত, সারাদিন-রাত্রে সবশুদ্ধ ঘণ্টা দেড়েকের বেশি তারা ষ্টেশনের নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটাত না।

তা ছাড়া বিপুল ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলায় তাল-বীথির মর্মর। বহু দূরে ধুলোর কুয়াশা বুনে-চলা গোরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরোধানের নীচু জমি। আকাশে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস আর এক ফালি মরা নদী। দুপুরের রোদে ঝকঝকে নুড়ির ওপর বিছানো চকচকে একটা মিটার-গজের লাইন, ভুট্টা ক্ষেতের বাঁক নিয়ে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে; তার একপ্রান্ত একটা জংশন ষ্টেশনে, আর এক প্রান্ত কোথায় গেছে জানা ছিলনা, কল্পনা করা যেত দিল্লী, বোম্বাই, কাশ্মীর, কারাকোরাম ছাড়িয়ে হয়তো তুষার মেরুর পেঙ্গুইনদের দেশে গিয়ে ওর যাত্রা শেষ হয়েছে।

মেজমামা ছিলেন ষ্টেশন মাষ্টার। অকৃতদার লোক, একটা পয়েন্ট্সম্যানকে নিয়ে তাঁর সংসারযাত্রা চলত। ষ্টেশনের কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে বিবেকানন্দের বই আর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ মুখে নিয়ে বসে যেতেন। রাশভারী মানুষ, নিতান্ত দরকার না হলে কথাবার্তার বড় বালাই ছিলনা।

আমার দিন কাটে কী করে? পৃথিবী ডাক দিলে। ভুট্টার ক্ষেত, রেলের লাইন আর মরা নদীর ধারে ধারে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙ্গে আর বুনো টিয়ার নাচ, কাশফুলের বনে নানা রঙের প্রজাপতি। খোলা আকাশের সোনালি রোদ রক্তের মধ্যে যেন মদের মতো ক্রিয়া করত, যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আর তৈরী করে নিয়েছিলাম একগাছা ছোট ছিপ, মাঝে

মাঝে মৎস্য শিকারের আশায় নদীর ধারে গিয়ে বসতাম। কাদা আর নুড়ির ভেতর দিয়ে তির তির করে রূপালি জল বয়ে যেত, নেচে উঠত ছোট ছোট মাছ, তাদেরই দুটো একটাকে ধরবার প্রত্যাশায় অসীম ধৈর্য ধরে ছিপ ফেলে বসে থাকতাম।

সেখাকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছিল নদীটা। মাঝে মাঝে কাশ, মাঝে মাঝে এক এক গুচ্ছ বন-তুলসী। কেন জানিনা, এই বন-তুলসীগুলোকে ভয়ানকভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমি। লাল রঙের বড় বড় ডাঁটায় রুক্ষ চেহারার ছোট ছোট পাতা—ভঙ্গুর, নমনীয়। মেঠো বাতাসে সহজেই নেচে উঠত, দুলে উঠত, একটা মৃদু মর্মরে ডাঁটা-পাতাগুলো আকুল হয়ে উঠত একসঙ্গে। তার মঞ্জরী থেকে ছড়িয়ে পড়ত জংলা কষায় গন্ধ—ওই গন্ধটার ভেতর দিয়ে চারদিকের প্রসারিত পৃথিবীটার একটা অভিনব আস্বাদ আমাকে ব্যাকুল করে দিত।

ওই বন-তুলসীর ঝাড়ের ভেতরে মাছ ধরবার জন্যে ছোট্ট একটু জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেখানে বসেই চলত শিকার-পর্ব। শিকার তো ছাই—ছিপ ফেলে হয় রেললাইনটার অথবা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকা। আর নয় তো ছোট ছোট মঞ্জরী ছিঁড়ে নিয়ে ডলে ডলে দুহাতে তার আরণ্য গন্ধটা মাখিয়ে নেওয়া। এই গন্ধ-বিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডিক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে সেদিন আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম সে কথাটা অস্বীকার করবার জো নেই।

এমন সময় সেই বন-তুলসীর পটভূমিতে মানবিক প্রেমের আবির্ভাব হল।

ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর নয়। জায়গাটা ছিল নির্জন, লোকজনের যাতায়াত ছিলনা। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একদিন দেখলাম একটি ছোট মেয়ে কেমন করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বোধ হয় তুরীদের মেয়ে। বছর বারো তেরো বয়েস হবে—হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা থান ধুতি পরণে। হাতে একটা ছোট ঝুড়ি, নদী থেকে বালি নিতে এসেছে। সারা গা অপরিচ্ছন্ন, গালে মুখে কাদার দাগ। আমাকে বোকার মতো তার দিকে তাকাতে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল।

মনে আছে, ভারী মিষ্টি লেগেছিল হাসিটা। হয়তো তার অন্য কারণ আছে। আকাশে তখন শরতের রোদ সোনা ঝরাচ্ছিল, তখন ছোট নদীর জল চিকচিক করছিল, বাতাসে বন-তুলসীর ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছিল—আমার রক্তে ছিল বন-তুলসীর গন্ধ। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম।

মেয়েটি বললে, কী মাছ পেলি বাবু?

আমি বললাম, কিছু পাইনি।

মেয়েটি বললে, তুই মাছ পাবিনা, ব্যাং পাবি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে নায়িকার ভাষাটা ভদ্রজাতের নয়। আমি রূঢ়ভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মেয়েটা মিষ্টি করে মুখ ভেংচে বন-তুলসীর ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছিপ হাতে তারপর আরো অনেকক্ষণ বসে ছিলাম সেখানে। শরতের রোদ আর বন-তুলসীর গন্ধ স্নায়ুর ভেতরে ঝিমঝিম করছিল—বহুক্ষণ অকারণে ভেবেছিলাম মেয়েটার কথা। না, অনুরাগে বিহ্বল হয়ে পড়িনি। মুখ-ভ্যাংচানির কথাটা যখনি মনে পড়ছিল, তখনি ইচ্ছে করছিল একবার হাতের কাছে পেলে ফাজিল মেয়েটাকে গোটা দুই চড় বসিয়ে দেব।

তারপরে আরো অনেকদিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেছি ওখানে। প্রায়ই মনে হত ওই বাচ্চা মেয়েটা ভারী জব্দ করে দিয়েছে আমাকে, বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আর একদিন ধরতে পারলে এর শোধ তুলব।

কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। আমার প্রথম নায়িকা দেখা দিয়ে সেই যে হারিয়ে গেল, তারপরে আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি। ভালোই হয়েছে। আর একবার এলে নির্ঘাৎ ঠ্যাঙানি খেত, তার পরিণতি কী হত জানিনা। প্রতিশোধের ইচ্ছাটা চরিতার্থ হয়নি বলেই তাকে ভুলতে পারিনি, অবচেতন মনের ভেতরে সে আমার প্রথম নায়িকা হয়ে বেঁচে রইল—বেঁচে রইল বন-তুলসীর পৃথিবীতে।

আমার নায়িকা হারিয়ে গেল, তারপরে হারিয়ে গেল সেই ছোট ষ্টেশন, সেই মকাই ক্ষেত, টিলার ওপরে তালের সারি, সেই রূপালি ছোট নদী আর সেই বন-তুলসী। চলে এলাম শহরে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। ইস্কুল, কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, রাজনীতি সাহিত্য।

হাতের থেকে সেই উদ্ভিদ-রসের কষায় গন্ধটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু রক্তের থেকে নয়। বহুদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সরু সরু লালরঙের ডাঁটাগুলো বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে; অনেক নিঃসঙ্গ ভাবনার অবকাশে শুনতে পেয়েছি ছোট ছোট রুক্ষ পাতাগুলোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শিরশিরানি শব্দ। রোমান্টিক মনের মুহূর্ত-বিলাস আমন্থর হয়ে উঠেছে কটু-কষায় একটা গন্ধের উল্লাসে।

এই পর্যন্তই ছিল ভালো। আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম বন-তুলসীও যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে তাকি বুঝতে পেরেছিলাম কোনোদিন। তোমাকে বলেছি, প্রেমের ধর্মই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস। মানুষের পক্ষে কথাটার প্রমাণ দরকার নেই—ওটা স্বতঃ-

প্রমাণিত। কিন্তু বাংলাদেশের নিরীহ পল্লী-প্রান্তরও যে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ভালোবাসতে পারে সেটা আমার জানা ছিলনা।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা, সবে এম-এ পাশ করে বসে আছি। ষ্টেট্‌সম্যান আর অমৃতবাজারের পাতা খুলে মাষ্টারী, প্রোফেসারী যারই বিজ্ঞাপন দেখছি দুহাতে দরখাস্ত করে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য তাতে ডাক-বিভাগের পক্ষেই নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধিত হচ্ছে মাত্র। নিরাশ হয়ে গীতা পাঠে মনোনিবেশ করব কিনা চিন্তা করছি এমন সময় ডাক এল বন্ধুর কাছ থেকে।

শিকারের নিমন্ত্রণ। ওদের বাড়ি উত্তর-বাংলার জংলা বিলের দেশে, বুনো হাঁস শিকারের অপূর্ব জায়গা। বিপ্লবী যুগে আমবাগানে টার্গেট প্র্যাকটিশ করে বন্দুক পিস্তলের হাত খানিকটা রপ্ত করেছিলাম—এবারে সেটা কাজে লাগাবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া মনের দিক থেকেও খানিকটা আউটিংয়ের দরকার ছিল, বেরিয়ে পড়লাম।

সত্যিই দেশটাকে ভালো লাগল। এতবড় একটা আকাশ যে আছে বহুদিন সে কথাটা মনেই ছিলনা। মাঠ আর বিল। বিলে অজস্র বুনো হাঁস, হাড়গিলা, দুটো একটা ফ্লোরিক্যান, কাগ, চীনে কাগ, বক, ছোট বড় স্নাইপ, এমনকি চখা-চখী পর্যন্ত। ছররা মারা শিকারীর স্বর্গ-বিশেষ।

বন্ধু সুধীররা গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার, বাড়িতে দু-দুটো বন্দুক। পাড়াগাঁয়ের স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তার সঙ্গে শিকার-পর্বও পরমোৎসাহে চলতে লাগল। শাপলা-কলমী আর পদ্মপাতার জগতে বালিহাঁসদের নিশ্চিন্ত সংসারে আমরা হাহাকার সৃষ্টি করে দিলাম। সকালের দিকে বেরিয়ে দিনান্তে যখন রক্তমাখা পাখীর ঝাঁক নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম, তখন মনে হত যেন দিগ্বিজয় করে আসছি। অদ্ভুত একটা হিংস্র আনন্দ—শিকারের নেশা—আমাদের পেয়ে বসেছিল। গুলি খেয়ে ক্ষীণপ্রাণ পাখী যখন ছটফট করত, তার রক্তে রাঙা হয়ে যেত বিলের কালো জল, তখন অমানুষিক বিকট জয়ধ্বনিতে আমরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করতাম। আবার আমাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে হাঁসের দল যখন বন্দুকের পাল্লার বাইরে উড়ে পালিয়ে যেত, তখন একটা চাপা আক্রোশে সমস্ত মনটাই যেন কালো হয়ে যেত। এক কথায় আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন জল্লাদ-বৃত্তিটা তখন আত্মপ্রকাশের বেশ একটা ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দোষ উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

এমন সময় একদিন সুধীর বললে, রঞ্জন, একটু হাঁটতে পারবি ?

—কেনরে ?

—ছোট হাঁস মেরে আর সুখ নেই, বড় গেমের সন্ধান পেয়েছি।

—বড় গেম ! বাঘ-ভালুক নাকি ?

—দূর, বাঘ-ভালুক কেন। রাজহাঁস।

—রাজহাঁস!

—হাঁ, 'ইটালীয়ান ডাক'। কাল রাত্রে একটা খুব বড় ঝাঁক উড়ে গেছে, ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। এ বছর এই প্রথম এল। কোথায় নেমেছে জানবার জন্যে সকালে লোক পাঠিয়েছিলাম। সে খোঁজ নিয়ে এসেছে ঝাঁকটা পড়েছে মাইল পাঁচেক দূরের কমলার বিলে। মস্ত ঝাঁক, প্রায় হাজারখানেক পাখী আছে।

—এর মধ্যে পালায়নি তো?

—না, না। কমলার বিল খুব ভালো জায়গা—মাইল তিনেকের মধ্যে লোকজন নেই, ডিষ্টার্বড্ হবেনা। তা ছাড়া রাজহাঁসগুলো এম্‌নিতেই একটু বেপরোয়া, সুবিধেমতো জায়গা পেলে সহজে নড়তে চায়না। যাবি কাল?

—বেশ, চল,—

—কিন্তু মাইল পাঁচেক রাস্তা—হাঁটতে হবে। গোরুর গাড়িতেও অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু অনেকটা ঘুরতে হবে, পাকা দশ মাইলের ধাক্কা। দিনটা কাবার হয়ে যাবে।

—তা হলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।

—কিন্তু তোর অভ্যেস নেই, হাঁটতে কষ্ট হবে—

মনের জল্লাদটা নেচে উঠেছিল। সোল্লাসে বললাম, না, না, কিছু কষ্ট হবেনা। আরে রোমে এসে রোমান না হতে পারলে কী চলে?

পরদিন ভোরের আবছায়া অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেল। মাথায় হ্যাট, কাঁধে ফ্লাস্‌ক, চাকরের হাতে টিফিন-বাস্কেট আর বন্দুক। যাত্রা করলাম আমরা পাঁচজন।

কোমর সমান বিন্নার বন আর ধানক্ষেতের আল্ ভেঙে মাইলখানিক এগোতেই আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠল। সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিনি, তার বর্ণণা শুনেছি; দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে দু তিনদিন টাইগার-হিলে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মেঘ আর কুয়াশা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। শুনেছি পাহাড় আর সমুদ্রের সূর্যোদয়ের তুলনা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের বিশাল মাঠের ওপরে সূর্য ওঠা দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, জীবনে একটা অত্যন্ত দাগী জিনিস হারিয়েছ।

মাঠের পারে সূর্য উঠল। আকাশে ছড়িয়ে গেল সাতরঙের বিচিত্র কিরণলেখা, হাঁসের ডিমের মতো চ্যাপটা একটা বিরাট রক্তের ছোপ বিলের জল আর সবুজ বনান্তকে মায়াময় করে তুলল। সে সূর্যোদয় আমি কখনও ভুলতে পারবনা—সেই সূর্যের আলোয় বন-তুলসীর গন্ধ ছিল।

আমি ছিলাম সকলের পেছনে। পায়ের জুতোয় কাঁকর ঢুকেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলে

একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখি ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তা যাক—সে জন্যে আমার চিন্তা ছিলনা। মাঠের পথ, হারাবো বলে ভাবিনি। বিন্নার জঙ্গল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার আড়ালে দূরে ওদের হ্যাট আর বন্দুকের নল দেখতে পাচ্ছিলাম।

আস্তে আস্তে চলেছি। শরতের রোদ তখন সমস্ত মাঠ-ঘাটের ওপরে পাত্‌লা একটা সিল্‌কের ওড়নার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট খালের পাশে চলে এলাম। তার ওপরে একটা বাঁশের পুল সেইটে পেরিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পুলে পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

চোখে পরল কালো পাথরের তৈরী ভেনাস। পূর্ণযৌবনা সাঁওতালের মেয়ে। বিন্নাবনের আড়ালে নির্জন খালের ধারে দাঁড়িয়ে সযত্নে গাত্র মার্জনা করছে। চারদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসংকোচ এবং একান্ত নিরাবরণ! কনক-চাঁপা রঙের রৌদ্রে উদ্‌ঘাটিত অপূর্ব্ব দেহশ্রী।

কোনো বিবসনা মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো ভদ্ররুচির পক্ষে শুধু ন্যক্কারজনক নয়, কল্পনাতীত। কিন্তু সেই মাঠ আর সেই সূর্যোদয় সেদিন যে পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার চির-পরিচিত শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। লোভের বিকৃত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে আমি তাকাইনি—সে প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণই অবান্তর ছিল। শুধু চেতনার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠছিলিঃ এ আশ্চর্য, এ অপরূপ। মনে হয়েছিল, খালের জল, সূর্যের আলো, গাছপালার গন্ধ, সবাই মিলে যেন কণা কণা সৌন্দর্য দিয়ে ওকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেছে--গড়ে তুলেছে একটা স্বপ্নের মূর্ত্তি। যে কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তিটা মিলে গিয়ে—গলে গিয়ে জলে আলোয় আকাশে হারিয়ে যেতে পারে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিলনা। তারপর দেখলাম একপাশ থেকে একখানা ময়লা কাপড় মেয়েটি কুড়িয়ে নিলে। সযত্নে আবৃত করলে দেহ, ওপাশের আলের পথ ধরে হাঁটতে সুরু করলে। খানিক দূর এগিয়েই—হ্যাঁ বন-তুলসী, আমার কৈশোরের সেই বন-তুলসী, তারই নিবিড় বনের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

আমার প্রতিটি রক্ত-বিন্দুতে যেন রণিত হয়ে উঠল কৈশোরের সেই গান, সেই মীড় মূর্চ্ছনা। আমার দুহাতের ভেতরে যেন ফিরে এসেছে একটা কটু কষায় উদ্ভিদ-গন্ধ। আমার পথ ভুল হয়ে গেল, আমার মাথার মধ্যে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। কেন যেন মনে হল সেই হারিয়ে-যাওয়া নায়িকা আজ পরিপূর্ণ যৌবনে ওই বন-তুলসীর কুঞ্জে আমারি জন্যে অপেক্ষা করছে।

দিবাস্বপ্ন? সস্তা রোমান্টিসিজ্‌ম? তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি সেই সূর্যোদয়ের কথা, বলেছি আমার মগ্ন-চৈতন্যের সেই বন-তুলসীর বিচিত্র আস্বাদ।

হয়তো তখন আমার মনের ভেতরে সব ওলট্‌-পালোট্‌ হয়ে গিয়েছিল, চেতন সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছিল অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপ। আমি বন-তুলসীর জঙ্গলের দিকে নেমে এলাম।

বহুদিন পরে শরতের রৌদ্র আর বাতাসের ঐক্যতান মিলল, বহুদিন পরে আমাকে আলিঙ্গন করলে সেই লাল নরম ডাঁটাগুলি, সেই খস্‌খসে পাতাগুলো আমার গালে মুখে ভালবাসার ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে। বন ভেঙে আমি এগোতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানিনা। আমার নায়িকার সন্ধানে কি? বোধ হয় তাও নয়। ডাঁটা-পাতার সেই স্পর্শ, দলিত মথিত গাছগুলোর সেই অপরূপ আদিম গন্ধ আর বাতাসের শিরশির শব্দই আমার কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল, সত্য হয়ে উঠেছিল।

ঘণ্টাখানিক বনের মধ্য দিয়ে চলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। নীচে মাটি নেই, এত ঘন হয়ে গাছগুলো উঠেছে যে ওদেরই একরাশকে চেপে বসতে হল আমাকে। চারদিকে বন-তুলসী আমায় ঘিরে ধরেছে—আমার মাথা থেকে প্রায় দুহাত উঁচুতে উঠে ওরা আমাকে আড়াল করে রেখেছে। কোনোদিকে কিছু দেখবার নেই—শুধু ওপরে নীল নিবিড় আকাশ আর তার কোলে শ্বেত-পদ্মের উড়ন্ত পাপড়ির মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে নিয়েছিলাম, অবগাহন করে নিয়েছিলাম বন-তুলসীর নিবিড় স্পর্শ-সান্নিধ্যে। পর পর যখন গোটা পাঁচেক সিগারেট শেষ করেছি তখন খেয়াল হল। তখন আমার মগ্ন চৈতন্যের ওপরে বাস্তব চেতনার আলো পড়ল। মনে পড়ে গেল, আমি সুধীরদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম। ওরা হয়তো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে, হয়তো ভাবছে—

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে দশটার কাছাকাছি। সর্বনাশ, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। দু পকেট ভরে বন-তুলসীর পাতা আমি ছিঁড়ে নিলাম, তারপর উঠে পড়লাম বেরিয়ে আসবার জন্যে।

কিন্তু আমার মতোই বন-তুলসীও বহুদিন বাদে আমাকে ফিরে পেয়েছিল। আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে রাজী হলনা, ঘন-নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরল।

বেরুতে চাই, আর বেরুতে পারি না। মোহভঙ্গের পরে বুঝতে পারলাম কত বড় বোকামি করে ফেলেছি আমি। একটু আগেই তুমি বলছিলে প্রেমের প্লেটোনিক রূপটাই নিরাপদ। হ্যাঁ, মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও।

এ বনের যেন শেষ নেই। মনে হতে লাগল এই বন-তুলসীর ঝাড় আদি অন্তহীন,—যেন কার একটা বিচিত্র যাদুমন্ত্রে এত বড় পৃথিবীটার পাহাড়-সমুদ্র-নগর-গ্রাম সব বন-তুলসীর জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবন, আমার সভ্যতা, আমার

আত্মীয়-স্বজন সব মায়া, সব মিথ্যে। এ জঙ্গল থেকে আমি আর কোনোদিন বেরুতে পারব না।

কোনোদিন বেরুতে পারব না! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল-লাল ডাঁটাগুলির রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ওপরে শরতের রোদ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে আমার মাথার ভেতরে বিঁধতে লাগল, আমার চোখের দৃষ্টি আসতে লাগল ঝাপসা হয়ে। দু হাতে জঙ্গল ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম, কিন্তু বৃথা। এ বনের শেষ নেই—এর ভেতর থেকে কোনোদিন লোকালয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবো না আমি। মাথা উঁচু করে জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চারপাশের উঁচু নীচু অসমতল জমির ওপরে আমার অভিশপ্ত প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই, কোনো কিছুর চিহ্নই নেই!

প্রাণপণে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি—কিন্তু জঙ্গল ভেঙে ভেঙে আমার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সামনে এগোবার চেষ্টা করে বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। এক পায়ের জুতো কোথায় ছিটকে চলে গেল, টের পেলাম পকেট থেকে পড়ে গেল মণি-ব্যাগটা। কিন্তু সেগুলো খোঁজবার অবস্থা নয়, বেরুতে হবে, যেমন করে হোক বেরুতে হবে। মনে হতে লাগল কোথায় কতদূরে আমার কলকাতা, তার বাড়ীঘর, তার ট্রাম-বাস, তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবন! আজ এই বন-তুলসীর জঙ্গলের ভেতরে আমি মরে যাচ্ছি, আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি—কেউ আর কোনোদিন আমায় খুঁজে পাবে না!

অসহায় গলায় বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু কে সাড়া দেবে? সেই আদিগন্ত মাঠের ভেতরে আমার অবরুদ্ধ আর্তনাদ শুনবে কে? কোনো আশা নেই, কোনো উপায় নেই। হয় এখানে দম আটকে মরে যাবো নইলে সাপে কামড়াবে—আশে পাশে বাঘ থাকাও অসম্ভব নয়!

আর একবার শেষ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করেই একরাশ গাছের সঙ্গে পা জড়িয়ে আমি পড়ে গেলাম। বন-তুলসীরা সাপের মতো কিলবিল করে আমাকে আকড়ে ধরল। জ্ঞানটা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যাওয়ার আগে মনে হল: এইখানে মরে যাবো আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তারপর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্ঠুর আরো একরাশ বন-তুলসী, নিশ্চিহ্ন করে ওরা আমাকে গ্রাস করবে, আত্মসাৎ করে নেবে—

কিন্তু জঙ্গলের বাইরে আমার টুপিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল বলেই অজ্ঞান অবস্থায় সে যাত্রা আমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল সুধীর। রক্ষা করতে পেরেছিল আমার নায়িকার সেই ঊর্ণনাভ-প্রেম থেকে।

তাই তোমাকে বলছিলাম, তবু আমাদের কলকাতাই ভালো। আর ভালো মানুষের প্রেম, যেখানে তুমি না থাকো, সৃষ্টির স্বাক্ষর সন্তানের মধ্য দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে—প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর তোমাকে একেবারে অবলুপ্ত করে নেবে না॥

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাইশ

চিঠিটা আবার পড়ল তামসী। এই জায়গাটা :

'এই তোমার মূর্তিমান? একটা ঘৃণ্য চোর? তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, তামসী। একেই কিনা তুমি একদিন—'

লজ্জিত হওয়া উচিত। ডান হাতে কপালটা চেপে ধরে হেঁট-মাথায় তামসী ঝিম মেরে বসে রইল।

হ্যাঁ, হাজতেই আছে। জামিন দেয়া হয়নি। কে দাঁড়াবে তার জন্যে? কে তাকে চেনে? কে আছে তার আপন জন?

তামসীর বুকের ভিতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠল।

তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, তামসী। কী করেছে সে শোন। আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছে তোমার নাম করে। বলেছে, ধর্মঘট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্যে তোমার চাকরি গেছে। বড় দুঃখে পড়েছ তুমি, কিছু তোমার সাহায্য দরকার। লিখে জানাতে

সংকোচ হয় তাই পাঠিয়েছ তাকে। দুঃখে পড়ে টাকা চেয়ে পাঠাবার মত তুমি মেয়ে নও বলেই জানতুম, কিন্তু লোকটা এমন প্রতীতির সঙ্গে কথা কইল, অবিশ্বাস করতে পারলুম না। তবু জিগগেস করলুম, আপনি কে? বললে, ওদের সংঘের কর্মী বললে যদি না দেন তাই বলি আমি ওর বন্ধু। কথাটায় খুব রস দিয়ে বললে। মজে গেলুম। বসালুম এনে আমার ছোট্ট পড়ার ঘরটীতে। ভাবলুম, সামান্য কটা টাকা, ঠকলে ঠকব, তবু তোমার নাম যখন উঠেছে তার অমর্য্যাদা করবনা। শোবার ঘরে এসে আলমারি খুলে টাকা বার করলুম। টাকাটা হাতে পেয়েই একটা নমস্কার ঠুকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তোমার সম্বন্ধে আরো যে একটু মন খুলে আলাপ করব তার সময় দিল না। লোকটা চলে যেতেই যেন মনে হল ঘরে কী নেই। কী নেই? টেবিলের উপরে আমার রিষ্ট-ওয়াচ আর ফাউন্টেন পেন। দরজার বাইরে, ভদ্রতায় বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি সুরু করলুম, কিন্তু চোরকে কোথাও দেখা গেল না। উনি, কলেক্টর সাহেব, তাঁর পশ্চিম-ঘরে বসে জরুরি মিটিং করছিলেন, সে-মিটিং ভেঙে দিলুম তক্ষুনি। দিকে-দিকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লে এখুনি ধরতে পারা যায় হয়তো।

শুনলুম, মিটিঙে কে একজন এসেছিলেন সাইকেল করে, সেই সাইকেল নিয়েই ভেগে গিয়েছে চোর। কিন্তু কোথায় যাবে, কার শাসনের দড়ি ছিঁড়ে? কার কড়া হুকুমের তাঁবে রয়েছে এই সহর-জিলা? বিকেলের মধ্যেই বামালসহ ধরা পড়ল চোর। দেখলাম তোমার সেই গুণধরকে। তোমার সেই রণধীর।

ছি ছি ছি। একেই কিনা তুমি—

মুহূর্তে মন ঠিক করে ফেলল তামসী। সে যাবে, যাবে রণধীরের কাছে। যাবে তার সাহায্যে। তার বিপদবারণে। গয়নার বাক্সটা এতদিনে হয়তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। হয়তো এত দিনেও একটা সুস্থ, ভদ্র চাকরি জোগার করতে পারেনি। ঘর বাঁধবার মত পায়নি এখনো মানুষের সন্ধান। সে দেবিকার কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইবে রণধীরকে। বলবে, ছেড়ে দে আমার হাতে। আরেকটা সুযোগ দে তাকে নীরোগ হবার। আমার জামিনদারিতে। চোখের জলে মুচলেকা সই করে দিচ্ছি। বিশ্বাস কর, হাতে পেয়ে হাত করে গড়ব তাকে। নির্মাণ করব।

তামসী চারদিকে চোখ ফেরাল। চারদিকে তার নির্মাণের স্বপ্ন লেখা। শরীরের মাঝে আত্মার আবিষ্কার। বাসনার থেকে বন্ধুতার উদ্ঘাটন। জড়তার থেকে প্রাণকর্ম। চিতানলের থেকে হোমানলের দীপ্তি। তার গৃহরচনা। তার দেশরচনা।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই তার গৃহ। অপচিত পথচ্যুত মনুষ্যত্বের মধ্যেই তার দেশ।

সমস্ত রাস্তা ট্রেনের ভিড়ে এক চমকও ঘুমুতে পারেনি তামসী। আবোলতাবোল

ভেবেছে। একদিন একই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল তারা পাশাপাশি। আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যের মত। দুইই কি আজ অস্ত গিয়েছে? আজ একজন চোর, আরেকজন—সমরেশের কথাটা কি মনে পড়ল?

না, পাথরে আগুন ফোটাবে তামসী। আরেকটা শুধু পাথর দরকার। যে করে হোক, ছাড়ান আনবে রণধীরের। তাকে কাছে বসিয়ে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলবে। বলবে, কী আশ্চর্য, আমার কাছে তোমার ভয় কি, লজ্জা কি, অনুতাপ কি। আমাদের আপোসের মামলা, আপোসে মিটমাট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, আবার আমরা পথের থেকেই আরম্ভ করব, একেবারে মাটির থেকে। এই মাটিই আমাদের ঘর। মাটিই আমাদের দেশ। আকাশের চন্দ্র-সূর্য জ্বলবে এবার মাটিতে।

তুমি এসো। আমার হাত ধরো। আমি তোমাকে নির্মাণ করব না। আমি হব তোমার প্রণীতা।

সকালবেলা। ষ্টেশনে নেমে একটা গাড়ি নিল তামসী। গাড়োয়ানকে চমকে দিয়ে বললে, 'ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠি।'

ফটকের কাছে গাড়ি আটকাল কে। ভিতরে ঘোড়ার গাড়ি যাওয়া বারণ। একটা তকমা-আঁটা চাপরাশি এসেছিল প্রায় তেরিয়া হয়ে। স্ত্রীলোক দেখে একটু ভেবড়ে গেল। বললে, 'কাকে চাই?'

বারান্দায় চটি জুতো পায়ে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে দেবিকাকে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল তামসী। দেবিকা এদিকে দেখেও দেখল না। এটা এখন চাপরাশির এলেকা।

'ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর কাছে এসেছি।'

'মেমসাহেবের কাছে?' চাপরাশি সংশোধন করল: 'কিছু হন নাকি আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি তার ছোট বোন হই। আসছি কলকাতা থেকে।'

চমকে উঠল চাপরাশি। মনে-মনে সাত হাত জিভ কাটল। সাহেবের শালিকে গেটের বাইরে আটকে রেখেছে। সসম্মানে নিয়ে এল তাকে ভিতরে, অন্দরমহলের বেয়ারার কাছে চালান দিলে। বললে, মেমসাহেবের বোন।

দেবিকাকে দেখা গেলনা কাছে-পিঠে। কোথায় সরে গিয়েছে সুট করে। বোধ হয় অঘোষিত অবস্থায় বহির্গত হবার রেওয়াজ নেই। কিম্বা, কে জানে, সত্যিই হয়তো দেখতে পায়নি তামসীকে। কিম্বা, এ ও হতে পারে, চিনতে পেরেছে তাকে, বুঝে নিয়েছে কিসের জন্যে তার আসা। তাই অমন করে সরে গেল অবজ্ঞায়।

তাকে ড্রয়িংরুমে বসাল বেয়ারা। অন্দরমহল থেকে ঘুরে এল। বললে, মেমসাহেব

বললেন কলকাতায় তাঁর কোনো বোন নেই। তাই এই কাগজটাতে নাম লিখে দিন আপনার।

এখানেও বুঝি কার্ড লাগে। তামসী বড়-বড় করে বাঙলায় তার নাম লিখল।

তবু তখুনি-তখুনি দেখা নেই দেবিকার। কার্পেট থেকে সিলিং দেখে-দেখে তামসীর চোখ ক্ষয়ে গেল। দেবিকার কী হল কে জানে। বুঝতে পেরেছি। দাম বাড়াচ্ছে। একটু বা সাজগোজ করে নিচ্ছে। পাছে তাকে মিসেস-ম্যাজিস্ট্রেট বলে মনে না হয়।

যা ভেবেছে তামসী। পাটভাঙা ফর্সা শাড়ি পরেছে, চুলটা মুখটা ও ঠোঁটদুটো একটু ঠিক করে নিয়েছে। গলায় ঝুলিয়েছে একটা জড়োয়া নেকলেস।

'ওমা, তুই? তামসী? তুই কখন এলি?'

তবু যেন খানিকটা আশান' এল। ভাগ্যিস তুই বলে ডেকেছে। তুমি-আপনি বলেনি। তবু মনে হচ্ছে যেন মুখস্ত-করা পাঠ বলছে। ভুলে-যাওয়া কবিতার লাইনের মত। এখনকার স্মৃতিতে নেই আর সেই অনুভবের উত্তাপ।

'এই এলাম—' কুণ্ঠিতমুখে তামসী একটু হাসল।

কেন এলি, কিসের জন্যে, এ-কথার ধার দিয়েও গেলনা দেবিকা। যত আজে-বাজে কথা। যেন তামসীর আসাটা এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় বেড়াতে আসা। যেন সমস্ত জরুরি কথা হয়ে যাবার পর এখন তারা কচুঘেঁচুর কথা কইছে। তুই সত্যি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছিস, কিন্তু বেশ টান-টান দেখাচ্ছে। আমি আগের চেয়ে মোটা হয়ে গেছি, না রে? জজ সাহেবের গিন্নিরা মোটা হবে, আমরা কেন? মফস্বলের জল-হাওয়ার দোষই এই, অল্প খাব বললেও বেশি খেতে হয়, এত ভেট বেগার এসে হাজির হয় না চাইতে। তার উপর গত বছর একটা টুইন হয়েছে। অফুল। ভেবেছিলুম মরে যাব। কিন্তু হাউ সুইট, ভারি মিষ্টি, এক ঢিলে দুই পাখি। রয়েছে ঐ ঘরে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। কী নাম রাখি বল তো?

এমনি ধারা ধরা-ছোঁয়া-না-দেয়া কথা। ক্রোমিয়াম-প্লেটেড ফ্রেমে-আঁটা এই কৌচগুলি ভারি সুন্দর, না? আঁকা-বাঁকা পায়ায় এগুলো পেগ-টেবল। এগুলো আখরোট কাঠের বাক্স, এটা তুলসী কাঠের, সিগারেট রাখবার জন্যে। যাই বল বাপু, বাঙালী মেয়ে, পানটুকু কিছুতেই ছাড়তে পারবনা। পানের রঙের যদি ভ্যারাইটি থাকত তা হলেই আর কথা ছিল না। হ্যাঁ, এই ডাবোর-পরাতগুলো জয়পুর থেকে আনা। এই নেকলেসটা কাল এসেছে। খুব মন্দ হয়নি, কী বল। ওমা, তোকে এক পেয়ালা চা দেব না? ব্যেরা। ব্যেরা!

বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না। মন বলছে, চোখ, তুমি ভুল দেখছ; কান, তুমি ভুল শুনছ। চোখ-কান বলছে, মন, তুমি আনাড়ি।

গাড়োয়ান গাড়ি ভাড়ার জন্যে চেঁচামেচি করছে। চাপরাশি এসে নালিশ করল।

'চেঁচামেচি ?' দেবিকা যেন ঘা খেল।

ও, হ্যাঁ, ভাড়াটা দেওয়া হয়নি। এই নাও। আমার জিনিস দুটো নামিয়ে নিয়ে এস।

'এইখানেই উঠলি নাকি ?'

'কেন, আপত্তি আছে ?' ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তামসীর।

'না, আপত্তি কী, বেশ তো, থেকে যা না কদিন।' পারল না, মুখের উপর না বলতে পারল না দেবিকা।

ভিতরের ঘরে, মানে সংসারী ঘরে নিয়ে এল তামসীকে। একটি চায়ের প্লেটে করে দুখানি থিন এরোরুট বিস্কুট আর ছোট এক কাপ চা মস্ত একটা কাঠের ট্রেতে করে নিয়ে এল বেয়ারা। বারকোশটাই বড়, বস্তু অতি সামান্য। এদের সমস্ত জীবনটাই হয়তো তাই।

প্রগলভ করে ঐ ড্রয়িংরুমটাই সাজানো হয়েছে, নইলে আর সব ঘরে ছাপোষা গরিব কেরানির দুর্দশা। চোখে দেখেও অসম্ভব লাগে। নড়বড়ে তক্তপোষ, ছেঁড়া মশারি, তুলো-বের-করা তোষক। শিশু দুটো দুটো ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে আছে। ভাঙা শিশি, ছেঁড়া জুতো, টাল-করা বিছানা বালিশ। বলতে-কইতে ব্যেরা, কিন্তু আসলে চাকর-ঠাকুর বলতে সেই একজন। যা প্রকাণ্ড লন তাতে তিনটে মালি লাগা উচিত, সেইখানে একটা মালি। তাই ফুলের মধ্যে গজাচ্ছে কলাবতী আর গাছের মধ্যে কচু। মোটর একটা রাখতে হয়, আছে, কিন্তু সোফার নেই। নিজেই সাহেব ড্রাইভ করে। গাড়িও তেমনি বুঝদার, প্রায়ই ব্যারাম হয়ে হাঁসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকে। লজঝর সাইকেল আছে একটা। চড়নদারের ভাবটা এমন যে লজঝর সাইকেলটাই একটা কীর্তি। আর, সাইকেলই বা কেন, আপিস বা আদালত বাড়িতে বসে করলেই বা ক্ষতি কি। এক মাঝে-মাঝে মফস্বল যাওয়া, তা পুলিশ-সাহেবের গাড়িই তো আছে।

এক নজরেই বুঝতে পেরেছে তামসী। বনেদী কৃপণ। শুধু একটা চলনসই ঠাট বজায় রাখবার জন্যে যেটুকু-না-করলে-নয় খরচ, বাকি সমস্তটা ব্যাঙ্কে, শেয়ারে-সার্টিফিকেটে, নানানরকম লগনিতে। একটা কোট গায়ে দিয়ে পাঁচ ষ্টেশন কাটিয়ে দিচ্ছেন এই তাঁর খুব গর্ব। স্ত্রীর বেলায় একটু উদার হতে তাঁর নারাজি নেই, কেননা স্ত্রীই হচ্ছে তার বাইরেকার বিজ্ঞাপন, কিন্তু বাপু, ঘটে বুদ্ধি যদি থাকে, সোনা দানা করো, শাড়িটা একটু

কমাও। কিন্তু, এমন আশ্চর্য, এক মেরুন রঙের জর্জেট সাত দিন পরলেও মেয়েরা বলবে, বা ওটা আবার কবে কিনলেন ?

টাইমপিস ঘড়িটাতে দশটা বেজেছে। দেবিকা বললে, 'এবার একবার আসবেন উনি ভেতরে। বেবিদের আদর করতে।'

ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বুঝি এমনি আসেন। এক ঘণ্টা পর-পর উৎসাহে ভাটা পড়ে।

'একে চিনতে পার ?'

স্ত্রীলোকের দিকে তাকাতে যেন কত অনিচ্ছা এমনি তাকাল নীলাচল। হামড়ি হয়ে পড়ে ঝুড়ির ছেলে-মেয়েকে আদর করছে। গায়ে আধা শার্ট, পরনে আধা প্যান্ট। তামসীর মনে হল শার্ট-প্যান্টের আয়ু পাঁচ ষ্টেশনের চেয়েও বেশি।

'আমাদের বিয়ের সময় দেখেছ।'

'তাই নাকি ?' যেন প্রায় বিস্ময়ের সীমান্তে এসে পৌঁছুল নীলাচল। মানে, তাঁর এত সৌভাগ্য, আমাদের বিয়ের সময় তিনি ছিলেন ?

তামসী সাহসে বুক বাঁধল। 'কেন, তারো আগে একবার আমরা দুজনে গিয়েছিলুম আপনার বাংলোতে। একজনের সম্বন্ধে—'

'তোর ভুল হচ্ছে।' দেবিকা শুধরে দিল : 'সে আরেকজনের কাছে। এর কাছে নয়।'

'আমার কাছে হলেও আমার কিচ্ছু মনে থাকত না। মেমরিই যদি শার্প হত, তবে জীবনে আরো অনেক বেশি শাইন করতে পারতুম।'

তামসীর মনে হল রণধীরের কথাটা দেবিকা একেবারে মুছে দিতে চায় দেয়াল থেকে।

কিন্তু সে বলবে, জিজ্ঞাসা করবে, ভিক্ষা চেয়ে নেবে অনুনয় করে। কিন্তু কখন ? দুপুরবেলা, খাওয়াদাওয়ার পর। যখন তার আর দেবিকার মধ্যে নামবে সেই স্তব্ধতার ঘনিমা। আগে-আগে গ্রীষ্মের দুপুরে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুয়েছে দুজনে, সমস্ত শব্দ যখন ঘুমে, তখন তারা কথা বলেছে। কত কথা। দেশের কথা, ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্বের কথা।

দুপুর ফিরে আসে, কিন্তু কথারা কি ফেরেনা ?

ক্রমশঃ।

আলোচনা

প্রমথ চৌধুরী

শিল্পকলার ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রভাবশালী এক একটি ব্যক্তিত্বের তিরোভাব মানে এক একটি যুগের অবসান হওয়া। সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরীর তিরোধানে বাংলাসাহিত্যের তেমনি এক যুগাবসান সূচিত হ'লো। কাল (মৃত্যুকালে তাঁর আটাত্তর বৎসর বয়েস হয়েছিলো) ও সৃষ্টির পরিমাণের দিক দিয়ে এই প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ বিচিত্র ঐশ্বর্যের দানে একাদিক্রমে বহু বৎসর বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাতে তাঁর অভাবটুকু শুধু মৃত্যুশোক হয়েই বাজ্‌বে না, আধুনিক প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে চরম দুর্দৈবরূপে প্রতিভাত হবে।

একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে একা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকের ভাষা ও চিন্তার প্রণালী নিরূপিত করে গেছেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের ছাঁচ বেঁধে দেবার প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রভাব যেমন কাজ করেছে, তেমনি সেই সঙ্গে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপরোক্ষভাবে, আরেকটি ব্যক্তিত্বের প্রভাবও সমান কার্যকরী হয়েছে। তিনি সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী—বাংলা গদ্যে নূতন রীতির প্রবর্তক পণ্ডিতাগ্রণ্য হাস্যরসিক 'বীরবল'। ভাষাশিল্পের দুটি দিক—একটি প্রেরণার আর আবেগের দিক, ভাবের জোয়ারে ভাষাকে ফেনায়িত ও ছন্দায়িত করার দিক; অপরটি তার কলাকারুর দিক, নিখুঁত ভাস্করের মতো যত্নে ও ধৈর্যে, মেপে ও কেটে, ভাষাকে খোদাই পাথরের রূপ দেবার দিক। প্রথমটির শিক্ষা আমরা পেয়েছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে; দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত এসেছে গদ্যকুশল 'বীরবল' থেকে।

কিন্তু 'বীরবলে'র কাছ থেকে আমরা শুধু কলাকারুর দিকটিই নিয়েছি একথা মনে করলে ভুল করা হবে। কলাকারু মানেই সজ্ঞান প্রচেষ্টা, চোখ কান মন খোলা রেখে কাজ করা। এইটে যদি মনে রাখি তা হলে দেখ্‌বো এ অই কলাকারুর সূত্র ধরেই বীরবল আমাদের যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠা অভ্যাস করতেও শিখিয়েছেন। একথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, গদ্য ঠিক কাব্যাত্মক ভাবের বাহন হবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি; গদ্যের আবেদন গদ্যময়ই হওয়া উচিত। তাতে রস থাকবে কিন্তু সেটা গদ্যের রস, কাব্যের রস নয়। গদ্যের রস সেই ভাষাতেই সব চাইতে প্রকাশমান যাতে চিন্তার স্বচ্ছতা ও প্রকাশভঙ্গির সারল্যের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবোধের প্রাবল্য থাকবে, লেখক যে প্রতিটি কথা মেপে মেপে বসাচ্ছেন, আবেগের তোড়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন না, তার সাক্ষ্য থাকবে। "সফল গদ্যের নিরিখ যদি তাই হয়, তা হলে বীরবলের নিকট আধুনিক সাহিত্যিকদের ঋণের শেষ নেই।

প্রমথ চৌধুরী চল্‌তি গদ্যকে জাতে তুলেছিলেন এইটেই তাঁর বড়ো পরিচয় নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো চল্‌তি গদ্যের মাধ্যমে যুক্তিনিষ্ঠা ও বিচারপ্রবণতাকে তিনি আবেগের ওপর স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর 'সবুজপত্রের' আন্দোলনকে সেভাবেই আমাদের দেখা উচিত। যদিও বীরবলী রীতির শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা আজকের দিনের সাহিত্যিকেরা অল্পবিস্তর সবাই স্বীকার করে নিয়েছি, তা হলেও নিরর্থক আবেগকে আমরা গদ্যের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বাতিল করতে পেরেছি আমাদের গদ্য তার প্রমাণ দেয় না। বীরবলের সাধনাকে সম্পূর্ণ করাই আমাদের সম্মুখে এখন একমাত্র পথ—যুক্তিনিষ্ঠা আর বৈজ্ঞানিক মনোভাবই আমাদের একমাত্র মাপকাঠি হোক।

প্রমথ চৌধুরী তাই বলে রুক্ষ, ধূসর পথের পথিক ছিলেন না। তাঁর হাস্যরস, ব্যঙ্গ, আমোদ-প্রিয়তা এতোই স্বতঃসিদ্ধ যে শুধু এই গুণেও তিনি পাঠকের হৃদয়ে আসন দাবী করতে পারেন। অন্য যে কোন সাধারণ সাহিত্যিকের হাতে যুক্তিনিষ্ঠার পথটুকু যেখানে বিশুদ্ধ কঙ্করাস্তীর্ণ পথে পরিণত হতে পারতো, তিনি তাকে ফুল ছিটিয়ে সুরভিত করে তুলেছিলেন। তবে সে ফুল কবিসুলভ কনকচাঁপা নয়, কাঠালীচাঁপা, তাতে গন্ধ ও ফলভার দুই আছে। পড়া গেলো অথচ রসিয়ে রসিয়ে পড়া গেলো—বোধ করি প্রমথ চৌধুরীর রচনা সম্পর্কেই এই কথাটি সব চাইতে বেশি খাটে।

বীরবলী ভঙ্গির আরেকটি প্রধান লক্ষণ তার পাণ্ডিত্য। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই পণ্ডিত ছিলেন। ইংরিজি, ফরাসী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পড়াশুনোর কথা সুবিদিত, কিন্তু তিনি শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্যেরই উপাসক ছিলেন না; দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র জ্ঞানের বিভাগে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ ছিলো। তবে অন্যান্য পণ্ডিতদের থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের এইখানে তফাৎ যে তিনি পাণ্ডিত্যকে তাঁর রচনার ভেতর মিশিয়ে দিতে জান্‌তেন; রচনার ওপর দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কখনও বিস্ফোটকের মতো ফুঁড়ে ওঠেনি—যা অনেকের লেখাতেই ওঠে। পাণ্ডিত্যকে হাল্কাভাবে বহন করার (ইংরিজি ইডিয়মটুকু ক্ষমনীয়) সফলতম দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে কেউ যদি থাকেন তিনি প্রমথ চৌধুরী। আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের রচনায় পাণ্ডিত্যের সংযোগ প্রায়ই ঘট্‌তে দেখা যায় না—পাণ্ডিত্য অর্জনের অভিপ্রায় প্রায়ই শিল্পসৃষ্টি প্রচেষ্টার তলায় পানা পড়ে যায়। বীরবলের কাছ থেকে এ বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেক কিছু শেখবার আছে।

কি সাহিত্য সমালোচনায়, কি ছোট গল্পে, কি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনায় বীরবলের পরিহাসরসিক, বিদগ্ধ মনটির অভ্রান্ত পরিচয় মেলে। জীবন ও জগতকে তিনি যে চোখে দেখেছেন তাতে সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদাই উদ্যত হয়ে ছিলো, কিন্তু তাতে বক্রতা ছিলো না। জীবনের অসুন্দর, অমলিন, নির্বোধ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু তার বিষ তাঁর কলমের কালিকে বিষাক্ত করতে পারেনি। তিক্ততা ও অসহিষ্ণুতা তাঁর অবিচল মনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। মানুষ ও মানুষের জীবন সম্বন্ধে যথার্থ কৌতুকবোধ থাক্‌লে তবেই গ্লানির দিকটাকে এমন হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত স্বল্প-ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকেরা প্রায়ই তিক্ততার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিক্ততা

রচনার গুণ নয়, দোষ, এই শিক্ষা প্রথম আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, দ্বিতীয় বীরবলের কাছ থেকে। তাঁদের রচনার বিপরীত দৃষ্টান্তই এবিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেছে।

কালচ্যর এক জিনিষ আর কালচ্যর সম্বন্ধে কথা বলা বা লিখা এক জিনিষ। সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত থাকলেই সেই নজীরে কেউ 'কালচ্যর্ড' হয়ে যায় না। কবি বা সাহিত্যিক মাত্রই কালচ্যর্ড নন, অধিকাংশকেই আঁচড়ে দেখলে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে শিশুর, অন্তঃসারশূন্য রূপসর্বস্ব নারীর, নির্বোধের কিম্বা আদিম মানবের প্রবৃত্তিগুলিই প্রবল। জীবন সম্বন্ধে যাঁর সমগ্র দৃষ্টিবোধ নেই, বিভিন্ন চিন্তা ও কর্মের স্রোত এক অখণ্ড ঐক্যের উৎসমুখ থেকে প্রবাহিত এই চেতনা যাঁর জন্মায়নি, তিনি কখনও নিজেকে কালচ্যর্ড বলে দাবী করতে পারেন না। প্রমথ চৌধুরীর এই সমগ্র দৃষ্টিবোধ ছিলো, যেমন ছিলো রবীন্দ্রনাথের। পরিতাপের বিষয়, উদার শিক্ষা, বিদগ্ধ রুচি, পরিশীলিত মন এ যুগে বোধ হয় খুব বেশি লোকের জীবনে বেঁচে নেই—রাজনীতির কড়া হাতের মার খেয়ে আর নিদারুণ সর্বব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি পালাই পালাই করছে। রবীন্দ্রনাথ-বীরবল ভাগ্যবান, তাঁরা উনবিংশ শতকের প্রসারমান নির্বিরোধ আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছেন—তাঁদের লিবারল্ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে চেয়ে আমরা বড়ো জোর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে পারি, কিন্তু তাঁদের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না।

আজন্ম অভিজাত প্রমথ চৌধুরী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন না। নীতি হিসাবে জমিদারী প্রথাকে তিনি নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিলেন—তার নজীর রয়েছে তাঁর 'রায়তের কথা' বইতে। একসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিলো, তারই ফলে 'রায়তের কথা'-র সূচনা। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই সব চাইতে বেশি ক্ষতি হতে পারতো, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া তাঁর মতো যথার্থ শিক্ষিতের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ছিলো না।

ফরাসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু নিষ্ফলা পাণ্ডিত্যের তিনি ধার ধারতেন না। ফরাসী সংস্কৃতির সুচিক্কণ সৌকুমার্য ও সহজাত কৌতুকপ্রিয়তাকে বোধ হয় তিনি বাংলা সংস্কৃতির দরবারে অতি সজ্ঞানেই আমদানী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গল্পগুলিতে তিনি যে রস পরিবেষণ করেছেন সেই রসের চেহারাই আলাদা। যাঁরা ফরাসী ভাষা জানেন তাঁরা বলেন ফরাসী সাহিত্য থেকে নেওয়া এই রস। ফরাসী ভাষার জ্ঞান আমাদের নেই, তবে উৎস যেখানেই হোক, তাঁর গল্পের রস চেখে চেখে ভোগ করতে সাহিত্যরসিক কারুরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাঁর 'আহুতি', 'চার-ইয়ারী কথা', প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ গল্পসাহিত্যের এক একটি শোভন ও সুচারু গুচ্ছ। দর্শনের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বের্গস‍ঁ-র প্রভাব তাঁর ওপর সব চাইতে বেশি পড়েছিলো।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার সর্বাঙ্গীন আলোচনার উপলক্ষ এটা নয়, পরে বিস্তৃত অবকাশের সুযোগে আমরা তাঁর সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। আপাতত এইটুকুই আমাদের শুধু বলবার যে এই সর্বস্বীকৃত সাহিত্যগুরুর তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট যুগ অবসিত

হ'লো—সেই যুগ বাংলা গদ্যের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার যুগ—গদ্যকে গদ্যের চালে চালাবার যুগ। যদিও ত্রিশ বৎসর আগে 'সবুজপত্র' মাসিককে কেন্দ্র করে বীরবলশিষ্যদের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো, বীরবলের প্রভাব আজ আর শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই—বীরবলী ধারা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে গেছে। এই ধারা অবশ্য ভাবের বিপ্লবের চাইতে ভাষা-রীতির বিপ্লবসাধনের দিকেই অধিক কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কিন্তু ভাষার বিপ্লবের মধ্যেই যে এতো দূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিহিত ছিলো তা কে ভাবতে পেরেছিলো?

পরিশেষে বীরবল ১৩৩০ সালে লিখিত 'নতুন কাগজ' প্রবন্ধে তখনকার নতুন লেখকদের সম্বোধন করে যে কয়টি অমূল্য কথা বলেছিলেন আজও নতুন লেখকদের সম্পর্কে তাদের মূল্য ফুরিয়ে যায় নি। এখানে প্রবন্ধটির শেষাংশ উদ্ধৃত করলাম—নতুন লেখকেরা কথাগুলি দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ুন:

> "নবীন লেখকদের আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই। অধিকাংশ লোকই জানে না যে, তার অন্তরে কতটা শক্তি আছে। চলতি বুলির মায়া কাটাতে পারলেই মানুষ তার নিজের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। আর সেই আত্মাই হচ্ছে সচল সাহিত্যের সনাতন মূল। সুতরাং প্রতি নবীন লেখক যদি এই সংকল্প করেন যে, I am not going to be dominated by other people's opinion, but I am going to dominate the opinion of others—তাহলেই তাঁর লেখার আর মার নাই।"



পূর্ব্বাশা — কার্ত্তিক
১৩৫১

'দুর্গম গিরি…'

শিল্পী—
উষারঞ্জন দত্তগুপ্ত

পূর্ব্বাশা

নবম বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা

কার্ত্তিক • ১৩৫৩

বিপ্লবের কথা

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমরা ও তাঁহারা

২

আমি—এই যে! আস্তেজ্জে হোক্। কি সৌভাগ্য আমার! "...ere the shoes were old..." সেদিনকার আলোচনার রেশ রণ্‌রণ্‌ করছে এখনও। এই দেখুন আমার জঙ্গল থেকে কিছু শুখনো কাঠ যোগাড় করেছি। এইবার আগুণ ধরান।

তাঁহারা—আরে মশাই করেছেন কি! এতগুলো বিপ্লবের বই বাড়িতে রেখেছেন, পুলিশে ধরে নি?

আমি—তারা লোক চেনে। টাকা চুরির মামলায় আমাকে তারা ধরবে তবু এই ধরণের বই ঘরে দেখলে তারা আমাকে 'প্রশ্ন' পর্য্যন্ত করবে না। বই বউএর অপেক্ষাও বিপ্লববিরোধী বরাবরই বলে আসছি।

তাঁহারা—যা তা বল্লেই হল আর কি! লেনিন শুনেছি খুব পড়িয়ে-লিখিয়ে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী কখনও তাঁকে বাধা দেন নি।

আমি—মোটেই বিশ্বাস করবেন না, মশাই। ইংরেজেরা ঐ গুজোব রটিয়েছে রাশিয়াকে জব্দ করবার জন্য। ওরা যখন কারুর মাথা খেতে চায় তখন বলে লোকটা বুকিশ্‌, গ্রন্থকীট। আর যদি বিশ্বাসও করেন লেনিন বই ঘাঁটত, তবে অনুগ্রহ করে মনে

রাখবেন বিপ্লবের সময় লোকটি ছিল পাঁচ শ' মাইল দূরে। না, না, পড়াশুনো ক'রে বিপ্লব হয় না। মহাত্মাজী কি জিন্না সাহেব এডওয়ার্ডস্, ব্রিন্টন, ম্যালাপার্ট, লেনিন, ট্রট্সকী, সোরোকিন, হান্টার—প্রভৃতির বই পড়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ কে অস্বীকার করবে যে তাঁদের কৃপায় ভারতে একটা জাগরণ, একটা, একটা, আপনাদের ভাষায়, আমূল পরিবর্ত্তন ও ডি, এল, রায়ের ভাষায়, একটা জলস্তম্ভ, মহামারী, ভূমিকম্প এসেছে। জওহরলালের অবশ্য বইএর সখ আছে, কিন্তু মহাত্মাজী, কি প্যাটেল, কি জিন্নার তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব, আরে, কিসে আর কিসে! এই বই তুলে রাখলাম। দেশের ধারণা আমরা বিপ্লব বান্চালই করতে পারি, চালু করতে অক্ষম। ছেড়ে দিন আমাদের, মহাত্মাজী, তথা কংগ্রেস, আমাদের জাতকে হ্যানস্থা করেন। তাঁদের কল্পিত পরিস্থিতিতে আমাদের সূচ্যগ্র স্থানও নেই। মাষ্টার পাবে পঁচিশ টাকা, আর দেশ হবে স্বাধীন! নিছক স্বার্থত্যাগের জোরে অবশ্য সব কিছুই সম্ভব হয় শুনেছি। জানিনা মশাই!

তাঁহারা—একটু অবিচার হচ্ছে না? আপাততঃ আপনাদের স্থান নেই এবং তার কারণ আপনি নিজেই এতক্ষণ বল্লেন। বিপ্লবের সময় আপনারা একটু বাইরে থাকুন, অর্থাৎ প্রস্তুত হোন আগামী কালের জন্য। জেলে গেলে আপনাদের কষ্ট হবে, লাঠির ঘা-ও আপনাদের সহ্য হবে না এবং আপনাদের মহিলা, মহিষীরাও কেঁদে কেঁদে কেবল সিনেমা দেখে বেড়াবেন। দরকার কি গোলমালে গিয়ে!

আমি—সমালোচনার প্রয়োজন নেই?

তাঁহারা—এখন মোটেই নেই। শক্তির অপচয় অন্যায়।

আমি—ঘষে ঘষে এক রকম বিদ্যুত জন্মায়।

তাঁহারা—আজকাল ও-ধরণের তৈরী বিদ্যুতে চলে না। এখন সব বড় বড় টারবিন।

আমি—পেট্রলের inner combustion?

তাঁহারা—উপমা ছাড়ুন।

আমি—যথা আজ্ঞা। সাফ্ বাৎই ভালো। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড-এর সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি মানি, প্রত্যেক বড় ঘটনা তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তাঁরা রায় দেন, যদিও জওহরলাল ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলে ফেলেন, অনেক কাজ করে ফেলেন এবং সেইগুলোই আমাদের ভালো লাগে······

তাঁহারা—তবু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি আবার সামলে নেন।

আমি—তাঁর এই সামলানটা আপনারা পছন্দ করেন?

তাঁহারা—তা অবশ্য করিনা। তা হলে, আপনার মতে······

আমি—প্রথমে শুনুন, তার পর সংক্ষিপ্তসার হবে। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড-এ সব পাকা পাকা লোক আছেন, কিন্তু সেইজন্যই সম্ভবতঃ বিপক্ষ মতাবলম্বীদের প্রতি তাঁদের কোনো ধৈর্য্য নেই। ধীরে ধীরে সব বামমার্গীরাই বিতাড়িত হয়েছে, ও হচ্ছে। হাঁ, প্ল্যানিং কমিটির উল্লেখ করতে পারেন বটে।

তাঁহারা—কেন, তাঁদের কমিটির রিপোর্ট ত' গরম গরম! ন্যাশন্যালিজেসন-এ বুঝি মন ভরে না?

আমি—হক্ কথা, ভরে না। কারণ, তাঁদের কল্পিত রাষ্ট্র ইংরেজী আদর্শে, অর্থাৎ এই লেবর-গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত। ষ্টেট্-ক্যাপিটালিজম্ আর সোশিয়ালিজম্ সমধর্ম্মী নয়। বম্বে রিপোর্টটা আবার তাও নয় এবং সেইটেই চলতে দেখবেন।

তাঁহারা—ইংরেজী আদর্শ অপছন্দ, অথচ গান্ধীজীর রামরাজ্যকেও বরণ করবেন না! ভারী মজার ব্যাপার!

আমি—মোটেই মজার নয়। রামরাজ্যটা পৃথক, বিপরীতও নিশ্চয়, এবং আরো নিশ্চয়, লেবর-গভর্ণমেণ্টের বিন্দুও এই ভারত সরকারের তুলনায় সিন্ধু। তবু, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কিংবা কয়লার খনি ও Power-resources-কে পুরোপুরি দেশী সরকারের অধীনে আনবার চেষ্টাকে বিপ্লব বলতে পারছিনা।

তাঁহারা—কেন?

আমি—দেশী সরকার বিদেশী সরকারের চেয়ে একশ' গুণ ভাল, কিন্তু হাজার গুণ নয়। রঙ তফাৎ হলে জাত বদলায় না। দেশী সরকার কি দেশী ধনিক-সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে? ভয় হয়, পারবে না। তখন কি অবস্থা হবে ভাবুন! একে দেশপ্রেম, তার ওপর সোশিয়ালিজম্-এর মুখোস—অর্থাৎ ন্যাশন্যালাইজেসন, যেন পনের বছর আগেকার জার্ম্মাণী, ইটালীর প্রতিচ্ছবি দেখছি। আসল ব্যাপার কি জানেন? সরকার-ফরকার কিছু নয়—সব সরকারই বড় বাবুদের বাজার-সরকার। অতএব প্ল্যানিংএর প্রধান উদ্দেশ্য হবে এই বড় কর্ত্তাদের সরান। আমাদের ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি থেকেই তাঁরা বিতাড়িত নন, ত' অন্যত্র কা কথা! তাঁরা নাকি সব বিশেষজ্ঞ! কিসের বিশেষজ্ঞ জানা আছে। থুতুতে চিঁড়ে না হয় ভিজতে পারে, কিন্তু ভেজা চিঁড়েয় মুখ রোচেনা। আমি চাই বাঁশমতী চালের ভাত, লুচি, মুর্গীর মাংস, কাবাব্।

তাঁহারা—গরহজমে মারা যাবেন।

আমি—ধন্যবাদ। কিন্তু গরহজমের জন্য দায়ী কে? আপনারা কি ভাবেন মানুষ খুদকুঁড়ো খেতেই জন্মেছে? শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। হজম

যায় বেশী খাওয়ার চেয়ে না খেয়ে, এবং খারাপ খেয়ে। অতএব……

তাঁহারা—অতএব পেটরোগা শিশুকে পোলাওএর পথ্য দেওয়া হোক্!

আমি—তা বলছি না। তারাও পোলাওএর অধিকারী, অতএব এমন ভাবে তাদের হজমশক্তি শিক্ষিত হোক যাতে তারা সেই অধিকার ভোগ করতে পারে।

তাঁহারা—এ আবার নতুন ফ্যাঁকড়া তুলছেন দেখছি। এতদিন তর্ক হচ্ছিল আপনাদের ও আমাদের মধ্যে, এখন আমাদের ছাড়া অন্য এক 'তাঁদের' দলকে ভেড়ালেন।

আমি—সত্যি বলছি, আপনাদের মত বুদ্ধিমান সম্প্রদায় ভূভারতে নেই। আপনারা ও আমরা পৃথক নই; আমাদের ঝগড়া সাহিত্যিক কলহ মাত্র; এ-ঝগড়ার শ্বাস নেই, শাঁষও নেই। এখনকার বিবাদ আমাদের উভয় দলের গোলামের সঙ্গে তাঁদের। এতদিন ধরে এই কথা বলতে চাইছি, পারিনি, আপনারা নিজগুণে ধরতে পারলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে বিপ্লব তাদের জন্যে।

তাঁহারা—আরেকটু এগোন, বিপ্লব তারাই করবে।

আমি—অতটা অগ্রসর হতে চাই না। ব্যাপারটা এই ধরণের ঘটে: যে-সমাজে বিপ্লব বাধছে সেখানে মোটামুটি দুই দল থাকে, নচেৎ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই। ইন্‌টিলেক্‌চুয়েলরা অধিকারীর দলেই এতদিন জন্মেছে। সর্ব্বক্ষেত্রেই যে তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অসন্তোষ ফুটে উঠছে তা নয়, তবু অসন্তোষের বাঙময় প্রকাশ, যাকে speech-reactions বলতে পারেন, তাঁদের দ্বারাই সম্ভব হয়। অন্যদলের অসন্তোষটাই বাস্তব, কিন্তু ভাষা নেই তাদের। বিপ্লব সুরু হয় যখন অসন্তোষের দুটি ধারা মেশে, বাক্য ও কর্ম্মের সংযোগ ঘটে, এবং তখনই নতুন myth তৈরী হয়, সেটা আবার সাধারণে গ্রহণ করে। অবশ্য, অত্যাচারের বহর, জনসাধারণের সমবেত হবার শক্তি ও সেই সব অনুষ্ঠানের লড়বার ক্ষমতা, অধিকারীর দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি ও নিজেদের প্রতি অবিশ্বাস, আর জীবননির্ব্বাহ পন্থায় নতুনত্বের ভীষণ প্রকোপ—এই সব কারণ ষড়যন্ত্র করে বিপ্লবের পটভূমি তৈরী করে। যারা বাক্যধর্ম্মী তাদের দ্বারা বিপ্লব চালান সুবিধের নয়। তারা নতুন symbol তৈরী করুন, তারা প্রচার করুন, ব্যাখ্যা করুন, বাঁচিয়ে রাখুন। অবশ্য, যখন গুলি চলছে তখন তাঁরা বাড়ির মধ্যে থাকলে সকল দিক থেকেই নিরাপদ ও মঙ্গল। এখানে আপনাদের সঙ্গে আমি একদিল।

তাঁহারা—আমরাও তাই অনেক সময় ভাবি বটে। যার কর্ম্ম তারে সাজে।

আমি—আরেকটি বক্তব্য আছে। এঁদের আরো একটি কাজ বিপ্লবটিকে বাঁচিয়ে রাখা। পৃথিবীতে বিস্তর বিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু ক'টা সত্যকারের বেঁচেছে বলুন ত? কেন?

ভাবপ্রবণতার স্বভাবই হল ফুরিয়ে যাওয়া। তাই তাকে ব্যবহার করতে হলে বুদ্ধি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে। সে-কাজ করবে একটা disciplined party। অরেল্-প্রভৃতিরা disciplined minority কথাটি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু Minority কথাটির মধ্যে অর্থবিপত্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে সংখ্যা কম হওয়াটা প্রধান নয়, যদিও তার প্রয়োজন বেশী; প্রধান হল Minority কে majority-তে, সমগ্র সমাজে, পরিণত করা। আমি জানি বিপ্লবের আদিযুগের বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায় বিপ্লবের পরেও minority থাকতে চান—এটা মানুষের স্বভাব। মিছরী কি চায় মুড়ির সঙ্গে একদর হতে? একবার যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করেছে তার পক্ষে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া কঠিন। পুরাতন দেবতারাও নতুন দেবতাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন। তাই আজকের বিপ্লবীনেতৃবৃন্দ কালকের নেতৃবৃন্দকে দেখতে পারেন না, এবং বিপ্লবের অন্তে একপ্রকার স্থাণু, জড় ভরত, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে এটা তাঁদের অভিমান, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তাঁদের অভিমান ক্ষতিকর। আমার মনে হয় কি জানেন? ইনটেলেকচুয়াল সম্প্রদায়ের কাজ যেমন বুদ্ধির সাহায্যে ভাবপ্রবণতার পাষাণভাঙ্গা, তেমনই বিপ্লব ঠিক পথে চলছে কি না নজর রাখার জন্য, তাকে মধ্যে মধ্যে ধাক্কা দেবার জন্য, সামাজিক শক্তির বিন্যাস, তার গতির রীতি-নীতি বোঝা ও বোঝবার জন্যও তাদের একান্ত প্রয়োজন। তারপরও তাঁদের অন্য কাজ রয়েছে অবশ্য।

তাঁহারা—Minority-কে majority-তে পরিণত কে করবে?

আমি—একটু অন্যভাবে দেখলে ব্যাপারটা শক্ত ঠেকবে না। আগেকার বিপ্লবের কথা ছেড়ে দিন—যদিও সেখানেও আমার মন্তব্য চলে—এখানকার বিপ্লবের majority ত সামনে রয়েছে।

তাঁহারা—চমৎকার! আপনি বলছেন সামনে, অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। যদি তারা অত নিকটে তবে প্রচারবিভাগের দরকার কি মশাই? আপনিই না সরকারের হাজার হাজার পৃষ্ঠা নষ্ট করেছেন?

আমি—আমার কথা তুলবেন না। আবার বলছি, ওরা সামনে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না এইটাই দুঃখ, এইটাই বিপ্লবের এক প্রধান অন্তরায়। প্রত্যেকবারই তাদের অনুমতিতে সমাজের পরিবর্ত্তন হয়েছে। অবশ্য লিখিত-পড়িত কিছু পাবেন না, তারাও জানে না যে তারা অনুমতি দিয়েছে। সেই সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখছি এই determined, disciplined, dominant minority-র শেকড়

উঠছে সমাজের এক নতুন শ্রেণী থেকে। এটাকে আপনারা বিপ্লববাদের প্রধান তত্ত্ব বলতে পারেন। যেখানে শেকড় নেই সেখানে জোর মারপিট, খুনোখুনি, রক্তারক্তি ও তারপর নেপলিয়ন, হিটলার, মিলিটারী ডিক্‌টেটর, অর্থাৎ গর্ভস্রাব, আর সেইখানেই ঐ অভিমান। যাঁদের বাঙলা দেশে 'দাদার দল' বলে তাঁদের সঙ্গে কথা কয়েছেন? Elite group-এর দশা সর্ব্বত্র এই। তাঁদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁদের স্থান কাচের আলমারীতে, সিঁকের ওপর, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে, মন্দির গাত্রে। এখনকার নতুন শ্রেণী চাষী, মজুর, আর নিম্নবিত্ত। তাঁদের সংখ্যা আপনাদের—আমাদের চেয়ে বেশী নয়? অতএব সমস্যাটা কোথায়? হাতের কাছেই majority রয়েছে।

তাঁহারা—ওঃ, আপনি বুঝি কম্যুনিষ্ট? ঐ যারা দেশের সর্ব্বনাশটা করলে ১৯৪২ সালে, আর এখনও করছে জিন্নাকে নাই দিয়ে? লজ্জা হয় না তাদের সঙ্গে একমত হতে?

আমি—আমি ভাবি নির্লজ্জ। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কি করেছে জানি না, তবে তারা যদি ১৯৪২ সালের ঘটনাবলীকে বিপ্লব না বলে থাকে তবে তারা নিতান্ত ভুল বোঝেনি। ১৯৪২ সালের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণেরও তাই মত। তিনি নিজে বলেছেন যে ওগুলোর পিছনে কোনো প্ল্যান ছিল না—অর্থাৎ ওগুলো মাত্র insurrection, ওতে বিপ্লবের সূচনা হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি-র উত্তর অবশ্য কেবল প্ল্যানিংএর অভাব নয়, তার উত্তর যে ১৯৪২ সালের বিপ্লবী পার্টির শেকড় তখনও পৌঁছয়নি শ্রমিক-মজুরের বুকের মধ্যে, অর্থাৎ তাঁরা তখনও নতুন শ্রেণীর মাত্র মৌখিক প্রতিভূ ছিলেন।

তাঁহারা—আপনি যদি চান যে নুতন নেতা মজুর চাষীর ঘরে জন্মাবার পর বিপ্লব আসবে তবেই হয়েছে! ফরাসী বিপ্লবের নেতা ছিল কাউন্ট মীরাবঁ, লা-ফায়েট, আর লেনিনের বাবা ছিলেন স্কুল-ইস্‌পেক্টার ভুলবেন না। আমেরিকায়ও উকীলের দল বিপ্লবের অগ্রদূত ছিল।

আমি—জন্ম পত্রিকার ছক্ কাটাকে ইতিহাস বলেনা।

তাঁহারা—তা হলে স্বীকার করুন যে বড়লোকের ছেলে হলেও চলে।

আমি—স্বীকার করেছি, করছি আবার।

তাঁহারা—বাধ্য স্বীকার করতে। একজন রথচাইল্‌ড্ কম্যুনিষ্ট হয়েছে কাগজে দেখলাম, লক্ষ্ণৌ এর বড় ঘরোয়ানার ছেলেরাও নাকি ঐ দিকে ঝুঁকছে?

আমি—গুজোব তাই; এখন অবশ্য আর তারা আসছে না, আজকাল বড়লোকেরা সব হয় লীগে-এ, না হয় কংগ্রেসে ঢুকে পড়ছে। হা, ভগবান!

তাঁহারা—ও আবার কি।

আমি—ভগবান ছাড়া পথ নেই। কংগ্রেস আর লীগ বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ, তাই নাম দুটো মুখে এল।

তাঁহারা—ভূতের মুখে রাম নাম!

আমি—আমরা ভারতবাসী ভুলবেন না। এখানে, অর্থাৎ আমাদের এই অনুন্নত, পরাধীন, লক্ষ্মীছাড়া দেশে ধর্ম্মই একমাত্র সম্বল। এতদিন আমাদের দেশে বিপ্লব হয়েছে ধর্ম্মান্তরতার ভেতর দিয়ে। সেকাল গত। সমাজ ছিল তখন বন্ধ। এখন সমাজ উন্মুক্ত, অন্ততঃ তাই ভাবি, অতএব আশা করছি যে ধর্ম্মের প্রয়োজন আর থাকবে না পরিবর্ত্তনের জন্য। কিন্তু...

তাঁহারা—সংস্কার যাবে কোথায়! চাষীমজুরদের, জনসাধারণের একটাত' খোঁটা চাই।

আমি—আচ্ছা, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? ভারতবাসীরা কি অত্যন্ত ধার্ম্মিক?

তাঁহারা—তা ঠিক বলতে পারছিনা, তবে জানি একটা কিছু বিশেষত্ব আছে। কেন জিজ্ঞাসা করছেন? এই এতক্ষণ বিপ্লবতত্ত্ব আলোচনা হচ্ছিল বেশ, ধর্ম্মতত্ত্বের কি দরকার ছিল?

আমি—অবান্তর, নিতান্ত অবান্তর। বিশেষত্বটা কি?

তাঁহারা—এখানে ধর্ম্মের বাঁধনটা খুব বেশী, অন্য দেশের চেয়ে।

আমি—তা হলে দাঁড়ায় এই: আমাদের সমাজই পৃথিবীর একমাত্র totalitarian সমাজ। গর্ভধান থেকে সুরু, মরেও শান্তি নেই, অন্ততঃ তিন পুরুষ। হিটলারীয়ান সমাজের সঙ্গে পার্থক্য এইটুকু যে এখানে আইন ব্রাহ্মণে তৈরী করতেন না, তাঁরা কেবল শ্রুতিস্মৃতি অনুযায়ী বিধান দিতেন। ফল সেই একই। নয় কি?

তাঁহারা—তা আর জানি না! যার বাড়ি একাধিক বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ও তাঁদের জননী, দিদিমা, খুড়ীমা আছেন তাঁরাই হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

আমি—তা হলে কর্ত্তব্য কি?

তাঁহারা—বেঁধে মার খাওয়া।

আমি—একেই বলে ভগবানের মার! গ্রহণ করা, সহ্য করা, মেনে নেওয়া মাথা পেতে, এই মনোভাবের নাম ধর্ম্মভাব, তা ইংরেজের বেলাই হোক আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেই হোক। আপনারা আমরা উভয়েই মেনে নিয়েছি যে নেতৃত্ব আসবে ওপরকার স্তর থেকে। তাই 'হা ভগবান' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। Totalitarian সমাজে জন্মেছি কি না তাই! স্বীকার করাটা আমাদের পক্ষে ডাল ভাত। আমাদের সংস্কৃতি স্বীকৃতির বিলম্বিত ইতিহাস। আপনাদের দম বন্ধ হয়ে যায় না?

তাঁহারা—হয় বলেইত ছুটে আসি।

আমি—কিন্তু বিপ্লবের মূলে হতাশা নেই, আছে আশা। সে আশার কুসুম আকাশে ফোটে না, মাটির বুক চিরে যে চারা বেরোয় তারই ডালের ডগায় সে-ফুলের কুড়ি ধরে। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা এতদিন টবের চারায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে জেনে রাখবেন। কেন ঘটবে না? যাই বলুন না কেন, তাঁরাও মানুষ, সামাজিক জীব। সমাজ বদলেছে, হয়ত যতটা বদলেছে ততটা তারা বদলান নি। কিন্তু বুঝছেন, সকলে নয়, অনেকে, যে তাঁরা পৃথক নন্, যে সেকাল আর নেই। কোন কাল আসছে তাঁরা অবশ্য সকলে ভাবছেন না; এখনও সেই দলাদলি চালাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কেউ যে স্বপ্ন দেখেন নি তা নয়। কিন্তু তবু স্বপ্নই রয়ে গেল। এটা কি কম আফ্‌শোষ মশাই! এতে মানুষ সীনিক্ হয়ে যায়। সীনিজম্ হল একপ্রকারের মৃত্যু, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর, মনের ধর্ম্মনাশ। মনের ধর্ম্ম এগিয়ে চলা, আর সীনিজম্ হল মনকেই উড়িয়ে দেওয়া। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সীনিক হয়ে পড়েছেন দেখেছি। আমারও মধ্যে মধ্যে ও-রকম অবস্থা হয়। কিন্তু জানি এটা সর্ব্বনাশের পথ। বিপ্লবের জন্ম আশায়, নিরাশায় নয়, নয়, নয়।

তাঁহারা—ও-রকম ধর্ম্মজীবনেও ঘটে, যোগীরা বলেন।

আমি—বলুন গে! তাতে আমার কি! কাটিয়ে ওঠাটাই একমাত্র কাজ। আমাদের দেশটাই একটু সীনিক্যাল হয়ে পড়ছে না কি? কালাবাজারের টাকা লুটে মাথায় গান্ধীটুপি পরাকে কি বলেন?

তাঁহারা—এখন কি কর্ত্তব্য মনে হয়?

আমি—দেশের সমস্যাকে আমার সমস্যার বৃহৎ সংস্করণ যদি ভাবি, তবে কর্ত্তব্য হোলো আরো বেশী চিন্তা করা। চিন্তার ফলে বোধ হয় নাড়ির যোগ খুঁজে পাব। আমরা সব মা-হারা সন্তান, তাই মায়ের পেটের ভিতর ঢুকতে ইচ্ছে হয় মধ্যে মধ্যে।

তাঁহারা—চিন্তার ফলে?

আমি—হাঁ, চিন্তারই ফলে, কারণ চিন্তার মানেই হল ওপরকার সংস্কারের খোলস ছিঁড়ে ফেলা। সংস্কার খুললেই দেখি যেন অইচেতনার রাজত্ব ধীরে ধীরে, প্রবাল দ্বীপের মতন বেড়ে উঠেছে। ইন্‌টেলেকচুয়ালদের প্রবালদ্বীপে জলের একটু ওপরে ঠেলে ওঠে, এই মাত্র। ছেড়ে দিন বাজে কথা। আমরাই বা কে, আপনারাই বা কি? কেউ কারুর নয়, সবই মায়া, সত্যই হল এই জীবন, ও তার পরিবর্ত্তন, আমূল পরিবর্ত্তন আপন প্রয়োজনে।

তাঁহারা—কিন্তু কার সাহায্যে?

আমি—সকলের সাহায্যে নয়। কারুর কারুর সাহায্যে। তারা নতুন সৈন্য। আমরা ক্লান্ত, অর্থাৎ গ্রহণশীল মন আমাদের, সংস্কারের চাপে আমরা মৃতপ্রায়। আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তাদেরই দ্বারা হবে যাদের মন সংস্কারমুক্ত। আমার বিশ্বাস কি জানেন? আন্তরিক বিশ্বাস হল এই যে নতুন শ্রেণীর মন ধর্ম্মাচ্ছন্ন নয় মোটেই, আর বাকী সব আমরা সকলেই ধার্ম্মিক, যদিও পূজো আচ্ছায় বিশ্বাস গেছে আমাদের অনেকেরই। তার বদলে এসেছে দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম, প্যাট্রিয়টিজম্। আমি জাতীয় আন্দোলনকে ছোট করছি না মোটেই; এইখানে কম্যুনিষ্টরা ১৯৪২ সালে ভুল করেছিলেন। তাঁরা দেশপ্রেমের জোর কত বুঝতে পারেন নি; মানসিক বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করবার, শক্তি পরিমাণ করবার ক্ষমতা তাদের কম। হতে বাধ্য; তাঁরা বুদ্ধিতে বিশ্বাসী, একটু বেশী রকমের। অথচ ভাববৃত্তিকে রোধে কে? কিন্তু এই সঙ্গে জোর গলায় বলবার সময় এসেছে যে দেশপ্রেম ধর্ম্মের আকার গ্রহণ করছে আমাদের দেশে। কেবল মুসলিম লীগই পলিটিক্স্-এর সঙ্গে ধর্ম্ম মিশিয়েছে বল্লে চলবে না। সর্ব্বত্রই তাই হচ্ছে। এই মেশান ব্যাপারটা মনের ওপর, সমাজের ওপর ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাসের চিহ্ন, বৃদ্ধির নয়। প্রভাব এখনও রয়েছে তাই ঐ রকম মনে হয়। Patriotism is my religion সকলেরই মুখে শুনেছি। পূর্ব্বে ছিল ধর্ম্ম আকাশমুখী, এখন এই জগতেরই সীমায় তার দৃষ্টি আবদ্ধ। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কম বেশী আছে, চার ধারে আবার দেয়াল রয়েছে, তাই দৃষ্টি আমাদের মারমুখী। অর্থাৎ শত্রু চাই আমাদের, নচেৎ দেশপ্রেম জমে না। অনেকে সোশিয়ালিষ্ট-কম্যুনিষ্ট হন এরই জোরে, এই শত্রু-আবিষ্কারের তাগিদে, ঘৃণার প্রয়োজনে।

তাঁহারা—ঘৃণা কমাবেন কিসে?

আমি—প্রেমে নয়, কারণ প্রেম ঘৃণার উল্টোটা, অন্ততঃ প্রেমের প্রথম কথা ঘৃণার অভাব। লোকটা সাপে কামড়েছে, কিসে বাঁচান যায়? না, সাপের বিষ না দিয়ে! চমৎকার! ভাবের শত্রু ভাব নয়, ভাবনা। তাই অতটা চিন্তার ওপর ঝোঁক দিচ্ছি। নচেৎ, চিন্তার সীমা সম্বন্ধে আমি সচেতন। বয়সের দোষে অবশ্য, কিন্তু সীমাজ্ঞান হয়েছে চিন্তারই কৃপায়।

* * * *

রাত বেড়েছিল, তাঁরা চলে গেলেন। মড়ারা বিপ্লব বাধায় না; ওটা জ্যান্তদেরই কাজ। সমাজের ওপরকার স্তর মৃত; কিন্তু তাদের ঠেলে কারা যেন উঠতে চাইছে।

তাদের কান্না আসে। রবি ঠাকুর কি এদের জন্যেই কান পেতে বসেছিলেন সারা জীবন? হাঁ, rescue-partyর একজন হতে চাই, কিন্তু সেই ছুতোয় যেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা না করি, উপকারকের দম্ভ যেন মনকে আচ্ছন্ন না করে। তারা বেরিয়ে এসে নিজেদের জীবন নিজেরা চালক, সেই সঙ্গে আমাদেরও বদলে দিক। এই জীবনটা অসহ্য এবং ভাবী জীবন গড়ে তোলায় তৃপ্তি আছে। সৃষ্টির জন্য বহু জিনিষের দরকার, চিন্তার, পড়াশুনোর প্রয়োজনও সেই সঙ্গে। আজকাল শুনেছি আমাদের এতদিনকার জাতীয় আন্দোলন বন্দরে এল বলে। যদি তাই হয় তবে পাইলট আর পোর্ট্‌ট্রাষ্টের কাজ বেড়ে গেল বই কমল না।

কবিতা

সূর্য্য নক্ষত্র নারী

জীবনানন্দ দাশ

এক

তোমার নিকট থেকে সর্ব্বদাই বিদায়ের কথা ছিল
সব চেয়ে আগে; জানি আমি।
সেদিনও তোমার সাথে মুখ চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ পৃথিবীতে র'য়ে গেছ
আমাকে বলে নি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
র'য়ে গেছে;—
যে যার নিজের কাজে আছে এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত সূর্য্যকে চেনে তারা;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কি ক'রে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি;—
আমার চোখের থেকে নিমেষ নিহত

সূর্য্যকে সরায়ে দিয়ে।
স'রে যেত ; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব নব সূর্য্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয় ? কেন দেব ? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়
স্থিরতর প্রিয় তুমি ;—নিঃসূর্য্য নির্জ্জন
ক'রে দিতে এলে।

মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হ'তাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মত
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা ক'রে আত্মস্থ হ'তাম।
তুমি তা' জান না, তবু, আমি জানি একবার তোমাকে দেখেছি ;—
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
বিচিত্র ইন্দ্রত্ব খসে বার বার ;—বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায় ;—মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায় ; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়!
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মত আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙীন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চ'লেছি!

দুই

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার র'য়ে গেছে, নারি,
জাতিস্মর শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য্য নেই যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত ক'রে দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা র'য়ে গেছে।
অন্তহীন ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে,
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি,
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব ক'রেছিলে ;—
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ

আমাকে ইসারাপাত ক'রে গেলে তারি ;—
অপার কালের স্রোত না পেলে কি ক'রে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে—
তোমার পল্লবঘন চোখ এসে সম্প্রদান ক'রে নিয়ে যাবে ?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দেখায়ে অনঙ্গকাল ভেঙে গেলে পরে,
যে দেশে নক্ষত্র নেই—কোথাও সময় নেই আর—
আমারো হৃদয়ে নেই বিভা—
দেখাবে নিজের হাতে - অবশেষে—কি মকরকেতনে প্রতিভা !

তিন

তুমি আছ জেনে আমি বাঞ্ছাকল্পতরু ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই সবিতার সাধনার শূন্যতার নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
অনিকেত লক্ষ্যে অবিরাম চ'লে যাওয়া।
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলতায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।

আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মত
তুমি যে শরীর নিয়ে র'য়ে গেছ সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষেব নির্জ্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে ?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে বা সেই উপচার পুরুষমানুষ ?—
ভাবি আমি ;—জানি আমি, তবু
সে কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই ;—
যে কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্ত্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।

কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ

কবিতার রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই: যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোষাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি ;—একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হ'লে ইমাজিনেশনের দরকার ; এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটির বাংলা কি ? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা কবিকল্পনা অথবা ভাবনা। আমার মনে হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা। বুদ্ধি—ধী—সকলেরই আছে এ কথা বলা চলে না। কল্পনা সব মানুষের মনেই সমান বিস্তার ও নিবিড়তা পেয়েছে বা পেতে পারে এ কথা মনে করা ঠিক নয়। উৎকর্ষের তারতম্য আছে। কল্পনার (ও অন্যান্য মনোদৃষ্টির) সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, কিংবা নবীন রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান। কিন্তু এ সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা একই ভাবে কাজ করে না, তার অন্তঃসারও একই রকমের নয়। যে কবির কল্পনাপ্রতিভা আছে সে ছাড়া আর কেউ কাব্যসৃষ্টি করবার মত অন্তঃপ্রেরণার দাবি করতে পারে কি ? এ প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরের মর্য্যাদায় টের পাওয়া যাবে আলোচনার বিচারসহনশীলতা।

কিন্তু ভাবনাপ্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে ; এ জিনিষ ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই। এই সব কারণেই—আমার পক্ষে অন্তত —ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার নয় ; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ ক'তে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামো এমন কি সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়: পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে। এর ফলে আমার এক বন্ধু আমাকে লিখেছেন "কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস ক'রে তোলে। এতে ক'রে কোনো একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু সমস্ত নক্সাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি।" কিন্তু এরকম ঐকান্তিক কবিতা আমি বেশি লিখতে পারি নি। এর কারণ, ভাবপ্রতিভা, তাকে বলম্বিত ক'রে নেবার অবসর ও শক্তি এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির উপযুক্ত প্রভাব কোনো না কোনো কারণে শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

মহাবিশ্বলোকের ইসারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য্য সত্যের মত ; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ ক'রেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

আজ পর্য্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সে সবে মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার ক'রে কেবল মাত্র তারি ভিতর থেকে উৎস-নিরুক্তি খুঁজে পাই নি। নাট্যকবির পক্ষে এটা পাওয়া প্রয়োজন। প্রতিভাসিক

কবিতাজগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি। কিন্তু তবুও তিনজগতেই বিচরণ করে সে—মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে উঠে। লিরিক কবিও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি, সমাজ, ও সময়অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠেনা; অন্ততঃ মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মত নয়। কাজেই উপন্যাস ও নাটকের মত মানুষমনকে সমূলে আক্রান্ত না ক'রেও কবিতা মানসের আমূল বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্ম্মলতর ক'রে তুলবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।

কোনো কিছুকে 'চরম' মনে ক'রে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই; র'য়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি ক'রবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখাও চায়। এতে ক'রে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরি হয়ে চ'লতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্ব্বাণের দিকে কারু মতে; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজপ্রযাণের দিকে অন্য কারু ধারণার; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাদের মনে (কিংবা হাতে) দুইজগৎ আবার নতুন ক'রে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই।

আমিও সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিষকে 'চরম' মনে ক'রে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখঠার দিয়ে মাঝে মাঝে,—টেম্পারারি সস্‌পেনশন্‌ অব ডিজ্‌বিলিফ্‌ হিসেবে। কিংবা কখনো কখনো মনকে এই ব'লে বুঝিয়েছি যে যাকে আমি শেষ সত্য ব'লে মনে ক'রতে পারছি না তা' তবুও আমাদের অধুনিক ইতিহাসের দিকনির্ণয়সত্তা; আজকের প্রয়োজনে চরম ছাড়া হয়তো আর কিছু নয়। কিন্তু তবুও সময়প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনে সম্ভাবনাকে বিচার ক'রে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা ক'রেছি। অনেকদিন ধ'রেই পরিপ্রেক্ষিতের আবছায়া এত কঠিন যে এর চেয়ে বেশি কিছু আয়ত্ত করা আধুনিকদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও কিছুটা সুদূরপরাহত।

মার্ক্সীয় দর্শন

মার্ক্সীয় জ্ঞানবিজ্ঞান

(এপিষ্টেমলজি)

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু দার্শনিক সমাজে জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্বন্ধে যে ধারণা সাধারণতঃ প্রচলিত, মার্ক্সীয় দর্শনের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারণা তদরূপ নহে। সেই জন্যই দার্শনিকদের নিকট মার্ক্সীয় দর্শনের অনুমোদিত জ্ঞানবিজ্ঞানের মতবাদ অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই মতবাদ গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ গতানুগতিক মতের পরিপন্থী হইলেও, তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের মতবাদ উপেক্ষণীয় নহে। এই দর্শন জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই উহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

মার্ক্স বলেন যে জ্ঞানের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর ঐক্য আছে কিনা ইহা নির্দ্ধারণ করা শুষ্কজ্ঞানের প্রশ্ন নহে, ইহা ব্যবহারের (প্র্যাক্টিস্) প্রশ্ন। জ্ঞানকে মানুষের কর্ম্মজীবন হইতে বিশ্লিষ্ট করার ফলে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইয়াছে শুষ্ক ও পথভ্রান্ত। মানুষ কর্ম্ম করিতে করিতেই বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে। কাজ করিতে করিতেই মানুষ এই জগতের বাস্তব রূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। বস্তুজগৎ যেমন দ্বান্দ্বিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয় মানুষের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনও সেইরূপ দ্বান্দ্বিক নিয়মে নব নব রূপে প্রকাশিত হয়। তাই মানুষের কর্ম্মজীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও প্রসার হয় এবং জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা গভীরতর হয়। সুতরাং মার্ক্সীয় দর্শনের মতে ডায়লেক্টিক্স্ই জ্ঞানবিজ্ঞান। জগতের গতি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারিলেই আমরা যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। সামাজিক ব্যবহারিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে জ্ঞানও প্রসার লাভ করে। মানুষ যখন নৌবানিজ্য আরম্ভ করে তখন হইতেই তাহাদের জলবায়ু, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতির জ্ঞান গভীরতর হইতে আরম্ভ করে। খনি-খনন কার্য্যের প্রসার লাভ ঘটার ফলেই খনিজবিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। সেইরূপ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান প্রভৃতির প্রসার লাভ ঘটিয়াছে।

সুতরাং এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে মানুষের সামাজিক ব্যবহারিক জীবন যত গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে মানুষের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানও তত গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। লেনিন বলেন যে মানুষ, সামাজিক ব্যবহারের ফলেই বাস্তব বিশেষের সঙ্গে সামান্যের যোগ উপলব্ধি করে, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, ঐক্য ও বিভিন্নতার ধারণা লাভ করে এবং সংখ্যা গুণ বস্তুপরিমাণ প্রভৃতির ধারণায় উপনীত হয়। প্রত্যক্ষীভূত জগতের বাস্তবরূপ সম্বন্ধে মানুষ জ্ঞান লাভ করে, সামাজিক ব্যবহারের সাহায্যে। এবং এই সামাজিক ব্যবহারের ফলেই মানুষ নৈয়ায়িক জ্ঞান লাভ করে। যে সব দার্শনিক বলেন যে নৈয়ায়িক জ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব জ্ঞান হইতে বিভিন্ন এবং উচ্চস্তরের তাঁহারা নৈয়ায়িক জ্ঞানকে সামাজিক ব্যবহারিক জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখেন। প্লেটো, ডেকার্ট, স্পীনোজা, লাইবনীজ, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিক মনে করেন যে নৈয়ায়িক জ্ঞান একটি উচ্চস্তরের জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের কোনও আন্তরিক যোগ নাই। এইরূপ ধারণার কারণ এই যে এইসব দার্শনিক ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অনেক দার্শনিকের মতে নৈয়ায়িক জ্ঞান চিরন্তন এবং নৈয়ায়িক ধারণা সমূহ অপরিবর্ত্তনীয়। ইঁহারা মনে করেন যে পরিবর্ত্তন অথবা গতি যে সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞান নৈয়ায়িক জ্ঞানের পরিপন্থী ও অবাস্তব। তাই ইলিয়াটিক্ দার্শনিকগণ গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ডায়লেকটিক চিন্তাধারার মতে নৈয়ায়িক ধারণাসমূহেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।' মানুষের সামাজিক কর্ম্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও প্রসার লাভ করে এবং নৈয়ায়িক ধারণাও এই পরিবর্ত্তনের ফলে পরিবর্ত্তিত হয়।

লেনিন, কি প্রকারে জ্ঞান গভীর হইতে গভীরতর হয়, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে আমাদের সংবিদের উদ্ভব হয়। তৎপরে আমরা সংবিদসমূহের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করি, ইহার পরে আমাদের গুণের ধারণা জন্মে এবং আমরা উহার সংজ্ঞা প্রদান করি। তাহার পরে আমাদের সংখ্যার ধারণা জন্মে। ইহার পরে আমাদের একত্ব, পার্থক্য, মূলবস্তু, সারসত্তা প্রভৃতির ধারণা জন্মে। জ্ঞানের এইসব ধাপসমূহ মন হইতে বস্তুর অভিমুখী হয় এবং ইহারা ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং জ্ঞান এই প্রকারে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অগ্রসর হয়। বিচ্ছিন্ন সংবিদসমূহের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া জ্ঞান ভাবরাজ্যে উপস্থিত হয়। উহা ক্রমে ভাবসমূহের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি করে এবং উহারা কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা জানিতে পারে। এবং মানুষ তাহার ধারণাসমূহের সত্যতা ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত করে। মানুষের জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারার ফলেই

দর্শনে আসিয়াছে ভাববাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং জ্ঞানের দ্বান্দ্বিকগতি অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে জ্ঞানের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সুতরাং মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ মনে করেন যে বস্তুবাদের সাহায্যে এবং সামাজিক ব্যবহারিক জীবনকে জ্ঞানের সত্যের নির্ণায়ক মনে করিলে, আমরা জ্ঞানের যথার্থ রূপ কি তাহা জানিতে পারি।

প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান যে তাহার সামাজিক সমাবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একটি অশিক্ষিত লোক একটি বস্তুকে যে দৃষ্টিতে দেখে, একজন শিক্ষিত লোক সেই বস্তুকেই অন্য দৃষ্টিতে দেখে। একটি বালকের কাছে যাহা কেবলমাত্র একটি খেলার জিনিষ তাহা একটি বয়স্ক ব্যক্তির নিকট অত্যাবশ্যক বস্তু হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানের গভীরতার দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ ও ধারণা রূপায়িত হয়। তাহা ছাড়া আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান গভীর হইতে গভীরতর হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞানের আমরা উত্তরাধিকারী এবং আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের স্বরূপ বহুলাংশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের লব্ধজ্ঞান দ্বারা নির্ণীত। ইন্দ্রধনু দেখিয়া অথবা বিদ্যুৎএর চমক দেখিয়া আদিম মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হইত। কিন্তু আমরা এখন ঐ সব দেখিয়া সেইরূপ অভিভূত হই না। তাহার কারণ আমাদের জ্ঞানের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। আধুনিক সমাজজীবন পূর্ব্বের সমাজজীবন হইতে বহুল অংশে উন্নততর। সেইজন্য আধুনিক মানুষের জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা অধিক। তাই মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পশ্চাতে আছে আধুনিক সমাজের ও পূর্ব্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা। আমরা কয়লার ব্যবহার জানি, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কয়লার ব্যবহার জানিতেন না। সুতরাং কয়লা সম্বন্ধীয় আমাদের জ্ঞান, তাঁহাদের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন ও গভীরতর। দার্শনিকগণ বহুসময় ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের দর্শন হয় অবাস্তব। মানুষের অভিজ্ঞতা, ধারণা, চিন্তা প্রভৃতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহও সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা নির্দ্ধারিত। সুতরাং সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে মানুষের জ্ঞানকে ঐতিহাসিক এবং বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে দেখা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সামাজিক ব্যবহার দ্বারাই জ্ঞানের সত্য যাচাই করিয়া নিতে হইবে। কিন্তু এই সামাজিক ব্যবহার যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। ফলে মানুষের জ্ঞানও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। কোনও সত্যকেই চিরন্তন মনে করা অনাবশ্যক। প্রত্যেক সত্যই আপেক্ষিক এবং প্রত্যেক আপেক্ষিক সত্যের সাহায্যেই আমরা চিরন্তন সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হই।

আমরা জগতের দার্শনিকদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। একদিক দিয়া দেখিলে দার্শনিকদিগকে আমরা চিরন্তন সত্যের সমর্থক ও আপেক্ষিক সত্যের সমর্থক, এই দুইভাবে বিভক্ত করিতে পারি। প্লেটো, ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কাণ্ট প্রভৃতি প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ চিরন্তন সত্যের সমর্থক। ইঁহারা মনে করেন যে সত্যের রূপান্তর ঘটে না। প্লেটো বলেন যে প্রজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অদৃশ্য সার্ব্বিক সত্যের স্বরূপ জানিতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ ইহা পরিবর্ত্তনশীল। ডেকার্ট বলেন যে, যে ধারণা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন ও সুস্পষ্ট তাহাই সত্য। স্পিনোজা মনে করেন যে, যে সব ধারণার ভিতরে সামঞ্জস্য আছে তাহারাই সত্য। তিনি আরও বলেন যে সত্যজ্ঞান ও বাস্তব জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। কারণ চিন্তাজগৎ ও বাহ্যজগৎ দুই সমান্তরাল সরলরেখার ন্যায়। লাইবনিজও মনে করেন যে নৈয়ায়িক-চিন্তার জগৎ দৃশ্যমান জগৎ হইতে বিভিন্ন। কাণ্ট আবশ্যিকতা ও সার্ব্বিকতাকে সত্যের নির্দ্ধারক মনে করেন। হেগেলও স্বাশ্রয়ী পদ্ধতি (আপ্রায়রাই মেথড) অবলম্বন করিয়া বাস্তব জগতের ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব চিরন্তন-সত্যের সমর্থক দার্শনিকগণ মনে করেন যে নৈয়ায়িক চিন্তা অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে এবং ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অন্তর্নিহিত যোগ নাই। ইঁহারা মনে করেন যে প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য নহে! নৈয়ায়িক জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা চিরন্তন সত্যকে জানিতে পারি। তাই চিরন্তন সত্যসমর্থক দার্শনিকগণ দার্শনিক সত্যকে গাণিতিক সত্যের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কাণ্ট বলেন যে নৈয়ায়িক জ্ঞানের মূল হইল প্রজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের মূল হইল বস্তু। ইহাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও যোগ নাই।

অন্যদিকে আপেক্ষিক সত্যের সমর্থকগণ বলেন যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাহিরে অন্যকোনও জ্ঞান নাই। লক্, বার্কলি, হিউম প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানকেই চরমজ্ঞান বলিয়া মনে করেন। লক্ বলেন যে, আমরা যখন ধারণা-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য অথবা অসামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি, তখনই আমাদের জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য। বার্কলি বলেন যে, যে সমস্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান ও ধারণাসমূহ সর্ব্ববাদীসম্মত তাহাই সত্য। হিউম বলেন যে আমাদের কোনও চিরন্তন সত্যের জ্ঞান নাই। আমরা পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রত্যক্ষের ও ধারণার ভিতরে যে সব যোগসূত্র দেখিতে পাই সেই সব যোগসূত্রকেই জগতের নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লই। আমরা যখন পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই যে কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ অথবা ধারণা অন্য একটি বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ বা ধারণার পূর্ব্বগামী তখন আমরা মনে করি যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যক্ষ বা ধারণা কারণ, এবং পরবর্ত্তী প্রত্যক্ষ বা ধারণা কার্য্য। সুতরাং হিউমের মতে

কার্য্যকারণের ধারণা আমরা বস্তু জগতের জ্ঞান হইতে লাভ করি না। তিনি বলেন যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। সুতরাং হিউম অবিশ্বাসবাদী দার্শনিক। অবিশ্বাসবাদের শেষকথা হইল এই যে জগতে কোনরূপ চিরন্তন সত্য নাই। গ্রীসের অবিশ্বাষবাদী প্রোটাগোরাস প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই মতের সমর্থক। ইহারা বলেন যে জগতে কোনরূপ চিরন্তন সত্য নির্দ্ধারক নৈয়ায়িক জ্ঞান নাই। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজের জ্ঞানদ্বারা সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করে।

অধুনিক জগতে জেমস্, ডিউই, শীলার প্রমুখ বৈষয়িক (প্রাগমেটিক্) দার্শনিকগণও অবিশ্বাসবাদী দার্শনিক। এই দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে একচেটিরা ব্যবসায়ের ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের ফলে। ইহারা বলেন যে জগতে চিরন্তন সত্য বলিয়া কিছু নাই। বস্তু-জগতের সঙ্গে জ্ঞান-জগতের সামঞ্জস্যের দ্বারা সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ইহাদের দর্শন ভাববাদ ও বস্তুবাদ এই উভয়েরই পরিপন্থী। ইঁহারা বলেন যে অভিজ্ঞতার সাহায্যে চিন্তার অথবা ধারণার সত্য নির্ণয় করিতে হইবে। কোন বিশেষ ধারণা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে। যদি কোন ধারণাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সুফল লাভ করি অর্থাৎ আশানুরূপ ফল পাই তাহা—হইলে সেই ধারণা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে ধারণা কার্য্যকরী অর্থাৎ আশানুরূপ ফল দেয় তাহাই সত্য। ইঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারণা ব্যক্তিবাদী ও স্বতন্ত্রবাদী। সত্যধারণা কার্য্যকরী সত্য, কিন্তু ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে যাহাই কার্য্যকরী তাহাই সত্য। ফ্যাসীবাদী দার্শনিক পাপিনি প্রভৃতি এই বিষয়বাদের (প্রাগমেটিজম্) সমর্থক। ইনি বলেন যে সত্য চিরন্তন নহে। তুমি, তোমার বিশ্বাসকে যদি জনসাধারণের বিশ্বাসে পরিণত করিতে পার তাহা হইলেই তোমার বিশ্বাস সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং তুমি যাহাতে বিশ্বাস কর সেই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়া প্রচারের সাহায্যে ঐ বিশ্বাসকে জনসাধারণের বিশ্বাসে পরিণত করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলেই তোমার বিশ্বাস সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। ইঁহাদের মতে প্রচারের সাহায্যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করা যাইতে পারে। ফ্যাসীবাদীগণ মনে করেন যে জনসাধারণ যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, তাহারা অজ্ঞ, সুতরাং প্রচারের সাহায্যে যেকোনও ধারণাকে তাহাদের কাছে সত্য বলিয়া চালান যাইতে পারে। ইটালিতে এবং জার্ম্মানীতে, কি ভাবে এই দার্শনিক মত প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত।

মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে চিরন্তনবাদ সমর্থক এবং আপেক্ষিবাদ সমর্থক দার্শনিকগণ সত্যের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ হইল এই যে এই দার্শনিকগণ সামাজিক ব্যবহারকে সত্যের নির্ণায়ক মনে করিতেন না। ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ-

জ্ঞানের সঙ্গে যে নৈয়ায়িক জ্ঞানের অভেদ্য সম্বন্ধ তাহা এই সব দার্শনিকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বস্তুজগতের যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় সামাজিক ব্যবহার দ্বারা। কাজ করিতে করিতেই আমরা সামান্য ও বিশেষ, কার্য্য ও কারণ, একত্ব ও বহুত্ব, ঐক্য ও পার্থক্য প্রভৃতি নৈয়ায়িক ধারণায় উপনীত হই। চিরন্তন সত্য সমর্থক দার্শনিকগণ নৈয়ায়িক ধারণার সত্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিশেষ কোনও স্থান দেন নাই। অন্যদিকে আপেক্ষিক সত্য সমর্থক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নৈয়ায়িক জ্ঞানের ভিত্তির উপর কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু মার্ক্‌সীয় দ্বন্দ্ববাদ এই দুইরূপ জ্ঞানের মধ্যে যে ঐক্য বর্ত্তমান সেই ঐক্যের উপর জোর দিয়াছেন।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকদের মতে যে জ্ঞান আপেক্ষিক তাহাই এক হিসাবে চিরন্তন এবং যাহাই চিরন্তন তাহাই অন্য হিসাবে আপেক্ষিক। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যাহা এক যুগে সত্য বলিরা গৃহীত হয়, পরবর্ত্তী যুগে নূতন সত্যের আবিষ্কারের ফলে উহা পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধতর স্তরে উপনীত হয়। জ্ঞানরাজ্যের কোনও বিশেষ স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা বলিতে পারি না যে আমরা জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছি। জ্ঞানের প্রসারের ফলে যে জ্ঞান অস্বীকৃত হয় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। প্রত্যেক অপরিণত জ্ঞানের ভিতরে চিরন্তন জ্ঞানের বীজ লুক্কায়িত থাকে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ফলে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণবাদ মিথ্যা হইয়া যায় নাই। আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক মতের ভিতরে নিউটনের বৈজ্ঞানিক মতের সত্য গৃহীত হইয়াছে। যে সত্য কোনও যুগোপযোগী তাহা ঐ যুগে চিরন্তন সত্য, কিন্তু সমগ্র জ্ঞানের দিক হইতে দেখিতে গেলে উহার সত্য আপেক্ষিক। আপেক্ষিক সত্যের ধাপ অতিক্রম করিতে করিতেই আমরা চিরন্তন সত্যের সন্ধান পাই। মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাববাদের এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদের মধ্যে যে আংশিক সত্য লুক্কায়িত ছিল তাহাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে সমন্বিত হইয়াছে। এই দার্শনিকদের মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ধাপে ধাপে আমরা আংশিক জ্ঞানের স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করি। ইঁহাদের মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই জ্ঞানের ও সত্যের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের একটি প্রধান সমস্যা হইল বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা। আমরা দেখিয়াছি যে প্রজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের মতে জ্ঞানজগৎ বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ একটি অতি-প্রাকৃতিক জগৎ। ইঁহাদের অনেকেই বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সার্ব্বিক রূপের সন্ধান

দিতে পারে না। উহা সার্ব্বিক জ্ঞানের অপূর্ণ ছায়ামাত্র। স্পিনোজা অবশ্য বলেন যে ভাবজগৎ ও বাহ্যজগৎ (চিন্তা ও প্রসার) দুইটি সরলরেখার ন্যায়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই মত অনুসারে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে চিন্তাজগতের কোনও আন্তরিক সম্বন্ধ নাই। এই ধারণা স্বভাবতঃই আসে যে বিশ্বস্রষ্টা যদিও ভাব জগৎকে ও বস্তু জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তথাপি তিনি এই দুই জগৎকে এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার জন্য উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান।

বার্ক্লী প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন যে জ্ঞানের প্রশ্ন সমাধান করিতে বাহ্য জগতের সঙ্গে ভাব জগতের সম্বন্ধের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা অনাবশ্যক। কারণ প্রত্যক্ষের বাহিরে বস্তুর কোনও অস্তিত্ব নই। সুতরাং প্রত্যক্ষসমূহের ও ভাবসমূহের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ আছে, উহা জানিতে পারিলেই আমরা জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে পারি। অজ্ঞেয়বাদী হিউমও বলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা জানিতে পারিলেই আমাদের জ্ঞানের সমস্যা সমাধান করা হয়। বাহ্য বস্তুর স্বরূপ আমরা জানি না। লক্ ও কান্ট বলেন যে বাহ্যবস্তু হইতেই আমাদের সংবিদের উদ্ভব। কিন্তু ইহাদের মতেও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মনোজগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা নহে। আমাদের প্রত্যক্ষসমূহের ও ধারণাসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান সেই সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করাই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা। বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানগম্য নহে। হেল্ম্হোল্জ্, প্লেখানভ্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত এই যে আমাদের ভাবজগৎ বাহ্যজগতের চিত্রলিপি স্বরূপ। বাহ্য জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, প্রত্যক্ষ ও ভাবসমূহের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এইসব দার্শনিকদের মতও ভাববাদী। কারণ ব্যবহারের সাহায্যে ইঁহারা বাস্তবজ্ঞানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পান নাই। মাক্, অ্যাভেনেরিয়াস্, পঁয়াকারে ব্যাগ্ডানভ্, প্রভৃতি দার্শনিকগণও হিউমের ও কান্টের মত সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারাও জ্ঞানজগৎকে বস্তুজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

যান্ত্রিক বস্তুবাদ যদিও বলে যে বাহ্যবস্তুর ও শরীরের সঙ্গে মনোজগতের সম্বন্ধ বর্ত্তমান তথাপি ইহা জ্ঞানের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ কি তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। যান্ত্রিক বস্তুবাদীদের মতে মন অক্রিয়, ইহা কেবলমাত্র মস্তিষ্কক্রিয়ার ছায়ামাত্র। অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীদের মতে আমাদের ভাবসমূহ বস্তুসমূহ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায়, ঐ দুই জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। এই দার্শনিকগণও মনকে অক্রিয় মনে করেন। ফয়ারবাক্ মনকে সম্পূর্ণ অক্রিয় মনে না করিলেও, তিনিও ভাববাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের

সাহায্যেই আমরা নৈয়ায়িক জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু মার্ক্‌স বলেন যে ফয়ারবাক্‌ অনুনিবেশশীল (কণ্টেম্‌প্লেটিভ্‌) দার্শনিক হওয়ায় তিনিও জ্ঞান জগতের সঙ্গে বাহ্যজগতের সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন নাই।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে দ্বান্দ্বিকপদ্ধতি অবলম্বন করিলেই জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ জ্ঞানকে সামাজিক ব্যবহার হইতে বিশ্লিষ্ট করার ফলে, তাঁহারা জ্ঞানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। এঙ্গেলস বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতরেই নৈয়ায়িক জ্ঞান নিহিত এবং জ্ঞানজগৎ বাস্তব জগতের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কিন্তু মার্ক্‌সীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইঁহার মতে জ্ঞানের মূলে আছে মনের সঙ্গে বস্তুর ঘাতপ্রতিঘাত। মন সক্রিয় এবং জ্ঞান দ্বারা ইহা বস্তু জগৎকে পরিবর্ত্তিত করে। মনের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংঘাতের ফলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সামাজিক ব্যবহারের ভিতরে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্ম সংযোজিত হইয়া বস্তুকে পরিবর্ত্তিত করে এবং এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই হয় প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব। জ্ঞান তাহার ক্রিয়াশীলতার দ্বারা বস্তুজগতের স্বরূপ, তাহার উদ্ভব ও গতি সম্বন্ধে অবহিত হয়। সামাজিক ব্যবহার দ্বারাই জ্ঞানের সঙ্গে বস্তুর আন্তরিক যোগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান একপ্রকার বিশেষ কর্ম্ম, সামাজিক ব্যবহারের উন্নতির ফলে জ্ঞানেরও উন্নতি ঘটিয়া থাকে এবং বস্তু সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান অর্জ্জিত হয়। ফলে যুগেযুগে বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া থাকে। তাই মানবমন নবনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া গভীরতর সত্যের পথে অগ্রসর হয়। সুতরাং মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ মনে করেন যে ডায়লেকটিক পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে আমরা সত্যের স্বরূপ জানিতে পারি না। জ্ঞানের সঙ্গেই বস্তুর যোগ অভেদ্য এবং সামাজিক ব্যবহারদ্বারাই এই যোগ স্থাপিত হয়। সেইজন্যই সত্যজ্ঞান বস্তুজগতের প্রকৃত প্রতিবিম্ব। ইহাই হইল মার্ক্‌সীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের মত।

মার্ক্‌সীয় দার্শনিকগণ বলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক মত বিভিন্ন। বুর্জ্জোয়া সমাজে ধনিকশ্রেণীর ভাবধারার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ভাবধারার অনতিক্রমনীয় বৈষম্য বর্ত্তমান। ইহার কারণ এই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব। মার্ক্‌স তাঁহার 'ক্যাপিটাল' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে বুর্জ্জোয়া সমাজে বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অর্থোৎপাদন সম্বন্ধে এবং সামাজিক সম্বন্ধের বিষয়ে যে মত প্রচার করেন, তাহা অবাস্তব। সর্ব্বদাই ইহারা সত্যকে রহস্যজালে আবৃত করে এবং এই শ্রেণী, ধর্ম্মের ও রাষ্ট্রের সহায়তায় আপনাদের মতবাদকে সমাজে চালু করে। ইহারা নগ্নসত্যের সম্মুখীন হইতে সাহস করে না। কারণ তাহা হইলে তাহাদের কাল্পনিক মতবাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ অতলজলে ডুবিয়া যাইবে। মার্ক্‌স তাই দেখাইয়াছেন

যে বুর্জ্জোয়া অর্থনৈতিকদের ভূমিকর, সুদ, লাভ, বেতন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় মতবাদ অবাস্তব। ইহারা চাহিদা ও পণ্যের পরিমাণের অন্তর্নিহিত অবাস্তব সম্বন্ধ দ্বারা অর্থ-বিজ্ঞানের মূল সমস্যাসমূহ সমাধান করিতে চাহে। মার্ক্স বুর্জ্জোয়া অর্থনৈতিক মতবাদকে তাঁহার 'ক্যাপিটাল' পুস্তকে খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা পরের অধ্যায়ে মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বুর্জ্জোয়াশ্রেণী তাহাদের স্বার্থোপযোগী দার্শনিক ও রাষ্ট্রিক মতবাদ প্রচার করিয়া থাকে এবং মনে করিতে চাহে যে তাহাদের মত চিরন্তন সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত।

অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে। ইহারা নগ্নসত্যের সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করে না। কারণ ইহারা জানে যে বাস্তব সত্যের রূপ মানুষ জানিতে পারিলেই সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে। শ্রমিক শ্রেণী তাই বস্তুউৎপাদন সামাজিক সম্বন্ধ ও রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বাস্তব সত্য কি তাহা সকলকে জানাইবার জন্য প্রয়াসী। ইহারা জানে যে যদি জনগণকে তাহারা সত্যের নগ্নরূপ জানাইতে পারে তাহা হইলেই তাহাদের শ্রেণীস্বার্থরক্ষা হইবে এবং বিপ্লবের পথে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিবে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে না পারিলে ধনিকসমাজের ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূত হইবে না এবং মানবের কল্যাণ সাধিত হইবে না। তাই মার্ক্সীয় দার্শনিকগণ শ্রমিকদিগকে বিপ্লবী করিবার জন্য ধনিক সমাজের নগ্নরূপ জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাদের জ্ঞান সামাজিক ব্যবহার দ্বারা নির্দ্ধারিত। সেইজন্যই ইহারা সত্যের বাস্তবরূপ কি তাহা জানে।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার রূপরস সাধনা

[ভাস্কর্য্য]

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

বাংলার রূপরস সাধনের বিচিত্র অধ্যায়গুলি অতি ধীর ও গভীরভাবে অধ্যয়ন প্রয়োজন। এর ভিতর একটা সম্পূর্ণতা আছে—সৌন্দর্য্যের গমককে ছিন্ন করে এদেশের রচনা আত্মঘাতী হয়নি।

ভারতের নানা প্রদেশে ভারতীয় রম্যকলার মনোহর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যা এক জায়গায় নেই—অন্য জায়গায় কল্পিত হয়েছে। ফলে সমগ্র ভারতের রচনাকে সমাহৃত না করলে ভারতের রূপ-সাধনার পরিপূর্ণ বর্ণ বিচারই সম্ভব হয় না। এলোরা, এলিফেন্টা, মহাবলিপুর, খাজুরাহো ও যবদ্বীপ ও হয়শালার রচনা প্রদক্ষিণ করে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটা ধারণা জন্মে। এসব রচনা এক একটি ভূখণ্ডের বিশেষত্বকে উদ্ঘাটিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলেও এসবের ভিতর কোন একটির একটা পরিপূর্ণ প্রকাশের সরল সীমান্ত পাওয়া কঠিন। এজন্য ভারতীয় ভাস্কর্য্য বিচারে আন্তর্জাতিক সমজদারগণ গোলোযোগে পড়েছেন। কেউ বা এ শিল্পকে "sensuous" বা ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্যের বিকাশক বলেছেন। অন্যেরা একে 'Spiritual' বা অধ্যাত্ম ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছেন। এ দুইটিই অত্যুক্তি হয়েছে, কারণ এ সব রচনায় ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত যথার্থ humanism বা মানবিকতা ধরা পড়েনি। প্রাক্‌ভারতীয় ভাস্কর্য্যচক্রকে এসব সমালোচক বিচার করতেই অগ্রসর হয়নি। এই চক্রের যা মধ্যমণি্য অর্থাৎ বাংলার তক্ষণকলা তা' এদের উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই পারেনি। বাংলার শিল্পকলা মাত্র অল্পকাল হ'ল কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কিন্তু এখনও পূর্ব্বভারতের রচনার ভিতর এর স্থান কোথা তা কেউ বিচার করতে অগ্রসর হয়নি।

বাংলাদেশের কলাই গৌড়ীয় কলা যদিও গৌড়ের প্রভাবের পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত এবং সেদিক হতে গৌড়ীর কলা বলতে সমগ্র প্রাক্‌ভারতীয় রসসৃষ্টি বোঝায়। জাতির বিরাট অভ্যুত্থানের সময়ই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলার বিশেষ উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। কাজেই এই দেশের মহৎ বা বিরাট যুগের কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট গৌরব যুগ হচ্ছে পাল আমল এবং সেন আমল। এ দুটি আমলের কাল বড় সামান্য নয়। সম্রাট্ গোপালের উত্থানের সময় হচ্ছে অষ্টম শতাব্দী; এবং মদন পালের পতনের সময় হচ্ছে ১১৫৮ খ্রীঃ। সেন আমল লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গেই নিঃশেষ হয়নি তা আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে। মিনহাজের মতে লক্ষ্মণসেন মহম্মদ খিলজির নবদ্বীপ বিজয়ের পর পূর্ব্ববঙ্গে চলে যান। পরবর্ত্তী সেন রাজারা এই অঞ্চলেই রাজত্ব করেন। "পঞ্চচাপা" নামক প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তকের বর্ণনা হতে দেখা যায় মধুসেন নামক রাজা ১২৮৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করে বাংলা দেশের পূর্ব্ব ভাগে রাজত্ব করেন। আদাবাড়ি তাম্র শাসনে দনুজমাধবের রাজত্বের কথা আছে ১২৮৩ খ্রীঃতে। তা ছাড়া ময়নামতীর তাম্রশাসনে ও নাছিরাবাদের তাম্রশাসন হতে বাংলার স্বাধীনতার ক্রমকে আরও বিস্তৃতভাবে দেখা যায়।

এ কয়েকটি শতাব্দীতে বাংলার প্রতিভা অতি উচ্চস্তরে উঠে। পাল আমলের

ভাস্কর্য্য সমগ্র পূর্ব্বভারতে গৌরবস্থানীয়। এ সময় তান্ত্রিক ধর্ম্ম মহাযানবাদের প্রেরণায় একটা বিরাট দেববাদ সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়। হীনযানের বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধজীবনের ঘটনার তক্ষণলীলা সর্ব্বত্র একটি বিস্ময়জনক আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। বুদ্ধগয়া, কুচবিহার ও নালন্দা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রভূত মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এসব মূর্ত্তি অতি কঠিন সঙ্কল্প ও কৃচ্ছ্রধ্যানে মজ্জিত মনে হয়। তীর্থস্থানগুলির আশেপাশে রূপ রচনার এক অসাধারণ সংযম লক্ষ্য করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক ধর্ম্মের ব্যাপক প্রেরণা আসে বিশেষভাবে বাঙালী পণ্ডিতগণ হ'তে। তান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় চিন্তার পরিধি হয় সুদূর বিস্তৃত। সেন যুগে প্রত্যেক চিন্তাকে বা তত্ত্বকে দেবরূপের ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত করা হ'ত। কাজেই এক একটি দেবমূর্ত্তি এক একটি তত্ত্বের দ্যোতক হত। মহাযানবাদ ক্রমশঃ নানা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। পরবর্ত্তী যুগের সে ইতিহাসও তত্ত্বের বিপ্লব ও মূর্ত্তিরচনার ভিতর বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। এসব ভূয়িষ্ঠভাবে ধীমানের কলাচক্রের সাহায্যেই ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়—এ গৌরব বাঙালীরই প্রাপ্য। তিব্বতের দুরূহ দেববাদও বাঙালীর সৃষ্টি। বাঙালীর চিন্তাই বৈচিত্র্য ও বহুত্ব রচনায় ভারতবর্ষে অগ্রণী—অতি প্রাচীন কাল হ'তে। যে ধর্ম্মের প্রেরণায় প্রাক্‌ভারতীয় শিল্পের গৌরবের যুগের সূত্রপাত হয়েছে—সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। ইউরোপীয় কলা-লোচকগণ সে ধর্ম্মের সামান্যও বোঝে কিনা সন্দেহ—অথচ পুঁথি লিখতে এরা এগিয়ে আসেন বার বার। J. C. Trench সাহেব পালকলা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখতে গিয়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মকে বলেছেন "Strange, startling and intricate"। তার কাছে এসব রচনা যে মোটেই ভাল লাগেনি তার প্রমাণ আছে তিনি মুসলমান বিজেতার আক্রমণকে জয়ধ্বনি করেছেন এবং বলেছেন এদের উপস্থিতিতে হিন্দুর এই ধর্ম্ম ও মূর্ত্তিগুলি নাকি উপযুক্তভাবেই চূর্ণীকৃত হয়েছে। যা নিজের কাছে দুর্ব্বোধ্য তাকে ধ্বংস করতে পারলেই অনেক ল্যাঠা চুকে যায় এবং বই লিখাও খুব সহজ হয়।

গোড়াতেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষের যুগ হচ্ছে গুপ্ত আমল। গুপ্ত আমল অলীক ধর্ম্মের পেছনে ছোটেনি। গুপ্ত আমলের স্বাধীনতা ভারতীয় দার্শনিকদের দান। উপনিষদ এক সময় বলেছিল "জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ" জ্ঞান হ'তেই মুক্তি হয়। যে জ্ঞান আত্মবিরোধী এবং শক্তিবাদের পরিপন্থী তার উপর আশ্রয় করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় না। তন্ত্রের একটি বিশিষ্ট দান হচ্ছে শক্তিবাদ। শক্তিবাদ যা কিছু দৃষ্ট হচ্ছে তা দেখে ভয় পায়না এবং ভয় পেয়ে বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। সংসারকে মায়া বলেও তার পাশ কাটায় না। বৈরাগ্যবাদ, অহিংসবাদ, মায়াবাদ দারিদ্র্যবাদকে বাড়িয়ে তুললে বসুন্ধরাকে স্বাধীনভাবে ভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বসুন্ধরা ভোগের কথার আভাষ এক সময় গীতায় কতকটা দেওয়া হয়েছিল। মহাভারতের যুগান্তরকারী ঘটনাগুলি ঠিক ঐতিহাসিক নয়। গীতার ভিতর অনাসক্তি ও সন্ন্যাসবাদের প্রচ্ছন্ন ছায়া থাকলে যুদ্ধোদ্যমের ঘটা তাতে প্রচুর আছে। বসুন্ধরা ভোগের জন্য যুদ্ধও সূচিত হয়। তান্ত্রিক চণ্ডীতে দেবীর নিকট ভক্ত 'রূপ' 'ধন' ও 'যশঃ' চাইতে ইতস্ততঃ করেনি এবং দেবীও সন্ন্যাসিনী বা গৈরিকধারিণী বা অহিংস আভরণে সজ্জিতারূপে কারও কাছে দেখা দেননি। তন্ত্রের চোখে জগৎ বাস্তব ব্যাপার, অলীক নয়। ভোগও সামান্য ব্যাপার নয়। তা দুরূহ সাধনায় যোগের মতই হয়ে পড়ে। এজন্য বাংলায় কুলার্ণবতন্ত্র সংক্ষেপে বলেছে ঃ "ভোগো যোগায়তে সম্যক মোক্ষায়তে চ সংসারঃ" অর্থাৎ সংসারে ভোগই যোগ হয়ে যায় এবং সংসারই হয়ে যায় মোক্ষ। কাজেই এতে চার্ব্বাকসুলভ ঐহিকতা নেই এজন্য তন্ত্রের মহাদেবী ঐহিকতামণ্ডিত নন। তন্ত্র 'ধর্ম্ম' ও 'মোক্ষ'কে শুধু নয়— 'কাম' ও 'অর্থ'কেও গ্রহণীয় বলে বর্ণনা করেছে এবং সেজন্য বৈদিক বিধিগুলো কলিযুগে খাটেনা একথা স্পষ্ট বলে গেছে।

এই শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় সমগ্র ভারতের বৈরাগ্য-পীড়িত শিথিল মাংসপেশীগুলি ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে যায়। নূতন লক্ষ্য ও নূতন উপায়কে গ্রহণ করে ভারত স্বাধীন হয় এবং সমগ্র এসিয়ায় নিজের প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের পালযুগের ইতিহাসে এই শাক্ত ধারা আরও অধিকতর ও ব্যাপকতরভাবে প্রবাহিত হয়ে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটা তীব্র জীগিষা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি জাগ্রত করে তোলে। একান্তভাবে পৃথিবীকে বর্জ্জন করে একটা কল্পিত বায়বীয় স্বর্গকে ধ্যান করে গুপ্ত ও পাল যুগ আশ্বস্ত হয়নি। এক্ষেত্রে ভোগ ও যোগের সমাহার হয়েছে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন হয়েছে। এ রকম একটা সাম্য ও মৈত্রী জগতের আর কোথাও কল্পিত হয়নি।

ফলে এসব যুগের রচনায়-একান্তভাবে অলীক, শুষ্ক ও বৈরাগ্যপীড়িত কোন দেবদেবী রচিত হয়নি। সকলেই হয়েছে সালঙ্কার, সশস্ত্র ও শক্তিগ্রাহী। বাংলাদেশের রচনায় তন্ত্র ও শক্তিবাদের এক নূতন সীমান্তে অগ্রসর হয়েছে।

ঐতিহাসিক তারানাথ সমগ্র ভারতে তিনটি শিল্পরীতির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এ তিনটি রীতি হল যথাক্রমে দেব, বন্য ও নাগরীতি। দেবরীতি প্রচলিত ছিল মগধে—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ হতে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত। বন্যরীতি সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ছিল এবং নাগরীতি তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এরকম মন্তব্যও করা হয়েছে। এর পরে এই তিনটি রীতিরই অধঃপতন হয়। কিছুকাল পরে কতকটা এই তিনটি রীতিকে আদর্শ করে মধ্যদেশ, পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্ব্বাঞ্চলে তিনটি শিল্পচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। মধ্যদেশের নায়ক ছিল বিম্বিসার। বিম্বিসার মগধে জন্মগ্রহণ করেন। এই শৈল্পীয় রীতি অনেকটা

দেবরীতির মতই ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে কলাক্ষেত্র ছিল রাজপুতানা এবং এর অধিনায়ক ছিল শৃঙ্গধর। এর রচনা বন্যরীতির আদর্শেই কল্পিত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের প্রবর্ত্তক ছিল ধীমান—এই শিল্পী ধর্ম্মপাল ও দেবপালের আনুগত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে নবম শতাব্দীতে। এ রীতি নাগরীতির পোষক ছিল।

এ তিনটি রীতির কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অথচ এর ভিতরকার সার্থকতা সুস্পষ্ট না হলে এই প্রাচীন অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকের ভঙ্গিই হয়ে পড়বে অর্থহীন। কাজেই প্রচলিত রচনা পরীক্ষা করে তিনটি রীতির বিশেষত্ব অনুভবের চেষ্টা করা উচিত। দেবরীতি হচ্ছে অপার্থিব সৃষ্টি। তা'তে ইন্দ্রিয়জ সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়নি। শিল্পী সীমার শাসনকে ত্যাগ করে' ঐশীলীলা দীপ্যমানে ইতস্ততঃ করেনি। এলিফেন্টার ত্রিমূর্ত্তির তিনখানি মুখই উন্মনা ও অমানবিক। কোন আলোচক এর "heavy brooding face" ও "drooping eyelids"এর উল্লেখ করেছে। ভৈরবমূর্ত্তিও যেন দুনিয়াকে ছেড়ে এক উর্দ্ধলৌকিক ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হয়েছে। অন্যদিকে 'যক্ষ' ঠিক দেবতাও নয়—অথচ মানুষও নয়। যক্ষের স্থান দেবতার ও মানুষের মাঝখানটা, যক্ষরীতি মধ্যপথ গ্রহণ করেছে। নাগরীতিই এ প্রসঙ্গে বিশিষ্টভাবে আলোচ্য সন্দেহ নেই। নাগরাজের অবস্থিতি হচ্ছে ভূগর্ভের অন্ধকারে—কিন্তু প্রকাশ আলোকে। আলো ও অন্ধকার, মৃত্তিকা ও উর্দ্ধলোককে অধিকার করে এই রীতি বিকশিত হয়েছে। কাজেই কঠিন বাস্তববাদের ভিত্তির উপর এই রীতি অবস্থিত; অথচ এই চক্র উর্দ্ধদৃষ্টি সূর্য্যমুখীর আলোক ও বায়ুর উপভোগে উল্লোল। যক্ষরীতির মত এই রীতি নিছক কাল্পনিক বা অ-মানুষিক নয়। তন্ত্র মাটির দুনিয়াকে সত্য বলেছে এবং মানুষকেও সত্য বলেছে। কাজেই নাগরীতির ভিত্তি বাস্তববাদের উপর রচিত। তাছাড়া নাগকল্পনায় আছে গভীর রহস্যবাদ। গতিশক্তির রূপক হচ্ছে নাগ। তান্ত্রিক শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে কল্পিত এবং কুণ্ডলিনী শুধু মূলাধারে নিদ্রামগ্ন থাকেনা—জ্ঞানের প্রতি স্তরে তা' উর্দ্ধমুখী হয়ে যায় এবং অবশেষে সহস্রারের তুরীয় চক্রকে স্পর্শ করে ধন্য হয়।

কাজেই প্রাক্‌ভারতীয় নাগরীতিতে স্থুল বাস্তবতার সহিত তুরীয় সূক্ষ্মতাকে সঙ্গত করা হয়েছে, উর্দ্ধ ও মধ্যেলোকের মিলন ঘটেছে। এর ভিতর আবার নাগছন্দের নানা ক্রম আছে। এজন্য প্রাক্‌ভারতীয় রচনা বিশ্লেষণ করে বাংলার রচনার বিশিষ্টতা কোথা দেখতে হবে। মৃগনাভিগন্ধে উন্মনা হরিণের মত রহস্যজনক সুরভির পেছনে ছুটে বাঙালী আজ রূপরসরচনায় নিজের কীর্ত্তি দেখতে উৎসুক হয়েও খুঁজে পাচ্ছেনা এটাই পরিতাপের বিষয়।

পালযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত আমল ও প্রাকভারতীয় পাটলিপুত্র হতেই আত্মপ্রভাব

বিস্তার করে। যে যুগে মগধ ও বঙ্গদেশের অধিবাসীরা এক জাতিরূপেই পরিচিত ছিল এবং তাদের ভাষাও ছিল মূলতঃ এক—যদিও প্রাদেশিক Dialect হিসেবে এ দু'টি দেশে প্রচলিত কথিত ভাষার বিভিন্নতা যে ছিলনা তা' নয়। কিন্তু এরকম বিভিন্নতা সব যুগে প্রত্যেক প্রদেশের নানা জায়গায় থাকতে বাধ্য—বর্ত্তমান যুগেও বাংলার কথিত ভাষা নানা আকারে নানা গ্রামাঞ্চলে পুষ্ট হচ্ছে। গুপ্ত আমল ও পাল আমলের মধ্যবর্ত্তীকালে রচিত বাংলাদেশের পাহাড়পুর অঞ্চলের সৃষ্টি আজ সকলকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। পাহাড়পুরেই বাংলাদেশ নিজের রূপের ভাষা ভালরকমে আরম্ভ করেছে দেখতে পাওয়া যায়। তাতে বাংলার নিপুণ কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়েছে সুকঠিন কল্পনার স্তরে এবং বাস্তবতারও অফুরন্ত কুহকে। বাস্তবত্বের এত বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য যে মূর্ত্তিসংগ্রহের বিচিত্রগঠনে ফুটিয়ে তোলা যায় তা ভারতের আর কোথাও কোন শিল্প দেখাতে পারেনি। গুপ্তযুগ যখন নিঃশেষ হয়ে গেল প্রতিভার ক্লান্তি ও অবসন্নতার ভিতর—তখন মানুষের মন বা সে মনের প্রসারিত অসীম স্ফূর্ত্তি নির্ব্বাপিত হয়নি কোথাও। অতিরিক্ত অলঙ্করণ, আবেশ ও সূক্ষ্মতা যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের জন্য প্রস্তুত তখন প্রাকভারতের ইতিহাসে পাহাড়পুর জাগিয়ে তুলল এক বিরাট আন্দোলন। পাহাড়পুরের পটশিল্প এ প্রসঙ্গে যা রচিত করেছে তার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। একান্তভাবে এ শিল্পটিকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট দান বলে অভিহিত করা যায়। জীবনের সমগ্র সম্পর্কগুলিকে হঠাৎ শিল্পী রূপের ছাঁচে ঢেলে তাতে এমন বিচিত্ররস উদ্ঘাটিত করে যে পাহাড়পুরের সৃষ্টি ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে একটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

পাহাড়পুরের পাথরের মূর্ত্তিগুলিতেও প্রাচীন যুগের গণশিল্পের প্রভাব আছে। মূর্ত্তিগুলি গুপ্ত আমলের অভিজাত শিল্পকে কোথাও বা একটা ক্ষুরধার রূপ দান করেছে—কোথাও তাকে অধিকতর রমনীয় লালিত্যে (plastic) মণ্ডিত করেছে। বস্তুতঃ বাংলার সংস্পর্শ পেয়ে ভারতব্যাপী গুপ্তভাস্কর্য্য বহু পরিমাণে রূপান্তরিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। সে রূপান্তরিত সৌন্দর্য্য পাল ভাস্কর্য্যের জটিল সৃষ্টিবিধানে অগ্রসর হয়।

বাংলার ভাস্কর্য্যকে প্রাচীনতার দিক দিয়ে বিচার করলেও তা ছোট হয়ে যায়না। বাঁকুড়ার পোখারনা অঞ্চলে যে মৃন্ময় মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তাতে সুঙ্গ আমলের চিহ্ন আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। আপাততঃ এই মূর্ত্তিটি এবং তমলুকে প্রাপ্ত আর একটি মাটির মূর্ত্তিকে বাংলার আদিতম রচনা বলে অভিহিত করা হয়। এর পরবর্ত্তী দুটি সূর্য্য মূর্ত্তি উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি মালদহে পাওয়া গেছে। এরা কুষাণ যুগের তিলক বহন করছে। বিষ্ণুমূর্ত্তিটি অতি পরিপাটি, গলায় মাল্য, উপবীত, মাথায় চূড়া। কিন্তু শিল্পসৌন্দর্য্যকে পৌরাণিক বা আধুনিক যুগে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে

বিচার করার কোন মানে হয়না। পাহাড়পুর ও পালযুগের রচনার সীমান্তের ভিতর বাংলার রূপসাধনার মন্ত্রকে খুঁজে পাওয়া দরকার।

পাহাড়পুরের রচনার 'বলরাম' মূর্ত্তিতে বাংলাদেশ প্রথম অহল্যা পাষাণীর মত নিস্পন্দ প্রস্তরের ভিতর প্রাণের আবেগ সঞ্চার করেছে। বলরামের আয়তলোচন, মুখর ওষ্ঠ, সঞ্চালিত হস্ত হতে পাথরের কাঠিন্য যেন দূর হয়েছে। আর একটি নরনারীর যুগল মূর্ত্তিতে স্থূলত্বের বাধাকে কর্পূরের মত উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যা মুক্ত করা হয়েছে তা একটা অনির্ব্বচনীয় রসসম্পর্ক। দেহলালিত্যে শিহরিত এ দুটি মূর্ত্তির প্রেম নিবেদন যেন প্রাচীন বাংলার মনোজগৎকে নগ্ন করছে। এর ভিতর কলাগত জটিল বিন্যাস বিষয়টিকে অস্পষ্ট বা আড়ষ্ট মোটেই করেনি। শুধু দেবমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে ঐহিক রস সুস্পষ্ট ফলিত করার পথে একটি বাধা আছে সেটা হচ্ছে এই—দিব্যমূর্ত্তির রচনায় মানবিকতা বহুপরিমাণে মলিন হতে বাধ্য—অথচ কাব্যে ও শিল্পে মানবিকতা (humanism) একটা বড় ব্যাপার। মানবত্বের গণ্ডী বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানব হৃদয়ের সহিত যোগও ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। তাছাড়া মানুষের পক্ষে মানুষকে জানা—মানুষের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার উপায় হচ্ছে কাব্য ও কলা। এজন্য একেবারে দেবচরিত রচনার স্তর হতে না নাবলে রসবৈচিত্র্য উদ্ঘাটন কঠিন হয়ে পড়ে। পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আর এক অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় সৃষ্টি। এ মূর্ত্তিতে যুগলরূপ যে অদ্বৈত তা সৃষ্টির ছন্দই প্রমাণিত করছে, সেজন্য ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হচ্ছে না। এ দুটি মূর্ত্তির সৃষ্টি কৌশলে প্রত্যেকটি মূর্ত্তিকেই অপরটির দিক হতে আপেক্ষিক (relative) করা হয়েছে। এর ভিতর একটিকে অদৃশ্য করলে ভাস্কর্য্যের ছন্দপতন হয়। এ দুটির পদভঙ্গের কারুতা এবং বাহুরক্ষার কৌশল সৌন্দর্য্যের অপরূপ টানে এমন একটি ঐক্যলাভ করেছে যে এর ভিতর বিভেদ কল্পনা অসম্ভব। এ মূর্ত্তি দুটির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হতেই মনে হয় যে রাধাকৃষ্ণ রচনা করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তা হলেও এর মানবিকতা অতি মুগ্ধকর। রাধার দৃষ্টি, কৃষ্ণের হস্ত সঞ্চালন একটা ক্ষুদ্র নাট্য সৃষ্টি করেছে পাথরের নির্ব্বাক বক্ষে, কোন মামুলি মূর্ত্তিরচনার প্রেরণা এতে নেই। এর ভিতর ভাবদীপ্ত গতিশীলতা এত রসপূর্ণ যে মনে হয় শিল্পী প্রাণ দিয়ে এদুটি মূর্ত্তিকে সঞ্জীবিত করেছে। পাহাড়পুরের যমুনা মূর্ত্তিতে একটা প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে উজ্জ্বল ও জীবন্তরূপ দান করতে হয় তা' প্রমাণ করেছে। যমুনার নিবিড় স্নিগ্ধতা, অচপল কমনীয়তা ও ঘনীভূত সৌন্দর্য্যকে শিল্পী জমাট করেছে একই স্তরে—অতি মহার্ঘ সৃষ্টির নিপুণতার হেরফেরে।

পাহাড়পুরের মৃদ্‌ভাস্কর্য্যের বৈচিত্র্যই সমগ্র ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে একটি অপরূপ

অধ্যায়। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এর প্রতিরূপ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ভাস্কর্য্যেই বাঙালী আত্মপ্রকাশ করেছে ভাল করে—এজন্য আজ পর্য্যন্ত বাঙালী এই রম্যকলাটিকে বিশেষ যত্নের সহিত অনির্ব্বাপিত দীপের মত বহু অনিদ্র রজনী ও দিবায় রক্ষা করে' নিজের ক্ষমতা ও শীলতার একটি উৎকৃষ্ট দানকে সম্মানিত করেছে। পাহাড়পুর মৃদ্‌ভাস্কর্য্য বাঙ্গালী-জীবনের একটি মহাকাব্য রচনা করেছে। এ কাব্যে এমন সুনিপুণ আলেখ্য আছে যে প্রাকভারতের আর কোথাও কেউ রচনা করতে পারেনি। এসব শ্রেণীর রচনাকে গণকলা (Folk Art) বলা যেতে পারে। সকল দেশেই গণকলার নমুনা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এ দেশের তীর্থক্ষেত্রসমূহে ছেলেদের খেলনা বা সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যাতে করে বহন করে নিয়ে যেতে পারে এমন দেবমূর্ত্তি রচিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। গ্রাম্যকলায় এরকমের রচনা বিশেষ সমাদৃত হয়ে থাকে। কিন্তু পাহাড়পুরের রচনাকে গ্রাম্যকলার (Peasant Art) অন্তর্গত করা যায় না। সভ্যতাপুষ্ট জটিল জীবনের গমক তাতে আছে। একাধারে তা কৌল (classical) বা অভিজাত কলা এবং গণ ও গ্রাম্যকলা। সহজ কথায় বলতে হয় এটা একটা নূতন রীতি সৌন্দর্য্য রচনার ক্ষেত্রে। এ রীতিটি অতীতের গ্রাম্য ও পৌরস্মৃতির উপর নিজের রূপ সৌধনির্ম্মাণ করে অগ্রসর হয়।

কোন লেখক আপশোষ করেছেন এরকম রচনা আর দেখা যায়নি—পাহাড়পুরে দৃষ্ট হয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। বস্তুতঃ তা ঠিক নয়। বহু পরবর্ত্তী যুগে এ রীতি বাংলাদেশে আবার এক দুর্লভ সৌন্দর্য্য নিয়ে দীপ্ত হয়। তখন পালকলার চরম সৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে—এবং ভারতের জীবনে এসে পড়েছে আর একটি নূতন অভিযান ও সম্পর্ক। এ নূতন অধ্যায়ও সৌন্দর্য্যজগতে বাংলার অমরত্ব ঘোষণা করে।

পাহাড়পুরের পরবর্ত্তী যুগে যে বিরাট সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল প্রাক্‌ভারতে, তাতে বাংলার রচনা কোন্ পতাকা উত্তোলিত করে সে বিচার করা দরকার। না হলে বাংলার রক্ত ও প্রেরণার নির্দ্দেশকে বোঝা যাবে না। বাঙালীর বিশিষ্টতা একটা অলস উক্তি মাত্র নয়। চণ্ডীদাস বা ভারতচন্দ্র যে বাণী বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন—তা একঘেয়ে বা বিশিষ্টতাবর্জ্জিত নয়। বাংলার রূপভাস্করও পাথর খোদাই করে চণ্ডীদাসের রসনির্ঝর উন্মুক্ত করেছে অবিরল ধারে। যে গঙ্গোত্রী হতে বাঙালী কবি ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনি করে রসপ্রবাহিনীকে আহ্বান করে তা' হতে শিল্পীরাও রসসুধা পান করে বিভোর হয়েছে এবং পাথর, ধাতু, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকাকে এমন করে তারই রূপছায়ার ইতিহাস রেখে গেছে। প্রাকভারতীয় শিল্পে বাঙালীর বিশিষ্ট দান বুঝতে হলে বাঙালীর সাহিত্য ও তত্ত্বক্ষেত্রের দানের কথা স্মরণ করতে হবে—কারণ এরূপ দান ভারতের আর কোথাও সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যে উজ্জয়িনীর কালিদাস শেষ কথা বলে যেতে পারেননি—আরও অনেক কিছু

বলার বাকি ছিল। সংস্কৃত ভাষাও প্রাচীন যুগের কবিচক্র ও নাট্যকারদের হাতে চরম রূপ ধারণ করেনি। বাংলার জয়দেবের নিকট সে ভাষা সেতারের ঝঙ্কারে পরিণত হয়েছে এবং সে সাহিত্যের লালিত্য অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে। রূপের অফুরন্ত বর্ণে তা যে রকম নূতন দীপ্তি লাভ করেছে বাংলার কবির হাতে—তা পূর্ব্ব যুগের কবিদের পক্ষে স্বপ্নাতীত ছিল। বাংলাদেশে রূপের ও রসের সকল সম্ভার এসেই এক বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হয়েছে। এজন্যই মুসলমান সম্রাটগণ এদেশকে 'ভূস্বর্গ' নাম দান করে। ভাস্কর্য্যের রূপদীপালীর প্রত্যেক আলঙ্কারিক স্তরে বাংলার সাধনার মহার্ঘ ইতিহাস প্রস্ফুট। দুঃখের বিষয় তা খুব কম লোকই জানে—সে সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে অতি সামান্য! ফলে সকলে একটা বিরাট কিছু প্রত্যাশা করে পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে বা রাজপুতনায়—বাংলা দেশে নয়। এ প্রতীতি একেবারে যে ভ্রান্তিপূর্ণ তা বাংলার রূপরসের বহুমুখী সম্ভার আলোচনা করলে দেখা যাবে।

জননী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

যুবক এবং প্রৌঢ়ের ছোটখাট একটি ভীড়ের উৎসাহ-দীপ্ত চোখের দিকে তাকালেন আদিত্যবাবু—সবার চোখের উপরই চোখ পড়ল তাঁর কিন্তু এদের কেউ যেন তাঁর চোখে ছিলনা। গম্ভীর? হাঁ, আদিত্যবাবু গম্ভীরই—কিন্তু একে কি ঠিক গাম্ভীর্য্য বলা যায়? অন্যমনস্ক! অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন তিনি। ভীড়ের প্রত্যেকটি মানুষ লক্ষ্য করল আদিত্যবাবু যেন অন্যমনস্কই হয়ে গেছেন। আদিত্যবাবু যে অন্যমনস্ক হ'তে জানেন কারো কল্পনায় সহজে তা আসতে চায় না। বিচিত্র কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে মন যাঁর সদাজাগ্রত, তিনি হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে যান কি করে? আশ্চর্য্য!

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বিভূতিবাবু ঘরের এই গুমোটটাকে পরিচ্ছন্ন করে আনবার চেষ্টায় একটু প্রগল্‌ভ হবার চেষ্টা করলেন: "আমাদের ইচ্ছাটাকে আব্দার ভেবেই আপনি তাতে সম্মতি দেবেন জানি। গাছ যে ফল দেয়, ছায়া দেয়, কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করে দেয়না—কিন্তু যারা ফল খায়, ছায়া পায় গাছের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ হবার অধিকার ত আছে—"

প্রবীন উকীল শশধরবাবু এতোক্ষণ যে কি করে নির্ব্বাক ছিলেন তিনি নিজেই বল্‌তে পারেন না—বিভূতিবাবুর কথাটা তিনি লাফিয়ে উঠে লুফে নিলেন: "বড়ো সুন্দর কথাটি বলেছ হে বিভূতিবাবু—" তারপর পেছনে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে অনাবশ্যক বিশ্লেষণ সুরু করলেন: "সহরের ওয়াটার ওয়ার্কস, ইলেকট্রিক সাপ্লাই যা কিছু জনসেবার প্রতিষ্ঠান সবার মূলেইত ইনি। অথচ আমরা এঁর জন্যে কি করেছি!"

এবার আদিত্যবাবু লজ্জিত হলেন: "টাউনহলে আমার পাথরের মূর্ত্তি বসাতে চাচ্ছেন, আমি বেঁচে থাক্‌তেই, এ ত ধারণার অতীত ব্যাপার!"

"আপনার কটন মিলে যে সহরের তিন চারশ' লোক অন্নসংস্থান করছে তা-ও ত আমাদের ধারণার অতীত ব্যাপার!" শশধরবাবুর হাসিতে ঘরটা সরগরম হয়ে উঠ্‌ল।

"ঠিকই বলেছেন শশধরদা—" বিভূতিবাবু আদিত্যবাবুর দিকে তাকালেন: "ওঁদের বার-লাইব্রেরীর ত ধারণা ছিল ওকালতি আর সরকারি চাকরি ছাড়া বাঙালীর আর জীবিকা-সংস্থানের কোনো পবিত্র পথ নেই!"

এবার পেছনের ছেলেরা জমাটভাবে হেসে উঠ্‌ল। অগত্যা শশধরবাবুকে সজোরে বল্‌তে হল: "সত্যি, তাই একসময় ভাবতুম আমরা!"

আদিত্যবাবুর মুখেও হাসির একটু আভাস আবিষ্কার করলেন বিভূতিবাবু কিন্তু তা এতো সূক্ষ্ম যে এ-স্থূল আলোচনার সঙ্গে যেন তার কোনো যোগাযোগ নেই। ইজিচেয়ারের পিঠে হাতের উপর মাথাটা এলিয়ে রেখেছেন তিনি—ধবধবে আদ্দির একটি ফতুয়া গায়ে—তেমন ধব্‌ধবে মুখ, বার্দ্ধক্য তাঁর গায়ের রঙের উপর, উজ্জ্বল চোখের উপর, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের উপর এখনও হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। এখনও আদিত্যবাবু সুপুরুষ। বিভূতিবাবু আবার প্রগল্‌ভ হবার উপক্রম করলেন। কিন্তু আদিত্যবাবুই কথা বল্‌লেন এবার: "আমার জীবন সম্বন্ধেও জান্‌তে চাও বিভূতি—ছোট সহরের বাসিন্দে সবাই যেম্নি জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে তা-ইত আমারও জীবন! ঘটা করে মানুষকে জানাবার মতো ত তাতে কিছু নেই! আর যাদের জানাবে তাদের মধ্যেই ত আমি আছি—তারা ত আমায় দেখ্‌ছে, চেনে, জানে!"

"পুস্তিকাকারে আপনার একটু জীবনী সেদিন বিলি করবারও প্রস্তাব হয়ে আছে কি না!" শশধরবাবু প্রস্তাবটা প্রাঞ্জলভাবে আদিত্যবাবুকে জানিয়ে দিলেন।

"সে-সম্বন্ধেইত বল্‌ছেন উনি—" গলার স্বরে নয় কথাটার গড়নে যতটা বিরক্তি প্রকাশ করা যায় বিভূতিবাবুকে তা-ই করতে হল।

"নিজের সম্বন্ধে কিছুই আমার বল্‌বার নেই—" একটা বিষণ্ণ হাসিতে কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠ্‌ল আদিত্যবাবুর মুখ: "সবাই কাজ করে--আমিও কাজ করছি, হয়ত সে-কাজ

একটু অন্যরকম। হয়ত আমার রক্তমাংসের কণিকাগুলো একটু অন্যরকম—তারাই আমাকে দিয়ে অন্যরকম কাজ করিয়ে নিয়েছে!”

শশধরবাবু ছাড়া সবাই নিঝুম হয়ে পড়ছিল—আর সবাই যখন চুপচাপ তখন শশধরবাবুকেও মনোযোগী হয়ে উঠ্‌তে হল।

“একটা গল্প বলি, শোনো বিভূতি—শশধরবাবুর কাছে ওটা শোনাজানা গল্প হ'বে—কিন্তু তোমাদের কাছে ওটা নূতন—” আদিত্যবাবু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেখানে খানিকটা মরকতনীল আকাশ—সাদা-সাদা খানিকটা মেঘ—দেবদারুগাছের ঘনসবুজ কয়েকটা মাথা ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের দিকেই তাকালেন আদিত্যবাবু—মনে হল, অনেকদিন যেন তাকাননি তিনি আকাশের দিকে—অনেকদিন, অনেক বছর, অনেক যুগ। কবে একবার ছেলেবেলায় তাকিয়েছিলেন তারপর এই আজ তাকালেন।

“ধরো আজ থেকে আশীবছর আগে, যখন কল্‌কাতার রাস্তায়ই মাত্র আটশ' কেরোসিনের বাতি জ্বল্‌ত—ভাব্‌তে পারো এ-সহরের কথা? একটি দিঘীর চারটি পাড় নিয়েই সহর—জমিদারের পতিত কাছারি বাড়িতে আদালত, আর তার গা ঘেঁষে উকীলবাবুদের টিনের ছাউনি দেওয়া বাসাবাড়ি! রেললাইন হয়নি—বন-জঙ্গল ভেঙে পায়ে-চলা পথে যদি দিঘীর পাড়ে পৌছুতে পার—তাহলে ইট-সুরকির মুখ দেখে, চোগা-চাপকানের নিশানায় বুঝ্‌তে পারবে সহরে এসেছ! নবাবী আমল আর বৃটিশরাজের মেক্যানিক্যাল মিক্‌শ্চার খানিকটা—আটপৌরে মোগল দরবারও বলা যায়। তবু জেলার গাঁয়ে-গাঁয়ে এ-সহরেরই নাম ডাক। সহর সম্বন্ধে সম্ভ্রম, ভয়, অবজ্ঞা, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, বিভীষিকা আর কৌতূহলের সীমা নেই।

“অবজ্ঞা, ভয়, বিভীষিকা যা-ই থাক—সিপাহীদের লড়াই খতম হয়ে গেছে যখন সহর ফেঁপে উঠ্‌তে থাক্‌লই। গাঁ থেকে লোক এসে জুট্‌তে লাগল স্থায়ী বাসিন্দে হয়ে। য়ুরোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমেরিকা যারা তৈরী করেছিল, গাঁয়ের এই দুঃসাহসীরা প্রায় তাদেরই মতো। এই যে ছোট্ট নদীটা, সহর যাকে ভুলে আছে—আমার কটনমিলের সঙ্গেই এখন যার আত্মীয়তা—ওটাই তখন এই সহরের রক্তচলাচলের সব সেরা ধমনী ছিল। এই নদীর ধারঘেঁষা গাঁয়ের মানুষদেরই দেখা গেল সহরে আসবার দুঃসাহস।

“সহরে যারা থাকত বৎসরান্তে হয়তো নদীপথে একবার তারা গাঁয়ে ফিরে যেত। তাদের ঘিরে ভীড় জমে যেত তখন গাঁয়ে—কতো জিজ্ঞাসা—কতো সন্ধান—সম্ভ্রম, শ্রদ্ধাও যেমন, তেম্নি ঘৃণা আর অশ্রদ্ধার গোপন জটলাও চল্‌ত পাশাপাশি। কিন্তু সে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার বেশি দিন বেঁচে থাকবার জীবনীশক্তি ছিল না—বেশিদিন তা বাঁচলও না। সহর-প্রবাসীরা গাঁয়ের সমাজের কুলীন হয়েই দাঁড়াল।

"গাঁয়েরই একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এম্নি সহর-প্রবাসী একটি ছেলের সঙ্গে—যার দু'পুরুষ কোতোয়ালির দারোগা। টাকা-পয়সার প্রাচুর্য্য ছাড়াও ছেলেটির আর যা-যা ছিল মেয়েটির তা কিছুই ছিলনা। মেয়েটির ছিল না রূপ, ছিলনা বিদ্যা। ওকেই হয়ত সত্যিকারের গাঁয়ের মেয়ে বলে—গাঁয়ের মেয়ে বল্‌তে আজ হয়ত অন্যরকম বোঝ তোমরা কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে সম্বন্ধে আমার ধারণা ওই মূর্ত্তিতেই সীমাবদ্ধ। ছেলেবেলায় লালপেড়ে ছোট শাড়ি পরে সে মার পেছনে পেছনে ঘুর-ঘুর করে ব্রত করেছে, রান্না শিখেছে, ছোট ভাইবোনদের কোলে-কাঁখে নিয়ে হাঁপিয়েছে। গাঁয়ের ঘোলাজল কাদামাটির মতো গায়ের রঙ, কিন্তু চোখ খুব কালো, গভীর—হয়ত গাঁয়ের আকাশেরই মতো—"

হঠাৎ থেমে গেলেন আদিত্যবাবু—মুখ ফিরিয়ে আন্‌লেন—ইজিচেয়ারের উপর একটু নড়েচড়েও উঠলেন যেন। কিন্তু আর সবাই চুপচাপ। যেন চিত্রে অর্পিত করে দিয়েছে নিজেদের। শশধরবাবুও দু'হাতের পাঞ্জার উপর থুতনি রেখে ঝিমোনো চোখে তাকিয়ে আছেন। আদিত্যবাবু সিলিং-ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে বল্‌তে লাগলেন ঃ

"মেয়ে সুন্দরী নয় বলে সেদিনকার বাপমায়ের মেয়ে-বিয়ের দুশ্চিন্তা ছিলনা—সমাজে মেয়ে ছিল কম—একনমিক্সের ডিমাণ্ড-সাপ্লাই-এর নিয়মে মেয়েদের রূপের কথাটা উপরে উঠ্‌তে পারতনা। কিন্তু কথাটা নীচে পড়ে থাক্‌লেও ব্যাপারটা ত মিথ্যে হয়ে যায়না। মেয়েটি জান্‌ত সে সুন্দরী নয়। দুর্ভাগ্যের মতোই হয়ত মনে হত তার ব্যাপারটা। আরো দুর্ভাগ্য ভাই-বোনও কেউ তার সুন্দর নয়। "তোমার সুন্দর রংটাও যদি আমরা পেতাম, মা—" মাকে বল্‌ত সে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে। "ও রং নিয়ে কি হ'ত তোর, কি বা হয়েছে আমার?" বল্‌তেন মা। হয়ত কিছু হতনা—যেম্নি আছে সে তেম্নি থাক্‌ত। কিন্তু তবু যেন ভালো লাগ্‌ত। "শ্বশুরবাড়ি থেকে সুর-দি এসেছে মা—কী সুন্দর ফুট্‌ফুটে একটা ছেলে হয়েছে—" কথাটা বল্‌তে চোখ থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ত মেয়েটির। মা ধম্‌কে উঠ্‌তেন ঃ "তুই চল্‌লি না কি সুর-দের বাড়ি এখন?" "কাল ছেলেটা নাম্‌তে চায়না আমার কোল ছেড়ে—কি সুন্দর, দেখ্‌তে যদি তুমি—আজ একটু কোলে করে আসি?" মার অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে ছুটে চলে গেছে।

"সে-মেয়ের বিয়ে হ'ল আশাতীত রূপবান এক ছেলের সঙ্গে। শুধু তা-ই নয়, সে-ছেলে সহরে থাকে। তারপর ইস্কুলের পড়া শেষ করে আরো বেশি পড়াশুনো করছে না কি কোথায়! গাঁয়ের লোক হাঁ করে তাকিয়ে রইল, এই মেয়ের ভাগ্যে ছিল এমন রাজপুত্র! গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল মেয়েটির—খুসীতে না কি ভয়ে বল্‌তে পারবেনা—ভালো করে সে তাকাতে পারলনা স্বামীর দিকে—মুখচন্দ্রিকার সময়েও নয়, শুভরাত্রির কোনো মুহূর্ত্তেও নয়।

"বিয়ের পর চলে গেল মেয়েটি শ্বশুরের গাঁয়ের বাড়িতে। মেয়ের মার তখন সুরু হল অগ্নিপরীক্ষা। গাঁয়ের লোকের রকমারি কথার জ্বালায় মাথা ঠিক রাখা তাঁর দায় হয়ে উঠ্‌ল। শ্বশুরবাড়ির কারো মন কি পাবে ও-মেয়ে? ফিরে এসে মায়ের সঙ্গেই থাক্‌তে হবে সারাজীবন। আর সবার কথা যেমন-তেমন, ও-ছেলে এ-মেয়েকে পছন্দ করবে না কি কোনদিন? সহুরে ছেলে—দশটা-পাঁচটা দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে, জান্‌ছে—আর ছেলেও বা কেমন কে বল্‌বে! ঢাকার বাঈজিদের নাচ লেগেই আছে না কি সহরে—সহুরে ছেলেদের মতিগতিই হয়ে যায় অন্যরকম! মা চুপ করে সব শুন্‌লেন।

"গাঁয়ের লোকেরা আবারও অবাক হ'ল যখন মেয়েটি হাসি-হাসি মুখে গাঁয়ে ফিরে এল মাত্র দু'দিনের জন্যে—আর দুদিন পর আবার হাসি-হাসি মুখেই চলে গেল শ্বশুরের সহরের বাড়িতে চার বছরের জন্যে! গাঁয়ের লোকের কৌতূহল কোনো দিকেই পথ খুঁজে নেবার সময় পেলেনা। খবর তৈরী করে উৎসাহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চল্‌ল দিন কয়েক—কিন্তু চার বছর বড় দীর্ঘ মেয়াদ, শেষটায় মেয়েটি সম্বন্ধে নিরুৎসুক হয়ে পড়তে হ'ল সবাইকে।

"মেয়েটি সহরে এলো—সহর তখন চারদিকে গা ছড়িয়ে দিচ্ছে সুরকির সড়কে আর ইটের বাড়িতে—তৈরী হচ্ছে ফৌজদারি আর জেলখানার লাল দালান, গীর্জ্জায় বসান হচ্ছে সাদা পাথর। রাস্তায় বাতি জ্বলে, ঘোড়ার গাড়ি চলে। গাঁয়ের মেয়েটি এ-সহরে এ'ল—এ'ল যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে সত্যি করে বাঁচতে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে তেমন আর অন্ধকার হয়ে আসেনা এখানে সমস্ত মন—ঘুঘুর ডাকে আলস্য ছড়িয়ে পড়েনা দুপুরে—কেমন যেন ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে সময় ছুটে চলেছে এখানে। রাস্তায় অনেক মানুষ—দিঘীর চার পাড়ে অনেক মানুষ—অনেক মানুষের অনেক রকম মুখ! তারা সবাই ত সুন্দর নয়—দু'চারজন হয়ত তার স্বামীর মতো সুন্দর কিন্তু অনেকেই ত সাধারণ, তারই মতো দেখ্‌তে—সহরের সব মানুষই সুন্দর এমন অদ্ভুত ধারণা তবে তার কেন হয়েছিল? সহরে যে তার মতো মানুষের ঠাঁই নেই এমন কথা বা কেন মনে হয়েছিল তার? দিঘীর পাড়ের উকীল, মোক্তার, মুহুরী, পেস্কার, ডাক্তার, দোকানদার—সবই ত গাঁয়ের লোক—সহরে এসেছে, সহরে এসে থাক্‌ছে তার মতো! কেন খাম্‌কা ভয় হচ্ছিল তার?

"চার বছর মেয়েটি গাঁয়ে ফেরেনি—তার মানে গাঁয়ে ফিরতে পারে নি। একটিমাত্র ছেলের বৌকে শ্বশুর-শাশুড়ী প্রথম দু'বছর চোখের আড়াল করতে চাইলেন না—তার পরের বছর ছ'মাস আগে পরে শাশুড়ী আর শ্বশুর মারা গেলেন। সতেরো বছর বয়েসের একটি মেয়ে বাইশ বছর বয়েসের স্বামীর সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়ল। গাঁয়ের বাড়ি থেকে বিধবা জেঠশাশুড়ী এলেন, মা-ও এসে গেলেন দু-চারবার—কিন্তু তাঁদেরও নিজেদের সংসার

আছে—সব সময়ের জন্যে ত তাঁরা এ-মেয়ের সংসার আগ্‌লে থাক্‌তে পারেন না! শেষটায় মেয়েটির নিজের সংসার নিজেকেই বুঝে-সমঝে নিতে হল। আর মাঝ-পথে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ছেলেটিকেও ঢাকা থেকে এ-সহরে এসে বস্‌তে হ'ল একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে। যতটুকু পড়ার সুযোগ আছে ততটুকু পড়তে পারলনা ছেলেটি—যেতে পারলনা কলকাতা এই দুঃখই সে করত স্ত্রীর কাছে। কিন্তু স্ত্রী ভাবত এই ত বেশ আছে তারা—কলকাতা হয়ত আরো চমৎকার কিন্তু এ সহরও ত ভালো। শুধু ভালো নয়, সত্যি বল্‌তে কি, মেয়েটির কাছে এ-সহরের তুলনা ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ীর অকৃপণ স্নেহ পেয়েছে সে এখানে—আদরের তিলমাত্র অভাব ছিলনা কোনোদিন—এখানে এসেই সে জান্‌তে পেরেছে প্রথম অবহেলা-উপেক্ষা পাওয়া, গাঁয়ের সাধারণ একটি মেয়ে মাত্র সে নয়, তাকে ভালোবাস্‌তে পারে এমন মানুষও আছে।—আছে তার স্বামী। কোনোদিন, কোনো সময় স্বামী তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেনি, অনাদর দেখায় নি! কৃতজ্ঞতায় যখন বুক ভারি হয়ে উঠেছে তার—যখন কথা খুঁজে পায়নি মন—হয়ত চোখ ছলছল করে উঠেছে। স্বামী বলেছেন: "ওকি, চোখ এমন হ'ল কেন, ভালো লাগেনা বুঝি তোমার এখানে থাক্‌তে?" তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিয়ে বলেছে মেয়েটি: "তা বুঝি?" তা নয়। তার স্বামীও জান্‌ত তা নয়—শেষে তার মা-ও জান্‌লেন তা নয়। চিঠি দিয়েছেন, লোক পাঠিয়েছেন মা মেয়েটিকে নেবার জন্যে—ও যায়নি। কোথায় যাবে সে স্বামীকে ছেড়ে—আর স্বামীর মতোই সুন্দর এ-সহর ছেড়ে!

"তারপর একদিন মেয়েটির জীবনে সেই মুহূর্ত্ত এলো যা সবচেয়ে আনন্দের আর উৎকণ্ঠার। পাড়ার মেয়েদের কাছেই সে নিঃসন্দেহে জেনে নিয়েছিল খবরটা, নিজের দেহের পরিবর্ত্তন নিজে সে লক্ষ্য করতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্য্য সে-খবর—কি চমৎকার! ছেলে না মেয়ে? ভাব্‌তে সুরু করে দিলে সে। মেয়ে হলে যদি তার মতো দেখ্‌তে হয়—না, না—তার চেয়ে ছেলেই ভালো—আর ছেলে হয়ত তার স্বামীর মতোই হ'বে। কিন্তু তা কি হ'বে? মায়ের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে যে, সে কি মায়ের মতোই হবেনা? ছোট দুই ভাই-এর মুখ মনে হল মেয়েটির—ওরা ত মায়ের মতো নয়! তাহোক, তবু এতো আশা সে করতে পারে না—তার কোল জুড়ে রাজপুত্রের মতো টুক্‌টুকে ছেলে হবে—এ কি কখনো ভাবা যায়? মেয়েটি হয়ত অকারণে তাকিয়ে থাক্‌ত স্বামীর মুখের দিকে—স্বামী হঠাৎ লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করত: "কি?" "না—" বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মেয়েটি আঁচলে মুখ মুছতে সুরু করত।

"ছেলেই হল মেয়েটির। স্বামী বল্‌ত: "তোমার কোলে সূর্য্য ঠিক্‌রে পড়েছে—।" অসহ্য আনন্দে মুখ গুঁজে উত্তর দিত মেয়েটি: "না, তুমি।" এ যেন বিশ্বাস কারা যায়না—

স্বপ্নে আনা যায়না—এ ছেলে যে তারই। এই সাধারণ মাটির ঢেলা শরীর তার কি করে তৈরী করলে এ-সূর্য্য। ভেবে অবাকই হয়ে যেতে হয়, প্রশ্নের মীমাংসা মেলেনা। দুহাত ভরে ঈশ্বর তাকে পুরস্কারই দিয়ে যাচ্ছেন—কি তার যোগ্যতা? পাঁচ বছর পর সেবার পূজোর ছুটিতে স্বামী-ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি গেল মেয়েটি। সমস্ত গাঁয়ের দর্শনীয় হয়ে উঠ্‌ল তারা—বিস্ময় আর প্রশংসার গুঞ্জন উঠ্‌ল গাঁয়ে—মেয়েটির মার বুক আশঙ্কায় দুরদুর করতে লাগ্‌ল।

"ইনটুইশন একেক সময় বিজ্ঞানের চেয়েও অদ্ভুত ফল দেখায়। মেয়েটির মার আশঙ্কা তা-ই করল। মেয়েটির স্বামী কয়েক মাস পরেই মারা গেল। প্রচণ্ড সুখের যেমন কোনো মানে ছিলনা—এই বজ্রপাতেরও কোনো মানে খুঁজে পেলনা মেয়েটি।

আদিত্যবাবু ক্লান্ত হয়েই যেন থেমে পড়লেন। ঠোঁটের উপর একবার জিভ চালিয়ে নিয়ে ঘাড়টা হেলিয়ে দিলেন একটু, তারপর বল্‌লেন: "অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে আছেন—আর একটু থাকুন।"

"আপনারা হয়ত ভাবছেন সর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়েটি শেষে গাঁয়েই ফিরে গেল। কিন্তু তা নয়। আর তাছাড়া সর্ব্বস্ব ত খুইয়ে বসে নি মেয়েটি। ওর কোলে রয়ে গেছে সে-সূর্য্য। শ্বশুরের আর স্বামীর সহরের বাড়িতেই থেকে গেল মেয়েটি। কারো ওজর-আপত্তি টিক্‌লনা—মা বাধ্য হয়ে ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে।

"কোলের শিশুটিকে মানুষ করে তুলবার পণ সমস্ত শরীর মন আচ্ছন্ন করে তুল্‌ল মেয়েটির। হয়ত সে জানেনা কি করে বড় করে তুল্‌তে হবে এ দেবশিশুকে, এ সহরের শিশুকে—কিন্তু জান্‌তে হবে তাকে, শিখতে হবে-নিজের মাটির দেহ তুলে ধরে তাকে দেবালয়ের প্রদীপ করতে হবে। সে এক অদ্ভুত ব্রত সুরু হল মেয়েটির জীবনে। শ্বশুরস্বামীর কাছ থেকে যে স্নেহের ঋণ নিয়েছিল সে, পলে-পলে বিন্দু বিন্দু করে তা শোধ করে দিতে লাগ্‌ল স্বামীর প্রতিভূর পরিচর্য্যায়। শীর্ণ হয়ে এলো তার শরীর কিন্তু শীতল নয়, ভেতরে যেন কিসের একটা আগুন জ্বল্‌ছে, তারই আভায় শুভ্র পবিত্র দীপশিখার মতো দেখাতে লাগল তাকে।

"ছেলেটি বড় হতে লাগ্‌ল—সহর বড় হয়ে চল্‌ল। সহরের আদি জমিদারের কাছ থেকে জমা-নেওয়া শ্বশুরের ভিটাটুকু কায়েমী সত্ত্বে কিনে নিলে মেয়েটি। কাঁচা-ঘরে বর্ষাবাদলে ছেলেটির অসুখ করে—ছোট একটি একতলা পাকা ঘর তৈরী করতে সুরু করে দিলে সে। বাড়ি-তৈরীর হিসেব আর তদ্বির নিজে একা করতে লাগ্‌ল। নিজের উপর একটা বিশ্বাস ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে তার মনে। তার দেহের অণুপরমাণু যখন সৃষ্টি করতে পারল এই দেবশিশুকে—তার প্রতিষ্ঠার মন্দিরও সে তৈরী করতে পারবে।

তৈরী হ'ল পাকা ঘর, তারপর ফুলের বাগান, ফলের বাগান। সহর সহরের মতো হয়ে উঠ্‌ছিল—বাড়িটিও সহরের মতো হয়ে উঠ্‌ল।

"স্কুলের পড়া শেষ হল ছেলেটির—তারপর কলকাতায় কলেজের পড়া! সেই কলকাতা যেখানে গিয়ে পড়তে পারেনি মেয়েটির স্বামী। দেবশিশুকে কোলছাড়া করে যেতে দিল মেয়েটি কলকাতায়। সহরের ছেলে সহরেইত যাবে—শ্রেষ্ঠ সহর কলকাতাইত তার নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবার জায়গা! গাঁয়ের মেয়েটি একা বসে বসে পাহারা দিতে লাগ্‌ল সহরের এ নিঝুম পুরী। দণ্ড পল প্রহর গুনতে লাগ্‌ল, কবে চারবছর শেষ হবে।

"চারবছর শেষ হল—কিন্তু তার সঙ্গে শেষ হয়ে এলো মেয়েটিরও জীবন। আমি যে-বছর বি-এ পাশ করে এলাম, সে-বছরই মা মারা গেলেন—"একটা ভারি পাথরের মতো গলায় কথাগুলো বলে চুপ করে গেলেন অদিত্যবাবু।

পুতুলের মতো হঠাৎ নড়ে উঠে শশধরবাবু বল্‌লেন: "আপনার মা!"

বিভূতিবাবু মুখ তুল্‌লেন না: "আগেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম!"

"আমার মূর্ত্তিস্থাপনের কোনো মানে হয়না বিভূতি," কোন অতল স্তব্ধতা থেকে যেন উঠে এলেন আদিত্যবাবু: "আমি যা করেছি দেখ্‌ছ, তা না করে আমার উপায় ছিলনা!"

"আপনার মার একটা ছবি পাব কি?" বিভূতিবাবু সশ্রদ্ধ চোখে আবেদন জানালেন।

"মার কোনো ছবি নেই—ছবি তুল্‌তে দেননি কোনদিন—দেখতে ভালো ছিলেন না বলে"—আদিত্যবাবু হেসে উঠ্‌লেন।

শ্রোতার দলের মনে হল তাদের গায়ে যেন বিদ্রূপের চাবুক চল্‌ছে।

গান্ধীজি ও অহিংসা

নারায়ণ চৌধুরী

সত্যে উপনীত হওয়ার দুই প্রক্রিয়া: এক, যে-আদর্শে আমার অটুট আস্থা তাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করে তার অভ্রান্ততা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া; আরেকটি উপায় হলো, তাকে অস্বীকার করে তার ঠিক বিপরীত আচরণের মধ্যে দিয়ে পরিশেষে সেই অনাদৃত সত্যেই আবার ফিরে আসা। প্রথমোক্ত পথ আচরণমূলক,

দ্বিতীয়টি অনাচরণের পথ। একটির প্রকৃতি পজিটিভ; অপরটির নেগেটিভ। মনে হয় শেষোক্ত পথেই বোধ হয় সত্যের মহিমা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। হয়ত আদর্শের অস্বীকৃতি ও তজ্জনিত ভ্রান্ত পথ অনুসরণের ফলে দুঃখ ও বেদনার মধ্যে দিয়ে অনেকখানি দাম দিতে হয়; কিন্তু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে একবার যদি সত্যের নাগাল পাওয়া যায় তা হলে তা অন্তরে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে থাকে; সত্যের পূর্ণ প্রকটিত রূপ আর নিষ্প্রভ হয় না।

কথাটা হয়ত ঠিক বোঝাতে পারলুম না, কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া রয়ে গেলো। বিষয়টিকে আরও ধরাছোঁয়া ভাবে বিচার করলে বোধ করি এই দাঁড়ায়, গান্ধীবাদ বিশ্বাসীরা গান্ধীজির আদর্শে জীবনের প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে যেমন সত্যকে নিজের জীবনের মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করছেন, তেমনি গান্ধীবাদে যাঁদের আস্থা দুর্বল কিম্বা আস্থা থাকলেও গান্ধীজিপ্রদর্শিত কঠোর সংযমের পথে নিজেকে চালনা করতে ভীত বা অপারগ, বিপরীত আচরণের মধ্যে দিয়ে তাঁদের পক্ষেও ঠিক একই সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব। অবশ্য, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয়েরই মনের মাটি তৈরী থাকা চাই; নিতান্ত স্থূল দেহধারণের সমস্যার বাইরে যাদের চোখ এগোতে চায় না তাদের পক্ষে কোন সত্যেই উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অবিশ্বাসী বলতে আমরা এখানে তাঁদের কথাই বলছি যাঁরা স্কেপটিক, কিন্তু সূক্ষ্মমানসিকতাবর্জিত নয়; কিম্বা আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে মনোবলের যাঁদের অভাব, যাঁরা আরামপ্রিয়, কর্মবিমুখ, কিন্তু তাই বলে ভালোমন্দের বোধশক্তিরহিত নন। এই শ্রেণীর লোকেরা বিপরীত আচরণের মারফৎ যে নিদারুণ দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাই তাঁদের চৈতন্য সম্পাদন করবার পক্ষে যথেষ্ট; সেই দুঃখের চেতনাই তাঁদের ক্ষেত্রে অমোঘ ঔষধ। গান্ধীজির আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ দ্বারাই তাঁরা আরও নিঃসংশয় হন যে গান্ধীজিপ্রবর্তিত সত্য ও অহিংসার পথই এযুগের, তথা সর্বযুগের, একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। শান্তি ও সদ্ভাবে বাস করাই যদি পৃথিবীর মানুষের কাম্য হয়, পরস্পর কামড়াকামড়ি করে শক্তিক্ষয় করা যদি প্রকৃতির বিধান না হয়ে থাকে, তা হলে গান্ধীজি যে কথা একাদিক্রমে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে বলে আসছেন তার অভ্রান্ততা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কেউ অটল বিশ্বাসের পথে এ সত্যকে বিনাদ্বিধায় মেনে নিচ্ছেন; কেউ বিপরীত পথে চলতে গিয়ে নানারকম ঘা খেয়ে তাকে মানতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে শেষোক্ত ব্যক্তির লাভ এই যে বাধ্যতার মধ্যে দিয়ে গোড়ায় যে-সত্যকে সে অস্বীকার করতে চেয়েছিলো তা তার হৃদয়ে এমন দৃঢ়ভাবে গাঁথা হয়ে যায় যে প্রথম ব্যক্তির সত্যোপলব্ধির গভীরতাকেও তা অনেকগুণ ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্বর্গের দৌবারিক জয় আর বিজয় নারায়ণের শত্রুতা করে তিন জন্মেই বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে পেরেছিলো;

পৃথিবীতে মিত্রভাবে থাকলে ফিরতে তাদের সাতজন্ম লাগতো। বিপরীত আচরণকারীদের সত্যদর্শনের প্রক্রিয়াটাও অনেকটা এইরকম।

অনেকেই গান্ধীজির অহিংসার আদর্শকে অবাস্তব মনে করে থাকেন। তাঁদের যুক্তি এই যে মানুষ কতকগুলি মৌলিক রিপুর পরবশ, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের আচরণে সভ্যতা ও শালীনতার অভাব দৃষ্ট হয় না; কিন্তু যখনই স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘটে, এবং স্বার্থের সূত্র ধরে উত্তেজনার অঙ্কুশের সাহায্যে একে অপরকে তাড়না করে, তখনই মানুষের নখরদন্ত বিশিষ্ট আদিম প্রবৃত্তিটুকু মুখোস খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে স্বদেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজনীতিতে এই একই হিংসার স্বরূপ বিভিন্নরূপে প্রকট। সাম্রাজ্যবাদী সর্বগ্রাসী যুদ্ধ থেকে তুচ্ছ সীমানার কলহ পর্যন্ত সমস্তপ্রকার বিতর্কের নিষ্পত্তি আমরা বলপ্রয়োগের সাহায্যে করতেই অভ্যস্ত, কেননা হিংসার দিকেই আমাদের সহজ মনের ঝোঁক। আর সেই হিংসার সংস্কার আমাদের ভেতর একদিন দুদিনের নয়, লক্ষ বৎসরের খাত-বাওয়া উত্তপ্ত রক্তস্রোত উত্তরাধিকারসূত্রে আজও আমাদের ধমনীতে সমান টগবগ করছে।

উল্লিখিত যুক্তির প্রণালীতে কিছুটা সত্য নেই তা নয়, তবে প্রশ্ন হচ্ছে সেইটেই কি একমাত্র কারণ যার জন্যে আমাদের হিংসাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে? পুরুষানুক্রমে বাহিত সংস্কার হয়ত মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই সংস্কারের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে হবে এমন কি কথা? সজ্ঞান প্রচেষ্টা ও স্বভাবের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের কি কোন দাম নেই? অভিপ্রায়ের সাধুতার দ্বারা যদি আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে শোধন করতে না পারবো, তা হলে এতো সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতার অগ্রগতি কি করে সম্ভব হলো? মনে হয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবকে অতিরিক্ত খাতির করতে গিয়ে, আদিম প্রবৃত্তির তত্ত্বটিকে আমরা এমন ক্ষমতা দিচ্ছি যে ক্ষমতা তার প্রাপ্য নয়। মানুষের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের সর্বপ্রকার সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার তারই ওপর ছেড়ে দিতে হবে, এই মনোভাব এযুগের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় পরাজিতের মনোভাবরূপে ধিকৃত হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্যের সাম্যবাদীদের ধারণায়, ন্যায়সঙ্গত আদর্শের জন্যে হিংসার প্রয়োগ অন্যায় নয়। Endsএর যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে যদি নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তবে means ন্যায় কি অন্যায় এই নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে, কেন না উদ্দেশ্যের সততাই সেইক্ষেত্রে উপায়ের সমর্থক। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, এই যুক্তি ধোপে টেকে না। কার্যকরী উপায় হিসাবেও তাকে গ্রহণ করা চলে না। হিংসার পিঠে বৃহত্তর হিংসা এবং তার পিঠে আরও বৃহত্তর হিংসার জন্ম, এই যে যুক্তি এটা নিছক কিতাবী যুক্তি নয়;

ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে তা অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রতিপাদিত। এই নিয়ে এ পর্যন্ত এতো কথা লেখা হয়েছে যে আমরা এখানে ends and means-এর প্রশ্নটিকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে সাম্যবাদীরা ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করলেও তাঁরা এই মূলগত সত্যটি প্রায়ই ভুলে যান যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর গতিপথের নির্দেশদানে হিংসার প্রভাব যেমন কাজ করেছে, তেমনি অহিংসার প্রভাবও কার্যকরী হয়েছে। বরং খতিয়ে দেখলে ইতিহাসের স্তরে স্তরে হিংসার ওপর দিয়ে অহিংসাই ছাপিয়ে উঠেছে দেখা যায়। প্রেমের নীতিই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, (The law of love governs the world—গান্ধীজি)। রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ফরাসী বিপ্লব কিম্বা রুশবিপ্লব যেমন এক একটি নূতন যুগসন্ধির সূচনা করেছে রক্তশূন্য ভাবের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবের অহিংসার বাণী, সক্রেটিশের জ্ঞানযোগ, যীশুখৃষ্টের প্রেমধর্ম, ভারতীয় মধ্যযুগীয় সাধকদের সর্বধর্মসমন্বয়চর্চা, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-লীলা এবং এ যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মহাত্মা গান্ধীর মানব-প্রীতি ও সর্বমানবের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস, তার চাইতে তত্তৎ যুগের সমাজও মানুষের ওপর বেশি ছাড়া কম প্রভাব বিস্তার করেনি। প্রচণ্ড বেগে ধাবমান বিপ্লব-অশ্বের খুরে ইতিহাসের সরণি গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত দেখতে পাই, তাই আমাদের মনে হয় ইতিহাসের জয়যাত্রার অইটেই বুঝি একমাত্র রাজকীয় পথ; রক্তহীন ভাবের বিপ্লব অইরূপ পথে দাগ কেটে কেটে চলে না, কিন্তু মনের ওপর তার ক্রিয়া অপ্রতিরোধ্য। স্থায়িত্বের দিক থেকেও তার প্রভাব সমাজের ওপর অধিকতর সুদূরপ্রসারী, ইতিহাসের এইটেই শিক্ষা।

গান্ধীজি মানুষের প্রকৃতিতে হিংসা ও অহিংসা এই দুটি সংস্কারের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেন, এবং অহিংসার অনুশীলন দ্বারা হিংসাকে জয় করতে বলেন। ভালোয়-মন্দে মেশানো মানুষের স্বভাবে ভালোবাসার প্রবৃত্তি ও আঘাত করার প্রবৃত্তি দুটি ধারায় কাজ ক'রে যাচ্ছে। একটির রাশ যখন আল্‌গা দিই অপরটি প্রসুপ্ত হ'য়ে থাকে; তারই ফলে আমরা যখন ভালোবাস্‌তেই চাই, যখন উন্মত্ত হিংসার বশে পরকে আঘাত করি তখন শুধু হিংসাতেই মেতে থাকতে চাই। সুতরাং প্রয়োজন সজ্ঞান ও চেষ্টাকৃত সাধনার দ্বারা হিংসার প্রবৃত্তির দমন ও অহিংস প্রবৃত্তির উদ্বোধন। মনের মাটির গভীরে অহিংসার শিকড় চালিয়ে হিংসার মূলগুলিকে আলগা আর ঝরঝরে ক'রে ফেলা দরকার, তা না করা পর্যন্ত যতোই কেন না বিজ্ঞানানুশীলন দ্বারা বস্তুগ্রাহ্য জগতের ওপর অধিকারের সীমা প্রসারিত করি, আমাদের প্রকৃতিজয় সম্পূর্ণ হবে না।

অহিংস প্রকৃতির উদ্বোধনে সর্বপ্রকারে কলুষমুক্ত হ'তে হবে। কিন্তু একাজটি সোজা নয়—এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই গান্ধীজির চিন্তাধারা মূলত আবর্তিত হচ্ছে। চিত্ত অবিকৃত

রাখতে পারা বা না পারার ওপরই গান্ধীবাদের সাফল্য অসাফল্য নির্ভরশীল। তাই চিত্তশুদ্ধি গান্ধীবাদে মস্ত বড়ো জিনিষ। গান্ধীজি 'স্বাধীন' কথাটা যখনই ব্যবহার করেন, পরের বন্ধনমুক্তি অপেক্ষা কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ওপরই অধিক জোর দেন। নিজেকে নিজের অনুগত রাখ্‌তে পারার নামই 'স্বাধীন'। ("It is Sawraj when we learn to rule ourselves-গান্ধীজি) যে নিজের প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে না, পারে না চিত্তের কলুষ দূর করতে, তার দরজায় পৃথিবীর সঞ্চিত স্বাধীনতা এনে স্তুপীকৃত করলেও সেই স্বাধীনতা তার হ'য়েই থাক্‌বে, সে তাকে ভোগ করতে পাবে না। গ্লানিযুক্ত মন নিয়ে পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাওয়া যাক্ না কেন, নিজের অশুভ প্রভাব থেকে নিজের মুক্তি নেই, দুশ্চিন্তা ও দুষ্কৃতিরূপ রাহু সর্বদাই পেছন পেছন ধাওয়া করে বেড়াবে। তাই স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় এই যে চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধি অব্যাহত রাখ্‌তে পারলেই আর মার নেই, মনের পবিত্রতার আলোতেই বাইরের পৃথিবী তখন পবিত্র দেখাবে ; মনের সারল্যের টানেই বাইরের পৃথিবী তখন জ্যামিতিক সরল রেখার ন্যায় প্রতিভাত হবে। 'স্বাধীন' কথাটি তখনই মাত্র সার্থক, তখনই তা কেবল ফলপ্রসূ।

এইখানেই গান্ধীবাদবিশ্বাসী মানুষকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়। আচরণে ও বাক্যে অহিংস হওয়া হয়ত কঠিন নয়, কিন্তু মনেপ্রাণে গ্লানিমুক্ত হওয়া বড়ো সহজ কথা নয়। সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করলেও মন থেকে কলুষের জড় বড়ো সহজে নিরাকৃত হ'তে চায় না, মন ঘুরে ফিরে গ্লানির বেড়ের ভেতর আবর্তিত হ'তে থাকে। একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বপ্রকার সাধ্য সংযমে শাসন প্রয়োগ করলে তবে যদি কলুষের জড় মারা যায়। কিন্তু তেমন সংযমের শাসন খুব অল্প লোকেই আয়ত্ত করতে পারে।

এইখানেই, প্রসঙ্গের গোড়ায় যে কথার সূচনা করেছিলুম সেই প্রসঙ্গে ফিরে আস্‌তে হয়। গান্ধীবাদী বলতে ঠিক যাঁদের বোঝায় আমরা তা নই আমি অন্তত নই। যে কারণেই হোক্ (হয়ত খতিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে তা ভীরুতা, নয় স্বার্থপরতা, নয় আলস্য, নয় সঙ্কোচ, নয় এম্নি ধরণের আর কোন কারণ), গান্ধীবাদের সহিত জড়িত কোনরূপ প্রতিষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিক আচরণের সহিত জড়িত হবার সুযোগ আজ পর্যন্ত আমার হয় নাই। বাক্যে ও আচরণে যাই-ই হই, মনে মনে হিংসাবৃত্তিকে আশ্রয় দিই না এমন কথা বল্‌তে পারি না, আর জীবনের প্রতি কর্মে অপ্রাপ্ত সত্যের আদর্শকেই আঁকড়ে ধ'রে আছি এবং কোন ক্রমেই সেই পথ থেকে কখনও নিজেকে বিচ্যুত হ'তে দিই নি এমন কথা বল্‌লে পুঞ্জীভূত মিথ্যাচরণকেই আরও প্রশ্রয় দেওয়া হবে। বস্তুত, নিক্তির ওজনে পাপাচরণের মাত্রার দিকটাই অনেক বেশি ভারী। কিন্তু আমাদের সাফাই হ'লো এই যে আদর্শ গান্ধীভক্ত গান্ধীজির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে যে সত্যের সন্ধান পান,

ঠিক তার বিপরীত অভিমুখে চলে আমাদের পক্ষে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা নাই। বরং সেই সত্য যেন আরও উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

এটা দেখেছি কারও প্রতি যদি মনে মনে বিদ্বেষভাব পোষণ করা যায় তা হ'লে হাজার চেষ্টাতেও তার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করা যায় না। শুধু তাই নয়, বিদ্বিষ্ট মনোভাবকে যতোই গোপন করতে চেষ্টা করি না কেন, কোন্ এক সূক্ষ্ম নালে একটা বৈরিতার স্রোত প্রবাহিত হ'তে থাকে। এ থেকে শুধু যে ক্রমিক ব্যবধান রচিত হয় তাই নয়, একটা চাপা হিংস্রতাও বোধ হয় পরস্পরের প্রতি বেড়ে উঠ্‌তে থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সম্পর্কেই যদি আবার অত্যন্ত কঠোর সংযমের শাসনে মন থেকে বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, তা হ'লে অপর দিক থেকেও বিদ্বেষের কালো পর্দা যেন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়, চমৎকৃত হ'তে হয় দেখে যে আমার সঙ্কল্পের সাধুতা কোন্ এক অদৃশ্য প্রভাবে তাকেও যেন আমার প্রতি নমনীয় করে তোলে। এর মর‍্যাল হ'লো এই, নিজেকে শুদ্ধ রাখো, তবেই জগৎকে শুদ্ধ রাখ্‌তে পারবে; নিজের মনকে অবিকৃত রাখো, তা হ'লে পরের মনের বিকৃতিমোচনেও তুমি সহায়তা করবে। তুমি নিজেকে পবিত্র রাখ্‌ছো মানে অপরের মনের পবিত্রতারক্ষার দায়িত্বও অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করছো। নিজের ভালোর সঙ্গে মিশে তবেই সামাজিক জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। 'আপ ভালো তো জগৎ ভালা।'

আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই। নিজের মধ্যে কোন কারণে যদি কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ববোধ থাকে তা হলে সেই মনোভাবকে হাজার লুকোবার চেষ্টা করলেও আচরণের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অথচ নির্ভুল একটা ঔদ্ধত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং নিজের অজান্তেই পরকে গিয়ে আঘাত করে। সেই পরব্যক্তিটিও তদনুযায়ী নিজের আচরণকে নিষ্করুণ করে নেয় এবং আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রতিঘাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। ঠিক তেমনি নিজের মনে কোন কারণে যদি হীনতাবোধ (inferiority complex) জাগে, আচরণকে হাজার নিয়ন্ত্রিত করলেও সেই মানসকুট চাপা দেওয়া যায় না, পরের চোখে তা ধরা পড়ে যায়ই এবং সেই পরব্যক্তিটিও এপক্ষের হীনতাবোধকে ভীরুতা মনে করে তার ওপর নিজের প্রভাব খাটাতে আরম্ভ করে। এই ভাবে কি হিংসার মনোভাব, কি গর্বের মনোভাব, কি ভীরুতার মনোভাব কি অন্যবিধ রিপুর মনোভাব কিছুই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়; অপরের আচরণের পিঠেই তাদের অস্তিত্ব। এই মনোভাবগুলি সংযত করা শুধু নিজেকেই বাঁচানো নয়, পরকেও বাঁচানো—নিজের চিত্তের পরিশুদ্ধি অপরের চিত্তের পরিশুদ্ধিরও সহায়ক।

তালিকাটাকে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন দেখি না। এতো

কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে চিত্তবৃত্তির পরিশুদ্ধির ওপর গান্ধীবাদের এই যে সর্বাংশে নির্ভরতা, তার যুক্তিযুক্ততা যেমন অহিংস আচরণের সাহায্যে বোঝা সম্ভব, তেমনি অহিংসার বিপরীত আচরণের মারফৎও তাকে আন্দাজ করা যায়। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর প্রত্যেকটি রিপুর দৃষ্টান্তেই চিত্তবৃত্তির পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গান্ধীজির অহিংসা সর্বব্যাপী শুধু এই অর্থে নয় যে তা হিংসাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার কথা বলে, তার প্রয়োগক্ষেত্র আরও বহুদূর ব্যাপক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দাবী ; কায়মনোবাক্যের সর্বাঙ্গীন পবিত্রতা নিয়েই তার বিশাল পরীক্ষার জগৎ।

বলা হবে পরের প্রতি প্রেমাচরণ সহজ নয়। অসংখ্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য রকমের ভীরুতা ও সন্দেহ মানুষের আচরণকে কঠিন আর জটিল করে তোলে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ভেতর কূটনৈতিক খেলায় এর একরকম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, আবার সমাজজীবনে একের প্রতি অন্যের ব্যবহারে এর আরেকরকম দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজজীবনে, কি সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক শক্তিদ্বন্দ্বে, কি আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে, অনেক কিছু অনর্থেরই মূল কারণ যথার্থ স্বার্থহানির আশঙ্কা নয়, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস, যার হয়ত কোন ভিত্তিই নেই। একের অবিশ্বাস অপরকেও প্রভাবিত করে, এক রাষ্ট্রের সন্দেহ অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে গিয়ে সঞ্চারিত হয় এইভাবে পাল্টাপাল্টি আঘাতে ও প্রতিঘাতে অন্তহীনভাবে দূষিত চক্র সৃষ্টি হতে থাকে এবং তার বিষের ক্রিয়া নিরীহ মানুষ কিম্বা সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত রাষ্ট্রের অভিপ্রায়কেও দূষিত করে তোলে।

ইউরোপে এর চরম নজীর দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি প্রত্যেকটিই কূটনীতির খেলায় সিদ্ধহস্ত—বিশেষত এ বিষয়ে ব্রিটেনের দোসর নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর অনেকেই আশা করেছিলো রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকার অন্তরালে সংঘটিত গোপন রসি-টানাটানির খেলা এবারে হয়ত সাঙ্গ হবে। ১৯১৭ সনের গণ-বিপ্লবের রাশিয়ার বলশেভিক নায়করা সকলেই একবাক্যে জারতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত কূটনৈতিক প্যাঁচ-কষাকষির খেলাকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। লেনিনের কথাই ছিলো : 'All cards must be placed on the table'। কিন্তু তাঁদের সেই সাধু অভিপ্রায় আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ষ্টালিনচক্রপ্রভাবিত সাম্প্রতিক রাশিয়ার কার্যকলাপ দেখে তা বেশ বুঝতে পারছি। আজকের রাশিয়া কূটনীতির মারপ্যাঁচে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিকেও টেক্কা দিয়ে গেছে—এবং পারিস শান্তিসম্মেলনে বিভিন্ন বিজেতা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে কামড়াকামড়ি সুরু হয়েছে তাতে রাশিয়া ও রাশিয়ার অনুগত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি দলের ভূমিকাটুকু নিছক নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নয়।

secretiveness এর ব্যাপারে রুশ রাষ্ট্রের রেকর্ড সকলের ওপর দিয়ে এবং লর্ড বিভারিজ-এর মতে এটা তার চরম অনুন্নত অবস্থারই দ্যোতক।

অবশ্য, রাশিয়ার এই আত্যন্তিক সাবধাননীতির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংস্থানগত কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু সেই নজীরে কূটনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়া যাই কিছু করবে বিচারবিরহিত ভাবে তাকে কেবল বাহবা দিয়ে যেতে হবে এতে করে পরস্পরবিচ্ছিন্নতার নীতিকেই শুধু আমল দেওয়া হয়। এই নীতি শুভও নয়, সুন্দরও নয়। আমাদের কথা হচ্ছে, কূটনীতির খেলা তো বহুকাল চলেছে, তার ফলটাও পৃথিবীব্যাপী স্বার্থের হানাহানি ও মারণযজ্ঞের মধ্যে অতি প্রকট ; এমতাবস্থায় গান্ধীজি যে কথা বল্‌ছেন, এবং ক্লান্তিকর পুনরুক্তির ভয় না করে ক্রমাগত একই নীতির দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রচেতনাকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছেন, সেই change of heart নীতিকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি। এই নীতিকে যদি জীবনের মৌলিক সত্যরূপে মেনে নিতে আপত্তি থাকে, শুধু সুবিধার খাতিরে, শুদ্ধমাত্র একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে, তাকে প্রয়োগ করে দেখতে বাধা কি? স্বার্থের দ্বন্দ্ব তো অনেক হলো, একবার স্বার্থচেতনাবিসর্জনের নীতিকে সুযোগ দিয়ে দেখা যাক না রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয়ে তার প্রভাব শুভ কি অশুভ ফল দেয়। পরার্থপরতার নীতি গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে না, আজকের সর্বব্যাপী হিংস্রতার আবহাওয়ায় পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে অতোটা আশা করাই অন্যায়—শুধু যার যার নিজের প্রয়োজনে স্বীয় রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে পরিশুদ্ধ রাখবার কথাই বলা হচ্ছে। ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির নীতিকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আবেদন জানানো হচ্ছে।

কিন্তু দুরারোগ্য অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় বর্ধিত পশ্চিমী দেশগুলি গান্ধীজির এই নিছক প্রাকটিক্যাল উপদেশে কি কর্ণপাত করবে? ওদের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ দেখে তো মনে হয় না। অনাগত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রাক্-প্রতিভূ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার ওপর আমাদের যে ভরসা ছিলো সোভিয়েট তার যুদ্ধকালীন আচরণ দ্বারা সেই বিশ্বাসকে একেবারেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আমরা নাৎসী জার্মানীর বেলসেন শিবিরের নিষ্ঠুরতার কাহিনীতে আঁৎকে উঠি, ইংরাজের পররাষ্ট্রপীড়নের দৃষ্টান্তে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠি, আমেরিকার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সাঁড়াশী আক্রমণের আশঙ্কায় ত্রস্ত, কিন্তু রাশিয়ার নব সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের ভয় নেই—যেন তা দেশে দেশে মুক্তির পতাকা বহন ক'রে নিয়ে আস্‌ছে! যেন দেশ থেকে দেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ভিন্ন হ'তে বাধ্য! এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহও যদি থেকে থাকে আর্থার কোয়েসলার আমাদের সেই সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর লেখায় সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধকালে লিথুয়নিয়ার লোকাপসরণপর্বের যে বর্ণনা

পাই, অতঃপর আর সন্দেহ থাকে না ষ্টালিনের রাশিয়া বিপ্লবকালীন মার্ক্সীয় আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হ'য়ে পরেছে, তার অধঃপতনের প্রক্রিয়া আজ সম্পূর্ণ।

মার্ক্সীয় নীতিই হোক্ আর অমার্ক্সীয় নীতিই হোক, হিংসার আদর্শকে যদি একবার অতিসূক্ষ্ম স্রোতেও প্রশ্রয় দেওয়া যায় তা হ'লে তার ক্রিয়ায় আস্তে আস্তে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাগুলি দূষিত হ'য়ে পড়ে এবং কালক্রমে তা সমগ্র আন্দোলনের গতিকেই ব্যাহত করে। সোভিয়েট রাশিয়া চোখে মহৎ স্বপ্ন নিয়েই হয়ত রাষ্ট্রসংগঠনের কাজে নেমেছিলো, কিন্তু নিজের আচরিত হিংসা ও কূটনীতির চাপে আজ কোথায় এসে সে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তার একার দোষে এটা ঘটে নি, ইংরেজের কূটনীতিও এজন্যে কম দায়ী নয়। কূটনীতি সম্পর্কে ইংরেজের কার্যকলাপ কিছু উল্লেখ না করাই ভালো। কিন্তু দেখে দুঃখ হয় যে গান্ধীজি-প্রদর্শিত পথে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বিবর্তন না হ'য়ে পুরাতন পথেই তার পরিক্রমা চল্‌ছে—ইউরোপের রাষ্ট্রধুরন্ধরদের মধ্যে বাঁধা পথ মাড়ানোর প্রবৃত্তি মজ্জাগত, পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুই দুইটি সর্বগ্রাসী যুদ্ধের শিক্ষাও তাঁদের চেতনাস্ফুরণের পক্ষে যথেষ্ট হ'লো না। আজ আবার আমেরিকা এসে এই আত্মবিধ্বংসী শোষণের প্রক্রিয়ায় হাত মিলিয়েছে। চীনদেশে তার সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের নীতিতে ইউরোপীয় ডঙ-এর শোষণেরই এক নূতন রূপ আজ প্রত্যক্ষ।

বিদেশের দৃষ্টান্ত থাক্। এবারে অমরা ভারতের সাম্প্রতিক জীবনের এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করবো আধুনিক ইতিহাসে যার তুলনা নেই—আমরা কলকাতার ১৬ই আগষ্ট ও তৎপরবর্তী চারদিনের ঘটনার কথা বল্‌ছি। এই একটিমাত্র ঘটনা, যার আলোকে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম আবার নূতন ক'রে পুনর্নির্ধারণ করা উচিত কিনা সেই বিচারের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। অনেকেই অনেকভাবে এই শোচনীয় ট্রাজিডির ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এই সম্পর্কে গান্ধীজি প্রথম বিবৃতিতে যে মূল্যবান কথাকয়টি বলেছেন তার তাৎপর্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে ব'লে মনে হয় না, হ'লে আমাদের সংবাদপত্রসমূহের রচনা ও বিবৃতি অন্যদিকে মোড় নিতো।

গান্ধীজি বলেছেন, কিছুকাল যাবৎই কল্‌কাতা হাঙ্গামার ক্ষেত্রে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এইটি যে তিনি বিগত নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসের আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর বন্দীমুক্তিসম্পর্কিত হাঙ্গামাকে মনে করেই বলেছেন তাতে আর সন্দেহ থাকে না। যেই দুটি আন্দোলনকে আমরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সকল আন্দোলনের চরম দৃষ্টান্ত কল্পনা ক'রে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি কল্‌কাতার ১৬ই আগষ্টের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রসঙ্গে তাদের উল্লেখ তিনি কেন করলেন? গান্ধীজি কোন কথাই নিরর্থক ব্যবহার করেন না; তাঁর প্রতিটি কথা অভিপ্রায়মূলক। সুতরাং এই সম্পর্কেরও তাৎপর্য আছে।

নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারীতে ছাত্ররা প্রচণ্ড উত্তেজনার মুখে যে অতুলনীয় সংযম ও মৃত্যুঞ্জয় শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে তার প্রশংসা করেও বলা যায়, শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনের গতি সম্পূর্ণ অহিংস থাকে নি। অবশ্য, ছাত্রদের প্রতি অহেতুক গুলীচালনার প্রতিবাদেই যে উপযুক্ত নেতৃত্ববিরহিত বল্গাহীন জনতা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো তাতে অবশ্য কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু একবার হিংসার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দিলে তা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আগেভাগে কেউ বল্‌তে পারে না। লরী পোড়ানো বা নিরপরাধ নিগ্রো চালককে লাঞ্ছিত করার মধ্যে দিয়ে যে অনিয়ন্ত্রিত অগ্ন্যুৎপাতের স্নুরু, তাই যে শেষ পর্য্যন্ত দাবানলের আকারে পারস্পরিক সদ্ভাবের ভিত্তির উপর রচিত কল্‌কাতার হিন্দুমুসলমানের মিলিত জীবনকে এক দমকে গ্রাস করতে আসেনি একথা কে বল্‌বে? যে ঘৃণা ও হিংসাচরণ একদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিলো, আরেকদিন অন্য উপলক্ষে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে, তাই যে পরস্পরের হননকার্যে প্রযুক্ত হয় নি এ কথা কি জোর ক'রে বলা যায়? হিংসার স্বভাবই এই যে তা শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে চলে এবং তার গতিপথ আগেথেকে নির্দেশ করা যায় না। মনে হয় কল্‌কাতার সম্প্রতিক মারণলীলার প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত হাঙ্গামাগুলির নজীর উল্লেখ করে গান্ধীজি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে হিংসাচরণ, তা যতো ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায় নিয়ে স্নুরু হোক না কেন, পরিণামে নিজের গায়ে এসেই লাগে। সামান্য চৌরীচেরার উপলক্ষে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখেছিলেন ব'লে যারা গান্ধীজির সমালোচনা করেন তাঁরা তৎপ্রবর্তিত অহিংস সংগ্রামের টেকনিক সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু গান্ধীজির উপরোক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় ষ্টালিনপন্থীরা বড়ো ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 'স্বাধীনতা-র ঘটনা ও রটনা' স্তম্ভে এই নিয়ে আক্ষেপ ক'রে 'দেশাভিমানী' লিখেছেন, সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী যুক্তফ্রান্টের সংগ্রাম আর সাম্প্রদায়িক সংগ্রামকে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে গান্ধীজি স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি অবিচার করেছেন। কারণ যখন দেখি রসিদ আলি দিবসে তাঁরাই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন তখন তাঁদের এই আক্ষেপের কারণ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু জনতার অনিয়ন্ত্রিত আচরণের দায়িত্ব না নিয়ে শুধু সেই জনবিক্ষোভের কৃতিত্বটুকু দাবী করার মধ্যে দেশপ্রীতির 'অভিমান'টুকুই প্রকাশ পায়, সত্যিকার দেশপ্রীতি প্রকাশ পায় না, এইটুকুই আমাদের বক্তব্য।

চারিদিকে যখন হানাহানি কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি দরকষাকষির আর অন্ত নেই, যখন পৃথিবীর বাতাস প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হিংসার বিষনিঃশ্বাসে ভারী, তখন গান্ধীজির কাছে এলে মনে হয়, না, এখনও সভ্যতার স্নুনিশ্চিত বিনাশ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার কারণ ঘটেনি; অই একটিমাত্র ক্ষীণদেহ কটিবাসসম্বল মানুষ যেন নিজের মধ্যে সমস্ত মহত্তর মানবিক বৃত্তিগুলিকে ধারণ ক'রে রয়েছেন এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার পাশব আক্রমণ থেকে সভ্যতাকে আগ্‌লে

বেড়াচ্ছেন। যে যুগে স্বার্থপরতাটাই বিধি, পরস্পরকে আঘাত করাটাই শৌর্য, কূটচক্রিতা ধর্মের পদে উন্নীত, আচরণে ও বাক্যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, পরের অনিষ্ট না ক'রে নিষ্ক্রিয় থাকা নির্জীব ও নিরীহের লক্ষণ, সেইযুগে গান্ধীজির নিঃস্বার্থ পরহিতব্রত, শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সকলের প্রতি বিনয়নম্র ব্যবহার, স্বাভাবিক সৌজন্য ও সারল্য, ও সর্বোপরি সত্য ও অহিংসার বাণী এই আশাই মনে সঞ্চারিত করে যে আণবিক বোমার অভ্যুদয় সত্ত্বেও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মারাত্মক আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত হয়ত সত্যে পরিণত নাও হ'তে পারে। চারিদিককার ঘোর তমিস্রার মধ্যে একটিমাত্র আলোর রেখা আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি—সেই আলোর রেখা গান্ধীজি।

গান্ধীজির অষ্টসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি তাঁকে যে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন তার ভেতর আমেরিকান মেথডিষ্ট মিশনের বিশপ এডুইন এবং লী-র অভিনন্দনটি এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যময়। তিনি বলেছেন: "Mahatma Gandhi unquestionably reached into the air and pulled down for our use great ideas and ideals." অর্থাৎ, "মহাত্মা গান্ধী অবধারিতভাবে শূণ্যমার্গে উঠে আমাদের জন্য মহৎ ভাব ও আদর্শসকল আহরণ ক'রে নিয়ে এসেছেন।" বিশপের মুখের কথা, হয়ত "শূণ্যমার্গ" কথাটার আধ্যাত্মিক উর্দ্ধবিহারের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, নিছক আক্ষরিক অর্থেও অই কথা কত না সত্য। পৃথিবীর মানুষ আজ কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই পশ্চাদ্‌পটে গান্ধীজির অভিপ্রায় ও সাধনাকে শূণ্যমার্গবিহারের সহিতই মাত্র তুলনা করা চলে।

গান্ধীজির অহিংসার মূলকথা হ'লো প্রেম। প্রেম থেকে আসে সহজ আচরণ, স্বতঃস্ফূর্তি ও নিঃশঙ্কতা। ঘৃণার প্রকৃতি তার বিপরীত। সর্বপ্রকার ভীরুতার উদ্ভব ঘৃণার থেকেই ("Non-violence springs from love, cowardice from hate"—গান্ধীজি)। গান্ধীজির শ্রেণীসমন্বয়ের আদর্শ কারও কারও কাছে অপ্রীতিকর এই যুক্তিতে যে এতে ক'রে ধনিক ও জমিদারতন্ত্রের পোষকতা করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর মতামতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থাক্‌লে আর এই ভুল করার আশঙ্কা থাকে না। গান্ধীজির চোখে শ্রেণীসমন্বয় অর্থ ধনী ও নির্ধনের স্বার্থের সুসমঞ্জস সঙ্গতি; একের দ্বারা অপরের প্রভাবিত হওয়া নয়। সনাতন মার্ক্সবাদীদের ন্যায় তিনি হয়ত শ্রেণীদ্বন্দ্বের নীতিতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর যুদ্ধোপায়গুলির মধ্যে শ্রেণীসংঘর্ষেরও স্থান আছে। তবে মার্ক্সীয় শ্রেণীসংঘর্ষ থেকে গান্ধীজিপ্রবর্তিত শ্রেণীসংঘর্ষের তফাৎ এই যে তাতে বলপ্রয়োগের অবকাশ নেই; পরস্পরের প্রতি অকারণ শত্রুতাসৃষ্টি না ক'রে, যতোদুর সম্ভব উত্তেজনা কমিয়ে, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আলাপ আলোচনা চালিয়ে অনেক জটিল

ব্যাপার মীমাংসা করা যায়, গান্ধীজি এটা মানেন। সর্বোপরি, তিনি হৃদয়ের রূপান্তরে বিশ্বাসী। তাই, মানুষের সম্পর্ক নিরূপণে তিনি মাত্র ভালোবাসার প্রভাবই মানেন, জবরদস্তির নয়। জবরদস্তি তাঁর স্বীয় অভিপ্রায়সাধনে প্রযুক্ত হ'লেও তিনি তা সমর্থন করতে প্রস্তুত নন।

নীতি হিসাবে গান্ধীজির অহিংস কার্যক্রম স্বীকার করা যতো সহজ, আচরণে প্রমাণ করা ততো সহজ নয়। তা সত্ত্বেও বল্‌বো, পৃথিবীর মুক্তির এ ভিন্ন আর অন্য কোন পথই বোধ হয় খোলা নেই।

প্রমীলার বিয়ে

অমিয়ভূষণ মজুমদার

প্রমীলার বিয়ে হয়েছে গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে ; সেদিন বৈশাখী নির্মেঘ আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ ছিল।

প্রমীলা ধনীর মেয়ে, কলেজে পড়েছে, গায়ের রং দুধে-আলতা নয়, নাক বা চোখ নয় বলবার মতো বিশিষ্ট কিছু, তবু তাকে অরূপা বললে মিথ্যা বলা হয়। এ সত্ত্বেও (তার বন্ধুদের চোখে) বিয়েটা নেহাৎ দাল-ভাতের মতো হয়েছে। দুপক্ষ থেকে আলাপ আলোচনা হয়েছে অন্তত দু'পাঁচ মাস, তবে সে আলাপের মধ্যে প্রমীলা বা তার সাথে জুড়ে দেয়া গো বেচারা এই ভদ্রলোকটির কোন অংশ ছিল না।

গত রাত্রিতেও প্রমীলার ভালো ঘুম হয়নি। কলেজে-পড়া মেয়ে হলেও প্রমীলা রাত জেগে কোনদিন পড়া করে নি, কাজেই কোন রাত্রিতে ঘুম না হলে তার কাছে সে রাত্রিটি বিশিষ্ট হয়ে থাকে, অনেকদিন মনে করে রাখবার মতো ; সেই কথাই বলছি।

কয়েকদিন আগে আর একটি রাত্রিতেও সে ঘুমাতে পারে নি, সেদিন বাসর ছিল। সব মেয়ের মতো তার স্নায়ুগুলি উঁচু পর্দায় চড়ান সেতারের মতো ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়েছিল। তার উপরে ছিল ফুলের গন্ধ আর বৈশাখী গরম। মাখন নামে এ বাড়ীর যে ছেলেটির সাথে বিয়ে হয়েছে তার নিমন্ত্রিতরা সবাই বিদায় নিলে অনেক রাত্রিতে সে ঘরের দরজায় এসে প্রমীলাকে পেয়ে নেমে গেল। এতক্ষণ এই উৎসবের আয়োজনের অন্যতম যোগানদার

হিসাবে তার অংশ মতো সে কাজ করে যাচ্ছিল, এবার সে ব্যাপারটার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারল বোধ হয়। এতক্ষণ সে ভাবেনি, বস্তুত ও জিনিষটা তার চিরদিনই কম। এ বাড়ীর অলিখিত প্রথা অনুসারে যে কোন কাজে যেমন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস থাকে এ ব্যাপারটিতে তার টোপর পরে বসাকেও তেমনি সহজ করে সে নিয়েছিল। ঘরের দরজায় এসে সজ্জিত পালঙ্ক, লজ্জিতা বধূকে দেখে লজ্জায় সে বোকা ব'নে গেল।

যেন কিছু দরকার এই মনে করে সে বল্‌ল,—এই বৌদি, শোন, শোন, তোয়ালেটা কোথায়, হাত পুছতে হবে।

উঠানের ছত্রাকারে ছড়ান এঁটো পাতার পাশ দিয়ে, বারান্দায় ঝুলান লাল হয়ে আসা ডে লাইটের তলা ঘেঁসে হলুদ ও মশলা মাখা শাড়ী পড়া মেয়েটা দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল রান্না ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে।

মাখন পুনরপি বললে—ও বৌদি, শোন, শোন, এক গ্লাস জল। প্রত্যুত্তরে ঝনাৎ করে কোণের ঘরটার দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং বন্ধ দরজার পিছন থেকে খিল্ খিল্ করে অজস্র হাসি উপচে পড়ল।

উৎসবের রাত্রিতে এত তাড়াতাড়ি (মাখন নোতুন পাওয়া ঘড়িতে দেখলে রাত দুটো বাজে) এমন আরামপ্রদ নিস্তব্ধতা আনতে তার পেছনে পরিকল্পনা থাকা দরকার; এই রকম একটা বোধ হল মাখনের—ষড়যন্ত্রটা বৌদির। কিছু করবার ছিল না। আত্মীয়-স্বজনে ঠাসা ঘরগুলির সব ক'টির দরজা বন্ধ। রান্নাঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। উঠোনের মাটির গ্লাসগুলি মেজে তো জল খাওয়া যায় না যেন সে জন্যেই মাখন কলতলার দিকে রওনা দিল।

মাখন যখন ফিরে এল তখন তার সারা গা ভিজে, চুল দিয়ে ফোটা ফোটা জল ঝরছে। ঘরে এসে আবার সে ফিরে যাচ্ছিল—ঐ যা, জল খেয়ে এলাম না।

তখন প্রমীলা উঠল। অন্য কেউ হলে সে বলত কি বোকা, কি নার্ভাস, কিন্তু সে নিজেও তখন কি করা উচিৎ, কি কথাটা বলা উচিৎ এ বুঝতে পারছিল না, কাজেই মাখনের কাজ ও কথার সমালোচনা করতে পারল না মনে মনেও; বললে—জল ঘরে আছে, তোয়ালেও আছে; দেব?

—তা হ'লে তো ভালোই হয়।

প্রমীলা তোয়ালে দিয়েছিল, জল গড়িয়ে দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে মাখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর প্রমীলা জেগেছিল। রজনীগন্ধার প্রথম কলন এত কোথা থেকে সংগ্রহ হল এই ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে যখন চোখ বুঁজে এসেছিল খিল্ খিল্ হাসির শব্দে ধরমর করে উঠে দরজা খুলে প্রমীলা বেরিয়ে এসেছিল।

কালও তেমন ঘুম হয়নি প্রমীলার, কিন্তু ফুলের গন্ধে নয়, মাখনের সান্নিধ্যের জন্য নয়, ভাবতে ভাবতে ঘুম হল না। বাসরের পরের দিন সকালের ব্যাপারগুলিতে এই ঘুম না হওয়ার অঙ্কুর ছিল। প্রমীলার মনে আছে সব।

যার খিল খিল করে উপচে পড়া হাসিতে তার ঘুম ভেঙেছিল তাকে অবলম্বন করেই দিনের আলোয় সে এ বাড়ীর প্রাঙ্গনে পা বাড়ল। গত রাত্রিতে হলুদ ও মশলা মাখা যে শাড়ীখানা পরে এ বৌটি সব কাজে হাত মিশিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আজ সেখানা পরণে নেই বটে, মুখের একপাশে নাকের কোলে হলুদের দাগ এখনও লেগে আছে। তার পিছন পিছন কলতলায় যেতে যেতে প্রমীলার আগ্রহ হল বাড়ীটার সাথে পরিচয় করতে।

কলতলার সাথে লাগোয়া ঘরখানি সে আন্দাজেই ঠিক করে নিল—সেটা রান্না ঘর। কয়লার ধোঁয়া, কয়েকটি শিশুর হাসি-কান্না ও খাওয়ার কথা শুনতে শুনতে তার মনে হল,—উনানের পাশে বর্ষিয়সী একজন সকালের দুধ জ্বাল দিতে বসেছে, শিশু ক'টি তাকে ঘিরে ছোট ছোট পিড়িতে ছোট ছোট বাটি হাতে কোলাহল করছে। প্রমীলা শিশুদের ভালোবাসে—এ বাড়ীতে যেন সে দ্বিতীয় অবলম্বন খুঁজে পেল।

গায়ে জল ঢালতে ঢালতে প্রমীলা বুঝলে,—রান্নাঘরে কিশোর বয়স্ক কারা এসে ঢুকল দু'তিনজন। কিশোরদের সে শিশুদের চাইতে ভালোবাসে; এরা যদি তার দেওর হয় তবে খুবই ভালো হবে। প্রমীলার ভালো লাগতে লাগল সকালবেলাটা। ওরা কি নিয়ে খুব হৈ রৈ ক'রে আলাপ করছে; প্রমীলা কানখাড়া করে শুনতে লাগল, কথার মাথামুণ্ডু সে বুঝতে পারলনা, তবু শুনতে লাগল।

একজন বললে—আসবেনা কে বলেছে?

ছোট একজন উত্তর করলে—চিঠি লিখেছে।

—তা লিখুক, অমন কড়া কথা ও লেখে, শেষ পর্য্যন্ত কড়া হ'য়ে থাকতে পারে না কোনদিন। আসবে দেখে নিস।

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—তবে তুই থাক, যাস নে। আমি ষ্টেশনে চললাম, কই চা হয়েছে নাকি দাও।

ভারি মিষ্টি এদের গলা। প্রমীলার নিজের ছোট ভাইদের মতো তরল খুসিতে ভরা। কাপড় পালটাতে পালটাতে প্রমীলা ওদের কথার দিকে কান পেতে রইল।

আবার ওরা কথা বলছে, চা বোধ হয় পেয়েছে। কে একজন বর্ষিয়সী বললেন,—অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছিস কেন?

প্রথম কিশোর বললে—বাহ্, সতের মিনিট বাকি আছে ট্রেন আসতে, যেতে অন্তত পনর মিনিটতো লাগবে।

দ্বিতীয় কিশোরটি বললে—রোজ বলি দুধটা আগে জ্বাল দিতে তা নয় আগে চা করবে।

বর্ষিয়সী বললেন—দুধ তো দিয়েছি তোকে।

—দিয়েছ তো, এত গরম খাওয়া যায় ?

প্রথম কিশোর বলল—তাড়াতাড়ি করছিস কেন ? তুইতো ষ্টেশনে যাবি না।

—যাব না কেন, শুনি ?

—তুই তো বললি আসবে না।

প্রমীলা হেসে ফেলল ওদের কথা শুনে। হাসি মুখে চোখ তুলে দেখল ঘেরার ওপাশে দাঁড়িয়ে সেই বৌটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ভাব বোঝা গেল না, মনে হ'ল সেও শুনছে ওদের কথা, দৃষ্টিতে যেন দুঃখ মেশান আছে তবে ওটাই তার স্বাভাবিক হ'তে পারে।

আর একটা গলার স্বর শোনা গেল রান্নাঘরে, প্রমীলার বুকের গোড়াটা টল্‌মল্ ক'রে উঠল। মাখন বললে—পিরিচখানা দাও।

—তোরও তাড়াতাড়ি নাকি ?

—তাড়াতাড়ি আবার কি !

—তবে ভালো হ'য়ে বস, হালুয়াটা নামাই। কাল রাত্রিতে খাস নি কিছু।

—ঘুরে এসে খাব।

—তোদের সবই অদ্ভুত। ষ্টেশনে যাবি বুঝি ?

নিস্পৃহ হবার ভান ক'রে মাখন বললে,—যাই একবার, আসেই যদি ভাববে বিয়ে ক'রে মাখনটা বোকা হ'য়েছে।

ধুপ্ ধুপ্ করে দুটো শব্দ হ'ল, প্রমীলা বুঝলে কিশোর দুটি তপ্ত চা ও দুধ কোন রকমে গিলে চৌকাট থেকে ঝাঁপ খেয়ে উঠানে পড়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটল। পিরিচে ক'রে চা জুড়িয়ে খেয়ে মাখনও বেড়িয়ে গেল। কোন এক বিলেতি গল্পে প্রমীলা পড়েছিল, খুসি হওয়াটা বাহিরের জিনিসের উপর নির্ভর করে না, খুসি হওয়া মনের একটা ক্ষমতা। প্রমীলার মনে হ'ল এরা সকলেই খুসি হতে পারে সামান্যকে অবলম্বন ক'রে। ভালো লাগল প্রমীলার।

নোতুন জায়গায় গেলে, নোতুন কাজ হাতে নিলে মানুষ নোতুন অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাশা করে। বিয়েটার চাইতে নোতুন কিছু নেই,—বিয়ের আগের জীবন থেকে মেয়েরা শিকড়শুদ্ধ উঠে আসে যেন নোতুন জমিতে, কাজেই নোতুন আবহাওয়ায় তার বাধ-বাধ ঠেকলেও নোতুনত্বটুকুকে সে প্রতীক্ষা করে। অভিনবত্বগুলি প্রথম শীতের আমেজের মতো শিরশিরে সোহাগে ভরে ওঠে।

স্নান সেরে শ্বশুর-শাশুরীকে প্রণাম করে প্রমীলা ঘরে ফিরে এল তার গাইড স্বরূপ বৌটির সাথে। কিছুক্ষণ পরে বৌটি এল, হাতে একবাটি তপ্ত দুধ। প্রমীলাকে বললে—খাও।

চায়ের জন্য প্রমীলার মন টলছিল, কিন্তু আজ সে কথাটা বলতে তার সঙ্কোচ হল বললে—দুধ আমি খাইনে।

—চা খাও বুঝি, আচ্ছা নিয়ে আসি, দুধটুকু খেয়ে নাও।

প্রমীলা জীবনে যা করেনি, হাসি মুখে তা করলে; মুখে দুধের স্বাদ পাচ্ছিল কিনা বোঝা গেল না, তার মুখ দেখে বোঝা গেল কৌতুক ও কৌতুহলের স্বাদ পাচ্ছে।

দুধের বাটি নামিয়ে রেখে প্রমীলা মুখ তুলে দেখলে বৌটি হাসছে। খুসি হয়ে প্রমীলা বললে,—তোমরাও সবাই খাও, অনিচ্ছাতেও খাও ?

বৌটি বলল—ঠিক ধরতে পেরেছ, এখন অভ্যাস হ'য়ে এসেছে।

প্রমীলার ধারণা হ'ল এ বাড়ীর কারো হুকুমে এ কাজটি হ'য়ে থাকে। সামান্য ব্যাপার তবু অনুভব করবার মতো। প্রমীলা বিয়ের আগের দিনও কল্পনা করতে পারেনি আহার বিষয়টিতে তার মতো মেয়ের রুচির উপরে আর কারো ছায়া পড়তে পারে, কিন্তু আজ ছায়া পড়ল। বিয়ের আগে প্রমীলা হয়তো কঠিন নিঃশব্দ হাসির আড়ালে সরে যেত, আজ এই চাপিয়ে-দেয়া অন্যের রুচি সে যেন উপভোগ করল। সে এ বাড়ীর একজন হয়ে গেছে নতুবা হুকুমটি তার'পরে চলবে কেন। প্রমীলার ভালো লাগল, একটু শ্রদ্ধা হ'ল যেন হুকুমদেবার মতো লোকটির 'পরে। বললে—থাক গে, চা আর খাবনা।

একটুক্ষণ পরে প্রমীলা বললে—কে আসবে আজ ? (কথাটি সে বলতে কুণ্ঠা বোধ করল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে, গ্রামের মেয়ের মতো সরল ও সঙ্কুচিতা এ বৌটিকে প্রশ্ন না করলে কিছুর সাথেই সে পরিচয় করিয়ে দেবেনা, সব বলাও যায় একে।)

—ওরা অমনি করে। কে আসবে-কে জানে।

প্রমীলার মনে হল শুনে বৌটি যেন উদাসীন প্রকৃতির। তার বলতে ইচ্ছা হল,—শুধু ছেলে মানুষরাই তো নয়, মাখনও যখন এতটা উৎসাহ নিয়ে ষ্টেশনে গেল তখন যে আসবে সে তো অন্তত প্রিয়জন বটে।

প্রমীলার কৌতুহল বেড়ে রইল আগন্তুকটির সম্বন্ধে।

শ্বশুর খেতে বসেছেন, প্রমীলা তার গাইডের পেছনে রান্না ঘরে যেয়ে বসল। ঘোমটার আড়াল থেকে প্রমীলা এবার শ্বশুরকে দেখতে পেল। গম্ভীর প্রকাণ্ড চেহারা, যেমন মর্য্যাদাবান লোকের হয়ে থাকে, সম্ভ্রম আকৃষ্ট করবার মতো দৃষ্টি। প্রমীলার প্রগলভতাটুকু সম্ভ্রমে গুটিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে গলার সুরে, কথায় কিন্তু প্রমীলার মনে হল বাবাকে

যেমন আব্দার করে কথা বলা যায়, তেমনি বলা যাবে এঁকে। প্রমীলার মনে হল সার্থক বিয়ে হয়েছে তার।

শ্বশুর বললেন—এমন দিনেও পরিষ্কার শাড়ী পাওনি, মা?

প্রমীলার গাইড তার আধময়লা মোটা শাড়ীটা নিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

শ্বশুর আবার বললেন—তুমি যদি এমন পরে থাক তোমার ছোটজারা ভাববে বৌদের বড় কষ্ট এ বাড়ীতে।

গাইড খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল,—তা যদি হয়, বাবা, আমি এখনই শাড়ী পালটে আসছি।

শ্বশুর বললেন,—তা তুমি পর যা ইচ্ছা হয়। শাশুরীর কাছ থেকে হলুদ মাখার একটিনি করছ বড়গিন্নী একদিন হবে বলে, সেজন্যে কিন্তু ছোট ছোট জাদের শিখিও না।

প্রমীলার দিকে ফিরে বললেন,—এটি আমার বড় মা। ওর বাপ-মা ওকে কেবল পুতুলের জ্বর হ'লে মাথায় জলপটি দিতে শিখিয়েছে আর খিল খিল করে হাসতে। সংসারী হ'তে ও পারবে না। এখনও ঝোলের কড়ায় আঁচল পড়ে যায় খুলে, রাঁধতে বসলে, কড়ার কালি কপালে অবধি লেগে যায়।

গাইড হাসিমুখে বলল,—কপালে লাগে নি, বাবা।

প্রমীলা মনে মনে বলল,—নাকে যে লাগে তা আমি নিজেও দেখেছি।

শ্বশুরের খাওয়া প্রায় হয়ে হ'য়ে এসেছে, পায়ের শব্দ করতে করতে কিশোর দুটি ফিরে এল। রোদে মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলি তোরা,—শাশুরী বললেন,—গাড়ীতো কোন সকালে চলে গেছে।

—দেখনা, গাড়ী চলে গেল, আমি বললাম আসবে না, ছোড়দা বলল পরের গাড়ীটা দেখে যাই, যদি কিছু কেনা কাটা করতে যেয়ে এটা ধরতে না পেরে থাকে।

ছোড়দা বললে,—তোকে তো আমি থাকতে বলিনি, চলে এলেই পারতিস।

—রোদ মাথায় ক'রে কারোই বসে থাকবার দরকার ছিল না; সে তো লিখেছে আসবে না।—শাশুরী বললেন।

—বাহ্। বাবা যে বললেন আসতে পারে—একজন কিশোর প্রতিবাদ করল।

—সত্যি আসবে না কে ভাবতে পেরেছিল,—শ্বশুর বললেন,—আসা উচিৎ ছিল।

—হয়তো ছুটি পায়নি।

শ্বশুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ছুটি সে পেত, আমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই আসেনি।

ব্যাপারটিতে সকলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, শ্বশুর আহার সম্পূর্ণ না করেই উঠে

গেলেন। ওরা কেউ লক্ষ্য করল কিনা কে জানে, পাতের দিকে চোখ পড়তে প্রমীলা মনটায় বিষণ্ণতা বোধ করলে। কে এই লোকটি যার আসবার কথা নিয়ে এরা সমারোহ করছে, জানবার জন্য তার কৌতুহল হ'ল। ভাবতে যেয়ে তার মনে হল—কথা বলতে যেয়ে শ্বশুরের ঠোঁটের প্রান্ত দুটি বার কয়েক কেঁপে উঠেছিল।

সকলের আহারাদি শেষ হ'লে বাড়ী যখন দুপুরের জন্য নিঃশব্দ হল তখন প্রমীলা ভাবল এবার তার বড়জা আসবে, কিন্তু সে যখন এলনা তখন প্রমীলা আশা করলে মাখন হয়তো আসবে। সেও যখন এল না প্রমীলার মনে হল তার ছোট ছোট দেওররাও আসতে পারত। একবার সে ভাবল যে লোকটির আসবার জন্য এরা উদগ্রীব হয়েছিল সে না আসাতেই এরা মুসরে পড়েছে। নতুবা যার ফুলশয্যা হয়েছে কাল এমন একটা বৌকে একা সময় কাটাতে হয় না কোনকালে।

অনেকক্ষণ পরে গলার শব্দ লক্ষ্য করে প্রমীলা দেখলে তার ঘরটির ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাখন আর তার বড়জা আলাপ করছে।

মাখন বললে—তুমি যাও বরং, মাকে থামতে বল।

—আমার কথা কি শুনবেন। বরং প্রমীলাকে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা অন্যমনস্ক হতে পারতেন।

—ওসবের মধ্যে বাইরের লোককে নিয়ে কি হবে,—মুখ কাচুমাচু ক'রে বললে মাখন।

মাখনের বলবার ধরণে প্রমীলার হাসি পেল কিন্তু বড়জার সাথে শ্বশুর শাশুরীর কাছে যেতে তার ইচ্ছা হ'ল, সত্যই যদি তার উপস্থিতিতে কিছু সুবিধা হয়। বুদ্ধিমতী প্রমীলা ধারণা করতে পেরেছে বিষয়টিতে নাটকীয় কিছু না থাকলেও তার শ্বশুর শাশুরীর দুঃখ বা অভিমানটুকু সাধারণ ঘটনার চাইতে গভীর। তার নিজের বাড়ীতে এমনি কিছু হলে সে-ই অনেকদিন তার গুমোট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রমীলার মনে হতে লাগল, ভালো গানের মাঝখানে কে কথা কয়ে উঠেছে।

নিভৃত রাতের অন্তরে এ অবস্থায় দুজনের কাছে দুজন ছাড়া আর কিছু থাকে না। তবু অন্য কথাই মনে হতে লাগল প্রমীলার। মাখনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল—কোথায় কি গোলমাল হয়েছে, কেন সুর কেটে গেল। একটু উস্‌খুস্‌ করে নিজে থেকে সে মাখনের দিকে ফিরল। মাখন মশারীর ছাতের দিকে অন্ধকারে চেয়ে আছে, হয়তো ভাবছে।

প্রমীলা বলল,—আজ কার আসবার কথা ছিল, দাদার?

—হ্যাঁ। তুমি ঘুমাও নি? ছুটি পায়নি তাই আসতে পারেনি মনে হচ্ছে।

প্রমীলার আর সাহস হ'ল না। একটু সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল, এদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে এখনই তার কথা কওয়াটা সমীচিন কিনা বুঝে উঠতে পারল না, কিছুক্ষণ পরে

মাখন বলল,—একটা কথা তোমায় বলি, দাদার মনের মতো হ'তে হবে তোমাকে, নইলে আমাদের সংসারের স্থর কেটে যাবে।

তারপরে মাখনও চুপ করল। গত রাত্রিতে মাখনও একবার প্রশ্ন করেছিল—তোমার নাম পূর্ণিমা না হ'য়ে প্রমীলা হ'ল কেন। আজ সারাদিন অন্য কথার মাঝে মাঝে প্রমীলা একটা ছোট মিষ্টি উত্তর ভেবে রেখেছিল। কেউ প্রশ্ন করল না, কেউ উত্তর দিল না।

কিন্তু জানতে প্রমীলা পারল। প্রমীলা বিস্মিত হ'য়ে শুনল—(ছোট দেওরের কাছ থেকে নানা কথার ছলে পরের দিন দুপুরে আদায় করলে খবরটা)—যে ঘটনাটা তাকে ও তার বিয়ে নিয়ে। তার সাথে মাখনের বিয়ে হ'য়েছে ব'লেই ঘৃণায় এ বাড়ীতে আসে নি তাদের বড়দা।

প্রমীলার বাবা কন্‌ট্রাকট্‌র। টাকা তাঁর যথেষ্ট বহুদিন থেকে, যুদ্ধের বাজারে অনেক বেড়েছে তা। পাকা ব্যবসাদার তিনি। সব কন্‌ট্রাকটরদের মতোই তিনিও যুদ্ধের বাজারে কিছু কিছু ভেজাল চালিয়েছেন বৈকি, কিন্তু ব্যবসায় ওতো আছেই। আর ব্যবসায় মিথ্যাও থাকে। দোকানদার যদি বলে—চার পয়সা কিনেছি, ছ'পয়সায় ছেড়ে দু'পয়সা লাভ করব; তাতে সত্য ভাষণ হয়, দোকানও উঠে যায়। এ বাড়ীর বড় ছেলেটি ব্যবসাদারদের, না ঘৃণা করে না, পৃথক স্তরের মানুষ মনে করে। তাদের বর্জন করতে হবে এমন কথা নেই, তাদের মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে এমন কথা নেই। অভিজাত রাজবংশীয় পুরুষ সাধারণ একজন লোককেও অসম্মান ক'রে না, বরং তার আভিজাত্যই তাকে বাধা দেবে, কিন্তু যতোই পরিচয় হ'ক ঐ সাধারণ লোকটির সাথে সখ্য হ'তে পারে না, বা আত্মীয়তা। রুচি ও অনুশীলনের দুস্তর ব্যবধান থাকবেই। এ বাড়ীর সাথে কোন ব্যবসাদার সবর্ণ হ'তে পারে না। প্রমীলার যেন অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে। এ বাড়ীর বধূ হ'য়ে এসে সে এদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ক্ষুণ্ন করেছে। ব্যবসাদারের ছল-প্রবণ স্থূল মন যেন এ বাড়ীর বিশুদ্ধতায় কালিমাখা হাত রেখেছে। অথচ রাজবংশ নয় এদের, অতি সাধারণ মধ্য শ্রেণীর লোক এরা। প্রমীলার বাবা শুনলে—ছেলেমানুষি বলতেন, বলতেন—আর একটু বয়েস হ'ক।

অন্যকোন উপলক্ষে এসব শুনলে প্রমীলা বুঝিয়ে দেবার মতো সহিষ্ণু হ'য়ে বলত—টাকায় যেন ছলের মিথ্যার গন্ধ জড়িয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বড় কাজ, ভালো কাজ এসবই কি টাকা ছাড়া হয়?

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম পালা এটা, করুণাহীন জীবনযুদ্ধে মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটছে অর্থ ও ক্ষমতার লক্ষ্যে। এরা কি অশরীর, গতযুগের স্বপ্ন মাত্র? স্বপ্নের মানুষের অকলঙ্ক মন যেন এদের, শুনে রেখেছে পবিত্রতা ভালো, সত্য ভালো। জীবনে সেই শুভ্র অকলঙ্কতা ফুটিয়ে রাখতে চায়।

যে অস্পৃশ্য নয় তাকে অস্পৃশ্য বললে সে অভিমান করে না, অপমান বোধও করে না।

প্রমীলা জানে তারা ও তার বংশের অন্য সবাই ব্যবসা করেন বলেই মানুষ হিসেবে তারা অশ্রদ্ধেয় নয়, কাজেই অপমানিত বোধ সে করল না।

কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো জোরও পেল না সে। লোকটি বুদ্ধিহীন নয়, মতিচ্ছন্ন ক্ষেপাও নয়, নতুবা এ বাড়ীর এতগুলি লোক তার মতামত নিয়ে এমনতর মাথা ঘামাত না। মাখন অন্তত হেসে উড়িয়ে দিতে পারত। বরং পরম শ্রদ্ধা পোষণ ক'রে মাখন; প্রমীলার গত রাত্রির গভীর ভাবে বলা মাখনের কথা ক'টি মনে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্য প্রমীলার যেন সাধ হ'ল এদের পক্ষ থেকে ব্যাপারটিকে দেখতে। সত্যি যদি হয় এদের এই বস্তুনিরপেক্ষ মানসিক পবিত্রতা তা হ'লেও তার শক্তি কতটুকু, বিশ্বজগতের জনারণ্যের কোথায় মিশে যাবে এরা। প্রমীলা ভেবে কিনারা করতে পারল না। একবার হয়তো একটা মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হ'য়েছিল—কিন্তু সেতো একটা কল্পনা;—পৃথিবীর কঠিন কালো অবিনশ্বর মাটির বুকে চুলের মতো একটা ফাটল থেকে একটা অতিক্ষীণ অতিমৃদু নীল শিখা দেখা যাচ্ছে, হয়তো ঐ শিখা একদিন প্রবল আগ্নেয়গিরির রুদ্ররূপ নিয়ে ধরিত্রীকে ভেঙ্গে গড়বে, সেইদিনের প্রতীক্ষায় এ শিখা বাতাসের মুখে নিভ্‌তে নিভ্‌তে জ্বলতে থাকবে।

কিন্তু এ যেন ছায়াবাজী দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকা, অপ্রাকৃত একটা কল্পনাকে কেন্দ্র করে নিজের ভেতরটাকে শুকিয়ে তোলা। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রমীলার হাসি পেল। দুঃস্বপ্নের কুণ্ঠায় গলা শুকিয়ে উঠলে মানুষ যতই আর্ত্ত হ'ক দিনের আলোয় সে কুণ্ঠার কথা ভেবে বিচিত্র কাহিনীর মতো সেটাকে উপভোগ করে। প্রমীলা হেসে ফেলে ভাবলে,—ছুটি না পেয়ে ভদ্রলোক আসতে পারেনি। ছেলেমানুষ কি শুনতে, কি শুনে কি বলেছে। হারিয়ে যাওয়া মধুর পরিবেশটিকে ফিরে সে আবার দুহাতে আঁকড়ে ধরল। বড়জাকে কলতলায় ধরে সে প্রশ্ন করলে—আমার ভাসুর কবে আসচেন, ঠিক করে বলো তো, দিদি।

তার ধারণাই সত্য হ'তে চলল। সেদিন বেলা অনেকদূর গড়িয়ে যাবার আগেই এ বাড়ীর বড় ছেলে এল। যাকে কোনদিন দেখেনি, যার কথা কেউ তাকে বলেনি এমন লোককে কল্পনা করা যায় না। কাল রাতের ঘুমের সাথে জড়িয়ে তবু প্রমীলা তাকে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করেছিল। বারবার তার মনে হয়েছিল, ফরসা দৃঢ় একটা পুরুষের কথা, যার গলায় সাদা ওড়না, সাদা পৈতে; কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে যা বলেছে এ বাড়ীর সবাই প্রাণপণে তাই করছে।

সাড়া পেয়ে উঠানে সবাই যখন কোলাহল করে উঠল তখন প্রমীলাও জানালার পাশে সরে যেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল তাকে। ধরা পড়লে গর্হিত কাজ করেছে বলবে এ বুঝেও সে কৌতূহল চাপতে পারল না। কিন্তু তার কল্পনার সাথে কিছুমাত্র যদি মেলে। মাখনের

মতোই চেহারা, গাল দুটো একটু শুকিয়ে যাওয়ায় চোখ দুটি একটু বড় হয়েছে এই যা। মাখনের চাইতে বরং একটু রোগা, বরং যেন সামনের দিকে নুয়ে পড়া, আধময়লা খাদির ধুতি পাঞ্জাবী পরা, ছেলেমানুষদের সাথে হর-হর কথা বলছে।

বাড়ীর গুমোট কোথায় কেটে গেল। আজ মাখনের গলা শোনা যাচ্ছে। তার বিরাট বুকের জোরাল ফুসফুসের ভরাট শব্দ বাড়ীখানা কাঁপিয়ে দিচ্ছে;—শোন দাদা, শোন বৌদি······।

আজ সন্ধ্যায় প্রমীলা রান্না করতে বসেছে। হলুদের ছাপ লাগা শাড়ী পরা বৌটিকে নিয়ে শ্বাশুরী উঠে পড়ে লেগেছেন, তার রুক্ষ চুলগুলি হয়তো বেণীতে গোছান যাচ্ছে না, তার আঙ্গুলের ডগায় জমে থাকা হলুদ আর মশলার দাগ হয়তো সাবান দিয়েও যাচ্ছে না। প্রমীলা উনুনের আগুনের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগল।

এমন কি মাখন একবার রান্নাঘরের দরজায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রমীলার সাথে কথা ক'য়ে গেল। ও পাশের ঘর-খানা থেকে কিশোরদের গলা শোনা যাচ্ছে,—তারা বিয়ের গল্প ও আনন্দের টুকরা খবরগুলি বলছে। প্রমীলা ভাবলে আজ সে মাখনকে বলবে—একজনের নাম পূর্ণিমা না হয়ে প্রমীলা কেন হয়েছে।

রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে প্রমীলা ঘরে এসে বসেছে। আকাশের একফালি চাঁদ উঠোনের ডানদিকে আমগাছটার পেছন থেকে খানিকটা আলো দিচ্ছে। ঝিরঝিরে একটা বাতাস উঠেছে; মুকুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে গাছটা থেকে। বড়জা প্রমীলার ঘরে পান রেখে চলে গেল। আলোটা কমিয়ে প্রমীলা বিছানায় যেয়ে বসল। উঠানে পায়চারি করতে করতে মাখন আর তার দাদা কথা বলছে।

একটু শুনে প্রমীলার মনে হল ওরা যেন বিয়ের কথা বলছে; মাখন বলছে আর তার দাদা চুপ করে শুনছেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রমীলা শুনতে পেল মাখন বলছে—আমি ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি।

কথাটাকে জোরালো করবার চেষ্টায় একটা ঢোক গিলে মাখন আবার বলল—তোমার হয়তো মনে হবে কিছু একটা আড়াল করবার জন্য আমি বলছি, কিন্তু তা নয়, সত্যি আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি; যেন ও না হলে আমার চলত না।

পৃথিবীতে সব চাইতে মধুর,—মিথ্যা হলেও যা মধুর, সে কথাটি এমন আচমকা আঘাত দিতে পারে এ কে জানত? প্রমীলা বিস্মিত হয়ে গেল। মাখন যদি অস্পষ্ট কণ্ঠে অসংলগ্ন ভাবে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলত কথাগুলি অবিশ্বাস্য হলেও প্রমীলার কাছে সব চাইতে বড় সত্য হত সেটা, আর মাখন এখন স্পষ্ট অকুণ্ঠ হয়ে বলছে তবু তার

মনে হল—এ মিথ্যা, এর চাইতে বড় মিথ্যা আর নেই। প্রমীলার মনে পড়ল এ বাড়ীর গুমোটের কথা, মনে হল তাকে এরা সবটুকু মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারছে না। তারপরে দৃষ্টি আবিল হয়ে প্রমীলার দুচোখ বেয়ে ধারা নেমে এল।

সেদিন রাত্রিতে প্রমীলার ঘুম হয়নি ভালো।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুপুরে দেবিকার অন্য কাজ। সমাজসেবা।

এখানে একটা মহিলা-সমিতি আছে, দেবিকা তার এক্স-অফিসিও প্রেসিডেণ্ট। তার অর্থ, নিজের নামের জোরে নয়, স্বামীর চাকরির জোরে। যদি তাকে অর্চনা করে তার স্বামীর থেকে আদায় করতে পারে কখনো সরকারী চাঁদা। একটু বা নেকনজর।

আগের কালেক্টরের বইর নাম ছিল বাণী। তখন সমিতির নাম ছিল বাণী-সমিতি। এখন দেবিকার নামে দেবী-সমিতি হয়েছে। সবাইর ইচ্ছে এককালীন একটা মোটা চাঁদা দিয়ে এই নামটা দেবিকা পাকা করে গেঁথে দিয়ে যায় দেয়ালে। মেয়েদের দেবিত্বটা চিরস্থায়ী করে রাখে। তারপরে দানবী-মানবী কে কবে আসে না-আসে তার ঠিক কি ?

মাসে দুবার করে বসে, দু রবিবার। প্রায়ই দেবিকা যায় না, অথচ প্রতিবারই প্রত্যাশা করে তাকে সভাপতিত্ব করতে নিমন্ত্রণ করবে। সমিতির উপর তার বড় অবজ্ঞা। সেই কটা ভুল-কথা-ওলা গান, টুকে-লিখে-আনা প্রবন্ধ। সবশেষে সেই চেঁচামেচি, ঝগড়া-বচসা। বেশির ভাগই উকিলনী-মোক্তারনী, নীলাচলের ভাষায়, জটিলা-কুটিলা। রান্নাঘর, মেয়ের সম্বন্ধ, বেপাড়ার কেচ্ছা। চীৎকারে বাজখাঁই, আবার ফিসিরফিসিরে গভীরসঞ্চারী।

এবারো বিধিমত বলতে এসেছিল দেবিকাকে। নির্ধারমত বলেছিল দেবিকা, 'কি করে যাই বলুন, সময় কোথায় ?' কিন্তু এখন, হঠাৎ, খাওয়া-দাওয়ার পর, দেবিকা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'আমাকে এখন একবার আমাদের সমিতিতে যেতে হবে। আর বলিস কেন, আমি আবার তার প্রেসিডেন্ট। না গেলেই নয়।'

সমিতি, মেয়েদের সমিতি। তামসীর মনটা ঝলমল করে উঠল। দেবিকা তা বলে সাধারণ মেয়েদের নীরস সংস্রব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি। সাধারণ সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার খোঁজ রাখার চেষ্টা করে এখনো। আর, অজানতে, মনে হয়তো বা অসাধারণ চিন্তার তাপ লাগে মাঝে-মাঝে।

'কী হয় সমিতিতে ?'

মুখ-চোখ গম্ভীর করল দেবিকা, মোটা গলায় বললে, 'সমাজসেবা।'

'যেমন ?'

'রন্ধনশিল্প, ফার্ষ্ট এড, প্রসূতিচর্যা। অল্পখরচে ঘরদোর ফিটফাট করতে শেখা, একটু বা গার্ডেনিং। এক কথায়, মেয়েরা যাতে সত্যিকারের সুগৃহিনী হতে পারে।' দেবিকা ঢোঁক গিলল, যেন বুঝতে পারল সুগৃহিনীত্বে বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই তামসীর। যেন তাই বললে সংকুচিত হয়ে, 'তুই একটু গড়া, আমি এক চক্কর ঘুরে আসি। আর দিবানিদ্রা যদি অভ্যেস না থাকে, বই আছে, পড় বসে-বসে।'

এমন কিছু ভুরিভোজ হয়নি যে বিছানায় টান হতে হবে ; আর পড়বার মত বই যা আছে তা নিতান্ত খেলো-মলাটের শস্তা ডিটেকটিভ উপন্যাস। ঝকঝকে মলাটের যে কটা মোটা বই ড্রয়িংরুমের ঘুরন্ত তাকে শোভা পাচ্ছে তা পড়বার জন্যে নয়, তা আসবাবের সামিল। এক উপায় আছে, নীলাচলের সঙ্গে গল্প করা। সম্ভব হলে, একটু বা তার সহানুভূতি জাগানো। কিন্তু ভদ্রলোক এখন খাটো পাজামা পরে পাশ-বালিশ জড়িয়ে পাশের ঘরে নাক ডাকাচ্ছেন।

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল তামসী। মফস্বলের শহর দুপুরের রোদে অসাড় হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, ধুলো নেই, ছায়া নেই। যেন একটা তৃষার্ত শূন্যতা তার বুক জুড়ে বসেছে। ভাবল, কোথাও বেরিয়ে পড়ে রাস্তা ধরে। কিন্তু, কে বলবে, জেলখানার দুয়ার কোন দিকে ?

দেবিকার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যাহোক, ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি। কিন্তু, একি, ফিরে এসেছে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে। চোখে-মুখে আগুনের হলকা।

কী হল ?

সভা ভেঙে গিয়েছে। ভেঙে দিয়েছি। এই সমিতিটাই ভেঙে দেব। ওরা ভেবেছে কী আমাকে।

কেন, ব্যাপার কী ?

ব্যাপার যা হয়েছে তা সাংঘাতিক। আজকের সভায় দেবিকার যাবার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা দেখে মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে সভাপতি করা হয়েছিল। কিন্তু সভা আরম্ভ হবার পর আচম্বিতে দেবিকা এসে হাজির। সমিতির সেক্রেটারি তখন শিক্ষয়িত্রীর গা টিপলেন তার চেয়ারটা দেবিকাকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু, শিক্ষয়িত্রী তেজী মেয়ে, রাজি হল না। দেবিকার জন্যে দূরের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলে উদাসীন ভাবে। সেক্রেটারি তখন প্রকাশ্যে সভাপতিমনোনয়নের নতুন প্রস্তাব করলে। একবাক্যে সমর্থন করল সবাই। দেবিকার দাবি যে পশ্চাতে এলেও অগ্রগণ্য এ সন্দেহ করবারও কোথাও ফাঁক নেই। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী কিছুতেই তার আসন ছাড়ল না। বলল, 'যথারীতি সভাপতি নির্বাচিত হবার পর এ সভার কর্তৃত্ব করব আমি, আর কেউই নয়, তিনি যে কেউই হোননা কেন। যতক্ষণ আমি এ সভা না ভেঙে দিচ্ছি ততক্ষণ আমার নির্বাচন নাকচ হবার নয়।'

প্রথমে গোলমাল, পরে গালাগালি শেষে যখন প্রায় চুলোচুলির কাছে চলে এসেছে তখন শিক্ষয়িত্রী উচ্চকণ্ঠে সভাভঙ্গের ঘোষণা করলে। সেইটেই যেন দেবিকার বুকে হাতুড়ির ঘা বসাল। সবাই ছুটে-ছিটকে বেরিয়ে গেল একে-একে, বলে-কয়ে কিছুতেই আর তাদেরকে ফেরৎ আনা গেল না। শিক্ষয়িত্রীর পরিত্যক্ত চেয়ারে আর বসা হলনা দেবিকার।

শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে দেবিকা বিষায়িত হয়ে উঠেছে: 'আমি জানি ঐ মেয়েটাকে। কেশো রুগী, যক্ষ্মা আছে। হাড়গিলের মত চেহারা। সমাজে-সংসারে তো ঠাঁই পাবে না তাই রাজনীতি ধরেছে। হাল-বৈঠা কিছু নেই তাই হাওয়া বুঝে পাল তুলে দিয়েছেন। দাঁড়াও, পাল-ফোলানো বার করে দিচ্ছি। ইস্কুল-কমিটিরও আমরাই প্রেসিডেন্ট, রাজনীতির ঝাঁজ আর আমাদের কাছে ফলাতে হবে না।'

বিকেল পর্যন্ত মেজাজ এমনি তিরিক্ষি করে রইল দেবিকা। সাধ্য নেই তার সঙ্গে তামসী হৃদয়ের একটি নিভৃতি রচনা করে। তার মনের কথার পবিত্র পরিবেশ পায়।

কিন্তু সন্ধ্যা আছে। ছায়া আসছে দীর্ঘতর হয়ে। নদীর পারের নির্জনতায় নিশ্চয়ই তাকে বেড়াতে ডাকবে দেবিকা। ঘাসের উপর বসে তারা তারা-ফোটা দেখবে, দেখবে পাখিদের ফিরে আসা। তখন বলবে। পারবে না বলতে ?

কিন্তু সন্ধ্যায় অন্য কাজ। পাঠচক্র। জজসাহেব প্রবন্ধ পড়বেন। বড় জ্ঞানী লোক, উপনিষদের কাষ্ঠকীট। যত না আইন বোঝেন তার চেয়ে বেশি বোঝেন উপনিষদ।

নাস্নে সুখমস্তি। তাই তাঁর সমস্ত কিছুই বিপুল, চোখ থেকে ভুঁড়ি, স্বর থেকে মুখব্যাদান।

চক্র বসবে আজ দেবিকার বাড়িতে। নির্বাচিত মণ্ডলীর কাছে। প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রকাব্যে উপনিষদের প্রভাব।

প্রথমে আসছেন মেয়েরা। সব উঁচু-দাঁড়ের অফিসরের স্ত্রী। বসেছেন একটা আলাদা ঘরে। ঘন হয়ে। একটা ফুলদানির নিচে একটা কাগজের টুকরো চাপা দেয়া। কে না জানে মেয়েদের কৌতূহলের কথা। একজন কাগজের টুকরোটা তুলে নিলেন। কোনো গোপনীয় চিঠি নয়, একটা ক্যাশমেমো। মেমসাহেব কলকাতার এক নামকরা দোকান থেকে যে জমকালো দাম দিয়ে একটা নেকলেস কিনেছেন তারই রূঢ় বিজ্ঞাপন। শুধু চোখে দেখে না ঠিকমত মূল্য দিতে পারে তার জন্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে। গয়নার গায়ে আর দাম লেখা থাকেনা, আর, কত দাম দিয়ে কিনলেন এ প্রশ্নটা কত মাইনে পান-এর মতই অশিষ্ট। কৃপণ মফস্বলে কারুই জহুরির চোখ নেই। তাই সভা করে সবাইকে জানাতে হলে কায়দা করে ক্যাশমেমো দেখানোটাই প্রশস্ত। নির্ভুল দলিলী প্রমাণ।

তামসীকে সঙ্গে করে দেবিকা ঘরে ঢুকল। ব্লাউজের গলা গভীরে নামানো, তাই একলক্ষ্যে সবাইর চোখ পড়ল সেই নেকলেসের উপর। এমনিতে হয়তো চমকাত না কেউ, কিন্তু ক্যাশমেমোর অঙ্কপাত মনে করে সবাইর মোহাবেশ উপস্থিত হল। প্রশংসায় ঝংকৃত হয়ে উঠল সবাই। কী আশ্চর্য মানিয়েছে দেবিকাকে। কী ভীষণ দাম হয়েছে না-জানি। এ সব আর দেবিকার কানে মামুলি খোসামোদ শোনাচ্ছে না, শোনাচ্ছে আন্তরিক স্তুতির মত, খানিকটা বা ঈর্ষা-মেশানো। কেননা এদেরকে যে সত্যি-সত্যি ক্যাশমেমো দেখানো হয়েছে। অটুট দলিল।

কিন্তু সঙ্গের ওটি কে? আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, বিকারহীন মুখে বললে দেবিকা। পরিচিতি শুনে চমকাল তামসী। বন্ধু বলতে পারে না পাছে অহংকারে ঘা লাগে, বোন বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলতে পারে না পাছে পদমর্যাদার হানি হয়। দূরসম্পর্কের আত্মীয় বললেই কেমন যেন দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় শোনায়। শোনায় সাহায্যপ্রার্থীর মত। তামসীর বেশবাসের অকিঞ্চনতার সঙ্গতি আসে।

চক্র বসেছে বড় ড্রয়িংরুমে। সভা বসেছে কলেক্টরের কুঠিতে, প্রবন্ধ পড়ছেন জজসাহেব, দু'দলের কর্মচারীরা ভিড় করেছে বারান্দা পর্যন্ত। সবাই পদস্থ, তাই সবারই পদবিশিষ্ট পোষাক পরনে। বাঙলা সংস্কৃতির সম্মান দেখাতে গিয়ে না কলেক্টর বাহাদুরের অসম্মান করে। শুধু জজসাহেবই একমাত্র উদ্দণ্ড ব্যতিক্রম: পরনে দেশী তাঁতের ধুতি,

গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, কাঁধে জরিদার মাদ্রাজী চাদর, পায়ে শ্রীনিকেতনের চটি। দেখাচ্ছে মঠবাসী আশ্রমগুরুর মত।

সুরু হল প্রবন্ধপাঠ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—এই সূক্তের প্রতিপাদনের সময় দেবিকার মহলে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। ত্যাগ করেই জজসাহেব ভোগ করছেন বটে। মাসের বাজার নায়েবনাজির করে দেয়, পিওনিচাকরি পেতে কে দুটো গরু কিনে দিয়েছে, কাঠ আর ঘি জোগাচ্ছে কোন কোথাকার কমন-ম্যানেজার। কোন উকিল শীতের লেপ-তোষক কিনে দিয়েছে, কোন মুন্সেফ নেটের মশারি। আর এই যে পাঞ্জাবি-চাদর দেখছ এ দিয়েছেন অফিসিয়েটিং সবজজের বউ, ভাই ডেকে ভাইফোঁটার উপহার।

'আর, কে জানে হয়তো এই প্রবন্ধটাও আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।' এ-ডি-এমের বউ টিপ্পনি কাটল।

এখনও সেই পরনিন্দা, খলভাষ! তামসী হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু, নিরুপায়, দেবিকাকে সে চটাতে পারে না। কুৎসা-কলঙ্ক শুনে তাকেও হাসতে হয় মৃদু-মৃদু। মাথা দোলাতে হয়।

হায়, কতক্ষণে দেবিকাকে পাওয়া যাবে নিরালায়? কতক্ষণ তার কাছে সে একটু কাঁদতে পারবে?

রাতের খাওয়ার পর তিন জন লনে পাইচারি করতে নাগল। নীলাচল পাইপ টানছে আর বিলেতের গল্প করছে। আর, শুনে-শুনে অর্ধভ্রমণ হয়ে যাওয়ার দরুন বর্ণনার অসম্পূর্ণতা সংশোধন করছে দেবিকা। তামসী উন্মনার মত শুনছে শুধু রাত্রির হৃৎস্পন্দন।

গুডনাইট জানিয়ে নীলাচল অন্তর্হিত হল। শেষ ফুলটাকে একটু নেড়ে আদর করে দেবিকাও চলে যাচ্ছিল, তামসী তার আঁচল চেপে ধরল। বলল, 'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল দেবিকা। একটু বোস আমার সঙ্গে। আমি কেন এলাম তোর কাছে, তা যে তুই একেবারেই জানতে চাইলিনা। এ আর আমি সহ্য করতে পারছিনা। আমাকে একটুখানি সময় দে।'

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

নাচ-গান-বাজনার শিল্পী

মণিলাল সেনশর্ম্মা

নাচ, গান ও বাজনাকে যারা পরিবেশন করে সে-সব শিল্পীর অনেক যত্ন ও কষ্ট করে অনেকগুলি নিয়মও অভ্যাস করতে হয়। শিল্পী যে বস্তু পরিবেশন করবে সেটি শিখে নিতে তার অনেক যত্ন ও অভ্যাস প্রয়োজন সে তো জানা কথা। পরিবেশন কাজে নিপুণ হতে হলে কি কি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক সেগুলি শুধু নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। পরিবেশন করা বললে বুঝতে পারা যায় যে একটা কিছু তৈরী আছে যা পরিবেশন করতে হবে। তাছাড়া আরও অনুমান করা সম্ভব যে, পরিবেশক তৈরী করতে সক্ষম হলেও পরিবেশন কালে যাতে পরিবেশনটি ক্রটি-বিহীন, মনোরম ও নিপুণ হয় সেদিকেই তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করবে সমাজের লোকের কাছে। শিল্পীর উপর অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া আছে এইজন্যে যে সমাজের কাছে তারা উচিত ও ললিত সঙ্গীতকেই তুলে ধরবে। শিল্পী রঙ্গমঞ্চে বা সঙ্গীত আসরের মধ্য দিয়েই সমাজের সামনে এসে উপস্থিত হয়। যারা সঙ্গীত তৈরী করছেন তারা নেপথ্যে থেকে এই পরিবেকশদের মধ্য দিয়েই তাদের তৈরী জিনিস সমাজের কাছে তুলে ধরে। পরিবেশকের যে-সব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন প্রায় সব সুরকারই সে-সব গুণ সম্বন্ধে উদাসীন হয়। এতে অনুমান করা সম্ভব যে পরিবেশকের কতগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার আর সেগুলি না থাকলে শিল্পী না হওয়াই ভাল।

সঙ্গীত-সভার পরিবেশক সাধারণ ব্যক্তি নয়। তারা নগণ্য হলেও সঙ্গীত আসরে তাদের উপর সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি থাকে। সুকুমার ও মধুর অনেক কিছু পাবার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে থাকে। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীগণ শিল্পীর সামাজিক জীবনকে একেবারে বাদ দিয়ে একমাত্র তার উৎকর্ষের দিকটাই আলোচনা করে গিয়েছেন। তাঁরা শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনকে উল্লেখই করেননি। সঙ্গীত-আসরের বাইরে শিল্পী কি ভাবে দিন কাটায় বা কি শ্রেণীর লোক এসব কিছুই আলোচনার বিষয়ভুক্ত না করে শিল্পী যে জন্যে আসরে উপস্থিত সে বিষয় তার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

গীতবাদ্যনৃত্যশিল্পীকে খুব সাবধান হতে হয় এই জন্যে যে তারা আসরে উপস্থিত জনগণের সম্মুখে যে বস্তুর সৃষ্টি করে তা বড়ই ক্ষণবিধ্বংসী। এইসব শ্রাব্য ও দৃশ্য বস্তু সঙ্গীত সভায় আবির্ভূত হয়ে আবার, সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হয়ে যায় কিন্তু উপস্থিত জনগণের মনের মধ্যে তাদের দোষ বা গুণ দুই থেকে যায়। দোষগুলিকে বাতিল করে দিয়ে পরে সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্যে শিল্পীকে যা আসরে দিতে এসেছে সে-সম্বন্ধে খুব কুশলী হতে হবে; যাতে

কোন দোষ ত্রুটি না হয়ে পড়ে তার জন্য সচেতন থাকতে হবে তাছাড়া আর কি ভাবে পরিবেশন করলে মনোরম হবে সে বিষয়ে নিপুণ হতে হবে।

গীতশিল্পী সম্বন্ধে ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রে (প্রথম শতক?) উপদেশ আছে যে শুধু স্ত্রীলোকই গান করবে—অর্থাৎ সঙ্গীত আসরে গান করবে। কেননা স্ত্রীকণ্ঠ স্বভাবতই বেশী মধুর আর গীতোপযোগী। পুরুষদের সম্বন্ধে ভরত বলেছেন যে পুরুষরা শুধু বাজাবে, কেননা বাদ্যের শ্রমসাধ্য হস্তকুশলতা বা ফুৎকারচেষ্টা স্ত্রীলোকদের পক্ষে কষ্টকর ও অস্বাভাবিক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব তার 'সঙ্গীত রত্নাকারে' স্ত্রীপুরুষ দুজনেরই গান করার কথা বলেছেন। পুরুষদের গান করার সময়ে অসাবধান হলেই আবেগের অবস্থায় সহজে তাদের স্বভাবের অনুচিত অঙ্গ সঞ্চালন ও মুখবিকৃতি (মুদ্রাদোষ) অনেকখানি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মেয়েদের এমন একটা স্বাভাবিক কোমলতা—স্নিগ্ধতা—শোভনতা আছে যার ফলে মুখবিকৃতি বা অশোভন অঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব হয় না। তার অবশ্য ব্যতিক্রম হয় শিক্ষাকালে কুগায়কের অনুকরণ করার দোষে। কিন্তু তা-ও পুরুষের মুদ্রাদোষের অনুপাতে অনেক কম।

ভরতের পুস্তকে মুদ্রাদোষের উল্লেখই নেই। সে সময়ে সঙ্গীত আসরে গান স্ত্রীশিল্পীরা করত আর তাদের মুদ্রাদোষ ছিল না। পুরুষরা একেবারে গানই করত না বললে ভুল হবে। আবেগবশে, বন্ধু মহলে বা অভাবপক্ষে পুরুষ গান করত। কিন্তু সে সময়ে গান করা ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের স্থানই প্রথম। সে-যুগে সব উৎসবে সব কাজে স্ত্রীলোক পুরুষদের সহযোগীই ছিল। তখনও বৈদেশিক সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবার প্রয়োজন ছিল না। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতাব্দিতে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিরাজ সিঙ্ঘনের আশ্রয়ে থেকে সেখান হতেই সঙ্গীতশাস্ত্রের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ 'সঙ্গীতরত্নাকর' লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীর বংশোদ্ভব ছিলেন। আর সে সময়ে কাশ্মীরের স্ত্রীলোক ক্রমশঃ অন্তঃপুরবাসিনী হতে আরম্ভ করেছে এবং গান করার ভার ক্রমে পুরুষদের উপর পড়েছে কাজেই শার্ঙ্গদেবের সময়ে পুরুষদেরও গান গাইবার ব্যবস্থা হয়েছে এরূপ অনুমান করাও স্বাভাবিক। 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' স্ত্রী ও পুরুষ দু-ই গান করবে বলা হয়েছে। কিন্তু পুরুষ গায়কদের পঁচিশ রকম মুদ্রাদোষের বর্ণনা করে সতর্ক করে তিনি দিয়ে গিয়েছেন।

গান-পরিবেশকদের কি কি গুণ থাকা উচিত সে সম্বন্ধে 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' যে বর্ণনা আছে তা বর্ত্তমানকালেও প্রযোজ্য। গীত শিল্পীকে 'হৃদ্যশব্দ' ও 'সুশারীর' অর্থাৎ সুকণ্ঠ ও মানানসই—সুন্দর শরীরযুক্ত হতে হবে। গীতশিল্পীর 'কণ্ঠজ' হতে হবে—অর্থাৎ শব্দের মৃদুতা ও উচ্চতা আয়ত্তাধীন করে প্রকাশ করতে পারা চাই। তিন সপ্তকে (মন্দ্র মধ্য ও তার) অনায়াসে প্রকৃষ্টশব্দের সঙ্গে গমকাদি (বিশেষগীত-অলংকারগুলি) সহকারে উঠানামা করতে পারে এমন কণ্ঠস্বর থাকা চাই। গীতোপযোগী শ্রমে অভ্যস্ত, অনুচিত অঙ্গভঙ্গি মুখবিকৃতি (মুদ্রাদোষ) যাতে না হয় তাতে সাবধানী, নানাবিধ গানরূপ আলাপে কুশলী, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন হয় এরূপ গান করতে পারদর্শী, রাগরাগিণী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই আর তালজ্ঞ হওয়া চাই। গান কিভাবে আরম্ভ করে কিভাবে গেয়ে কখন শেষ করতে হবে সে পরিমাণজ্ঞান (গ্রহমোক্ষ বিচক্ষণ) শিল্পীর থাকা চাই।

সুকণ্ঠী গীতশিল্পীর অনেককিছু ত্রুটিই ধরা পড়ে না কিন্তু স্বাভাবিক মিষ্ট-কণ্ঠ সকলের তো

থাকে না। তবে চেষ্টা করে মার্জ্জিত করে কণ্ঠস্বর চলনসই শ্রুতিমধুর করা সম্ভব। তাছাড়া কণ্ঠস্বর মিষ্টি রাখবার চেষ্টা থাকা চাই। সেজন্যে যখন তখন যা-তা খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে হয়; কণ্ঠের উপর অত্যাচার হয় এমন সব বর্জ্জন করতে হয়, নানা ব্যাপারে সংযত হতে হয় তা-না হলে কিছু পরে কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব লোপ পায়। যার কণ্ঠস্বর মিষ্টি নয় তার গীতশিল্পী হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও গীতশিল্পী হওয়ার সাধ বর্জ্জন করে সুরশিল্পী (বাজিয়ে) হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। আসরে শিল্পী থাকবে লোকের চোখের সামনে সেজন্যে তার শরীর বেমানান হলে গান জমবে না অথবা গান জমতে অনেক দেরী হবে। গীতশিল্পীকে যে নটনটীর মত সুশরীর হতে হবে তা নয় তবে একেবারে কুৎসিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া শিল্পীকে সময়ের রুচি অনুযায়ী পরিচ্ছদ ব্যবহার আর প্রসাধন করতে হয়। যতদিন না সহজে অনায়াসে মন্দ্র মধ্য ও তার সুরগুলি কারুকাজসহ কণ্ঠে মধুর হয়ে আসবে অর্থাৎ অনেক অভ্যাসের ফলে সুরের উপর বেশ দখল না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পী আসরে গাইবে না। তাছাড়া প্রহরব্যাপী একটানা গান করতে পারগ হতে হবে, সে শ্রম করতে অভ্যস্ত হতে হবে। সর্ব্বোপরি আসরে সর্ব্বক্ষণ মুদ্রাদোষবর্জ্জিত হয়ে গাইতে হবে।

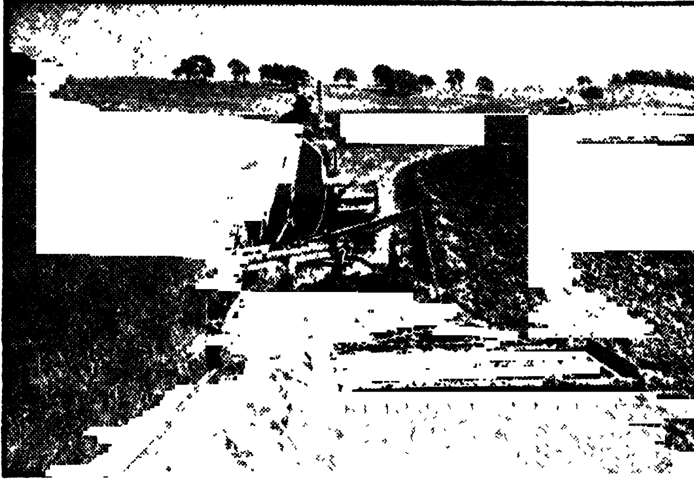
নাচে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই দরকার হলেও অঙ্গসৌষ্ঠব ও তার সুকুমারত্বের দিক হতে নর্ত্তন-ব্যাপারে নর্ত্তকীই শ্রেষ্ঠ। গাত্র বিক্ষেপ দিয়ে যে সুন্দর এক বিশিষ্টরূপে স্থায়ী ও সঞ্চরণশীল মনোভাব ব্যক্ত করা নৃত্যের কাজ তাতে স্ত্রীলোকের স্থানই প্রধান। ভাস্কর্য্যের সঙ্গে নটনটীর দৈহিক সুষমার ঐক্য আছে। ভাস্কর পাথর খুদে রূপকে নিশ্চলভাবে ধরে রাখে আর নৃত্যরত নট ও নটী নিজেদের দেহকে সচল ভাস্কর্য্যে রূপান্তরিত করে। ভাস্কার্য্য অচল আর নৃত্য সচল। নটনটী তাদের সুসমঞ্জস দৈহিক গঠন সুষমার সাহায্যে লীলায়িত ভঙ্গি দিয়ে ভাবপ্রকাশ করে।

নর্ত্তকীর গঠন তন্বীর আকার হওয়া চাই। নটীর দেহচালনার সহজ ভঙ্গি আসে যখন নটী ক্ষীণকটি শ্রোণীভারমন্থরা পীনোন্নত-পয়োধরা নিটোল নধর অনতিকৃশাঙ্গী নারী। নটকেও হতে হবে ক্ষীণকটি। তাছাড়া তার থাকা চাই প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সুগোল মানানসই অনতিকৃশ দেহ। নাচের প্রকাশভঙ্গির প্রধান উপকরণ সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠন ও ব্যঞ্জনাময় সঞ্চালন। তাছাড়া দেহাবরণ নাচের ছন্দটিকে সামান্যভাবে সাহায্য করলেও নাচে পরিচ্ছদের প্রভাব গৌণ অথবা কোন কোন বিশেষ বিষয়বস্তু প্রকাশ করতেই শুধু প্রয়োজন।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীগণ নট ও নটিকে 'পাত্র' বলেছেন। অর্থাৎ রসভাবের আধার মাত্র। সামাজিক ব্যক্তির কাছে দর্শকের চোখের সামনে নট ও নটী নৃত্যের রসভাব প্রকাশ করে। যেমন পানীয় বস্তু কোনও পাত্রে বা আধারে রেখে পরিবেশন করা হয়; আর সামাজিক ব্যক্তি বা দর্শক ঐ পানীয়ের স্বাদই গ্রহণ করে কিন্তু আধার বা পাত্রকে ভোগ করে না। সেজন্যেই নট ও নটীকে পাত্র বলা হয়েছে। নট-নটী পরিবেশক মাত্র নিজে রসাস্বাদ করবে না। নট-নটী ও অভিনেতা কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না—নিজেরা অভিভূত হয়ে পড়বে না। যদি ঘাতকের অভিনয় করতে গিয়ে মঞ্চের উপর সত্যসত্যই অন্য অভিনেতাকে মেরে ফেলে তবে রস পরিবেশন তো থাকবে না। সেজন্যে প্রাচীন সঙ্গীতশিল্পীগণ নট-নটী সম্বন্ধে বলেছেন যে নর্ত্তনশিল্পীগণ যে রস পরিবেশন করবে তারা নিজেরা সে রস প্রত্যক্ষ করবে না, নিজেদের মনের মধ্যে সে ভাবও হবে না। তাছাড়া সমাজের দৃষ্টির সামনে আসরে মাঝে মাঝে অতি সামান্য মাত্র দেহাবরণ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে বলে তাদের সংকোচ থাকলে চলবে না।

আদর্শশিল্পীর দেহ-গঠন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সে রূপ খুবই বিরল আমাদের দেশে। তাছাড়া শরীর সুন্দর রাখবার কষ্টকর চেষ্টা আমাদের দেশে কেউ করে না। শাস্ত্রকার বলেছেন দৈহিক গঠনের কিছু অভাব থাকলেও সুচারুতা সম্ভব যদি দৈহিক সৌন্দর্য্য ছাড়া আরও কতকগুলি গুণ যা নটনটীর থাকা প্রয়োজন সেগুলি বেশী করে থাকে। সেগুলি—'লাবণ্যকান্তি মাধুর্য্যধৈর্য্যোদার্য্য-

কম খরচে ভাল চাষ



একটি **৩-বটম প্লাউ**-এর মই হলো ৫ ফুট চওড়া, তাতে মাটি কাটে ন' ইঞ্চি গভীর করে। অতএব এই 'ক্যাটারপিলার' ডিজেল ডি-২ ট্র্যাকটর কৃষির সময় এবং অর্থ অনেকখানি বাঁচিয়ে দেয়। ঘণ্টায় ১½ একর জমি চাষ করা চলে, **অথচ তাতে খরচ হয় শুধু দেড় গ্যালন জ্বালানি।** এই আর্থিক সুবিধাটুকুর জন্যই সর্ব্বদেশে এই ডিজেলের এমন সুখ্যাতি। তার চাকা যেমন পিছলিয়ে যায় না, তেমনি ওপর দিকে লাফিয়েও চলে না। পূর্ণ শক্তিতে অল্পসময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করবার ক্ষমতা তার প্রচুর।

আপনাদের প্রয়োজনমত সকল মাপের পাবেন

ট্র্যাকটরস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্

৬, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

ফোনঃ কলি. ৬২২০.

প্রগলভতা'।—লাবণ্য অর্থে পরিমাণ—শ্রী। লাবণ্য থাকলে অন্যান্য অনেক কিছুর অভাব থাকলেও সব দোষ নষ্ট হয়ে যায়। পরিচ্ছদ ও প্রসাধন সামগ্রীর সাহায্যে কান্তি আনা সম্ভব হয়। মাধুর্য্য, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যের অভাব থাকলে নাচ বাজনা বা গান জমে না। ধরা থাক—একদল আনারী গোলমাল করছে বলে ধৈর্য্য হারালে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া নিজদের মধ্যে কেউ আসার বসে যদি ভুল করে তাতে ক্রোধ না করে ঔদার্য্যের সাহায্যে তাকে অতিক্রম করতে হবে। খুব অভ্যাসের ফলে শ্রমে কাতর না হয়ে সবকিছুর অভ্যাস পরিমাণ ঠিক রাখতেই মাধুর্য্য ফুটে উঠে। সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর সামান্য নির্লজ্জতার অর্থে 'প্রগলভতা' ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ যদি হঠাৎ শিল্পীর ভুল হয়ে যায় আর শিল্পী লজ্জিত হয়ে ও ক্রমে ভীত হয়ে পড়ে তবে সঙ্গীত ক্ষুণ্ণ হয়।

নাচের উৎকর্ষ উত্তর ভারত হতে দক্ষিণ ভারতে প্রাচীনকাল হতেই আছে। আর আমাদেরও সবসময়ে পেয়ে এসেছে। বাংলায় নাচের উৎকর্ষ নতুনভাবে মাত্র পনর বৎসর হলো চলেছে। উত্তর ভারতীয় নাচ দক্ষিণ ভারতীয়ের তুলনায় খুব নিম্নস্তরের, তাছাড়া শিল্পীর আদর্শ উত্তর ভারতীয় নাচে মধ্যযুগে ছিল কিনা জানিনা তবে বর্ত্তমানে নেই বললেও চলে, বাংলা আঠার শতক হতে উত্তর ভারতীয় গানবাজনা নাচের অনুকরণ করাতে বাংলায় উত্তর ভারতীয় নাচের নিকৃষ্টতম সংস্করণ প্রচলিত ছিল। সেগুলির আবেদন রুচি অনুযায়ী ছিল না বলে সকলেই নাচকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখে এসেছে এতকাল।

সুর ও ছন্দ এই দুই নিয়ে আমাদের বাজনাও দুভাগে ভাগ করা আছে। ছন্দে, গানে, বাজনায় ও নাচে ব্যবহৃত হয় বলে এই তিনটি ভিন্নপন্থী কলাকে একত্রে বাঁধতে ছন্দই সমর্থ। সে জন্যেই অভাবস্থলে একমাত্র তালজাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে নাচ বা গান বাধা হয়। কিন্তু ক্রমে সুরজাতীয় বাজনার ব্যবহার গানে ও নাচে—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে গৌন ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। অথচ সুরজাতীয় যন্ত্রে ছন্দ রাখা সম্ভব ও সমীচীন। প্রাচীন শাস্ত্রীগণ বলেছেন পুরা সঙ্গীত ব্যাপারে গীত হবে প্রধান, বাদ্য গীতকে অনুবর্ত্তন করবে, এবং নৃত্য বাদ্যকে অনুগমন করবে। এই সূত্রটি পূরা গীতবাদ্যনৃত্যসমন্বয়ে যে সঙ্গীতের পরিকল্পনা তারই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কীর্ত্তণের মূলগায়ক নতুন নতুন সুর সংযোজনা করবে বাজনা তাকে অনুসরণ করবে বা নৃত্যও সুর ও ছন্দের সাহায্যে সচল হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু নৃত্যপ্রধান সঙ্গীতে বা বাদ্যপ্রধান সঙ্গীতে গায়কই প্রধান হবে না। অথচ সে ভুল করে গানকে কণ্ঠসর্ব্বস্ব করে রাখা হয়েছে আর বাদ্যপ্রধান সঙ্গীত বা নৃত্যপ্রধান সঙ্গীত অর্থাৎ সঙ্গৎসঙ্গীত গড়েই উঠেনি এতকাল।

গীতশিল্পীদের সম্বন্ধে যে সব নিয়ম পালন করার কথা বলা হয়েছে বাজিয়ে সম্বন্ধেও সে সব কথাই খাটে। কেননা আমাদের দেশে একক যন্ত্র বাজিয়েরা গায়ন-পদ্ধতিতেই বাজায়। যে সব বাজিয়ে গীত বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে বাজাবে তারা অথবা যন্ত্রসজ্জ, গীত, বাদ্য বা নৃত্যের ত্রুটিগুলি আবরণ করে নিতে কুশলী এমন গুণী হওয়া চাই। ভাল সারেঙ্গী বাজিয়ে গায়িকাকে অনেকভাবে সাহায্য করে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে; যেখানে কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায় সেখানে সারেঙ্গীর আওয়াজ দিয়ে সে সুর মধুর করে নেয়। ভাল বাজিয়ের সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হয় কিরূপে গানটিকে আরও মধুর মনোরম করা সম্ভব। ছন্দ রাখবার যন্ত্র বাজিয়েদের দাপটেই আমাদের কানে বিশ্রী লাগে। এইজন্যেই মৃদঙ্গ বা বায়াতবলা প্রায়ই গানের কথা ও সুরকে ঢেকে ফেলে; তাছাড়া তবলচীদের যে সব মুদ্রাদোষ থাকে সেগুলির বিবরণ গীতশিল্পীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যন্ত্রবাজিয়েদের আর একটি গুণ নৃত্যের বাজনায় থাকা প্রয়োজন যে নটনটীর অভিপ্রায় বুঝে বাদ্যে অনুসরণ করা। নৃত্যগীত ব্যাপারে শিল্পীদের ছন্দের ভুল, সুরের ছোটখাট ত্রুটি সব সময়েই হয়। সে সব ত্রুটিকে অতিক্রম করে নিতে পারে সহজে কেবল পুরুষ গুণী বাজিয়েগণ। সে জন্যেই হয়ত নাট্যশাস্ত্রের বিধান রয়েছে যে পুরুষেরা শুধু বাজাবে।



পূর্ব্বাশা

অগ্রহায়ণ

কল্‌কাতা

নভেম্বর — ১৯৪৫

চিত্রাধিকারী ঃ

জাতীয় প্রদর্শনী

পূর্বাশা

নবম বর্ষ ● অষ্টম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ● ১৩৫৩

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সমাজের ক্ষতচিকিৎসকমাত্রই আজকের দিনে সাম্যবাদের (communism) দাওয়াই হাতে নিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সুবিখ্যাত দাওয়াই কুইনিনের মতোই সাম্যবাদ কথাটা আজ সর্ব্বজনবিদিত এবং হয়ত কোনো কোনো স্থলে কুইনিনের মতোই কথাটা তিক্ততা অর্জ্জন করতেও সুরু করেছে। কেবল যে জনশ্রুতির তিক্ততা তা-ই নয়, ভুক্তভোগীর তিক্ততার কাহিনীও আছে।

এ-তিক্ততার কাহিনী আলোচনা করবার আগে সাম্যবাদ বস্তুটিকে একটু পর্য্যবেক্ষণ করে নেওয়া দরকার। ওর জন্মের সন-তারিখ নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই—যেদিন থেকে ও সুশিক্ষিত হয়ে 'সামাজিক জীব' হিসেবে কাজ করতে সুরু করেছে সেদিনটির দিকে আমাদের একবার ফিরে তাকান দরকার। তার মানে কাল্পনিক নীড় ছেড়ে বিজ্ঞানের বাস্তব ভিত্তিতে যখন সাম্যবাদ আত্মপ্রকাশ করল—সে যুগটিই আমাদের স্মরণীয়। আরো সোজা কথায়—সাম্যবাদ বলতে কার্ল মার্ক্স কি বুঝতেন তা-ই আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

মার্ক্সের ভাষায় সাম্যবাদের স্বরূপ দ্বান্দ্বিক (অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক বিবর্ত্তন) চিন্তার সঙ্গে জড়িত।

দ্বন্দ্ববাদের ঊর্দ্ধগতিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর চিন্তায় সাম্যবাদ রূপ পরিগ্রহ করেনি। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিরোভাবে সমাজের দেহে যে একটি নঞ-ব্যঞ্জক অবস্থা তৈরী হয়ে চলেছিল, মার্ক্স বলেছিলেন, তাকে নাকচ করে দেওয়ার ভারই সাম্যবাদের উপর: সাম্যবাদের উপরই সামাজিক উন্নতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ভর করছে—সে সামাজিক উন্নতি শৃঙ্খলিত, রোগগ্রস্ত সমাজের মুক্তি ও আরোগ্য সাধনার সঙ্গেই জড়িত। সাম্যবাদ ভবিষ্যতেরই একটি ছবি, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবারই শক্তিমন্ত্র।[১] মার্ক্সের একথাগুলো অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে ধনবিজ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতির প্রয়োগ করেই তিনি সাম্যবাদকে ভবিষ্যতের রূপ ও মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ ভবিষ্যৎ কি স্বয়ম্ভু—আপনা থেকেই কি তার আবির্ভাব হয়? এ-ধরণের কোনো প্রশ্ন যদি আমাদের মনে জেগে ওঠে তার উত্তর আমরা মার্ক্সের কথা থেকেই পেতে পারি: একটি সমাজের অন্তর্গত উৎপাদন-শক্তিগুলোর পূর্ণবিকাশ না হতে সে-সমাজ বিলুপ্ত হয়না আর উন্নততর একটি উৎপাদন সম্বন্ধও আত্মপ্রকাশ করতে অক্ষম হয় যদি না পুরণো সমাজেরই গর্ভে তার বেঁচে থাকার বাস্তব অবস্থা সুচারুভাবে তৈরী হয়ে ওঠে।[২] সাম্যবাদের উন্নততর উৎপাদন-সম্বন্ধের প্রসঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজই পুরণো সমাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলো পূর্ণবিকশিত হয়ে গেলেই তার বিলুপ্তি ঘটবে এবং তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে ভবিষ্যতের উন্নততর উৎপাদন-সম্বন্ধ। ধনতন্ত্রের গর্ভ থেকে সাম্যবাদের জন্মের কথা মার্ক্স তাঁর পরবর্ত্তী রচনায়ও[৩] বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে যখন সাম্যবাদী সমাজ জন্ম নেয় তখন তার গায়ে তার জননীর (পুরণো সমাজের) শরীরের অনেক চিহ্নই থেকে যায়। সে সব চিহ্নের কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়—তার জন্মপত্রিকাটাই আমাদের কাছে মূল্যবান। সাম্যবাদী সমাজ বলতে মার্ক্স যে ধনতান্ত্রিক সমাজের পরেকার একটি উন্নততর উৎপাদন-সম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজকেই বুঝতেন তা-ই আমাদের জানবার বিষয়। ধনতান্ত্রিকতার জোয়ারের মুখে বসে মার্ক্স এই অবিশ্বাস্য সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে ধনতন্ত্র বা ধনতান্ত্রিক সমাজ একটি স্বয়ম্ভু, শাশ্বত বস্তু নয়—একটি প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ক্ষয় হয়ে গিয়ে তার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে—তেম্নি তারও বিকাশের পর লয় হবে—এবং তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে সাম্যবাদী সমাজ। মানুষের সমাজ এই দ্বান্দ্বিক নিয়ম এড়িয়ে যেতে পারেনি—ধনতান্ত্রিক সমাজও এই নিয়মের বাইরে যেতে পারবে না। মার্ক্স তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'ক্যাপিটেলে' ধনতান্ত্রিক সমাজের এই দ্বান্দ্বিকগতির নিখুঁত চিত্র এঁকে গেছেন। সমাজের চোখের উপর ধনতন্ত্রের যে উজ্জ্বল চিত্র ধরা ছিল—'ক্যাপিটেলে'র আবির্ভাবের পর তার রঙ ম্লান হতে সুরু করেছে।

কিন্তু উৎপাদন-সম্বন্ধের ইতিহাসে ধনতন্ত্রের দানকেও মার্ক্স মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। 'ক্যাপিটেলে' ধনতন্ত্রের শুধু কালোর দিকটাই নয় আলোর দিকটাও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ধনোৎপাদনের দিক থেকে সভ্যতার ছবির দিকে তাকালে দেখা যায় যে মানুষের সমাজ ক্রমেই উন্নততর উৎপাদন-সম্বন্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলা দ্বান্দ্বিক গতিতেই নিষ্পন্ন হয়, অন্য কোনো গতির নিয়মে তাকে বিশ্লেষণ করা যায়না। একটি নঞ-ব্যঞ্জক অবস্থাকে নাকচ করে দেওয়াই দ্বান্দ্বিকগতির অন্যতম সূত্র। ধনতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিরোভাব ঘটায়—এই নঞ-ব্যঞ্জক অবস্থাকে নাকচ করাই ধনতন্ত্রের পরবর্ত্তী উন্নততর উৎপাদন-সম্বন্ধের প্রধান কাজ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে উৎপাদক আবার নিজ সম্পত্তি ফিরে পাবে—ধনতন্ত্র তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে যে ক্ষেতে ও কারখানায় কাজ করিয়েছে—সাম্যবাদ সেখানে তাদের প্রত্যেকের মালিকানা হবে।[৪] ব্যক্তিগত শ্রমদ্বারা যে বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মালিকানার সৃষ্টি হয় তাকে ধনতান্ত্রিক মালিকানায় পরিবর্ত্তিত করা দুরূহ এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার কিন্তু ধনতন্ত্র যখন উৎপাদন-প্রক্রিয়াটাকে প্রায় সমাজগত করে তুলেছে তখন ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমাজগত মালিকানায় পরিবর্ত্তিত করা খুব কঠিন কাজ নয়।[৫] এ কথাগুলো থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর—উন্নততর এই জন্যে যে উৎপাদন-প্রণালী এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্পরমুক্ত হয়ে সমাজগত হয়ে পড়ছে। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক মধ্যযুগের ধনোৎপাদনের চিত্রটি একটু বিশদভাবে বুঝতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে স্বল্পোৎপাদনই সে-যুগের বৈশিষ্ট্য এবং উৎপাদনোপায় শ্রমিকের নিজ সম্পত্তি। কৃষি ছিল ক্ষুদ্র চাষীদের হাতে আর শিল্পদ্রব্য তৈরী করত নগরবন্দরের শ্রমিকেরা। ক্ষেত ও কৃষিযন্ত্র, কারখানা ও কারখানার যন্ত্রপাতি, মানে সমগ্র শ্রমযন্ত্রই ছিল ব্যক্তিগত শ্রমের উপায়-স্বরূপ—ছিল একক ব্যবহারের জন্যেই। কাজেই শ্রমযন্ত্রগুলোর ক্ষুদ্রকায় না হয়ে উপায় ছিলনা। আর সেজন্যেই তার মালিক ছিল স্বয়ং উৎপাদক। এ সব ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত উৎপাদনোপায়কে একজায়গায় জড় করে আজকের দিনের বিপুলায়তন কারখানায় পরিণত করতে ধনতান্ত্রিক উৎপানপদ্ধতির দরকার ছিল এবং সেই সঙ্গে দরকার ছিল সেই পদ্ধতির প্রতিনিধি বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের।[৬] ব্যক্তিগত উৎপাদনকে সামাজিক উৎপাদনে পরিণত করার দরুণই এই সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বৃহদায়তন হতে হয়েছিল—ক্যাপিটেল গ্রন্থের মারফৎ তা আমরা দেখতে পাই। হাজার হাজার লোকের সহযোগিতায় কাজ চলবে বলেই তাঁত আর চরকার বদলে কাপড়ের

আর সূতার কল বসেছে—তাঁতীর ছোট তাঁত ঘরটি রূপ নিয়েছে বিরাট কারখানায়। এখন এ-কারখানা থেকে যে কাপড় তৈরী হয়ে বেরুল তা একটি তাঁতীর শ্রমফল নয়—বহু শ্রমিকের সমবেত শ্রমের ফল। বিশেষ কোনো একজন শ্রমিক বলতে পারবে না: আমিই এ কাপড় তৈরী করেছি—আমিই এর উৎপাদক। সামাজিক জীব মানুষের হারানো সমাজবোধ ফিরে পাওয়া যদি সভ্যতার অগ্রগতি হয়—তাহলে ব্যক্তিগত উৎপাদন পদ্ধতিকে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির দিকে নিয়ে যাওয়াও উৎপাদন-সম্বন্ধের উন্নতি নির্দ্দেশ করে। উৎপাদন-সম্বন্ধের এই উন্নতির মূলে ধনতন্ত্রের দানকে অস্বীকার করা যায়না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদন-সম্বন্ধের অগ্রগতির ইতিহাসে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

উৎপাদন-সম্বন্ধের বিপ্লবের উপরই সামাজিক বিপ্লব নির্ভরশীল। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধকে উৎখাত করেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধ প্রসার লাভ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজও নূতন পর্য্যায়ে রূপায়িত হয়—তার পর একদিন দেখা যায় রাষ্ট্রক্ষমতা ধনিকশ্রেণীর হাতে চলে এসেছে। উন্নত দেশগুলোর ইতিহাসে এধরণের দৃশ্যাভিনয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। ফরাসীদেশে অভিজাতশ্রেণীকে সরাসরি ক্ষমতাচ্যুত করা হল—ইংল্যাণ্ডে অভিজাতশ্রেণীকে ধনিকশ্রেণীতে (Bourgeoisie) পরিণত হতে হল। এঙ্গেল্‌সের ভাষায় বল্‌তে গেলে, অভিজাত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর সংগ্রাম ছিল গ্রামের বিরুদ্ধে নগরের সংগ্রাম, ভূসম্পত্তির বিরুদ্ধে যন্ত্রশিল্পের সংগ্রাম, প্রাকৃতিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে মুদ্রা-অর্থনীতির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে সেখানেই, যেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার অপ্রতিহতভাবে চল্‌তে পেরেছে। যে-যে দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আপন গর্ভে যন্ত্রশিল্পের ভ্রূণকে পরিণত হ'তে দিয়েছে, সেখানেই একদা ধনতান্ত্রিক বিপ্লব পুরণো সমাজের রঙ মুছে দিয়ে নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। বলাবহুল্য যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারেনি।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদন-সম্বন্ধের একটি বিরাট বিপ্লব ঘটালেও উৎপাদন-সম্বন্ধকে গ্লানিমুক্ত করতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যক্তিকে অপসারিত করে সমাজকে অনেকখানি ঠাঁই দিয়েছে সত্যি কিন্তু উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানায় সেখানে ব্যক্তির আসনই কায়েম, মালিকানা তখনো সামাজিক হয়নি। ধনতন্ত্রের এই ক্রটী উৎপাদন -সম্বন্ধকে গ্লানিমুক্ত হতে দেয়নি—আর তারই দরুণ সমাজ নূতনভাবে শ্রেণীবিভক্ত হয়ে একদিকে সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে দারিদ্র্যের গহ্বর তৈরী করে চলেছে। উৎপাদনকে

সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলমুক্ত করে উৎপাদন-সম্বন্ধকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়াই তাই ধনতন্ত্রোত্তর সাম্যবাদী বিপ্লবের লক্ষ্য।

মার্ক্স ধনোৎপাদন পদ্ধতিকেই সমাজের মেরুদণ্ড বলে প্রমাণ করেছিলেন, কাজেই কোনো দেশের সামাজিক বিপ্লবের প্রসঙ্গে সে-দেশের ধনোৎপাদনপদ্ধতিকে উপেক্ষা করা মার্ক্সীয় রীতি নয়। ফরাসী-বিপ্লবের পর সত্যিকারের সামাজিক বিপ্লব মাত্র একটি দেশে সংঘটিত হয়েছে—এবং যে-দেশে তা হয়েছে সেখানে তা খুবই অপ্রত্যাশিত। ধনতান্ত্রিকতার বিচারে রাশিয়া একটি অনুন্নত দেশ কিন্তু সাম্যবাদী বিপ্লব সম্ভবপর হ'ল সেখানেই—আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব সাম্যবাদের মার্ক্সীয় ধারণাকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

ইংল্যাণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মেণী—য়ুরোপের এই তিনটি ধনতন্ত্রপুষ্ট দেশকে উপেক্ষা করে কৃষিপ্রধান দেশে কি করে সাম্যবাদী বিপ্লব সংঘটিত হ'তে পারে—সত্যি তা এক জটিল প্রশ্ন। মার্ক্স বলেছেন ধনতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্পজাত শ্রমসর্ব্বস্বশ্রেণীই (Proletariat) আজকের দিনে সবচেয়ে বিপ্লবী—সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতা হবে তারাই।[৭] উৎপাদনের শরীর থেকে ধনতান্ত্রিক রং মুছে ফেলবার চেষ্টা আছে যন্ত্রশিল্পজাত শ্রমসর্ব্বস্বশ্রেণীরই।[৮] কাজেই যন্ত্রশিল্পে যে দেশ অনুন্নত সাম্যবাদী বিপ্লবের সৈন্য বা সচেতনতা সেখানে তৈরী হওয়া মুস্কিল। অগণিত চাষী এবং মুষ্টিমেয় যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক নিয়েও রাশিয়া মুস্কিলআসান করে ফেল্‌ল। সাম্যবাদী বিপ্লব সম্বন্ধে জারশাসিত রাশিয়ায় অবিরাম তুমুল প্রচারই হয়ত তার খানিকটা কারণ কিন্তু বিপ্লবের নেতা লেনিন এবং বিপ্লবের পুরোধা ট্রট্‌স্কি এ-বিপ্লব সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন্। কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্যে দুনিয়ার মজদুরদের ডাক দিয়ে গেছে—সাম্যবাদী বিপ্লবকে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স কোনো বিশেষ দেশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ করে দেখ্‌তে চান নি। যেখানে ধনতন্ত্র—যেখানে যন্ত্রশিল্প, সেখানেই সাম্যবাদী বিপ্লবের সৈন্য শ্রমিক তৈরী হচ্ছে—ধনতন্ত্রের পৃথিবীজয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌কে তাই দুনিয়ার মজদুরের দিকেই তাকাতে হয়েছিল। লেনিন-ট্রট্‌স্কির সম্মুখে ধনতন্ত্রের যে ছবি ছিল তাতে তার আন্তর্জাতিকতার রঙ আরো পরিচ্ছন্ন। তাঁরা তাই ধনতন্ত্রকে সর্ব্বদেশব্যাপী একটি শক্তি বলে উপলব্ধি করেছেন—বলেছেন, ধনতন্ত্রের শৃঙ্খলে রাশিয়াও বাঁধা পড়েছে—অনুন্নত দেশ বলেই রাশিয়া সে-শৃঙ্খলের স্পর্শমুক্ত নয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে এ-শৃঙ্খলের বাঁধন যত শক্ত—অনুন্নত

দেশ রাশিয়ায় তা ছিলনা। অনুন্নত দেশ বলে রাশিয়ার এ লাভটুকু হয়েছে যে ধনতন্ত্র এখানে দুর্ব্বল। মহাযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রের সর্ব্বদেশব্যাপী শৃঙ্খলের উপরই আঘাত পড়েছিল—কিন্তু যেখানে তার শক্তগড়ন, ইংল্যাণ্ড, ফরাসী বা জার্ম্মেনী, সেখানে তার বাঁধন ছিঁড়েনি—ছিঁড়েছে রাশিয়ায়, তার দুর্ব্বলতম গ্রন্থিতে। রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লবের সমর্থনে ট্রট্স্কি সমাজবিজ্ঞানের একটি অপরিজ্ঞাত নিয়মও আবিষ্কার করেছিলেন—এবং তার নাম দিয়েছিলেন Law of Combined Development। দীর্ঘ সাধনায় সভ্যতার ভাণ্ডারে যে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে ওঠে, অনুন্নত দেশগুলোর সুবিধে এই যে সে-সাধনালব্ধ ফল পেতে তাদের সে-সাধনার মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলো এক এক করে পার হতে হয়না—এক লাফেই সে-স্তরগুলো পার হয়ে তারা দীর্ঘ সাধনার নবীনতম সিদ্ধির আশীর্ব্বাদ লাভ করে থাকে।[৯] ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক জাগরণ দীর্ঘকালব্যাপী—অতীতের গুরুভার তাদের মাথায়; কিন্তু রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী একলাফে জেগে উঠে তাদের আবেষ্টনীর, বন্ধনের ও সম্বন্ধের গভীর পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে।[১০] ট্রট্স্কির এই যুক্তি অনুসরণ করে এ কথাও বলা যায় যে আজকের দিনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছুতে মধ্যবর্ত্তী ধনতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘ অধ্যায় ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই উল্লম্ফন কার্য্যত সম্ভব হয় এই জন্যে যে আজকের দিনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিশুদ্ধভাবে সামন্ততান্ত্রিক নয়—ধনতন্ত্রের উঁকিঝুঁকি একআধটু তাতে থাকবেই—আর তারই দরুণ সাম্যবাদের ঝাণ্ডাবহন করবার সৈন্যও সেখানে তৈরী হবে। নূতন ও পুরাতনের অদ্ভুত সংমিশ্রণ নিয়েই অনুন্নত দেশের যাত্রা সুরু হয় –ট্রট্স্কির সংযুক্ত বিকাশবাদের মর্ম্মকথা তা-ই।

রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব শ্রমিকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এনে দিলেও বলশেভিক নেতারা রাশিয়ার অনুন্নত অবস্থার কথা ভুলে যাননি। তাঁরা একথা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাম্যবাদী বিপ্লব সংঘটিত না হলে—অনুন্নত দেশের এই বিপ্লব চূড়ান্ত সাফল্য অর্জ্জন করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষকল্পে যে বিপ্লব পরিকল্পিত তার প্রকৃতি আন্তর্জাতিক হবেই—সে-বিপ্লবের উৎসমুখ প্রথম একটি অনুন্নত দেশে খুলে গেছে বলেই মনে করা যায়না যে উন্নত দেশের শ্রমিক-শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে তা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে। তাই অক্টোবর বিপ্লবের পর কৃষকসম্মেলনীর জমিসংক্রান্ত আইনের উপর লেনিন যে বলশেভিক প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন তাতে এ কথাটি ছিল: "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় ও সাফল্য এবং জমির এই বিলিব্যবস্থা নির্ভর করে এমন একটি অনুপেক্ষনীয় অবস্থার উপর যখন কৃষিশ্রমিক ও শিল্পশ্রমিক উন্নত দেশের শ্রমসর্ব্বস্বশ্রেণীর সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।"[১১]

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব যে মার্ক্সের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়—সে-সম্পর্কে লেনিন আর কারো চেয়ে কম সচেতন ছিলেন না। তাই তিনি সাম্যবাদের (communism) বদলে সমাজতন্ত্রবাদ (socialism) কথাটি প্রয়োগ করে রাশিয়ার বিপ্লবটিকে আখ্যাত করতে চেয়েছেন। গোথা-কর্ম্মসূচীর আলোচনায় মার্ক্স সাম্যবাদের দু'টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—ধনতন্ত্র থেকে যখন তা উদ্ভূত হয় তখন একটি স্তর, আর যখন ধনতন্ত্রের দিগন্ত পেছনে ফেলে এসেছে তার সেই দ্বিতীয়, উন্নত স্তর—দুটো স্তরকে তিনি সাম্যবাদ (communism) নামেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু লেনিন প্রথমস্তরের নাম দিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রবাদ (socialism) দ্বিতীয় স্তরকে সাম্যবাদ (communism) নামে অভিহিত করেছিলেন।[১২] নামের এই পরিবর্ত্তন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। উন্নত ধনতন্ত্র উৎপাদন পদ্ধতিকে অনেকাংশে সমাজগত করে দেয়, ধনতন্ত্রে অনগ্রসর যে দেশ, সামাজিক উৎপাদন-সেখানে প্রায় অপরিজ্ঞাত; কাজেই উৎপাদনপদ্ধতিকে সমাজগত করাই সেখানকার বিপ্লবের মুখ্য কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ধনতন্ত্রের পথে না গিয়ে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন এবং যন্ত্রোৎপাদনই তাই বলশেভিক বিপ্লবের প্রধান কর্ত্তব্য বলে পরিগণিত হল। আর তাই এ-বিপ্লবকে সার্থকভাবে সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত করা হল।

এই নামকরণে বলশেভিক নেতাদের যতটা নিরাসক্তি প্রকাশিত হয়—আসলে ততটা নিরাসক্তি নিয়ে তাঁরা নিজেদের সৃষ্টির দিকে তাকান নি। তখন তাঁদের কাছে হয়ত ততটা বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী আশাও করা যায়না। এই অভূতপূর্ব্ব শ্রমিক বিপ্লব তাঁদের চোখের উপর নূতন এক পৃথিবীর আলোকোজ্জ্বল তোরণ খুলে ধরেছিল—তাঁরা ভেবেছিলেন শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন শ্রমিকশক্তির অসাধ্য কিছু নেই। কল্পনা করেছিলেন লেনিন যে অনুন্নত দেশ রাশিয়াতেও মুক্তশ্রমিকশক্তি ধনতন্ত্রের পরবর্ত্তী পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবে। "ধনতন্ত্র এ পর্য্যন্ত যা করেছে সেখান থেকে সুরু করে আমরা উৎপাদনকে বৃহদায়তন করে গড়ে তুলব—" এ কথাও বলেছিলেন লেনিন।[১৩] কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল মানুষের সদিচ্ছা ও সদন্তঃকরণের চেয়ে বাস্তব অবস্থার শক্তি অনেক বেশি। লেনিন বিপ্লব তৈরী করেছিলেন কিন্তু বিপ্লবোত্তর ইপ্সিত অবস্থা তৈরী করতে পারলেন না—অনুন্নত দেশের অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। সে-শক্তি কেরেনস্কি নয়, জারের দালাল নয়, শ্বেতরুশ নয়—অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অনিবার্য্য অভিশাপ।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের অজস্র, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত মালিকানাকে বা মুনফা অর্জ্জনের ব্যাপক প্রয়াসকে রোধ করে সেখানে সমাজতান্ত্রিক-উৎপাদন প্রবর্ত্তিত করা, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েও, বলশেভিকদের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি। এই বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত

ব্যক্তিগত মালিকানা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাল্পতায় পরিণত হ'লে তাদের সমাজগত করা হয়ত সহজ কিন্তু রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা এই সহজসাধ্য কাজের অনুকূল ছিলনা। বলশেভিক বিপ্লব প্রভূত উৎপাদনের যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিয়ে এসেছিল সমাজ-তান্ত্রিক ধনোৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তা কার্য্যে পরিণত হতে পারেনি—অনন্যোপায় হয়ে তাই লেনিন ধনতন্ত্র-ঘেঁসা 'নবঅর্থনৈতিক নীতি' (NEP) প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন। 'নেপ' সম্বন্ধে ট্রট্স্কির এই স্বীকারোক্তি অনুধাবনীয়ঃ "নেপ প্রবর্ত্তন করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে আমরা নিজেরাই আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক সম্বন্ধের ঠাঁই করে দিয়েছি।"[১৪] ধনতন্ত্রকে রাশিয়াতে একটু ঠাঁই করে দেবার বিপদ সম্বন্ধে লেনিন খুবই সচেতন ছিলেন—কৃষিপ্রধান দেশে যে সাম্যবাদের চেয়ে ধনতন্ত্রই বসবার আসন ভালো পায় লেনিন এ সত্য উপলব্ধি করেও উৎপাদনবৃদ্ধির জন্যে উৎপাদনকারীদের ব্যক্তিগত মুনফার পথ খুলে দিলেন। লেনিনের জীবদ্দশায় এ-পথ রুদ্ধ হয়নি। দলীয় কংগ্রেসের শেষ বক্তৃতায় লেনিন বলেছিলেনঃ "আমরা যন্ত্রকে যেদিকে চালাতে চাচ্ছি সেদিকে তা যাচ্ছেনা, ঈশ্বর জানেন কোত্থেকে কতগুলো বে-আইনি মুনফাখোর আর পুঁজিবাজ ব্যবসায়ী গজিয়ে উঠছে—যন্ত্রটাকে তারাই চালিয়ে নিচ্ছে।"

লেনিনের মৃত্যুর পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষেও লেনিনের সেই স্বপ্ন ("ধনতন্ত্র এপর্য্যন্ত যা করেছে সেখান থেকে সুরু করে আমরা উৎপাদনকে বৃহদায়তন করে তুলব") কার্য্যে পরিণত হলনা। ১৯৩১-এ শিল্পাধ্যক্ষদের একটি সম্মেলনে ষ্টালিন বল্‌লেনঃ "আমরা উন্নত দেশগুলোর পঞ্চাশ কি একশ বছর পেছনে আছি। দশ বছরে তাদের সমান হতে হ'বে।"[১৫] শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্প গ্রহণ করা হ'ল যে-যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে ধনতান্ত্রিক উদ্বর্ত্তন উচ্ছেদ করা।[১৬] ব্যক্তিগত মুনফার বৃত্তিই ধনতন্ত্রের বীজ— এবং তা যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে আজও সশরীরে বর্ত্তমান তা তার যৌথ-কৃষি-অধ্যক্ষদের বিতারণের সাম্প্রতিক সংবাদেই অবিসংবাদীভাবে অভিব্যক্ত। তাছাড়া শিল্পোন্নতির প্রয়াসে রাশিয়ার যন্ত্রবিদ্যা ও যন্ত্রীর অভাবের কথা ১৯৩৫ পর্য্যন্ত ষ্টালিনের নিজ মুখেই ঘোষিত হয়েছে। তারপরও সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে আন্দোলন তুমুল কলরব সৃষ্টি করেছে সেই 'ষ্টাখানভ আন্দোলন'ও ফুরণে কাজ করানো ছাড়া আর কিছু নয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলো এ-পদ্ধতিতে বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়ে অভ্যস্ত। অথচ ষ্টালিন বল্‌ছেন এই আন্দোলনই না কি শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদকে সাম্যবাদে পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করবে।[১৭]

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের প্রায় ত্রিশবছর পরে আজ আমরা বল্‌তে পারি যে বিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় সেখানে ধনতন্ত্রের ইমারতগুলোকেই নষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু ধনতান্ত্রিক মানসিকতার কিম্বা ধনতান্ত্রিক ভিত্তির গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি। তাছাড়া, যন্ত্রশিল্পের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিকরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হলেও রাশিয়া আজপর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো উৎপাদন-শক্তি তৈরী করতে পারেনি। অথচ উৎপাদন-শক্তির বন্ধন-মোচনই সাম্যবাদের গোড়ার কথা—যে বন্ধনের রচয়িতা ধনতন্ত্র। রাশিয়ার এই পরিণতির জন্যে দায়ী তার ঐতিহাসিক অনগ্রসরতা। যন্ত্রশিল্পে অনগ্রসর ছিল বলেই রাশিয়া তার সাম্যবাদী বিপ্লবের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। রাশিয়াতে যতোটুকু হয়েছে তাকেই যদি আমরা সাম্যবাদের জয় বলে ঘোষণা করি তাতে আর কিছু না হোক, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের সাম্যবাদের অমর্য্যাদা করা হয়।

১ Critique of Political Economy—p. 126
২ Ibid.
৩ Critique of the Gotha Programme
৪ Capital, Vol. I p. 837 (Kerr Edition)
৫ Ibid.
৬ Anti-Duhring.
৭ The Communist Manifesto.
৮ Critique of the Gotha Programme.
৯ History of the Russian Revolution (Gollancz Edition-p. 23, 27)
১০ Ibid-p. 33.
১১ Ten days that shook the world (p. 305. Modern Library Edition)
১২ Selected works, vol, VIII p. 239.
১৩ State and Revolution
১৪ The Real Situation in Russia, p. 31 (Allen & Unwin Edition)
১৫ History of the Communist Party of the Soviet Union, p. 314.
১৬ Ibid, p. 324;
১৭ Ibid, p, 340

মার্কসীয় দর্শন

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মার্ক্‌সের 'ক্যাপিট্যাল' যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে মার্ক্‌স তাঁহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিতে সর্ব্বত্রই দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করিলে, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মার্ক্‌স এই পুস্তকে অসাধারণ নিপুণতার সহিত ধনিকসমাজের গতি ও পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়াছেন। ধনিক সমাজের বস্তুউৎপাদনপদ্ধতি, উক্ত সমাজের সামাজিক সম্বন্ধের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং অধঃপতনের ধারা অনুসরণ করাই তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য।

ধনিকসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইল পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা। প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের দুইপ্রকার মূল্য আছে, ব্যবহার মুল্য (ভ্যালু ইন্ ইউজ) এবং বিনিময় মূল্য (ভ্যালু ইন্ এক্সচেঞ্জ)। মূল্য বলিতে সাধারণতঃ বিনিময় মূল্যই বুঝিতে হইবে। প্রাচীনসমাজে দ্রব্যবিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক সমাজে মুদ্রার সাহায্যে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় চলিয়া থাকে। সমানমূল্যের পণ্যের সঙ্গে সমান-মূল্যের পণ্যের বিনিময় হইয়া থাকে। যদি একখণ্ড বস্ত্রের মুল্য একজোড়া জুতার মূল্যের সমান হয় তাহা হইলে ঐ বস্ত্রখণ্ডের বিনিময়ে একজোড়া জুতা পাওয়া যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল যে দ্রব্যের মূল্য কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হয়? মার্ক্‌স বলেন যে প্রত্যেক পণ্যদ্রব্য মানবের শ্রমদ্বারা উৎপাদিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের ভিতরে শ্রমশক্তি লুকায়িত থাকে। এই শ্রমশক্তির পরিমাণ দ্বারাই দ্রব্যের মুল্য নির্দ্ধারিত হয়। যদি কোন বস্তু প্রস্তুত করিতে আবশ্যিক সামাজিক একঘণ্টা সময় লাগে তাহা হইলে উহার মুল্য আর একটি বস্তুর মূল্যের সমান হইবে যাহা প্রস্তুত করিতেও আবশ্যিক সামাজিক একঘণ্টা সময় লাগে। শ্রমশক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হয় সময়ের দ্বারা। কোনও একটি পণ্যদ্রব্যে কতটা শ্রমশক্তি লুকায়িত আছে তাহা স্থির করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কতটা আবশ্যিক সামাজিক শ্রমসময় লাগিয়াছে।

এই শ্রমের সময় নির্ণয় করিবার একটি সামাজিক মাপকাঠি আছে। সুতরাং এই সামাজিক মাপকাঠির সাহায্যে স্বাভাবিক শ্রমশক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সুতরাং মার্ক্‌সের মতে শ্রমশক্তির পরিমাণ, অথবা আবশ্যিক সামাজিক শ্রমসময় দ্বারা পণ্যদ্রব্যের বাস্তব মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শ্রম বলিতে মার্ক্‌স কোনও বিশেষ রকমের শ্রম বুঝেন না। ধনিকসমাজে কোনও একটি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে বহুলোকের সহযোগিতা আবশ্যক। তাহা হইলেও প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য শ্রমশক্তির পরিমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন সমাজে পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হইত এবং সমান মূল্যের দ্রব্যের সঙ্গে সমানমূল্যের দ্রব্যের বিনিময় হইত।

কিন্তু পণ্যোৎপাদন ও বিনিময় প্রথা জটিল হওয়ায় মুদ্রার প্রচলন হয়। মুদ্রার প্রচলনের পর মুদ্রার সাহায্যেই বিনিময় কার্য্য চলিতেছে। আধুনিক জগতে স্বর্ণ হইয়াছে বিনিময়ের মানযন্ত্র। মুদ্রার প্রচলনের ফলে পণ্যের মূল্যের প্রকৃত স্বরূপ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। ফলে অর্থনীতিশাস্ত্রে রহস্যবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। আধুনিক ধনিকসমাজে অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ায় এবং মুদ্রার প্রচলনের ফলে বিনিময় প্রথা তদ্রূপ জটিল হইয়া পড়ায় মানুষ এখন ভুলিয়া গিয়াছে যে শ্রমশক্তির পরিমাণ দ্বারা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তদ্ব্যতীত বুর্জ্জোয়া অর্থনৈতিকগণ অসত্যের আশ্রয় লইয়া অন্য উপায়ে দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহাদের প্রচেষ্টার ফলে অর্থনীতি শাস্ত্র অবাস্তব ও রহস্যাবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে মুদ্রা ছিল পণ্য-বিনিময়ের উপায় স্বরূপ, কিন্তু পরে উহাই হইয়া পড়িয়াছে মূলধন। এই মূলধন ক্রমেই বাড়িয়া চলে। কি প্রকারে এইরূপ ঘটে তাহা বুঝা অবশ্যক। পূর্ব্বে মানুষ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিত এবং উহা অর্থমূল্যে বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থমূল্য দ্বারা আবার পণ্য ক্রয় করিত। কিন্তু ধনিক সমাজে এই ব্যবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন মানুষ অর্থের সাহায্যে পণ্য প্রস্তুত করে এবং সেই পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া আবার অর্থলাভ করে। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রথম যে অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা হইতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার পরিমান অনেক অধিক। কি প্রকারে মূলধন বাড়িয়া যায় তাহা আমাদের জানা কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই মার্ক্‌স উদ্বৃত্তমূল্যের (সার্‌প্লাস্‌ ভ্যালু) মূলনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পণ্যবিনিময়ের ফলে উদ্বৃত্তমূল্য উৎপন্ন হইতে পারে না কারণ পণ্যবিনিময়ে সমান মূল্যের পণ্যের সঙ্গে সমান মূল্যের পণ্যের বিনিময় হয়। তাহা হইলে কি প্রকারে এই উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্ট হয়? মার্ক্‌স বলেন যে এক প্রকার পণ্য আছে যাহার ব্যবহারিক মূল্যদ্বারা নূতন মূল্য সৃষ্ট হয়। এই পণ্যদ্রব্য নিজেকে ক্ষয় করিয়া নূতন মূল্য সৃষ্টি করে।

মার্ক্‌সের মতে এই পণ্যদ্রব্য হইল শ্রমশক্তি ধনিকসমাজে একদল শ্রমিক আছে যাহারা স্বাধীন ও নিঃস্ব এবং যাহারা শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। ধনিকগণ অর্থের বিনিময়ে এই শ্রমশক্তি ক্রয় করে। এই শ্রমিককে সে দেয় ততটা মূল্য যাহার সাহায্যে সে তাহার ক্ষয়িত শ্রমশক্তির পুনরুদ্ধার করিতে পারে। সুতরাং শ্রমিক ততটা অর্থমূল্য পায় যাহার সাহায্যে সে নিজের ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে।

মার্ক্‌স বলেন যে প্রত্যেক শ্রমিক কারখানায় ১২ ঘণ্টা করিয়া খাটে (মার্ক্‌সের সময় শ্রমিকদের কারখানায় এইরূপই পরিশ্রম করিতে হইত)। কিন্তু সে ৬ ঘণ্টায় যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে তাহার মূল্যেই তাহার ও তাহার পরিবারের ভরণপোষণ চলিতে পারে। বাকি ৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া সে যে পণ্যপ্রস্তুত করে তাহার মূল্য মালিক আত্মসাৎ করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হইল মালিকের লভ্যাংশ। সুতরাং প্রত্যেক পণ্যমূল্যের অর্দ্ধেক মালিক আত্মসাৎ করে। ইহার ফলেই মালিকের মূলধন বাড়িয়া চলে। উদ্বৃত্তমূল্য যে ধনিক আত্মসাৎ করে তাহা সে স্বীকার করে না। সে বলে যে অন্য কারণে অর্থাৎ পণ্যবিনিময়ের ফলে তাহার লাভ হয়।

শ্রমিকের শ্রমের সময় হ্রাস করিয়া দিয়াও ধনিকগণ লাভের অংশ বাড়াইতে পারে। সে তাহার মূলধনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, যথা স্থায়ীমূলধন এবং অস্থায়ী মূলধন। তাহার স্থায়ী মূলধন হইল কারখানার বাড়ী, পণ্যপ্রস্তুতের যন্ত্র প্রভৃতি এবং অস্থায়ী মূলধন হইল শ্রমিকের বেতন। এডাম্‌স্ স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি অর্থনৈতিকগণ বলেন যে ধনিকশ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্যকে অস্থায়ী মূলধনে পরিণত করে। মার্ক্‌স বলেন যে ঐ সব অর্থনৈতিকদের মত গ্রহণীয় নহে। কারণ উহা বাস্তব ধনিকসমাজ-ব্যবস্থার পরিপন্থী। উদ্বৃত্ত মূল্য দ্বারা ধনিকগণ উন্নততর যন্ত্র ক্রয় করে এবং উহাকে পণ্যোৎপাদনের কার্য্যে লাগায়। সুতরাং মার্ক্‌সের মতে ধনিকগণ উদ্বৃত্তমূল্যকে স্থায়ী মূলধনে পরিণত করে। ইহার ফলে শ্রমিকদের শ্রমসময় কমাইয়া দিয়াও ধনিকগণ যথেষ্ট লাভ করিতে পারে। পণ্যপ্রস্তুত করিবার জন্য উন্নততর যন্ত্র প্রয়োগের ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। কিন্তু ধনিকগণ কোন প্রকারে এই বেকার শ্রমিকদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। এই বেকার শ্রমিকগণই হইল ধনিক সমাজের অর্থোৎপাদনের রক্ষিত সৈন্য। ধনিকগণ প্রয়োজনের সময় এই শ্রমিকদিগকে কাজে লাগায়। সুতরাং আধুনিক ধনোৎপাদনের ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকগণ তাহাদের মূলধন হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি সুফলও হইয়াছে। শ্রমিকগণ ক্রমেই সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইতেছে এবং তাহারা ক্রমেই অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধ

সচেতন হইয়াছে। মার্ক্স বলেন—ধনিকগণ নির্ম্মমভাবে পণ্যোৎপাদকদের মূলধন অপহরণ করিয়াছে এবং স্বার্থস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া নীচ, নির্দ্দয় ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। পণ্যোৎপাদকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ধনিকগণ উহাদিগকে নিঃস্ব, নামেমাত্র স্বাধীন শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছে এবং ধনিকগণই হইয়া উঠিয়াছে সমাজের সম্পত্তির ও মূলধনের অধিকারী। এখন আর ধনিকগণ কোন এক বিশেষ শ্রমিকের অর্থ অপহরণ করে না। উহারা এখন সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর অর্থ অপহরণ করে। মূলধনের আত্মগতির ও আত্মবিকাশের নিয়মানুসারেই এইরূপ ঘটিয়াছে। একজন ধনিক বহু শ্রমিকের বিনাশ সাধন করে। ধনোৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া কতিপয় মাত্র ধনিকের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনিকগণ অর্থোৎপাদনের ব্যবস্থাকে সুসঙ্গত করে, ফলে আন্তর্জ্জাতিক ধনিকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়, শ্রমিকগণ ধনোৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে এবং তাহারা ক্রমেই সংঘবদ্ধ ও সচেতন হয়। অর্থোৎপাদন ব্যাপারে সহযোগিতা ও শ্রমবিভাগ অবলম্বন করার ফলে এবং যন্ত্রাদির উন্নতির ফলে শ্রমিকগণ ক্রমেই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। একদিকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভবের ফলে শ্রমিকগণ যেরূপ অবনতির চরমসীমায় নামিয়া আসে অন্যদিকে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ধনিকসমাজের অর্থোৎপাদন ব্যবস্থায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপচয় দেখা দেয়। ইহারা এমন একটি সমাজের সৃষ্টি করে যাহার মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় সুতরাং ধনিকগণ তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নিজদের মৃত্যুবীজ রোপন করে। ফলে এই ধনিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এবং পরধন আত্মসাৎকারীদের ধন অবশেষে সমাজ কাড়িয়া লয়। সুতরাং ধনিকসমাজের উদ্ভবের ইতিহাসের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে এই সমাজের ধ্বংসের বীজ।

"ক্যাপিটালের" দ্বিতীয় খণ্ডে মার্ক্স, কিভাবে সমাজের মূলধন দ্বারা ধনিকগণ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে সমাজের মূলধন দুই প্রকার পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতে প্রযুক্ত হয়। মূলধনের একাংশ দ্বারা পণ্য প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত করা হয় এবং অপরাংশ দ্বারা মানুষের ভোগের উপযোগী পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। মার্ক্স তাঁহার "ক্যাপিটালের" তৃতীয় খণ্ডে লাভের হার কি প্রকারে স্থিরীকৃত হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মার্ক্স, বিশেষ কোন ব্যক্তি ধনোৎপাদন দ্বারা কি প্রকারে লাভবান হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া সামাজিক ধনোৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা ধনিক সমাজ কি প্রকারে লাভবান হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জ্জোয়া অর্থনৈতিকদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক।

তিনি উদ্বৃত্তমূল্যের উদ্ভব কি প্রকারে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কি প্রকারে এই উদ্বৃত্তমূল্য লাভ, সুদ, জমিকরে বিভক্ত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। লাভের হার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কতটা মূলধন কাজে লাগাইয়া কি পরিমাণ উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্ট হইয়াছে। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী মূলধন অস্থায়ী মূলধন হইতে অধিক সে স্থানে লাভের হার অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী মূলধনের পরিমাণ স্থায়ী মূলধন অপেক্ষা অধিক সেই স্থানে লাভের হারও অপেক্ষাকৃত অধিক। এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এবং মূলধনের প্রয়োগ একরূপ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে অন্যরূপ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে লাভের হার কমিয়া যায়। সমাজের পণ্যদ্রব্যের মোটমূল্য এবং ঐ সব পণ্যদ্রব্যের মোট বাজারদর সমান। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকার ফলে অনেক সময় পণ্যদ্রব্য উহার উৎপাদন মূল্যের দরে বিক্রিত হয়। এই উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ মূলধন ও গড়পড়তা লাভ, এই উভয়ের মূল্যের সমান। এই প্রকারে মার্ক্স দেখাইয়াছেন কি প্রকারে পণ্য মূল্যের সঙ্গে পণ্যের বাজারদরের বৈষম্য ঘটে এবং কি প্রকারে সর্ব্বক্ষেত্রে লাভের হার সমান হয়।

শ্রমিকগণের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় তখনই যখন স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ইহার ফলে, অস্থায়ী মূলধনের পরিমাণ কমিয়া যায়। এইরূপ হইলে লাভের হার কমিয়া যায়, কারণ অস্থায়ী মূলধন হইতেই লাভের উদ্ভব হয়।

ধনিকসমাজে জমি সম্পত্তি ব্যক্তির অধিকারে থাকায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান থাকায় জমিজাত পণ্যের মূল্য নিকৃষ্ট জমি হইতে পণ্য উৎপাদন করিতে যে মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহার মূল্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমি হইতে অধিকতর পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। নিকৃষ্ট জমির পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট জমি হইতে যে অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার মূল্যই ভূমিকরে পরিণত হয়। রিকার্ডো বলেন যে উৎকৃষ্ট জমি প্রথমে চাষ করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে মানুষ নিকৃষ্ট জমি চাষ করে। যখন নিকৃষ্ট জমি চাষের কাজে লাগান হয় তখন উৎকৃষ্ট জমি হইতে ভূমিকর পাওয়া যায়। কিন্তু মার্ক্স বলেন যে অনেক সময় দেখা যায় নিকৃষ্ট জমি প্রথমে কর্ষিত হয় পরে উৎকৃষ্ট জমি কর্ষিত হয়। রিকার্ডো আরও বলেন যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন শক্তির ফলে কালক্রমে জমির উৎপাদনশক্তি হ্রাস পায় এবং ফলে জমিতে মূলধন প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। মার্ক্স বলেন যে রিকার্ডোর এইমত গ্রহণযোগ্য নহে। জমির স্বাভাবিক উৎপাদন শক্তির উপর জমিজাত উৎপাদন দ্রব্যের পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। নানা উপায়ে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে

যে উৎপাদনের ব্যবস্থা ব্যক্তির হাতে থাকায় এবং ধনিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় লাভের হার সমান হয়। পণ্য প্রস্তুতে ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে লাভের হার সম্পূর্ণ সমান হইতে পারে না। কিন্তু জমির অধিকারে মানুষের সমান অধিকার থাকে না। জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকায় অনেক সময় জমির উপর একচেটিয়া অধিকার জন্মে এবং তাহার ফলে স্বাধীনভাবে জমিতে মূলধন প্রযুক্ত হইতে পারে না। জমির উপর একচেটিয়া অধিকার থাকায় জমিদারগণ জমির উৎপাদন দ্রব্য হইতে উচ্চহারে লাভ পাইয়া থাকে। এবং এই অতিরিক্ত লাভের হারই জমিকরে পরিণত হয়। জমির অধিকার যদি সমাজের হাতে আসে তাহা হইলে কৃষি-পণ্য উৎপাদন ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কারণ এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সমাজ হইতে জমিদারের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়। মার্ক্‌স বিভিন্ন দেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া কি প্রকারে জমিকর নির্দ্ধারিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। চাষী যে উদ্বৃত্তমূল্য প্রস্তুত করে তাহা সে জমিদারকে কর-স্বরূপ দিয়া থাকে। প্রথমে সে পণ্যদ্রব্য দ্বারাই জমিদারের কর দিত। ক্রমে ক্রমে পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে অর্থদ্বারা ভূমিকর প্রদানের প্রথা প্রচলিত হয়। মার্ক্‌স আরও দেখাইয়াছেন যে যান্ত্রিকযুগে ক্রমে ক্রমে চাষীগণ জমির অধিকার হারাইয়া নিঃস্ব শ্রমিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা জমিদারের সুদের হার ভূমিকর এবং অন্যান্য নানা প্রকার কর দিতে অসমর্থ হইয়া নিঃস্ব শ্রমিকদের পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। অনেকস্থলে চাষীগণ চাষপণ্য উৎপাদনের যন্ত্র সমূহের অধিকার হারাইয়াছে। সুতরাং যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে সর্ব্বত্রই ধনিকশ্রেণীর অত্যাচারে সাধারণ চাষীর ও শ্রমিকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

মার্ক্‌স্ বলেন যে ধনিক সমাজে যে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, এবং এই সমাজে যে দারুণ ব্যাধি দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠন করা। সমাজের সমস্ত মূলধন ও জমি সমাজের হাতে না আসিলে সমাজের অসমতা ও দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হইলে ব্যক্তিগণ স্বাধীন হইবে, প্রত্যেক শ্রমিক তাহার শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যের পূর্ণমূল্য পাইবে, শিক্ষার উন্নতি হইবে, আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল পারিবারিক ব্যবস্থা দূরীভূত হইবে এবং উন্নততর পারিবারিক ব্যবস্থা স্থাপিত হইবে। সমাজের জীবন সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণতর হইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ আর মানুষের উপর আধিপত্য করিতে চাহিবে না। সে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে প্রকৃতিকে আপনার বশে আনিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে। মার্ক্‌স্ মনে করেন যে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে ইহার ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইতেছে এবং ইহার ফলে এই সমাজের পতন

অনিবার্য্য। এই ধনিকসমাজের উচ্ছেদের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হইবে। কিন্তু এইরূপ সমাজ গঠন করিতে হইলে জগতের সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। উপযুক্ত নায়কদের পরিচালনাধীনে ইহারা ইহাদের উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকা আবশ্যক হইবে। শ্রমিকশ্রেণী যদি সমাজের গতি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে না পারে এবং ভুল পথে চলে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বহু বাধা উপস্থিত হইবে। ইতিহাসের গতি ইহাদের অনুকূলে। সুতরাং শ্রমিকগণ যদি স্থিরভাবে ও বিচারবুদ্ধি সহকারে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারা অদূর ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে পারিবে ; ইহাই মার্ক্‌সীয় অর্থনীতির চরম সিদ্ধান্ত।

কবিতা

পাখীদের মত

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

পাখীদের মত বুঝি
মনের ভিতর থেকে আমরাও অনেক সবুজ মাঠ খুঁজি।
যে-মাঠ তন্ময় থাকে তৃণগুল্ম সবুজ-প্রচ্ছায়
সেখানে হৃদয় যেতে চায়,
পাখীদের ডানা নয়—মনের পাখায়।

পাখীরা যেমন ঝড়ে ঝরায় পালক—
ফেরে নীড়ে, কখনো হারিয়ে ফেলে কিছু রৌদ্রালোক ;
আমরাও অবসাদ, অন্ধকার, লোভাতুর নোখ
ঝেড়ে ফেলে হৃদয়ের সবুজে-সবুজে
নিঃশেষে প্রলীন থাকি অনেক উষর পথ ঠেলে ঠেলে ভুজে।

ডানায় মুছিয়া ফেলে দিন
যখন পাখীরা ফের উষ্ণ করে নীড়,
আমরাও ফিরে এসে উন্মুখর সান্নিধ্যের আলাপে নিবিড়।
তখন আকাশে থাকে নক্ষত্রের ভিড়।

নিদ্রালু চোখের পাতা বুঝি এলে বুজে'
আমাদের মন থাকে পাখীদের মত ঠিক মাঠের সবুজে।

বৈকালী

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

এদিনের শেষ হয় রাত্রির আভাষে
অবশিষ্ট কালটুকু থমথমে ভয়—
সন্দেহের দোলা বাজে সম্ভাবনাময়।
জীবন-মৃত্যুর ভাঙ্গা-গড়া,
ইতিহাস, প্রেম, জীবায়ন—
একটি বৈকালে এসে হারায় স্বপন।

অনেক গোধূলিক্ষণ সন্ধিকাল হয়ে—
আমারে চঞ্চল করে, অথচ নীরব!

গোধুলি-সাঁওতাল

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতালী মেয়েদের গান!

পাহাড়িয়া মধুপুর; মেঠো ধুলিপথ:
দিনশেষে বৈকালী মিষ্টি শপথ!

"মোহনিয়া বন্ধুরে। আমি বালিকা;
তোরই লাগি গাই গান; গাঁথি মালিকা—

* * *

আজো সন্ধ্যার শেষে খালি বিছানা;
আমি শোবো, পাশে মোর কেউ শোবে না—
তুই ছাড়া এই পূজা কেউ ছোঁবে না।"...

সুরে সুরে হাওয়া তার মিষ্টি বুলায়—
সাঁওতালী মেয়ে ক'টি দৃষ্টি ভুলায়।

দিনশেষ। ধূ ধূ মাঠ; ধূ ধূ মেঠো পথ!...
সাঁওতালী মেয়ে ক'টি ছড়ালো শপথ;—
হাওয়ায় হাওয়ার মতো ছড়ালো শপথ!

আলোকচারী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

এখনো শিশিরগন্ধী সেইসব রাত নেমে আসে।
প্রান্তরমূর্ছিত জ্যোৎস্না (মনে পড়ে সে রাত কেমন ?),
ফাঁকা ফাঁকা গুহা মাঠ বন,
শীতার্ত হিমেল নদী—শিমূলের অস্পষ্ট পাহারা—
অরণ্যের স্বপ্ন দেখে মন;
ট্রেনের তীর্যক আলো কুয়াশার ফ্রেমে ভেসে ওঠে,
এমন শীতের শেষ—এই রাত দেখে নাই তারা—
দু'একটি শিথিল ফুল ফোটে।

ঢের বার আসে আর যায়
এই ছবি। ফিরে ফিরে আসে ঢের বার

নির্জন মাঠের স্বপ্ন, প্রান্তরের আচ্ছন্ন পাহাড় ;
তারপর হঠাৎ হারায়।
তখন স্নায়ুর ঢেউয়ে প্রথম সূর্যের যাওয়া আসা,
আলোর অশান্ত ভালোবাসা।
হয়তো তখন নেই মাঠ নদী মেঘছোঁয়া মন,
অথবা নিবিড়
দিনের উজ্জ্বল স্পর্শে রাত্রির ছবিরা কথা পায় ;
অরণ্য তখন নেই, আছে জনারণ্যের ভীড়।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার রূপরস সাধনা

[ভাস্কর্য্য—দ্বিতীয় পর্ব্ব]

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

পাহাড়পুরের আন্দোলন বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে জগতের সামনে উপস্থিত করেছে। এ সব প্রস্তর ও মাটির মূর্ত্তিসঞ্চয় যে একান্তভাবে বাঙালীর রচনা এবং বাংলাদেশের মনস্তত্ত্বের দিক হ'তেও যে এসব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। বলেছি বাংলার ভাস্কর্য্যের দুটি বিরাটধারা গঙ্গাযমুনার মত ইতিহাসের বক্ষে প্রবাহিত হয়েছে। একটি হচ্ছে পৌর বা কৌল রীতির (classical) প্রতিফলক, অন্যটি হচ্ছে গণ বা গ্রাম্যরীতির (folk) প্রতিবিম্ব।

পাহাড়পুরের মৃদ্‌ভাস্কর্য্য এক অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যে ভরপুর। যে দেশে শুধু দেবদেবতার মূর্ত্তি রচনা করাই পরমার্থ মনে করা হয় সে দেশের জাগ্রত পার্থিব জীবনের বিচিত্র ঘটনার তরঙ্গভঙ্গকে মর্য্যাদা দান ক'রে নানা মূর্ত্তি রচিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয়। বস্তুতঃ তান্ত্রিকযুগে যে ঐহিকতা ও মানবিকতার পোষক ছিল সাহিত্যে বা শিল্পে সব জায়গায় তা' পরিস্ফুট হ'তে পারেনি। সমগ্র ভারতে তান্ত্রিকতত্ত্বের প্রভাব বিস্তৃত হয় কিন্তু তা' হলেও অন্যান্য প্রদেশের

সহিত রচিত সুদীর্ঘ ভ্রূযুগলের আয়ত ঔদার্য্য, দৃষ্টির মর্ম্মভেদী বাণী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপভারাক্রান্ত ঐশ্বর্য্য দেবতাকেও মানবত্বের ঘনিষ্ঠ স্তরে এনেছে। উপাসকের আনন্দ ও পূজার্চ্চনার জন্য বাংলার শাক্ত কবি মহাদেবকেও নিজের সামাজিকতার গণ্ডীতে এনে যেমন রসপরিহাসে মশ্‌গুল হয়েছে—তেমনি ভাস্করেরা মানবীয় মূর্ত্তির ভিতর দেবতাকে এনে—রসবন্ধন ঘনিষ্ঠ করেছে—তা'কে আকাশে ন্যস্ত নক্ষত্রের মত, সুদূরবিহারী করেনি। বাংলার তারামূর্ত্তিতেও বহুহস্তযুক্ত অত্যুক্তি নেই। মগধের মূর্ত্তিগুলিতে অধ্যাত্ম লক্ষণের শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ বজায় রাখা হয়েছে কিন্তু মানুষের ভিতর যেমন দেবতা বিহার করছেন তেমনি দেবতার ভিতরও মানুষের রসোজ্জ্বল অনুভূতির ব্যাঞ্জনা না থাক্‌লে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কি করে স্থাপিত হয়? উভয়কে একস্তরে আসা চাই—বাংলার ভাস্কর তাই করেছে সকল ভাবে। গ্রীক দেবতার মানবিকতা মাংসল গণ্ডীতে এসে পড়েছে বাংলার দেবতা অতদূর যায় নি। বহু আভরণ ও উপকরণ দেবতার দিব্যত্বকে খণ্ডিত হ'তে দেয়নি।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত সূর্য্যমূর্ত্তিতে এক বিস্ময়জনক রূপোচ্ছ্বাস দেখা যায়। সমগ্র মূর্ত্তিটি সুমার্জ্জিত ও সুগঠিত অথচ তা একটা গতানুগতিক ফরমায়েস ও বিধিনিষেধ মেনে' তৈরী পুতুলনাচের মূর্ত্তির মত ব্যাপার নয়। সমগ্র ভুবনে যে দেবতা ব্যাপ্ত তাকে দেখাতে হয়েছে একটা আত্মসংহত ও সমাহিত অবস্থার গণ্ডীর মধ্যে। সূর্য্যদেব যেন তাঁর ভাস্বর সহস্রাংশুকে নিজের ভিতর গুটিয়ে রূপালঙ্কারে ভক্তদের নিকট দেখা দিচ্ছেন। কোথাও কোন আড়ষ্ট ভাব নেই—শিল্পীর কোনরকম দারিদ্র্য ও ভীরুতা এ মূর্ত্তিতে দেখা যায় না। সূর্য্যদেবের মুখশ্রীও উজ্জ্বল ও নিখুঁত। এর ভিতর কোথাও দক্ষিণভারতের রীতিপ্রধান, প্রাণহীন প্রস্তরত্ব মূর্ত্তিকে অতিক্রম করে' ভেসে উঠে না।

বাংলার রচনার বহুদিক আছে। তান্ত্রিক কল্পনার উল্লোল ব্যাপকতামণ্ডিত বাংলার হেবজ্রমূর্ত্তি তিব্বত ও জাপানের এ শ্রেণীর মূর্ত্তিসঞ্চয়কে হতপ্রভ করেছে। বহুশীর্ষ ও বহু হস্তযুক্ত হলেও হেবজ্রের মুখ-শ্রী লালিত্যে লীলায়িত এবং ভাবোচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল। এর ভিতর বিকটত্ব কোথাও নেই। হেবজ্রের শক্তির ও দেহৈশ্বর্য্যও মুখশ্রীর অতুলনীয় ভঙ্গী জগতে এ শ্রেণীর সমগ্র রচনাকে হীনপ্রভ করে দেয়। বিধিবন্ধনের অসংখ্য হেরফেরে আবদ্ধ এই মূর্ত্তিযুগলের অপ্রাকৃত দেহভঙ্গীর ভিতর একটা অসাধ্য ব্যাপারই ছিল। এরকম রচনার ভিতরও মানবিকতার দ্বন্দ্ব রসসম্পুট রক্ষা করা বাংলার শিল্পীর অতুলনীয় প্রতিভাই সম্ভব করেছে।

মূর্ত্তিরচনায় বাংলার আর একটি ব্যবস্থা সহজেই চোখে পড়ে। এখানকার শিল্পীরা অতিকায় কিছুই রচনা করতে সহজে অগ্রসর হয় নি। এটাও বাংলাদেশের একটা সত্যোপেত মানবিকতার নিদর্শন সন্দেহ নেই। যে মানুষকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় সত্য বলেছে তাকে কোনকালেই অতিকায় বা বিরাটকায় মনে করে সে আনন্দ পায় নি। কথিত আছে মানুষের

পক্ষেই মুক্তি, সিদ্ধ-দেবতাকেও মুক্তি পেতে হলে মানুষের দেহ পরিগ্রহ করতে হয়। কাজেই মানবীয় পরিমাপেরও একটা সার্থকতা আছে। তা' মধ্যপথ অধিকার করেছে—অণুও তা' নয় বিরাট ও তা' নয়।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নানা দৃষ্টান্তে সকলেই অত্যুক্তি লক্ষ্য করে' থাকেন। শ্রাবণ বেল-গোলার জৈন গোমতেশ্বর মূর্ত্তি উচ্চতায় পঁয়ষট্টি ফুট। মহামানব রচনা করতে গিয়ে জৈন-শিল্পী তীর্থঙ্করকে বিরাট করতে অগ্রসর হয়েছেন। এ দেশে এ প্রণালী বিশেষভাবে অনুসৃত হয় নি। সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্যই বাংলাদেশের প্রিয়—তা মনেরই হোক্ দেহেরই হোক্। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হ'তে মূর্ত্তিকলা বিচার করলে পাল ও সেন আমলের রচনা বিশেষভাবে অভিনন্দিত হবে সন্দেহ নেই।

বজ্রযোগিনীতে প্রাপ্ত হাস্যমুখী মৎসাবতার একটি অনবদ্যসৃষ্টি। জোড়াদেউলের [ঢাকা] ত্রিবিক্রম দাক্ষিণাত্যের বা মধ্যভারতের রচনার মত অস্বাভাবিক মুখশ্রীমণ্ডিত নয়। পুরাপাড়ার অর্দ্ধনারীশ্বর বাংলার শিল্পকে গৌরবান্বিত করেছে। এলিফেণ্টার রচনায় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিকে চারিদিকে নানা আলঙ্কারিক আবেষ্টন দিয়ে সজ্জিত করতে হয়েছে—বাংলার মূর্ত্তিতে কোন অনাবশ্যক আবর্জ্জনা নেই। ওঠ্ মূর্ত্তিটির যথাযথ সন্নিবেশই একটা শিল্পগত ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে। মালভূমের মহিষমর্দ্দিনীর হাস্যমুখ বিশেষভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বোগ্‌রার সরস্বতী মূর্ত্তিও শিল্পসৌন্দর্য্যের একটা উৎকৃষ্ট নমুনা। এমনি করে দেখা যাবে বাংলার রূপদীপালীর কোন দীপ-ই অশোভন ও প্রাণহীন নয়— সবই জ্বলন্ত ও জীবন্ত। এ প্রশংসা সামান্য নয়।

এসমস্ত মূর্ত্তির মুখশ্রী একঘেয়ে বা এক ছাঁচে ঢালা মামুলি ব্যাপার নয়। প্রত্যেকটিই প্রাণবান ও জাগ্রত ভাবের মহিমায় মণ্ডিত—অন্যপ্রদেশের রচনা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। কঠিন ও রুক্ষ মননশীলতায় এ সব মূর্ত্তি ভারক্রান্ত নয়—যদিও এসব শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে নানা লক্ষণ ও তিলকে ভূষিত হয়েছে। প্রাক্‌ভারতীয় ভাস্কর্য্য স্পষ্টভাবে তিনটি ধারায় অগ্রসর হয়েছিল। মগধের শিল্পে জ্ঞানের প্রভাব ও প্রাধান্য অধিক। বাংলার কলালালিত্য ভাবপ্রধান। উড়িষ্যার শিল্প ক্রিয়াশীল (dynamic) ও কর্ম্মপ্রধান। কণারকে অশ্বারোহী ও অশ্বের যে একটা প্রচণ্ড গতিশক্তি স্ফুরিত হয়েছে তা' অত্যন্ত দুর্লভ। পুরীর নটরাজের নৃত্যচাতুর্য্যের নিকট অন্ধ্র নটরাজকে হার মানতে হয়। পুরীর রচনায় শুধু শরীরের নয় নটরাজের মনের হিল্লোলও দীপ্ত হয় মুখশ্রীতে। দ্রাবিড় রচনায় মুখ একেবারে আড়ষ্ট ও বিভূতিহীন। ভাবপ্রবণতার সহিত গতিবেগ সহজেই যুক্ত। এজন্য বাংলা ও উড়িষ্যার কলায় একের সহিত অন্যের যোগ সহজেই স্পষ্ট হয়। উড়িষ্যার

মহিষমর্দ্দিনীর সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিল্লোলিত গতিবেগে—বাংলার রচনায় শ্রীদুর্গা ভাববিভোর অথচ আড়ষ্ট বা অতিরিক্ত চঞ্চল নয়।

বাংলার শিল্পে পশ্চিম ভারতের অজন্তারীতিসুলভ অত্যুক্তিও মাঝে মাঝে দেখা যায় চব্বিশ পরগণার মথুরাপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মীমূর্ত্তি অজন্তার রূপভঙ্গীকে হার মানিয়ে দেয়। কাব্যে বর্ণিত দেহশ্রীতে রূপকের সাহায্যে নানা অত্যুক্তি করা কবিদের একটা অধিকার 'বলে' স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ঠিক এরকমের অত্যুক্তি ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা-ক্ষেত্রে ভারতের কোন কোন জায়গায় প্রচলিত থাক্‌লেও বাংলাদেশে একটা মধ্যপথই অবলম্বিত হয়ে এসেছে। শুক্রনীতি-সারে আছে:—

"ন হীনা নাধিকা মানাৎ তে তে জ্ঞেয়া সুশোভনাঃ
ন স্থূলা ন কৃশা বাপি সর্বে সর্ব্বমনোরমা"

শুক্রনীতিসার (১০২-৩)

মানকে বজায় রাখ্‌তে হবে অথচ দেখ্‌তে হবে অত্যুক্তি কোথাও সম্ভব না হয়। গুপ্তযুগে পশ্চিমভারতের প্রভাব পূর্ব্বাঞ্চলে ব্যপ্ত হ'তে পারে নি। এখানকার ধীমানের নাগকলা একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সূচনা করে' সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিস্তার করে। এই পদ্ধতি রচনা নেপালে, চীনে ও জাপানে একসময় প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলার ভাবপ্রধান রচনা সমগ্র ভাস্কর্য্যকে একটা জাগ্রত জীবন দান করেছে। যা'কে ইংরেজীতে 'conventional' বা চল্‌তি প্রাণহীন কায়দার রচনা বলা হয় বাংলাদেশে তা নেই। কতকগুলো অবয়ব সংযোগের প্রচলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রথা বাংলাদেশ গ্রহণ করেনি। এজন্য এখানকার প্রতিটি মূর্ত্তির ব্যঞ্জনায় প্রাচীন ও প্রাণহীন কোন প্রথাকে মুখ্য করা হয়েছে মনে হয় না। বরং বাংলার মূর্ত্তিগুলির মুখশ্রী চাহনি ভ্রূভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন এসব মূর্ত্তি সদ্যোত্থিত একটা নূতন জাগরণের ইঙ্গিতপূর্ণ। সুষুপ্ত জাতির দৃষ্টি যেন বহুকাল পরে জেগে উঠ্‌ছে কালের নূতন তরঙ্গোচ্ছ্বাসে। মগধে প্রাপ্ত হরগৌরীমূর্ত্তি প্রস্তরের মূর্ত্তি মাত্র, সব যেন স্থির ও অচঞ্চল, কিন্তু বাংলার ভাটেশ্বর মন্দিরের হরগৌরী মূর্ত্তি সচঞ্চল, জাগ্রত এবং প্রণয়ের অভিনয়ে উন্মুখী—একে অন্যের দিকে হস্তপ্রসারিত করেছে—পরস্পর ভাবগদগদ। বস্তুতঃ বাংলাদেশের বিরাট জাগরণের পূর্ব্বাভাষ এসব রচনায় লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেও গতানুগতিক (formal) বা কায়দাদুরস্ত ব্যাপার কিছু নেই। যা আছে তা' মৌলিক, জীবন্ত ও ভাবে ভরপুর।

কাজেই বাংলার ভাস্কর্য্যের পরিচয় দান করতে হলে একে ভাবপ্রধান বল্‌তে হয় মগধ ও উড়িষ্যার সহিত তুলনামূলক বিচারে। কিন্তু বস্তুতঃ এর অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতা হচ্ছে এই যে এ শিল্পের ভিতর দিয়ে সমগ্র জাতির একটা নূতন জাগরণের অবস্থা প্রকটিত হয়েছে।

এ জাগরণের বহুদিক ক্রমশঃ জাতির চক্ষুগোচর হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের হাজার বছরের সাধনাকে অপূর্ণ ঘোষণা করেই যেন জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। ভাষার ভিতর দিয়ে এই অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি বাংলাদেশের প্রেরণারই যেন অপেক্ষা করছিল। চণ্ডীদাসের আলুলায়িত ভাষার লীলাকদম্বও এই নব্য জাগরণের সাক্ষ্য দেয়। পরবর্ত্তী যুগেও বাংলাভাষা নূতন নূতন সৃষ্টির বেলাভূমিতে তরঙ্গাকুল জলধির মত ঝাপিয়ে পড়ে।

একদিকে এই অভিজাত ভাস্কর্য্য এমনি করে সৃষ্টির এক নূতন সীমান্তকে উদ্ঘাটন করে ভারতবর্ষে, অন্যদিকে গণকলার এক বিরাট প্রকাশ ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব হয়। গণচিত্র বা গণভাস্কর্য্য অতি ক্ষিপ্র ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে ভাবপ্রকাশে অভ্যস্ত। জটিল অলঙ্কার বা কালোয়াতীর পথে গিয়ে এই শিল্প বিরাট জনতাকে আকর্ষণ করতে পারে না। এ জন্য ইউরোপেও এই পথে বর্ত্তমান যুগ অগ্রসর হচ্ছে। প্রাচীন রাফেল (Raphael), মাইকেল এঞ্জিলো (Michael Angelo) প্রভৃতির রচনা ইদানীং কা'রও মন হরণ করছেনা—গ্রীক্‌শিল্পকে অত্যন্ত সামান্য স্তরের সৃষ্টি বলে Miergrato ও Reger Fry প্রমুখ আলোচকগণ বলছেন। সম্প্রতি মোটা কায়দায় রচিত স্থূল অপ্রাকৃত সৃষ্টিই সকলের অভিনন্দন লাভ করছে। শিল্পীরা ইচ্ছা করে বাস্তববাদিতার পথ বর্জ্জন করে রূপরচনায় অস্বাভাবিক ও স্বেচ্ছাচারের পথে যাচ্ছে। ইউরোপের আধুনিক অন্তরঙ্গ কলা (Expressicnist art) বর্ব্বর ও অসভ্য জাতির কলাসৃষ্টিকে বাহবা দিতে অগ্রসর হয়েছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় বাংলাদেশের শুভবুদ্ধি একসময় এই গণশিল্পকে সুদৃঢ়ভাবেই গ্রহণ করে। এই শিল্পের সাহায্যে মূর্ত্তি ও চিত্ররচনার ক্ষেত্রে এদেশই একটি বিচিত্র ছায়াপথ রচনা করে। পাহাড়পুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এই শিল্পটি সেকালেও একটা নূতন সদ্যপ্রচলিত শিল্প ছিলনা। অথচ গণভাস্কর্য্যের এই আদর্শ একটা বিরাট রচনায় শিল্পীদের সহায়তা করে। গণভাস্কর্য্যের রীতিতে সকল রকমের মূর্ত্তিই অতি প্রখর ও জাগ্রতভাবে রচিত ও কল্পিত হয়েছে। পাহাড়পুরের রচনায় অতি সামান্য দৃশ্যও অসামান্য গৌরব লাভ করেছে। একটা রচনায় একটি লোক তবলা বাজাচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়—আর একটি দৃশ্য হচ্ছে একটা লোকের ঘণ্টা বাজাবার। এগুলি অতি চমৎকার জীবন্ত ও জাগ্রত জীবনের মুখর সৃষ্টি। এরকম লৌকিক ও সাংসারিক বিষয় নিয়ে বিচিত্র ও অফুরন্ত রচনা আর কোথাও পাওয়া যাবেনা। এ সব রচনাও প্রমাণ করে যে একটা নূতন জীবন ও জাতীয়তার উষারাগ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই সূচিত করেছে। এ সব যেন নূতন জাগরণের ছন্দীকৃত জমাট কাকলি। পাহাড়পুরে একটি যুগলমূর্ত্তি আছে নরনারীর। শিল্পবিচারে এ রচনাটি অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই। পাহাড়পুরের রচনা ষষ্ঠ হ'তে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রবহমান ছিল পণ্ডিতগণ সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই বাংলার বৈচিত্র্য

সৌকুমার্য্য ও সূক্ষ্ম প্রখরতা এখানে বাহুকাল পর্য্যন্ত উদগ্রভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়।

গণশিল্প সারা বাংলাদেশ জুড়ে কাঠের, ধাতুর, ইষ্টকের ও পাথরের মূর্ত্তি রচনা করে ধন্য হয়েছে। এর প্রচুর নমুনা নানা যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে। ইদানীং ইউরোপীয় সমঝদার গ্রাম্যকলার পক্ষপাতী হয়েছে বলে বাংলার গণভাস্কর্য্যের মূল্য বহুপরিমাণে বেড়ে গেছে।

পাহাড়পুর এবং বাংলায় অন্যত্র বহু খণ্ড খণ্ড রচনায় এই বলিষ্ঠ শিল্পের নিপুণ নিদর্শনগুলি বাংলার মানসিক দৃঢ়তা এবং সৌন্দর্য্যবুদ্ধির সাহসিকতার প্রমাণস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শুধু খণ্ড রচনায় ভারতীয় প্রতিভা তৃপ্ত হয় না। বরভূধরে তক্ষণকলার ধারা বহুসহস্র ফুল ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে—ইন্দোচীনের এঙ্কোরভাট মন্দিরের তক্ষণক্রিয়া সারাদিন ঘুরে ফিরে দেখেও শেষ করা যায় না। ভারহুট, অমরাবতী ও সাঁচিতেও রূপের স্রোত মর্ম্মরন্যস্ত করেছে শিল্পীর প্রতিভা। বাংলাদেশেও গণভাস্কর্য্যকে একটা বিস্তৃত রূপ দান করে এক একটি বৃহৎ ফলকে রূপান্বিত করা হয়েছে। এরকম সফল চেষ্টা ভারতের আর কোথাও হয়নি। গণকলার বিশিষ্ট রূপের ভাষায় জীবনের বা জাতির বিরাট অধ্যায়গুলি রচনা করা অতি কঠিন কাজ। কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে বিষ্ণুপুরের অতুলীয় ও অপ্রত্যাশিত রচনা।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ ৬০৪ খ্রীঃ হতে ১৭৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এ দেশের রাজাগণের স্বাধীনতা চিরকালই স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। ইদানীং সহরটি বাঁকুড়া জেলার মহকুমা হিসেবে কোনপ্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। এখানকার জোরামন্দির একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্যাদি অসাধারণ শিল্পশক্তি প্রমাণ করে। এ সমস্ত রচনায় রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির দেবলীলা যেমন আছে তেমনি যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরকন্না পল্লীজীবন ও পশুপক্ষী জীবনের বহু ফলকও উৎকীর্ণ করা হয়েছে। রাজা গোপাল সিংহ এই মন্দিরটি তৈরী করেন।

এ মন্দিরের ধারাবাহী তক্ষণশিল্পে গণভাস্কর্য্যের অফুরন্ত কারুতাই মূর্ত্তিমান হয়েছে। গণভাস্কর্য্যের প্রাণহীন গতানুগতিকতা এতে নেই। সব যেন নূতন প্রাণ ও অফুরন্ত শক্তিতে হিল্লোলিত। একটা উদ্দাম প্রখরতা চক্ষুগোচর হয় এসব রচনায়। তাতে করে প্রমাণিত হয় এযুগ হতে বাংলাদেশে একটা নূতন জাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল এরকমের শিল্পচেষ্টার ভিতর। কোন কিছুই আকস্মিকভাবে হঠাৎ এসে পড়েনা। যুগযুগান্তের সাধনা নানা আয়োজন ও আবহাওয়ায় ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হয়ে উঠে।

বিষ্ণুপুরের তক্ষণকলার একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ প্রয়োজন। একটি ফলকে কতকগুলি মাতৃমূর্ত্তি রচনা করা হয়েছে, তাদের সকলের অঙ্কে শিশুমূর্ত্তি শায়িত

অবস্থায়। মূর্ত্তিগুলিতে গণেশ-জননীর শ্রী ও গৌরব আছে। পার্শ্ববর্ত্তী ফলকে দেখা যায় স্তন্যপায়ী শিশুরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অবস্থায় ছুটোছুটি করছে খেলায় মত্ত হ'য়ে। এদের যৌবন অবস্থাও পরে দেখান হয়েছে যখন তারা মল্লরাজের সৈনিকরূপে শরীর-গঠনে মত্ত এবং মনের দৃঢ়তায় জীবনের মধ্যাহ্নেও উপস্থিত। এরকম বিচিত্র ও ভৌম কল্পনাকে শিল্পী অবলীলাক্রমে রচনা করে সমগ্র ফলকটিকে সমসাময়িক জীবনের মুকুরের ন্যায় উপস্থিত করেছেন। এরচনার কৌশল ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে শুধু একথা বললেই চলে যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রচনায় গণকলার এমন সর্ব্বতোমুখী শ্রী আর কোথাও দেখা যায়নি। ইদানীং যাঁরা এ রীতিতে রচনা করছেন তাঁদের অনেকেই বিষ্ণুপুরের রচনার খবরই হয়ত জানেননা। জানা থাকলেও আধুনিক রচনার ছন্দে বিষ্ণুপুরের রীতিকে আয়ত্ত করতে পারেননি। বিষ্ণুপুরের রচনায় পাহাড়পুরের নাটকীয় রচনা একটা পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। শুধু বাংলাদেশের পক্ষেই অবলীলাক্রমে এরূপ অতুলনীয় শিল্পভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

দর্পণ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেভিড্‌কে দেখ্‌লে ভয় করে। ঝাঁকড়া-ঝাঁক্‌ড়া একমাথা চুল জট্‌ পাকিয়ে আছে। মুখমণ্ডল ক্ষুরের স্পর্শ থেকে বহুদিন বঞ্চিত। অ-সমান দাড়ি-গোঁফ যথেচ্ছ বেড়েছে। যত্ন নেই। কালো গরমের প্যান্ট্‌-টায় অজস্র তালি পড়েছে। এমন দামী পুরু ওভারকোট্‌টা ধুলিমলিন—বিবর্ণ, যায়গায়-যায়গায় বেশ ছিঁড়েও গেছে। গলায় একটা মাফ্‌লার জড়ানো। সেটার দিকে চাইলে করুণা হয়। ডেভিড্‌ বলে, "হাত দিওনা মাই বয়্‌, ওটা এককালে কীরকম রঙ্‌চঙে ছিল, তা'জানো?"

সুরমাকে মাঝে মাছে বলি ওর এই ছন্নছাড়া বিবর্ণ জীবনটার কথা। ওর জীবনেও এককালে রঙ্‌ ছিল। রান্নাঘরের দিকে যেত যেতে থম্‌কে দাঁড়ায় সুরমা, একটু হাসে, উত্তর দেয়, "রঙ সকলের জীবনেই এককালে থাকে, ও' আর নতুন কথা কী!"

হাস্‌লে বীভৎস দেখায় ডেভিড্‌কে। কোটর-প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র চক্ষুদু'টির পাশ রীতিমত কুঁচ্‌কে যায়, বাঁকা তীক্ষ্ণ নাকের ডগার কাছেও কুঞ্চন, পুরন্ত ঠোঁটদুটির ফাঁকে পোকা-খাওয়া

ক্ষীয়মান দাঁত, দুপাশের দুটি সুতীক্ষ্ণ 'শ্বা-দন্ত' যেন মরচে-ধরা লোহার টুক্‌রো! সেই টুক্‌রোয় মধ্যে মধ্যে ঝিলিক্ খেলে!

সুরমা সেদিন বল্‌ছিল, "ঐ ষণ্ডাটার সংগে তোমার এত ভাব কীসের, শুনি? বেটা গরুখোর! খবরদার, তুমি আর ওর সংগে মিশ্‌তে পারবে না।"

সুরমার গিন্নীপণা বেশ কৌতুককর লাগে। মাত্র ছ'টি মাস হলো ও' আমার ঘরে এসেছে। এরই মধ্যে চমৎকার গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। নবোঢ়ার সলজ্জ দ্বিধা বিদূরিত। ওর উপস্থিতি স্পষ্ট, সহজ, স্বচ্ছ, সাবলীল।

বাঘের গন্ধ নাকি যোজন দূর থেকে টের পাওয়া যায়। ডেভিড্ বাঘ না হ'লেও ওর সম্বন্ধে ও'কথা খাটে। সুদীর্ঘ ছ'ফিট্ লম্বা মানুষটি, পাৎলা ছিপ্‌ছিপে দেহযষ্টি সম্প্রতি একটু নুয়ে প'ড়েছে। কাছে যখন বসে তখন নাকে রুমাল না দিয়ে পারা যায় না। বিশ্রী উগ্র গন্ধ ওর গায়ে-পোষাকে। পুরু ঠোঁটটা বেঁকিয়ে ডেভিড্ হাসে, বলে, "পাগল বলে আমাকে ঘৃণা কোরো না মাই বয়্। জীবনে অনেক বাজে কথা বলেছি, কিন্তু কাজের কথাটি শোনো। আমার মা হ'তে পারে ইণ্ডিয়ান্ আয়া, কিন্তু আমার বাবা ছিলেন চার্চের পাদ্রী, খাঁটি ইংলিশ। কর্ন্‌ওয়ালের সমুদ্রতীরে ছিল তাঁর বাড়ী। ডু ইউ নো কর্ন্‌ওয়াল্?"

সন্ধ্যায় বিশ্রম্ভালাপের ফাঁকে কথাটা বল্‌লাম সুরমাকে। ওকে যা' ভাবো,ও' তা' নয়। কী একটা মানসিক বিপর্যয়ে ও পাগল হ'য়ে গেছে। নইলে এককালে ওরই খাতির ছিল কতো। এখানেই ভালো চাক্‌রী কর্‌ত। হ'তে পারে অশিক্ষিত মাতাল ফিরিঙ্গী কিন্তু জানো কি, এই এখানকার কোন্ কারখানার একটা ডিপার্ট্‌মেণ্টের ও' ছিল ফোরম্যান? মোটা টাকা মাইনে পেতো, থাকত কেতাদুরস্ত ভাবে, হঠাৎ কী হ'লো কে জানে, ছুটি নিয়ে বৌ-কে রেখে এলো কলকাতায়, মদ খেতে লাগ্‌ল বেদম, একদিন দেখা গেল, এই হাল, একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে!

সুরমা ব'সেছিল জানালার কাছে, পেঁপে গাছের চিক্‌রি-কাটা পাতার ফাঁক দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ এসে ওকে স্পর্শ ক'রেছে। বাইরের নিঃসীম শূন্যে তাকিয়ে হয়ত শুন্‌ছিল আমারই কথা, মুখ ফিরিয়ে হাসি টেনে আন্‌ল ঠোঁটের কোণে, বল্‌লে, "ও বাবা, ওর আবার বউ-ও ছিল বুঝি।"

"সে'রকমইত শোনা যায়।"

"কেমন ছিল দেখ্‌তে?"

"শুনেছি, অপূর্ব সুন্দরী।"

জোৎস্নার যে-ঝলকটি জানালা গ'লে এসেছে ঘরে, তার পাশেই অন্ধকার। সেই আলো-

আঁধারের মাঝখানে মুখখানি টেনে এনে চমৎকার হাস্‌ল সুরমা, বল্‌লে, "আমার চেয়েও ?" মুগ্ধ অন্তর নিয়ে ওর কাছে স'রে এলাম। সুরমা আমার গর্ব। টক্‌টকে গায়ের রঙ্‌, সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব, সুবিস্তৃত ঘন চুল, চমৎকার মুখশ্রী, অপূর্ব দুটি চোখ। সুরমা অতুলনীয়া! এ'কথা মুগ্ধ ভক্ত-প্রদত্ত সামন্য বিশেষণ নয়, বিশেষ সত্য। রূপের খ্যাতি ওর এ অঞ্চলেও চাঞ্চল্য এনেছে। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লাম, "তোমার সংগে কী কারো তুলনা হয়, রমা ?"

সুরমা ঈষৎ হাস্‌ল, নিবিড় তৃপ্তিতে আমার বাহুমূলে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপ্‌চাপ্‌ রইল খানিকক্ষণ। একসময় বল্‌লে, "এ'ষায়গাটা ভারী চমৎকার, না ? সহর অথচ দূরে পাহাড়, বেশ লাগে।"

"চলো, তোমাকে কাল বেড়াতে নিয়ে যাব বিষ্ণুপুর-মার্কেটে। কিম্বা চলো সিনেমায়, নতুন বই এসেছে একটা।"

"রক্ষে করো! তার চেয়ে সাক্‌চীতে নিয়ে যাবে ? আমবাগান রাস্তাটি ধরে সোজা অনেকদূর এগিয়ে যাব, মনে হবে কলকাতার হিন্দুস্থান রোড্‌ ধরে পিসীমার বাড়ী চলেছি, তাই না ?

"তার চেয়ে এক কাজ করো। চলো খড়্‌কাইর তীরে, চমৎকার লাগ্‌বে।"

"তাই চলো।"

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। বেড়াতে ভালবাসে। ওকে বাসে করে নিয়ে যাব হলুদপুকুর, কালিকাপুর, অথবা ছোট ট্রেনে চড়ে বাদামপাহাড়ের অভিমুখ, তাই বা মন্দ কী ?

একসময় আবার কথা বল্‌লে সুরমা, "হ্যাঁগো, সেদিন যে বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিল্‌াম, ষ্ট্রেট্‌ মাইল্‌স্‌ রাস্তাটার মোড়ে কার সংগে দেখা হয়েছিল বলো ত'? সেই কোট্‌-প্যান্ট্‌-পরা মোটাসোটা সাহেবী-ধরণের ফর্সাপানা বুড়ো লোকটি ? মুখে আবার একটা পাইপ্‌, সংগে ছিল চেন-বাঁধা সাদা কুকুর, ঐ যে তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে যার সংগে কথা কইলে ?"

"বুঝেছি। বুড়ো কোথায় রমা, ওঁর বয়স পঞ্চাশও হয়নি এখনো। উনিই হচ্ছেন মিঃ নাগচৌধুরী, আমার উপরওয়ালা, বুঝ্‌লে ?"

"তাই নাকি! একদিন চলোনা ওঁর বাড়ী, ওঁর স্ত্রীর সংগে আলাপ করে আস্‌ব।"

"মাথাই নেই তার মাথাব্যাথা ? স্ত্রী কোথায় ? উনি বিয়েই করেন নি।"

"কেন!"

"কে জানে! আদা নিয়ে আমার ব্যাপার, জাহাজের খোঁজে প্রয়োজন ? তবে, এককালে অন্যদিক দিয়ে ওঁর একটু দুর্ণাম ছিল।"

"ও।"

বাইরে কুয়াশার একটা সূক্ষ্ম আবরণ। সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কেটে গেল নিঃশব্দে। ঘরের ঘড়ীটার হৃদস্পন্দন শোনা যাচ্ছে, টিক্-টিক্-টিক্!

একটু পরেই পাশের বাড়ীর রেডিও থেকে উচ্চকণ্ঠে বাঙলায় খবর-বলার ঘোষণা শোনা গেল। চমক্ ভেঙে চাইলাম বক্ষলগ্না সুরমার দিকে। ওর কপালের কাছে চূর্ণ কুন্তলের ওপরে হাতখানি ছুঁয়ে দিতে দিতে সেদিন হঠাৎ-ই মনে হ'য়েছিল, প্রচণ্ড আমার অভাব। সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে উপযুক্ত আয়োজনে অভ্যর্থনা কর্‌তে পারি নি। চাই, চাই। চাই বাড়ী, গাড়ী, চাই অর্থ। অনেক কিছুই আমার চাই!

রেষ্টুরেন্টে সামনাসামনি ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে ডেভিডের মুখচোখ একসময় অতি অদ্ভুত হ'য়ে ওঠে, বলে, "আমি কী চাই, জানো? শুধু এক বোতল ভড্‌কা। যা' কুলিমজুররা খায়। টেষ্ট ক'রেছ কোনদিন? করো নি? পুওর বয়্! চোখের সামনে সাতটা রঙ্ দেখাবে। এভ্‌রি ড্রপ্ ইজ্ সিন্‌সিয়র্ টু ইউ! নেশা—নেশা ড্রিঙ্ক, এ্যাণ্ড্ বি মেরি!···অথচ এককালে আমি অনেক কিছুই চেয়েছিলুম মাই বয়্! পেয়েও ছিলুম। ছিলুম বারো-আনা রোজের সামান্য কুলি, ইয়েস্—ইউ বিলিভ্ ইট্ অর্ নট্,—সেই থেকে হ'লাম ফোর্‌ম্যান্। মাই লাক্। পেলুম সব, বাড়ী গাড়ী টাকা, এভ্‌রি থিং! কিন্তু রইল কী মাই বয়্? সব গেছে, যায়নি কেবল এই রঙীন বোতল—মাই মোষ্ট্ সিন্‌সিয়র্ ফ্রেণ্ড্! যখন চোখে অন্ধকার দেখ্‌বার কথা, তখন এ' দেখায় আমাকে রঙ্! হাউ সুদিং! আমি মর্‌তে গিয়ে বেঁচে যাই!"

অফিসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে মধ্যে মধ্যে থম্‌কে থেমে যাই। চোখ পড়ে বাইরে। আমি বাঁচ্‌তে চাই। বাঁচার মত বাঁচা! আমারও বাড়ীর জানালায় থাক্‌বে দামী সুদৃশ্য পর্দা, গ্যারেজে মোটর, কক্ষে রেডিও। পরণে সিল্কের ড্রেসিং-গাউন, মুখে পুড়্‌বে পাইপ! কেন হবে না? কেন সুরমার অনিন্দ্যসুন্দর বক্ষে থাক্‌বে না হীরের লকেট্-বসানো জড়োয়া নেক্‌লেশ্? অর্থ চাই, সম্পদ্ চাই, চাই অনেক-কিছু! কুলি থেকে যখন ফোর্‌ম্যান্, তখন আমার জীবনেই বা কেন থাক্‌বে অসম্ভব কথাটার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা?

হাঃ হাঃ করে উচ্চহাসিতে যখন ফেটে পড়ে ডেভিড্, তখন রেষ্টুরেন্ট্-ঘরটার সমস্ত লোক চকিত হয়ে একযোগে ওর দিকে চেয়ে থাকে। "মাই বয়্, তুমি কি জানো আমার স্ত্রী দেখ্‌তে কেমন ছিল? এক্‌ষ্ট্রিম্‌লি বিউটিফুল্! ফুল ভালবাসত। আমার বাড়ীর বারান্দার ছাতে ছিল ফুলের টব্, অজস্র ফুল ফুট্‌ত। সেই ফুলের মধ্যে ফুল হাতে নিয়ে সে যখন দাঁড়াত, ওঃ! হোয়াট্ এ ওয়াণ্ডার! সে'তুমি ভাবতেও পারবে না মাই বয়!"···

ওর সংগে তর্ক করলে ভয়নক রেগে যায়, তাই তর্ক করি না। শুধু একসময় বলি, "তোমার স্ত্রীর খবর বলো ডেভিড্।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, চোখ বিস্ফারিত, পুরন্ত ঠোঁট কাঁপতে থাকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—"সে' খবর বলি না কাউকে। কখনো শুনতে চেয়ো না। এ' ষ্ট্রেঞ্চ্ ষ্টোরি!"

আর দাঁড়ায় না, চ'লে যায় বাইরে, কিন্তু খানিক পরেই ঘুরে আসে। এক কাপ চা চেয়ে নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, "হয়ত হ'তো না কিছুই। কিন্তু মাই ব্লাড্! আমার বাবা ছিলেন চার্চের পুরোহিত—নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চান। তাঁরই অভিজাত রক্ত আমার দেহে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তোমাদের ডেভিড্ ডেভিল্ হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হ'তে পারল না। তাস গেল ভেস্তে। সব কিছু চুরমার হয়ে গেল!"...

এরপর এমনি অদ্ভুত ভঙ্গীতে অকস্মাৎ সে বেড়িয়ে যায়, যার থেকে পরিস্কার আমরা মন্তব্য করতে পারি,—বদ্ধ পাগল!

নিজের সম্বন্ধে আজকাল ভয়ানক ভাবছি। কারখানায় কাজ করতে করতে জানালার বাইরে থমকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি। বাসায় এসে তক্তাপোষে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়েও সে' ভাবনার অন্ত থাকে না। ঘর দুটি আমার অতিরিক্ত মলিন—অতিরিক্ত ছোট! প্যাকিং-বাক্স থেকে তৈরী 'টেবিল' নামধারী দ্রব্যটি নিতান্তই হাস্যকর। আর হাতলভাঙা সস্তায়-কেনা পুরাণো চেয়ারটা, ওটা আমারই অক্ষমতার মূর্ত্তিমান পরিচয়! ছেঁড়া সাড়ীর টুক্রো রঙে ছুপিয়ে জানালায় পর্দা-খাটানোর প্রহসনে হাসি আসে। হাসি আসে আধ-ভাঙা বহু-ব্যবহৃত পুরাতন সাংসারিক টুকিটাকিগুলোর দিকে চেয়ে। কন্ট্রোলে কেনা সস্তা বাজে খাটো সাড়ী পরে সুরমা রান্না চাপায়, চায়ের জল গরম করে, পান সাজে, কলতলায় কাপড়ও কাচতে হয় মাঝেমাঝে, দু'টি ঘরে ঘোরাঘুরি করে, কাছে আসে, বইপত্রগুলি সাজিয়ে রাখে, ফেরীওয়ালা আনাজ বিক্রী করতে এলে দস্তুরমত দর কষাকষি করে। মনে মনে ভাবি, অন্যরকমেরও তো হতে পারত! দু'টি ঘর না হয়ে থাকতে পারত অনেকগুলি ঘর। ফিট্ফাট্-ছিমছাম। থাকতে পারত ঠাকুর-চাকর, সোফা-কাউচ, রেডিও-গ্রামোফোন, সুরমার দামী হেলিওট্রোপ সাড়ী!

ডেভিড বলে, "ভাবো কী আজকাল অতো, মাই বয়? এসো, লেট্ আস্ হ্যাভ এ' ড্রিঙ্ক্! দেখোই না টেষ্ট করে একদিন!"

উঠে দাঁড়াই। 'ড্রিঙ্ক' আমি করেছি। মদ নয়, অর্থলিপ্সা! অর্থলিপ্সার তীব্র সুরায় আমি আচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর!

সুরমা বলে, "হলো কী তোমার দিনদিন! টেবিলের বই টেবিলেই পড়ে থাকে, পড়াশোনা কী একেবারেই ছেড়ে দিলে?"

কথাটা শুনে ইষৎ অবাক হলাম মনে মনে। পড়াশোনা? হ্যাঁ, এককালে পড়াশোনা করবারই ব্রত নিয়েছিলাম বটে। পৃথিবীর বুকে ধন নয় মান নয় মাত্র এতটুকু বাসাই আশা করেছিলাম একদিন। ছোট্ট অনাড়ম্বর গৃহকোণ, সুরমার মতো সঙ্গিনী, সাধারণ জীবন, আর আমরণ পড়াশোনা করে যাবারই অসাধারণত্ব। অতি প্রয়োজনীয় অর্থটুকু ছাড়া সংসারের কাছ থেকে আর কিছু স্বাচ্ছন্দ্য করব না দাবী, থাকল আমার পুরাণো বই আর লাইব্রেরীর সহযোগিতা, বাণীর প্রসাদই হোক আমার আত্ম-উদ্বোধনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আমি পথ হাঁটব ফুটপাথের ওপর দিয়ে জনসাধারণের সংগে, সমগ্র জাতির অন্তরের সংগে থাকবে আমার সংযোগ!...কিন্তু আজ অত্যন্ত সারহীন মনে হচ্ছে এই আদর্শ। অর্থনৈতিক জটিলতার জটায় আমি বাঁধা পড়ে গেছি, বাইরে থেকে ঘা খাচ্ছি নিরন্তর, ক্রমে প্রয়োজনটাই জীবনে দাঁড়ালো বড়ো হয়ে মনে হচ্ছে, আদর্শ নয়।

খুলে বললাম সুরমাকে। চাকরীতে উন্নতির আশা নেই। ব্যবসা করব। অফিসে বন্ধুদেরও কথাটা বললাম। দূরের লোক বললে, পাগল! কাছের লোকের মন্তব্য,—দু'টি জিনিষ মনে রাখতে হবে, এক ক্যাপিটাল, দুই প্রতিযোগিতা। কুলোবে কি শক্তি ও সামর্থে? যারা কাছেরও নয়, দূরেরও নয়, তারা হাসে, ঠাট্টা করে। সুরমা মাথায় হাতখানি বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,—"অতো বাজে ভাবনা কীসের, বলো ত? ধৈর্য ধরো, এই চাকরীতেই তোমার উন্নতি হবে।"

"ছাই উন্নতি! এখানে বিচার নেই রমা, গুণের আদর নেই। কর্তার ইচ্ছায় শুধু কর্ম হয় এখানে। না আছে শিক্ষার মূল্য, না আছে অভিজ্ঞতার। বহুলোক বহুদিন থেকে একই মাইনেয় কাজ করে আসছে, ওঠা নেই পড়া নেই, ধরা-বাঁধা জীবন। কেবল উপরওয়ালাকে যারা হাত করতে পেরেছে, তারাই লাটসাহেব!"

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায় এর পর। বাইরে সন্ধ্যারাত। সজল হাওয়া পাচ্ছি। আর পাচ্ছি সুরমাকে—অতি কাছে। এক সময় বলে, "হ্যাঁগা, সেই যে তোমার ওপরওয়ালা কী নাম যেন?"

"মিঃ নাগচৌধুরী।"

"তাঁর সঙ্গে তোমার খাতির আছে, তাই না?"

"হাসালে। কারুর সংগে খাতির রাখবার মানুষ তিনি ন'ন।"

"তাঁর বাড়ী যাওনা কেন তুমি মাঝে মাঝে?"

"সর্বনাশ! ভয়ানক রুক্ষ-স্বভাব। বাড়ীতে কারুর সংগে দেখা করেন না। নেহাৎ-ই দেখা করতে চাও, অফিস রয়েছে। বাড়ীতে আমাদের মতো লোকের প্রবেশই নিষেধ।"

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ।

আবার বলে, "ওগো, শুনছ?"

"বলো।"

"এক কাজ করবে? ওকে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন করো না এখানে।"

হেসে উঠলাম। মিঃ নাগচৌধুরী আসবেন চা খেতে আমার বাসায়! ঐ ভাঙা-হাতল চেয়ারটায় বসে তিনি চায়ের কাপ মুখে তুলবেন! হায় ভগবান!

"হাসলে যে? দেখোই না একবার বলে? হাজার হোক বাঙালী ত!"

"কিন্তু বাঙালী যখন সাহেব হয়, তখন সাহেবদেরও বহু উর্দ্ধলোকে তাঁদের বিচরণ, তা' জানো ত?"—কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও কদিন ধরে বাড়ীতে কারখানায় মনের মধ্যে বেশ গুঞ্জরণ চলছে। আসলে সুরমার যুক্তিটা মন্দ নয় দেখাই যাক না, কোনদিন ত' এ প্রচেষ্টা করি নি! বেশ কিছুদিন ইতস্তত করবার পর হঠাৎ একদিন মিঃ নাগচৌধুরীর ঘরে ঢুকে কোনক্রমে কথাটা তাঁকে বলে ফেললাম। উত্তরে মৃদু হাসলেন, বললেন, "কেন যাবো না! এতো করে আহ্বান জানাচ্ছেন, না যাবার কারণটা কী থাকতে পারে? তবে, বেশী কিছু হাঙ্গামা করবেন না যেন, সামান্যের ওপর দিয়ে গেলেই সন্তুষ্ট হবো।"

বিস্ময় রাখবার স্থান আমার নেই। এ-ও কি সম্ভব?…কিন্তু সত্যই সম্ভব হল। সেদিন সন্ধ্যায় আমার ক্ষুদ্র জীর্ণ কক্ষে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য এলো। ভাঙা চেয়ারটায় বসে স্বচ্ছন্দ আলাপ চালাতে লাগলেন ভদ্রলোক। চলে যাবার পর মনে হল, এঁকে কে বললে খারাপ লোক রুক্ষ স্বভাব? আরও আশ্চর্য, তার দিন দুই পরে খবর বেরুলো, আমার পনেরো টাকা মাইনে বেড়েছে।

রেষ্টুরেণ্ট সেদিন ডেভিডের সংগে দেখা। ডেভিড্ বলছিল, "ড্রিল্ সাহেবকে চেনো? নাম শুনেছো? আমার 'বস্' ছিল কারখানায়। এখন এখানে নেই, কলকাতায়। লম্বা-চওড়া বিরাট চেহারা, দ্যাট্ ডেভিল্! তাকে কতো খাতির করেছি জানো? বতো খোসামোদ? জাষ্ট্ লাইক্ এ' সারভেণ্ট্! ওঃ! হরিব্‌ল্…হরিব্‌ল্!"…

টেবিলে মাথা গুঁজল। আমি হেসে মনে মনে বলি, "একেবারে পাগল!"

কয়েকটা মাস কাটল। কিন্তু শান্তি আমি হারিয়েছি। বইয়ের মলাটে ধূলো জমে, সুরমাকে মাঝে মাঝে ঝেড়ে পরিস্কার করতে দেখি। মাসিক পনেরো টাকায় বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পেলাম না। কারখানায় কাজ করতে করতে মনে হয়, আমার গতি এত কম কেন? গতিবেগ চাই, তীব্র মদির গতিবেগ!

এদিকে ডেভিডের পাগলামি ভয়ানক বেড়েছে। প্রচুর মদ খাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। সঞ্চয়ের যা'কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা-ও শেষ হবে এবার বোধ হয়। সেদিন মদের ঝোঁকে

বলছিল, "লিজাকে এখনো ভালবাসি। লিজা কে, জানো ত? আমার স্ত্রী। মাই বয়, সে এখনো বেঁচে আছে। কোথায় জানো? কলকাতায়। আই ফিল্ ফর্ হার্। কিন্তু কান্ট্ হেল্প্! কিছু করতে পারি না। মাই ব্লাড্। আমার ধার্মিক পিতার অভিজাত রক্ত আমায় বাধা দিচ্ছে তার জন্য কিছু করতে! লেট্ হার ডাই এ মিজারেবল্ ডেথ্।"

না, আর নয়, লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছিনা। পাগলামোরও একটা সীমা থাকা উচিত।

মিঃ নাগচৌধুরীর বাড়ীতে আজকাল মাঝে মাঝে যেতে পাচ্ছি। মধ্যে-মধ্যে কিছুক্ষণ বসে কথাবার্ত্তা বলেন, কিন্তু কারখানার কথা তুললেই হ'য়ে যান্ গম্ভীর। কোন কোনদিন কথার মাঝেই উঠে দাঁড়ান, বলেন, "আচ্ছা, এখন যান্। গুড্ বাই!"

আরও একটি লোক ওঁর বড়ীতে বেশ ছিম্ছাম্ পোযাকে যাতায়াত আরম্ভ ক'রেছে। আমাদেরই অফিসের বীরেশ্বর ঘোষাল। সেদিন শুনলাম এরও দশটাকা মাইনে বাড়ল।... তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভব করছি। মিঃ নাগচৌধুরীকে হাত আমায় করতেই হবে। শুধু বেতনবৃদ্ধি নয়, পদোন্নতি। সম্প্রতি অফিসে অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধ-বেতনের একটি আসন শূন্য হ'য়েছে। বীরশ্বর ঘোষালের অতো ঘন ঘন আসা-যাওয়ার অর্থ এবার বুঝলাম। উদ্দাম চাঞ্চল্য এলো রক্তে। কী একটা সুতীব্র নেশায় মাতাল হ'য়ে যাচ্ছি। কিন্তু এটা আমার চাই-ই!

সুরমা চিঠি দিলে একখানা হাতে। প্রবাসী বন্ধু দীর্ঘদিন পরে দীর্ঘ পত্র দিয়েছে একখানা। পড়াশোনা কেমন চলছে। কোন্ গ্রন্থের জটীল পথ এখন আমি অতিবাহিত করছি? বন্ধুটি আমার পন্থাকে অনুসরণ করতে চায়, কাজের চাপে এখন তত সময় পাচ্ছে না। আমার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা চায়। চায় উৎসাহ, চায় পথনির্দেশ। অর্থের অর্থহীন বোঝা ব'য়ে ব'য়ে সে নাকি এখন ক্লান্ত। কী কী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমি সম্প্রতি আহরণ ক'রেছি,—তারও বিবরণ সে চায়। নিশাচর গ্রন্থকীট আমি, আমার স্বাস্থ্য কেমন চলছে তা-ও তাকে জানাতে হবে।... চিঠিখানা টুকরো ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

সুরমা বললে, "ওকি, ছিঁড়ে ফেললে, উত্তর দেবে না?"

"না। এ'সব বাজে চিঠির উত্তর দেবার সময় আমার নেই।"

উঠে দাঁড়ালাম। পরশুদিন মিঃ নাগচৌধুরীর কাছে গিয়ে আমার কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি হেসেছিলেন একটু, কিছু বলেন নি। আজও আবার যাব। এ'উদ্যমের প্রয়োজন আছে।

মিঃ নাগচৌধুরী এবারেও ঠিক তেম্নি একটু হাস্লেন আমার কথায়, কিছু বল্লেন না। খানিক পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলাম, এবার আমায় যেতে হবে। কিন্তু

আশ্চর্য, মৃদুহাস্যে এলেন এগিয়ে, বল্‌লেন, "ভালকথা, বল্‌তে ভুলে যাচ্ছিলাম, কাল বিকেলে আমার এখানে আপনারা চা খাবেন, আপনি ও আপনার স্ত্রী। আমাকে চা খাইয়েছেন, নিমন্ত্রণটা ত আর একতরফা হ'তে পারে না। কেমন?"

"নিশ্চয় স্যার, এত সৌভাগ্য।"

আশার আলোক দেখ্‌তে পাচ্ছি। সুরমাকে সে'সন্ধ্যায় সংবাদটা জ্ঞাপন করলাম। কোন্ সার্ট-টা পরি বলো ত? সার্ট-কোট? না, পাঞ্জাবী-চাদর? আর তুমি? বিয়ের-উপহার-পাওয়া সেই মেঘ-রঙা ঢাকাই শাড়ীটি পরো, কেমন? আর ভালো ক'রে কথাবার্তা ক'য়ো, জবুথবু হ'য়ে থাক্‌বে কেন সেকেলেদের মতো? একালের মেয়ে না?

সে'রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে দেখ্‌লাম, আকাশটা কালো, ঘন মেঘ, বাতাসে বেগ। ক্রমে ঝড় উঠ্‌ল। প্রচণ্ড ঝড়। রুদ্ধ আক্রোশে বিশ্ব-অজাগর ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছে।....

কথা কইতে কইতে সুরমা ঘুমিয়ে প'ড়েছে। আমারও তন্দ্রা আস্‌ছিল। হঠাৎ দরজায় কার করাঘাত।

"কে?"

দরজা খুলে দেখি—ডেভিড্। ভীষণ, ভয়াবহ তার চেহারা।

"কিছু মনে ক'রো না মাই বয়, তোমার বাইরের ঘরে একটু বস্‌তে দাও। বার্ থেকে ফির্‌ছি। কিন্তু দেখ, কী ঝড়, আর ঐ দেখ বৃষ্টি নাম্‌ল, রীতিমত থানডারিংও হ'চ্ছে!"

"এসো।"

"তোমার বাড়ীতে এই প্রথম এলাম। ম্যাডাম্ কোথায়? ভেতরের ঘরে ত? তাহ'লে দরজাটা প্লিজ্ ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দাও।"

দিলাম।

"তুমি ঘুমোবে? নো—মাই বয়্—একটু আজ জেগে থাকো। এমন চমৎকার ভয়ঙ্কর ঝড় জীবনে বেশী দেখ্‌তে পাবে না। জাষ্ট্ ফিল্ ইট্!"

পাগল বলে কী!

"ভয় কর্‌ছে না কী আমাকে? না? তাহ'লে, কাম্ ক্লোজার্। ঝড় অনুভব করো।"

বাইরে বাতাসের গর্জন, ধারাপাত ও বজ্রপাত চলেছে।

"আমার হার্ট আজ কী অদ্ভুতভাবে বিট্ কর্‌ছে বুঝ্‌তে পার্‌ছ, মাই বয়্! হাত দিয়ে দেখো। এম্‌নি এক ঝড়ের রাতে আমার লাভ্‌লি লিজাকে কলকাতায় ফেলে দিয়ে এসেছি। কোন্ এক কন্‌ভেন্টের হাসপাতালে সে প'চে মর্‌ছে!"

কাছেই একটা বাজ্ পড়্‌ল। আমরা চম্‌কে উঠ্‌লাম।

"বারো আনা রোজের কুলি থেকে ফোরম্যান! ডু ইউ নো কেমন ক'রে ঘটল তা?

মরিয়া হ'য়ে গেলাম টাকার জন্য। আমার বস্ ছিল ড্রিল্—তাকে হাত করলাম। সে-ই আমাকে রাজা ক'রে দিয়ে গেছে! ইয়েস্—এ কিং! লিজা ছিল দেখতে অপূর্ব সুন্দরী! ও কী চমকালে যে? হ্যাঁ বন্ধু, বিলিভ ইট্ অর নট্,—আমি নিজে লিজার হাত ধ'রে রাত্রির অন্ধকারে ড্রিলের ঘরে পৌঁছে দিতাম, আবার ফিরিয়ে আন্তাম। না—না, মাই বয়, আজ আমি মোটেই পাগলের মতো কথা বল্ছি না। এই ক'রে ক'রেই আমি কুলি থেকে ফোরম্যান্!...ও কী, টেবিলে মাথা রাখ্লে কেন, মাই বয়্, শোনো শোনো। হয়ত ধর্ম্মনিই চল্ত। কিন্তু ডু ইউ নো, আমি অভিজাত পিতার সন্তান? আমি—আমি কেমন ক'রে সহ্য কর্বো এ'সব? টাকা-টাকা। ছাট্ মোষ্ট ডেঞ্জারাস্ থিং আমাকে মাতাল ক'রে তুলেছিল—পাগল ক'রে তুলেছিল!..."

কতক্ষণ টেবিলে মুখ গুঁজে ছিলাম জানি না, হঠাৎ কী একটা শব্দে চকিত হ'য়ে মুখ তুল্লাম। বাইরের দরজা খোলা। ডেভিড কখন চলে গেছে! ভেতরের দরজায় সুরমার করাঘাত।

দরজা খুলে সুরমাকে নিয়ে এলাম।

"ষণ্ডাটার সংগে কী সব পরামর্শ করছিলে গো, দরজা বন্ধ ক'রে? আমি ত ভয়েই বাঁচি না!"

দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেল্লাম ওকে, বল্লাম, "কাল আমরা খরকাইর তীরে বেড়াতে যাব। বেড়িয়ে এসে বই প'ড়ে শোনাবে, কেমন?"

"কাল না তোমার ওপরওয়ালার বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন?"

"না।"

"কেন গো!"

"না।"

"কী হ'য়েছে!"

উত্তর দেওয়া গেল না। ওকে নিবিড় ক'রে ধ'রে রাখলাম। একসময় বাইরের সেই কালো রহস্যময়ী রাত্রির দিকে তাকিয়ে বল্লাম, "ভালো ক'রে দেখো তো সুরমা, ঝড়-টা সত্যিই থেমেছে কী?"

হয়ত থেমেছে, তবু ম'নে হ'ল, হয়ত বা থামে নি।

"একদিন"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজ ঈদ। প্রতি বৎসর এই শান্তির দিনে ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামায় রক্ত ছোটে; এবার না বন্যা বয়! যারা প্রার্থনায় বিশ্বাসী তাঁদের প্রতি ঈর্ষা হয়, তাই বাধ্য হয়ে অন্য পথ অবলম্বন করি। কাল রাত্রে Albert Schwitzer-এর Civilization and Ethics বইখানি শেষ করতে দেরী হয়ে গেল। অন্য সময় আমার মস্তিষ্ক আপত্তিতে সাজারু হয়ে উঠত, কিন্তু আজকার এই দুর্যোগে, যখন মানুষ পশুত্বকে বীরত্ব ভাবছে, আমার বিচারবুদ্ধি লেখকের মহান বিশ্বাসে নিরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি বলছেন: বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্য থেকে মনুষ্যত্ব বজায় রাখাই হল সভ্যতার অর্থ, এবং মনুষ্যত্বের মানে জীবনের প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জীবনশ্রদ্ধাই উন্নতির বিভিন্ন আদর্শকে সফল করে, জীবন-দর্শন ও ভূয়োদর্শনকে সমন্বিত করে। সোয়াইৎসার যদি কেবল দার্শনিক হতেন তবে বোধ হয় আমার মনে তাঁর বাণী অত সহজে পৌছত না। তিনি নিজের জীবনে তাঁর আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে বসবাস করেন, সন্ন্যাসী হয়ে নয়, ডাক্তার হিসেবে। তিনি এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্গান-বাদক, এবং 'বাক্' সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থই প্রামাণিক। এমন লোকই আজকার ভারতবাসীর প্রাণে শান্তি আনতে পারে। (তিনি যেন মারা গেছেন মনে হচ্ছে।)

* * * *

মহাত্মাজীর মূল বক্তব্য একই, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। তবু কেন সোয়াইৎসার বেশী ভাল লাগল? বিদেশী বলে? বোধ হয় নয়, কারণ বিদেশীপ্রীতি খানিকটা কাটিয়ে উঠেছি বলে আমার ধারণা। মহাত্মাজীর রচনার সঙ্গে আমি অপরিচিত নই; সোয়াইৎসার আমি কমই পড়েছি সে তুলনায়, তবে কি নতুনত্বের মোহ? কিন্তু কয়েক মাস ধরে আমি পুরাতন প্রামাণ্য গ্রন্থই পড়ছি, এবং আজ আমি আবার ক্লাসিকসেরই ভক্ত। আমার মতে সোয়াইৎসারের লেখা বেশী ধারাবদ্ধ, বেশী সীস্টেম্যাটিক, যদিও খুব বেশী নয়, এবং সে রচনায় এমন একটা বস্তু আছে যার বিশেষ নিদর্শন মহাত্মাজীর রচনায় পাই না। একে সোয়াইৎসার world affirmation বলছেন। অনুবাদে ভূয়োদর্শন দাঁড়ায়। অবশ্য দর্শনের অর্থ নিশ্চয়াত্মক প্রতিজ্ঞা-সমষ্টি বুঝতে হবে। এটি জীবন-দর্শন থেকে প্রত্যয় হিসেবে ভিন্ন। সোয়াইৎসার-এর মতে ভারতীয় দর্শনের প্রতিজ্ঞা নঙর্থক। আমাদের

দেশী পণ্ডিতের অনেকেই এই প্রকার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেছেন জানি, কিন্তু মাত্র সমাজের দিক থেকে হয়ত ব্যাখাটি প্রকৃত। মহাত্মাজীর অ-হিংসা যে নঙর্থক নয় যাঁরা তাঁর লেখা পড়েছেন তারা সকলেই মানবেন, কিন্তু অর্থ সর্ব্বক্ষেত্রে পাঠের অপেক্ষা করেনা। অর্থাৎ, অর্থের একটা প্রকাণ্ড সামাজিক দিক আছে, এবং সেই দিক থেকে দেখলে অ-হিংসাবাদ নঙর্থক, অর্থাৎ সুবিধাবাদের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে মানতেই হবে। এই জন্যই বোধ হয় world affirmationটা আমার বেশী ভাল লাগল। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে নিশ্চয়-সদর্থকতা আছে এই কথাটি জানার আমাদের প্রয়োজন ঘটেছে।

* * * *

উঠতে তাই দেরী হোলো। আকাশ অসময়ে মেঘাচ্ছন্ন। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে সকালে। বিছানায় শুয়ে চা খাচ্ছি, এমন সময় কে ভৈরবীর ঠুংরী গাইতে গাইতে চলে গেল। কথা শুনতে পেলাম না, তবু ভৈরবীর পর্দ্দায় প্রাণটা দুলে উঠল। তা হলে এখনও বুড়ো হইনি, এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। গোলাগঞ্জের নবাব-বাহাদুর বলতেন, লক্ষ্ণৌএর কেবল আছে ভৈরবী, সোহিনী আর সহবৎ। সহবৎটি আজ লুপ্ত ছাত্রদের কৃপায়—এবং আমাদের অক্ষমতায়—অন্ততঃ সরকার বাহাদুর, আমাদের নিজেদের সরকার এই অজুহাতে লক্ষ্ণৌএর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে যাচ্ছেন। চাকরী হয়ত যাবে, তবু থাকবে ভৈরবী। গায়কের কণ্ঠ সাধা নয়, তবু কী সুন্দর কোমল ধৈবত আর পঞ্চম মধ্যমের খেলা। অনেক দিন এমন অকৃত্রিম মিঠে স্বর শুনিনি। ভৈরবীর রূপ যেন ফুটে উঠল মেঘ কাটিয়ে। শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি নয় কিন্তু। আশা-মাখান মুখটা, সন্ন্যাসিনীর বেশ নেই, কিসের বেশ দেখতে পেলাম না। তবে যে সেটা ছবি তাতে সন্দেহ নেই। সার-রিয়ালিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার নয়। ঘষা ছবি। আজ কয়েক বৎসর ধরে মনে হচ্ছে যে আমাদের সঙ্গীত বড় পাৎলা পশ্চিমী সঙ্গীতের তুলনায়। সে বিশ্বাস অবশ্য ভাঙ্গল না, তবু ভৈরবীর টানে সমস্ত মন প্রাণ সাড়া দিল। বাংলা বিহার ভুলে গেলাম। জীবনকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই।

* * * *

ডাক এল। মাদ্রাজের শিল্পী নামে পত্রিকা, বন্ধু চিত্রা যার সম্পাদক। রমেন চক্রবর্ত্তীর দুটি নক্‌সা চমৎকার। চিত্রার নীল সমুদ্র ছাপায় খোলেনি। ৺সি, আর, শ্রীনিবাস আয়াঙ্‌গারের কর্ণাটি সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধটি উপাদেয়। Cultural Heritage of India-র দ্বিতীয় ভলুমে বেরিয়েছিল। মতের মিলই বেশী।

* * * *

বেলা এগারটায় একটি ছাত্রের বিস্তর ছবি দেখলাম। অশিক্ষিত পটুত্ব। কারুর

কাছে না শিখে এমন আঁকে কি করে? লাইব্রেরীতে তার একটা প্রদর্শনী খুলতে হবে। কর্ত্তৃপক্ষ এখনও আর্টের ডিপ্লোমা খোলবার বন্দোবস্ত করলেন না।

* * * *

ছবি আর গানের সমন্বয় চাই। তাই বিকেলে ঐ সোয়াইৎসারের বাক্-এর জীবনি নিয়ে বসলাম। দ্বিতীয় ভলুমের ১৯, ২০ ও ২১ অধ্যায়গুলি আবার পড়লাম। বক্তব্য সোজা: কবিতা, সঙ্গীত, চিত্র একই সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া। "Every artistic idea is complex in quality until the moment when it finds definite expression. Neither in painting, nor music, nor in poetry is there such a thing as an absolute art that can be regarded as the norm, enabling us to brand all others as false, for in every artist there dwells another, who wishes to have his own say in the matter, the difference being that in one his activity is obtrusive, and in another hardly noticable. Herein lies the whole distinction. Art in itself is neither painting nor poetry nor music, but an act of creation in which all three co-operate." তর্ক ছেড়ে দিলে মোদ্দা কথাটা অত্যন্ত খাঁটি। রবীন্দ্রনাথের গানে তাই লক্ষ্য করেছি। কোথাও কবি, কোথাও গায়ক, কোথাও বা চিত্রকর ঠেলে বেরিয়েছে।

* * * *

কিন্তু যেখানে চিত্রকর প্রধান, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন দেখতে হবে। শান্তি-নিকেতনে এই ধরণের বিচার চলুক আমি চাই। মোটামুটি বলা যায়, দুই ধরণের সঙ্গীত রচনা আছে, কবিতাপ্রধান ও চিত্রপ্রধান। কবিতার চাল অর্থবাহী। মোটামুটি তার একটা মেজাজের ধারা, mood থাকে। সেই মেজাজটিকে অবশ্য সুরে বজায় রাখা চাই। তার পর গুরু, লঘু অক্ষর বিচার। এইখানে থামলে চলবে না। Verbal phrase ও musical phrase-এর মিলন চাই। বিদেশী সঙ্গীতের বেলা দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ। আমার কেবল রবীন্দ্রনাথের 'না' 'নাহি', 'নয়' প্রভৃতি কথার যথাযোগ্য বিভিন্ন musical phrase গুলি কানে আসছে। যদি দেখাতে পারতাম তবে আনন্দ হত। লক্ষ্ণৌ-এ রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে পাই না। এমনই শত শত ছবি তাঁর গানে ভেসে ওঠে, স্থির, অস্থির, নিকট দূর, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, এমন কি রঙীন। আমি এই ছবিগুলিতে বিস্তৃত আকাশ পেয়েছি, যার সন্ধান হয়ত তাঁর রীতিমত ছবিতে ততটা পাইনি। সেখানে মিলেছে চেতনার গভীর স্তর, ঘন বন, কালো নদী। এই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে একটা যোগসূত্র আছে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কি সেটা জানিনা সেজন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। "না, না,

না' 'সময় নাহিরে' 'নয়, নয়, নয়"—এর কয়েকটি সাধারণ পর্দ্দা বেছে নিয়ে সঙ্গীত-অনভিজ্ঞের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে, তার পর তাদের মানসিক প্রতিবিম্বের বিচার, শেষে তাদের সঙ্গে গানের কবিতার মূল চিত্র ও খেয়ালের যোগস্থাপন—তবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ বিচার হবে। বিশ পঁচিশ বছর পূর্ব্বে যা বলা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি সঙ্গীত সমালোচনা নয়।

* * * *

সোয়াইৎসারের জীবন-শ্রদ্ধা ও তাঁর সাঙ্গীতিক বিচারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছিনা। যদি life-এর বদলে living বলি এবং act of creation-কে a singular act of creating হিসেবে ধরি তবে সম্বন্ধটা হয়ত বুঝতে পারব। দেখা যাক।

* * * *

Life ও living এর মধ্যে পার্থক্য এই যে life-টা static ; তার ভূয়োদর্শনের প্রতিজ্ঞা হল এইঃ জীবনসত্তা নির্গুণ, কেবল, সম্পূর্ণ, নির্গুণ, অর্থাৎ সমাপ্ত, আত্মনির্ভরশীল, অবিশেষ ; অন্যধারে living-এর প্রতিজ্ঞা এই যে জীবন-সত্তা চলিষ্ণু জগতের ছক, অতএব সগুণ, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, অনাদি ও সবিশেষ, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার, জাগতিক ও প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির মুখাপেক্ষী। সোয়াইৎসার নিজে যাই বলুন না কেন, তাঁর বক্তব্যের মূল কথা reality is a process—নচেৎ world-affirmation সম্ভব হয় না, যদিও life-view প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত নয়। process কথাটা বড় গোলমেলে। আজকালকার মনোবিজ্ঞানে সমাজতত্ত্বে field, flow ধরণের কথা চলছে। যেমন magnetic, electric field বস্তুর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির will-to-live উবছে প'ড়ে reverence for living-এ পরিণত হয়। এই পরিণতির উল্লেখ সোয়াইৎসার করেছেন। তেমনই সৃষ্টিও গানে, ছবিতে, কবিতায় উবছে পড়ে। তবেই মানতে হয় অখণ্ডতাকে, অবশ্য অখণ্ডতা স্মাট্‌স্ সাহেবের Holism ঠিক নয়। স্রোতের যেমন অখণ্ডতা, বিদ্যুতের যেমন অখণ্ডতা, এও তাই।

* * * *

হাঁ তাই। নতুন Pilot Papers এসেছে। তাতে Barna-র একটি চমৎকার ঝরঝরে প্রবন্ধ পড়লাম, Home Policy and World Trade। ওখানেও সেই কথা—উবছে পড়া, multi-lateral mutual imports। নতুন ধরণের Free Trade-এর অর্থ a gradually emerging social order, co-operative commonwealth।

* * * *

শ্রদ্ধার অর্থ এই অতিক্রমকে স্বীকার করা। একেই মনুষ্যত্ব বলি। পশু ভয় পায় ;

মানুষ তার বাইরের, অথচ তাকে নিয়ে, সত্তার flow, fieldকে মানে, অর্থাৎ জীবনকে শ্রদ্ধা করে। আজ দেশে শ্রদ্ধার বড়ই অভাব। মনুষ্যত্ব খোয়াতে বসেছি, স্বাধীনতার খোলস নিয়ে কি করব! পলিটিক্স্ মাথায় ঢোকে না। রেডিও সারতে গেছে, Bach-এর fugue গুলো শুনতে ইচ্ছে হয়। না আছে রেকর্ড, না আছে গ্রামোফোন, সব গেছে ভেঙ্গে। একটা শক্ত ইকনমিক্সের বই খুঁজি। আজ সারাদিন বিশ্রাম পেলাম বহুদিন পরে।

পরিবার-প্রথা

নারায়ণ চৌধুরী

জাপানী আক্রমণ আশঙ্কার সুরু থেকে যুদ্ধের কয়েকটা বৎসর এবং যুদ্ধক্ষান্তির পরবর্তী এই বৎসরাধিক কালের ভেতর বাঙলার পরিবার-প্রথার ভিত্তিমূল অনেকখানি নড়ে গেছে ব'লে মনে হয়। সনাতন পরিবার-প্রথার সঙ্গে জড়ানো লোক-লৌকিকতার ভাবটাও অনেক পরিমাণে কমে গেছে ব'লে আশঙ্কা হচ্ছে।

তার একটা প্রমাণ পেলাম গেলো বিজয়া দশমীর পর। আগে—অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের আগে—বিজয়ার পরের কয়েকদিন প্রতিবেশী ও আত্মীয় পরিচিত বন্ধুবান্ধবের তরফ থেকে কুশলসম্ভাষণের অন্ত ছিলো না। আত্মীয়হিতৈষী যাঁরা দূরে আছেন তাঁরাও, এই একটি মাত্র উপলক্ষে অন্তত, চিঠি দিয়ে প্রত্যেক বৎসর খোঁজখবর নিয়েছেন এবং আমার নিজের তরফ থেকেও তাঁদের সকলের সঙ্গে লৌকিকতার বিনিময় করতে হয়েছে। কাছের মানুষকে সম্ভাষণ এবং পত্রযোগে সম্ভাষণ, এই দুইয়েরই কোনরূপ কম্‌তি ছিলো না। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎই দেখছি আদানপ্রদানের ধারা ক্রমে যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং এবার বিশেষ চকিত হ'য়ে লক্ষ্য করলাম, তা প্রায় শূন্যবিন্দুতে এসে ঠেকেছে। প্রতিবেশীদের যেমন লোকাচার পালনের চাড় নেই, তেমনি যাঁরা বাইরে আছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে ডুব মেরেছেন। নেহাৎ নিকট-আত্মীয়দের লেখা মাত্র কয়েকখানা চিঠি হাতের কাছে নিয়ে মনে মনে নিজেকে শুধোচ্ছিলাম অসংখ্য আত্মীয়পরিজনবন্ধুবান্ধবের চোখে আমার খাতিরই

কমে গেলো, না কি লোকলৌকিকতার খাতিরই আস্তে আস্তে লোকের কাছে কমে যাচ্ছে কোন্‌টা।

সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। একবার মনে হ'লো, বোধ হয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রকৃতি ক্রমশ শুকিয়ে আস্‌ছে, তাই লোকে আর আগের মতো আমার সঙ্গে লৌকিকতারক্ষার চাড় অনুভব করছে না। কিন্তু নিজের আচরণে এই আশঙ্কার সমর্থন খুঁজে পেলাম না। আমার দিক থেকে তো আত্মীয়তা আর বন্ধুতার মনোভাবের অভাব নেই, তবে কেন এরূপ ঘট্‌ছে। অবশ্য চারিদিকে সবারই মনে যখন আত্মীয়তাপালনের তাগিদ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে তখন সেই সমাজেরই একজন হ'য়ে আমি কী ক'রে পুরাতন প্রফুল্লতা রজায় রাখছি সেটা একটা প্রশ্ন হ'তে পারে। তার উত্তর এই যে সব নিয়মেরই যেমন ব্যতিক্রম থাকে, আমার দৃষ্টান্তকেও এই ক্ষেত্রে তেমন একটি ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। এরকম ব্যতিক্রম বোধ হয় আরও অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। এতে ব্যতিক্রম-ওয়ালাদের নিজেদের বাহাদুরী করার কিছু নেই; অন্যান্য শতসহস্রের জীবনে সমাজের ভাঙনের ফলে যে বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, এদের ক্ষেত্রে ফলটা এখন পর্যন্ত ততদূর গিয়ে পৌঁছয় নি, এই মাত্র। তবে মোটামুটি ভাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে বাংলা দেশের গতানুগতিক পরিবারজীবনে সুস্পষ্ট ভাঙন দেখা দিয়েছে। অন্যান্য প্রদেশগুলির কথা ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে যেহেতু বাংলার ওপর দিয়েই যুদ্ধের চাপটা সব চাইতে বেশি গেছে এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত বিপর্যয়ের আঘাত তাকেই সইতে হয়েছে বেশি, তাতে এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ভারতের অপরাপর প্রদেশগুলির ভাগ্যে বাংলার মতো এমন নিদারুণ বিড়ম্বনা ঘটে নি। বিধাতৃ-পরিত্যক্ত বাংলা দেশ, তার ফেরই আলাদা।

নানাপ্রকার লক্ষণে বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারছি বাঙালীর পরিবারজীবন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে। অসংখ্য বিপর্যয়ের ঘা খেয়ে খেয়ে বাঙালীর মনোভাব এমন হ'য়ে উঠেছে যে তার চিন্তা ও দৃষ্টি পরিবারের প্রয়োজনের বাইরে মোটে যেতেই চায় না। পরিবারের আসন্ন সুখদুঃখ প্রয়োজন অপ্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই তার স্বার্থচিন্তা ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। পরিবারের বাইরেও বাড়া কিছু থাক্‌তে পারে সেটা সে আমলেই আন্‌তে চায় না। এই নিঃশেষ স্বার্থচিন্তার ফলটাও হাতে হাতে দেখা দিয়েছে: বাঙালীর পরিবারজীবন অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠেছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয়তারক্ষার দায় আর বাঙালী আগের মতো অনুভব করে না; লোকলৌকিকতার স্রোতে ভাটির টান লেগেছে। আগে যে পরিবারব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল তা অনেকখানি স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট ছিল; প্রয়োজনমতো তাকে টেনে বাড়ানো বা সঙ্কুচিত করা

চল্‌তো। অর্থাৎ প্রয়োজন হ'লে পরিবারিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের অভিন্নতা ঘটানো যেতো, প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে মিশে পারিবারিক মানুষের কাজ করবার ক্ষেত্র ছিল; আবার ইচ্ছে করলে সে নিছক পরিবারের খোলসের মধ্যেও নিজেকে গুটিয়ে আন্‌তে পারতো। কিন্তু বর্তমানে কেবল শেষের প্রক্রিয়াটাই চল্‌ছে; লৌকিকতার ক্ষেত্র বল্‌তে গেলে একরকম অনাবাদী প'ড়ে আছে। ফলে পরিবারপ্রথা আজ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি; যে কোন মুহূর্তে গোটা কাঠামোটাই হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়তে পারে। ক্রমাগত সঙ্কোচনের ফলে যেমন ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হ'য়ে যায়, তেম্‌নি অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত পরিবারজীবনেরও আজ কেন্দ্র বিচ্যুত। সামাজিক ভূকম্পনের আর বেশি দেরী নেই।

ধরা যাক্ কল্‌কাতা সহরের মধ্য আয়ের একটি পরিবার। স্বামী স্ত্রী ও চারটি পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার। স্বামীর নাম বিনোদ। জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সবে বারোয় পড়্‌লো। বিয়ের ভাবনা আছে। মেয়ে-স্কুলে পড়তে দেওয়া হয়েছে। বড়ো ছেলেটির বয়েস নয়। সেও স্কুলে পড়ছে। ছোট ছেলেটির ভর্তি হবার বয়েস হ'লো। আর সবার ছোটটি মেয়ে—নিতান্তই শিশু—এখনও মায়ের আঁচল ধ'রে ঘুরে বেড়াবার বয়েস কাটে নি। বিনোদ যা রোজগার করে তাতে অন্য ভাগীদার না থাক্‌লে কোনক্রমে সংসার চ'লে যেতে পারতো। কিন্তু দেশে মা বাবা আছেন আর আছে এক বিধবা বোন, স্বামী মারা যাবার পর পিতার সংসারে এসে উঠেছে। ভাগিনেয়টি গ্রামের স্কুলে পড়ে। জমি-জমা যা সামান্য আছে তাতে ভরণপোষণ হয় না, বিনোদকে তার আয়ের কিছুটা অংশ প্রতি মাসে দেশের ঠিকানায় মণিঅর্ডার করতে হয়। সুতরাং বাঁধা মাইনের চাক্‌রি, বেশ হিসেব ক'রে, দক্ষিণবাম দেখে, সংসার খরচ করতে হয়। থাকা হয় ফ্ল্যাটে—কবুতরের খোপের মতো দুটি ঘর আর এক চিল্‌তে রান্নাঘর। আত্মীয়রা সহরের কে কোথায় ছিট্‌কে আছে, তাদের সঙ্গে মোটে দেখাই হয় না। ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গেই বলে গিয়ে আলাপ-পরিচয় নেই, বাইরের লোকদের খোঁজ করতে বয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবরা যে যার কাজের ধাঁধায় ব্যস্ত, কদাচিৎ কখনও দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়। নেহাৎ স্বার্থের সূত্রে জড়িত না থাক্‌লে কোন শর্মার এমুখো হবার নাম নেই; বিনোদও স্বার্থের গন্ধ ছাড়া কারও বাড়ি ব'য়ে দেখা করার পাত্র নয়। কলেজে পড়বার সময় বিনোদের খুব হৈহল্লাপ্রিয় বন্ধুবৎসল ব'লে নাম ছিল, কিন্তু সংসারের মুখ চেয়ে এখন নিজেকে জোর করে গুটিয়ে আন্‌তে হয়েছে; এককালের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও আজকাল রাস্তায় দেখা হলে মামুলি কুশলপ্রশ্নাদির পর, প্রথমতম সুযোগে, পাশ কাটিয়ে চলে আস্‌তে হয়। বন্ধুবান্ধবদেরকে বাড়ীতে ডেকে আড্ডা দেওয়া, খাওয়ানো অনেককাল উঠে গেছে, নিজেও কোথাও আড্ডা দিতে, খেতে যায় না। পারতপক্ষে জন্মদিন বা বিয়ের

নেমন্তন্নে যেতে চায় না, কেননা লৌকিকতার ভয় আছে। এককালে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে খরচ ক'রে সিনেমা দেখার সখ ছিল, কিন্তু এখন সখটাই আছে, বন্ধুবান্ধবরা নেই। একা একা সিনেমা দেখ্‌তে আর খারাপ লাগে না। স্ত্রীকে পাশে নিয়ে দেখলে হয়, কিন্তু তাতে অনেক হাঙ্গাম। ছেলেগুলি আবার সঙ্গে যাবার জন্যে বায়না ধরে, কোলের শিশুরও আজকাল টিকিট লাগে। কলেজে থাকতে কি কুক্ষণে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস করেছিলো, অভ্যাসটা ছাড়তে পারে নি, কিন্তু আজকাল চারদিক দেখেশুনে তবে প্যাকেটটি পকেট থেকে বার করতে হয়। যাদবপুরে এক মাসীমা থাকেন, লিখেছেন মাস্‌তুতো ভাইয়ের সাংঘাতিক অসুখ, একবার এসে যেন দেখা করে। শ্যামবাজার থেকে যেতে-আস্‌তে কতগুলি পয়সা খরচ, তা ছাড়া বাড়ি পাহারাই বা দেয় কে। থাক্ গে, একটা কার্ড লিখে দিলেই চল্‌বে। মাসীমার তো অবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়, দিনরাত্রির জন্যে দুটো নার্স রেখে দিলেই হয়। চিঠিতে প্রস্তাবটি পেড়ে দেখবে। ছা-পোষা সংসার, কোথাও কি বেরোবার যো আছে—সন্ধ্যার আড্ডার মায়া পর্যন্ত কাটাতে হয়েছে অনেকদিন। চাকর রাখ্‌বার সংস্থান নেই, সন্ধ্যার দিকে বাড়ী থাকলে স্ত্রীর কাজের অনেকখানি সাশ্রয় হয়। একমাত্র রোব্‌বার—কিন্তু অই সপ্তাহব্যাপী একটানা কাজের ঘানি ঘোরাবার পর একটি মাত্র ছুটির দিন, কোথাও কি যেতে ভালো লাগে, না দেহের সেই সামর্থ্য থাকে? রোববারের দুপুরটা একপ্রস্থ ঢালা ঘুম না হলে মনে হয় ছুটির দিনটাই মাটি হ'লো। স্ত্রীরও এককালে এক আধটু সখ ছিলো, কিন্তু সংসারযন্ত্রের পেষণে এখন নিশ্বাস নেবার পর্যন্ত ফুরসত মেলে না। বান্ধবীদের বাড়ী যেতে আর ভালো লাগে না, সুমিতার তো স্বামীর গরবে মাটিতে পা-ই পড়তে চায় না; আভার সঙ্গে দেখা হলেই ওর নতুন প্যাটার্ণে গড়া সরু হারটি নাচিয়ে নাচিয়ে দেখানো চাই-ই; শিপ্রার মুখে কেবল নিজের ছেলেমেয়ের গল্প—বাকী রইলো মিনতি, কিন্তু ও পড়েছে এক আকাট দরিদ্রের হাতে, পাড়াটা যা নোংরা, ওদের বাড়িতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আস্‌তে চায়। হাজার হোক মান-মর্যাদা একটা আছে, ফ্ল্যাটের বাসিন্দার কি বস্তির বাসিন্দার সঙ্গে মাখামাখি করা চলে?

গড়পরতা একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি। ইচ্ছে করলে আরও কয়েকটি তুলির পোঁচ দিয়ে চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করা যেতে পারতো, কিন্তু যেটুকু আভাস দিয়েছি তাতেই বোধ করি পরিবারটির আত্মকেন্দ্রিকতার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সমাজজীবনের সঙ্গে এই পরিবারের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ সুতোয় ঝুলছে তা আশা করি না বল্‌লেও চলে। এই ধরণের পরিবারের সংখ্যাই আজ মধ্যবিত্ত-সমাজে বেশি। যুদ্ধের আগে এদের জীবনযাত্রা খুব বেশি ভিন্নতর ছিল তা নয়, তবে যুদ্ধের মারাত্মক বিপর্যয়কারী বৎসরগুলি

সেই জীবনযাত্রাকেই আজ একেবারে বিনিঃশেষ স্বার্থচিন্তার শুক্‌নো চড়ায় এনে ঠেলে তুলেছে। কোনরকমে টিকে থাক্‌তে পারাটাই আজকের দিনের প্রধানতম সমস্যা।

এইভাবে যতোই সমাজজীবনের উঁচুর দিকে উঠা যায় ততোই দেখি পরিবার-জীবনে আত্মসুখ ছাড়া কথা নেই; কেবলই নিজেকে এবং নিজের নিকট পাঁচজনকে নিয়ে সুখে বেঁচেবর্তে থাকার চক্রান্ত। অপরে জাহান্নমে যাক্, নিজের গায়ে আঁচড়টি না লাগ্‌লেই হলো। অপরের বিপদ নিজের ঘাড়ের ওপর এসে পড়া বিচিত্র নয় জেনেও যতোক্ষণ সেই বিপদ নিজের ওপর এসে না পড়ছে ততোক্ষণ কিছু করার নামটি নেই, আত্মবুদ্ধির ধাঁধায় মানুষের এমনি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। বিগত কলকাতার দাঙ্গায় যতগুলি পরোপকার ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে কেবলমাত্র উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার জন্যে প্রশংসা দাবী করতে পারে, আমাদের ওপরতলার জীবরা যেন তেন প্রকারেণ আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেমন নিষ্ঠুরতায় ক্ষমাহীন, তেম্‌নি ঔদার্যেও অবারিত। তাদের ভেতর পরিবার-বন্ধন শিথিল, কাজেই স্বার্থচিন্তাও কম। এদের নাচিয়ে বেড়ানোই হচ্ছে আত্মসুখপরায়ণ পরিবার-কেন্দ্রিক বড়োলোকদের কাজ। যাদের জন্যে অতগুলি অসহায় দরিদ্র নিরপরাধ লোকের শুধু শুধু প্রাণ গেলো সেই ধনী নেতৃবৃন্দ (ধনী না হলে এদেশে নেতা হওয়া যায় না) কতদূর বিচলিত হয়েছেন জানি না; আর যদি বিচলিতও হয়ে থাকেন তাতেই বা কি, সেই সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিত্বের আশায় ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়েও তো উঠেছেন। বহুর দুঃখের বিনিময়ে একের আত্মপ্রতিষ্ঠা, এইটেকে আমরা প্রকৃতির বিধান বলে মেনে নিয়েছি। আমাদের চোখে যে কোন মূল্যে সামাজিক সাফল্য অর্জন করাটাই হচ্ছে আদত। পরিবার প্রতিপালন করতে হলে, পোষ্যদের মানুষ ক'রে তুল্‌তে হলে, অমন সবাই এক আধটু পরকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে, তাতে দোষ হয় না—এইটেই আমাদের সকলকার মনোভাব।

কাজেই মূলে সেই পরিবার-প্রথা। এক একটি পরিবারে এক এক ধরণের স্বার্থ-চিন্তা পাক খেয়ে খেয়ে উঠ্‌ছে। দুই পরিবারের সীমানায় আগে যেখানে শুধু ইঁটের দেয়াল ছিলো, এখন সেখানে মনের দেয়াল উঠেছে। লোকলৌকিকতার দৌলতে আগে যেখানে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে খানিকটা ঐক্যবন্ধন ছিলো, এখন তার জায়গায় বিরাট শূন্যতার মরুভূমি হাঁ ক'রে আছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব মানুষকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে দিচ্ছে না; কেবলই তাকে দূরে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। উনিশ শতকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আমরা আদর্শ হিসাবে বিসর্জন দিয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের আচরণে তাকে সজোরে আঁকড়ে ধ'রে আছি। তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর পরিবার-প্রথার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ। কান টান্‌লে মাথা

আসে ; যেখানেই পরিবারের মানুষদের জন্যে ভাবনা, সেখানেই ভূঁয়ো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। পরিবারের অনেকগুলি মানুষের জন্যে একার ভাব্‌তে হয় ব'লে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় তা ভাব্‌বেন না, কারণ এক একটি গোটা পরিবার এক একটি ইউনিট, তারই ওপর তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি। পরিবার প্রতিপালন করার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং এই ধরণের আরও যেসব গালভরা কথা প্রায়শ শুনি তার অর্থ হচ্ছে মানুষ বিয়ে ক'রে সংসারী হয়ে বস্‌লেই স্বার্থপরতার পাস্‌পোর্ট পেয়ে গেলো। তখন পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের কথা না ভেবে কেবল নিজের আর নিজের সংসারকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও বলবার কেউ নেই ; আধুনিক পরিবার-প্রথার মধ্যেই তার অনুমোদন আছে। আজকের সমাজে, বিশেষত বাংলার যুদ্ধোত্তর সমাজে, এক একটি পরিবার যেন এক একটি দ্বীপ, তার চারদিকে শূন্যতা থৈ থৈ করছে। সামাজিকতার ছোট ছোট সাঁকোগুলি পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ; পরস্পরের পরস্পরের কাছে যাবার কোন উপায়ই রইলো না।

নেপোটিজ্‌ম্‌ বা আত্মীয়ানুগ্রহ ব'লে যে কথাটি আছে তার মূলেও এই পরিবারপ্রথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফেবারিটিজ্‌ম্‌-এরও পরিবারপ্রথা থেকে উদ্ভব। আপনি হয়ত আপিসের একজন মাতব্বরস্থানীয় ব্যক্তি, ধরা যাক্‌ আপনি বড়বাবু। যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিসে একজন নতুন লোক নেওয়ার কথা উঠেছে এবং সেই নিয়োগের ভার পড়েছে আপনার ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার অকাটমূর্খ ভাগ্নে—সিনেমা দেখা, ঘুড়ি ওড়ানো এবং খেলার দিনে 'মোহনবাগান মোহনবাগান' ক'রে পাড়া মাথায় করা যার একমাত্র কাজ—সেই অকর্মার ধাড়ীটির কথা আপনার মনে পড়্‌লো। বসে ব'সে আপনার অন্ন ধ্বংস করছে বই তো নয়। মামা হ'য়ে এহেন যোগ্য ভাগ্নেটিকে আপনি disoblige করতে পারেন না। পারলেও পাড়ার দশজন আপনাকে তিষ্ঠোতে দেবে না, বল্‌বে ছাখো, ভাগ্নেটার পর্যন্ত একটা গতি করতে পারলো না। কাজেই অন্য দশটি দরখাস্ত চাপা দিয়ে একদিন ভাগ্নেকে সাজিয়ে-পড়িয়ে সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে হয়, ভাগ্নের হ'য়ে যা কিছু বলার সে আপনিই বলেন। শুভদিনে ভাগ্নে আপিস আরম্ভ করে এবং পাড়ায় আপনার নামে ধন্যি ধন্যি প'ড়ে যায়।

এই ধরণের ব্যাপার তো হামেসাই হচ্ছে। চাক্‌রিবাক্‌রির রাজ্যে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু সেইটে ততো শোচনীয় নয় যতোটা শোচনীয় এই সম্পর্কে সাধারণ দশজনের মনোভাব। এই ধরণের আত্মীয়ানুগ্রহের দৃষ্টান্তে মানুষকে খুব বেশি গ্লানিবোধ করতে দেখা যায় না ; যেন এইটেই স্বাভাবিক। পরিবার-প্রথা সম্পর্কে প্রত্যেকের মনে অকারণ মোহ আছে বলেই এরকম হয়। এর ভেতর যে খুব বেশি দোষাবহ কিছু আছে এই চেতনাই আমাদের জাগ্রত নয়, কেন না পরিবার-প্রথার ঠুলি চোখে

প'রে আমাদের এমন হয়েছে যে ন্যায় অন্যায় নির্ণয়ের বেলায়ও আমরা সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি ; কিছুই আমাদের চোখে স্পষ্ট নয়। ভাবটা যেন এই, পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আমরা যেন পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে পরস্পরের অবাধ স্বার্থপরতার অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছি ; যুদ্ধকালীন ইংরেজ-রুশ চুক্তির মতো একের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ না করার সর্তটি পর্যন্ত তাতে আছে। নিজ নিজ পরিবারের আওতার ভেতর থেকে স্বার্থপরতার বিজয়পতাকা ওড়াও, কেউ তোমাকে বলতে আসবে না—আমাদের অলিখিত চুক্তির সারমর্ম হ'লো তা-ই।

আসলে পরিবার বস্তুটি কি ? স্ত্রীপুত্রসংসারকে কেন্দ্র ক'রে নীড় রচনার সংস্কার মানুষের মনে বদ্ধমূল, পরিবারজীবনের মধ্যে সেই অভিলাষেরই পরিতৃপ্তি। অবসর ও বিশ্রামভোগেচ্ছা, গোপনীয়তা ও নিভৃতির আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির সাধ, পোষ্যদের প্রতি আচরণে কর্তৃত্বের গোপন বাসনা, আশ্রিতদের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধির তাগিদ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ও সঞ্চয়স্পৃহা—এই সব এবং এই ধরণের আরো নানাবিধ আকাঙ্ক্ষা মিলে পরিবারের ভিত্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিতৃপ্তিই জীবনের সব নয়, এদের বাইরেও কর্ম আর বাসনার বিস্তৃত জগৎ প'ড়ে রয়েছে। আমরা ভুল করি সেখানেই যেখানে আমরা জীবনের পরিধি ও পরিবারের পরিধিকে এক ক'রে দেখি। পরিবারকে দিয়ে জীবনের বৃত্ত কখনও পূর্ণ হয় না ; তাকে বড়ো জোর জীবনের একটি ছোট বৃত্তাংশ বলা যেতে পারে। কিন্তু কালেরই এমন চক্রান্ত যে আজ জীবনের আনুগত্য মানেই পরিবারের আনুগত্য। সমাজ ও পরিবার আজ সমার্থক ; পরিবারের বাইরে জীবনের ধারণা আমাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে তা বিকৃত। যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানে এ নয় যে বাইরের সমাজের সঙ্গে তোমার কোন যোগ থাকবে না, শামুকের মতো নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের খোলের ভেতর গুটিয়ে থাকাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে না। আমরা কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরোক্ত অর্থই মেনে নিয়েছি এবং যেহেতু পরিবারপ্রথা অই বিকৃত অর্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক সেইজন্যে পরিবারপ্রথার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যদি ঠিক ঠিক অর্থ করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে সমগ্র সমাজ নিয়েই তার বেড়। সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চরিত্রে সদ্‌বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি—এইটেকেই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলা উচিত। নিজের স্বাধীনতা যতোক্ষণ না পরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ততোক্ষণই তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কিন্তু পরের ক্ষতি করলেই তা যথেচ্ছাচার। ঘরে ব'সে তুমি নাচো কুঁদো সং সাজো কিছু আসে যায় না, পরের শান্তি না ভঙ্গ করলেই হ'লো। তোমার খেয়াল তোমার, যতোক্ষণ

না তুমি পরকে ঘাঁটাতে যাচ্ছো ততোক্ষণ সেই খেয়াল বাধাহীনভাবে অনুসরণ করার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে, কিন্তু তাই ব'লে পরের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে তুমি পারো না।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিছুতেই পরিবারপ্রাণতার সঙ্গে এক ক'রে দেখা চলে না। কিন্তু এই ভুলটি আমরা প্রায়শ করি। তাতেই যতো গণ্ডগোল বাধে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করার ফলে হয়েছে এই যে পরিবার-প্রথা রূপ রাহুটিকে আমরা সমগ্র সমাজদেহকে বিনাবাধায় গ্রাস করতে দিচ্ছি। এই বিনাশের প্রক্রিয়া অবিলম্বে রোধ করা দরকার।

আগের দিনের যৌথ পরিবারপ্রথার যতো দোষই থাকুক, তাতে খানিকটা সামাজিকতার অবকাশ ছিলো একথা অস্বীকার করা যায় না। অনেক পোষ্য ও আশ্রিত মিলে যে পরিবার তাকে বিরাট সমাজ-ব্যবস্থারই একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপক ব'লে ধরা চলতো। প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্যের দায় পরিবারের বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতি কর্ত্তব্যকর্মের মধ্যে দিয়ে খানিকটা সারা যেতো। প্রাচীন যুগের কৌম সমাজব্যবস্থায়, যখন সকলে মিলে এক পরিবার ছিলো আর পরিবারের শীর্ষে ছিলো একজন পেট্রিয়ার্ক বা গোষ্ঠীপতি, তখন পরিবার ও সমাজ অভিন্ন ছিলো। কিছুদিন আগেকার যৌথ পরিবারপ্রথার মধ্যে তারই যেন একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। যৌথ পরিবারপ্রথা যেমন নানা দোষের আকর, তেমনি একথাও অস্বীকার করা যায় না যে তাতে খানিকটা হৃদয়বত্তা আর মহানুভবতারও জায়গা ছিলো। আজ যৌথ পরিবারপ্রথা প্রায় লুপ্ত, কিন্তু যে সব পরিবারে তার খানিকটা ছিঁটেফোঁটা লেগে রয়েছে, তাদের ভেতর কোথায় যেন একটা সামাজিকতা ও প্রতিবেশিপরায়ণতার (neighbourliness) ভাব টিকে আছে বলে মনে হয়। আজকের ফ্ল্যাট-নিবাসী আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ ছোট ছোট পরিবারগুলিতে এই গুণগুলির একান্তই অসম্ভাব।

ছোটখাট মফঃস্বল শহরে কোথাও কোথাও দেখেছি দুই পরিবারের মধ্যে বাঁধাধরা কোন সীমারেখা নেই, এক পরিবারের লোক আরেক পরিবারের উঠোন দিয়ে দিব্যি আসা যাওয়া করছে, কারও মনে কোন দ্বিধা নেই। আমাদের মতো নাগরিকভাবাপন্ন লোকের চোখে হঠাৎ কেমন যেন দৃশ্যটি দৃষ্টিকটু ঠেকে—কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যৌথ পরিবারপ্রথাটাই অনেকখানি রূপান্তরিত হয়ে এইরূপ হয়েছে। অই দুই পরিবারের উল্লেখযোগ্য আত্মীয়তা হয়ত বিশেষ নেই, তবু যে তাদের মধ্যে নেহাৎ রান্নাবান্না খাওয়াশোওয়া ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সম্মিলিত জীবনযাপনের প্রয়াস দেখা যায় তাতে পুরাতন পরিবার-প্রথারই ক্ষীণ একটু প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ব'লে মনে হয়। আমার মনে আছে ছোটবেলায় কোন এক জেলাসহরে থাকতে প্রায়ই

আমরা ছেলের দল এক পরিবারের উঠোনের ওপর দিয়ে রমারম যেতাম-আসতাম, খেলার মাঠে যাবার সেইটেই ছিলো 'শর্ট-কাট্'। অনেকখানি বয়েস হয়ে অবধি এটা আমরা করেছি, কিন্তু কোনদিন সেই পরিবারের তরফ থেকে এই নিয়ে আপত্তি ওঠেনি। অথচ সেই পরিবারের লোকদের সঙ্গে আমরা যে বিশেষ পরিচিত ছিলাম তাও নয়। আজকের দিনে এমন একটা ব্যাপার চিন্তা করুন তো। ছেলেদের সঙ্গে এই নিয়ে পরিবারের কর্তার কবে লাঠালাঠি বেধে যেতো!

যৌথ পরিবারপ্রথা বা তার কোনরূপ রকমফেরকে জীইয়ে রাখবার জন্যে ওকালতি করছি তা ভাববেন না। যৌথ পরিবারের দোষ সম্বন্ধে আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সব চাইতে যেটা বড়ো দোষ তা হচ্ছে অনেকের অকর্মণ্যতার সুযোগে একের মোড়লী করা— পরিবারের কর্তার অন্য সবাইকে গরুভেড়া ছাগলের মতো জ্ঞান করা। এই প্রভুত্ব-পরায়ণতার ছিদ্রপথে যে পর্বতপ্রমাণ আলস্য, কুক্রিয়াসক্তি, আত্মমর্যাদার অভাব জমে ওঠে, খানিকটা হৃদয়বত্তা আর সামাজিকতার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয় না। সে ক্ষতি অনেক বড়ো।

সুতরাং ইউরোপীয় সমাজের নজীরে পরিবারগুলিকে ভেঙে ভেঙে ছোট করতে হবে, যদি যুগপ্রভাব মানতে হয়। ছেলে শিক্ষাসমাপনান্তে রোজগারের চেষ্টা করবে, রোজগার প্রয়োজনানুরূপ হ'লে বিয়ে করবে এবং বিয়ে ক'রে স্বতন্ত্র পরিবার গড়ে তুলবে এই ব্যবস্থাই আজ্‌কের দিনে প্রশস্ত। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "The Problems of Indian Youth" বইতে অভিভাবক-যুবক সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে এই ব্যবস্থাই সমর্থন করেছেন দেখ্‌লাম। তবে কথা হচ্ছে, এই ব্যবস্থাকে নিখুঁত ব্যবস্থা মনে করলে ভুল করা হবে। গণ্ডীবদ্ধ ছোট ছোট পরিবারের সুবিধা অনেক, কিন্তু তাতে আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব বড্ড প্রশ্রয় পায়, সেইজন্যেই ভয়। আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক দোষের আকর, তাকে রোধ করতে না পারলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই বানচাল হ'য়ে যেতে পারে। তাই উপরোক্ত গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিবার-প্রথার পরিপূরক হিসাবে আরও কিছু চাই।

এই পরিপূরক কী? আমাদের মনে হয় নানা কর্মসূত্রে জনসাধারণের সান্নিধ্যে আসা। সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শ স্থাপন করা। রাজনীতিচর্চায় এইরূপ সান্নিধ্যের অবকাশ আছে, কিন্তু রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরামর্শ কাউকে আমরা দিতে পারি না, যেহেতু এদেশীয় রাজনীতি মানে জনসাধারণকে মইরূপে ব্যবহার ক'রে তারপর তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহন ক'রে মইটিকে ঠেলে দেওয়া। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়াও বল্‌তে পারেন। তবে আর কি ভাবে সমাজের সান্নিধ্যে আসা যায়? নিঃসন্দেহে সঙ্কটত্রাণ, সমাজসেবা, সাহিত্য-শিল্পসঙ্গীত অনুশীলন, নিরক্ষরকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্যের দ্বারা। এর ফলে আমাদের

দৃষ্টিভঙ্গি উদার হবে, আমাদের মনোভাব সামাজিক হবে, অথচ পরিবারের গণ্ডীর ভেতর স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে শান্তিতে বাস করতেও বাধা থাকবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও বজায় রাখ্‌তে হবে আবার সামাজিকতাকেও মেনে চলা চাই, এই যদি আমাদের মনোভাব হয় তা হ'লে উপরোক্ত পথই একমাত্র পথ। এছাড়া সমাজদেহকে টিকিয়ে রাখ্‌তে পারা যাবে কিনা সন্দেহ।

ব্যক্ত

বুদ্ধদেব বসু

গোলদিঘির ধারে গলির মোড়ে
অবন্তীবাবুর বইয়ের দোকান।
সময়ে অসময়ে
সাহিত্যিকের আড্ডা জমে সেখানে।
বাঙালি লেখকের দুই পুরুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ।
আমরা, যারা এখনো আছি তিরিশের পাড়ায়,
আর যাঁরা পঞ্চাশ-পেরনো,
দুই দলের শিবির পড়ে পাশাপাশি
অবন্তীবাবুর দোকানে।
আমাদের দেখে অত্যধিক খুশি হন তাঁরা
মনে-মনে কী ভাবেন জানি না।
আমরা মনে-মনে তাঁদের করুণা করি
আমাদের যারা করুণা করবে, তারা ঘরে ঘরে বড়ো হচ্ছে।

অবন্তীবাবুর ব্যবহারে পক্ষপাত নেই,
তাঁর অভ্যর্থনা কলের জলের মতো,
অসাম্য নেই তাতে, বৈচিত্র্যও নেই।

ভালো মন্দ মাঝারি লেখকের ভেদ নেই তাঁর কাছে ;
যে-কোনো শ্রেণীর লেখক হোক না,
হোক না সাহিত্যজগতে সদ্যোজাত,
আসন তার অবধারিত অবন্তীবাবুর দোকানে।
অথচ তিনি যে মস্ত প্রকাশক তা নয়,
সাহিত্যের রসিক ব'লেও মনে হয় না তাঁকে।
মানুষটি একটু অদ্ভুতই।
তাঁর মধ্যে যেটুকু অসাধারণ তা তাঁর নামেই,
আর যা—তাকে সাধারণ বললে অপমান হয় সাধারণের।
এমন নিষ্প্রভ নির্জীব বিবর্ণ মানুষ
লাখে একটাও হয় না।
সামনের দিকে বেচাকেনা চলে, পিছনে আবছা আলোয় তিনি বসে থাকেন
মস্ত টেবিলের সামনে, গদি-আঁটা চেয়ারে।
সেই টেবিল ঘিরেই সাহিত্যিক বৈঠক বসে
দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়।
কেউ আসে, কেউ যায়, অবন্তীবাবু নিশ্চল নির্বিকার,
কখনো দেখিনি তাঁকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে,
হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা শুনিনি।
ভাবের লেশ নেই মুখে,
তিন বছর পরে কাউকে দেখলেও খুশি হন না,
দুঃখ পান না কারো মৃত্যুসংবাদেও,
অন্তত মুখ দেখে তা-ই মনে হয়।

রোজ তাঁকে ঘিরে
কত গল্প, কত তর্ক, কত ঠাট্টা,
সাহিত্যে শান-দেয়া রসনার
কত আশ্চর্য চকমকি ;
তিনি কখনো হাসেন না, রাগেন না, কথা কাটেন না,
কেমন একরকম নিবু-নিবু চোখে তাকিয়ে তাকেন চুপ করে।

চা চলে অবিরাম,
সেই সঙ্গে শিঙাড়া, সন্দেশ,
সিগারেট, পান।
কখনো কেউ তাঁর কাছে ব'সে চুপি-চুপি কী বলে,
অমনি দেরাজ খুলে বের করেন টাকা
মুখে বলেন না কিছুই।
আমরা কেউ-কেউ ভাবি, ভারি মজা তো!
চাইলেই পাওয়া যায়, ফেরৎ দিতে হয় না!
আড়ালে তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও চলে,
তার মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ যেটা, সেটা বলি।
গৌর ঘোষ তাঁর নাম দিয়েছে সাহিত্য-মুদি—
মানে; সাহিত্যিকদের চা খাইয়ে আর রশদ জুগিয়েই এ-যাত্রা তিনি ত'রে যাবেন।
কেন টাকা চাই, কী দরকার, সত্যি দরকার কিনা,
একবার জিগেস পর্যন্ত করে না,
বোকা!
এমন করলে কি আর ব্যবসা চলে! উঠে যাবে দোকান!
আর উঠে যখন যাবেই, আমরা কেন রোদ পুইয়ে নেবো না,
যতক্ষণ রোদটুকু আছে!

আমিও অনেকদিন ভেবেছি
অবন্তীবাবু কেন তাঁর দোকানে
সাহিত্যিকের আসর জমান।
কেন চা খাওয়ান, চাওয়ামাত্র টাকা দেন বের ক'রে।
এ-সব যে তাঁর ভালো লাগে তা তো নয়,
পৃথিবীর কোনো-কিছুই যে তাঁর ভালো লাগে, তা ভাবা শক্ত
ঐ তো জড়ভরত মানুষ,
বন্ধু নেই, আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই;
তাঁর কথা যখনই ভাবি, মনে হয় ঐ টেবিলটির ধারে ঝিমুচ্ছেন ব'সে।

আজ দশ বছর ধ'রে একই রকম তাঁকে দেখছি,
একদিন দোকান কামাই করতে দেখিনি,
কখনো দেখিনি চেয়ারটি শূন্য।
ভাবতে পারি না রাত্তিরে কোথায় শোন,
রবিবারে কী করেন।
এদিকে ব্যবসাতেও মন নেই।
বাপের আমলে বেশ বড়ো কারবারই নাকি ছিলো,
আজ উৎসবশেষের শুকনো মালার মতো পড়ে আছে তার স্মৃতিটুকু।
এখন অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে শুনি,
তবু কেন ওঁর সাহিত্যিকের বাতিক?
সাহিত্যিকরা সুখী হলে ওঁর তাতে কী।
শুনেছি, এইরকমই চলে আসছে বহুদিন ধ'রে
পঞ্চাশ-পেরনো লেখকরা যখন ছোকরা তখন থেকেই।
কেন এরকম, এ-প্রশ্ন এখন আর ওঠেই না,
এটা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ,
অবন্তীবাবু আড্ডা ভেঙে দিতে পারেন না ইচ্ছা করলেও।

২

অবন্তীবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দুপুরবেলায়,
তারপর আষাঢ় গেলো, শ্রাবণ এলো, আর যদিও
নিত্যই ও-পাড়ায় আমার আনাগোনা,
আর যাইনি।
কেন?
সকলের অপরাধ আমাকে অপরাধী করেছে, তাই।
দুই পুরুষের সাহিত্যিকের লজ্জা আমি একলা বহন করছি, তাই।

সেদিন গিয়ে দেখি
আর কেউ নেই,
আড্ডার ঠিক সময় হয়নি তখনও।
অবন্তীবাবুকে একা দেখলে বড়ো বসি না,
নেহাৎ গরম ব'লেই
পাখার তলায় একটু বসতে হ'লো।
সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই গেলো প'ড়ে,
তুলতে গিয়ে হাত ঠেকলো কী একটা কাগজে।
আরে! একটা নোট! হাজার টাকার!
ব'লে উঠলাম, 'কী কাণ্ড! হাজার টাকার নোট টেবিলের তলায়!'
'ও', বলে অবন্তীবাবু সেটি দেরাজে রেখে দিলেন,
কিছুই বললেন না,
মুখে ফুটলো না কোনো উদ্বেগ, কোনো আনন্দ,
না কোনো চকিত আশঙ্কা, না কোনো ক্ষিপ্র শান্তি।
একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে,
হঠাৎ তিনি বললেন, 'এ-রকম কত গেছে,
এও যাবার হ'লে যেতো।'
সিগারেটে দুটো টান দিয়ে বললেন আবার:
'আমার স্ত্রী ভারি অসাবধান মানুষ ছিলেন,
কেবলই টাকা হারাতেন,
এ নিয়ে তাঁকে ব'কে আর রাখতুম না।
তারপর তিনি যখন মারা গেলেন,
ঘরের যেখানে হাত দিই, সেখান থেকেই টাকা বেরোয়,
আনাচে-কানাচে কত যে জমিয়েছিলেন!'
চিরকাল যে-মানুষ চুপচাপ,
চিরকাল যাকে দেখেছি ছায়ার মতো,
যার আকার আছে, আয়তন নেই, স্ফীতি আছে, বস্তু নেই,
তার মুখে হঠাৎ এত কথা শুনে
ভারি অস্বস্তি লাগলো আমার।

মনে হলো কিছু বলা উচিত, কিন্তু কী বলবো।
একটু পরে উনিই বলতে লাগলেন ঃ
'তার পর থেকে দেখছি টাকা থাকে না আমার হাতেই ;
অনেক ছিলো—কেমন করে গেলো বুঝতেও পারলুম না।
বাবা পাঠ্যবইয়ে পয়সা করেছিলেন,
আমিও অন্য-কিছু করবো ভাবিনি,
ভাবলেন আমার স্ত্রী।
তিনি বললেন, 'কী হবে আর এ সব ক'রে।
এমন বই বের করো, যা আনন্দ দেবে মানুষকে,
ঘরে-ঘরে জ্বালবে আলো, জীবনে আনবে শ্রী,
যা কেউ বাধ্য হয়ে পড়বে না, বাধ্য হবে পড়তে।'
ভাইয়েরা রাজি হলো না,
তাদের সঙ্গে আলাদা হয়ে এই দোকান করলুম।
আমার স্ত্রীর উৎসাহ অফুরন্ত,
রাশি-রাশি বই পড়তেন তিনি,
সাহিত্যিকদের ভালোবাসতেন, কাছে বসে খাওয়াতেন বাড়িতে ডেকে।
একদিন তাঁর অসুখ করলো,
ডাক্তার এসে দিলেন ভুল ওষুধ,
তারপর কত কিছুই করা হ'লো, ভুল আর ঠিক হলো না।'
এই পর্যন্ত ব'লে
হঠাৎ চুপ করলেন অবন্তীবাবু।
আর আমার মনে হলো,
এই প্রথম তাঁকে দেখলুম।
এতদিন দেখেছি তাঁর মাথা ভরা টাক,
গায়ের কাদা-গোলা রং, হলদে চোখের ঘোলা দৃষ্টি।
বৃদ্ধ ব'লে ভাবিনি তাঁকে,
কখনো যে যুবা ছিলেন তা মনেই আনতে পারিনি ;
তাঁর বয়সটাও যেন কোনো এক অনির্নীত ধূসরিমায় স্তম্ভিত,
দেখে চেনা যায় এমন-কোনো রূপ নেই তার।

মুছে-যাওয়া ছবির মতো তিনি ছিলেন
যা কেউ লক্ষ্য করে না, তবু নামিয়েও রাখে না।
সেই আবছায়ার ছাইরঙা আচ্ছাদন সরিয়ে
হঠাৎ তিনি স্পষ্ট হলেন, ব্যক্ত হলেন,
হলেন ব্যক্তি।

'সে অনেকদিন হ'লো,
আপনি তখন ছেলেমানুষ নিশ্চয়ই,
তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে ভালো লাগত আপনার,
মানুষটা তিনি ভালোই ছিলেন—লোকে তা-ই বলতো।'
চাপা গলায়, দ্রুতস্বরে অবন্তীবাবু কথাগুলো বললেন,
মুখে লালের আভা,
ঠোঁটের কোণে হাসি,
অথচ ঠিক যেন হাসিও নয়।
একবার তাকিয়েই চোখ নিচু করলাম আমি,
হঠাৎ ধিক্কার এলো নিজের উপর।
মনে হ'লো, বৃথা পড়েছি রাশি-রাশি বই
ইংরেজি, ফরাশি, রাশিয়ান।
গদ্য পদ্যের জোড়া পাখায়
রাশি-রাশি কথা বৃথাই উড়িয়েছি আকাশে।
ও-সব কিছু না।
অন্ধ আমি, মনে আমার অন্ধকার, রোজ যাকে দেখি তাকেও দেখি না-
আমি আবার দৃষ্টি দেবো কাকে, আমি আবার আলো জ্বালবো কার ঘরে!

পরদা-ঢাকা আড়াল থেকে
পুরোনো চাকর হরিপদ
চায়ের পেয়ালা এনে রাখলো আমার সামনে।

ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু না বলতে পারলুম না,
নিঃশব্দে ব'সে-ব'সে শেষ করলুম পেয়ালা।
সত্যি কথা বলতে কী, অবন্তীবাবুর চা-টা ভালো,
নিখুঁত দুধ-চিনির মাত্রা, ঝকঝকে বাটি,
একটু উনিশ-বিশ হয় না কখনো।
এর অর্থ বুঝলুম এতদিনে।
এই চা, আর অন্য যা-কিছু,
সবই তো সেই একজনের ভালোবাসার ভাষা,
যে-মানুষকে আমি দেখিনি, যাকে দেখলে আমার ভালো লাগতো,
যে-ভালোবাসার অনির্বাণ আগুনের
অবন্তীবাবু অলক্ষ্য মৃৎপ্রদীপ।

মালব্যজী

অনিল চক্রবর্ত্তী

অশীতিপর বৃদ্ধের মৃত্যু একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, কিন্তু যে অন্যতম ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভ থেকে একান্তভাবে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকল্পে সমগ্র জীবন ব্যয়িত করে জাতি নির্ব্বিশেষে সকলের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করেছেন, তাঁর মৃত্যু অকস্মাৎ না হলেও জনগণ তাতে আকস্মিক একটা ক্ষতি মনে করেই বিহ্বল হয়ে পড়ে। অক্লান্ত কর্ম্মী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মৃত্যুও আজ এমনিভাবে আর একবার সমগ্র ভারতবর্ষের মনে একটা অপূরণীয় ক্ষতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেলো।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের রাজনীতি যখন নবজাত পক্ষী-শাবকের মতো ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তারের চেষ্টায় উদগ্রীব, তখন যে কয়জন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক অপরিমেয় পরিশ্রমে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছিলেন তরুণ মদনমোহন তাঁদের অন্যতম। সেদিনকার ভারতবর্ষ অনেক বিসর্পিল পথ পার হয়ে, অনেক ভাঙাগড়ার বাধা এড়িয়ে আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে কী বিপুল সম্ভাবনাময় রূপ পরিগ্রহ

করেছে, তার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে শেষ অবধি বেঁচে ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস সেবক মদনমোহন। সুতরাং এ কথা বললে বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হবে না যে, মালব্যজীর জীবনেতিহাস একপক্ষে ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসও বটে।

সমগ্র জীবন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও মালব্যজী মধ্যে মধ্যে তার কর্ম্মপন্থার বিরোধিতা করেছিলেন, এ সংবাদ অনেকেই জানেন। কিন্তু এই যে তাঁর নির্ভীক বিরুদ্ধাচরণ, তাঁর কর্ম্মধারার সন্ধান যিনি রাখেন তিনি জানেন, তার পেছনে ছিলো এই দৃপ্ত-হৃদয় পুরুষের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। আপন বিবেক-বুদ্ধির প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস ছিলো বলেই বাইরের জগৎ থেকে বার বার আঘাত পেয়েও তিনি হতাশায় মুষ্‌ড়ে পড়েননি। প্রেরণার উৎস ছিলো তাঁর আপনারই অন্তর্লোক। তাই অন্তর্লোকের প্রেরণায় যে ব্যক্তিত্ব তিনি অর্জ্জন করেছিলেন, তা তাঁকে কোনোদিন পরাজয়ের কলঙ্কিত গ্লানি বহন করতে দেয়নি। মালব্যজী এই ব্যক্তিত্বের প্রথম পরিচয় দিলেন কলকাতায়, সেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে। কংগ্রেসের সেই শিশুকালে, অজ্ঞাত-পরিচয় মালব্যজীর উদ্দীপনাময়ী ভাষা সেদিন যে প্রতিশ্রুতি জানিয়েছিলো, ভবিষ্যকালের ভারতবাসী তারই পরিচয় পেয়েছে তাঁর উত্তরজীবনের কর্ম্মধারায়। এ কথা স্বীকৃত সত্য যে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বদ্‌লায়, এবং তারই সঙ্গে বদ্‌লায় জনগণেরও একীভূত মন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কংগ্রেস যখন ভারতবাসীর মনে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছিলো, তখন তাকে আজকের মতো প্রতি পদে এমনভাবে যুক্তিতর্কের সামনে দাঁড়াতে হয়নি। অনুসারী যারা, কংগ্রেসকে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলো তারা উর্দ্ধতন নেতাদের প্রতি সরল বিশ্বাসবশতই। ভারতবাসীর মন থেকে নেতারা আজ বিশ্বাস হারাতে বসেছেন সে কথা আমি বলিনে, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে আজকের এই দলগত নেতৃত্বের ফলে অখণ্ড ভারতবাসীর বিশ্বাস নানা ইজ্‌ম্ আর যুক্তিতর্ককে অবলম্বন করে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই দলগত মত ও পথের আশ্রয়ে জনগণ আজ যুক্তি দিয়ে উর্দ্ধতন নেতাদের বিশ্বাস করে, সন্দেহও করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের শৈশবে এত দলও ছিলো না, তাই জনগণও যুক্তিতর্কের বালাই নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামিয়ে মরতেও চায়নি। সুতরাং কংগ্রেসী নেতাদের সামনে সেদিন বড় রকমের সংশয় ছিলো, কোটি কোটি নরনারীর সম্মিলিত স্বার্থকে ব্যাহত করে তারা কখনও ভুল পথ ধরে চল্‌ছেন কি না। এ সংশয় যখনই মালব্যজীকে বিব্রত করে তুলেছে, তখনই তিনি একবার তাঁর অন্তর্লোকের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন, বিচার করে দেখেছেন আপন বিচারবুদ্ধি দিয়ে। তারপর মুক্তিস্নান করে ফিরে এসেছেন যেন সত্যাশ্রয়ী মালব্যজী। নিজের বিচার দিয়ে যদি তিনি কখনোও বুঝতে পেরে থাকেন, কংগ্রেসের এ পথ তাঁর পথ নয়,



লাহোর কংগ্রেস ১৯০৯
মালব্য সভাপতি

চিত্রাধিকারী—
জাতীয় প্রদর্শনী

শিল্পী ঃ
সুনীল কর

এ কর্ম্মধারায় তাঁর মনের সত্যিকারের সায় নেই, তবে তিনি নিঃশব্দে সরে না দাঁড়িয়ে যুক্তি দিয়ে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজের পথে। কিন্তু বিরোধ ঘটলেও তিনি অনর্থক বাধা হয়ে দাঁড়াননি কোনোদিন। কারণ তিনি জান্‌তেন, উদ্দেশ্য যখন এক, তখন মত ও পথ নিয়ে বাকবিতণ্ডা করলে সময়ই শুধু নষ্ট হবে, বিভ্রান্তিই শুধু বাড়্‌বে, এগিয়ে যাওয়া আর চলবে না। এ তাঁর ব্যক্তিত্বের এক বিচিত্র প্রকাশ।

তিনি হিন্দু ছিলেন, মনে প্রাণে খাঁটি হিন্দু। সুদীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় তিনি প্রতি কাজে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের নির্দ্দেশ মেনে চলেছেন। হিন্দুত্বের প্রতি এই আসক্তি লক্ষ্য করে যদি কেউ মালব্যজীকে সাম্প্রদায়িক বলে গ্লানিলিপ্ত করতে চান, তা হলে বলা যায়, তিনি তাঁকে ভুল বুঝেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ছিলেন এক কথায় ভারতীয়

ঐতিহ্যের প্রতীকস্বরূপ। যে পরিশীলিত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর সামনে শ্রদ্ধাস্পদ এবং মহিমোজ্জ্বল করে তুলেছিলো, তার অনুশীলনে প্রধান উপাদানই ছিলো ধর্ম্ম। জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য নয়, আত্মিক মুক্তিই হলো কামনার বস্তু, ঐতিহ্যগত এই বাণীই বহন করেছিলেন মদনমোহন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনেই বা আমরা কি দেখতে পেয়েছি? সেখানেও আমরা দেখতে পেয়েছি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে। কিন্তু মহাত্মাজীকে কে বলবে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি দ্বারা কলুষিত? ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মানুশীলন দোষাবহ নয়, যদি না সে ধর্ম্ম কুসংস্কারকে আশ্রয় করে বদ্ধজলার আবর্জ্জনার মতো চারদিকের আবহাওয়াকে দূষিত করে তোলে তার দুর্গন্ধ বিলিয়ে। মালব্যজী ধার্ম্মিক ছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক পৌত্তলিক ছিলেন। ধর্ম্মের নাম করে হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসকে কখনও তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন এ সাক্ষ্য কংগ্রেসের ইতিহাস কোনোদিনই দেবে না। বরং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে ধর্ম্মকে এমনি ভাবে প্রাণপণে আশ্রয় করে গেছেন এবং তার ফলে যে বার বার তিনি অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েও আপনার সত্তাকে বিক্রীত করেননি, সেই থেকেই আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি বিশেষ করে। তাঁর এ উদারতার স্পষ্ট প্রকাশ আমরা বার বার দেখতে পেয়েছি মহাত্মাজীর হরিজন সমস্যার মধ্যে। মহাত্মাজীর অন্যান্য মতের সঙ্গে মালব্যজীর মতের অমিল ছিলো না এমন নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অভিন্ন। বর্ণভেদের সমস্যাটি আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও কি ভয়ানক প্রকটরূপে বিরাজ করছে তার প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে নেই। অনুশীলন নেই, আছে শুধু কুসংস্কারের আবরণটাকে আঁকড়ে ধরে রাখবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, ধ্বসে-পড়া সমাজ-ব্যবস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে প্রাচীন সেই জরাজীর্ণ কাঠামোটার ওপর কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে রাখার উদগ্র প্রয়াস আজো অটুট হয়ে আছে উগ্র প্রাচীনপন্থী একদল সংরক্ষণশীলের মধ্যে। আর মদনমোহন মালব্য ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক ব্রাহ্মণ সন্তান। বংশপরম্পরায় তাঁর মধ্যে এসে পৌঁছে-ছিলো ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই বীজমন্ত্র, শৈশবের কাঁচামনে পড়েছিলো সংস্কৃত পাঠশালার ছাপ। সুতরাং তাঁর মধ্যে যদি বিশেষ করে হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামিটুকুর সন্ধানই পেতাম, তা হলেও তাঁকে হয়ত দোষ দেওয়া চলতো না। কিন্তু তা তো দূরের কথা, আমরা বরং দেখতে পাই পরম শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ-সন্তান স্মিতমুখে কোলে তুলে নিচ্ছেন চির-অস্পৃশ্য অনাদৃত হরিজন-সম্প্রদায়কে। লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় কর্ণপাত করেন নি তিনি, তিনি জানতেন শাস্ত্র তাঁকে বাধা দেন নি, ধর্ম্ম তাঁর অন্তরায় নয়। 'উদার চরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এ বাণী তাঁকে উদ্বোধিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে যদি কেউ বলেন, মালব্যজীতো হিন্দুমহাসভার একজন উৎসাহী সমর্থকই ছিলেন, তার সভাপতিও হয়েছিলেন তিনি এবং সেই সূত্রে তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে চান, আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করবো, স্বজাতিপ্রীতির অপর নাম কি সাম্প্রদায়িকতা? আপন ধর্ম্ম ও জাতির সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তার দোষগুণের সঙ্গে ছিলো তাঁর সম্যক পরিচয়, সুতরাং দেশকে এবং জাতিকে ভালবাসতে গিয়ে তিনি যদি কায়মনোবাক্যে আপন দেশের ও জাতির উন্নতি কামনা করে থাকেন, সে কি তাঁর ক্রটী?

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় মালব্যজীর জীবনের এক অমর কীর্ত্তি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম উদ্গাতাগণের অন্যতম হিসাবে যদি ভবিষ্যৎ ভারত তাঁর কথা বিস্মৃত হয়, যদি রাজনীতিজ্ঞ হিসেবেও ভারতবাসীর মনে তিনি বেঁচে না থাকেন তবু নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাহিসাবে তাঁর নাম চিরদিনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা যদি মালব্যজীর প্রথম জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখি তা হলে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সেই মহান আদর্শেরই প্রতিরূপ। যুবক মদনমোহন তাঁর কর্ম্মজীবন সুরু করেছিলেন রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়, সামান্য শিক্ষকরূপে। শিক্ষকতা যে অর্থোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা নয় তা তিনি জানতেন, কিন্তু তবু যে তিনি বিশেষ করে এই পথই বেছে নিয়েছিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি, শিক্ষাব্রত গ্রহণের পেছনে ছিলো তাঁর একনিষ্ঠ আদর্শ, জাতিগঠনের আদর্শ। এ কথা চিরকালের স্বীকার্য্য সত্য যে অধুনাকালের ছাত্রসমাজই হয় ভবিষ্যৎ জাতির প্রতিভূ। অতএব এই ছাত্রসমাজ যাতে মনোবলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে, তাতেই হবে জাতির উন্নতি। এই বিশ্বাসেই মালব্যজী গ্রহণ করলেন শিক্ষাদানের সাধনা। ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে যদি সাহায্য দান করে যেতে পারেন, তবে সেই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কিন্তু একসময় ডাক এলো দেশের কাছ থেকে, পথিক বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়ালেন আরো কয়েকজন সহধর্ম্মী। এবার সুরু হলো মালব্যজীর নতুন পথ। অনেক পথ ও পথের প্রান্ত পার হয়ে এসে তিনি হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত দেশসেবক। কিন্তু প্রথম জীবনের আদর্শ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্যুতি ঘটলেও, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই একান্ত গোপনে সে আদর্শ তাঁর নিভৃত অন্তরে বেঁচে ছিলো। তাই যৌবনের প্রান্তে এসে পুনরায় সেই শিক্ষাব্রতীরই স্বরূপ প্রকাশ পেলো। মহান আদর্শের প্রেরণালব্ধ মদনমোহনের সেদিন উৎসাহের অন্ত ছিলো না। অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র দেশ ঘুরে বেড়ালেন তিনি ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে। তাঁর সে প্রাণ-পাত পরিশ্রম ব্যর্থ হলো না। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো, সমগ্র ভারতের অন্যতম গর্ব্বের বস্তু। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানের ভাণ্ডার, ভারতের ইতিহাস

তাই সাক্ষ্য দেয়। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষ এসেছে তীর্থযাত্রীর মত ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞান ও বিদ্যা সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে। ভবিষ্যৎ তীর্থযাত্রীদের কাছেও ভারতবর্ষের শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে সাক্ষী হয়ে থাকবে বিশ্বভারতীর মতই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আর সেই সঙ্গে বারবার উচ্চারিত হবে তার প্রতিষ্ঠাতা মালব্যজীর নাম।

মৃত্যুপূর্ব্ব কয়েকটা দিন মালব্যজী অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাটিয়ে গেছেন, জীবনে যিনি মানুষের কাছে শান্তির ললিত বাণী পৌঁছিয়ে দেবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, বাংলা দেশের এই বিশৃঙ্খলা তাঁকে আকুল করে তুলেছিলো। এ বিশৃঙ্খলা চিরদিন থাকবেনা জানি, একদিন তার অবসান ঘটবেই। আমরাও সেই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অপেক্ষা করে আছি। সেদিন মালব্যজীকে আমরা আবার পাবো তাঁর আদর্শকে স্মরণ করে। তারপর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পাঠক সশ্রদ্ধ হৃদয়ে একদিন স্মরণ করবে কর্ম্মবীর মালব্যজীর নাম।

সাময়িক সাহিত্য

গল্প

অসমতল : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইন্টারন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। দাম দু'টাকা।

হলদে বাড়ি : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৬, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা। দাম দু'টাকা।

বাংলায় নতুন যাঁরা আজকাল ছোটগল্প লিখছেন তাঁদের ভেতর নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা ওপরের ছোটগল্পের বই দুটি পড়ে দেখ্‌লুম এ খ্যাতি তাঁর সর্বাংশে প্রাপ্য। আমি নরেনবাবুর লেখার সঙ্গে আগে বিশেষ পরিচিত ছিলুম না; মাঝে মাঝে মাসিকের পাতায় তাঁর দুটো একটি গল্প উল্টে' দেখেছি, এই মাত্র। সম্প্রতি তাঁর রচিত পর পর দুখানা ছোটগল্পের বই একসঙ্গে হাতে এসে পড়লো, পড়ে দেখ্‌লুম, গল্পলেখক হিসেবে এই উদীয়মান লেখকের শক্তি ও প্রতিশ্রুতি অনেক প্রবীণের প্রতিভাকেও লজ্জা দেয়। এতোদিন এই শক্তিমান লেখকের লেখা আমার প্রায় অজ্ঞাত ছিলো এইটে ভেবে বিস্ময়বোধ করছি।

'অসমতল' নরেনবাবুর প্রথম গল্পের বই; 'হলদে বাড়ি' দ্বিতীয়। একজন লেখকের লেখার ছাঁদ, ভঙ্গি, মানসিকতা, অভ্যাসগুণ ও অভ্যাসদোষগুলি বুঝ্‌তে দুটি বই বোধ করি যথেষ্ট। দু'তিন দফায়, প্রায় একনাগাড়েই বলা চলে, নরেনবাবুর গল্পগুলি পড়ে আমার এই ধারণা হল যে

লেখক প্রধানত মন নিয়ে কারবার করতে ভালোবাসেন। ঘটনার প্রতি তাঁর উৎসাহ কম, হয়ত তাঁর উদ্ভাবনীশক্তিও সে দিকে দুর্বল, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতির পটভূমিকায় কোনো একটা বিশেষ চরিত্রের সূক্ষ্ম মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছবি ফুটিয়ে তুল্‌তে তিনি সিদ্ধহস্ত। অথবা, সমগ্র গল্পের মধ্যে দিয়ে একটা বিশেষ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টাও তাঁর প্রশংসনীয়। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের পরিবেশ হয়তো বদলায়, কিন্তু তার চাইতে বেশি বদ্‌লায় মানুষের মন—মনের এই রঙফেরতার কাহিনীই তিনি বিশেষ করে ফুটিয়েছেন তাঁর গল্পগুলিতে। অমূল্য চোর—হাতসাফাই করে প্রায়ই কোন না কোন জিনিষ ঘরে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে স্ত্রীকেও ওপরের ভাড়াটেদের ঘর থেকে জিনিষ সরাবার প্ররোচনা দেয়। স্ত্রী রেণুর অতিরিক্ত ভালোমানুষী তার পছন্দ হয় না, কিন্তু যে দিন রেণু সত্যি সত্যি ওপরের ঘরের বিনোদবাবুর হাতঘড়িটি না বলে নিয়ে এলো, স্ত্রীকে ঘিরে যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য এতোদিন জমা হ'য়ে ছিল অমূল্যর কাছে মুহূর্তে তা বিস্বাদ হয়ে গেলো। অনেকদিন পর লালবানুর স্বামী কাদের যুদ্ধ থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছে—এই দিনটির প্রতীক্ষাতেই লালবানু ছিলো। আর কাউকে দিয়ে লেখানো কাদেরের ভালোবাসার চিঠিগুলি তার মনে একটা স্বপ্নের জগৎ তৈরী করে তুলেছিলো। কিন্তু গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর কাদেরের কথার ঢঙ ও ছিরিতে যখন সেই পুরনো দিনের নিতান্ত চাষাড়ে, অশিক্ষিত কাদেরকেই আবার পাওয়া গেলো, লালবানুর এতোদিনের এতো প্রতীক্ষাবুঝি সব ব্যর্থ হয়ে গেলো—কে যেন তাকে এক স্বপ্নময়, রহস্যময় পৃথিবী থেকে আবার সেই পুরাতন পাকাটির বেড়া-দেয়া জীর্ণ ঘরের মধ্যে এনে ঢোকালে। 'হলদে বাড়ি' বইয়ের 'রোগ' গল্পের বিভূতি আপ্রাণ প্রয়াসে তার স্ত্রী নীলিমাকে সেবাশুশ্রূষা করে বাঁচালে, কিন্তু রোগ আরোগ্যের পর নীলিমাকে যেন আর বিভূতির তেমন ভালো লাগ্‌লো না। মনে 'হলো রোগশয্যা আর অজস্র অষুধপত্র ডাক্তারি বইয়ের মধ্যে দিয়ে বিছানায় শায়িতা ক্লান্ত আর অসহায় নীলিমাকে কেমন ভাবে বিভূতি নিজের করে পেয়েছিলো, সুস্থ হওয়ার পর এক আঘাতে নীলিমা স্বামীর সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিলো। 'মহাশ্বেতা' গল্পে চিন্মোহন বিধবা অমিতাকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছে—কিন্তু সেই অমিতা যখন বিচিত্র সাজসজ্জা পরে কপালে বড়ো রকমের সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে রাত্রে শয়নগৃহে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, চিন্মোহনের সব কিছু বিস্বাদ মনে হলো। যাকে সে বিয়ের আগে ভালোবেসেছিলো সে কি এই সঙ্‌সাজা অমিতা, না শুভ্রবাসপরিহিতা তারই মহাশ্বেতা রূপ?

এইভাবে অনেকগুলি গল্পের ভেতরই মানুষের মনের কারিকুরি আর বিচিত্র পটপরিবর্তনকে সূক্ষ্ম রেখায় ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের সূক্ষ্ম আঁচড়গুলি ভালো লাগে আরও এইজন্যে যে তিনি যাদের চরিত্ররূপে দাঁড় করিয়েছেন তারা সবাই আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মানুষ—সাধারণ ঘরোয়া জীবনের পিঠে প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে—কেউ সূক্ষ্ম মানসিকতাবিলাসী ওপরতলার জীব নয়; কিম্বা তাদেরকে type বা বর্গচরিত্ররূপে ভুল করবারও উপায় নেই। সহর ও গ্রামের অতিপরিচিত সাধারণ নরনারীর অন্তর্জীবনের ভেতর তিনি তাঁর

শিল্পদৃষ্টি চালিয়েছেন এবং সূক্ষ্ম আভাসে, ক্ষণিকের জন্যে অন্তত তাদের মনোজগতের সাম্‌নে আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন।

তবে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে লেখকের মানসিকতায় খানিকটা 'মর্বিডিটির' ছোঁয়াচ লেগেছে, যেটা তাঁর অবিলম্বে কাটিয়ে ওঠা উচিত। মনে হয় অজ্ঞাতসারে এবিষয়ে তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন কিন্তু নিজের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ভালো করে চিন্‌তে শিখলে আর স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। দোষ হোক্ গুণ হোক্, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিকতা-প্রীতি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নিজস্ব; তাঁর ভঙ্গিতে চরিত্রগুলির মধ্যে 'অ্যাবনর্মাল' ধরণ আমদানি করতে গেলে নিজের রচনা-শক্তিকেই খাটো করা হয়। 'অ্যাবনর্মাল' গল্পের দৃষ্টান্ত হিসেবে নরেনবাবুর 'যৌথ', 'স্পর্শ', 'শম্বুক', 'যযাতি', 'রোগ', 'পুনরুক্তি,' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যায়। তবে মাণিকবাবুর থেকে নরেনবাবুর এবিষয়ে পার্থক্য এই যে মাণিকবাবুর গল্পের অস্বাভাবিকতা চরিত্রগুলির সহজাত; আর নরেনবাবুর লেখায় এই অস্বাভাবিকতাকে বিশেষ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে গল্পের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা চরিত্রগুলির অঙ্গীভূত নয়। সে যাই হোক্, ভবিষ্যৎ রচনায় লেখক এই দিকে ঝোঁক কমালে ভালো করবেন।

উৎকর্ষের দিক দিয়ে 'হল্‌দে বাড়ি' 'অসমতল' বইটি থেকে ভালো উৎরেছে। 'হল্‌দে বাড়ি'তেই অবশ্য লেখকের অস্বাভাবিকতা বেশি করে ফুটে উঠেছে, তা হলেও শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে এই বইটিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। 'হল্‌দে বাড়ির' 'যৌথ', 'শম্বুক', স্বখাত', 'মহাশ্বেতা', কুমারী শুক্লা', 'পুনরুক্তি', সিঁদুর, 'হল্‌দে বাড়ি' প্রত্যেকটিই চমৎকার গল্পের উদাহরণ। আর 'অসমতল' বইতে 'নেতা', 'লালবানু', 'মদনভস্ম', 'আবরণ', 'পুনশ্চ' উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'পুনশ্চের' তুলনা হয় না।

ভাষা-শিল্পেরও লেখক একজন ওস্তাদ শিল্পী। চমৎকার সংযত সংহত প্রাঞ্জল ভাষা তাঁর। তবে বড়ো বেশি পরিপাটি, পলিশ্‌ড্। লেখক অনায়াসেই ভাষার ডৌলটিতে আরও একটু দার্ঢ্য, আরও একটু বলিষ্ঠতার সঞ্চার কর্‌তে পারেন। ভাষাকে অতিরিক্ত মার্জিত করতে গেলে তারও রঙ পাঁশুটে, হলদে হয়ে যায়, 'হল্‌দে বাড়ি'র গল্প-লেখককে এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

নারায়ণ চৌধুরী

পরিস্থিতিঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (অগ্রণী বুক ক্লাব; দাম আড়াই টাকা)

সাহিত্য এখন সমাজের দিকে নজর দিচ্ছে কথাটার মধ্যে আর বিশেষ নূতনত্ব নেই। সমসাময়িক জীবন-ধারাকে একদম উপেক্ষা করে যে সাহিত্যিক মানসবিলাসে মত্ত থাকেন, তুরীয় অনুভূতিকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর অনুভূতি বলে চালান, আধুনিক সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। শিল্পবিচারে সমাজমুখীন সাহিত্যের হীন হবার ভয় আছে এই বলে, এবং চিরন্তন অনুভূতির অগ্রগণ্য দাবীর সাফাইয়ে যাঁরা সমসাময়িক দুঃখদুর্দশার যথাযথ সাহিত্যিকরূপ দেননি বা দিতে চেষ্টা করেন নি তাঁদের হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকদের কোন শ্রদ্ধা নেই। বাঙালীর সামাজিক জীবনে

এক'বছর যে দুর্বিপাক গেলো, কোন সাহিত্যিকের রচনায় যদি তার সুষ্ঠু ছাপ খুঁজে না পাই, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই বলবো, উক্ত সাহিত্যিকের মন সজাগ নয়। অন্য মানুষের দুঃখদুর্দশার ওপর নিজের হৃদয় প্রসারিত করবার শক্তি নেই যাঁর কি করে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার আসনে তুলে ধরতে পারি? সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে অন্য অনেক কথা উঠতে পারে। কিন্তু এই একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই একমত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিকতম গল্পগ্রন্থ 'পরিস্থিতি' সমসাময়িক সামাজিক বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং মনকে অত্যন্ত জোর ঝাঁকুনি দিয়ে যাবে। কলকাতায় বোমার ভয় থেকে শুরু করে পোষ্টাল ষ্ট্রাইক্ পর্যন্ত মানসিক বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলিকে মাণিকবাবু এই গল্পগ্রন্থের মধ্যে চিরন্তন করে রাখলেন। সামাজিক পরিবর্তনের কোন পদক্ষেপই তাঁর চোখ এড়ায় নি। ভূমিকাতে মাণিকবাবু বলেছেন, "চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে; সবকিছুই বদলে যাচ্ছে, এইটুকুই শুধু গল্পগুলির একতা।" এবং এ' একতা অদ্ভুত। এই গল্পগ্রন্থে বিপর্যস্ত বাঙালীসমাজের যে "ছাড়া ছাড়া" ছবি পেয়েছি তাকে মানসিক প্রক্রিয়ায় সংলগ্ন করে ধরলে এক'বছরের বাঙালী জীবনের একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হদিশ মেলে। নিম্নমধ্যবিত্ত ও একদম দরিদ্রদের যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত জীবন নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ যখন উচ্চাংগের উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি, তখন মাণিকবাবুর 'পরিস্থিতি' সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।

মাণিকবাবু যাই লিখুন না কেন তার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য জ্বলজ্বল করে। 'পূর্বাশা'র পাতায়ই জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন যে মাণিকবাবুর রচনাশৈলী আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত। 'রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত' কথাটার মানে বোধ হয় এ' নয় যে তাঁর রচনায় রোমান্টিকতার ছায়া পর্যন্ত কোন কালে ছিল না; 'দিবা-রাত্রির কাব্য' বা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই তাঁর রোমান্টিক মনের গাঢ় স্পর্শ অনুভব করেছেন। একথা ঠিক যে বয়সের সংগে সংগে নানা ঘাত প্রতি-ঘাতে তাঁর রোমান্টিক মনোবৃত্তি অত্যন্ত আহত হয়েছে, যার ফলে তিনি একটু sadist হয়ে পড়েছেন। এ' গেল তাঁর প্রতিভার বক্রগতির দিক। তাহলে তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য কোথায়? আসল বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রকাশভংগীতে। তাঁর প্রকাশভংগীটি এমন যে মনে হয়, লেখক তাঁর রচনার সংগে কোথাও যেন একাত্ম হতে পারছেন না। কেন জানি বিবৃত কাহিনীর থেকে তিনি নিজেকে একটু আলাদা, একটু নিস্পৃহ করে রাখতে চান। মনে হয়, নিরপেক্ষ উন্নাসিক বিধাতার দৃষ্টিতে যেন তিনি ঘটনাধারা নিরীক্ষণ করছেন। তার সহানুভূতি বা দরদকে তিনি কোথাও আঠাল করতে দেবেন না। তার ফলে, রবীন্দ্রপ্রভাবিত পাঠকদের কাছে মাণিকবাবুর রচনা কেমন একটু খাপছাড়া মনে হতে পারে। একে ঠিক দরদ বা সহানুভূতি বলা চলে না,—এ তাঁর একান্ত নিজস্ব সাহিত্যিক মেজাজ।

এই ধরণের সাহিত্যিক মেজাজ যাঁদের তাঁরা জাতে ঔপন্যাসিক। কারণ বিস্তৃত পটভূমিকায় এলিয়ে পড়বার ভয় এঁদের নেই। অনুভূতিকে এঁরা সহজেই যতটা বিকীর্ণ করতে পারেন, ছোট আয়তনে ঠিক ততটা কেন্দ্রমুখী করতে পারেন না। মাণিকবাবুর আধুনিক গল্প তাই ঠিক যেন গোলগাল সম্পূর্ণ গল্প নয়—ধরণধারণ অনেকটা উপন্যাসের ভগ্নাংশের মত; মস্তবড় সাতমহলা দালানের একটি

মাত্র ঘরকে যেন আমাদের দেখান হচ্ছে, আর নয়! তাঁর গল্প তাই শেষ হয়েও যেন শেষ হ'তে চায় না—পাঠকের মন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করে। কোন বিশেষ সামাজিক ঘটনার আঁচল ছুঁয়েই তিনি খালাস। আর তিনি বলবেন না, বাকিটা মনের কাজ, হৃদয়ের দৃষ্টির কাজ।

বাঙলা সাহিত্যে মাণিকবাবুর আর একটি কৃতিত্ব সম্বন্ধে এপ্রসংগে উল্লেখ করা উচিত মনে করি। আধুনিক কথা-সাহিত্যের ঝোঁক মনোবিশ্লেষণের ওপর, এ' আর কারো অবিদিত নয়। সকলেই মানবচরিত্রের অনুভূতির ওপর জোর দেন, মধ্যে মধ্যে নিপুণ মনোবিশ্লেষণও করেন। কিন্তু 'stream of consciousness' অর্থাৎ 'অনুভূতির স্রোত' বলতে আমরা যা 'বুঝি—তা' মাণিকবাবুর রচনাতে বিশেষ করে পাওয়া যায়। মনের ওপর জোর দিতে গিয়ে ব্যবহারিক জগতের কথা হয়তো তিনি ভুলে যান না—কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের আবহাওয়াই অনুভূতি দিয়ে বোনা। কাহিনীব্যাপী অনুভূতির ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট মর্ম্মরই তাঁর গল্পের মুখ্য আকর্ষণ। 'রাসের মেলা' গল্পটিতে এই অনুভূতি-স্রোত অনেকটা কবিতার মত মনে লাগে।

মধ্যে 'সমুদ্রের স্বাদ' ও 'ভেজাল'এ মাণিকবাবুর মনোবিকৃতির যে পরিচয় ছিল এখন তা' অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অশালীন রুচির উদ্দামতা তখন অসহ্য মনে হ'তো। এখন তা যেন অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। অন্তত 'পরিস্থিতি'পড়ে তাই মনে হয়।

রবি চক্রবর্ত্তী

প্রবন্ধ

পরমায়ু—পশুপতি ভট্টাচার্য ডি. টি. এম : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : সাড়ে তিন টাকা

বিজ্ঞানের বই আমাদের দেশে খুব কমই প্রকাশিত হয়। তার কারণ শোনা যায়, প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকসমাজ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি উদাসীন, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক দিক বিবেচনা করে অধিকাংশ প্রকাশক প্রবন্ধের বই ছাপাবার ঝুঁকি নিতে আশঙ্কিত হন, এবং তৃতীয়তঃ সাধারণের বোধগম্য সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের কৌতূহলোদ্দীপক অথচ জটিল বিষয়গুলির সরস আলোচনা করতে হলে যতখানি দক্ষতা ও কৃতিত্বের প্রয়োজন অনেক লেখকের মধ্যেই তার অল্প-বিস্তর অভাব ঘটতে দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, সাধারণ পাঠকসমাজকে এতটা লঘু মনে করবার কোনই সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। যদিও অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে গল্প এবং উপন্যাসের চাহিদাই বেশী, তবু সত্যিকারের ভাল প্রবন্ধের প্রতিও তাঁদের আগ্রহ কম নয়। আমাদের মতে শক্তিশালী লেখক এবং সাহসী প্রকাশকের অভাবটাই মুখ্য। সুখের বিষয় আজকাল এতদুভয়ের অভাব ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে। কয়েকজন লেখক এবং প্রকাশক নীরবে জনকল্যাণ এবং লোকশিক্ষার প্রচার করছেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভূমিক-সম্বলিত পশুপতিবাবুর এই বইখানি সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রকৃতই প্রয়োজনীয়। অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচিত করিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পশুপতিবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। নানা সাময়িক পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের রহস্যপূর্ণ তথ্যগুলি পরিবেষণ করে থাকেন। আলোচ্য পুস্তকটিতে কিভাবে সুস্থ দেহমন নিয়ে দীর্ঘ আয়ুষ্কালের অধিকারী হওয়া যায় তারই পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্ত্রের বিস্ময়কর গঠন ও কার্য্যপ্রণালী, খাদ্য-প্রকরণ, মনের রোগ প্রভৃতি অধ্যায়গুলি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। তবে পরিভাষায় সামান্য দু'একটি ত্রুটি আছে।

Glands-কে কোনক্রমেই 'গণ্ড' বা 'গণ্ডমালা' বলা বলে না। ইংরেজি 'Table'-এর পরিভাষা যেমন 'টেবিল', তেমি 'Glands'-এর পরিভাষাও হল 'গ্লাণ্ড'। কিন্তু তাই বলে বাংলায় 'ভাইট্যাল কেপ্যাসিটি' লেখা চলে না। ভাইটাল কেপাসিটি হল 'জীবনী-শক্তি', তবে পুস্তকে উল্লিখিত বিশেষ ক্ষেত্রটিতে 'বিশিষ্ট পরিমাপ' কথা দুটি ব্যবহার করা চলে।

অমরা "পরমায়ুর" প্রসার কামনা করি। অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

সাত সতেরো : সম্পাদক—সুধাংশু চৌধুরী (প্রকাশক--আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বরিশাল ; দাম আট আনা)

আধুনিক বাংলা কবিতার একখানা নির্ভরযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হলনা। যে কটি সংকলন বাজারে চল্‌ছে, কোনো না কোনো ত্রুটি মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে তাতে।

'সাত-সতেরো'ও আধুনিক বাংলা কবিতার একখানা সংকলন, এবং সাত-সতেরোও তার ব্যতিক্রম নয়। অথবা ব্যতিক্রম যদি বল্‌তেই হয় তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের ব্যতিক্রম। আসলে সংকলন বল্‌তে যা বোঝায়, এটি তা নয়। অখ্যাত কয়েকজন কবির রচনার সঙ্গে চার পাঁচ জন খ্যাতনামার কবিতা জুড়ে দিয়ে বইখানা প্রকাশ করা হয়েছে। কবিতাগুলির সব কটিই ইতিপূর্বে প্রকাশিত কিনা বুঝতে পারা গেলনা, তবে যে কয়েকজন নামী লেখকের রচনা এতে দেখলাম তার অধিকাংশই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক যখন শেষপর্যন্ত নামী কবিদের প্রকাশিত লেখাই সংকলনে সন্নিবেশিত করলেন, তখন এমন কবিতা কেন বাছাই করা হলো যা তাঁদের প্রতিভার ঠিকমতো প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা?

তবু এরি মধ্যে আহ্‌সান হাবীবের 'কান্না' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। বিষয়বস্তু মৃদু হলেও শুধুমাত্র আন্তরিকতার জোরে কবিতাটি প্রগাঢ় মাধুর্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর ভালো লাগলো আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'হোসনবানু-কে'। তবে তাঁর 'একটি লাল কবিতা' বড়ো বেশী ফেনায়িত ছেলেমানুষীতে ভরা। শামসুদ্দীন সাহেব জোর করে 'লাল' না হবার চেষ্টা করলে বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন। একমাত্র তিনি ছাড়া নতুন কবিদের আর কারুর মধ্যেই তেমন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া গেলনা।

ভূমিকায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী যে সপ্রতিভ বাক্‌চাতুর্যে নিজেদের ত্রুটিগুলি সামলে নেবার চেষ্টা করেছেন তাতে স্তম্ভিত হতে হয়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অন্তরঙ্গ—বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : কবিতা ভবন। দাম—।৹

কবিতা-ভবন থেকে প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের অধুনাতন গ্রন্থ 'অন্তরঙ্গ'। অপরিচিত কবির এই সঙ্কুচিত আত্মপ্রকাশ দেখে অবজ্ঞা করবার মত কিছু নেই। কুখ্যাতি অপেক্ষা অখ্যাতি ভালো। ভরসা এই, অখ্যাত বিভূতিবাবু প্রথম পদক্ষেপে নিন্দাবাদ অর্জ্জন করবার মত কাঁচা কলম নিয়ে কাব্যক্ষেত্রে নামেননি। সত্যি বলতে, অন্তরঙ্গ-এর প্রায় সব কয়টি কবিতাই আমার ভালো লেগেছে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য 'ভ্রমণ', 'একটি কথা' এবং 'মাঠের স্বপ্ন'। বিভূতিবাবু উগ্র প্রগতিপন্থী নন, বরং বলা চলে, এই অতিসতর্ক আধুনিকতার যুগেও একান্ত প্রত্যক্ষভাবেই তিনি রোমান্টিক। যুগ-বিচারে যাঁরা কবিতার মাপকাটি নির্ণয় করে থাকেন, তাঁদের কাছে 'অন্তরঙ্গ' কতটুকু রসবিতরণ করতে পারবে বলতে পারিনা, কিন্তু নিঃসংশয়ে একথা বলা চলে যে, বিশ্লেষণ ও

চুলচেরা বিচার-বিতর্কের গণ্ডীর বাইরে থেকে যাঁরা কবিতার কাছ থেকে শুধু তার মাধুর্য্যটুকু আহরণ করতে চান তাঁরা নিঃসন্দেহে বিভূতিবাবুকে অভিনন্দন জানাবেন।

বিভূতিপ্রসাদ নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে। এই হচ্ছে অন্তরঙ্গের মূল কথা। ভাব ও বিষয়বস্তুর প্রতি যদি কবিমনের সত্যিকারের আকর্ষণ থাকে অর্থাৎ কবির ভেতর যদি ফাঁকি না থাকে তবে তাঁর রচনাশৈলীতে এমন একটা সুর ধরা পড়তে বাধ্য যা শুধু সেই ভাবও বিষয়বস্তুরই আপেক্ষিক। এদিক থেকেও বিভূতিবাবু তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। নিরাবরণ প্রকৃতির মতোই একটা নিরাভরণ সাবলীলতা এবং সারল্য ছড়িয়ে আছে কবিতাগুলোর ছন্দে সুরে।

মুগ্ধচিত্তের প্রথম প্রকাশ কবিমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এখনও, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই বিস্ময়বোধ যখন কাটবে, জীবন-জিজ্ঞাসা যখন কবিকে ধীরে ধীরে আকুল করে তুলবে তখনই সেই অন্তর বাহিরের দ্বন্দ্বে আসবে সত্যিকার কবিতার মুক্তিপথের সন্ধান। সে শুভদিনে বিভূতিবাবু নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হবেন না, অন্তরঙ্গ পড়ে অন্ততঃ সে বিশ্বাস আমরা তাঁর ওপর রাখতে পারি। অনিল চক্রবর্ত্তী

জীবনী

নেতাজী--গোপাল ভৌমিক। প্রকাশক : শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা। দাম--২৲

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে যে কয়জন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি জীবন উৎসর্জ্জন করতে কোনো-দিন দ্বিধাবোধ করেন নি, সুভাষচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। প্রকৃত মুক্তিকামীর প্রাণপ্রেরণা প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত ছিলো তাঁর মধ্যে, তার পরিচয় আজ আর কারো কাছে অজ্ঞাত নয়। একদিন সম্ভাব্য-জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় অবহেলা করে যিনি হাসিমুখে দুঃখকষ্টকে বরণ করে নিয়েছিলেন, যে মহান পুরুষ অসুস্থ দেহ নিয়েও একটি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ত্তব্য কর্ম্ম থেকে সরে দাঁড়ান নি, যৌবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও যিনি অমিত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক অবাক বিস্ময়ে যাঁর নাম শ্রবণ করেছে, সেই সুভাষচন্দ্রের জীবনেতিহাস জানবার ইচ্ছা আজ সকলেরই।

গোপাল ভৌমিক-রচিত 'নেতাজী' পাঠকসাধারণের এ কৌতূহল অনেকাংশে প্রশমিত করবে। আজাদ-হিন্দ ফৌজকে অবলম্বন করে সুভাষচন্দ্রের জীবনী নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কাব্য নাটক এবং জীবন-চরিত রচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তারা তাঁর পরিপূর্ণ-জীবনের ইতিহাস নয়, তাই গোপালবাবু তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। গোপালবাবু অন্ততঃ এই কথা বলতে চান। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, এ কি সত্যিই পূর্ণাঙ্গ জীবনী? একদিন যে রহস্যের সৃষ্টি করে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন আজও আবার তিনি সেই রহস্যেই আবৃত হয়ে আছেন। তাই আমাদের মনে হয়, তাঁর সম্পূর্ণ জীবন-চরিত রচনার দিন বোধ হয় এখনও আসেনি।

তবু এ জীবনের যতটুকু পরিচয় জানতে পারা গেছে, ততটুকু গোপালবাবু আন্তরিকতার সঙ্গেই সংস্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি দীর্ঘদিনের সংবাদিক, সুতরাং পরম্পরাগত ঘটনার ঐতিহাসিকতায় কোনো বিকৃতি থাকবেনা এ আশ্বাস পাঠকসমাজ নিঃসন্দেহে পেতে পারেন। আর একটা কথা। সুভাষচন্দ্রের জীবন সুধু একটা ইতিহাস মাত্র নয়, উপন্যাসও। তাই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনোপন্যাস তৈরী করতে হলে সত্যিকারের সাহিত্যিকের প্রয়োজন; যাঁর সততা আছে, কল্পনায় মিশ্রিত করে যিনি ইতিহাসকে দেখেন না। গোপালবাবু সুপরিচিত সাহিত্যিক এবং এখানে তিনি সে সততারও পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা সুন্দর, সব বয়সের পাঠকেরই উপভোগ্য।

অনিল চক্রবর্ত্তী

পূর্ব্বাশা। — **একা** — শিল্পী

পৌষ, ১৩৫৩ — সুনীল কর

পূর্ব্বাশা

নবম বর্ষ • নবম সংখ্যা
পৌষ • ১৩৫৩

গান্ধীজির সঙ্গে একঘণ্টা

ডক্টর পি, এস্, লোকনাথন

২৮শে জুনের 'ইষ্টার্ণ একোনোমিষ্ট'-এ 'খাদি একোনোমি' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তা গান্ধীজির দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে, তাই আলোচনার জন্যে আমাকে তিনি ভাঙি-কলোনিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজির সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, আমার পক্ষে তা এক স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ এই আমার প্রথম নয়, কয়েক বছর আগে 'নিখিল ভারত অর্থ নৈতিক সম্মেলন' উপলক্ষে সম্মিলিত অর্থনীতিজ্ঞদের দলের সঙ্গে আমিও ওয়ার্ধাতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সাময়িক প্রবন্ধের উপর দু-চারটি প্রশ্ন করে তখন তাঁর মতামত শুনে নিয়েছি। কিন্তু সে দেখাশোনাটাকে কোনরকমেই ব্যক্তিগত বলা চলেনা। এই উপলক্ষে মহাত্মাকে কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল আর এক ঘণ্টার উপর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বিষয় আলোচনার ভেতর থেকে তাঁর মনের চেহারাও খানিকটা দেখ্‌তে পেলাম। এ কথা স্বীকার করলে অত্যুক্তি হবেনা যে সংক্ষেপে যাকে 'গান্ধীয় অর্থনীতি' বলা হয় এ-আলোচনার ফলে আমি সে সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান এবং তার অন্তঃসার সম্বন্ধে গভীরতর বোধ নিয়ে ফিরে এসেছি।

'ইষ্টার্ণ একোনোমিষ্ট'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বলে নিলে সম্ভবত আমাদের আলোচনার সূত্রটি পাঠকরা সহজে ধরে নিতে পারবেন। প্রবন্ধটির বক্তব্য

এমন ছিলনা যে খাদি দিয়ে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর বস্ত্র সমস্যা দূর করা যায় না—এমন কোনো নীতির অনুসরণ বা বর্জ্জনের উপরও সে-প্রবন্ধ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেনি। এর উদ্দেশ্য ততটা বিস্তৃতই নয়। সমগ্র ভারতবাসীর জন্যে খাদি উৎপন্ন করতে হ'লে যে শ্রমিকশক্তি দরকার প্রবন্ধটির ইঙ্গিত সেদিকেই ছিল। কতকগুলো গণনা ও কতকটা ধারণার উপর বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে যদি খাদির উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে ৭ কোটি শ্রমিককে শুধু খাদি-উৎপাদনের কাজই করতে হবে এবং কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্যে অবশিষ্ট থাকবে মাত্র ১১ কোটি শ্রমিক। কেবল কৃষির কাজেই ১১ কোটি শ্রমিকের দরকার, কাজেই বাড়িঘর তৈরী, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও নানাবিধ চাকরির জন্যে আর শ্রমজীবীই থাকে না। পছন্দ যদি কর খাদি তুমি পেতে পার, তবে আরো যে হাজারো সুখসুবিধা আমরা চাই তার জন্যে কিন্তু শ্রমিক বা সময় পাওয়া যাবে না!

সূতোকাটা, তাঁতবোনা আর মাঝের নানারকম কাজে যে পরিমাণ সময় খরচ হয় তা নিয়ে বিসম্বাদ নেই। 'অল্-ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনে'র গণনা থেকেই সূতোকাটার সময়ের পরিমাণ নিরূপণ করে 'ইষ্টার্ণ একোনোমিষ্টে'র সংখ্যাগুলো তৈরী হয়েছিল। আমাদের যুক্তির লক্ষ্য ও ফলের (তা উদ্দেশ্যমূলক হোক বা না হোক) বিরুদ্ধেই গান্ধীজি প্রধান আপত্তি উত্থাপন করলেন। তিনি বল্‌লেন যে কাজের সবটুকু সময়ই যে সূতোকাটায় ব্যয়িত হবে এবং তার জন্যে যে একদল শ্রমিক আলাদা করে রাখতে হবে এমন কথা কেউ বলেনা। এর মজা এখানে যে পনেরো বছরের কম যাদের বয়েস (গণনায় শ্রমজীবীর দল থেকে যারা বাদ পড়েছে) এবং যারা ৫০—৫৫ বয়েসের বুড়োমানুষ, তারাও এ-কাজ করতে পারে। সূতোকাটার পরেকার কতগুলো কাজ আর তাঁতবোনা হয়ত কর্ম্মে নিযুক্ত সময়ের সবটুকুই দাবী করে—কিন্তু সূতোকাটা-টা অবসর সময়ের কাজ। চাষীরা বছরে তিন-চার মাস বেকার হয়ে থাকে তাছাড়া বছরের অন্য সময়েও অবসর তাদের থাকেই—সেদিক থেকে দেখতে গেলে একটি উপকারী কাজে তাদের নিয়োগ করা কেবল সুসাধ্যই নয়—নিতান্ত প্রয়োজনীয়; হাতে সূতোকাটা সে-কাজের একটি সুযোগ মাত্র। তাছাড়া ন্যায়সঙ্গতভাবে এ তর্ক তোলা যায় যে যন্ত্র-প্রযুক্ত কঠোর ব্যবস্থায় যখন শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তখন দিনে ৮ ঘন্টা খাটুনিই যথেষ্ট; কিন্তু মানুষ যখন রান্নাবান্নার কাজের মতো করেই সূতো কাটবে—উপরিওয়ালার আদেশের তাড়ায় নয়—তখন ওই শ্রম-সময়ের কোনো সার্থকতাই নেই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কোনো বিশেষ ব্যবস্থাধীন কাজের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত করা যায় পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থাধীন কাজের বেলায় তা খাটেনা। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী একঘণ্টা

সূতো কাটে তাতে সমগ্র দেশের প্রয়োজন মিটে যায়। যদি তারা সূতো না কাটে, গান্ধীজি বলেন, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। তিনি তাঁর সামনে একটি আদর্শ দাঁড় করিয়েছেন, স্বভাবতই কাজ আদর্শের পেছনে পড়ে থাকে। কাজ যদি ক্রুটিহীন হ'তে পারত তাহলে ত তার আদর্শ আর আদর্শই থাকৃতনা—মানুষ নূতন আদর্শ খুঁজে নিত। তিনি শুধু এটুকু প্রমাণ করতে চান যে হাতে-কাটা সূতোয় তৈরী খাদি একটি সম্পূর্ণ বাস্তব প্রস্তাব, যদি মানুষ তাদের করণীয় কাজ করে। মাথা পিছু ২০ গজ কাপড়ে তিনি সন্তুষ্ট নন—সবাইকে তিনি ৪০ গজ করে কাপড় দিতে ইচ্ছুক। সৌখীন পোষাক নয়—মানুষ ভালো পরিধেয় পরুক, তিনি তাই চান। লেখক গান্ধীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, সে-অবস্থায় গ্রামে অন্যান্য শিল্প-উৎপাদনের অবকাশ থাকৃবে কি না। যতোটুকু সূতোর প্রয়োজন তা হয়ত হাতে কেটেই পাওয়া যাবে কিন্তু হাতে যদি ধান ভান্‌তে হয়—কাগজ তৈরী করতে হয় আরো অন্যান্য কাজ করতে হয় তখন কতটুকু সময় আর পড়ে থাক্‌বে? তাছাড়া, তিনি কি মনে করেন গ্রামের মেয়েরা দুপুর পর্য্যন্ত ক্ষেতে খেটে এসে, রান্নার ঘরকন্নার কাজ করে সূতো কাটবার জন্যে স্বেচ্ছায় এক ঘণ্টা সময় করে নিতে পারবে? গান্ধীজি বোঝালেন যে তিনি গড়পরতা এক ঘণ্টার কথা বল্‌ছেন—বছরের অবসর সময়টাতে বেশিক্ষণ সূতো কেটে মেয়েরা ঘাট্‌তিটা মিটিয়ে নেবে। আগের প্রশ্নটির উত্তরে তিনি বল্‌লেন যে ক'টি পল্লীশিল্প যে সমস্ত সময়ব্যাপী কাজ দাবী করে সে-সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেন নি। তবু তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রয়োজনীয় পল্লীশিল্পগুলোর জন্যে শ্রমিকের অভাব হবেনা। সে যা-ই হোক, সূতোকাটা অন্য সব কাজ থেকে আলাদা। হাতের শ্রম সম্বন্ধে তাঁর মতামত সম্পর্কে আমাদের যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তা তিনি দূর করতে চাইলেন। যেমন, হাতে যতোটা কাগজ তৈরী করা সম্ভব তা তিনি তৈরী করাতে চান কিন্তু তা বলে যন্ত্রোৎপাদিত কাগজ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করবেন না—অবশ্য পরিহাসচ্ছলে তিনি বল্‌লেন যে কাগজ খরচ করে যা লেখা হয় তার চারভাগের তিনভাগই বাজে—কিন্তু তাতে তাঁর আপত্তি নেই—সম্ভবত তিনি নিজেও লেখক বলেই আপত্তি নেই। যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন গান্ধীজি খোলাখুলি স্বীকার করলেন—কিন্তু তা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তাকে জনসাধারণের সেবায়ই নিয়োজিত করতে হবে। গান্ধীজি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রের বিরোধী এবং ক্ষমতা থাকলে তিনি যন্ত্রগুলো নির্ম্মূল করবেন—এ-ধারণা সত্য নয়। প্রশ্নটা বেশি বা কম নিয়ে—সম্পূর্ণ বর্জ্জন বা গ্রহণ নিয়ে নয়। শুনে আশ্বস্ত হলাম—এবং একথাটি জিজ্ঞেস করবার সাহস হল: "গান্ধীজি, যতটুকু সম্ভব হাতের শ্রমের কথাই যখন বল্‌লেন—যতটুকু সম্ভব খাদি নিয়ে কি আপনি খুসী থাকৃতে পারেন না?" দ্রুত উত্তর এলো: "না।" খাদির কথা আলাদা। এ-শুধু একটি বস্তুর উৎপাদন নয়। তিনি বল্‌লেন যে জওহরলালের

ভাষায় খাদিকে স্বাধীনতার প্রতীক বলা যায়। শুধু কি তাই; খাদি দরিদ্র ভারতীয়দের আত্মসম্মানের সঙ্গে জড়িত। গান্ধীজি তারপর আরো এগিয়ে যেতে লাগলেন—বিবৃত করলেন ভারতীয় সূতোর ইতিহাস, বল্লেন সুতোই আমাদের কলাকৌশল, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক ছিল। সূক্ষ্ম ও মসৃণ খাদিতে আজও যে সে কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তা বল্তে গিয়ে যেন গান্ধীজির বুক গর্ব্বে ফুলে উঠেছিল। তিনি বল্লেন, একদিন কি ভারতবর্ষ মিলের কাপড় ছাড়াই বস্ত্রসমস্যার সমাধান করেনি—তাহলে আজ কেন তা করতে পারবেনা? আমি বল্লাম, তখন আমাদের লোকসংখ্যা আজকের দিনের লোকসংখ্যার আদ্ধেক বা তিনভাগের একভাগ ছিল এবং কাপড়ও কম ব্যবহৃত হত। উত্তরে গান্ধীজি বল্লেন, তা হতে পারে—কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে কাজের সময়ওত বেড়ে গেল। মিলের কাপড়ের চেয়ে খাদির দাম হয়ত বেশি কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের বাগানে তুলো উৎপন্ন করে নেয় খাদির খরচ অনেক কমে যায়।

খাদি গান্ধীজির জীবন-দর্শনের বাইরের রূপ। এখন তাই তাঁর জীবন-দর্শন বিবৃত করবার আবহাওয়া তৈরী হয়ে উঠ্ল। ঘরের খাদ্যের মতোই একটি গ্রাম্য পরিবারের কাছে খাদি অতন্ত্য ব্যক্তিগত এবং কাজের বস্তু। সহরে হোটেল বা রেষ্টুরেণ্ট যুক্তিসম্মতভাবে থাকুক বা না থাকুক কিন্তু গ্রামে তার অস্তিত্ব থাক্বে, সেখান থেকে লোক খাদ্য কিনে আন্বে এবং সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে লোকের ভীড় জম্বে এ দৃশ্য তার কাছে অসহ্য না হলেও অদ্ভুত। খাদিও একটি পারিবারিক ব্যাপার। পল্লীগুলো বস্ত্রের জন্যে সহরের মুখ চেয়ে থাকবে না। তাছাড়া খাদি জীবিকাসংস্থানেরও একটি উপায়। আমেরিকার মতো ভারতবর্ষ যদি একটি বোতাম টিপে সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করে যাতে ঈশ্বর-প্রদত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড় বা অবান্তর হয়ে ওঠে—একা করতে হলেও গান্ধীজি তাতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করবেন। একমাত্র খাদিতেই সে সঙ্কট এড়িয়ে যাওয়া যায়। হতে পারে যে মানুষ তার প্রয়োজনের আয়োজন বাড়িয়ে তুল্তেই চায়। আরো চাওয়ার বাতিক বন্ধ করবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে প্রস্তুত।

হাতের শ্রম ও আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, টেলিফোন, এবং যন্ত্রযুগের অন্যান্য সুখোপাদানের ব্যবহার মেনে নেওয়াতে যে স্পষ্ট দু'টি বিরুদ্ধ ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় আমি সেদিকে গান্ধীজির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। পল্লীশিল্পের সমর্থকরাও সস্তা বৈদ্যুতিক শক্তির উপর নির্ভর করে আছেন—কিন্তু দেশে যদি বিদ্যুৎউৎপাদক যন্ত্র, পাখা, বাতি এবং আরো শত শত সাজসরঞ্জাম যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী না হয়—অথবা সেসব যন্ত্র যদি আমরা দ্রব্যবিনিময়ে বিদেশ থেকে না আনি তাহলে সেই সঙ্গে সস্তা বৈদ্যুতিক শক্তি আর পাওয়া যাবেনা। গান্ধীজিকে এ-প্রশ্নটি করতে পেরে

আমি খুসী হলাম কারণ উত্তরে তিনি যা বল্‌লেন তা আমার কাছে একটি আনন্দকর বিস্ময়। তিনি বল্‌লেন যে গ্রামে যা কিছু করা যায় তা-ই তিনি করতে উদগ্রীব—কেবল সহরের উপর নির্ভর না করলেই হল। যেসব জিনিষ কেবল যন্ত্রের সাহয্যেই পাওয়া সম্ভব—তাদের তিনি বাদ দিয়ে রাখতে চান না। যদি তাঁকে আমি ভুল না বুঝে থাকি, আমার মনে হল তিনি এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন—যা তাঁর কাছে আমরা আশা করিনে। অবশ্য নিজের আদর্শ তিনি আঁকড়েই রয়েছেন: গ্রাম্য অর্থনীতির ভিত্তি হবে সারল্য ও আত্মনির্ভরতা—গ্রামগুলো শুধু আমাদের জন্যেই খাদি তৈরী করবে না—অপরের প্রয়োজনও মিটাতে পারবে।

আরো অনেক উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করলেন। তাঁকে পুঁজিবাদী মনে করা যেতে পারে - কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন অর্থনীতিজ্ঞরা যে সুদৃঢ় সংজ্ঞায় পুঁজিবাদকে টেনে এনে পুঁজিবাদীর চেহারা তৈরী করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল নেই। তাঁর মতে সমস্ত পুঁজিপতিকে জাতির অছিতে পরিবর্ত্তিত করতে হবে। তাদের মেধা এবং অর্থ ব্যয়িত হবে জাতির জন্যে, যতটুকু নিজের জন্যে ওটা দালালির মতোই মনে করা যেতে পারে। জমিদাররাও তা-ই করবে। আমি বল্‌লাম যে পুঁজিপতি আর জমিদারদের যদি সম্প্রদায়ের অছি হিসেবে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভবপর হয়—তাহলেও তা একটি মন্থর গতির ব্যাপার; আর দু'একজন লোকের পরিবর্ত্তনের উপর যদি কাজটা ফেলে রাখা যায় তাহলে তা ফলপ্রসূ হবেনা। গান্ধীজি একমত হলেন না। গতি মন্থর হলেও তার ফল ধ্রুব এবং দৃঢ়তর। এই মতবাদটিকে তিনি আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। তিনি সমাজতান্ত্রিক কিন্তু পাশ্চাত্য-জাত মার্ক্সীয় বা অন্য কোনো চেহারার সমাজতান্ত্রিকের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। জবরদস্তি তাঁর কাছে গর্হিত মনে হয়—উদাহরণত, মাদ্রাজের বাধ্যতামূলক খাদিউৎপাদন পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তিনি উত্তর দিলেন যে মাদ্রাজসরকারকে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁদের এই পরিকল্পনা তাঁর সমর্থন ত পাবেই না এবং পরিশেষে খাদির ধ্বংস-সাধন করবে।

অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গই তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে আলোচনা করলেন—তা উল্লেখ করে লাভ নেই। কয়েকটি সেকেণ্ডের মতো সত্তর মিনিট পার হয়ে গেল। চলে আসবার সময় তিনি বললেন ইচ্ছা করলে আবার আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

খাদি-অর্থনীতির দিক থেকে এ আলোচনার ফল কি দাঁড়াল? এ আলোচনা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তে নিয়ে পৌছে দিতে পারেনি কারণ সরবরাহ, চাহিদা, মূল্য প্রভৃতি যা নিয়ে অর্থনীতিজ্ঞদের প্রশ্ন—এর সূত্রগুলো তার অতীতে অনেকদূর চলে গেছে।

গান্ধীজির কাছে জীবনের দাম সবচেয়ে বেশি। মানুষের কল্যাণের প্রশ্ন সবার উপর—সেই প্রশ্নের নিকটেই প্রাণহীন অর্থনীতির যাচাই হবে—তার অধীনেই থাকতে হবে অর্থনীতিকে। খাদির মানদণ্ড টাকায় বা সম্পদে নির্ণিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে গান্ধীজির অর্থনৈতিক দর্শন উপলব্ধি করতে আমার পক্ষে কষ্টকর নয়—সেভাবে জীবন যাপনের ইচ্ছাও আমার হয়। কিন্তু সমগ্র সম্প্রদায়ের দিক থেকে বলতে গেলে ব্যাপারটা কিছু জটিল এবং আমার মনে হয় তাতে দুটি অসুবিধে আছে। প্রথমত—প্রত্যেকের সুতোকাটা এবং গ্রাম্য আত্মনির্ভরতার দর্শন অন্নবস্ত্রের কোনো উদ্বৃত্ত সংস্থান তৈরী করতে পারবেনা। প্রাকৃতিক বা মানুষিক দুর্যোগের সামান্য আঘাতেই এর অদৃঢ়বদ্ধ কাঠামো ভেঙে যেতে পারে—হাজার হাজার গ্রামবাসী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে মরে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত—গান্ধীজি যাদের জন্যে বলছেন এবং পরিশ্রম করছেন তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক নরনারীই স্বেচ্ছায় এই কর্ম্ম ও জীবনের পথ গ্রহণ করবে। মুষ্টিমেয় লোকের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করে কি লাভ? উদাহরণত আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রামে গরুরগাড়িতে যাবার সময় ঘটনাটি ঘটেছিল। পথে গাড়ি-চালক হঠাৎ তার বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে এক বস্তা ধান গাড়িতে তুলে নিল। আমি কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, ধানগুলো সে কাছাকাছি চালের কলে নিয়ে যাচ্ছে। তার কারণও সে জানাতে ইতস্তত করলনা: স্ত্রী তাকে সাবধান করে দিয়েছে কল থেকে যদি সে চাল তৈরী করে না আনে—স্ত্রীকে হুকুম করে বাড়িতে ধান ভানতে তাহলে স্ত্রী আর রান্নাবান্না ত করবেই না—তাকে ছেড়েই চলে যাবে! ধান ভানা থাক, এম্নিতেই তাঁকে রাঁধতে হয়—কূয়ো থেকে জল তুলতে হয় আরো কতো কি করতে হয়! সেই গ্রাম্য মেয়েটিই খাঁটি অর্থনীতিজ্ঞ যার সঙ্গে গান্ধীজির বোঝাপড়া করতে হবে—অর্থনীতির পণ্ডিতরা এবিষয়ে কোনো রায় দিতে পারবেন না।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার রূপরস সাধনা

[বাংলার চিত্রকলার চতুর্ম্মুখ]

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

বাংলার ভাস্কর্য্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালীর মননশীল সৌন্দর্য্যচর্চ্চার উৎস আলোচিত হয়েছে। ভাস্কর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রকলা সম্পর্কে এ দেশের সৃষ্টির বিষয় আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মর্ম্মরে রচিত মূর্ত্তিতে বাংলার ভাস্কর্য্য পর্য্যবসিত হয়নি—পাহাড়পুরের মৃন্তাস্কর্য্যের কথা বলা হয়েছে। বাঙালীর মনের নমনীয়তা সংক্রামিত হয়েছিল শুধু মৃন্ময়মূর্ত্তি রচনায় নয়—প্রস্তর, ধাতু ও কাষ্ঠের উপাদানে মূর্ত্তি রচিত করে বাংলাদেশ আত্ম-প্রসাদ লাভ করে।

মৃন্ময়মূর্ত্তি রচনাপ্রসঙ্গে বর্ণসঞ্চার ও প্রয়োগের প্রশ্ন উঠে—কারণ মাটির মূর্ত্তি রঙীন না হলে তৃপ্তি দান করতে পারে না। কাজেই মৃন্তাস্করদের এদেশে চিত্রকৃত্যে দীক্ষা নিতে হয়। ভারতের অন্যত্র মৃন্মূর্ত্তি রচনার ধারা বহুকাল হতে অন্তর্ধান করেছে—কাজেই চিত্রকররূপে তুলিকা গ্রহণ করার উৎসাহও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশেই মাটির তৈরী মূর্ত্তির উৎসাহ দেখা যায় অন্যত্র তা নেই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সুষ্ঠুভাবে এখনও পাওয়া যায়নি, কারণ বাঙালীর মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে কেউ এ পর্য্যন্ত নিজের কোন বিশিষ্ট অধিকার প্রমাণ করেননি। এ বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক দিক হতে যাঁরা চর্চ্চা করেছেন তাঁরাইত বাংলার ইতিহাস গ্রন্থাদিতে বলেই দিয়েছেন যে বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁরা স্থিরতার সহিত কোন কথাই বলতে পারেন না। সে যাক্, বর্ত্তমান আলোচনায় একটা দিকদর্শনের চেষ্টা করা গেছে এবং বাংলার রসপ্রসঙ্গ ও রূপসৃষ্টিতে এর সমর্থন যে সুস্পষ্ট তা অনেকটা প্রমাণিত করা হচ্ছে। মৃন্ময়মূর্ত্তি রচনা যে বাংলার একটা বিশেষত্ব এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই এবং এজন্যই সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে বর্ণপ্রয়োগের একটা ধারা (tradition) এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা বড়ই বিপাকে পড়েছেন। শাস্ত্রে যতটুকু আছে বা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে মুখর হতে অনেকেই অগ্রসর হয়। যা তা'তে নেই এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই তাঁরা বিপদে পড়েন। এ ক্ষেত্রে একজন পণ্ডিত বলেন যে বাঙালীর

মনটি নরম এবং মাটিও নরম কাজেই মূর্ত্তিশিল্পে নরম মাটির ভক্ত হয়েছে বাঙালী। এ রকম উক্তি করা একটা পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ নরম মাটি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় পাওয়া যায় অথচ সেখানে মূর্ত্তি তৈরী হয় পাথরের—মাটির নয়। মাটির খেল্‌না তৈরী হয় না এমন জায়গা ভারতবর্ষে পাওয়া দুষ্কর। অথচ এ সব জায়গায় মূর্ত্তি শিল্পে কেউ মাটি ব্যবহার করেনি। বস্তুতঃ এর কারণ অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে যে বাঙালী জাতির ভিতরকার মঙ্গোলীয় প্রভাব তাকে ন্যায়শাস্ত্রের ভক্ত এবং সূক্ষ্ম চুলচেরা বিশিষ্টতা খুঁজতে অভ্যস্ত করেছে। এজন্য সে বিশেষভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক (individualistic)। এখানকার আইনশাস্ত্র হচ্ছে "দায়ভাগ" দ্বারা প্রভাবিত—"মিতাক্ষরা" দ্বারা নয়। "দায়ভাগে"র প্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই একেবারে স্বাধীনভাবে নিজের দানধ্যান নিয়ন্ত্রিত করে—যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের সম্পদ দান করতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বাধীনতা মিতাক্ষরা কর্তৃক পরিচালিত ভারতের অন্য দেশে নেই। এজন্যই এখানকার সকলেই স্বপ্রধান দান ধ্যান পূজোতে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র হতে উৎসাহিত হয়। ফলে পূজাদিতে প্রত্যেকেই নিজের গৃহে প্রতিমা নির্ম্মাণে উৎসাহিত হয়। প্রস্তরের সাহায্যে বহুসংখ্যক প্রতিমা নির্ম্মাণ সম্ভব নয় কাজেই মৃন্ময় মূর্ত্তি রচনার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বাঙালীর সূক্ষ্ম মননশীলতা ও ভাবোচ্ছ্বাসে ভরপুর আস্বাদরই তাকে এই শুভ পথে নিয়ে গেছে।

এর ফলে বাংলার চিত্রকলা সমৃদ্ধ হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে। অজন্তার রূপাদীপালির ছায়াপথ অতীতের নিঃশব্দ শ্মশানশয্যাকে দীপ্ত করে তুল্‌ছে মাত্র। তা অন্তর্হিত জীবনযাত্রার ঘনীভূত দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত। বাংলার চিত্রকল্পনা ও চিত্রসজ্জা এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত, হৃদ্যতায় উদ্বেলিত এবং ব্যবহারিক স্পর্শে উষ্ণ ও দীপ্ত। একান্তভাবে অতীতের অন্ধকারে এ চিত্রকলার পৃষ্ঠপট রচিত হয় নি। কাজেই বাংলার চিত্রকলার মর্য্যাদাকে এ যুগে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করা প্রয়োজন।

গুহার গভীর আশ্রয় ছাড়া প্রাচীন চিত্রকলাকে রক্ষা করার জন্য আর কোন বিশেষ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সহজেই রেশম, বস্ত্র বা কাগজ বিবর্ণ বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যদিও স্থলবিশেষে আকস্মিকভাবে কিছু কিছু মালমশলা পাওয়া গেছে। মধ্য এশিয়ায় Auriel Steire প্রচুর বালি, প্রস্তর প্রভৃতির অন্তরালে বহু চিত্র অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করেছেন। তাতে করে চিত্রকলাদির ইতিহাসের একটা নূতন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা দেশে এরকম কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। এখানকার প্রাচীনকালের বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং আক্রমণকারী বিজেতা কর্তৃক অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়েছে। এসব কথা প্রামাণ্যভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই

যে সব জায়গায় চিত্র-সংগ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সে সব ধ্বংস হওয়ায় অত্যন্ত প্রাচীন কিছু পাওয়া কঠিন হয়েছে।

তবুও যা পাওয়া গেছে ও যাচ্ছে তা বিচিত্রতায় অপরাজেয় এবং ভাস্কর্য্যেও অদ্বিতীয়। বাংলার চিত্রকলা-ক্ষেত্রেও একঘেয়ে রচনা সম্ভব হয়নি বাংলার সভ্যতা ও শীলতার বৈচিত্র্য-প্রীতির জন্য। এজন্য আলোচকেরা সহজেই এদেশের সংগ্রহে চিত্রকলার চতুর্ম্মুখ দেখে বিস্মিত হবেন। শুধু বাংলাদেশেই এরকমের বহুমুখী সুষমার সাধনা হয়েছে আর কোথাও নয়।

চিত্রকলা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকটি আধার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য। প্রথম হচ্ছে হস্তলিখিত পুঁথি। এসব পুঁথি সেকালে শুধু মাত্র লিখিত হ'ত না চিত্রিত হ'ত। এখনও নেপালে হস্তলিখিত পুঁথিকে সচিত্র করার রীতি আছে। এ ধারা মোগল আমল পর্য্যন্ত চলে এসেছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের সাহায্যে বাদসাহেরা সেকালে হস্তলিখিত গ্রন্থাদি সুচিত্রিত করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। মোগল আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুদের তান্ত্রিক পুঁথি প্রভৃতি এমনিভাবে চিত্রিত করা হয়। যে সমস্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভেতর "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গেছে—নেপালে, বিহারে ও বাংলা দেশে। কেম্‌ব্রিজে রক্ষিত একখানি পুঁথির কাল হচ্ছে মহীপালের রাজত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসর। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আর একখানি পুঁথির রচনাকাল হচ্ছে ১০৭১ খ্রীস্টাব্দ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুঁথির সময় হচ্ছে সম্রাট গোপালের পঞ্চদশ বৎসর। এ পুঁথিগুলি ছাড়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে করণ্ডব্যূহ ও বোধিচর্য্যাবতার নামক আরও দু'খানি পুঁথি আছে।

বাংলার চিত্রকলার প্রচুর প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের উক্তি হতে। তাঁর উক্তিকে প্রামাণ্য মনে করে চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলার চিত্রকলার অস্তিত্বের নির্দ্দেশ করা যায়। নানা প্রতিকূল অবস্থায় সে সব সুরক্ষিত হ'তে পারেনি। উপরকার সচিত্র পুঁথিগুলি অন্যত্র পাওয়া গেলেও বাংলা ও নেপালই হচ্ছে প্রধান জায়গা যেখানে এসবের সংগ্রহ সার্থক হয়েছিল। নেপাল চিত্ররচনার ক্ষেত্রে বাংলার নেতৃত্বই গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে ধীমান ও বিত্তপালই প্রাক্‌ভারতীয় শিল্পচক্রের গুরু। নেপালী শিল্পের কোন আদি-কর্ত্তার উল্লেখ তারানাথের গ্রন্থে নেই। কাজেই এ সমস্ত পুঁথির চিত্রকরগণ হয়ত বাংলাদেশের ছিল কিম্বা বাংলাদেশের প্রেরণায় সুশিক্ষিত ছিল। এ সব পুঁথিতে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র আছে সেগুলির রীতি অনেকটা অজন্তা ও এলোরার মত। বলা প্রয়োজন, প্রাক্‌ভারতের প্রেরণা গুপ্ত যুগে

সংক্রামিত হয় পশ্চিম ভারতে—পাটলীপুত্র হতে। কাজেই অজন্তার রীতির উপর এবং তারানাথের উল্লিখিত মারওয়ারের শিল্পী পৃথধরের রীতির উপর প্রাক্‌ভারতীয় প্রভাব যে কাজ করেছে তা অস্বীকার করা অসম্ভব। পরবর্ত্তী যুগেও রাজপুত চিত্রকলা অজন্তা বা এলোরার রীতিকে আপন মনে করে শিরোধার্য্য করেনি বা সে পথে অগ্রসর হয়নি। কাজেই "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" পুঁথির চিত্রকলার রীতি বাংলাদেশ কর্ত্তৃক সৃষ্ট বা প্রভাবিত বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।

একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এ শ্রেণীর পুঁথির দেবদেবতাগুলি প্রাক্‌ভারতীয় তান্ত্রিকধর্ম্ম কর্ত্তৃক কল্পিত হয়েছিল এবং এই শ্রেণীর তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রবর্ত্তকও ছিল বাঙালী আচার্য্যগণ, কাজেই এসব পুঁথির চিত্রসম্পদের উপর বাংলার অধিকার অসামান্য। যতটুকু বর্ণ ও রেখাগত প্রাচুর্য্য ও অত্যুক্তি দ্বারা এসব চিত্র মণ্ডিত হয়েছে ততটুকু অতিশয়োক্তি ক্রমশঃ বর্জ্জিত হয়েছিল। এসব চিত্রের রেখাজালের অতি সূক্ষ্ম ও কমনীয় কারুতার ধারা বাংলাদেশেই সৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল। বাঙালীর নৈপুণ্য এ বিষয়ে ছিল অসাধারণ। পরবর্ত্তী যুগে বাংলার শিল্পীগণ রেখার কালোয়াতীতে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাজেয় হয়। এখনও এ রীতি রূপান্তরিত অবস্থায় অন্য ক্ষেত্রে সমাদৃত হচ্ছে বাংলাদেশে।

এ সমস্ত পুঁথির চিত্রসম্পদ সৃষ্টি করে বাঙলাদেশ যথার্থই চিত্রকলা ক্ষেত্রে এক্‌ সময় অপরাজেয় হয়েছিল। বাংলার রীতিতে দীক্ষিত নেপালী শিল্পী আনিকো চীনদেশের দরবারে আহুত হয়। সম্রাট কাবলা খাঁ তাকে শিল্পবিভাগের প্রধান পদ দান করে। এমনি করে বাংলার রচনা চীনদেশকেও প্রভাবিত করে। পরবর্ত্তী যুগে চৈনিক চিত্রকরেরা—যাদের (নক্কাশ-ই-চীন) বলা হত—পারস্যদেশে আহুত হয়ে পারস্য চিত্রকলাকে প্রভাবিত করে। প্রচ্ছন্নভাবে তাতে করে এদেশের রূপরাগের একটা বিরাট বিস্তৃতি সম্ভব হয়। একথা এখনও কারও চোখে পড়েছে কিনা সন্দেহ।

"প্রজ্ঞাপারমিতার" চিত্ররীতি এদেশে একমাত্র রীতি ছিল না। একদিকে সুলক্ষণ, সুদর্শন ও মননশীল একরকমের শিল্পরীতির অপরাজেয় কলাকৌশল সকলকে বিস্ময়াপন্ন করে সমগ্র জাতির সভ্যতার চরম প্রতিমারূপে গৌরবের ব্যাপার হয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকাদির মত সুমার্জ্জিত ও সুলক্ষণ এসব রচনাকে "classial" বা অভিজাত সৃষ্টি বলা চলে। কিন্তু জীবন্ত জাতি কখনও সোণার শৃঙ্খলেও নিজকে আবদ্ধ রাখতে চায় না। এজন্য সংস্কৃত নাটকেও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার আছে। বস্তুতঃ "অপভ্রংশ" ভাষাগুলিই সর্ব্বত্র অগ্রগামী নূতন ভাবের বাহন হয়ে থাকে। এসব অপভ্রংশ ভাষাগুলিকে

ভ্রষ্ট বলা হয় কারণ "ক্লাসিক্যালভঙ্গী" বর্জ্জন করাই এদের পরমার্থ হয়ে পড়ে। ভারতের আধুনিক নানা সাহিত্য এ স্তরে পড়ে।

চিত্রকলা ক্ষেত্রেও যাকে গণকলা বলা হয়—তাই হচ্ছে অনেকটা প্রাকৃতস্থানীয় অপভ্রংশ সৃষ্টি। তা' সুসংস্কৃত পরিবেশন মোটেই নয়। গণকলায় অতিরিক্ত কালোয়াতী নেই, অতিসূক্ষ্ম রচনা বিন্যাসের অক্লান্ত চেষ্টা নেই। গ্রামের স্থূলজীবনের বলিষ্ট ভঙ্গী, অদম্য প্রখরতা এবং রূপব্যঞ্জনায় অস্খলিত দৃষ্টির প্রভাব গণচিত্রের ভিতর অস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। অতিসূক্ষ্মের যেমন একটা ছন্দ আছে—অতি স্থূলেরও তেমনি একটা ব্যাকুল গতিভঙ্গ আছে, রূপের ক্ষেত্রে যার সুষমাও যুগে যুগে অব্যাহত হয়ে পড়ে। শকুন্তলার অভূষণ রূপ শৈবালের দ্বারা মণ্ডিত হয়েও কণ্বের তপোবনে দুষ্মন্তকে আকৃষ্ট করে। তেমনি গণকলার স্থূল সৌন্দর্য্যও অনেক সময় পৌরভবনের অতিরিক্ত মণ্ডনকে হতপ্রভ করে দেয়। বাংলার গণসৌন্দর্য্যসাধনাও ভারতে অপরাজেয় হয়েছে—এ সহজ কথাও এতকাল বলা হয় নি।

ভাস্কর্য্যক্ষেত্রে গণকলার উদাহরণ পাওয়া গেছে পাহাড়পুরে, বিষ্ণুপুরে যে প্রেরণা তুলেছিল এক সৌন্দর্য্যের ঝড়। বাংলার চিত্রকলার চতুর্ম্মুখের ভিতর গণকলার দান বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ইদানীং বাংলার নানা কেন্দ্র হতে বহু প্রাচীন চিত্র আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হয়েছে। গণচিত্রের আদর্শে রচিত এ সব রচনার শুধু abstract বা অবস্তুমুখী ভঙ্গী দেখলে অবাক হতে হয়। আধুনিক ইউরোপ কলাক্ষেত্রে বাস্তববাদিতা বর্জ্জন করেছে। সামনে মডেল বা নমুনা রেখে হুবহু কিছু রচনা করাতে শ্লাঘার ব্যাপার কিছুই থাকেনা। তাতে না থাকে স্বাধীন সঙ্কল্প না স্বাধীন রূপসৃষ্টির প্রেরণা। যথার্থ কলাকৃত্য জাল করার প্রশ্রয় দেয়না। একটা কিছু রচনা এমনিভাবে করতে হয় যেন তা' সহজভাবে একটা বিশিষ্ট রসোদ্রেক করে। আধুনিক ইউরোপীয় আলোচকগণ একে "significant form" রচনা বলেন। নিগ্রো শিল্পে আছে অত্যুক্তি ও অমানবিক সৃষ্টির কৌশল—অথচ তাতেও পাওয়া যায় একটা মুখর ও প্রবল প্রেরণা। এই প্রেরণা চিত্তকে সহজে অভিভূত করে। রসতাত্ত্বিকগণের মতে নিগ্রো শিল্পের সফলতা এখানেই সুস্পষ্ট হয়। বাংলা চিত্রের প্রাচীন সংগ্রহের ভিতর কয়েকখানি চমৎকার রচনা বন্ধুবর অজিত ঘোষের সুপরিচিত সংগ্রহে আছে। এর ভিতরের একখানি চিত্র বাংলার মনের ইতিহাসের সহিত সহজেই জড়িত। এই প্রাচীন চিত্রখানি হচ্ছে দশভুজা শ্রীদুর্গার। চিত্রখানির কোথাও দেবীর মুখশ্রীতে মানবীয় সুষমা দানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। এদিক হতে এ চিত্রটি একেবারে অপ্রাকৃতমুখী। অথচ সমগ্র রচনার শৃঙ্খলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্নিবেশ এবং অসংখ্য রেখাকদম্বের ছন্দগত বিন্যাস শিল্পীর অপরাজেয় প্রতিভা প্রমাণ করে।

কোন বর্ব্বরজাতি কর্তৃক এরূপ জটিল রচনা সম্ভব নয়। দেবীর দশভুজের সমন্বয় করতে হয় রেখা ও বর্ণের তৈরী নক্সার বিচিত্র সমাহারে। চিত্রকলায় schematisation হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। শিল্পী তা' এক্ষেত্রে যেন অবলীলাক্রমে করেছে। কোথাও হাতের তুলিকা শিথিল হয়নি, বর্ণের অকুণ্ঠ প্রলেপ এলোমেলো হয়নি। রাজপুত চিত্রকলার বশৌলী চক্র (Bashouli School) এ পথে গেছে এবং গুজরাটের জৈনচিত্রকলাও এ আদর্শ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলার চিত্রকলার ভৌমরূপ এক্ষেত্রে আর কেউ দান করতে পারেনি। বাংলার বৈষ্ণব আমলে হস্তলিখিত পুঁথির পাতায় যে সব চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তা'ও এ আদর্শেই রচিত। পুরী ও বেনারসে গণচিত্রের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেন আমলে গৌড়ের সীমা ছিল বারাণসী পর্য্যন্ত। উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ নানাসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ কাজেই সেখানেও এরকম একটা জীবন্ত ধারা থাকা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। কিন্তু পুরীর রচনায় আছে অতিরিক্ত উন্মনা অত্যুক্তি। উড়িষ্যার রচনায় অবস্তুতান্ত্রিক সৌন্দর্য্য ব্যাহত না হলেও মননশীল কৃষ্টির পক্ষে সেসব স্বেচ্ছাচারের মত দেখায়। আধুনিক ইউরোপের শিল্পী Archipenko চিত্রক্ষেত্রে কোন রকম পরিচিত জনপ্রাণী বা বৃক্ষব্রততীর ছায়াও নিক্ষেপ করেনি ইচ্ছা করেই। কিন্তু তা'তে করে এরকম রচনা ঠিক নৈসর্গিক হয়নি বরং সুকৌশলে পরিচালিত অভিজাগ্রত বুদ্ধির দানরূপে পরিণত হয়েছে। এ দু'রকমের আদর্শ বর্জ্জন করে বাংলার গ্রাম্য ও গণচিত্রকলা মধ্যপথ অবলম্বন করেছে অতি সফলভাবে। একান্তভাবে অমার্জ্জিত শৃঙ্খলহীনতারও একটা রস আছে সন্দেহ নেই। ভারতীয় রসতাত্ত্বিক নারায়ণ একে "অদ্ভুত" রস বলেছেন। কিন্তু অদ্ভুত রসেরও অত্যুক্তি অভিশয়োক্তি বা বক্রোক্তিকে সফল করতে হলে তাকে সীমার ভিতর রাখতে হয়—কারণ মানুষ সীমার তালে চলে। সীমার সংযম বর্জ্জন করা সব সময় নিরাপদ নয়—অথচ উড়িষ্যার গণচিত্রকলাক্ষেত্রে এরকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। বাংলার গণচিত্র গুজরাটী রচনার মত একঘেয়ে নয়, বারাণসীর রচনার মত শুধু রঙের লীলায় আবদ্ধ নয় বা উড়িষ্যার রচনার মত রেখার কালোয়াতীতে আত্মহারা নয়। বাংলার গণচিত্রকলার অতি বিস্ময়জনক নমুনা পাওয়া যায় স্বর্গত গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহে। এ সংগ্রহের চিত্রগুলির বর্ণকলাপ অসাধারণ এবং রূপবিস্তারের ছন্দও অতি চমৎকার। এ রকমের রচনা ভারতের অন্য কোথাও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। কাজেই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপরাজেয়।

প্রজ্ঞাপারমিতার রচনা এবং গ্রাম্য ও গণকলার রচনার পরিধির ভিতর পড়েনা এমন আর এক শ্রেণীর বাংলা চিত্র বিশেষজ্ঞদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এটাই হল বাংলার চিত্রশিল্পের চতুর্মুখের তৃতীয় মুখশ্রী। কালীঘাটের পটুয়াগণ এক্ষেত্রে প্রচুর

প্রশস্তি লাভ করেছে। এ রচনায় অপ্রাকৃতত্ব বড় কথা নয়—কারণ এগুলিতে ঠিক পুরীর রচনার মত অস্বাভাবিক কিছু নেই। বরং এগুলি বহুপরিমাণে স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে অকুণ্ঠিত ভাবে। এ রচনাগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এদের রেখাঙ্কনের বলিষ্ঠতা। শুধু একটি রেখার অভ্রান্ত অস্খলিত হিল্লোলে এক্ষেত্রে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোথাও রেখার কোন পতন, কম্পন বা বিচ্যুতির সামান্য নিদর্শনও এসব রেখাচিত্রে পাওয়া যাবে না—সব যেন দৈবীপ্রভাবে পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেরণায় রচিত। বস্তুতঃ এ রকমের সৃষ্টিও জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। চীন ও জাপানের রেখাঙ্কনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য জগতে অপরাজেয়। কিন্তু এ সব জায়গাতেও একটি রেখার টানে একটি সৃষ্টি সম্ভব করতে কেউ অগ্রসর হয়নি। বহুরেখার বহুচক্রে এসব দেশের চিত্রকলা সমৃদ্ধ। জাপানে ছত্রিশ রকমের তুলিকা সঞ্চালনের প্রথা আছে—চৈনিক শিল্পে রেখা সঞ্চারের কায়দা পুরুষানুক্রমে পিতা হ'তে পুত্রে, ওস্তাদ হতে সাকরেতে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তবুও এসব দেশে এরূপ বিস্ময়জনক অঘটন ঘটন সম্ভব হয়নি। কালীঘাটের পট একটা অকুণ্ঠ বলিষ্ঠ সৃষ্টি। এ শ্রেণীর শিল্পীরা শুধু এরকমের পট রচনা করে তাদের কর্ত্তব্য শেষ করেনি। তারা প্রতিমার পেছনকার চালচিত্রও রচনা করে আসছে আর এক ছন্দে। এ শ্রেণীর রচনায় আছে শুধু রেখার নয়—নানা রঙেরও অতি চমৎকার সমাবেশ। এটা হল বাংলার চিত্রকলার চতুর্থ পর্য্যায়। কালীঘাট ও কুমারটুলীর শিল্পীদের এ শ্রেণীর রচনার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এদের ধারাবাহিকতা বা "continuity"। একটির পরে আর একটি, এমনি করে চিত্রপ্রসঙ্গে নানা ঘটনার সমবায়কে একটা রীতি ও ছন্দগত ঐক্য দান করা হয়েছে। ভারতের বিরাট চিত্র ও ভাস্কর্য্য কলাক্ষেত্রে এ রকমের ধারাবাহিকতা একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বরভূধরের তক্ষণকলা তিনমাইল ব্যাপী ফলক পরম্পরায় প্রতিফলিত। এঙ্কোর মন্দিরেও এই প্রবহমান ধারা বিস্ময় উদ্রেক করে। অজন্তার চিত্রও ধারাবাহী। অজন্তায় একটা লীলায়িতক্রমকে সৌন্দর্য্যের ভাষায় পুষ্ট করা হয়েছে। বাংলার চালচিত্রে এই ছন্দটি এখনও অক্ষতভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এ রকমের চিত্র-বিন্যাস অতি কঠিন। এর ভিতরকার পরম্পরা রক্ষা করতে হলে যশোধরের উল্লিখিত চিত্রের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন হতে হয় :—

রূপভেদঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকা ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকং।

এ সবগুলির সমাবেশ প্রতি চিত্রপ্রসঙ্গে যথাযোগ্যভাবে ফলিত করা অতি কঠিন। জগতের অন্য কোন চিত্রকলাই ভারতীয় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। নানা কালের নানা ঘটনাকে একই সূত্রে সমাহিত করার কৌশল এখনও অজ্ঞাত। মুঘল

চিত্রকলাও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। এ শ্রেণীর রচনা বিরাটত্বের পটভূমিতে এতকাল ন্যস্ত থাকলেও বাঙালী শিল্পী তাকে অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তনে উপস্থিত করেছে। তা'তে করে প্রমাণিত হচ্ছে নব্য মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করলেও দুর্লভ প্রাচীন কলাকৌশলকে দক্ষ বাঙালী শিল্পীরা কিছুতেই বর্জ্জন করতে চায়নি।

এ সমস্ত রচনায় প্রমাণিত হচ্ছে যে বাংলাদেশে চিত্রকলার সনাতন ধারা এখনও নির্ব্বাপিত হয়নি। এখনও ভারতীয় চিত্রকলার চিরন্তনতা অব্যাহত আছে। আধুনিক বাংলাদেশে মৃদ্‌ভাস্কর্য্যের প্রচলনই এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করেছে।

বাঙালীর মন

(বাংলার মাসিকপত্র আন্দোলন)

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলার বিগত একশো বৎসরের সংস্কৃতির ধারা অনুধাবন করলে দেখা যায় আধুনিক অর্থাৎ ইংরিজিশিক্ষাপুষ্ট বাঙালীর সংস্কৃতির বিকাশ ও পরিপুষ্টিসাধনে বাংলাভাষার মাসিকপত্রিকাগুলি সবিশেষ সহায়তা করেছে। বাংলা মাসিকপত্রিকাগুলিকে বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট শাখা বললেও অত্যুক্তি হয় না। মাসিকপত্রিকায় বিন্যস্ত রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে তার দোষ ও গুণ দুই-ই ধরা পড়ে। মাসিকপত্রিকার প্রবন্ধ নিতান্তই হ্রস্ব, পূর্ব্বাপরসম্পর্কবর্জিত ও টুকরো টুকরো। একটি মাসিকপত্রিকা হাতে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে মনকে প্রতি আধঘন্টা কি এম্নি সময় অন্তর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ক্রমাগত দৌড়ছুট করাতে হয়, ফলে পাঠকের চিন্তার প্রক্রিয়া ঘনঘন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার মনোযোগ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথমে কবিতা, তারপর সাহিত্যের প্রবন্ধ, তারপর গল্প, তারপর (ধরা যাক) একটি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধ—এইভাবে পরের পর মনকে মুহুর্মুহু স্বাদবদল করাতে গিয়ে ফল হয় এই যে মন অখণ্ডভাবে কোনো জিনিষ ভাবতে পারে না, প্রতি বিষয়কে কেবলই তার খণ্ডিতভাবে বিচার করতে ইচ্ছা হয়। এই পদ্ধতির পড়াশুনোয় চিন্তার অভ্যাসটি শানিত হয়ত হয়, কিন্তু গভীরত্ব কখনই লাভ করতে পারে না।

এইতো গেলো দোষের দিক। গুণের ক্ষেত্রে বাংলা মাসিকপত্রের সব চাইতে

বড়ো দান হ'লো এই যে তা ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করে, জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃততর করতে সহায়তা করে এবং সাধারণভাবে বাংলা সংস্কৃতির পরম্পরাগত বার্তাকে পাঠকসমক্ষে তুলে ধরে তার সংস্কৃতি সাহিত্যশিল্পপ্রীতিকে জীবন্ত ক'রে তোলে। বাঙালীর ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় একটি আধারে যদি সংগ্রথিত দেখতে চান তা হ'লে আপনাকে বাংলা মাসিকপত্রের শরণ নিতেই হবে। বাংলা মাসিকপত্র বাঙালী মনের দর্পণ—তার ভেতর দিয়ে বাঙালী কী ভাবছে, কী অনুভব করছে, কী করতে চায় তার মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এইভাবে যে পরিচয় আমরা লাভ করি তা হয়ত খুব গভীর নয়, কিন্তু তাতে বাঙালী মনের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি অস্পষ্ট থাকে না। বাংলা মাসিকপত্রের কার্যকরিতা সেখানেই।

সবদেশেই মাসিকপত্র প্রকাশ ও প্রচারণার রেওয়াজ আছে, সুতরাং সেইদিক দিয়ে বাংলাদেশের মাসিকপত্রগুলিকে উল্লেখযোগ্য মনে করবার কী কারণ থাকতে পারে? উত্তরে বলবো যে বাংলা মাসিকপত্রগুলি যেরূপ স্পষ্টভাবে সাহিত্যশিল্পসংস্কৃতির সেবায় নিয়োজিত, আর অপর কোন দেশের মাসিকপত্র সম্পর্কেই বোধ হয় সেকথা বলা চলে না। আমাদের দেশের মাসিকপত্র বলতেই তাকে সংস্কৃতির মুখপত্র বলে ধরে নিতে হয়; অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকা যে মাসিকই হবে তার কোন কথা নেই। আরও একটি কারণে আমাদের মাসিকপত্রিকাগুলি উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হতে এখনও অনেক বাকী, লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য মাত্র। এই অবস্থায় পুস্তকের প্রসারপ্রতিপত্তিও সীমাবদ্ধ। যে বিষয়ই ধরা যাক না কেন; বিশেষজ্ঞদের লিখিত ভালো বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা যায়। সমাজের উচ্চশিক্ষিত মহলে যে চিন্তার আলোড়ন চলছে সাধারণশিক্ষিত জনসাধারণের মনের তীরে তার ঢেউ পৌঁছে দিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। মাসিকপত্রই সেক্ষেত্রে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বাহন যার মারফৎ এই কাজটুকু কিছুপরিমাণে সম্পাদন করা যায়। বাংলা মাসিকপত্র এই কাজ বহুদিন ধরে সুচারুরূপে করে এসেছে। আজ মাসিকপত্রের জনপ্রিয়তা যদি কিছু কমে থাকে তা হলে অই একই ব্যাখ্যার মধ্যে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। জনশিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজ বাংলা দেশে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত পুস্তকের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুস্তকপ্রকাশ ও পুস্তকবিক্রয় একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হতে চলেছে। এমতাবস্থায় মাসিকপত্রের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা কিছু কমতে পারে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাংলার মাসিকপত্রগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায় তার এক একটির পিছনে এক এক ধরণের রুচি ও বিশ্বাস কাজ করেছে ও করছে। অবশ্য সমস্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

সম্পর্কেই একথা বলা চলে, কিন্তু মাসিকপত্রিকাগুলির বেলায় রুচি ও বিশ্বাসের তারতম্য যেন আরও বেশি স্পষ্ট, আরও বেশি উচ্চারিত। বাংলার মাসিকপত্র আন্দোলনকে এইজন্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগত আন্দোলন আখ্যা দেওয়া সঙ্গত; বাস্তবিকও তারা তা-ই। এক একটি মাসিকপত্রকে কেন্দ্র করে এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের অনুবর্তন চলেছে। বহুমুখী বাঙালী মনের সন্ধান যেমন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্যকলা প্রভৃতির মারফৎ পাওয়া যায়, তেমনি মাসিকপত্রের মধ্যে দিয়েও তাকে কম পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীমনের খবর নিতে হলে মাসিকপত্রের সাহায্য নেওয়া নানাকারণে প্রশস্ত। রুচি ও আদর্শের নিরূপণে মাসিকপত্রের নির্দেশ ধ্রুবতারার নির্দেশের মতোই প্রায় অভ্রান্ত। মাসিকপত্র হলো ছাপানো হরফের যাদুঘর—অক্ষরের কঙ্কালের ওপর চোখের আঙুল বুলিয়ে আমরা একটা গোটা সমাজমানসকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারি। বাঙালী মন পর্যালোচনায় তাই মাসিকপত্রের আলোচনা অপরিহার্য।

মুখ্যত আধুনিক বাঙালীর মন নিয়েই আমরা এযাবৎ আলোচনা চালিয়েছি, তাই এক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা মাসিকপত্র আন্দোলনগুলির লক্ষণ নির্ণয় করাই আমাদের এবারকার কাজ হবে। ইতিপূর্বে 'সবুজপত্র' ও 'ভারতী'র প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা বিশেষ করে চলতি যুগের কথাটাই বলতে চাই। সাহিত্যে এই চলতি যুগের সুরু 'কল্লোল' 'কালিকলম'-এর যুগ থেকে; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তারাই অগ্রদূত। ইতিপূর্বে যে কটি মাসিকপত্রের মধ্যে বাঙালী মনের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেছে তাদের ভেতর 'সবুজপত্র', 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'নারায়ণ' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাদের আমরা বর্তমান আলোচনার আওতায় আনিনি এজন্যে যে এখানে আমরা মুখ্যত সেই মনের কথাই বল্‌বো যে মন যুদ্ধোত্তর (প্রথম) যুগের তিক্ততা ও অবিশ্বাস, প্রশ্ন ও দ্বিধার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান; পুরাতনের প্রতি কুণ্ঠাহীন অশ্রদ্ধা ও নূতনের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধার সংঘর্ষে যে মন সর্বদাই সচকিত। এই মনের সন্ধান জানতে হলে 'কল্লোল' 'কালিকলম' থেকেই সুরু করা উচিত। এই সঙ্গে আরও কয়েকটি কাগজকেও আমাদের নজরে আনতে হবে। প্রকৃত পক্ষে, এই কয়টি কাগজ মিলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' প্রভৃতি নামজাদা মাসিকগুলিকে এই পর্যায়ের ভেতর ফেলা যায় না; রুচি ও মেজাজের দিক থেকে তাদের খানিকটা পুরাতনপন্থী বলাই সঙ্গত। তবে যেহেতু আজও তাদের চাহিদা আছে, বিশেষ করে শিক্ষিত জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের মধ্যে তারা আজও সমাদৃত, সেইহেতু তাদের সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বঙ্গবাণী', 'উদয়ন' প্রভৃতি মাসিকপত্রও এই গোষ্ঠীর কাগজ, কিন্তু এদের কোনোটাই আজ আর বেঁচে নেই,

তাই এদের আর টান্‌লুম না। তবে অধুনা-লুপ্ত 'বিচিত্রা'র বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ থাকা নানাকারণে প্রয়োজন—সেইটিকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'কালিকলম্' মরে গেছে অনেকদিন, কিন্তু সেই কাগজের সঙ্গে জড়িত দুটি লেখকের কালিকলম আজিও অক্ষুণ্ণ রয়েছে; তাঁরা হ'লেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ তাঁদের প্রাথমিক লেখার মধ্যে দিয়ে এমন কি দিতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁদের অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের থেকে তাঁদের রচনাকে ভিন্নতর করে দেখা সম্ভব হয়েছিলো? শৈলজানন্দ বাংলাসাহিত্যকে কয়লাকুঠির গল্প উপহার দিয়েছিলেন যা আগে কেউ দেয় নি, সেইটেই তাঁর প্রধান পরিচয় নয়। তাঁর পরিচয় হলো সেই বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যের বলে তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে নূতন চোখে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। গাঁয়ের সাধারণ নারীজীবনের কাহিনী এর আগেও কেউ কেউ লিখে থাক্‌বেন; কিন্তু শৈলজানন্দসৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে তিনি তাদের আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে, তাদের মন ও মেজাজের মানে খুঁজেছেন অন্য কিছুতে। সেখানেই তিনি পুরনো লেখকদের থেকে দূরে স'রে এসেছেন। বন্ধ্যা নারীর ব্যর্থতাবোধের অভিব্যক্তি তাঁর কলমে কতোভাবে ফুটে বেরিয়েছে—বন্ধ্যাত্বের নিস্ফলতায় কোনো মেয়ে দজ্জাল কেউ বা অতিরিক্ত কামাতুর, কেউ প্রেমময়ী, কেউ কঠোরকোমলা, গাঁয়ের মেয়েদের এইরূপ কতো বিভিন্ন চিত্র শৈলজানন্দের রচনায় আমরা পাই। গ্রামের সাধারণ আটপৌরে জীবনের বাইরে তিনি কখনও উপাদান খুঁজ্‌তে যান নি, কিন্তু কী চরিত্রচিত্রণের অনন্যতা! সেখানেই শৈলজানন্দ আর সবার থেকে আলাদা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিনবত্ব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সূচিমুখীনতায়। কি কবিতায়, কি গল্পে, কি প্রবন্ধে তিনি আলোচ্য বিষয়ের একেবারে মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করতে পারেন। অনেক সময় এমন হয় যে বিষয়ের খুঁটিনাটি তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়, কিম্বা এমনও হয় যে তিনি খুঁটিনাটি নিয়ে নিতান্তই সাধারণ লেখকের মতো নাড়াচাড়া করেন—কিন্তু খুঁটিনাটিকে ছাড়িয়ে যেখানে বিষয়ের সার, সেখানে তাঁর দৃষ্টি অভ্রান্ত। সাগরের তলদেশ ছেঁচে ডুবুরির মতো তাঁর মুক্তো তোলা, অনেক সময় ওপরকার জলে তার আলোড়ন জাগে কি না জাগে। পাঁকের গল্পই হোক আর পঙ্কজের গল্পই হোক্, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই অসাধারণতা সর্বত্রই সমান প্রকট। তাতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র, আর কেউ নন।

'কালিকলম'-এর প্রসঙ্গে বিশেষ করে এই দু'জন লেখকের নাম করার অর্থ এই যে এঁদের মিলিত প্রচেষ্টাতেই 'কালিমলম'-এর অভিযান; পরে 'কল্লোল' কাগজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এঁরা যখন সরে এলেন, 'কালিকলম' আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেলো। 'কালিকলম'-এর

হাতেকলমে আধুনিকতা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আর রইলো না ; 'কল্লোল'ই তার স্থান দখল করলো।

'কল্লোল' কাগজে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ ছাড়া নজরুল ইস্‌লাম, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, প্রবোধ সান্ন্যাল, ভূপতি চৌধুরী, 'যুবনাশ্ব' (মনীশ ঘটক) প্রভৃতি আধুনিকতাবিশ্বাসী সাহিত্যিকের দল এক নূতন নীতিবাদ ও আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে একত্রে এসে মিলিত হ'লেন। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কয়েকজন শক্তিমান তরুণতর লেখক আরও কিছুদিন পর এই সাহিত্যিক চক্রে যোগ দিলেন। 'কল্লোল' কল্লোলিত হয়ে উঠলো।

'আধুনিকতা' কথাটির কোনো সময়-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নেই। ওটি একটি আপেক্ষিক শব্দমাত্র। যা আজ আধুনিক কাল তা পুরাতনের সামিল। কল্লোলের যুগে যা আধুনিক ছিলো, আজ নূতনত্বের খোলস খসে গিয়ে তার মহিমা জীর্ণ। তবু 'কল্লোল'-এর আধুনিকতার নিশ্চয় এমন কিছু বিশেষ লক্ষণ ছিলো যাতে তা বিশেষিত হয়ে দেখা দিয়েছিলো। আধুনিক মনোভাব সাধারণত দুইভাবে আত্মপ্রকাশ করে দেখা যায়। এক, 'র‍্যাশনালাইজেশন' দ্বারা প্রচলিত ব্যবস্থার অভিনব ব্যাখ্যা ও তার সমর্থন ; দুই, পুরাতনের প্রতি একেবারে পিঠ দিয়ে থাকা। 'কল্লোল' শেষোক্ত পথই বেছে নিয়েছিলো। বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসকে আঘাত করাই তার কাজ হ'লো। রবীন্দ্রপ্রভাব সর্বপ্রযত্নে খণ্ডন দ্বারা নূতন সাহিত্যাদর্শসৃষ্টির পথে সকল প্রচেষ্টার গতিমুখ ফেরানো হ'লো। সাহিত্যিক বাঙালীর মন নূতন পরীক্ষার নেশায় মেতে উঠলো।

এই পরীক্ষার বিপদ ছিলো এবং সেই বিপদ 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সাধনাকে পেছিয়েও দিল। নূতন পথ কেটে চলার আত্যন্তিক মোহে ও উগ্রতায় অই আধুনিক সাহিত্যিকের দল বাঙালী জীবনের কতকগুলি মূলগত মূল্যবোধকে অস্বীকার ক'রে তার জায়গায় এমন কতকগুলি নূতন নীতি ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করলো, ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে যাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যারা ততোদূর গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'সেক্স-অর্জ' একটি আদি ও মৌল জৈব প্রেরণা, কিন্তু তা জীবনের একাংশ মাত্র ; মানুষের সমগ্র স্বপ্ন ও সাধনা, কর্ম ও বাসনার ভিত্তি তার ভেতর খুঁজ্‌তে গেলে তাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 'কল্লোল' সে ভুলই ক'রেছিলো। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা আটপৌরে মধ্যবিত্তজীবনের চিত্রণপ্রচেষ্টা ছেড়ে সমাজের নিচুতলার জীবদের সুখ দুঃখকে ভাষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেটাকে হয়ত যথার্থ প্রগতিমুখীনতা বলা চলে, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁরা সেই প্রগতিমুখীনতাকে নিজেরাই অনেকখানি ব্যাহত করেছিলেন। অতিমাত্রিক যৌনতার সংস্কার তাঁদের রচনাকে পূর্ণ পরিণতির দি'কে এগিয়ে

যেতে দেয় না। 'যুবনাশ্বের' দৃষ্টি সমাজের একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁচেছিল সত্যি; মধ্যবিত্ত মানসিকতার মোহ কেটে গিয়ে তাঁর দৃষ্টিতে সমাজচেতনা ফুটে উঠেছিলো তাও স্বীকার করা গেলো; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে যৌন বিকৃতির ধারণাই তাঁর রচনার মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। সমাজের নিচুতলার জীবদের যৌনজীবন অকিঞ্চিৎকর তা বল্‌বো না, কিন্তু বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রয়াসের চাপে সেই যৌন আবেগের স্ফূর্তি অবদমিত, অনেক ক্ষেত্রে বিশুষ্ক। তাই সমাজের তলানিদের যৌনতাকে প্রাধান্য দিলে তাদের আশাআকাঙ্ক্ষার অমর্যাদাই করা হয়, তাদের আত্মবিকাশকে সাহায্য করা হয় না। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'-র গল্পও এই ত্রুটিমুক্ত নয়।

অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের ভেতর কাজী নজরুল ইস্‌লাম 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন তার কারণ তিনি বিদ্রোহী কবি; যে আবহাওয়ায় বিদ্রোহের পোষকতা আছে সেখানে তাঁর স্থান পূর্বনির্দিষ্ট। তারুণ্যের প্রতি অকৃত্রিম মমতাই তাঁকে এই তরুণদলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো। তাছাড়া আরও একটি কারণ বোধ হয় এর পেছনে ছিলো। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর মনোভাবে বিদ্রোহের সুস্পষ্ট প্রণোদনা ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অনেকখানি ভাবালুতার ফেনাও ছিলো। যুক্তিবাদের চাইতে আবেগের টানটাই ছিলো তাতে বেশি। নজরুলসাহিত্যের সহিত পরিচিত প্রত্যেকেই জানেন যে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা এইরূপ। শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের ন্যায় যুক্তিনিষ্ঠ তিনি নন, স্বতঃস্ফূর্ত ও তীব্র আবেদন তাঁর কাব্যকে প্রধানত ধরে আছে। সুতরাং আদর্শের সমতার জন্যে তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবেন সেটা সহজে বোঝা যায়। নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহাত্মক কবিতা 'দারিদ্র্য' এই কল্লোল-এর পাতায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহাত্মক কবিতা ছাড়া অনেক সুললিত গীতিকবিতাও তিনি 'কল্লোল'কে উপহার দেন।

'কল্লোল'-এর সমসাময়িক কালে আরও দুটি আধুনিক মাসিক আত্মপ্রকাশ করে। তাদের একটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'প্রগতি'; অন্যটি 'ধূপছায়া'। শেষোক্তটি ছিল নিছকই ফাঁপা আধুনিকতার বাষ্পে ভরা; কাজেই 'ধূপছায়া'-রূপ ফানুসটির চুপ্‌সে যেতে বিলম্ব হয়নি। 'প্রগতি' সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা যায় না। তাতে সত্যিকার প্রগতিবাদের পোষকতা ও সমর্থন ছিলো। তবে 'প্রগতি'র ক্ষেত্র ছিলো সঙ্কীর্ণ, আবেদন ছিলো সীমাবদ্ধ। এর একটি কারণ এই যে 'প্রগতি' নিছকই সাহিত্যের পত্রিকা ছিলো, সমাজ-জীবনের সহিত সাহিত্যের যে অঙ্গাঙ্গী যোগ এই নীতি তাতে স্বীকৃত হয়নি। আর একটি কারণ বোধ করি এই যে তাতে পাশ্চাত্যমুখীনতা বড়ো বেশি স্পষ্ট, বড়ো বেশি উলঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। 'প্রগতি' গোষ্ঠীর তরুণ সাহিত্যিকেরা ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রধানত তাঁদের প্রেরণার উপাদান খুঁজতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে প্রায় অস্বীকার

করতে বসেছিলেন। ইংরিজি সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত মমতায় তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলার সাহিত্যসম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন বলা চলে। 'প্রগতি'-গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের মধ্যে একমাত্র কবি অজিত দত্ত ছাড়া আর সবারই দৃষ্টি অল্পবিস্তর রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রতি কেন্দ্রীভূত ছিলো; প্রাক্‌রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহও ছিলো না, সায়ও ছিলো না।

বুদ্ধদেব বসু, প্রভু গুহঠাকুরতা প্রভৃতি 'প্রগতি'-র পরিচালক-লেখকেরা ইংরিজি সাহিত্যেরই মানসসন্তান। পুরাতন বাংলা ও বাঙালীর ঐতিহ্যের প্রতি যোগ তাঁদের যৎসামান্য। অন্তত তখন ছিলো। ইউরোপীয় সমাজের মধ্যবিত্ত জীবনের আদর্শ ও উচ্চতর জীবনযাত্রার মান তাঁদের কল্পনাকে গভীরভাবে উচ্চকিত করেছে, তার সূত্র ধরে বিশেষ করে বুদ্ধদেববাবু বাংলায় এমন এক উগ্র ধরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমদানী করতে চাইলেন যেটা বাঙালীর সহজাত সামাজিকতা ও লোকলৌকিকতার মর্ম্মমূলে গিয়ে আঘাত করলো। জনতার প্রতি তাঁর নিদারুণ ঘৃণা; সমাজের সাধারণ দশজনের যে সমাজজীবনে একটা ভূমিকা আছে তাঁর রচনায় সেটা অস্বীকৃত; সমষ্টিকে এড়িয়ে চলতে, এবং মনে মনে তুচ্ছ জ্ঞান করতেই, তাঁর মানসিক আনন্দ। এই আত্যন্তিক অহমিকা ও উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেতনা বুদ্ধদেববাবুর রচনার নিঃশেষ ক্ষতিসাধন করেছে মনে হয়। অবশ্য পরবর্তী রচনাবলীতে তিনি এইভাব অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন, তবে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর সম্প্রতি লেখা 'লেখক হবার দুঃখ' গল্পটিই তার প্রমাণ। আমাদের স্থির বিশ্বাস, অসম্ভব প্রতিভাশালী লেখক বুদ্ধদেব বসু এই একটি মাত্র ত্রুটির জন্যে আজও সঙ্গহীন হয়ে রইলেন; গণমানসের সঙ্গে যদি আত্মিক সহানুভূতির সূত্রে তিনি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন তা হ'লে তাঁর লেখার আর মার ছিলো না।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষার ঔজ্জ্বল্য, বক্তব্যের স্পষ্টতা ও ধার, রচনার গতিবেগ সবই বাংলা সাহিত্যকে নিঃশেষে সমৃদ্ধ করেছে। ইংরিজি সাহিত্যের আদর্শ দ্বারা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন এই অভিযোগ করা সত্ত্বেও বলা যায়, তিনি ইংরিজি ভাষার ইডিয়ম, বলবার ভঙ্গি, চিন্তাপ্রণালী আমদানী করে বাংলাভাষাকে জড়তামুক্ত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছেন ও করছেন। এতে বাংলা ভাষার প্রচলিত সংস্কার ক্ষুণ্ণ হয় বলে যাঁরা হা হা করে ছুটে আসেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সজনীকান্ত দাস সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে এই ধরণের ভাষা সম্পর্কে বক্রোক্তি করেছেন), তাঁরা ভাষা-জগতের মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, একটু ছোঁয়াছুঁয়িতেই তাঁদের জাত যায়। ভাষার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বুদ্ধদেববাবুর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়।

বুদ্ধদেব বসুর রচনার সর্বাঙ্গীন আলোচনার স্থান এটা নয়। পরে ভিন্নতর উপলক্ষে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিস্তৃততর আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

'প্রগতি' ও 'ধূপছায়া'র পর "পূর্ব্বাশা"র আবির্ভাব। 'পূর্ব্বাশা' প্রথমে বিশুদ্ধ সাহিত্যের পত্রিকারূপেই সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। প্রথম দিকে এর আদর্শের ভেতর স্পষ্টতা ছিলো না; পত্রসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যসেবার দুর্নিবার ও অকৃত্রিম তাগিদ ছাড়া আর কোনো স্পষ্টগ্রাহ্য আদর্শের প্রেরণা এর প্রাথমিক চলার বেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু যতোই দিন যেতে লাগলো, 'পূর্ব্বাশা'র আদর্শ ও নীতি একটা সুস্পষ্ট আকার নিয়ে পাঠকসাধারণের চেতনার উপর নিজেকে প্রসারিত করে ধরলে। "পূর্ব্বাশা"র পরিচালকবৃন্দ দেখতে পেলেন সমাজচেতনা বাদ দিয়ে সাহিত্যসেবার প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই আত্মপ্রতারণামাত্র। বিশুদ্ধ সাহিত্যের নামে আমাদের দেশে ক্রমাগত যেটা প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে সেটা বাস্তববোধবর্জিত একপ্রকার সস্তা ভাবালুতা, যুক্তিনির্ভর নয় বলেই তা বর্জনীয়। "পূর্ব্বাশা" এই ভাবালুতার পরিবর্তে যুক্তিবাদের সাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। 'পূর্ব্বাশা'র ভেতর দিয়ে বাঙালীর মানসিকতায় সেই যুক্তিবাদ প্রবর্তনের সাধনাই এখন পর্যন্ত চলেছে। এই অভিযান কতোদূরসফল হয়েছে বা হবে সে বিচার এখনই করা হয়ত ঠিক হবে না; কিন্তু এইটে নিশ্চয় যে সমাজচেতনা ও যুক্তিনিষ্ঠার ক্ষেত্রে সজ্ঞান উদ্যমের দৃষ্টান্ত মাসিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে "পূর্ব্বাশা"ই প্রথম স্থাপন করলো।

"পূর্ব্বাশা"র অভ্যুদয়ের সমসাময়িক কালে আরও অনেক আধুনিক মাসিক কাগজ বেরিয়েছিলো। কিন্তু যেমনি লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে তারা আত্মপ্রকাশ করেছিলো তেমনি ভাবেই তারা মুছে গেলো। ব্যাঙের ছাতার মতোই তাদের আবির্ভাব ও বিলুপ্তি। যেখানে সাহিত্যপ্রীতিটুকু মেকি, উৎকট আধুনিকতাপ্রীতি মাত্র সম্বল, সেখানে মাসিকপত্রগুলির ভাগ্যে এর বেশি কিছু আশা করা যায়না।

জনপ্রিয় বড়ো আকারের মাসিকগুলি (যথা, 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' প্রভৃতি) অনেকদিন থেকে চলে আস্‌ছে এবং এখনও চল্‌ছে তার কারণ এদের প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন পাঠকপাঠিকার রুচি ও পছন্দের খোরাক একই আধারে পাশাপাশি বিধৃত রয়েছে। এদের কোনটিরই সুস্পষ্ট ঘোষিত নীতি নেই, তবে বাংলা দেশের প্রচলিত রুচি ও নীতিবোধের সহিত সমতা রেখে এরা পঠিতব্য বিষয় সমাবেশ করে থাকে বলে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এদের চাহিদা। আদর্শের সজ্ঞান অনুসরণের অভাবজনিত ত্রুটি এরা আয়োজনের প্রাচুর্য দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি কাগজেরই সংগঠন বেশ বড়ো; বিশেষ করে 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী'র প্রকাশকেরা প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী। ফলে বিভিন্ন রকমের রুচি

পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা এঁরা অনায়াসে করতে পারেন। 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী'তে কী নেই ? সাড়ে বত্রিশ ভাজার এমন দুর্লভ সমাবেশ মাসিক সাহিত্যজগতে আর কোথাও পাবেন না। পুরাতন পর্যায়ের 'বসুমতী' সম্পর্কে এ কথা তো খাটেই, নব পর্যায়ের 'বসুমতী' সম্পর্কেও খাটে। হাতবদল হওয়ার পর নব পর্যায়ের 'বসুমতী'-র ওপর আধুনিকতার একটা কড়া রঙ চড়ানো হয়েছে, কিন্তু লেখকের শ্রেণীবিন্যাস বা রচনাসন্নিবেশ বিষয়ে জাগাখিচুড়িই চল্‌ছে। বরং লেখকনির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরাতন 'বসুমতী'র কমবেশি একটি বিশেষ লেখকগোষ্ঠীর ওপর ঝোঁক ছিল; নব পর্যায়ের 'বসুমতী'তে 'উপীনদা'র উৎকট সাম্প্রদায়িকতা আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের এখানে গলাগলি সম্পর্ক। মাসিক 'ভারতবর্ষ'ও তথৈবচ, তবে তার ভড়ং কম এইটুকুই যা বাঁচোয়া।

কিন্তু 'প্রবাসী' এদের থেকে স্বতন্ত্র। লোকান্তরিত রামান চট্টোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত এই প্রসিদ্ধ মাসিকটিতে যদিও নিষ্ঠার সহিত পুরাতন পদ্ধতির সংবাদপত্রসেবার আদর্শকেই অনুসরণ করা হয়েছে, তবু রচনা নির্বচানে এই কাগজটির বিশেষ অভিনিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকনির্বাচনেও কাগজটি বড়ো খুঁতখুঁতে। আধুনিক মানদণ্ডের বিচারে 'প্রবাসী'র যা-ই ত্রুটিবিচ্যুতি থাকুক না কেন, এ কথা নিঃসন্দেহ যে বাংলা দেশের সংস্কৃতির বাহক হিসাবে 'প্রবাসী'র দানের তুলনা হয় না। একসময়ে 'প্রবাসী'কে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতিগত আন্দোলন মুখ্যত গ'ড়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলী 'প্রবাসী'কে প্রকাশ করতে দিয়ে শিক্ষিত মহলে কাগজটির আকর্ষণ বহুগুণ বাড়ান। পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় চিত্রকলারীতির শ্রেষ্ঠ চিত্রসকল 'প্রবাসী'র পাতায়ই প্রথম ছাপা হয়। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ও অন্যান্য বরণীয় শিল্পাচার্যরা 'প্রবাসী'র নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফলে 'প্রবাসী'কে ঘিরে বাঙালী পাঠকপাঠিকার রুচি ক্রমশই মার্জিত, সূক্ষ্ম ও শানিত হয়ে উঠেছিলো। শিল্পসংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালী মন 'প্রবাসী'র কাছে বহুদিন ঋণী থাক্‌বে।

এপ্রসঙ্গে অধুনালুপ্ত 'বিচিত্রা'র নাম উল্লেখযোগ্য। 'বিচিত্রা'ও চমৎকার একটি সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলো—কিন্তু ব্যবসায়িক অকৃতকার্যতার দরুণ তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি, সেইটেই যা দুঃখের। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও শুভেচ্ছার অকৃপণ দান 'বিচিত্রা'কে ঠিক 'প্রবাসী'র মতোই স্নেহচ্ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিলো, কিন্তু তবু 'বিচিত্রা' টেকে নি। ব্যবসায়গত অব্যবস্থার জন্যে শেষের দিকের 'বিচিত্রা' তার প্রাথমিক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে প'ড়েছিলো। 'বিচিত্রা' টিকে থাক্‌লে বাঙালীর সাহিত্যিক সংস্কারকে আরও অনেকখানি তীক্ষ্ণ করতে পারতো সন্দেহ নেই।

পরিশেষে আর দু'খানি মাসিক কাগজের নাম করে আজকের মতো বিদায় গ্রহণ করবো। তার একটি 'পরিচয়', অন্যটি 'শনিবারের চিঠি'। 'পরিচয়' সুধীন্দ্র দত্তের সম্পাদকতা কালে ত্রৈমাসিক ছিলো, বর্তমানে মাসিক কাগজে পরিণত হয়েছে। লক্ষণ দিয়ে বিচার করলে যদিও 'মাসিক পরিচয়' অগ্রসর চিন্তাধারার বাহক, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দলগত প্রচারের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাগজটির প্রগতিবাদী মনোভাব তাই পক্ষপাতহীন নয়; অনেক বিষয়েই কাগজটির সুর 'প্রোপ্যাগ্যাণ্ডিষ্ট'।

'শনিবারের চিঠি' আবার আরেক ধরণের দলীয় কাগজ। প্রতিক্রিয়াশীলদের সেটা আশ্রয়নীড়। সাহিত্যে প্রগতিমুখীনতার নির্বিচার নিন্দা ও পুরাতনপন্থার তুল্য প্রশংসা এই কাগজটিকে আধুনিক সাহিত্য জগতে অপাংক্তেয় করে রেখেছে। 'কল্লোল' যুগের অতিরিক্ত যৌনতাগন্ধী রচনার অসংযমকে সংযত করতে 'শনিবারের চিঠি'র রূঢ় তিরস্কার খানিকটা কাজ করেছে সন্দেহ নেই এবং সেজন্যে তাকে প্রশংসাও করতে হয়, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে কাগজটির নীতি নিঃসন্দেহে প্রগতিবিরোধী। 'শনিবারের চিঠি' তার আঠারো বৎসরের জীবনে অনেকবার অনেক রকমের আদর্শগত ডিগবাজি খেয়েছে; তার সাম্প্রতিক গান্ধীবাদপ্রীতি সেই ধরণেরই একটা ডিগবাজি কিনা কে বলবে!

মধুছন্দার কয়েকদিন

অমিয়ভূষণ মজুমদার

আফিস থেকে এল সে, খুট্ খুট্ ক'রে অবিরত শব্দায়মান হালকা বুট তাকে বহন ক'রে আনছে,—ভীতা হরিণীর পা ঠুকবার মতো শব্দ। কিন্তু হরিণীর সাথে তুলনা ঐ পর্যান্তই শেষ; তার চোখ হরিণীর মতো নয়, নয় সে উৎকর্ণা সঙ্গীতের জন্য, ব্যাধের আশঙ্কায় স্পন্দিত হয় না তার নাসাগ্র। কারণ সে স্ত্রী, মানুষের জাতীয় হ'লেও মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু সে, যেন বেশী মানুষ (ঠিক অতিমানুষ নয়); মানুষকে সে সৃষ্টি করে, লালিত করে, তারপরে তার সোহাগের আদরে বস্ত হ'য়ে ওঠে। মা, মেয়ে, স্ত্রী হ'য়ে যাদের সে বশীভূত না করতে পারবে সেই অতিদূরের পুরুষও তার প্রভাবমুক্ত নয়, অন্তত কয়েকটা মুহূর্ত্ত কারো না কারো

দৃষ্টি একাগ্র হ'য়ে আসে উদ্বাহু হ'য়ে তার দিকে। রেলগাড়ীর জানালায় তার ক্লান্ত মুখখানা দেখবার জন্য, চলতি ট্রামের নিকটতম ব্যবধানটুকু উপভোগ করবার জন্য দীনতা স্বীকার করে তার কাছে।

মধুছন্দা এই সব ভাবতে ভাবতে আজও আসছিল। মধুছন্দা তার নাম নয়, (এরকম অদ্ভুত নাম তার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের হ'তে পারে না) একবার একটা নাটকে ঐ নামের নায়িকার অনবদ্য অভিনয় সে করেছিল, তারপর থেকে ঐ নামে ডাকত তাকে কলেজের সঙ্গীরা। চাকরি নেবার সময় হঠাৎ কতকটা বেপরোয়া হ'য়ে নিজের নাম ঢাকবার জন্য বলে ফেলেছিল ঐ নাম। এখন বেশ ভালো লাগে তার অভ্যাস হ'য়ে গেছে ব'লে। এমন কি পর পর তিনটে cosonent লাগিয়ে ছ' তৈরী করে সাহেবকে সে থ' লাগিয়েছে। File গুলিতে সই দেবার সময়ে সে সি' (c) এর পরে এইচ্ (h) দুটিতে একটু ক'রে প্যাঁচ কসে দেয়। ছোট সাহেব আজও উচ্চারণ করতে পারে না; বড় সাহেব সিভিলিয়ানি তাগিদে বাংলাবিদ্ হ'য়েছিল, সে নামটার দুর্লভতা বুঝতে পারে, তার লেখায় যদিচ্ছ ব্লু পেন্সিল চালায় না। ইংরেজি বাহুল্যও রপ্ত হ'য়ে গেছে। ছোট সাহেব একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, উচ্চারণ কোথায় শেখা, কোন ইংরেজ গভার্ণেস ছিল কিনা তার শৈশবে। (হায়রে পরিহাস! ইস্কুল মাষ্টারের মেয়ে মধুছন্দা।)

—কি মনে হয় তোমার?

—ছিল হয়তো, কিন্তু ভালো শেখায় নি। বলে সাহেব।

সাহেবের মতটা ভালো কিম্বা মন্দ বুঝতে মধুছন্দার দেরী লেগেছিল। সহসা সে ভেবে উঠতে পারে নি গভার্ণেস রাখবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তাদের ছিল এই স্বীকৃতি, কিম্বা কল্পিতা গভার্ণেস ভালো শেখায়নি এই অপবাদ কোনটি তাকে মানায়, তাকে আর একটু বিশিষ্ট করে দলের মধ্যে। মধুছন্দা সাহেবকে প্রায় বিদ্ধ ক'রলে দৃষ্টি দিয়ে, তারপরে বললে —এমনি হয় এদেশে।

যারা শুনছিল ফাইলে দৃষ্টি আনত রাখবার ছলে তারা কি বুঝল কি জানে। সাহেব বললে,—হয়ই তো, এক বিদেশী কখনও আর একের ভাষা দখল করতে পারে না। সেই থেকে মধুছন্দা গভার্ণেস কর্ত্তৃক শিক্ষিতা স্বল্প কয়েকজন অভিজাতের একজন হ'ল। মধুছন্দা ঘটনাটাকে চাপা দিলনা, দিতে পারত সে; অনায়াসে বলতে পারত—সাহেবকে কেমন বোকা বানিয়ে দিলাম বল দেখি। ব'য়ে গেছে মেম সাহেবি উচ্চারণ শিখতে।

কিছুই বললে না সে। এমনকি চাঁদ এসে যখন তার উজ্জ্বল অন্বেষী দৃষ্টি তার মুখে ফেলে প্রশ্ন করলে—বলো কী মাধবীদিদি গভার্ণেস ছিল তোমার? তখনও মিথ্যার পা-শিরশির করা উঁচু চূড়া থেকে নামবার সুযোগ নিলে না সে। ফাঁকি ধরে ফেলবার কারো আগ্রহ

তাকে এতটুকু আঘাত করত না, চাঁদের লঘু প্রচুর পরিহাসের কোলে লাফিয়ে পরলে। চাঁদের পরিহাস উদ্বাহ হ'য়ে তাকে ইসারা করলেও সে শুনলে না, ভুলে গেল গত বিশবছরের মধ্যে গভার্ণেস রাখবার রেয়াজই শুধু উঠে গেছে নয়, অভিজাতে অন্য সব লক্ষণের মতো মেয়েদের শিক্ষার পদ্ধতিও আমূল বদলে গেছে। মেয়েদের থ্রিল দেয়া জ্যাকেটের মতো, হাতপাখার মতো গভার্ণেসও গত হয়েছে।

চাঁদ তথাপি বললে,—বলো কী মাধবীদিদি গান্ধিজীর যুগে, গান্ধির দেশে বিলেতি মেমের কাছে পড়তে তুমি আপত্তি করোনি।

কি সেদিন হ'য়েছিল মধুছন্দার ; চাঁদ হাত ধরে তাকে নামিয়ে আনতে চায় ধাপে ধাপে তবু সে নামবে না, যেন ঐ মিথ্যাটুকুর চূড়ায় সে অচল হ'য়ে থাকতে পারবে, অবিরত সতর্ক হ'য়ে থাকতে তার অসুবিধা হবে না।

যারা কাজ করছিল না কথা শুনছিল তাদের কাজ করতে বলে মধুছন্দা ফাইল টেনে নিল। পাঞ্জাবী লেফটেনাণ্ট দুইজন পর্য্যন্ত টেবিলে স্তব্ধ হ'য়ে বসে কলম তুলে নিল। এইটুকু মধুছন্দার তৃপ্তি ; জাঁদরেলী পুরুষগুলিকে কাজ করাতে দুটি কথাই মাত্র প্রয়োজন।

জ্বর মানুষকে অনেক সময় অকারণে অনুতপ্ত করে। মধুছন্দা জ্বরের ঘোরে একদিন চাঁদকে বলেছিল,—নিজের আমি একি করলাম চাঁদ ? নিজের পারিবারিক গণ্ডী থেকে বাইরে ছুটে এসেও থামি নি, নিজের পরিবারিক চালচলনগুলিকেও অস্বীকার করবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছি। আমার বুড়ো বাপমা আমার শিক্ষাদীক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করবার করেছিলেন না থাকুক তাতে রংদার কিছু কিন্তু তবু তাকে অস্বীকারের দৈউলেখানায় এনে ফেলেছি। কেন বলতো ? আমাকে কি সব বিষয়েই অসাধারণ হ'তে হবে, সব দিকেই চমকপ্রদ হ'তে হবে?

তখন চাঁদ কিছু বলে নি। আকাশের চাঁদের মেঘলা জোছনা মধুছন্দার রোগশয্যায় এসে পড়েছিল ; আবেশের মতো দৃশ্য হ'চ্ছিল মধুছন্দার মুখের একটা পাশ, একটা হাত, বুকের পরে টেনে দেয় ক্লান্ত খয়েরি শাড়ীটা। চাঁদ হুঁ মাত্র উচ্চারণ করেছিল ধোঁয়া ছাড়বার অবকাশে। নির্জন বাদলা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেও চাঁদ নাগালের বাইরে বাঁকা ক'রে হাসতে পারে তৃতীয়ার চাঁদের মতো।

তারপরের একদিন চাঁদকে লাঞ্চের সময় চীনে রেস্তোরায় সুস্বাদু অখাদ্যের লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে মধুছন্দা ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিয়েছিল :

"মাঝে মাঝে মনে হয়, চাঁদ, সাধারণ হ'তে পারলে, তোমাদের মতো হ'তে পারলে বেঁচে যেতাম। অসাধারণ হবার ঝামেলা অনেক, অনেক দিকে চোখ রেখে চলতে হয়। রীতিনীতি আদব কায়দায় বাঁধা আভিজাত্য দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। গালের রং খসে গেল কখন, কোথায় লাগল বেনারসীতে আলগা ভাঁজের দাগ, কাকে হ'ল না প্রত্যভিবাদন করা,

প্রতিদান দেয়া হ'ল না কার সৌজন্যের। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, বিশ্রাম বিরাম মন চায়। সাধারণ করে দিতে পারনা আমায়। সেদিন জ্বরের ঘোরে—(মধুর করে হাসলে, নিজের দুর্ব্বলতাকে নিজেই করুণা ক'রে প্রশ্রয় দিলে) এই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।"

চাঁদ রা করেনা। মুরগীর সরু হাড় ছাতু ছাতু ক'রে চুষতে থাকে।

পদশব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিলে আর্দ্দালি। মিছে কথা নয়, আর্দ্দালিও পেয়েছে মধুছন্দা। বাড়ী, গাড়ী, ঝি, বোয়, আর্দ্দালি এ সবই আছে তার। কিছু আফিস থেকে পেয়েছে, কিছু বড়সাহেব দিয়েছে, কিছু সে নিজে যোগার করেছে। ভ্যান্সিটার্ট রোতে তার বাসা। রাস্তার নামের জন্যই বাসা নেয়া এই আফিসসঙ্কুল পল্লীতে। ফ্ল্যাট মাত্র নয়, পুরো একটা বাসা, নেমপ্লেট ঝিকিয়ে ওঠা গেটের লতাবিতান সমেত। আর্দ্দালি পোষাক পরে দরজা খোলে, কারণে অকারণে প্রতিবেশীদের, দূর প্রতিবেশীদের রক্ষণশীল কর্ত্তাদের মেমসাহেবের সেলাম দিয়ে আসে। বোয় রেস্তোরা থেকে খাবার নিয়ে আসে দুবেলা, দুবেলা আহার হয় আফিসে। ঝি প্রায় অকাজে কুড়ে হ'য়ে গেল। রান্নার পাট নেই, যা দুইখানা বাসন সেগুলি মুছে রাখে বোয়; পোষাক ধোবাবাড়ী থেকে ওঠে ওয়াড্রোবে, আর্দ্দালিই রাখে গুছিয়ে, কি ক'রে বুঝবে বুশ্‌সার্টের কোন বোতাম কখন সে পড়ে। ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রয়োজন হয় ঝির,—যেদিন পেঁয়াজের স্বাদে বিষাক্ত বোধ হয় মধুছন্দার, হঠাৎ সেদিন স্নান সেরে পিঠময় কালো চুল এলিয়ে দিয়ে লাল শাড়ীর ভাঁজে ঢিলে ঢালা হয়ে নোতুন এলামেলের হাঁড়িতে মুগের ডাল সিদ্ধ করতে বসে মধুছন্দা। কয়লা, ঘুঁটে, এনামেলের হাঁড়ি, ডাল, লঙ্কা তেলের জন্য হাজার বার ছুটতে হয় ঝিকে।

আর্দ্দালি স্যালুট ক'রে সরে দাঁড়াল একপাশে। অদ্ভুত একটা কৌশলে কাঁধের উপরের তিনটে সোনালি তারা ঝিকিয়ে দিল মধুছন্দা আর্দ্দালির চোখ জুড়ে। এই তার প্রাত্যহিত পুরস্কার।

মধুছন্দার মনে হ'ল আজকের বিকালটিতে তার অবসর। চাঁদ পর্য্যন্ত আসবে না। অর্থাৎ চাঁদকেও সে আজ আসতে হুকুম করে নি। মেজরও আসবেনা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোবার জন্য। পূর্ণ অবকাশ আজ। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াল সে, কানের পাশের রুক্ষ চুলগুলি দেখে সহসা তার কেমন মায়া হ'ল। ক্যাপের খাকি রেশমের সুতো বাঁপাশের চুলে লেগে আছে অথচ সহসা চুলের থেকে আলাদা হ'য়ে চোখে পড়ে নি এ ঘটনাটি চিন্তাগ্রস্থ ক'রে তুলল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন যেগুলি তার নজরে পড়েনি সেগুলি তাকে আচ্ছন্ন করল, বিব্রত ক'রে তুলল। আঁধারের স্রোতের মতো চুল তার। কান্না আসে যেন। সাথে সাথে নজরে পড়ল লাবণ্য পুড়ে-যাওয়া মুখের তপঃক্লিষ্টতা। মরি মরি! একি তাপসীর মূর্ত্তি হ'ল তার। তার অন্তর কী তপস্যা করেছে উমার মতো? মুহূর্ত্তপরে রোমান্টিক

ভাবালুতা বর্জন করলে সে। ঝিকে ডাকলে চেঁচিয়ে, আর্দ্দালিকে পাঠাল ক্যান্টিনে ফেস্‌ক্রিম আনতে। ঝি এল চুলের ব্যবস্থা করতে। তপস্যাই সে করে যদি, করবে বাঁচার।

বাঁচবে এই প্রতিজ্ঞা তার। আরও বেশী করে বাঁচতে চায় সে। জীবনের প্রথম দশটা বছর হয়তো সে বেঁচেছিল, কিন্তু ভালো জামা, ভালো একজোড়া জুতো এই যখন ছিল তার অপূরণের দুর্লভ সাধ সে বয়সে কতটুকুই বাঁচতে শেখে মানুষে। তখন হয়তো চাঁদ ধরবার জন্য আব্দার করেছে মায়ের গলা ধরে, হয়তো তৃপ্তও হয়েছে রাঙতার তৈরী চাঁদ হাতে পেয়ে। তা হ'লেও মানুষ অতীত সুখের উদ্গার তুলে বাঁচে না। বাল্যের বাঁচার সাধ জিহ্বায় জড়িয়ে থাকে না, মধুছন্দারও থাকেনি। খুকুরাণী এককালে শোভনা রায় হ'য়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। নিজের হ'য়ে বাঁচতে শেখার সেই প্রথম দিনে, কিন্তু জীবন তখনই সরে যেতে সুরু করেছে, বালুচর জাগছে ইতিমধ্যে। কলেজে মৃত্যুর সমারোহে দৃষ্টি নিরুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে অসহ যন্ত্রণায় বিকৃত কণ্ঠে সে একবার অন্বেষণ করেছিল,—আলো কোথায়, আলো কোথায় পাব? তার ফলে ঢাকা কলেজ ছাড়তে হল, কোলকাতায় পালিয়ে এল সে। যে মরেছে তার বাঁচবার চেষ্টা করা কেলেঙ্কারি এই অভিজ্ঞতা হল তার।

মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে বাংলাদেশে; সমাজে তার সব চাইতে সম্মানের পরিচয় হবে অমুকের অমুক বলে, এই শুধু যথেষ্ট অপমান নয়, ঐ অমুকটিকে যোগার করতে হয় উদ্যোগ করে, লেখালিখি, হাঁটাহাঁটি, দাবার গুঁটি চেলে চেলে। কিন্তু এ সব ব্যথা এ সব বিড়ম্বনা অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়েদের। শোভনা রায় হিসাবেই মধুছন্দা অনন্য সাধারণ ছিল। স্ত্রী স্বাধীনতার কথা ভাবতে বা বলতে তার লজ্জা হ'ত। অন্যকে মোহাচ্ছন্ন রাখবে এই প্রকৃতি যার সে কি করে মাত্র স্বাধীন হবার জন্য এত কোলাহল করে। স্ত্রীসঙ্ঘের কেউ কিছু বলতে এলে শোভনা এই জবাব দিত তাদেরকে। তারা বুঝতে না পেরে তাকে রিএক্‌শ্যনারি বলেছে। শোভনা দুঃখে ব্যথায় কেঁদেছে, দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, তার কান্নাকে কেউ আমল দেয়নি, দেবার সাহস ছিলনা বলেই শুধু নয়, তার ভাষা বুঝতে পারে নি কেউ। মুক ব্যথায় সহানুভূতি জাগান কঠিন নয়, ব্যথা যখন গভীরতায় প্রচলিত ভাষার নবতর দ্যোতনা দিতে থাকে তখন লোকে বলে বাড়াবাড়ি, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।

আদিম যুগের কথা মনে হত শোভনার, যখন একজন মাত্র নয় একাধিক পুরুষ একটি নারীকে কেন্দ্র করে জীবন গড়ে তুলত। আজও কেন করবে না? নারীর প্রাণ-শক্তি কি কৃপণ হয়ে পড়েছে আজ, বহুকে সে কি প্রাণ দিতে পারে না আর? সেই বলে বহুভর্তৃকা হবার অভিলাষী নয় মধুছন্দা বরং বিপরীত। পৃথিবীর প্রেম চলে পুরুষের পায়ে এ কথাটা সে ভাবে আর অবাক হয়ে যায়। স্বাভাবিক হয় তখনই ভালোবাসা যখন

প্রেমের পাত্রটি আবার ওঠাবে নারীর হাতে। ধরা দেয়া না দেয়া হবে তার ইচ্ছাধীন। সেই ক্বচিৎ কিরণে উদ্ভাসিত হবে যে পুরুষ সে তো দুর্লভ সৌভাগ্যবান। সংখ্যা কি করে একাধিক হবে।

ঝি চুল বাঁধা শেষ করে ঘাড়ে চুলের গোড়ায় পাউডারের সাথে অ্যাশ মিশিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে। ক্যানটিন থেকে ফেশক্রিম এসেছে গলদঘর্ম আর্দ্দালির হাতে। প্রসাধন শেষ হল যখন তখন নোতুন রঙ করা বোডোয়ার হাল্কা সুগন্ধে ম' ম' করছে।

আরও আধঘন্টা পরে পোষাক পালটানো ব্যাপারটা সমাধান হ'ল। গল্পকার হয়েও পুনরুক্তি দোষের ভয়ে নারীর রূপবর্ণনা করিনি বহুদিন। আজ করতে হল। এমনি সুগঠিত বক্ষ, এমনি অবয়ব বুশ্‌সার্টের খাকিতে আড়াল হয়ে ছিল কে জানত? দিনে দশমাইল মার্চ করে রক্তের রঙ্‌ লাল হয়েছে। রূপোলি আদ্দির পায়জামা ও পাঞ্জাবির অন্তর থেকে স্বাস্থ্য দুর্নিবার রূপে পরিণত হয়েছে। নিজের ছবিতে আয়নায় দৃষ্টি পড়তে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল যোদ্ধনারী। ঠিক এমন অসতর্ক মুহূর্ত্তে চাঁদ আসতে পারে একথা ভাবা যায় না, কিন্তু তাই এল সে। নিমন্ত্রিত না হ'য়ে রূঢ় কথা শুনবার ভয় না ক'রে বেডোয়ারে প্রবেশ করলে।

—চাঁদ যে, অসময়ে?

চাঁদের পক্ষে বলা উচিৎ ছিল, গগন প্রান্তে আমার উদয় একই নিয়মে চলে, যারা প্রতীক্ষায় থাকে তারা ভাবে আমার পথ অতি দীর্ঘ; যার পোড়া চোখে সয় না আমার উৎসব সে কাঁদে আর বলে—কেন এলে।

চাঁদ একেবারে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মধুছন্দা নোতুন জীবন সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা করছে। সামনে আদর্শ নেই যে অনুসরণ করা চলে, কাজেই সহচরদের 'পরে তার চলবার রীতি কি রকম প্রতিঘাত করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হয় তাকে। চাঁদের দৃষ্টির অর্থ সে খুঁজতে যেয়ে অবাক হয়ে গেল। যে কথাটি তার মনে হল তা এই,—অরণ্যের অধীশ্বরী বাঘিনী সাথীর অন্বেষণে চলেছে কান্তার প্রান্ত উচ্চকিত করে প্রতিধ্বনিত গর্জনে, বাঘের শিশু সে ডাকে সারা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; উল্লাসের চাইতে গভীর বিস্ময়, ভয়ের চাইতে বড় মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

কিন্তু সাধারণ মেয়ের মতো মধুছন্দা বললে,—কি দেখছ হাঁ করে?

চাঁদের যোগ্য উত্তর হতে পারত,—জন্মজন্মান্তরের সাধনায় চাওয়া আমার মৃত্যুকে, বললে—মুহূর্ত্তটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

প্রশ্রয় দিয়ে বললে মধুছন্দা,—কেন? বলো।

—আজ খেলতে গেলে না টেনিস।

—কার সাথে খেলব বলো, দুর্ভিক্ষে দেশ ছেড়ে যে সব পালিয়েছে। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে খেলতে জানে এমন লোক দেখিনে।

—শুনি রয়েল গোর্খার দু একজন অফিসর আছে।

—আছে হয়তো। সেখানেও অসুবিধা বোধ হয় আমার। স্লিমের কাছে যখন খেলা শিখেছিলাম তখন এদিকটাতে দৃষ্টি পড়ে নি। সাধারণ চলতি খেলা ওরা জানে। দৌড়াদৌড়ি করে, লাফিয়ে, প্রাণপণে কোন রকমে পয়েন্ট কুড়িয়ে ওরা সেটা দখল করতে পারে, বড় চাল ওদের নেই। আঁচরে আঁচরে ছবি ফুটিয়ে তুলবার মতো খেলাতেও কলার বিকাশ হতে পারে এ জানে না ওরা। ওটাকে শ্রমশিল্প বানিয়েছে।

চাঁদ বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকল। চাঁদ মধুছন্দাকে পরাজিত হ'তে দেখেছে সেটা বিজ্ঞানের কাছে চারুশিল্পের পরাজয় কি না কে জানে।

চাঁদ অন্যখাতে কথা পারল,—মেজর আসবে না আজ ?

—না আসতে বলি নি কাউকে।

—তা হ'লে একান্ত অবসর আমার ?

মধুছন্দা চাঁদকে বিদ্ধ করলে দৃষ্টি দিয়ে, চাঁদের খাকির আস্তরণ ভেদ করে সে তীব্রতা কোথায় পৌঁছাল কে জানে। মসলিনের মতো শালের ওড়না কাঁধ থেকে বাহুতে নেমে এল মধুছন্দার।

চাঁদ কথার ভঙ্গি পালটে নিল,—আবেদন শুনবে না বাইরের কেউ, সুতরাং বলি।

—পায়ের কাছে এসে বস।

—না টেবিলের কাছে যাই, কাগজ কলমের দরকার হয়ে পড়তে পারে।

—বেশী ক'রে কবিতা পড়নি বুঝি, মুখে বলবার ভরসা পাচ্ছ না ?

—সঙ্কোচ হ'চ্ছে এমনি রূঢ় চাওয়া আমার। শ' তিনেক টাকা দেবে মাধবী দিদি।

মধুছন্দার গর্বে আঘাত লাগল কি না কে জানে, চাঁদের সম্বন্ধে তাঁর হিসাবে কোথায় একটু ভুল থাকবেই।

চাঁদ টাকা না নিয়ে গেল না, একটু তকরার হ'ল তাদের ; একটু বাঁকা ক'রে বললে মধুছন্দা।

চাঁদ অকুণ্ঠ চিত্তে প্রায় উদাসীনের স্বরে ব্যক্ত করলে টাকার প্রয়োজন। দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীর সহায়তায় বলদর্পী হয়ে উঠেছে। একটি ষোড়শী কুমারীকে এবং তা থেকে তার পরিবারস্থ আর সকলকে বাঁচবার মতো টাকা দিতে হবে। তার নিজের বেতনের শ'দুই টাকার প্রায় সবটাই সে পাঠায় দাদাকে নইলে তিনি অচল—

এমনি সব বস্তুতান্ত্রিক কথা। অবশেষে সে স্বীকার করল ষোড়শী তার কেউ নয়। ক্যান্টিনে এসেছিল আহার্য্য সংগ্রহের সুযোগ অনুসন্ধান করতে। চাঁদ তাকে সুযোগ খুঁজবার অবকাশ দেয়নি। কাজেই বাধ্য হ'য়ে ক্ষতিপূরণ করছে।

চাঁদ গেল শুধু টাকা নিয়েই নয়, গত আট ন' মাসে মধুছন্দা হিসাবে শোভনার মনে বাহিরের যে প্রলেপ প'ড়ে অন্তর ঢেকে গিয়েছিল সেখানে খানিকটা আঘাত করেও। খবরের কাগজে রোজই ঐ মহামারী, ঐ দুর্ভিক্ষ কাহিনী, আজকাল ঐ খবর এড়াবার জন্য সে পাতা উল্টে যায়। বহুদিনের কোন অতীতে সারাদিনে কিছু না খাবার কষ্টে সেও মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল একদা কিন্তু চাকরির সোনার ধাপে ধাপে পা দিয়ে আজ সে যেখানে পৌঁছেছে তাতে নিজেকে বাঙালি, বুভুক্ষু মুমূর্ষু বাঙালির সমজাতীয় বলে আর বোধ হয়না।

মধুছন্দা প্যাড্ টেনে নিয়ে বরিশালের এক গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারের বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি লিখতে বসলে :

মিনতি,

ভেবেছিস তোকে আমি ভুলে গেছি। যাই নি, কেউ কোনদিন পারে না। আট ন' মাস মাত্র তোকে দেখিনি, অথচ কতদিন যেন দেখিনি। তোরা ভাল আছিস তো। দুর্ভিক্ষ কি তোদের বাড়ীতে ঢুকতে পেরেছে ? নিশ্চয় পারে নি, বড়দা নিশ্চয় কিছু উপায় করছে। বড়দাটা একটু ছেলেমানুষ, নইলে কি অদ্ভুত পরিশ্রম করে আমার কোলকাতায় পড়বার খরচ যোগার করত। আচ্ছারে, বাবা আমার কথা বলেন ? মার সেই মাথা ধরা কি এখনও হয় ? তোদের জন্য মন কেমন করে। আমি যখন ফিরে যাব তখন তোরা আমায় বাড়ীতে ঢুকতে দিবিতো ? না দিস তো আমি যে বাড়ী করব, তাতেই সবাইকে নিয়ে আসব।

মিনু, লক্ষ্মী দিদি, একটা কথা বলি, নিশ্চয় রাখবি আমার কথা। এইমাত্র একজন ভদ্রলোক আমাদের সহকর্মী বললেন,—কবে কোন মেয়ে অল্পবয়সী অভাবের তাড়নায় মিলিটারির আড্ডায় গিয়েছিল ভিক্ষা চাইতে। তা যেন তুই করিস নে। কথাটা শুনে আমি শিউরে উঠেছি। তোর মুখখানা মনে পড়ে গেল। দিদিভাই, কিছুতেই তুই কখনো এই মেয়েটির মতো করবি না। জানিস তো পুরুষরা একরকম বেহিসেবি আনন্দ পায় আমাদের বিপদে ফেলে। অবশ্য সব মেয়ের বেলায় এমনি দুঃসাহস ওদের হয়না।

লেখা বন্ধ করে কি ভাবলে কিছুক্ষণ তারপরে আবার লিখল,—আমি টাকা পাঠাব যত টাকা তোদের লাগবে, তোর বিয়ের টাকাও আমার যোগার করা আছে।

চিঠি পেয়ে বরিশালের মিনতি কি করেছিল জানিনা। এমন কি কিছুদিন মধুছন্দার খবর পর্য্যন্ত রাখতে পারিনি। তার static formation কখন কি ভাবে পুরোদস্তুর

রেজিমেন্ট হয়ে উঠল এবং রাতারাতি কতক ট্রেনে কতক প্লেনে আসাম সীমান্ত পার হয়ে ব্রহ্মের পাহাড়ে জঙ্গলে পারি দিতে লাগল এ সব মিলিটারি সিক্রেট। ভান্সিটার্টের বাসায় তালা ঝুলল না এইটুকু মাত্র জানি। চাঁদ কি করে ওদের আঙুলের ফাঁকে বেড়িয়ে পড়েছিল ওদের সর্বগ্রাসী মুষ্টি থেকে। সে রয়ে গেল কোলকাতায়, মধুছন্দার বাসায়, মধুছন্দার বোতোম্মার সিগারেটের ছাই-এ ভুক্ত-অন্তর খাবারের টিন কৌটায় জঙ্গলাকীর্ণ করতে লাগল। ঝি তার রান্না করে দেয় কদাচিৎ, কাজেই আপত্তি করে না হুজুরাইনের বাড়ীঘর বেমিসিল করায়। আর্দ্দালি তার মনিবের সাথে গেছে জাপানীকে রুখতে, কাজেই চাঁদের নিরুপদ্রব বিশ্রামে কেউ বাধা দিল না।

খবর পেয়ে চাঁদ বললে—শালা; কিন্তু মধুছন্দাকে শালা বলে আরাম পেল না আজ। আফিসে যখন যেয়ে সে পৌঁছল তখন রাত আছে, পথের গ্যাস সাঁ সাঁ ক'রে জ্বলছে। দরজায় আর্দ্দালিকে স্যালুট ফিরিয়ে না দিয়ে, পাস্‌ওয়ার্ড না বলে, গুলি খাবার ঝুঁকি নিয়ে পড়ি কি মরি করে তেতালায় ইন্‌ফরমেশন ব্যুরোতে যেয়ে উঠল সে। জমাদার আদিত সিং অবাক হল তাকে দেখে, দুটো কথা যে খরচ করে না তার মুখে চোখে যেন কথা উপচে পড়ছে। কিন্তু ক্যাজুয়ালটি লিষ্টের আটদশ পাতার ক্ষুদে টাইপে লেখা হতভাগ্য নামগুলি বারবার পড়েও মধুছন্দার নাম খুঁজে পেল না সে। হতের তালিকা, আহতের তালিকায় না পেয়ে আদিত সিংকে ডাকল সে, টেবিলের পরে আলোর দগ্‌দগে বালবের নীচে বিছিয়ে নিয়ে দুজনে মিলে নিখোঁজের তালিকাও দেখলে সেখানেও মধুছন্দার ডবল এইচ নেই। দ্বিতীয়বার শালা বললে চাঁদ, এবার নিজেকে। তবে কি দুঃস্বপ্ন। না। সুবাদার ধীরেন ব্রহ্ম খবর দিয়েছে মধুছন্দাকে হঠাৎ ক'দিন থেকে সে দেখেনি। ধীরেন ব্রহ্মকে চাঁদ ছোটবেলা থেকে চেনে, নিজে সুপারিশ করে তাকে মিলিটারিতে খানিকটা তুলে দিয়েছে। তবু আদিত সিংকে প্রশ্ন করলে চাঁদ,—ধীরেন ব্রহ্ম বলে কেউ আছে সুবাদার গোর্খা রাইফেলসে। দুলাখ তেত্রিশ হাজার নামের মধ্যে এক মিনিটে ধীরেন ব্রহ্মের নাম পাওয়া গেল খুঁজে, যেন না খুঁজেও পাওয়া যেত। চাঁদ শালা বলতে যেয়ে থেমে গেল। মেজরের কাছে ছুটি নিয়ে চাঁদ বেড়িয়ে পড়ল, লাকসাম, কুলাউড়া, আখাউড়া, তিনসুকিয়া, সিরাজগঞ্জ, দেউলালি ঘুরে এসে মধুছন্দাকে পেল সে রানাঘাট ষ্টেশনের ছোট লম্বা বেঞ্চিতে। আর্দ্দালি তাকে চিনতে পারল। মধুছন্দা চোখ মেললে, লাল টক্‌টক্ করছে চোখের সাদা অংশটুকু।

ভান্সিটার্টের বাসায় কোলে করে নামিয়ে আনলে মধুছন্দাকে চাঁদ। ক্যাপ্টেন মধুছন্দা এত লঘু এত কোমল এ চাঁদ জানত না। পাছে মিলিটারির লোক এসে হসপিট্যালে নিয়ে যায় তাই সেবা করবার ইচ্ছায় অসুখের কথা সাফ গোপন করলে চাঁদ।

কিন্তু দুদিন দুরাত কাটল বমি ছাপ করে। চাঁদের মন সমগ্র স্ত্রী-জাতীর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ এমন দুর্বল এমন পলকা যাদের শরীর তাদের কেন এ সব জাঁদরেলি কাজে নামা। সকালের দিকে জ্বর কমতে শুনিয়ে দিল মধুছন্দাকে। কুইনাইন ইনজেকশন যা পারেনি। ধমক তা পারল। তিন দিনের পর সকালে উঠে বসে আরও কিছুদিনের ছুটি চেয়ে পাঠাল মধুছন্দা। চাঁদ নিচের তলার অন্ধকার ঘরে যেয়ে আর্দ্দালিকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে সেই যে দরজা বন্ধ করে ঘুম দিল পরের দিন সকালের আগে তার দেখা পাওয়া গেলনা অবশ্য দেখা পাওয়ার জন্য কেউ বড় একটা ব্যস্তও ছিল না। শুধু আর্দ্দালি খইনির ডিবে খুঁজতে এসে বার দুই ধাক্কা দিয়েছিল দরজায়, আর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মাথার কাছে কারো হাত খুঁজে না পেয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল মধুছন্দা। মাথার কাছে যার হাত খোঁজ করেছিল পাশের খাটখানায় সে লোকটা আছে কিনা এ সন্ধানে তার প্রয়োজন হল না, করলও না।

জোড়া খাটের আর একখানা উঠল চিলে কোঠায়; ড্রেসিং টেবিলের বারনিসে শুধু মাত্র ক্ষীণ দাগ রেখে ওষুধের শিশি, ফিডিং কাপ, জ্বরের চার্ট, আইস ব্যাগ অদৃশ্য হয়েছে। এখনও ঘর ম' ম' করেনা বটে সুগন্ধে, ইতিমধ্যে ব্লাউজের ভাঁজে ভাঁজে রাখা মৃদু চেরির গন্ধ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু বর্ম্মা থেকে সে শুধু জ্বর নিয়ে ফেরেনি। দিন সাতেক পরে একদিন কর্ত্তব্য বোধ চাগিয়ে ওঠায় চাঁদ ভান্সিটার্ট রোতে উপস্থিত হ'ল, দোতালার হল ঘরটিতে (যা এতদিন আসবাবশূন্য হয়ে করিডরের কাজ করত) মধুছন্দাকে পাওয়া গেল। পরনে আমেরিকান ব্লাউজ, আর বার্ম্মানিজ লৌঙ্গি, জাফরান রঙের ব্লাউজ আর সোনালি সিল্কের লৌঙ্গি। ঘরের মাঝখানটিতে কাঁচের নাতিবৃহৎ টেবিল, টেবিলের চারিপাশে গুটিকয়েক হরিণ শিঙের চেয়ার, টেবিলে ডিক্যান্টারে সোনালি রঙের খানিকটা, পাশে একটি ছোট জাগে ডালিমফুলী রঙের আর খানিকটা বিলেতি সুরা। মধুছন্দার মুখে চোখে করুণ অনুতাপ আশা না করলেও খানিকটা লজ্জা ও কুণ্ঠা আশা করেছিল চাঁদ।

মধুছন্দা এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে চাঁদের দুহাত ধরে স্বাগত করল তাকে; শোবার ঘরে নিয়ে গেল তাকে, বসাল নিজের খাটে, নিজে বসল তার পাশে তবু হাত ছাড়লে না। মধুছন্দার চোখ দুটি তীব্র ঝাঁঝালো মিষ্টিতে ভরে টস্‌টস্ করছে। চাঁদের অবাক লাগতে লাগল; ছোট্ট একরত্তি ছেলে নয় সে, দু বাহুর সাহায্যেই সে মধুছন্দাকে মাটি থেকে তুলে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

মধুছন্দা দুতিনবার কথা বলবার চেষ্টা করে থামল; অবশেষে বলল,—এতদিন এস নি কেন? এখানে জোড়াখাট ছিল মনে আছে? তুমি যে বালবটি বদলেছিলে

এ ঘরের এখনও সেইটে আছে, তোমার পছন্দকে নাকচ করতে পারিনি; আজ হঠাৎ আমার মনে পড়েছে জোড়াখাট এঘরে বেমানান হয়না।

চাঁদের বলতে ইচ্ছা হল—তুদিন অপেক্ষা করে তার পরেও এ সব বিদ্যার পরিচয় দেয়া চলত। শরীরে এখনও রক্ত ফেরেনি।

কিছু না বলে সিগারেট ধরালে, খানিক পরে বললে,—মাথা ঘোরে না তো? সেইটে খেয়াল রেখ।

মাথা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল মধুছন্দা। বললে,—ভাগ্যে তুমি এসেছ। ফ্রন্টে একটি স্বদেশী ছেলের বিচার হয়েছিল বিদ্রোহের জন্য। তাকে ওরা গুলি করে মেরেছে। শেষ কথা সে আমার সাথে বলেছিল, বলেছিল;—ভাবতেও পারছিনে আমি থাকব না, আর কয়েকমিনিট পরে চিরদিনের জন্য লোপ পেয়ে যাব। তার জন্য এটা ধরেছি, তার জন্যে কেঁদেছি, বড্ড বেশী তোমার মতো দেখতে ছিল সে।

অন্য সময়ে চাঁদ বলত—ইয়া। মধুছন্দার মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—চোখ তুটি ছল ছল করল যেন। গত ছ মাস যার ডাগ আউটের সল্প পরিসর গর্ত্তে অস্নাত পুরুষের ঘামে ভেজা গায়ের সাথে গা মিশিয়ে ঘুমুতে হয়েছে, রক্ত মেশান জমাট কাদা যার বুটে এখনও লেগে আছে খাঁজে খাঁজে তার এমন চোখ তুটি দেখে অবাক হয়ে গেল চাঁদ। সন্ধ্যার অন্ধকার তেমন গাঢ় হবার আগে চাঁদ বিদায় নিল, যাবার সময়ে অনুরোধ করে গেল,—হুঁসিয়ার হয়ে থেক, মাথা ঘুরে পড়ে গেলে শিরাটিরা ছিঁড়ে বিপদ হতে পারে।

কিন্তু মাথা ঘোরা অবস্থাতেই একদিন চাঁদকে আসতে হল, দেখতে হল এমন ভাগ্য তার।

কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছিল জানিনা, পরে শুনেছি মেজর সাহেব নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, চাঁদ নিমন্ত্রিত হয়নি। সেই হলঘর, কাঁচের টেবিল, কাটা কাঁচের গেলাস, জার, ডিক্যান্টার, কাঁচ কড়ির পেয়ালা পিরীচ, বার্নিশ করা রূপোর ট্রে, কাঁটা চামচ সবগুলি দর্পণ-ধর্মী। বিচিত্র বর্ণের আহার্য্য পানীয় সবগুলিকে বিচিত্রতর করেছে। মধুছন্দা টেবিলের পাশে কারণে অকারণে ঘুরছে, সবগুলিতে প্রতিফলিত হচ্ছে তার বর্ণদাঢ্য অবয়ব, অথবা এইটেই সব চাইতে বড় কারণ তার ঘুরে বেড়াবার।

আর মধুছন্দা নিজে? হায়রে আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই যে তার বর্ণনা করি।

মেজর শ্যাম্পেন খেয়েছে সন্ধ্যায়, এখন ক্লারেট খাচ্ছে, খাঁটি ইজিপ্সীয়ান সিগারেটও চলছে। লোকটি একান্ত ভদ্র, নিজের সাথে সে সন্ধ্যা থেকে যুদ্ধ করছে। পুরো আহারের পর শ্যাম্পেন যখন সে চেয়েছিল তখন সকলে অবাক হয়েছিল। তারপরে সে যখন ক্লারেট চাইল এবং মধুছন্দা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়েছিল তখন তার মনে হল

মধুছন্দার পাশে বসে তার অঙ্গ বিচ্ছুরিত যে উত্তাপ তার সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়ে গেছে তার দাহ মিটাবার জন্মই সে ক্লারেট চেয়েছে।

সবাই চলে গেছে, গভীর রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মানুষ যেমন রাত্রির আবেশকে ছিন্ন করবার ভয়ে গলা নিচু করে কথা বলে তেমনি করে মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করলে—যাবে না ?

কানে কানে বলার মতো করে মেজর বললে—না।

ফিস্ ফিস্ করে মধুছন্দা বললে— কেনো।

তারপরেই চাঁদের উক্ত সেই মাথা ঘোরা ব্যাপার, রূঢ় হাতের মার খেয়ে আবেশ ছেঁড়ার ঘটনা। চাঁদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল। দু পা পিছিয়ে যেয়ে মধুছন্দা মেখলায় ঝুলানো ক্রোমিয়াম প্লেটেড্ রিভলবারটি তুলে নিয়ে মেজরের চোখ দুটিকে নিশানার এক্তিয়ারে এনে ফেলল; তারপরে হেসে উঠল। গোটা একটা কাঁচের ঝাড় বুঝিবা আলোর আতিশয্যে চূর্ণ হয়ে গেল কাছে কোথায়।

কিন্তু চাঁদ যখন এক নিমেষে তার পাশে এসে দাঁড়াল, বললে—ইয়া! তখন যেন কেঁদে ফেলল মধুছন্দা। একবার ভেবেও দেখল না নির্বাক চাঁদ আজ মনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পেরেছে। আর চাঁদ? করুণায়, স্নেহে, খোপা ভাঙ্গা চুলের ভারে, নারীদেহের কোমলতায় নিজেকে কোথাও খুঁজে পেল না।

তাকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে চাঁদ যখন দূরের সিটটাতে বসে সিগারেট ধরালে তখন মধুছন্দা আশায় ভরে উঠল—এইবার চাঁদ তাকে শাসন করবে, তিরস্কার করবে। তার বহুদিনের স্বপ্নে দেখা ব্যাপারটা সত্য হবে, সফল হবে। কিন্তু স্বপ্নে চাঁদের বেত্রাঘাতে জর্জর হবার যে সৌভাগ্য সে লাভ করেছে তা কি সত্য হয়?

চাঁদ সিগারেট ধরাল, বসে বসে দুলল। অবশেষে মধুছন্দা বললে,—কেন এসেছ তবে? বলো বলো। রূঢ় হতে তুমি পার না, আমি জানি। ভয় কোরনা আমার মনের কোমলতা খাবলে দেবে তোমার কথা। ও তোমার ক্ষমতার বাইরে।

মধুছন্দার কথার রেশ মরে যাবার অবসর দিয়ে চাঁদ বললে,—কিছু টাকার দরকার হয়েছে আবার।

চাঁদ ভেবেছিল মধুছন্দা ঘর থেকে চলে যাবে। গেল না। ক্লান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে,—কাল আপিসে মনে কোর।

কথাটা ভাল লাগল না চাঁদের, বড্ড বেশী দাতার ভাব ফুটিয়ে দিল মধুছন্দা। চাঁদ বক্তৃতা দিল: বিয়ে করব, মাধবী দিদি, টাকা চাই, ছুটি চাই। বড্ড ভুল করেছি বিয়ের কথায় রাজি হয়ে, এখন দেখছি বিয়ে করা আর বেকুব হওয়া একই কথা। বাসর ঘর ইতিমধ্যে অতীতের ঐশ্বর্য্যে পরিণত, বধূকে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্লিওপেট্রা বলে বোধ হচ্ছে।

আমি জানতাম বিয়ের কথায় মেয়েরা বক্তার হয়ে ওঠে, সে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক, (পরের হলে বরং কানেও শুনতে পাওয়া যায়); আর জানতাম বেটা ছেলেরা বাঁধা পড়তে আনন্দ পেলেও মুখে অন্তত কড়া কড়া প্রতিবাদ করে। এ ক্ষেত্রে দেখলাম সে সব কিছুই হল না। নির্বাক চাঁদ বিয়ের কল্পনায় বাগ্মী হয়েছে, আর মধুছন্দা এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের সংবাদ আকস্মিক ভাবে পেয়েও এতটুকু উৎসুক হলনা।

বিটারস্, এবসিন্থ বা ফ্রেঞ্চ ভারসাউথ যে জন্যই হ'ক কক্‌টেলের পর মুখ ও তা থেকে সারা দেহ ও সমগ্র মন তিক্ত বোধ হচ্ছিল মধুছন্দার, হয়তো তার নিস্পৃহতার অন্যতম কারণও এইটি।

পরের দিন আফিসে যেয়ে বেলা এগারোটায় চাঁদকে ডেকে চেক্ লিখে দিল মোটা অঙ্কের। চাঁদ চাওয়ার বেশী পেয়ে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সাদা দাঁত ঝিকিয়ে স্যালুট করলে বুট্ ঠুকে। তার অপস্রিয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে মধুছন্দা কি ভাবল তারপর কলমের ঢাকনি খুলে ফাইলের পর ফাইল সই করতে লাগল। বারোটাতে মধুছন্দার মনে হল চাঁদকে ডেকে জানিয়ে দেয় তার ছুটি সে মঞ্জুর করবে, এতটুকু দ্বিধা তার হবে না। মিনিট দু'এক দেব কি দেব না করে খবরটা দেবার জন্যে চাঁদকে ডেকে পাঠাল।

—বিয়ের পর কোথায় যাবে তুমি?

—তুমি কি তোমার কাছে এসে থাকতে বলবে না?

—তা মন্দ হয় না। নবদম্পতীর কপোত লীলার কূজন প্রতিধ্বনি শুনতে পাব।

—তা হ'লে তাই।

—কিন্তু আমি হয়তো থাকব না। কাশ্মীরে যাবার ইচ্ছা হয়েছে। মনতোষকে মনে নেই? হ্যাঁ সেই ডাক্তার কর্ণেল মনতোষ মিত্তির, সে বারব র লিখছে।

এই কথাগুলি কিছুক্ষণ পরে বললে মধুছন্দা, একটু ভেবে চিন্তে; গল্পকারের মতো কথা ওজন করে করে, শ্রোতার পরে কথার কাজ লক্ষ্য রেখে রেখে। চাঁদ এ অবতারণার কারণ বুঝতে না পেরে ফিরে গেল।

চাঁদ খুব আশা করেছিল টিফিনে আজ কোন বাইরের রেস্তোরায় যাবে মধুছন্দা এবং তাকে সঙ্গে নেবে। চাঁদের অনেক পরামর্শ ছিল তার সাথে; কিন্তু মধুছন্দা বাইরে গেল বটে মোটরের গতি তীব্রতর করলে বটে, চাঁদকে সঙ্গে নিল না।

বেলা তিনটেতে চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে মধুছন্দা চাপরাশিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল চাঁদকে কিন্তু চাঁদ ততক্ষণে বরিশাল এক্সপ্রেসে চেপেছে শেয়ালদায়।

কার সাথে বিয়ে, কোথায় বিয়ে, কি রকম মেয়ে, একালের না সাবেকি এসব অনেক

কথা জানবার ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা, কৌতূহল থাকা দুর্ব্বলতা কি না এ বুঝতে না পেরে মধুছন্দার জানা হয় নি।

আফিস থেকে বাসায় ফিরে সন্ধ্যার আনা ডাকে তার কৌতূহল নিরসন হল একটু বা আশাতিরিক্ত ভাবে, একটু বা প্রয়োজনের অতিরিক্তই হল।

বরিশালের সেই স্কুলমাষ্টার যিনি শোভনারূপে মধুছন্দার বাবা ছিলেন তিনি লাল ছাপান নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছেন মিনতির বিয়ের। মিনতিও একখানা পোষ্টকার্ডে তাকে চিঠি লিখেছে, সঙ্কোচ নেই, কুণ্ঠা নেই। বিয়েটাকে মিনতি নেহাৎ কর্ত্তব্যবোধে করছে যেন তবু তার মধ্যেও একটা অভিনবের সুর আছে। লিখেছে,—তুমি আসবে দিদি ভাই। একই পত্রে সে বরের নামও উল্লেখ করেছে—চন্দ্রকান্ত সেন তার নাম। কৌতূহল নিরসন হল, অতিরিক্তটুকু পাওনা ছিল, সেটা মিলল—চাঁদের টেলিগ্রামে। দীর্ঘ বিস্তারিত টেলিগ্রাম, নৈহাটি থেকে করেছে, মাধবী দিদি তার পেয়ে রওনা হও! মিনতির সাথে আমার বিয়ে। অনেক কথা বলবার ছিল আফিসে বলা হয়নি, মুখ ফুটে বলতে পারিনে বলেও বটে। কালকের বরিশাল একস্‌প্রেস ফেল কোর না।

মধুছন্দা এক সাথেই চিঠি দুটি ও তারখানি টেবিলে নামিয়ে রাখল। একটা কথা মাত্র তার মনে হল ঃ চাঁদ যখন তখন উদাসীন হতে সে পারে না। একটা কিছু করা দরকার। চাঁদের সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে সে নিস্পৃহ থাকবে কি করে ? মনে পড়ল চাঁদ, ভীরু নির্ব্বাক চাঁদ।

হঠাৎ সে ফোন তুলে নিল, হ্যালো সাউথ ফাইভ ও নাইন থ্রি। মেজর যেন তার ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল, ব্যগ্র হয়ে সাড়া দিল।

চাঁদ তোমার কাছ থেকে ছুটি নিয়েছে ? না ? আশ্চর্য্য। সে তো কোলকাতায় নেই, নৈহাটি থেকে তার করেছে আমার কাছে। না আমার কাছ থেকেও ছুটি পায় নি, দরখাস্ত করেছিল কিন্তু এখন মনে পড়ছে ছুটি আমি মঞ্জুর করিনি। কি বলছ ? তার বিয়ে ? বিয়ে তাতে কি আইন ভাঙ্‌বার অধিকার জন্মায় কারো ? হাসছ তুমি ? আমি হাসছি। হ্যাঁ তুমি নিশ্চয় কৈফিয়ৎ নেবে। চার্জ্জ ফ্রেম করো। এ রকম নজির আমি আমার কমাণ্ডে থাকতে দেব না। হ্যাঁ আমি বেশ ভেবেই বলছি, বিচারের ফল কি দাঁড়ায় জেনে শুনেই বলছি।···ধন্যবাদ।

ফোন ছেড়ে দিয়ে মধুছন্দা পায়ে পায়ে ফিরে এল ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে। একটা শূন্য অবসাদ বোধ হচ্ছে। আয়নার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল। না—একটি চুলও তার পাকেনি। কানের কাছে যেটা চক্ চক্ করছে সেটা খাকি সিল্কের আঁশ। এখন আর নেই। একটি রেখাও পড়েনি কপালে কিম্বা গালে। কেন তবে ?

এবার গালে রেখা পড়ল, ঠোঁটের দুপাশ বার কয়েক আকুঞ্চিত হল, দুহাতে মুখ ঢেকে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল সে।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তেইশ

দুইজনে বসল একটা বেঞ্চিতে। পাতলা-পাতলা জ্যোৎস্না। রাতের শিশির পড়ছে নিঃশব্দে।

'আমি কেন এসেছি একবারো জিগগেস করবি নে?' দেবিকার ডান হাতটা তামসী চেপে ধরল।

'আমি জানি।' দেবিকার মুখে উপেক্ষাভরা কাঠিন্য।

'জানিস?'

'হ্যাঁ, ঐ গুণ্ডাটার জন্যে।'

নরম হৃৎপিণ্ডটা কে যেন চেপে ধরল নির্মমের মত। তামসী ঘন-ঘন দুটো নিশ্বাস নিল। বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস, রণধীরের জন্যে। তোকে ধন্যবাদ।'

ঝামটা মেরে উঠল দেবিকা: 'নাম বলে আর ব্যাখ্যানা করিসনে। ঢের হয়েছে। চোরকে বীরচুড়ামণি বলিসনে ঘটা করে।'

তামসী মুখ নামিয়ে রইল।

'ধন্যবাদ দি তোকে। বলিহারি! বলি, তোর লজ্জা করে না?' দেবিকার চোয়ালের হাড়টা শীর্ণতায় বড় তীক্ষ্ণ দেখাল।

'করে।'

'করে?'

'করে বলেই এত শক্ত করে ঢেকে রাখতে চাই বুকের মধ্যে। লুকিয়ে রাখতে চাই। যেখানে ব্যথা সেখানটাই বারে-বারে চেপে ধরে স্পর্শ করতে চাই ব্যথাটাকে।'

রাগে সারা শরীর রি-রি করে উঠল দেবিকার। বললে, 'ঐ ছোটলোক চোরটাকে

তুই ভালোবাসিস ? ঐ স্কাউণ্ড্রেল লোফারটাকে ? তুই একটা কী ! এমনি অপদার্থ হয়ে গেছিস তুই ?' তামসীর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝটকা মেরে।

'রাগ করিসনে। আমার জন্যে একটু দুঃখ কর মনে-মনে।' অশ্রুস্নানশান্ত তামসীর কণ্ঠস্বর : 'যাকে নিয়ে তোর সব চেয়ে বেশি লজ্জা তাকে নিয়ে তোর সব চেয়ে বেশি দুঃখ। যে প্রেম লজ্জিত তার মত বিষণ্ণ প্রেম আর কী আছে ?'

এতটুকু স্পর্শ করল না দেবিকাকে। বললে, 'রাখ তোর বক্তৃতা। যে লোক পরের বাড়ি ঢুকে চুরি করে, পকেট মারে, বাক্স ভাঙে, তাকে তুই ভালোবাসবি ? ভালোবাসতে তোর অপমান মনে হবে না ? ঘেন্না ধরে যাবেনা নিজের ওপর ?'

'শুধু নিজের ওপর ? বলতে চাস, তাকেই আমি ঘেন্না করি না ?'

'ঘেন্না করিস ?' চমকে উঠল দেবিকা। 'কাকে ? তোর রণধীরকে ?'

'বিষের মত ঘেন্না করি।'

কতক্ষণ অনড়ের মত তাকিয়ে রইল দেবিকা। বললে, 'যাকে ঘেন্না করিস তাকেই আবার ভালোবাসিস ?' এ হয় কখনো ?'

'কী রে ?'

'যাকে ঘেন্না করা যায় তাকেই ফের ভালোবাসা যায় ?'

'সত্যিকারের ভালোবাসা বুঝি সেইটেই। যাকে তুই ঘেন্না করিস তাকে ফের ভালোবাসিস। যাকে ছুঁড়ে দিতে চাস তাকেই ফের আঁকড়ে ধরিস। যাকে মারতে চাস তারই জন্যে কেঁদে বুক ভাসাস। নইলে, বল, সেইটেই কি প্রেম, যেখানে সব কিছু স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, আশীর্বাদময় ? সে তো খুব সোজা, সে কে না পারে ? যে আহত, আনত, পদস্খলিত, তাকে ভালোবাসাটাই তো বড় কথা, তার অনাবিষ্কৃত মনুষ্যত্বকে মূল্য দেয়া। সেইটেই কঠিন, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় খাঁটি। আর, তুই নিজে যখন অপমানিত, প্রবঞ্চিত, প্রত্যাখ্যাত, তখনই তোর ভালোবাসা। যত তোর ঘৃণা তত তোর প্রেম।'

'বুঝিনে বাপু।' দেবিকা গলার স্বরটা মোটা করল। ভাবখানা এই : আমরাও তো একদিন প্রেম করেছি, কিন্তু, এমন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইনি। 'তা বলে একটা চোর-ছ্যাঁচোড়কে ধরতে হবে ?'

'অনেকবার নিজেকে জিগগেস করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনা। একটা কুৎসিত সুখকে কেন যে সুন্দর লাগে কে বলবে। কারণ নেই, অর্থ নেই। এ টানের কোথায় যে উৎস কে দেবে তার ঠিকানা ! তোকে বলতে বাধা নেই দেবিকা, ভীষণ অসহায় লাগে নিজেকে, জিজ্ঞাসা করবার ধৈর্যও সহ্য হয় না। কিন্তু তোকে বলি, এই অসহায়তাই আমার শক্তি, এইখানেই আমার বিশ্বাস।'

আগের কথারই খেই ধরছে দেবিকা। 'যদি তবু দেশের জন্যে ডাকাত করে ধরা পড়ত—'

'তার বদলে পেটের জন্যে চুরি করে ধরা পড়েছে। কিন্তু যে দেশ আমাদের আসছে সে দেশে আর কেউ ঘৃণ্য নেই, ব্যর্থ নেই, অপাঙক্তেয় নেই। সেই দেশই ওকে আরেকবার দেখাতে চাই, দেবিকা।'

এই বুঝি এসে পড়ল রাজনীতি। দেবিকা ছটফট করে উঠল। ঝাঁজালো বিরক্তির সুরে বললে, 'আমাকে তুই কী করতে বলিস শুনি?'

'ওকে ছেড়ে দে। আমার হাতে ছেড়ে দে।' তামসী আবার দেবিকার হাত চেপে ধরল: 'আমি ওকে মানুষ করি, নিষ্কলুষ করি। ও আমাকে কঠিন করুক, বিশুদ্ধ করুক। তারপরে দুজনে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অভিবাদন করি আমাদের নতুন দেশকে, নতুন অভ্যুদয়কে। এ হয় না? হয় না এটুকু? পারিস না ছেড়ে দিতে?'

'যে লোক বন্ধু সেজে ঘরে ঢুকে চুরি করে পালায় তাকে ধরতে পেয়ে ছেড়ে দেব এ কোন দেশের রাজনীতি?'

'তোর যা ক্ষতি তা হয়তো সামান্যই, আমার যা ক্ষতি তাকেও না-হয় সামান্যই বলব, কিন্তু তার যা ক্ষতি হবে তার বোধ হয় তুলনা নেই। উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভা একদিন জ্বলেছিল তার চোখে, তার সে-চোখ ভয়ে লজ্জায় বিমর্ষতায় অন্ধকার করে দিসনে। সত্যি, ছেড়ে দেয়া যায় না? তুলে নেয়া যায় না মামলা?'

অসম্ভব।

ঘটনাটা কী, খুঁটিয়ে দেখতে হবে। স্বয়ং কলেক্টর সাহেবের বাড়িতে রাহাজানি। আর, বলি, জিনিস কার? তাঁর স্ত্রীর, মিসেস কলেক্টরের। সমস্ত জেলা-জোড়া যাঁর প্রতাপ, তা শুধু তাঁর স্ত্রীর বেলায় অপ্রকট থাকবে? স্ত্রীর কাছে তাঁর বলৈশ্বর্যের প্রমাণ হবে না? কত বড় যোগ্য স্বামীকে বিয়ে করেছে নিজ চোখে দেখে যাবেনা তামসী?

কিন্তু দেবিকার ক্ষমতাও বা কম কোথায়! যদি স্বামীকে ধরে আসামীকে ছাড়িয়ে আনতে পারে সেইটেও তো তার কম বাহাদুরি নয়। কিন্তু তাতে শুধু তার স্ত্রীত্বের মহিমা, কলেক্টরের স্ত্রী হবার দরুণ বিশেষ কোনোই কেরামতি নেই।

'তুই শেষকালে একটা গুণ্ডার জন্যে আমার কাছে প্লিড করবি?'

চাবুকের বাড়ির মত লাগল তামসীর মুখের উপর।

'আর আমি ওঁর কাছে গিয়ে মুখ ফুটে বলব ঐ গুণ্ডাটা তোর লাভার?'

তামসী মুখ ঢাকল দু হাতে।

'এ তো তোর বড় আবদারের কথা। চোর ধরা পড়েছে তো তাকে সাজা দেয়া

যাবে না। আগুনে হাত পুড়েছে তো পারবে না জ্বালা করতে। রাজ্যে আর তোর মানুষ ছিল না ভালোবাসবার ?'

তামসী স্তব্ধ হয়ে রইল।

'টাকার দরকার মনে করিস দিতে পারি, আসামীর জন্যে মোক্তার দিতে পারিস ইচ্ছে করলে। যদিও ডিফেণ্ড করে কিছু লাভ হবে না। তার চেয়ে প্লিড গিলটিই ভালো। শাস্তি কিছু কম হতে পারে।'

'না, টাকার দরকার নেই। আমি কালই চলে যাব।' তামসী উঠে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠে তামসী বেরুলো শহরের দিকে। মোক্তারের সন্ধানে। ঐ তো, ঐ আস্তাবলের পাশে বিরিঞ্চি মোক্তারের বাড়ি, সাইন-বোর্ড আছে। হ্যাঁ, বিরিঞ্চি মোক্তার পাকা মাঝি।

কলাইয়ের বাটিতে চা নিয়ে তাতে বিস্কুট ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাচ্ছেন বিরিঞ্চি, তামসী ঘরে ঢুকল। ঘরে আর লোক নেই, শুধু একটা বুভুক্ষু ছোট ছেলে বাপের নিষ্ঠুর গ্রাস থেকে বিস্কুটের অংশ পাবার জন্যে নিস্ফল চেষ্টা করছে। আর চেঁচাচ্ছে।

একটা মুখের মধ্যে এতগুলো গর্ত থাকতে পারে আর সেসব গর্তের ধারে-ধারে এতগুলো চোখা হাড় একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এ আর তামসী দেখেনি। আর, মুহূর্তের জন্যে, কে মোক্তার কে মক্কেল বিরিঞ্চির হুঁস রইল না। সেই ফাঁকে অধ্যবসায়ী ছেলেটা মুখের থেকে বিস্কুটের শুকনো আদ্ধেকটা কেড়ে নিলে ছোঁ মেরে।

কি চাই ? চাঁদা ? আঁতুড় ঘর ? সেলাইর কল ? না, ইনসিওরেন্সের দালালি ?

'একটা কেস সম্পর্কে আপনার কাছে এসেছি।'

যতদূর দীর্ঘ করা যায় শেষ চুমুক দিয়ে বাটিটা বিরিঞ্চি ছেলের হাতে চালান করে দিলেন। বিস্কুটের গুঁড়ো-মাখানো হাতটা কাপড়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'ব্যাপার কী ? তিন শো ছেষট্টি না চার শো আটানব্বুই ?'

তামসী থমকে দাঁড়াল।

'ধারা জিগগেস করছি। কোন ধারা ? না, অদৃষ্টে শুধুই অশ্রুধারা ?'

ব্যাপারটা মোটামুটি বললে তামসী। বললে, 'না, অশ্রুধারা নয়। টাকা দেব, যত লাগে। হাজিরের তারিখটা জানুন আর একটা জামিনের ব্যবস্থা করে দিন।'

মাড়ির থেকে বিস্কুটের চর্বিতাংশ জিভের উপর আনবার জন্যে বিরিঞ্চি মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়েছিলেন দাঁতের কামড় পড়ে গেল অতর্কিতে। বললেন, 'সেই কলেক্টরের বাড়ির চোর ? কী ভয়ানক ?'

ভয়ানকটা কে, কলেক্টর না চোর, বুঝতে পারল না তামসী। বললে, 'চোর যতই

ভয়ংকর হোক, মুক্তি না পেলেও, মোক্তার তো সে পেতে পারে।'

'কিন্তু আমাকে নয়, মাপ করবেন।' বিরিঞ্চি হাত জোড় করলেন: 'জামিন দাঁড়িয়ে খাই, কলেক্টর-এস-ডি-ওর বিরুদ্ধ হতে পারব না। কালেক্টরের বাড়িতে ঢুকে চুরি করেছে, কে জামিনদারির দরখাস্ত করবে? দরখাস্ত করলেই বা কি। ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুর করবে নাকি?'

'কিন্তু তার বিরুদ্ধে তো আপিল আছে জজের কাছে।'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে এক কুড়ি চীনে হাঁস বা আঁকাবাঁকা শিং-ওয়ালা হরিণ বা অন্তত একটা দুধাল গরু দরকার। পারবেন জোগাড় করতে?'

'কিন্তু যদি তার অসুখ হয়ে পড়ে?'

'তা আর বিচিত্র নয়। পুলিশের হাতে যা মার খেয়েছে শুনেছি, কে জানে হয়তো হাঁসপাতালেই আটক আছে। তাই সরকারী ডাক্তারের শরণ নিন। ব্যথা-ট্যাথা কিছু হয়েছে বলে তাকে একবার কল্ দিন আগে। এখানে হাতে-হাতে কারবার, একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিতে কষ্ট হবে না। চমচমে সার্টিফিকেট দেখলে ম্যাজিস্ট্রেট নরম পড়বে নিশ্চয়।'

'কিন্তু তখনো তো পেশাদার জামিনদার একজন সেই মোক্তারেরই দরকার হবে। আপনি—'

'ওরে ব্বাবা, আমি নয় কিছুতেই। আমার ও-অশ্রুধারা থেকে এ-অশ্রুধারা অনেক ভালো। কখন কে কোথায় হাজির-জামিনি জব্দ করে বসে, মারা যাই আর কি। আমি কেন, কেউ এগোতে সাহস করবে না। এখানে কে চেনে আপনাদের? জামিনে ছাড়া পেয়ে আসামী যদি ভাগে তবে কে তার পিছু নেবে? আপনি যে আপনি, আপনারই বা ঠিকানা কি।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি তামসী। সত্যিই তো, ছাড়া পেয়ে কোথায় যাবে তারা, কোন গৃহচ্ছায়ায়? কোথায় তাদের আশ্রয়, তাদের অন্তরঙ্গ নির্জনতা? দুঃখের আগুন সামনে রেখে কোথায় পাবে তারা মুখোমুখি বসবার জায়গা? যদি আবার রণধীর পালায়! যদি আবার চুরি করে! সত্যি, কে নেবে তার দায়িত্ব?

তামসী হাতের ব্যাগ থেকে দুটি টাকা বের করে রাখল টেবিলের উপর। উঠে চলে গেল নিঃশব্দে।

'দু নয়নে দশ ধারা হল না, আমারই কপাল মন্দ।' বিরিঞ্চি টিপ্পনি কাটলেন।

তামসী রাস্তায় নেমে এল। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না।

এমন সময় একটি যুবক সামনে এসে দাঁড়াল। সস্মিত মুখ, বলিষ্ঠ অভয় তার আবির্ভাবে। বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন। ভোলাদা'র বাড়ি। ভোলাদা এখানকার স্বদেশী মোক্তার।'

(ক্রমশঃ)

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দুই

রুশ-বিপ্লবের উদাহরণে আমরা দেখতে পাই একটি অনুন্নত দেশ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিপ্লবের অধ্যায় স্পর্শ না করেই সাম্যবাদী বিপ্লবে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। ওটা বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়—বিপ্লবের অর্থনৈতিক পর্য্যায়ে একটি অনুন্নত দেশের এতোটা সিদ্ধি প্রশ্নাতীত নয়। ধনতান্ত্রিক বিপ্লব (Bourgeois-democratic Revolution) ধনোৎপাদনের যে অভিনব কৌশল ও উপকরণ সঙ্গে বহন করে আনে তাদের উপেক্ষা করে সাম্যবাদী ধনোৎপাদন কল্পনা করা যায় না। কাজেই অনুন্নত দেশের সাম্যবাদ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিপ্লবের অধ্যায় ডিঙিয়ে গেলেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের সাধনা ও সিদ্ধিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর তাই অনুন্নত দেশের সাম্যবাদের প্রাথমিক কাজই হয় ধনতন্ত্রের হাত থেকে সমাজের যতটুকু পাওনা ছিল, ততটুকু সমাজকে দিয়ে দেওয়া। রুশ-বিপ্লবের নায়করাও গোড়াতে তা-ই করতে চেষ্টা করেছিলেন তাই লেনিনকে বল্‌তে শুনি: "কৃষিকে পুনর্গঠন করতে পারে এমন বিরাট যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজতন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি তৈরী হবে।"[১] ট্রট্‌স্কি বলেছিলেন: "যন্ত্রশিল্প ও সংস্কৃতিতে আমরা অনুন্নত বলেই দেশে যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রবর্ত্তনের জন্যে আমাদের সুতীব্র চেষ্টা থাকা চাই—প্রত্যেকটি উপায়-উপকরণের নির্ভুল প্রয়োগ হওয়া চাই।"[২] ষ্টালিন বলেছেন: "আমাদের কাজের ভিত্তি আর মর্ম্ম হচ্ছে আমাদের কৃষি-প্রধান দেশকে যন্ত্রশিল্পে উন্নত করে তোলা—প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিজের চেষ্টায় উৎপাদন করা।"[৩]

বাজারে মাল বিক্রী করে মুনফা পাবার তাগিদে পুঁজিপতিরা প্রচুর উৎপাদনের

পক্ষপাতী আর প্রচুর উৎপাদনের তাগিদেই তাঁরা শিল্পযন্ত্রের আশ্রয় নেয়। সোভিয়েট রাশিয়া মুনফা পাবার তাগিদে প্রচুর উৎপাদন ও যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন চায়নি—তাদের উৎপাদনের প্রেরণা ছিল ব্যবহার—মুনফা নয়। সাম্যবাদী উৎপাদনের লক্ষ্যই তা-ই: উৎপাদন হবে ব্যবহারের জন্য, মুনফার জন্যে নয়। প্রচুর উৎপাদনের সহায়ক বলে যন্ত্রকে সাম্যবাদী অর্থনীতি সাদরে গ্রহণ করেছে কেননা ব্যবহারের জন্যে প্রচুর উৎপাদন সমাজের কোনো ক্ষতি করে না বরং মানুষের জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর উঁচুতে তুলে দেয়। কিন্তু মুনফার পরিবর্ত্তে ব্যবহার কথাটার সার্থকতা তখনই আছে যখন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে মুনফা অর্জ্জনের উপযোগী হয়—জন্ম নেওয়া মাত্রই কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান মুনফা অর্জ্জনের অধিকারী হয়ে ওঠেনা। বিশেষ করে অনুন্নত দেশে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাবালকত্ব প্রাপ্তি খুবই জটিল ব্যাপার। যন্ত্রোৎপাদনে অনভিজ্ঞতা, যান্ত্রিক ও যন্ত্রকুশলতার অভাব সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জীবন বিপন্ন করে তোলে। সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টাও এই বিপদ থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি। ধনতান্ত্রিক আবহাওয়ায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর শৈশব-সঙ্কট মুষ্টিমেয় মালিকের সঙ্কট হিসেবেই উপেক্ষিত হয়—কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক ও পরিচালক যেখানে রাষ্ট্র সেখানে তাদের শৈশব-সঙ্কট সমস্ত সমাজকে সঙ্কটের সম্মুখীন করে দেয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য যখন সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকের ক্রয়শক্তির এলাকায় নেমে এলনা তখন এ-অবস্থাটাকে স্বাভাবিক মনে করতে না পেরে একদল বলশেভিক বলেছিলেন যে এ হচ্ছে ট্রট্স্কিপন্থীদের কূটকৌশল—যন্ত্রশিল্পকে নষ্ট করবার ফিকির।[৪] উত্তরে ট্রট্স্কি বলেছিলেন: যে পরিমাণে দ্রব্য তৈরী হচ্ছে তা অকিঞ্চিৎকর, তার উপর তার দাম যদি নীচুতে নামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রশিল্পের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ক্ষতি হবে।[৫] প্রাথমিক অবস্থায় যন্ত্রশিল্পের এই অপরিণত উৎপাদনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর—এবং প্রতিষ্ঠানের আয় দিয়ে যদি তার ব্যয়-নির্ব্বাহ করতে হয় তাহলে অভিজ্ঞ লোকমাত্র স্বীকার করবেন যে সেই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য খুসীমাফিক নীচুতে নামিয়ে আনা যায়না। যন্ত্রোৎপাদনের নিজেরও একটা নিয়ম আছে, সে-নিয়মের ব্যতিক্রমে তার দেহ দুর্ব্বল হ'তে সুরু করে। রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার এই দৌর্ব্বল্যের দাওয়াই সরবরাহ করে যেতে পারে—কম দামে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রী করে আয়ের শূন্যঘর খয়রাত দিয়ে রাষ্ট্রই আবার পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটা চুকেবুকে যায় না। তখন রাজকোষেই ঘাটতি দেখা দেয়—আর সেই ঘাটতি পূরণ করতে রাষ্ট্র ঋণের জন্যে জনসাধারণের দ্বারস্থ হয়। জনসাধারণ সুলভে রাষ্ট্রোৎপাদিত মাল পায় বটে কিন্তু রাষ্ট্রের-মহাজন-হবার-সান্ত্বনাপত্র হাতে নিয়ে আয়ের খানিকটা অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রের এই ঋণমুক্তির বা

ঋণের সুদ যোগাবার আশা আছে তখনই যখন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রশিল্প প্রচুর উৎপাদন করেই মুক্তি পাবে না, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রী করে মুনফা টেনে আন্‌বে। আর সেখানে গিয়ে অবস্থাটা দাঁড়াবে—ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন নয়, মুনফার জন্যে উৎপাদন, ধনতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন যে-অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়।

যন্ত্রশিল্পকে নিজের নিয়মে সোজা পথে চল্‌তে না দিয়ে যদি গোড়াতেই সমাজতন্ত্রের পাহারায় এই বাঁকা পথে চালিয়ে নেওয়া যায় তাহলে সে ধনতন্ত্রের হাতিয়ারের মতোই কাজ করতে সুরু করে। ওয়েবদম্পতীর বই-এ যখন দেখ্‌তে পাই সোভিয়েট রাষ্ট্র ঋণের জন্যে শতকরা আট টাকা সুদ দিচ্ছে তখন বলা যায় যে সেখানকার যন্ত্রশিল্প বাঁকা পথে চলে মুনফা টান্‌তে বাধ্য হচ্ছে। সুদের টাকা যন্ত্রশিল্পের মুনফা দিয়েই তৈরী। ঘুরিয়ে বল্‌তে হলে অবশ্য হুভারের এ কথাও বলা যায়ঃ "পরের বছর শ্রমিকদের যে-টাকাটা সুদ বাবদ দেওয়া হয় শিল্পের আয় থেকে তা তুলে না নিলে সে-পরিমাণ টাকা তারা বেতনবৃদ্ধি হিসেবেই পেতে পারত!"[৬] এই ছদ্ম বেতন-কর্ত্তনকে বিশুদ্ধ শোষণ বা মুনফা বল্‌তে আমাদের আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু সাম্যবাদের দরবারে এ ধরণের আপত্তি টিঁক্‌তে পারে না।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে উৎপাদনে ধনতান্ত্রিক বিপ্লব আনবার প্রকৃষ্ট প্রয়াস দেখা যায় লেনিন-প্রবর্ত্তিত নব্যঅর্থনীতিতে (New Economic Policy অথবা NEP)। 'নেপে'র উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী মূলধন পাওয়া এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন করা। তাছাড়া শ্রমিকরাষ্ট্রের পাহারায় ধনতন্ত্রের খানিকটা পুনরুজ্জীবনও এই নীতি বরদাস্ত করতে চেয়েছিল। আশা ছিল ধনতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়ক হবে। শ্রমিকরাষ্ট্রের এ আশা যে পূর্ণ হয়নি তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র ধনতন্ত্রের অঙ্কুরও গজিয়ে উঠে উৎপাদনযন্ত্রটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে বস্‌ল। অনুন্নত দেশের শিল্প-শ্রমিক সাধারণত যন্ত্রবিশারদ হয় না—জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠন করবার জন্যে তাই জারআমলের এঞ্জিনিয়ার ও সুদক্ষ যান্ত্রিকদের উপরই শ্রমিকদের নির্ভর করতে হয়েছিল। তাদের উচ্চবেতন, বিশেষ সুবিধা, কারখানার খানিকটা আধিপত্য প্রভৃতির লোভ দেখিয়েই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। ধনতন্ত্রের এই পোষ্যের দল নিজেদের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রমিকরাষ্ট্র উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেনি বটে কিন্তু যন্ত্রকুশল শ্রমিক ও সাম্যবাদী কর্ম্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে মিলে মিশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করে নিয়েছে।

ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের সহজাত উৎপাদন-প্রাচুর্য্য সাম্যবাদের আওতায় তৈরী করতে গিয়ে অনুন্নত রাশিয়া যন্ত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমি তৈরী করল 'নেপ-ম্যান' বা ধনতন্ত্রের বীজাণুবাহী একদল লোক ঠিক তেমি কৃষির ক্ষেত্রে 'কুলক' বা সমৃদ্ধ কৃষকদের গা ঘেঁষেই

তাকে দাঁড়াতে হল। কৃষি-দ্রব্য উৎপাদনে 'কুলক'দের সর্ব্বাধিক দক্ষতাই তখন শ্রমিকরাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে বিবেচ্য বলে মনে হয়েছিল। শস্য-উৎপাদনে 'কুলক'দের দক্ষতা অনস্বীকার্য্য। দেখা যায় ১৯২৭-এ 'কুলক'রা উৎপাদন করত ৬০ কোটি 'পুড' শস্য আর ১৯২৯-এও যৌথকৃষিকেন্দ্রগুলো আর রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিত ভাবে উৎপাদন করেছে মাত্র ৪০ কোটি 'পুড' শস্য।[৭] সমৃদ্ধ কৃষকরা শ্রেষ্ঠ উৎপাদক বলে রাষ্ট্র থেকে সবরকম সুযোগ ও সুবিধা লাভ করতেও সুরু করল। অবশ্য একসময় আবার এই কুলককূল রাষ্ট্রের পেষণেই দলিত হয়েছে কিন্তু মরবার আগে তারা রাশিয়ার কৃষির অবস্থা এমন শোচনীয় করে তুলেছিল যার ফলে ১৯৩২-৩৩এর দুর্ভিক্ষ রাশিয়ার দুইলক্ষ জীবন মুছে নিয়ে গেল।[৮] দুইলক্ষ লোকের উপবাস-মৃত্যু দিয়ে উৎপাদন-বৃদ্ধির মূল্য দিতে হল।

সাম্যবাদের আওতায় অনুন্নত দেশে শিল্পবিপ্লব ও উৎপাদনবৃদ্ধি করতে গেলে ধনতন্ত্রের কাছাকাছি সরে আসা যেমন অনিবার্য্য তেমনি অনিবার্য্য সেখানকার শাসকদলের মধ্যে মতবিরোধিতা। বলশেভিক দলের কর্ণধাররা লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো একটি বিশেষ পথ একযোগে সমর্থন করেন নি। বিরোধী বামপন্থী দলের নেতা হিসেবে ট্রট্স্কি সুপরিকল্পিত যন্ত্রশিল্পের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে চেয়েছেন—দরিদ্র চাষীদের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করেছেন—এবং 'নেপ-ম্যান' ও 'কুলকে'র উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিতে বলেছেন; কার্য্যকরী কেন্দ্রীয় সমিতির নেতা ষ্টালিন কৃষির দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়ে চলেছেন, কুলকদের আগে প্রশ্রয় দিয়ে পরে উচ্ছেদ করেছেন; দক্ষিণপন্থী দলের নেতা বুখারিন 'নেপম্যান' ও 'কুলকে'র অবাধ প্রশ্রয় সমর্থন করেছেন—তাঁর এমনও ধারণা ছিল যে 'কুলক'রা একদিন সমাজতন্ত্রবাদী হয়ে যাবে। এই বিরোধ যে পরস্পর দোষারোপ, নির্ব্বাসন এবং হত্যালীলায় পরিণতি লাভ করেছিল তা সর্ব্বজনবিদিত। সোভিয়েট রাশিয়ার ধনোৎপাদনের মত ও পথ নিয়ে বলশেভিক নেতাদের এই যে দলাদলি তার মূলে দেশের অনগ্রসরতার ছবিটিই উঁকি দেয়। একটি অনগ্রসর দেশ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যে পথে অগ্রসর হতে পারত—সাম্যবাদী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর তার আর সে পথে যাবার উপায় ছিলনা। রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্যবাদী রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকাতেই বিপ্লবোত্তর উৎপাদন ব্যবস্থা একটি জটিল ও বিঘ্নসঙ্কুল পথ ধরে চলেছে। উৎপাদন-প্রাচুর্য্যের জন্যে ধনতন্ত্রকে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েও তাকে প্রবেশ-পথ দেওয়া হবে না—সাম্যবাদের আসনে বসে ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের সাধনা করতে হবে—এ-পথ সত্যি ক্ষুরধার এবং দুর্গম। সোভিয়েট রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লবের সর্ব্বাঙ্গীন জয় হোক এ কামনা হয়ত প্রত্যেক

বলশেভিক নেতার মনেই ছিল, মূল আদর্শের রঙ কারো মনেই ম্লান হয়ে যায়নি কিন্তু অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা এমনি জটিল যে তার জট খুলে সমস্ত সূত্রগুলো পরিচ্ছন্ন করে সোজা সাম্যবাদের দিকে চালিয়ে নেওয়া অসাধ্য।

তবু, যতো বিলম্বেই হোক তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়া শিল্পোন্নতির পথে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা অর্জ্জন করা তার পক্ষে কোনো সময়েই সম্ভব হয়নি আর তার উপর গত যুদ্ধ তার শিল্পশক্তিকে গুরুতরভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে। রাশিয়ার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (যা সম্পূর্ণ হবে ১৯৫০-এ) লোহা আর ইস্পাত তৈরীর পরিমাণ সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১৯'৫ মিলিয়ন টন ও ২৫'৪ মিলিয়ন টন—অথচ ১৯৪২-এতেই রাশিয়ায় লোহা তৈরী হয়েছিল ২২ মিলিয়ন টন, ইস্পাত তৈরী হয়েছিল ২৮ মিলিয়ন টন। লোহা আর ইস্পাত উৎপাদনে এই অবনতি রাশিয়ার মৌলিক যন্ত্রশিল্পের অবনতিই নির্দ্দেশ করে। শুধু তাই নয়। পরিকল্পনায় দেখা যায় কাগজ, সূতোর কাপড়, পশমী কাপড়, জুতো—এ প্রত্যেকটি জিনিষই ১৯৪২-এর চেয়ে ঢের কম তৈরী হবে। সমস্ত সোভিয়েট রাশিয়া জুড়ে তৈরী হবে ২৪০ মিলিয়ন জোড়া জুতো—যুদ্ধপূর্ব্ব বৃটেনে এর দ্বিগুণ পরিমাণ জুতো তৈরী হত এবং বৃটেনের যুদ্ধোত্তর শিল্পদ্রব্য রপ্তানির পরিকল্পনাও যুদ্ধপূর্ব্ব রপ্তানির পরিমাণের দেড়গুণ। ব্রিটেনও যুদ্ধবিধ্বস্ত হয়েছে কিন্তু তার উৎপাদন ক্ষমতা সোভিয়েট রাশিয়ার মতো পঙ্গু হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়ার যন্ত্রোৎপাদনের এই ঘাটতির মূলে যে-যে অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান তা সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়।

তাছাড়া সোভিয়েট কৃষিকেন্দ্রগুলো সম্বন্ধেও 'প্রাভদা'-তে সম্প্রতি যেসব খবর প্রকাশিত হচ্ছে তাও খুব সুখবর নয়। ৪ঠা জুলাই-এর প্রাভদা খবর দিচ্ছে, "ক্রাসনোইয়ার্স্ক অঞ্চলে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীর নৈতিক অধঃপতন ও অপরাধের খবরে দলীয় প্রাদেশিক সমিতির অবাক হবার কিছু নেই—তারা বিতাড়িত হয়েছে এবং বিচারাধীন আছে। ১৯৪৪-এ যৌথকৃষিকেন্দ্রে তহবিল তছরুফের কয়েকটি ঘটনা হয়েছিল।" এ খবরে আমরাও খুব বেশি অবাক হইনি, কিন্তু এ ছাড়াও কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রে, অষ্ট্রাখান অঞ্চলে, ভোলগা-কাস্পিয়ান মৎস্য-কেন্দ্রে যৌথসম্পত্তি অপহরণের আরো কয়েকটি খবর যখন প্রাভদাই প্রকাশ করে যাচ্ছে তখন আর ব্যাপারটাকে লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। সামাজিক সম্পদ আত্মসাৎ করবার অপরাধের জন্যেই ধনতন্ত্র অপরাধী আর সেই অপরাধবৃত্তি থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পদস্থ কর্ম্মীরাই মুক্ত নয়! ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয়ের লোভ তাদের মনে এতো-খানি নিম্নগামী যে চুরির মতো অপরাধেও তারা লিপ্ত হয়! সাম্যবাদের সংগঠনকারীদের মনেই যখন সাম্যবাদের আদর্শ মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তখন অনুন্নত দেশের অনুন্নত

জনসাধারণ যে সাম্যবাদের আদর্শে আবদ্ধ থাকবেনা তা সহজেই অনুমান করা যায়। যৌথকৃষিকেন্দ্রের সাধারণ চাষীদের বহু দুষ্কৃতির খবরই 'প্রাভদা' প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে: "ক্ষেত থেকে ফসল কেটে যৌথকৃষিকেন্দ্রের গোলায় বা রাষ্ট্রভাণ্ডারে আনবার পথে প্রত্যেক পদে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।"—(প্রাভদা ৬ জুলাই)। তার মানে চাষীরা রাষ্ট্রের গোলায় নিয়ে শস্য মজুত করতে অনিচ্ছুক এবং প্রাভদা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করছে: "এ সব ব্যাপারকে সোভিয়েট বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।" তারপর ভোরোশিলভস্ক অঞ্চলের যৌথকৃষিকেন্দ্রের চাষীরা যৌথকৃষিকেন্দ্রের খড় গাদায় তুলে আনছে না, নিজেদের ক্ষেত-খামার নিয়েই তারা ব্যস্ত—কিম্বা ষ্টাভরোপোলের হাটে গিয়ে গুলতানি করে বেড়াচ্ছে (প্রাভদা ৬ জুলাই)। ৫ জুলাই-এর প্রাভদা বলছে আলতাই যৌথ-গোপালনকেন্দ্রে দুগ্ধউৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হয়ে চলেছে, যৌথপ্রতিষ্ঠানের বাইরেও গোপালন চলতে সুরু করেছে বলেই এ অবস্থা। প্রাভদার এ খবরগুলো সোভিয়েট কৃষিনীতির একটি শোচনীয় পরিণতির চিত্র আমাদের চোখের উপর তুলে ধরে। সাম্যবাদ যদি কৃষকের স্বার্থরক্ষায়ই বেশি তৎপর হয়ে ওঠে তাহলে সাম্যবাদের নিজের সার্থকতা রক্ষা চলেনা। উচ্ছেদের পরও আবার 'কুলকে'র জন্ম হয়। ব্যক্তিগত মুনফা ও মালিকানার মোহে কৃষকমন ওতোপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন—যৌথমালিকানার যুক্তি সে মন সহজে গ্রহণ করতে চায় না। সমৃদ্ধির সামান্য স্পর্শেই কৃষকমনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঊর্দ্ধমুখী হয়ে উঠতে চায়। যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়ার চাষীসম্প্রদায়ের হাতে অগাধ সম্পদ জড় হয়েছে—তার প্রভাব যে তাদের মন থেকে সাম্যবাদের প্রভাব উচ্ছেদ করবে তাতে আর সন্দেহ কি?

১। Lenin, Vol XVIII Chap. I.
২। Stalin's Address on the 14th Party Congress (1925)
৩। The Real Situation in Russia—by Trotsky.
৪। History of the Communist Party of the Soviet Union.
৫। The Real Situation in Russia.
৬। Dictotors and Democracies—by C. B. Hoover.
৭। History of the Communist Party of the Soviet Union.
৮। Conquest of Power—Vol. 2.—by A. Weisbord.

অপঘাত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেথুনের বাস গলির মোড়ে এলেই সোজা বাইরের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে সঞ্জীব। তার উৎসুক চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে গলিটার দিকে—এখনি প্রজাপতির মতো ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে নমিতা। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো এক টুকরো মেয়ে। ঠিক ফুল নয়, ফুলের পাপ্‌ড়ি। সঞ্জীবের কাব্য করে বলতে ইচ্ছে করে যেন বসন্তের কুঞ্জবন থেকে দক্ষিণা বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে এল।

আর কাব্য করবার মতো মেয়েই বটে। রাজেন্দ্রাণীর মতো দেহশ্রী। সবুজ রঙের রেশমী ফিতে জড়ানো কালো বেণীটি পিঠের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে। কপালে ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপ। দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ—যে শাড়ী যে ব্লাউজটি পরে, সেইটেই যেন অদ্ভুত ভাবে শরীরের ছন্দের সঙ্গে মিশে যায়। নিজের মনে মনেই আবৃত্তি করে সঞ্জীব: 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল'—

মুনিদের ধ্যান ভাঙুক আর নাই ভাঙুক—সঞ্জীবের যে ধ্যানভঙ্গ হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। তা ছাড়া সন্ন্যাসীও সে নয়। উর্বশী-মেনকা না হলে যে চিত্ত-বিকার ঘটবেনা এমন কোনো কঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রতও সে পালন করছে না। অধিকন্তু উর্বশী যদি জুটেই যায় তা হলে সে যে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতোই ভেসে যাবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

না—অসভ্য অভদ্র নয় সঞ্জীব। চোখের দৃষ্টি রাক্ষসের মতো উদগ্র-প্রখর করে তুলে সে সশরীরে নমিতাকে উদরস্থ করতে চায়না, জুতোটাকে সজোরে ঠুকে ঠুকে শিস্ দিয়ে নমিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো রুচি-বিকারও তার ঘটেনি। দু চারটে শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্য অথবা প্রেম-জর্জরিত হৃদয়ের আগ্নেয়গিরির থেকে অগ্ন্যুৎপাতের মতো চটুল গানের উৎপাত করে সে নিজের পৌরুষ প্রতিপন্ন করতে চায়না। সে শিক্ষিত—মেয়েদের স্বাভাবিক সম্মান রাখবার মতো সহজ ভদ্রতাবোধটুকু তার আছে। কিন্তু বেলা সাড়ে দশটার সময় বেথুন কলেজের বাস থেকে পরিচিত হর্ণটা শোনবামাত্র তার ভেতর কী একটা যে ঘটে যায় কে জানে। যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই ছুটে বেরিয়ে আসে, দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক কাতর দৃষ্টি মেলে। রাণীর মতো লঘুছন্দে আসে নমিতা, কপালে কাঁচপোকার

টিপটি জ্বলজ্বল করে, পিঠের ওপর সবুজ ফিতে জড়ানো কালো বেণীটি দোলা খেতে থাকে, আর তারই তালে তালে দোলে সঞ্জীবের হৃৎপিণ্ড।

মাত্র দু মিনিট থেকে আড়াই মিনিট সময়। এরই ভেতরে সঞ্জীবের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি ধরা দিয়ে মিলিয়ে যায় সমস্ত দিনটির জন্যে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরী হয়, কখন নমিতা আসে সঞ্জীব জানেনা। শুধু ওই একটিবার দেখা—ওই দেখাটুকুর ভেতরেই যেন মনের পাত্রটি তার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নমিতা কখনো তাকে লক্ষ্য করে কিনা কে জানে। দু চারদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে, কিন্তু তার ভেতরে কোনো পরিচয়ের আভাসমাত্র নেই। তার দৃষ্টি নিরাসক্ত, নির্বিকার। হয়তো পথে-ঘাটে চলা-ফেরার প্রতি মুহূর্তে পুরুষের দৃষ্টিবাণ ভোগ করতে হয় বলেই এই নিরাসক্তিটা আয়ত্ত করে নিতে হয় মেয়েদের। ট্রামে যেতে যেতে যেমন ঘর-বাড়ি গাড়ি-ঘোড়া কতগুলো অর্থহীন ছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়, নমিতার কাছে তার চাইতে বেশি কিছু মূল্য নেই সঞ্জীবের। একটা ল্যাম্পপোষ্ট্ অথবা ট্রাম-ষ্ট্যাণ্ডের সংকেত-লিপি।

তবু সঞ্জীব হতাশ হয়না। যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু লাভ। রূপের তীর্থ দুয়ারে ভিখারী হয়ে থেকেই সে খুশি—একটি কটাক্ষের প্রসাদও যদি না মেলে তবে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। যেটুকু সে পায়, সেটুকুকে আশ্রয় করেই বহু শূন্য মুহূর্ত নানা বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনায় ভরে তোলে সঞ্জীব,—অতন্দ্র রাত্রি আমন্থর হয়ে ওঠে কল্পনার জাল বুনে।

শেষ পর্যন্ত কথাটা কানে গেল বন্ধু পরিমলের।

পরিমল চিরকালই একটু বেপরোয়া। কলেজে যতদিন পড়েছে, সহপাঠিনীদের ততকাল সে জ্বালিয়ে মেরেছে। মেয়েদের পিছু নেওয়া তার বাতিকের মতো ছিল। গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে, সুবিধে না হলে টেলিফোনে পরিচয় জমাবার প্রয়াস পেয়েছে। কালি ঢেলে রেখেছে মেয়েদের বেঞ্চে, গোবেচারা অধ্যাপকের ক্লাশে চিঠি ছুঁড়েছে মেয়েদের লক্ষ্য করে। আর লিখেছে হাজারখানেক প্রেমপত্র—গর্ব করে নিজের অজস্র প্রেমকাহিনীর গল্প বন্ধু-বান্ধবদের শুনিয়েছে। সঞ্জীব পরিমলকে যে কোনোকালে খুব অনুরাগের চোখে দেখেছে তা নয়; কিন্তু এই ডন-জুয়ানটির নানা অভিজ্ঞতা সঞ্জীবকে খানিকটা সশ্রদ্ধ করেছে তার সম্পর্কে।

এ হেন দিক্‌পাল পরিমল সঞ্জীবের অসহায় প্রেমের কাহিনীটা শুনতে পেল একদিন।

ঠোঁটের কোণে পাইপ্ আঁকড়ে ধরে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে দর্শন দিলে পরিমল। বললে, তুই একটা গাধা!

—হঠাৎ।

—হঠাৎ কিরে। প্রেমেই যদি পড়েছিস তাহলে অমন ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়াচ্ছিস কেন? লেগে যা বুক ঠুকে।

—কী করব?

—এগিয়ে যা, বল্, তোমাকে আমি চাই।

সঞ্জীব বললে, যাঃ!

—যাঃ, কেন?

—যদি বলে আপনি আমাকে চাইতে পারেন, কিন্তু আপনাকে আমি চাই না?

—হুঁঃ!—মুখে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলে পরিমল: আরে রাখ! ওদের এখনো চিনিসনি। প্রেমে পড়বার লোভ পুরুষের চাইতে ওদের ঢের বেশি, ফাঁদে পড়বার জন্যে পা বাড়িয়ে আছেই সারাক্ষণ। শুধু লজ্জায় বলতে পারেনা।

সঞ্জীব চুপ করে রইল। কথাটা সে বিশ্বাস করতে রাজী নয়, বিশ্বাস করা একান্ত অসম্ভব তার পক্ষে। রাণীর মতো দেহসৌষ্ঠব নমিতার। কপালের ময়ূরকণ্ঠী টিপটিতে যেন মণি-মুকুটের দীপ্তি। শান্ত-সুন্দর মুখে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মতো আশ্চর্য মনোরম কমনীয়তা। সেই মেয়ে এত সহজেই সঞ্জীবের প্রেম-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-সমর্পণ করে বসবে, নমিতাকে এত সুলভ বলে সে কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু পরিমল থামল না। অনর্গল বকে গেল সে, অশ্রান্তভাবে অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করে গেল। কতগুলো অশ্লীল রসিকতা করে গেল সহজ স্বচ্ছ গলায়। নর-নারীর সম্পর্কের রোমান্স্‌হীন একটিমাত্র শারীরিক রূপকেই সত্য বলে জেনেছে পরিমল। ফ্রয়েড্, লিণ্ড্‌সে, মারী ষ্টোপ্‌স আর হ্যাভেলক এলিসের বাছা বাছা উদ্ধৃতির একটা জীবন্ত এবং প্রগল্‌ভ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

বিশ্রী বিরক্তি বোধ হচ্ছিল সঞ্জীবের। ইচ্ছে করছিল ঘাড় ধরে বার করে দেয় এই বর্ব্বরটাকে, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। নিজে খানিকটা দুর্বলচিত্ত বলেই সে ভয় করে তার শত্রুতাকে। যখন তখন যা তা স্ক্যাণ্ডাল্ রটিয়ে বেড়াতে পারে—যেখানে সেখানে যা খুশি বলে আসতে পারে তার নামে। পরিমলের অসাধ্য কাজ নেই কিছু।

ওঠবার সময় পরিমল উদারকণ্ঠে বললে, তোর জন্যে ভারী সহানুভূতি বোধ হচ্ছে। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

সঞ্জীব শঙ্কিত হয়ে উঠল। ত্রস্ত স্বরে বললে, যাক্ ভাই, তোকে কিছু করতে হবেনা। পাড়ার মেয়ে, শেষকালে—

চুরুটের একরাশ ধোঁয়া সঞ্জীবের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পরিমল বললে, থাম,

থাম। পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ কেন বাবা? আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবেনা, দাড়ি গজাবার আগে থেকে এসব করে আসছি। কত ধানে কত তুঁষ বেরোয় তা আমার জানা আছে।

হরিণের চামড়ার চটিটাকে ভঙ্গি ভরে টেনে নিয়ে বেড়িয়ে গেল পরিমল।

সঞ্জীব বসে রইল বিমর্ষ মলিন মুখে। হতভাগা পরিমল কী কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসবে কে জানে। আর লোকটাও আশ্চর্য—টের পেলো কী করে। হাওয়ার মুখে খবর পায় নাকি। প্রতিভাটাকে এদিকে নিয়োজিত না করে কোনো ভালো কাজে লাগালে এতদিনে একটা মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারত পরিমল। কিন্তু ভাগাড় ছাড়া কোনো কিছু আর ওর নজরে পড়বেনা কোনোদিন।

নমিতা। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সঞ্জীব। কালো আকাশে তারার দীপালি জ্বলছে। নীচে হ্যারিসন রোড দিয়ে ট্র্যাফিকের গর্জন, ট্রামের ঘন্টির শব্দ। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে পাশের বাড়ির রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজছে—অন্তত ওই গানের ঝঙ্কারটা এসে রণিত হচ্ছে সঞ্জীবের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

নমিতা। শুধু পাড়ার মেয়ে নয়—সত্যশরণ চাটার্জির মেয়ে। সত্যশরণবাবু এ অঞ্চলের স্বনামধন্য অ্যাড্‌ভোকেট, এম-এল-এ, নাম করা কংগ্রেস নেতা। তাঁর ওখানে দন্তস্ফুট করা সঞ্জীবের পক্ষে কোনোদিন কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, তা ছাড়া—

সব চাইতে বড় বাধা সেইখানেই। সঞ্জীবের জীবিকার পরিচয় আজকের দিনে খুব গৌরবের ব্যাপার নয়। কলকাতা পুলিশের সে সাব-ইন্‌স্পেক্টার। হাজার হাজার বিদ্রোহী ছেলেমেয়ের বুকের রক্তে রাঙানো রাজপথ তাকে বুটের নীচে মাড়িয়ে যেতে হয়। ছাত্র-মিছিলের সামনে রিভলভার বাগিয়ে ধরে তাকে পথরোধ করতে হয়। সেখানে মনুষ্যত্বের প্রশ্ন নয়, নিজের বিবেক বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা সম্ভব নয় সেখানে। বিদ্যা আছে সঞ্জীবের বুদ্ধিও আছে। কিন্তু সত্যশরণ চাটার্জির মেয়ের কাছে একটা নেড়ী কুকুরের মূল্যও তার ঢের বেশি। ওদের জগতে সঞ্জীব অস্পৃশ্য, সে চণ্ডাল।

জানলার বাইরে আকাশে অজস্র তারা। নমিতা চিরকাল ওই নক্ষত্রগুলোর মতোই দুরধিগম্য থাকবে তার কাছে। ওই রেডিয়োর গানের মতোই সুর হয়ে তার মনের মধ্যে ধরা দেবে, সত্য হয়ে আসবেনা কোনোদিন। আচ্ছা, চাকরীটা ছেড়ে দেবে সঞ্জীব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় দেশে বাপ-মা, ভাই-বোন—তার চাকরীর ওপরে সমস্ত পরিবারটা নির্ভর করে আছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিলে সঞ্জীব। টেবিলের টানা থেকে বার করে আনলে

রিভল্‌ভারটা। ওইটে দিয়েই তাকে একদিন আত্মহত্যা করতে হবে নাকি! আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে— আজো সারারাত তার ঘুম আসবেনা।……

কিন্তু পরিমল নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলনা। এল দিন তিনেক পরেই। কাঁধে ষ্ট্রাপে ঝোলানো একটা ক্যামেরা। সোল্লাসে বললে, এগিয়েছি—মাভৈঃ!

কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হলনা সঞ্জীবের। সে শুধু তাকিয়ে রইল বিমূঢ় দৃষ্টিতে।

—সত্যি তোর টেষ্ট্ আছে মাইরি। চমৎকার মেয়েটা। ছবিখানা যা এসেছে—

—ছবি!

—আল্‌বৎ ছবি। এই নে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখ। আপাতত এটা তোর সান্ত্বনার ব্যবস্থা হল। তারপর শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পন্থা—

পকেট থেকে এন্‌ভেলপ বাড়িয়ে দিলে পরিমল। আশ্চর্য, নমিতার ছবি! বুকের কাছে বই আর ভ্যানিটি ব্যাগ্ আঁকড়ে ধরা। বিস্মিত দৃষ্টিতে অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

—পেলি কী করে?

—অত্যন্ত সহজে। সামনে দাঁড়িয়ে বাইশ নম্বর বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস্ করলুম, তারপরেই ক্লিক্!

—কিছু বললে না?

—বলবে আবার কী? কাঁচা ছেলে পেয়েছিস আমাকে! টের পাওয়ার আগেই হাওয়া!

সঞ্জীব তেমনি বিমূঢ় ভাবে বসে রইল।

—মাইরি, তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে! ছবিটার একটা কপি আমারও অ্যাল্‌বামে রেখে দেব। তুই যখন পছন্দ করেছিস, তখন আর ওতে নজর দেবনা, নইলে—

একটা বীভৎস রকমের অশ্লীল মন্তব্য করে তীক্ষ্ণ শব্দে পরিমল হেসে উঠল। আর সেই মুহূর্তে কেমন একটা বিশ্রী বিপর্যয় ঘটে গেল সঞ্জীবের মাথার ভেতরে। আর্তনাদ করে সে দাঁড়িয়ে উঠল, ছবিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলে বাইরে, একটান দিয়ে আছড়ে ফেললে পরিমলের ক্যামেরাটা। চীৎকার করে বললে, রাস্কেল, বেরো, বেরো এক্ষুনি—গেট্ আউট্!

—ব্যাপার কিরে।

—চুপ! আর একটা কথা বলেছিস কি সামনের দাঁতগুলো উড়িয়ে দেব। গেট আউট—

সঞ্জীবের আগ্নেয় চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে লাথি খাওয়া কুকুরের মতো পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে গেল পরিমল। দরজার বাইরে থেকে চাপা গর্জনের মতো তার একটিমাত্র কথা শোনা গেল : শালা!

তারপর—তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

মনের দিক থেকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছে সঞ্জীব। অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে ঘুরে চলেছে সময়টা কোথাও অপেক্ষা করছে না—অপেক্ষা করছেনা সঞ্জীবের শিথিল অবসন্নতার। তাকে বাদ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা, তার রিভলভারকে উপেক্ষা করেই আসছে আন্দোলনের পরে আন্দোলন। ২১শে নবেম্বর চলে গেল, চলে গেল আর-আই-এন্-ডে, তারপরে ষ্ট্রাইক। সত্যশরণবাবুর সঙ্গে ব্যবধানের সীমারেখাটা আরো বেশি বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে সঞ্জীবের। সুদূর নক্ষত্রের মতো নমিতা—মাটি থেকে একটা নক্ষত্রের দূরত্ব কত? আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, সেই নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে যদি আলো আসতে হাজার বছর সময় লাগে, তা হলে—

সঞ্জীব কিছু ভাবতে চায়না, ভাবতে ভুলেও গেছে। আরো একটা বছর কেটে গেল। নমিতা বোধ হয় থার্ড ইয়ারে পড়ে এবারে। রঙীন শাড়ী ছেড়ে আজকাল খদ্দরের শাড়ী ধরেছে, মাঝে মাঝে গান্ধীটুপি পরে কলেজে যায়। সুদূরের তারাটা ক্রমেই দুনিরীক্ষ্য হয়ে উঠছে। আরো কিছুদিন পরে একেবারে হারিয়ে যাবে দৃষ্টির বাইরে। আকাশে যে রক্তমেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তারই আড়ালে নিশ্চিহ্ন ভাবে যাবে মিলিয়ে।

কিন্তু চাকরী ছাড়তে পারবেনা সঞ্জীব। বাপ মা, ভাইবোনের মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তার রোজগারের ওপরেই নির্ভর করছে সংসার। হাতে তার যত রক্ত মাখাই থাক—সেই রক্তমাখা টাকাতেই চলবে দিনগত পাপক্ষয়ের শোচনীয় আত্ম-অবক্ষয়। কিন্তু ওই রক্তাক্ত হাতে নমিতার শুভ্র খদ্দরের শাড়ীকে সে কখনো স্পর্শ করতে পারবেনা, শুধু সে মুঠোয় তার রিভলভারটাকেই নিষ্ঠাভরে আঁকড়ে রাখতে পারবে!

সেদিন বিকেলে থানার থেকে বাড়ি ফিরছিল সঞ্জীব।

কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেই তাকে থেমে পড়তে হল। ছাত্র-ছাত্রীর বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে একটা। ডাক-ধর্মঘটীদের দাবীতে পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছে তারা।

নির্নিমেষ চোখে সঞ্জীব তাকিয়ে রইল। বাংলার যৌবন-শক্তি। নানা পতাকার আশ্চর্য সমন্বয়ে সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ওদের চোখেমুখে জীবনের সজীব উন্মাদনা—ওদের কণ্ঠস্বরে আগামী ঝড়ের সংকেত—সেই ঝড়—যার আসন্ন সম্ভাবনার প্রেতচ্ছায়া দুঃস্বপ্নের মতো এসে পড়েছে সঞ্জীবের চেতনার ওপরে। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস

নেই সঞ্জীবদের—শুধু পরের অস্ত্র হাতে নিয়ে উন্মাদের মতো, অন্ধের মতো ওদের ওপর আঘাত করতে পারে এবং অপেক্ষা করতে পারে সেইদিনের জন্যে—যেদিন এই অস্ত্র ফিরে এসে দ্বিগুণ বেগে প্রতিঘাত করবে।

সিগারেটটা ঠোঁটের কোনে কামড়ে ধরে তাকিয়ে রইল সঞ্জীব। না, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং ওদের মধ্যে নমিতাকে না দেখলেই সে বিস্ময়বোধ করত। সত্যশরণ বাবুর মেয়ে, তিনপুরুষ ধরে জেল খেটে আসছে ওরা, নমিতার বড়দা মারা গেছে আন্দামানে। হয়তো নমিতাও তৈরী হচ্ছে জেল খাটবার জন্যে, আন্দামানের জন্যে, লাঠি আর বন্দুকের গুলির জন্যে। সেইটেই স্বাভাবিক—সেইটেই অনিবার্য। দুর্লক্ষ্য নক্ষত্রটির ওপর রক্তমেঘের ছায়া আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে, রেডিয়োর গানটা হারিয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনের মধ্যে।

চমৎকার লাগছে নমিতাকে। এতদিনে সঞ্জীব তাকে দেখতে পেলো তার সত্যিকারের পরিবেশের ভেতর। শুভ্র সুডোল হাতে পতাকাটি তুলে ধরেছে, রোদে রাঙা হয়ে গেছে অপরূপ কোমল মুখখানা, অসংবৃত অলকগুচ্ছ খেলা করছে গালে-কপালে। রোজ সাড়ে দশটায় কাঁচপোকার টিপ পরে, দীর্ঘ নিবিড় বেণী দুলিয়ে লঘুচ্ছন্দে যে মেয়েটির বেথুনের বাসে এসে ওঠে, তার সঙ্গে এর কোনোখানে এতটুকুও মিল নেই। ছোট একটি প্রদীপের শিখা যেন মশালের আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে এখানে—সঞ্জীবের ঘর তা আলো করবে না, অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দেবে বরং।

—শেম্—শেম্—

সঞ্জীব চমকে উঠল। তাকেই লক্ষ্য করে বলছে ওরা। শেম্ শেম্। তার পরণে ইউনিফর্ম, তার কোমরে রিভলভার। টুপিতে রাজটীকা জ্বলজ্বল করছে। কোনখানে আত্ম-গোপন করবার একবিন্দু অবকাশ নেই। সঞ্জীবের মুখে আছড়ে পড়ল এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস।

কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সহকর্মী প্রতাপ দাস। কাঁধে তার হাতের স্পর্শ, লাগতে সঞ্জীব চমকে উঠল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো।

—দাঁড়িয়ে কী করছ ব্যানার্জি ?

—দেখছি।

—হুঁ, ভয়ঙ্কর বাড় বেড়েছে। দেশ এবার স্বাধীন করেই ফেলবে দেখছি।

শোভাযাত্রাটা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। নমিতাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাতের পতাকাটাকে এতদূর থেকেও চিনতে পারছে সঞ্জীব। অন্যমনস্ক ভাবে বললে, আশ্চর্য নয়।

সঞ্জীবের দৃষ্টি অনুশরণ করে শোভাযাত্রার দিকে একটা আগ্নেয় কটাক্ষ ক্ষেপণ করলে প্রতাপ দাস। বললে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ম্যাগাজিন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। অত শস্তা হবেনা।

—তা হবে।

তেমনি অন্যমনস্কভাবেই সঞ্জীব জবাব দিলে। সে ভাবছিল অন্যকথা। এখন পরিমল থাকলে বেশ হত। এই অবস্থায় নমিতার একখানা ফোটো পেলে যত্ন করে সে সাজিয়ে রাখত তার টেবিলে, হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের শেষ আলোর স্বাক্ষর তার জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ হয়ে থাকতে পারত।

কিন্তু আজ চব্বিশে আগষ্ট, উনিশ শো ছে'চল্লিশ। টেবিলের পাশে একটা পাথরের মূর্ত্তির মতো বসে আছে সঞ্জীব। একটা সহজ ভদ্রতার কথা অবধি তার মুখে আসছে না।

তার সামনে মুখোমুখি বসেছেন সত্যশরণবাবু। বিনয়ে তাঁর মুখখানা কেমন অস্বাভাবিক আর কৌতুকজনক হয়ে উঠেছে। যেন সত্যশরণ চাটার্জি নয়—তাঁর ক্যারিকেচার। চোখে মুখে সেই তপস্যাক্লিষ্ট শুচিতা, সেই উন্নাসিক আভিজাত্য মুহূর্তে যেন ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। একটা তীব্র শারীরিক অস্বস্তি বোধ করছে সঞ্জীব, অস্থির চোখে লক্ষ্য করছে দেয়ালে টাঙানো দেশনেতাদের ছবিগুলোর দিকে।

সত্যশরণবাবু বলছিলেন, আপনি পাড়াতেই থাকেন, মুখ চেনা আছে, কখনো আলাপের সুযোগ হয়না। তাই আজ আপনাকে ডেকে নিয়ে এলাম। এখন তো আপনারাই ভরসা, যদি ওরা অ্যাটাক-ফ্যাটাক করে—

শুকনো গলায় সঞ্জীব বললে, না, সে ভয় নেই।

—কিছু বলা যায়না মশাই, কিছু বলা যায়না। বিশ্বাস নেই ওদের। তা আপনি যদি মাঝে মাঝে একটু দয়া করে আসেন তাহলে আমরা খানিকটা আশ্বাস পাই আর কি!

তেমনি নিষ্প্রাণভাবে সঞ্জীব বললে, আসব।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল নমিতাই। সত্যশরণবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নমিতার দিকে একটিবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিলে সঞ্জীব। আশ্চর্য এ তৃতীয় নমিতা। সত্যশরণবাবুর মতো এও নমিতার ক্যারিকেচার—এরও মুখে একটা বিচিত্র অস্বাভাবিকতা, একটা বিগলিত বিনয়ের ব্যঙ্গ। নমিতা কখনো এত কুৎসিৎ হতে পারে এটা স্বপ্নেরও অতীত ছিল সঞ্জীবের।

মধুর গলায় নমিতা বললে, চা নিন।

চা-টা যেন বিষের মতো তেতো মনে হল সঞ্জীবের। পথে কখন বেরিয়ে এল, তখন সমস্ত পৃথিবীটা তার কাছে যেমন শূন্য, তেমনি নিরর্থক হয়ে গেছে।

মহাপৃথিবী

(শ্রীজীবনানন্দ দাশ-কে)

সুধীরকুমার গুপ্ত

অসংখ্য তারার ভিড়ে এ পৃথিবী ছিল একদিন
একটী নগণ্য তারা শুধু
অনাদি কালের ছায়াপথে।
এই সমুদ্রের স্বপ্ন, দীর্ঘশ্বাস গোবি সাহারার,
ব্যথায় ধূসর দিগ্বলয়
সেদিন ছিলনা কিছু ; আজও কোথাও নেই তারা
আমাদের দৃষ্টির আড়ালে
আর কোনো ভিন্ন দেশকালে।

কোথাও কি আছে সে সময়
হৃদ্‌স্পন্দনে চিহ্নিত যা নয় ?
আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের পথে হেঁটে হেঁটে
অনেক শতাব্দী গেল কেটে।
তবুও এখনো অবিরাম
মৃত্যু আর করুণার মুখোমুখি প্রবল সংগ্রাম
আমাদের হৃদ্‌স্পন্দনে শুনি
দিন রাত্রি আলো অন্ধকারে ;
কত রাজ্য ওঠে পড়ে, কত কীর্ত্তি সমাজ ও সংসারে
গড়া আর ধূলিসাৎ হয় ;
যারা সৌরজগতের কোনো এক আহ্নিক গতির
নিশ্চেতন আবর্ত্তন নয়।

যত সূর্য্য গেছে জ্বলে, মরে-গেছে যেসব আকাশ
এ মাটিতে এতকাল ধরে,
আমাদের সব চিন্তা ধারণা ও কাজের ভিতরে
কোথাও রয়েছে তারা ; সেই মর্ত্ত্যলোক
নিয়ে তার সব ব্যথা, সব হাসি আনন্দ ও শোক
মৃত্যুরও কবরে অবহেলে
আরেক আসন্ন সূর্য্যে প্রাণের প্রতীক্ষা রাখে জ্বেলে।
সেই মৃতদের চোখ, সে বিস্মৃত স্বপ্ন আর প্রেম
যত আশা বুকে করে পৃথিবীকে করেছে বিপুল
ক্ষান্ত তা হয়নি আজো ; আবার কঠিন বর্ত্তমান
মশালে উঠেছে জ্বলে, জনতায় ওড়ায় নিশান।

পুরাণো পৃথিবী সব, কত রোম গ্রীস বেবিলন
নানা অরণ্যের স্তরে সে আদিম গুহার আশ্রয়
ফেলে রেখে অনেক পিছনে
এমনি নতুন রোদে আমাদের বিচিত্র জীবনে
পেয়েছিল আরো কতো রূপ।
সে সব জাহাজ সাঁকো রাজ্যপাট আয়ুধের স্তুপ
তবুও অদৃশ্য আজ ; তাদের সে সমাধির পর
এ অগণ্য জনপদ লক্ষ লক্ষ ক্ষেত ও প্রান্তর
আরেক প্রার্থনা আজ শোনে।
আবার তাদেরও কাজ স্বপ্ন ভয় আকুলতা গোণে
মৃত্যুর নিষ্ঠুর স্পর্শ ; তবুও জীবন চিরজীবী,
তার প্রেমে সীমাহীন আমাদের এ মহাপৃথিবী।

পাখীরা

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য-কে)

আশরাফ সিদ্দিকী

সোনার পাখীরা মোর গানের পাখীরা !
নরোম মোমের মতো নরোম নরোম প্রাণ মে'মের পাখীরা মোর স্বপন পাখীরা
নীলের পেয়ালা হ'তে নীল সুধা পিয়ে পিয়ে নীলিমার মত আহা সহজ নয়ন—
নরোম মেঘের মত মেঘের পালক যেন আহা মোর হাসি-হাসি আকাশী পাখীরা !

এইসব মাঠে মাঠে মুঠি মুঠি ধানে ধানে তুই ঠোঁট ভ'রে ল'য়ে ল'য়ে—
এইসব গাছে গাছে থলো থলো ফুলে ফলে তুই হাত ভ'রে ল'য়ে ল'য়ে
এইসব সূর্য্য-সোনা, এইসব চাঁদ সুধা, এইসব নদীদের উদার প্রসাদ···
প্রাণ ভরি' পান করি' মেলে দিয়ে তুই পাখা অবাধ অবাধ···
দক্ষিণ হাওয়ার গানে উত্তর হাওয়ার গানে পূবান হাওয়ার গানে গানে
ব'য়ে গেছে ভেসে' গেছে উজানের পানে।
এইসব পাখীদের দিন ছিল স্বপ্ন রচনার
স্বপ্ন ছিল দিন রচনার।
এইসব পাখীদের ফুলে ঢাকা রঙীন বাসর
জানেনি জানেনি যুদ্ধ হাজার বছর।
এইসব পাখীদের মন—
হিংসা-দ্বেষ বোঝেনি কখন।

নরোম মোমের মতো নরোম নরোম প্রাণ সে পাখীরা কোথা গেল সব
সোনার ধানের বানে টলোমলো দিনগুলি সেদিনেরা লুকালো কোথায়।
সেইসব নীলাকাশ, সেইসব নীল মাঠ, এখনো তো বিলায় প্রসাদ—
এখনো আকাশে হাসে এতো বড়ো চাঁদ !···
(আহা, এই ধাপে ধাপে ইহাদের নীড়গুলি ভ'রে যেত নাকি ?
নদীর মতন আহা স্বপনের মত আহা ইহাদের দিনগুলি বয়ে যেত নাকি ?)

তবু দেখি ছিয়াত্তরে···মনে পড়ে তেরশ' পঞ্চাশে—
গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি···শিকারীর রাইফেলে লাল রক্ত নীল হ'য়ে আসে

শৃগালেরা শব ল'য়ে শুনো মাঠে বাঁধায় সংঘাত—
রাত নামে—ভারতের রাত!

অভিশাপ কোন শতাব্দির? অভিশাপ কোন সভ্যতার?
এ কোন ব্যাধের শরে কেঁপে মরে লাখো লাখো নির্জীব শিকার!
এমন শরৎ খানি এমন পাখীর দিন পিষে মারে কোন শয়তান?
এমন মোমের মতো লাখো লাখো পাখী আহা লাখো লাখো মাটির সন্তান!

চড়ুয়ের নীড়

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কোথায় পাখির নীড় উড়ে গেছে ঝড়ে?
উঁচুতে গাছের ডালে বাঁধা ছিল খড়ে।

যত দূর চোখ যায় চেয়ে দেখি মাঠের উপর
ছড়িয়ে সুতার মত পড়ে আছে নীড়-ভাঙা খড়—
ধূলায় ধূসর।
সেখানে ঘাসের ভিড়ে ইতস্তত করে সঞ্চরণ
চেয়ে দেখি চড়ুয়ের মন।
ভাঙা-নীড় উড়ো খড় ঠোঁটে করে উড়ে যায় ফের,
আবার নতুন নীড় হবে চড়ুয়ের?
এখানে না কোথাও সে আর,
মন থাকে, চড়ুয়ের দিকে নয়, তৃণ লুব্ধতার।

নিরুপায় চড়ুয়ের মত
আমারো সবুজ নীড় ভেঙে চূর্ণ ত
কাতিকের ঝড়ে।
এখন দাঁড়িয়ে আছি ধূধু-ফাঁকা মাঠের ভিতরে।
মাঠ ত সে নয়:
জীবনের রূঢ় সঞ্চয়।

ভাঙা নীড় পিছু পড়ে থাকে,
মন উড়ে চ'লে গেছে চড়ুয়ের পাখে।

আলোচনা

কেন লিখি না

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজ পূর্ব্বাশার সম্পাদকের কাছ থেকে একটি চিঠি এল। তিনি লিখেছেন, 'আপনার কাছে যা চাই তা পাই না।' সেই সঙ্গে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন যেন আমি টয়েনবী ও মার্কস্-এর ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণার তুলনামূলক সমালোচনা পাঠাই। সঞ্জয় বহুদিন ধরে আমার কাছে মার্কসীয় মতবাদ ও সেই অনুযায়ী ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাখ্যা চাইছেন, আমি দিতে পারিনি। সম্পাদকেরা সাধারণত লেখকের প্রতি একটু নির্দয় হন; কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়। সঞ্জয়কে আমি স্নেহ করি, এবং তাই তাঁর আবদার করবার অধিকার আছে মানি। প্রত্যাশা করে বলেই না তাঁর অনুযোগ! তবু মনে হয় কেন লিখছি না তিনি পুরোপুরি বোঝেন না। "কেন লিখি" একবার বলেছিলাম, সেটা ছাপার অক্ষরে আছে। "কেন লিখি না" এবার বাধ্য হলাম লিখতে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীর কথা বাঙলার বাঙালী জানে না। এখানে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়, প্রায় স্কুল-কলেজের মতন। অনেকের আশ্চর্য্য লাগবে—এম, এ ক্লাশে সাতখানি বিষয়ের (পেপার) সঙ্গে অধ্যাপক হিসেবে আমি যুক্ত। তার ওপর সেদিন পর্য্যন্ত বি, এ ক্লাশও নিয়েছি। এম-এ ক্লাশে নোট দিই না; অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব এমন বিষয় যে আধুনিক খবর না দিয়েও উপায় নেই। তা ছাড়া, এম-এ ক্লাশে একাধিক ছাত্র থিসীস নেয়, এবং পি এচ-ডি ছাত্রও আছে। এদের প্রতি পৃষ্ঠা দেখতে হয়, ন্যায়, ব্যাকরণের সংশোধন পর্য্যন্ত। ছাত্রদের আবার সভা-সমিতি আছে, সেখানেও যেতে হয়। যদি নিজের দুএকটি খেয়াল, যেমন অন্য বিষয় জানবার আগ্রহ, না থাকত, তবে যা তা' করে চালিয়ে দিতাম। খেয়াল কেন বলি! দেখেছি ইতিহাস না জানলে অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়ান যায়না, নতুন দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য ও জীবতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সমাজতত্ত্ব পড়ান অসম্ভব। ইকনমিক থিওরী ও তার চিন্তাধারার বিচার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। অর্থনীতির জন্য অর্থতত্ত্ব (সেম্যানটিক্স) ও ন্যায়শাস্ত্রেব ভীষণ প্রয়োজন। উঁচু ধরণের অঙ্ক না হলেও আবার চলছে না। অবশ্য অঙ্ক আমার ধাতে নেই। অতএব শিক্ষকতার জন্যও আমাকে পড়াশুনা করতে হয়। যত বয়স বাড়ছে ততই নিজের অজ্ঞতা ধরা পড়ছে নিজের কাছে। যত রাত্রি পর্য্যন্ত আগে পড়তে পারতাম আজকাল তত রাত্রি পর্য্যন্ত খাটলে ঘুম আসে না। তাই সম্পাদকের চাহিদা মেটান আমার পক্ষে সহজ নয়।

দ্বিতীয় কারণ: মার্কস-বাদ সম্বন্ধে, ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে যতটা ভেবেছি ততটা লিখেছি। অবশ্য ইংরেজীতেই প্রধানতঃ। পূর্ব্বাশার সম্পাদক কেন, কোনো সম্পাদক ও বাঙালী পাঠক তার

খবর রেখেছেন বলে জানিনা। কোনো বাংলা পত্রিকায় আমার ইংরেজী বইএর সমালোচনা হয়নি—এমন কি পরিচয়ের পৃষ্ঠাতেও নয়। বই পাঠান অবশ্য সর্ব্বত্র হয়ে ওঠেনি—কিন্তু যাদের কাছে পাঠিয়েছি তারাও নীরব। অথচ বইগুলি যে একদম চতুর্থশ্রেণীর তাও মনে করবার মতন বিনয় আমার নেই। পূর্ব্বাশার সম্পাদক আমার কাছে টয়েনবী ও মার্কসের ইতিহাসের বিচার চেয়েছেন। গত বৎসর আমার একখানা বই বেরিয়েছে, "On Indian History—A Study in Method" যাতে অন্তত ষাট পৃষ্ঠার বিচার আছে ঠিক ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে। সেই ক'টা পাতার অনুবাদ বাঙালী করুন না?

আর, ভারতীয় ঐতিহ্য, সে-সম্বন্ধেও যতটুকু আমি জানি তা লিখেছি। মার্কস-এঙ্গেল্‌সকে যে মানে সে কি কখনও কোনো মত ঘটনার ওপর 'প্রয়োগ' করতে পারে? ৫ই জুন ১৮৯০ পল আর্ণ্‌সট্‌কে ও ৫ই আগষ্ট ১৮৯০ কনরাড স্মীটকে এঙ্গেলস যে দুটি চিঠি লেখেন তাইতে তিনি মার্কসিষ্ট ঐতিহাসিককে 'প্রয়োগ' করতে মানা করেছেন, নতুনভাবে ইতিহাস পড়তে বলেছেন। "But our conception of history is above all a guide to study, not a lever for construction in the manner of the Hegelians. All history must be studied afresh, the conditions of existence of the different formations of society must be individually examined before the attempt is made to deduce from them the political civic-legal, aesthetic, philosophic, religious, etc., nations corresponding to them." চিহ্নিত অংশগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে ঐ প্রকারের nations, অর্থাৎ, ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা একার কাজ নয়, অন্ততঃ আমার নয়। হেগেল কিংবা স্পেঙ্গলার আমার গুরু হলে চেষ্টা করা যেত। তা যখন নয়, তখন মাত্র যতটুকু জানি ততটুকুর ওপর নির্ভর করে যৎসামান্য মন্তব্য দেওয়াই ভাল। এবং তা আমি দিয়েছি। অবশ্য, তার পরও পড়ছি, কবে সিদ্ধান্তে পৌছব জানি না। যখন পৌছব তখন বাঙলা-ভাষার প্রতি টান অক্ষুন্ন থাকলে জানাব।

সঞ্জয়ের অনুযোগের পিছনে আবদার ছাড়া আরো কিছু আছে সন্দেহ হয়। পাঠক-লেখকের সম্বন্ধকে 'লেন-দেন', 'চাওয়া-দেওয়া' বলা হয়। বেশ কথা। চাওয়ার বহর অনুযায়ী দেওয়া সম্ভব সব সময় হয়না। এক কারণ দাতার অক্ষমতা; অন্য কারণ যে চায় তার চপলতা, অসহিষ্ণুতাও হতে পারে। যদি মাত্র অসহিষ্ণুতাই কারণ হত তবে খানিকটা বোঝা যেত; যেমন আমরা স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু অসহিষ্ণুতার অন্য উৎপত্তি আছে, যথা ইতিহাসের রীতি-নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, পরিস্থিতি বোঝবার অক্ষমতা, আদর্শবাদ ইত্যাদি। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রমথ বাবুর সম্বন্ধে একটা আক্ষেপ ছিল, 'এমন পণ্ডিত হয়েও তিনি দিলেন কি?' তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরিয়েছে; সেগুলো আমি পড়েছি; এবং পড়ে হতাশ হয়েছি। এমন কোঁতান স্তুতিবাদ কখনও চোখে পড়েনি। এর চেয়ে তিনি অক্ষম, অপদার্থ, নিতান্ত সাধারণ লেখক ছিলেন বল্লে ভালো হত। তাও বলা হয়নি। তার বদলে ১৯১৫-১৯৩৫ সালের প্রমথ চৌধুরীকে ১৯৪৫ সালের আশা ভরসার প্রতিবেশে বিচার করবার চেষ্টা হয়েছে। লোকে বলবে, প্রমথবাবু যদি এই সময়ের উপযোগী কোনো কথা দশ-বিশ বছর পূর্ব্বে না বলতে পেরে থাকেন, তবে তিনি কিসের প্রমথ চৌধুরী? কিন্তু এই প্রশ্ন নিতান্ত অনৈতিহাসিক, নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক, নিতান্ত অ-মার্কসীয়।

একপ্রকার ঝুটো মার্কস্‌বাদ আছে যার বিশ্বাসীরা পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যদবানী চায় তাইতে আস্থাবান হয়। Popper সাহেব একটি প্রকাণ্ড বই লিখেছেন "The Open Society and its Enemies"; তার দ্বিতীয় ভলুমের নাম "The High Tide of Prophecy: Hegel and Marx"। লেখকের মতে, ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতি দুর্ব্বলতা এই দুজনই সৃষ্টি করেছেন। হেগেল সম্বন্ধে তাঁর মত মানি, মার্কস সম্বন্ধে নয়, যদিও মার্কসের বহু রচনায় ভবিষ্যতের ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমার ধারণা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিমূলক বিশ্লেষণ। এর বেশী যে প্রত্যাশা করে তার রোগকে হয়ত infantilism বলবনা, কিন্তু left-wing adolescent disorder বলব। অর্থাৎ পাঠক-সম্পাদক লেখকের কাছে যা চায় তার মূল্য ততটা যতটা সেই চাওয়ার পিছনে সমাজ-বোধ, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জ্ঞান আছে। প্রমথ বাবুর সমালোচকের মনে তা নেই। তিনি যা দিয়েছেন তার বেশী তাঁর কাছে আমরা কেউ চাই নি তখন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে তিনি নিজে থেকে আরো কিছু দিয়েছিলেন—সেটা কি? আমার মতে প্রাণবাদ, ভাইট্যালিজম-এর বিচার। অনেকে আমার কথা মানবেন না জানি; এবং তার কারণও সোজা, আমাদের সমাজ প্রাণহীন, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাণে অবিশ্বাসী।

আরেকটি দৃষ্টান্ত: ভাদ্রমাসের পূর্ব্বাশায় নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় বাঙালীর মনের পর্য্যায়ে ভারতী ও সবুজপত্রের কালের বিচার করেছেন। প্রবন্ধটিতে চিন্তা আছে, কিন্তু যুক্তি সব সময় বজায় থাকে নি। প্রমথ বাবুকে তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি আমার কথাও লিখেছেন। বলা বাহুল্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতাটাই সব নয়। তিনি আমার বিষয় লিখছেন, '…কিন্তু তাঁর রচনা থেকে কি কোন বিশেষ পথের নির্দেশ আমরা পাই, না তিনি তা কখনও আমাদের দিতে চেয়েছেন? তাঁর রচনা থেকে এই মাত্র শুধু আমরা বুঝি তিনি 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের পক্ষপাতী নন, বামপন্থী চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের তিনি অনুরাগী, হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের প্রেরণা তাতে প্রবল, ঘটনা অপেক্ষা মনোবিশ্লেষণে তাঁর অধিক আনন্দ—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বাঙ্গালীর সম্মুখে পথ কি, সে সম্বন্ধে তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ কোথায়? চিন্তাশীল, লেখক হিসেবে তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করলে বোধ হয় খুব অন্যায় করা হয় না। 'আমার উত্তর ছোট্ট; নারায়ণ বাবু চিন্তাশীল লেখক ও পাঠক, অতএব এইরূপ আশা করা অন্যায় তাঁর পক্ষে। পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ কোনো চিন্তাশীল লেখক বাৎলে দেয় না, দিতে পারে না, কারণ সে-কাজ যাদুকরের, জ্যোতিষীর, ভণ্ড নেতার। অতএব পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নারায়ণ বাবুর মতন লেখকের চাওয়াটাই অনুচিত—কারণ সেটা অনৈতিহাসিক, অ-বৈজ্ঞানিক, অ-যৌক্তিক। পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের বদলে পথ যে আছে, এবং সেই পথের ভাব, যাকে sense of social direction বলা যায়, যদি আমার রচনায় কেউ পেয়ে থাকেন তবে আমার ত্রিশ বছরের প্রয়াস অতিমাত্রায় সফল হয়েছে আমি বলব। আমি এর বেশী কিছু নিজের কাছেই চাই নি, পাঠক-সমাজও চান না আমি জানি। অতএব 'ঐ পর্য্যন্ত'-এর অর্থ নেই এই সংস্থানে।

আশা করি পূর্ব্বাশার সম্পাদক-পাঠক-লেখক গোষ্ঠী, ফুটনোট সমেত হাজার পাতার বই চান না। এখানকার দু এক জন অধ্যাপক আছেন তাঁরা ২০০।২৫০ পৃষ্ঠার বেশী কোনোটাই লিখতে পারিনা

বলে আমার সম্বন্ধে আপত্তি জানান। এরা প্রকৃতপক্ষে academic snob, অর্থাৎ 'স্কলার'। ভগবান পূর্ব্বাশাকে 'স্কলারশিপ'-এর হাত থেকে রক্ষা করুন।*

* টয়েনবীর সমালোচনা করেছি আমার বইএর ৪৯—৫৭ পৃষ্ঠায় এবং মার্ক্‌সের ইতিহাস-পদ্ধতি ও ভারতীয় ইতিহাস ১—৪৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। মোদ্দা কথা এই: টয়েনবীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি academic, তাঁর challenge and response ফরমূলা প্রকৃতপক্ষে psychological, তিনি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার টাইপের উত্থান-পতনের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু উত্থান-পতনের পিছনকার ও আভ্যন্তরীন খবর দেন নি। মার্কসের পদ্ধতি ডায়েলিক্‌টেক্যাল-মেটিরিয়ালিষ্ট, সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে-ধরণের বিজ্ঞান চলে সেই মত বৈজ্ঞানিক; তিনি সভ্যতার বিশেষত্বকে স্বীকার করেও জাগতিক ধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন, শ্রেণী সংঘর্ষের সাহায্যে উত্থান-পতনের ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর ব্যাখ্যা কার্য্যকরী। টয়েনবী পড়ে বিদ্বান হওয়া যায়, মার্ক্‌সীয় ইতিহাসের সাহায্যে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করা সম্ভব। আশা করি, সকলেই আজকাল এই কথা জানেন। ভারতীয় ইতিহাসের মার্ক্‌সীয় ব্যাখ্যা আমি যা পারব তার চেয়ে বেশী ভালো করে ভূপেন দত্ত তাঁর Studies in Indian Social Polity-তে গোপাল হালদার তাঁর সংস্কৃতির রূপান্তরে, ও হীরেন মুখার্জ্জি তাঁর নতুন বই India Stuggles for Freedom-এ লিখেছেন। পূর্বাশার সম্পাদক আমার বদলে তাঁদের কাছে অনুরোধ জানান, আশাতীত ফল পাবেন।

সম্পাদকের বক্তব্য:

একজন লেখকের কাছে লেখা চাওয়া আজকের দিনে সম্পাদকের পক্ষে অন্যায় কি না তা আমার জানা নেই। ও কাজটা অন্যায় বলে যদি আজ জানতে হয় তাহলে আমি সম্পাদকের কাজ করছি বলে লজ্জিত হব। তবে এ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও আমি লেখকের কাছে লেখা-চাওয়াটাকে 'চপলতা' 'অসহিষ্ণুতা', 'ইতিহাসের রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা' 'পরিস্থিতি বোঝবার অক্ষমতা' প্রভৃতি এতো কিছু বলে মনে করতে পারছিনে—কাজেই প্রবীণ সাহিত্যিক ধূর্জ্জটিপ্রসাদের কথাগুলোও আমি বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করতে পারলাম না।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ শুধু প্রতিভাবান সাহিত্যিক নন, তিনি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির অধ্যাপক। একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক যদি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির বিষয়গুলো পাঠকদের পরিবেশন করতে চান তাহলে সে-কাজের সুফল অবধারিত। বাংলা ভাষার মারফৎ এ বিষয়গুলো জানবার যাঁদের আগ্রহ আছে অথচ ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করবার সুযোগ নেই, তাঁদের প্রতি ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মতো সাহিত্যিকের দায়িত্ব আছে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ ভুল করেছেন—আমি বাংলাসাহিত্যের পাঠকশ্রেণীর জন্যেই তাঁকে টয়েনবী ও মার্ক্স সম্বন্ধে লিখতে বলেছি, 'পাঠক-সম্পাদকে'র জন্যে নয়। 'পাঠক-সম্পাদক' জানেন যে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ ইংরেজি ভাষার পাঠকদের ও বিষয়টি উপহার দিয়েছেন—তাই তাঁর অনুরোধ ছিল বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্যে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদের অবশ্য জানবার কথা যে 'পাঠক-সম্পাদক' ইংরেজি পড়তে পারেন এবং এই বিদেশীভাষাটি কিছু কিছু বুঝতে পারেন। 'পাঠক-সম্পাদক' আখ্যাত কোনো ব্যক্তিবিশেষকে পড়াবার জন্যে বা তাঁর জ্ঞানোদয় করাবার জন্যে আমি বাংলা সাহিত্যিকদের অমূল্য সময় অপব্যয় করতে অনুরোধ করব কেন? 'পাঠক-সম্পাদক'কে উপেক্ষা করলেও তাঁদের বিশেষ ক্ষতি হবেনা, কারণ তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক না হলেও ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র, মার্ক্সবাদেরও ছাত্র হয়ে থাকতে পারলেই তিনি খুসী, অধ্যাপক হতে চাননা। তবে ছাত্র হলেও তিনি সেসব অধ্যাপকের প্রতি আস্থাবান নন, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ যাঁদের 'রিকমেণ্ড' করে দিচ্ছেন।

শেষ কথা, সম্পাদক কোনো লেখকের কাছে অনুরোধই জানান বা আব্দারই করুন, তা থেকে একথা মনে করা যায়না যে লেখকমাত্রই সম্পাদকের বিচারে লেখক। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সাময়িক সাহিত্য

প্রবন্ধ

কংগ্রেসের পথ : শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি, ১৮১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা।

গোপন বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে পুরাতন পন্থা বিসর্জন দিয়ে গান্ধীবাদের আশ্রয় গ্রহণ বাংলা দেশের আবহাওয়ায় প্রায় অভাবনীয় সংঘটন। বাংলা দেশের কথা বিশেষ ক'রে বল্‌লাম এইজন্যে যে বাংলায় গান্ধীবাদের শিকড় কোনদিনই খুব দৃঢ়মূল ছিল না; গান্ধীজি-প্রবর্তিত অহিংস কার্যক্রমের প্রতি শুধু যে বাঙালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই অশ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন তা নয়, বাংলার জনসাধারণের মধ্যেও গান্ধীজির নীতি ও আদর্শের প্রভাব বরাবরই একটু শিথিল ছিলো। কিন্তু '৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের পর থেকে এই অবস্থার সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। জনসাধারণের ভেতর যেমন আর গান্ধীজীর প্রতি পূর্ববৈরিতার মনোভাব বেঁচে নেই, বহু আদর্শ রাজনৈতিক কর্মীর মনোজগতেও ইতিমধ্যে একটা ওলট-পালট হ'য়ে গেছে ব'লে প্রতীতি হচ্ছে। গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের আদর্শ ও কার্যক্রম আজ আর পাগলের প্রলাপ ব'লে কেউ উড়িয়ে দিতে সাহস করছেন না; পক্ষান্তরে, পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক, সুনিশ্চিত সমাজ-তান্ত্রিকতার আদর্শ ও তার কর্মপন্থার নির্দেশ একমাত্র গান্ধীবাদের মধ্যেই নিহিত আছে এমন কথাও কেউ কেউ ভাব্‌তে সুরু করে দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ এই রূপান্তরিত রাজনৈতিক কর্মীদের একজন। অরুণবাবু সুপরিচিত দেশসেবক; পুরাতন যুগের গোপন রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা থেকে সুরু ক'রে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি আন্দোলন আলোড়নের মধ্যে দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস ও বিচিত্র সমাজতান্ত্রিক মতামতের সহিতও তিনি পরিচিত। ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে মার্ক্সবাদের আলোকে বিচার করবার প্রক্রিয়ায় তিনি অগ্রণী। এ হেন অগ্রসর-চেতনাযুক্ত রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে 'মধ্যযুগীয়' বলে কথিত গান্ধীবাদকে ভারতের মুক্তিসাধনার একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করা প্রথম দৃষ্টিতে বাস্তবিকই একটু আশ্চর্য ঠেকে। কিন্তু যাঁরা বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন তাঁদের কাছে এই মানসিক বিবর্তনের কাহিনী খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলেই মনে হবে। বইটির মূল্য সেখানেই।

গ্রন্থকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মানদণ্ড দিয়ে ভারতের মুক্তিসাধনার আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বিচার করে দেখিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কেমন করে আবেদননিবেদনসম্বল অভিজাতদের প্রতিষ্ঠান থেকে বিচিত্র রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে একটি খাঁটি জনবিপ্লবের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জনতার আশাআকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ গান্ধীজীপ্রবর্তিত অসহযোগের আমল থেকেই যদিও সুরু হয়েছে, কিন্তু আগষ্ট অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত তার আকার সুস্পষ্ট রেখার দ্বারা চিহ্নিত ছিল না। কংগ্রেস নেতৃবর্গকর্তৃক আগষ্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি ও তাঁদের কারারুদ্ধ

হওয়ার পর জনগণের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা কংগ্রেসের চেহারা আমূল বদ্‌লে দিয়েছে। এবং জেল থেকে বেরিয়ে এসে যেদিন গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে "কৃষক-প্রজা-মজ্‌দুর-রাজ" প্রতিষ্ঠাই স্বরাজের লক্ষ্য এবং সেইদিকেই কংগ্রেসের কার্যক্রমের মোড় ফেরানো দরকার, সেদিন থেকে কংগ্রেসের আদর্শের সহিত জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার আর কোনরূপ বৈষম্য রইলো না, কংগ্রেস সত্যিকার গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'লো। লাহোর কংগ্রেসে "পূর্ণ স্বাধীনতা"র প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর থেকে অরুণবাবুদের ন্যায় বিপ্লবের নীতির দ্বারা উজ্জীবিত কর্মীদের আদর্শের সহিত কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধ আস্তে আস্তে ক'মে আসছিলো; '৪২-এর আগষ্ট প্রস্তাবে যখন সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হ'লো কারখানার, কৃষিক্ষেত্রের ও অন্যান্য স্থানের শ্রমশীল জনগণই ("workers in the fields and factories and of elsewhere") হবে রাষ্ট্র ও সমাজক্ষমতার মালিক, সেই বিরোধ আরও সঙ্কুচিত হয়ে এলো; তারপর কারাগার থেকে নিষ্ক্রমণের পর গান্ধীজী যখন উপরোক্ত মর্মে স্বরাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন এবং গঠনমূলক কার্যক্রম (18-point Constructive Programme)-এর বিধানের মধ্যে দিয়ে সেই আদর্শকে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন, তখন বিরোধিতা একেবারেই লুপ্ত হ'লো। গণকল্যাণমুখী সমাজতান্ত্রিক কর্মীরা নিঃসংশয়ে বুঝ্‌লেন গান্ধীনেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে গণবিপ্লব সাধন করা সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, ভারতে গণবিপ্লব সাধন করার ঐ একমাত্র পথ।

বইটি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিরই মূল সুর এক। বিশেষ ক'রে 'অহিংসার পথ' নিবন্ধটিতে সেই সুর সব চাইতে স্পষ্ট। কংগ্রেসের পথ কেন অহিংসার পথ এবং কেমন করে কংগ্রেস অহিংস গণনেতৃত্ব ও গণবিপ্লবের দিকে চালিত হচ্ছে তারই একটি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রোচিত ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাবে। গ্রন্থকারের মানসিক বিবর্তনের নির্ণায়ক ব'লেও প্রবন্ধটি মূল্যবান। গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট মত এই যে মার্ক্সপ্রবর্তিত সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যক্রম আজকের পৃথিবীতে আর প্রযোজ্য নয়। মার্ক্সের আমলে শ্রমিকশ্রেণী ছিলো অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাহীন; তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরও তাদের প্রভাব ছিলো না; সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশের সাহায্যে বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা উৎসাদিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর মার্ক্স স্বভাবতই জোর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই একশো বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আজ শুধু শ্রমিকই নয়, শোষকদের মধ্যেও অর্থনৈতিক চেতনা অল্পবিস্তর দেখা দিয়েছে; তাছাড়া, রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরও তারা খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের বেলায় শ্রমিক-কৃষকের দাবী-দাওয়া আর আগের মতো অবহেলা করার উপায় নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, এযুগের বিপ্লবে সহিংস পন্থার প্রয়োগ আর আগের ন্যায় অনিবার্য নয়; গণচেতনা সর্বব্যাপী এবং অন্যান্য বাস্তব অবস্থা অনুকূল হ'লে শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়েই বিপ্লব সাধন করা সম্ভব। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সেই পথেরই নির্দেশ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। 'শ্রেণীসংগ্রাম' জিনিষটাকে আমরা এ যাবৎ নিতান্তই পুঁথিগত অর্থে বিচার করে এসেছি। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব বর্তমান সমাজে অবশ্যই আছে এবং গান্ধীজী তা অস্বীকারও করেন না। কিন্তু গান্ধীজীপ্রদর্শিত পথে এই সংঘর্ষের

'টেক্‌নিক' আমূল বদ্‌লে ফেলা হয়েছে। যাকে গান্ধীজী change of heart বলেন তার অর্থই হচ্ছে এই যে শোষিতদের বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার সূক্ষ্ম প্রভাব দ্বারা শোষকদেরও প্রভাবিত করে ফেলা—শোষকদের শুভবুদ্ধির দ্বারে গিয়ে ধর্না দিয়ে প'ড়ে থাকা নয়। গঠনমূলক কার্যক্রমের নির্দেশে বঞ্চিত ও নির্যাতিত প্রত্যেকটি ভারতীয় যদি স্বস্থ ও স্বয়ং-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে, তা হ'লে আপনা থেকেই পরিশ্রমপুষ্ট পরগাছার দল নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়বে, তাদের বিষদাঁত ভেঙে ফেলা হবে। 'মতিগতির পরিবর্তন' কথাটাকে এই অর্থেই বিচার করা উচিত এবং এইভাবে দেখলে মার্ক্সকথিত 'declassed' হওয়ার সঙ্গে তার আর প্রভেদ থাকে না।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিভাবে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হয় তার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা প্রস্তুতির অধ্যায় আছে, অধৈর্য হয়ে যারা সস্তা 'economism' এর দোহাই পেড়ে সুযোগ আসার আগেই বিপ্লব ঘটাতে চায় তাদের কাজের সঙ্গে 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো'র প্রক্রিয়ার বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। গ্রন্থকারের মতে '৪২-এর আগষ্টে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সুযোগ এসেছিলো, কিন্তু 'জনযুদ্ধ'-ওয়ালা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাধাদানের ফলে সেই সুযোগ নষ্ট হয়। কংগ্রেস যখন সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক গণকল্যাণের আদর্শকে তার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন তখন সকলের উচিত ছোটোখাটো সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় না করে সেই একমাত্র আদর্শকে জয়যুক্ত করার চেষ্টা করা। কিন্তু আমাদের দেশের একদল 'infantile leftist' তা কিছুতেই হতে দেবেন না—দেশের বৃহত্তর স্বার্থের আদর্শ থেকে মানুষের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে এনে ছোটোখাটো অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বে তাকে কেন্দ্রীভূত করাই তাঁদের কাজ।

এই সব বিবেচনায় অরুণবাবু কংগ্রেসের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' কথা দুটি প্রায়শ ভ্রান্তবুদ্ধির দ্যোতক। প্রকৃতপক্ষে (গ্রন্থকারের ধারণায়), কংগ্রেসের সর্বশেষ কার্যক্রমকে যাঁরা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই বামপন্থী; 'পুঁথিগত জিগির তুলে যারা বামপন্থার দাবী করে' তাঁদের দাবীর পেছনে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব ভিত্তি নেই। অরুণবাবু "এক মত, এক কার্যক্রম" এই আদর্শের ভিত্তিতে কংগ্রেসকে 'one-party' প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত দেখ্‌তে চান—কংগ্রেস 'পার্টি'-নয়, 'প্লাটফর্ম' মাত্র, এই যুক্তিতে যাঁরা কংগ্রেসে বিভিন্ন মত ও পথের অনুবর্তী দলের প্রতিনিধিত্বের অধিকার অনুমোদন করেন তাঁদের ঔদার্যের দ্বারা কংগ্রেসের কার্য ব্যাহত হয় বলেই তাঁর ধারণা। তাই বলে নিজেদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে তিনি অনবহিত নন। মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসের যে কিছুতেই মীমাংসা হচ্ছে না এজন্যে মুসলিম লীগই যে সর্বাংশে দায়ী তা নয়, কংগ্রেসসেবীদেরও দায়িত্ব আছে। গ্রন্থকার মুসলমানদের সম্পর্কে উদারমনোভাবযুক্ত সম্পূর্ণ নতুন পন্থা অনুসরণ করতে বলেছেন।

অরুণবাবু পুস্তকের নানা জায়গায় গঠনমূলক কার্যক্রমের বিষয় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন নি। সাপ্তাহিক Forward পত্রিকার সমালোচকের মতের প্রতিধ্বনি করে আমিও বলি, একটি আলাদা অধ্যায়ে গঠনমূলক কার্যক্রমের ব্যাখ্যামূলক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সংগ্রথিত করলে পুস্তকটির মূল্য বাড়তো।

বাংলার কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে বইটি নানাদিক দিয়ে অপরিহার্য। গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট অভিমত

এই : "গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বাঙালীর মনে নিবদ্ধ করা দরকার। নইলে বাংলা দেশে কংগ্রেস কখনও শক্তিশালী হবেনা।"

নারায়ণ চৌধুরী

অভিব্যক্তি—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : দাম আট আনা)

আমাদের অদৃশ্য শত্রু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : দাম আট আনা)

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের আরো দুখানা বই আমাদের হাতে এসেছে—'অভিব্যক্তি' এবং 'আমাদের অদৃশ্য শত্রু'।

আরো নানা তথ্যের মতই জীবজগতের আবির্ভাব সম্পর্কেও আমাদের চল্‌তি বিশ্বাস যে সহজ পথ বেছে নিয়েছিলো অজ্ঞতার একগুঁয়েমীর ওপরেই তার প্রতিষ্ঠা। বেছে নিয়েছিলো বললে কথাটাকে সাফসুফ অতীতের মধ্যে কবরস্থ করা হয়, আসলে সৃষ্টিরহস্যের পেছনে ঐশিক প্রসাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবলপণ প্রচেষ্টার অবসান এখনও ঘটেনি।

প্রাণের প্রথম আবির্ভাব থেকে সুরু করে আজকের দিনের বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ—বিবর্তনের দৃঢ় মতবাদ প্রয়োগ করে ডারউইন অক্লেশে এই বিস্তীর্ণ জমি পার হয়ে এসেছেন মনে করলে ভুল করা হবে। প্রচণ্ড বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, বিজ্ঞানসমাজে আর কোনো বিষয় নিয়ে এতবড় বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়না। বহু সময় এই বিতর্ক ব্যক্তিগত আক্রমণের রূপ নিয়েছে এবং, আশ্চর্যের কথা, ডারউইনের Origin of species গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার বহু বৎসর পরেও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার উত্তাপ এতটুকু ঝিমিয়ে আসেনি।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে সাধারণ পাঠকের সঙ্গে অভিব্যক্তি ও ক্রমবিবর্তনবাদের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। এ কাজের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর ; ভাষার দিকে নজর রাখতে গিয়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ম্লান হয়ে পড়েছে—এমন ঘটনা হামেশাই চোখে পড়ে আমাদের। রথীন্দ্রনাথ যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে এ দুয়ের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। এ বিষয়ে আমি নিজে একজন সাধারণ পাঠক : সাধারণ্যের পক্ষ থেকেই আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

'আমাদের অদৃশ্য শত্রু' বইখানি লেখা হয়েছে 'রোগ-জীবাণু' সম্পর্কে। লেখক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই তথ্যাবলীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যে সাদাসিদে ভাষার মধ্যে দিয়ে গুরুতর বিষয়ের অবতারণার জন্যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের বইগুলি প্রসিদ্ধ এখানিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সঙ্কলন ও সাময়িকী

দিগন্ত—সম্পাদক : অজিত দত্ত। প্রকাশক : এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। দাম—২৲

মাঙ্গলিক (অগ্রহায়ণ) —সম্পাদক : অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যা—।০

আজকাল প্রায়ই পরিচিত অপরিচিত সাহিত্যিক অসাহিত্যিক নানাপ্রকার সম্পাদকের সম্পাদিত সাহিত্য-সঙ্কলনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের অধিকাংশই সাহিত্য বা সঙ্কলন কোনদিক দিয়েই সার্থক নয়। সুতরাং এর মধ্যে যদি পাঠযোগ্য দু' একটি সংকলনগ্রন্থ হাতে এসে পৌঁছে, তা'হলে তাকে সাগত সম্ভাষণ জানাতে পাঠকের মন সহজেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

কবি অজিত দত্ত সঙ্কলিত 'দিগন্ত' সেই বিরল এবং সার্থক সঙ্কলনের অন্যতম। একটা জিনিস এখানে সকলের আগে স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো। তা হচ্ছে সম্পাদকের প্রশংসনীয় পক্ষপাতহীনতা। তাই, অতুলচন্দ্র গুপ্তর প্রবন্ধ 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ'-এর পাশেই নির্ব্বিঘ্নে স্থান পেয়েছে গোপাল হালদার-বিরচিত প্রবন্ধ বা অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রর 'সাহিত্য ও সংগ্রাম'। তাই, 'চিতা' বা 'দিগন্ত'র মতো কবিতার গা ঘেঁসে এসে বসেছে, একান্ত-বিরোধী কবিতা 'ঘুম' এবং 'জীবন অভিসার'। বিরোধীধর্ম্মীই হোক বা আপাতবিরোধীই হোক, মতৈক্য কি মতানৈক্য যা কিছু বিবেচ্য তা শুধু রচনা ও রচনাকারকে ঘিরেই, সম্পাদকের দায়িত্ব সেখানে নয়। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে সেখানে আসল সম্পাদনাকার্য্য যেখানে সুষ্ঠু বিচারবোধকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। মতের বিরোধটা আদর্শের অনুগ, সেখানে বাকবিতণ্ডার অবকাশ থাকতে পারে, জোরজুলুমের স্থান নেই। অতএব, সঙ্কলয়িতা যদি সাহিত্যিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য বিচারবোধে কোনো রচনাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তা'হলে তাকে মুদ্রিত করে অন্যায় কিছু করেন না। তাতে পাঠক-সাধারণের একটা লাভ হয় এই যে, তাঁরা দ্বিপথগামী দুটি আদর্শকে পাশাপাশি অনুধাবন কর্‌তে পারেন।

সুতরাং সম্পাদক 'কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ' ও 'সমসাময়িক বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটো একসঙ্গে প্রকাশ করে মন্দ করেন নি। প্রথমোক্ত প্রবন্ধের রচয়িতা অতুলচন্দ্র গুপ্ত যখন বলেন, 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের মনে এ মোহ নেই যে সাহিত্যিকদের এই কাজ সাহিত্য-সৃষ্টির কাজ। এ কাজ লৌকিক কাজ, সাহিত্যিক ক্ষমতাকে অসাহিত্যিক কাজে লাগিয়ে। কিন্তু এই ক্ষমতার প্রয়োগ এ কাজকে যে শক্তি দেয় অন্যকিছুর তা সাধ্যের অতীত। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের আহ্বান সাহিত্যিকদের এই কাজে আহ্বান।...যে সাহিত্যিকের মন সমাজধর্ম্মী ঐ আহ্বান তাদের জন্য।' তখন দেখি দ্বিতীয়োক্ত প্রবন্ধকার গোপাল হালদার বল্‌ছেন, 'প্রসঙ্গক্রমে বোধ হয় বলা অন্যায় হবে না যে, বাংলার 'কমিউনিস্‌ট্‌ কবিরা' সংখ্যায় বেশী নন। যাঁরা 'কমিউনিস্‌ট্‌ কবি' বলে গণ্য তাঁদের অনেকেরই কাব্যশক্তি স্বীকৃত; অন্য অনেকেরও লেখায় প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট। কিন্তু যা তাঁরা জানেন তা হয়ত শিক্ষিত সাধারণ এখনো জানেন না। তাঁরা জানেন—তাঁরা কবিও, কমিউনিস্‌টও; কিন্তু এখনও এক হয়ে উঠ্‌তে পারেননি মানে 'কমিউনিস্‌ট্‌ কবি' হয়ে উঠ্‌তে পারেন নি।' আসলে দুয়েরই অর্থ প্রোপাগাণ্ডা, কিন্তু পথ আলাদা। এখানে যে কোনো পাঠক তাঁর আদর্শ অনুযায়ী কথা শুন্‌তে পাবেন। আবার নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষেও একটা পথ বেছে নেওয়া অসুবিধের নয়।

সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার যা মনে হয় তা হচ্ছে এই: অতুলবাবুর বক্তব্য আমি বুঝি, কারণ তা যেমন স্পষ্ট তেমনি প্রাঞ্জল। গোপালবাবুর বক্তব্য অবশ্য হেঁয়ালী নয়, তথাপি বল্‌তে লজ্জা নেই, আমার কাছে তা আপত্তিকর। তাঁর বক্তব্য থেকে আমি সার কথা এই বুঝতে পারি যে তিনি বল্‌তে চান কবিকে শুধু কবি হলেই চল্‌বে না, তাঁকে নিষ্কলঙ্ক কমিউনিস্‌ট্‌ও হতে হবে। তা না হলে কবিতা যত ভালোই হোক তা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হবে না কিছুতেই। তাই যদি হয় তা'হলে আমার সরল প্রশ্ন হচ্ছে, আইনের মাপকাঠি দিয়ে কবিতার স্তরভেদ করা সম্ভব কিনা। গোপালবাবু যদি স্পষ্ট করে বল্‌তেন, প্রোপাগাণ্ডার একটা বিশেষ উপায় হচ্ছে কবিতা কিংবা সাহিত্য এবং সেইদিক দিয়ে যাঁরা একাধারে কবি এবং কমিউনিস্‌ট্‌ তাঁদের পক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক রচনা সৃষ্টি করা শ্রেয়, তা'হলে আমার কিছু বলবার ছিলো না। কিন্তু তিনি তা বলেননি, বরং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তিনি কবিতাকে ব্যাপকভাবে কাব্য-সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যা খাঁটি রসবস্তু, যা মানুষের সুকুমার রসচেতনাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু অতুলবাবুর এ অভিমান নেই, তিনি অত্যন্ত সরলভাবে স্বীকার করেছেন, 'সাহিত্যিকেরা দল বেঁধে

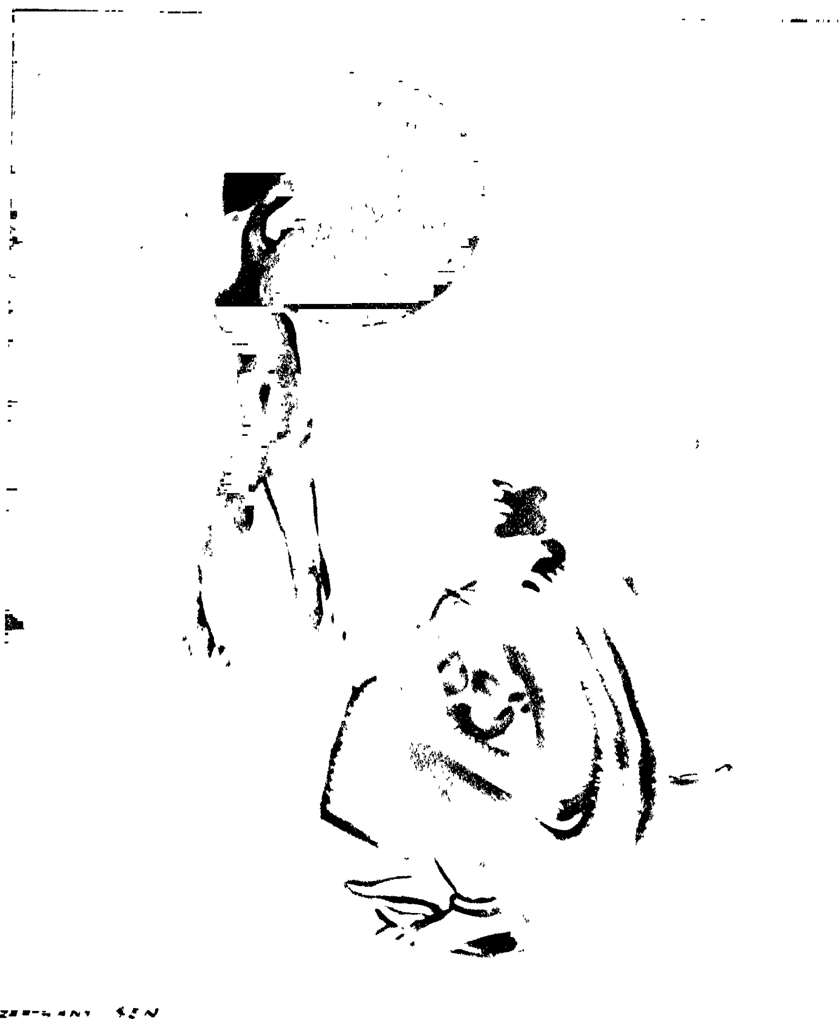
সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু প্রোপাগাণ্ডা চালাতে পারে এবং আর সকলের চেয়ে ভাল পারে।' গোপালবাবুর বক্তব্য থেকে মনে হয় তিনিও প্রায় এই কথাটাকে মানেন, শুধু 'দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টিকে' তিনি সত্যিকারের সাহিত্য পদবাচ্য করতে চান। তা না হলে 'কমিউনিস্‌ট্‌ কবি'-র মত হাস্যকর একটি শব্দ তৈরী করলেন কি করে।

গোপালবাবু আরও দু' একটি মজার সংবাদ বিতরণ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। যথা, বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে যাঁরা প্রতিভাবান কবি বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তৃতীয় যুগে অর্থাৎ সাম্প্রতিক কবিদের যুগে তাঁরা আর significant রইলেন না। তার মানে কবি-হিসাবে তাঁরা আজ প্রাক্তন তালিকাভুক্ত। এমন একটা আপ্তবাক্য তিনি কি করে উচ্চারণ করতে পারলেন তাই ভাবি। আমরা তো বুঝি, সাহিত্যে যুগবিচার করতে হলে আগে দেখতে হয় নবতন রচনায় সুস্পষ্টভাবে নূতন সুর ধরা পরেছে কিনা, এবং পূর্ব্বতন সাহিত্যিকের দল নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছেন কিনা বা তাঁদের বক্তব্য সাম্প্রতিককালে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন কিনা। সবদিক দিয়েই কিন্তু আমরা বিশেষভাবে দেখ্‌তে পাই, গোপালবাবুর কথাগুলো সত্যিসত্যিই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রথমতঃ, গোপালবাবুর আখ্যানুযায়ী সাম্প্রতিক কবির দল আজও পরীক্ষাধীন (এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন) এবং তাঁদের রচনায় এমন কিছু নবতন শক্তি ও সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়নি যাকে স্বীকার করে নিঃসংশয়ে নতুন যুগের অভ্যুদয়বার্ত্তা ঘোষণা করা যায়; দ্বিতীয়তঃ গোপালবাবু যাদের প্রাক্তন বলে অখ্যায়িত করতে চান তাঁরা সত্যি সত্যি কেউ নিঃশেষ হয়ে যাননি। হাতের কাছে অন্ততঃ 'দিগন্ত'-সম্পাদক নিজেই আছেন। অজিত দত্ত সম্বন্ধেই গোপালবাবুর মত কি? তিনি কি বল্‌তে পারেন তাঁর কাব্য সাম্প্রতিক পাঠক-মনকে অভিভূত করতে পারে না আর! অবশ্য অজিত দত্ত 'কমিউনিস্‌ট্‌ কবি' নন্‌ বলে গোপালবাবু যদি বলেন, তাঁর প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে তা'হলে আমার কিছু বলবার নেই।

আর একটি সংবাদ হচ্ছে, সাম্প্রতিক কবিরা নাকি ১৯৪১ এর ২২ এ জুনের পর থেকেই পথ খুঁজে পেয়েছেন, অর্থাৎ, বাংলা কবিতার মোড় ফিরেছে সেদিন থেকে। সমাজচেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সামাজিক বিবর্ত্তনের এক একটা স্তরকে অবলম্বন করে, তা মানি, কিন্তু কথা হচ্ছে, ঐ দিনটির প্রভাব বাঙালী কবিদের কয়জনের মধ্যে ধরা পড়েছিলো এবং যে কয়জনের মধ্যে তার প্রভাব পড়েছিলো তাঁরাই কি আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যিকারের ভালো কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন? ইস্তাহার এবং কবিতা যে এক জিনিস নয়, একথা কে না স্বীকার করবে! আসল কথা, কোনো এক দেশের উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশান্তরের কবিমন সমাজ-সচেতন হয়ে উঠবে এটা মনে করা ভুল। কবিমনে সমাজচেতনা জাগে স্বসমাজ-বিবর্ত্তন থেকেই, সুতরাং তার দিকে উদাসীন-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাব্য সন্ধান করে বেড়ালে আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয়।

'মাঙ্গলিক' রেড-ক্রস-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচারিত মাসিক পত্রিকা। যে মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠান স্বকার্য্যে অগ্রসর হয়েছেন তা সুবিদিত। সুতরাং রেড-ক্রসের মুখপত্র হিসেবে 'মাঙ্গলিক' যে জনসাধারণের কাছ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করতে সক্ষম হবে তাতে আর সন্দেহ কি। পত্রিকাটির বিশেষ কর্ত্তব্য হলো সামাজিক উন্নতি, গ্রাম-সংস্কার, শিক্ষা, পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য এবং শিশু ও মাতৃমঙ্গলের প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রতিনিয়ত সমস্যাগুলোর সমাধান করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া। এ ধরণের সাময়িক পত্রিকা যত প্রকাশিত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

অনিল চক্রবর্ত্তী



পূর্ব্বাশা আতঙ্ক শিল্পী

মাঘ, ১৩৫৩ হৈমন্তী সেন

দুর্ব্বাসা

নবম বর্ষ • দশম সংখ্যা

মাঘ • ১৩৫৩

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্স

শশধর সিংহ

এক

অনেকের মতে ফরাসী রাজনীতির অনিশ্চয়তার মূলে রহিয়াছে ফরাসী মহাবিপ্লবের অসম্পূর্ণতা। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী নিয়া ফয়দালী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সুরু হইয়াছিল তাহাতে এই নির্ম্মম ব্যবস্থার অবসান হইল বটে, কিন্তু বিপ্লবের আদর্শ পুরাপুরিভাবে গৃহীত হইল না। ফ্রান্সে রাজারাজড়াদের আধিপত্য গেল সত্য এবং সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও আসিল। কিন্তু এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও আথিক সাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে রাষ্ট্রের মূলে চিরকালের জন্য একটা দ্বন্দ্ব রহিয়া গেল। ফয়দালী শাসকবৃন্দের একাধিপত্য গেল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শ্রেণী-নির্বিবশেষে ফরাসী জাতির ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হইল না। জয়জয়কার হইল বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ১৭৮৯ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ফরাসী সমাজে ধনী-দরিদ্রের বিরোধের কোন প্রকৃত সমাধান হয় নাই। ফলে ফরাসী রাষ্ট্রের ভিত্তিও এ যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই মৌলিক অনিশ্চয়তার পরিচয় কেবল স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের অসাফল্যের মধ্যে পাওয়া যায় না, ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে একটা চিরন্তন রূপ দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসও ইহার সাক্ষ্য দেয়। সম্প্রতি ফরাসী রিপাব্লিকের চতুর্থ সংস্থান গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এইবারের চেষ্টাই যে এবিষয়ে শেষ চেষ্টা হইবে তাহা মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাস্কি লিখিয়াছেন : "অথচ আমার মনে হয় যে এই ঘটনাবলীর মূল কারণগুলি মনযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে ইহার সহিত ফরাসী মহাবিপ্লবের মৌলিক অসমাধিত দ্বন্দ্বের একটা যোগ আছে। পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের পর হইতে এ যাবৎ ফ্রান্সে অনেকে বিপ্লবের শত্রুদের সহিত যোগদান করিয়া স্বাধীনতার অগ্রগতি রোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা নানা সাজে দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্যের কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। যখনই জনগণের স্বাধীনতার প্রয়াস ইঁহাদের ব্যক্তিগত সুবিধার মূলে আঘাত করিয়াছে তখনই তাঁহারা স্বাধীনতার পরিপূরণে বাধা দিয়াছেন। গণতন্ত্রবাদের গতিশক্তি ইঁহারা চিরকাল ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং নিয়তই ইঁহাদের প্রধান চেষ্টা হইয়াছে স্বাধীনতার প্রয়াসকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে।" ["Yet if the sources of that spectacle be carefully traced, it is, I think, clear that they go back to the unsolved contradiction of the Great Revolution. Ever since the overthrow of ***ancien regime***, there have been Frenchmen willing to collaborate with the enemies of the Revolution to arrest the forward march of freedom. Their ultimate purpose has always been the same, however different the guise in which they have happened to appear. They have been unwilling to assist in the fulfilment of freedom if its price was the surrender of their privileges. They have always feared the dynamic of democracy ; and their chief concern has been to narrow the frontiers within which it could operate."]

আধুনিক ফরাসী ইতিহাসের কতগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা আলোচনা করিলে এই মন্তব্যের সম্যক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ফরাসী বিপ্লবের অল্পকালের মধ্যেই নেপোলিয়ানের উত্থান হইল। ফ্রান্সের নূতন কর্ত্তা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী তাঁহাদের আধিপত্য রক্ষা করিতে গিয়া নেপোলিয়ানের সাহায্য নিলেন এবং কালে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সম্রাট হইয়া বসিলেন। Code civil অর্থাৎ ফ্রান্সের নূতন আইনবিধি প্রণয়ন করিয়া বুর্জ্জোয়াস্বার্থ কায়েম করিবার প্রয়াস করা হইল। বিদেশে ফরাসী পরাক্রমের বিস্তারসাধন করিয়া নেপোলিয়ান স্বদেশের সামাজিক অসন্তোষ বহির্মুখী করিতে যত্নবান হইলেন। পরবর্ত্তীকালে দেখা গেল যে ১৮৩০ সালে নিজেদের সামাজিক স্থান অম্লান রাখিতে গিয়া বুর্জ্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়া দশম চার্লসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪৮ সালের য়ুরোপব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলনের যুগে আবার ইঁহারাই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। তৃতীয়

নেপোলিয়ানকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাইয়া গণআন্দোলনকে থামাইয়া রাখার নমুনাও পরে পাওয়া গেল। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর ১৮৭১ সালে প্যারিস কম্যুনের সহিত সংগ্রামে বুর্জ্জোয়া স্বার্থান্বেষণের একইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় রিপাব্লিক স্থাপন করিয়া ফরাসী মধ্যবিত্তশ্রেণী ভাবিলেন চিরকালের মত তাঁহাদের রাষ্ট্রিকপ্রাধান্য স্বীকৃত হইল। তিয়ের বলিলেন: "আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। শৃঙ্খলা, ন্যায় এবং সভ্যতা এতদিনে বিজয়ী হইল…আমাদের দেশের মৃত্তিকা বিদ্রোহীর রক্তে সিক্ত হইয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য যেন ইহাদের শিক্ষা দেয়।" ["We have achieved our aim", said Thiers, "order, justice and civilisation are at last victorious…the scil of the country is covered with the corpses of the rebels; may this dreadful spectacle be a lesson to them."] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ফ্রান্সের চিন্তাজগতে যে এক প্রতিক্রিয়াশীল ধারা দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে এক প্রবল স্রোতস্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক র‍্যনাঁ (Renan) হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী লেখকদের একদল আজ পর্য্যন্ত চিরকাল গণস্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রবল লেখনী প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। বলাবাহুল্য ইঁহাদের লেখার ভিতর দিয়াই ফ্রান্সে ফ্যাশিবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রথমে রচিত হয়। ফরাসী চিন্তাধারার আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন: "বোনালের মত লেখক, র‍্যনাঁ ও তেনের মত ঐতিহাসিক, ফাগে ও ক্রনতিয়েরের মতো সমালোচক অথবা বুরজে ও বারেছের মত ঔপন্যাসিক বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর দালালি করিতে গিয়া একই মনোবৃত্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা সবাই সমাজের শ্রেণী-বিভাগকে চিরন্তন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা সবাই বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল জগতে সাধারণ লোকের ন্যায্যস্থান অধিকার করিবার দাবীকে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী সব সময়েই সম্পত্তির অর্থাৎ বুর্জ্জোয়া-শ্রেণীর অধিকারকে মানিয়া চলুক এই হইল ইঁহাদের অভিলাষ।" ["Their pamphleteers, whether publicists like Bonald, historians like Renan and Taine, critics like Faguet and Brunetière, novelist like Bourget and Barrès, have always exhibited the same characteristics. They have attacked the right of the common man to affirm himself in terms which permit his adaptation to a changing world. They have sought to stereotype a hierarchical view of society in such a fashion as to subordinate the claims of freedoom to the demands of property."]

এই ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৮৭৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সের তৃতীয় রিপাব্লিকের আওতায় ফরাসী সাম্রাজ্য প্রচুর বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ফলে যে দেশের আভ্যন্তরীন বিরোধ কিয়দংশে প্রশমিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তথাপি ফ্রান্সের সামাজিক শক্তি-সাম্য (balance of power) বেশীদিন রক্ষা করা গেল না। প্রথম য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে সেখানকার শ্রেণীসংঘর্ষের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িয়াছে। ফরাসী মালিক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ বাঁচাইতে গিয়া দেশে ও বিদেশে কিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নাৎসী জার্ম্মেণীর প্রতি ইহাদের প্রীতি ও সহযোগের সূচনা হইল এই গণবিপ্লব ভীতির অন্তরালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি হইতে ইহার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রান্সের পরাজয়ই বা কেন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল তাহারও একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। লাভাল, বনে (Bonnet) প্রভৃতি ফরাসী নেতৃবৃন্দের পূর্ব্ব হইতেই হিটলারপন্থীদের সহিত যোগাযোগ ছিল। হিটলারের দূত আবেৎস্ (Abetz) এর সহিত কেবল ফরাসী সাংবাদিকদের নহে, ফ্রান্সের চিন্তা ও শিল্পজগতের অনেকের সহিত দহরমমহরম ছিল। নাৎসীরা ফরাসী ফ্যাসিবাদকে নানাভাবে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়ে নাই। কাগুলার (Cagoulards) ও আকশিওঁ ফ্রঁাসেজ (Action Francaise) দলগুলির সহিত বহির্জগতের পরিচয় আছে। কিন্তু নাৎসী বিষের প্রতিক্রিয়া কেবল ইহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলনা। মঁসিও ব্লুমের "ফ্রঁ পপুল্যার" [Front Populaire] গভর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ দক্ষিণপন্থীদের সম্মিলিত চেষ্টায় বিনষ্ট হয়। ইহার ফলে স্প্যানে ফ্রাঙ্কোর জয় হইল এবং স্প্যানের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়া জার্ম্মেণ নাৎসীরা ও ইতালীয় ফ্যাসিস্টরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য হাত পাকাইয়া লইল। ফ্রান্সের বামপন্থীদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপময় প্রতিক্রিয়শীল রাজনীতি আবার মাথা উঁচাইয়া তুলিল। ১৯৩৮ সালে ফ্রান্স, বৃটেন ও জার্ম্মেণীর সহিত ম্যুনিকে যে বোঝাপড়া হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিত হইল এই প্রতিক্রিয়াশীলতার জয়যাত্রা। মঁসিও লুই লেভি তাঁহার "Verite's Sur La France" পুস্তিকায় লিখিয়াছেন: "ফ্রঁ পপুল্যারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হইয়াছিল ইহাদের বৈদেশিক নীতি। সংবাদপত্রের উপর ইহাদের প্রবল প্রভাব থাকাতে ইহারা সর্ব্বতোভাবে এই গভর্ণমেণ্টের ফ্যাসিষ্টবিরোধী আন্তর্জাতিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে এবং বামপন্থী গভর্ণমেণ্টকে কার্য্যকরী হইতে দেয় নাই।" ["La meilleure arme des fascistes contre le Front Populaire a e'te' la politique exterieure. Exercant une forte influence par la presse, ils sout oppose's de leur mieux a' la politique internationale anti-fasciste et ils out empeche' les gouvernments de gauche".] দোষ অবশ্য কেবল দক্ষিণপন্থীদেরই নহে, সোসেলিষ্টদের মধ্যেও অনেকে

আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস রাখেন নাই। "Front Populaire" গভর্ণমেণ্ট পতনের ইহাও একটা কারণ।

সুতরাং যুদ্ধ যখন বাধিল তখন ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী গভীরভাবে বিভক্ত। সোসেলিস্টদল শান্তিবাদী প্রোপ্যাগাণ্ডা দ্বারা এমনভাবে প্রভাবান্বিত হয় যে তাহারা যুদ্ধের প্রতি স্বভাবতঃই বিমুখ ছিল। অন্যদিকে কম্যুনিষ্টরাও প্রথম হইতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। রুষ-জার্ম্মান সন্ধি তাহার অন্যতম কারণ। কেবল তাহাই নহে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষরাও দেশরক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করিয়াছিলেন যে দেশের লোকের মধ্যে একটা নিষ্ক্রিয়" মানসিকতার ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মানসিক অবস্থাকে পরে "La Psychologie Maginot" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মনোভাবের একটা মস্ত দোষ হইতেছে এই যে ইহা বর্ত্তমান যুদ্ধপদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। প্রথম মহাযুদ্ধে ট্যাঙ্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতেই আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ গতিশীল রূপ ধারণ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই গতিশীলতা এমন প্রসারলাভ করিল যে দেখা গেল ফরাসী সামরিক চিন্তা তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। "War of movement" এর যুগে মাজিনো দুর্গবেষ্টনীর পশ্চাতে বসিয়া থাকা কেবল যে সামরিক দিক দিয়া ভুল হইয়াছিল তাহা নহে, স্থৈতিক দেশরক্ষা বা static defence এর মনোবৃত্তিও সমগ্র ফরাসী জাতির উপর একটা গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। লুই লেভি লিখিয়াছেন "আজ এই বিষয়ে সকলেই একমত হইবেন যে 'মাজিনো লাইন সবার মনে নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটা অবাস্তবতা আনিয়া দিয়াছিল এবং শান্তিরক্ষার ব্যাপারে একটা আত্মঘাতী মরীচিকা সৃষ্টি করিয়াছিল।" [···aujourd'hui tout le monde doit être d' accord, c'est que la ligne Maginot avait créé un état d'esprit de fausse securité, la terrible illusion de la quiétude".] ফ্রান্সের পরাজয়ের মূলে তাই কেবল সামরিক অপারগতার পরিচয় পাওয়া যায়না, একটা বিশেষ মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে ফ্রান্সের মালিকশ্রেণীও যুদ্ধে নামিয়া ফরাসী সমাজের অসমাপ্ত বিপ্লবের পথ সুগম করিতে চাহেন নাই। এই বিষয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি সত্যই লিখিয়াছেন : "যখন যুদ্ধ আসিল, ফ্রান্স ইহাতে নিতান্ত আস্থাহীন ভাবে যোগদান করিল। দেশের মানসিক অবস্থা তখন লক্ষ্যহীন এবং রাজনৈতিক মতবাদের ভেদও তখন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী নেতারা ফ্রান্সের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। মাসের পর মাস অলসভাবে মাজিনো লাইনে অপেক্ষা করার ফলে লোকের আত্মবিশ্বাস পুনর্জীবিত না হইয়া বরঞ্চ অন্তর্হিত হইল। ১৯৪০ সালের দুর্ব্বহ বসন্ত অভিযানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রান্সের পরাজয় ঘটিল। ফ্রান্স পূর্ব্বেই হিটলারের হাতে নৈতিক পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। এইবার হিটলারের তড়িৎসম আঘাতের ভিতর

দিয়া যে পরাজয় ঘটিল তাহা এই নৈতিক পরাজয়ের বাহ্যিক রূপ মাত্র।" ["When the war came, France entered it without conviction, spiritually confused and politically divided. The faith of its leaders in the idea of France had broken down. The months of weary waiting in the Maginot line produced not a renovation, but a liquidation of faith. The brief but agonising weeks of the spring campaign of 1940 were only the material registration of a moral defeat which Hitler had already struck before he struck the lightning blow".]

ফ্রান্সের দুইশত প্রধান প্রধান পরিবারকে ঐদেশের আসলশাসক বলা হইয়াছে। এই কিংবদন্তী সংখ্যার দিক পুরাপুরি সত্য না হইলেও ইহার মৌলিক ন্যায্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মার্শেল পেতাঁ্যা ইঁহাদের অগ্রণী হইয়া হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ফরাসী ইতিহাসে এই সন্ধির মত অপমানকর ঘটনা অনেককাল ঘটে নাই। ফ্রান্সের উচ্চশ্রেণীয়রা ভাবিলেন যে এই ভাবে তাঁহারা নিজেদের বিপ্লবের হাত হইতে বাঁচাইলেন। যে ভীতি ১৭৮৯ সাল হইতে সুরু করিয়া চিরকাল ইহাদের রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, এবারও তাই করিল। বিপ্লবীযুগের "এমিগ্রাঁ" দের মত ইঁহারাও দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাইয়া নিজেদের পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। ভিশি (Vichy) তে বৃদ্ধ পেতাঁ্যার আওতায় যে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল তাহার প্রয়াস হইল ১৭৮৯ সালের স্মৃতিকে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলা। *Ancien regime* বা পুরাতন আমলের শাসন ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনা হইল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। তৃতীয় রিপাব্লিকের উপর এইভাবে যবনিকা পড়িল।

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তিন

যে দেশ অতিমাত্রায় কৃষিনির্ভর তার উপর সাম্যবাদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যেতে বাধ্য। কথাটা অত্যন্ত সত্য এবং কঠোর। যাঁরা বিপ্লবগতপ্রাণ অথবা যাঁরা সুযোগান্বেষী তাঁরা এ-কথায় মর্ম্মাহত হয়ে একে সাম্যবাদের শিশুয়ালি আখ্যা দিতে পারেন; তার উত্তরে বিনীতভাবে বলা যায় যে সাম্যবাদ এখনও শৈশব-অবস্থাতেই আছে; অবশ্য এ-উষ্মার একটি উদ্ধত উত্তরও আছে: যেনতেন প্রকারে কার্য্যোদ্ধারকে যদি পরিণত সাম্যবাদ বলে মনে করতে হয় তাহলে তার চিরশিশু থাকাই প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বিচারে একটি দেশ উন্নত কি অনুন্নত তা তার কৃষিনির্ভরতার মাত্রা দিয়েই নির্ণিত হয়। অনুন্নত কথাটা যন্ত্রশিল্পে অনগ্রসরতা-বাচক। অনুন্নত:দশে সাম্যবাদের সৈনিক হিসাবে যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকের চেয়ে কৃষককুলই সংখ্যায় অধিক হয়ে দাঁড়ায় এবং এই অবস্থাটাই সাম্যবাদের পক্ষে অবশেষে মারাত্মক হয়ে উঠে। গ্রেটব্রিটেনে লোকসংখ্যার ৫.৬৯ জন চাষী, ফরাসীতে শতকরা ৩১ জন চাষাবাদের উপর নির্ভর করে আছে (১৯৩১-এর গণনা-অনুযায়ী)[১]। এসব উন্নত দেশে সাম্যবাদের সৈন্যদলে, আর যা-ই হোক, কৃষককুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। যন্ত্রশিল্পনির্ভর গ্রেটব্রিটেন অথবা ফরাসীতে সাম্যবাদের নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের হাতে চলে যেতে পারে। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে হয়ত কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ সম্মিলিত করা অসম্ভব নয় কিন্তু বিপ্লবের অবসানে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতেই রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থদ্বন্দ্ব তখন পরিচ্ছন্নভাবে উঁকি দিতে সুরু করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ পরাভব মেনে নেয়। কৃষক ও শ্রমিক এ-দু'টি শ্রেণীর স্বার্থের পরিচয় নিতে গেলে দেখা যায়—ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের মোহ থেকে শ্রমসম্বল শ্রমিকের মন খানিকটা মুক্ত বলে সে যৌথউৎপাদন ও যৌথবণ্টনের প্রতি অনাকৃষ্ট নয়, তাছাড়া যন্ত্রোৎপাদনে উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসলও যখন তারই হাতে এসে যাচ্ছে তখন এ-ব্যবস্থাকে সে তার স্বার্থের অনুকূল মনে না করে পারবে না; কিন্তু কৃষকসম্বন্ধে এ-কথা খাটেনা, ভূমিহীন শ্রমসম্বল চাষীরও মনোবাসনা নিজস্ব দু'এক বিঘে জমি পাওয়া—জমির ব্যক্তিগত মালিকানার লোভ থেকে কৃষকমন মুক্ত নয়—যৌথব্যবস্থায় প্রবেশ করতে হলে

কৃষক অনিচ্ছুক মন নিয়েই প্রবেশ করে। এই দু'শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা পরিচ্ছন্ন ভাবে সমাজ-শরীরে ততদিন ফুটে ওঠেনা, যতদিন ধনতান্ত্রিক একটি তৃতীয় স্বার্থ সমাজের শাসন ও শোষণের যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু সমাজের দেহ থেকে ধনতান্ত্রিক স্বার্থের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হওয়া মাত্রই কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থবৈষম্য প্রখর আলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী বিপ্লব সংঘটিত হলে যন্ত্রশিল্পে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের স্বার্থানুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় আর তাই সাম্যবাদী সমাজগঠন সেখানে একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠেনা। কিন্তু অনুন্নত দেশের সাম্যবাদী বিপ্লব সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষকস্বার্থের উজান ঠেলে শ্রমিক-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা—সোভিয়েট রাশিয়ার তা-ই দেখা গেছে। দেখা গেছে যৌথকৃষিতে কৃষকদের তৃপ্তি নেই, তাদের মন জমির বা পশুর ব্যক্তিগত মালিকানার দিকেই সদাজাগ্রত।

শ্রমিক ও কৃষকের সংখ্যাতত্ত্বটি অর্থনীতির এলাকায় টেনে আনলে দেখা যায় যে অনুন্নত দেশে জাতীয় সম্পদের একটি মোটা অঙ্ক তৈরী করে তোলে কৃষকরা—তার তুলনায় শ্রমিকের তৈরী সম্পদের পরিমাণ খুবই অকিঞ্চিৎকর। কাজেই অনুন্নত দেশে কৃষকবাদী অর্থনীতি গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক—সাম্যবাদী অর্থনীতি নয়। ধনতন্ত্রের পতনের পর সেখানে কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা স্বার্থের প্রতিকূলে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এ-ইতিহাসও সোভিয়েট রাশিয়া রচনা করেছে। তবে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র কৃষক-শ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত নয়—রাষ্ট্র যেখানে বলশেভিক আমলাতন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শ্রমিক-কৃষকের সম্বন্ধে ভাঙন ধরে থাকলেও তাই তা উগ্র হয়ে বাইরে প্রকাশিত হ'তে পারে না। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা অটুট রাখবার অভিপ্রায়ে কখনো কৃষির দিকে কখনো যন্ত্রশিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে কৃষকের প্রতি বলশেভিক কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। তারপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বছরে সমাপ্ত করে রাশিয়াকে যন্ত্রশিল্পে উন্নত করবার সাংঘাতিক ব্যগ্রতাও তাঁদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এড্‌গার স্নোর 'গ্লোরি এণ্ড বণ্ডেজ' বই-এর মারফৎ শোনা যায় গতযুদ্ধের সময় খাদ্যোৎপাদনের তাড়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষকদের যথেচ্ছ সমৃদ্ধ হ'তে এবং মুনফা টান্‌তে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, (প্রথমপঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করবার আগে কৃষকদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সমিতি যেমি 'ধনী হও' আন্দোলন চালিয়েছিলেন!)—আবার যুদ্ধের অবসানে, এখন, 'প্রাভ্‌দা'র পৃষ্ঠায়ই কৃষকদমনের পূর্ব্বাভাস ফুটে উঠেছে। এসমস্ত কার্য্যকলাপ এই প্রমাণ করে যে বলশেভিক দল সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে রাখবার জন্যেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছেন, হয়তবা রাষ্ট্রযন্ত্রের পেষণে চেষ্টাও করছেন কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে কিন্তু জবরদস্তিতে দু'টি হাত বেঁধে দিলেই কি তাকে

হাতমিলানো বলা যায় ? এখনও সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিকের সংখ্যা কৃষকের সংখ্যার বহু পেছনে পড়ে আছে—যন্ত্রশিল্প ও শ্রমিক কৃষি ও কৃষকের সমান মর্য্যাদা লাভ করতে পারেনি। শ্রমিকরা রাশিয়াতে বিপ্লব সফল করেও বিপ্লবের বন্ধনে বন্দী হয়ে আছে।

একটি অনুন্নত দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে লেলিন শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর পথ খুঁজতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে কিন্তু কৃষকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন না। অক্টোবরের শ্রমিক বিপ্লব সংগঠনের সময় ১৪ই এপ্রিল, তিনি বলেছিলেন : "কৃষক আন্দোলন একটা ভবিষ্যৎবাণী হ'তে পারে, বাস্তব ঘটনা নয়।...কৃষক-বুর্জ্জোয়া মৈত্রীর জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।"[২] ট্রট্স্কির মত ছিল : "কৃষকবিপ্লবকে চূড়ান্ত ভেবে নিলেও বলতে হয় যে তার একার পক্ষে বুর্জ্জোয়া আমলের সীমা অতিক্রম করা কোনোদিন সম্ভব হয়নি।"[৩] রুশবিপ্লবের নেতারা কৃষকদের নিয়ে সাম্যবাদ তৈরী করবেন এমন আশা করেননি। কিন্তু আজ শোনা যায় যে কৃষকদের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ, এমনকি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থ বজায় রেখেও রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ কৃষির পক্ষে ব্যবসায়ের রঙ গায়ে মাখা আর ধনতন্ত্রের এলাকায় ঢুকে যাওয়া যে সমান কথা তা আমরা লেনিনের মুখেই শুনতে পাই : "প্রাকৃতিক কৃষিকর্ম্ম যখন ব্যবসায়িক কৃষিকর্ম্মে রূপান্তরিত হয় তখনই প্রথম বোঝা যাবে কৃষিকর্ম্মে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হল।"[৪] বিপ্লবের নেতাদের ধারণা ছিল সাম্যবাদের আবেষ্টনীতে ধনতন্ত্রের কাছে যা সত্যিকারের পাওনা তা আদায় করে নেবেন—যখন ধনতান্ত্রিক দানে রাশিয়ার ভাণ্ডার অপূর্ণ রয়েছে এবং শ্রমিকবিপ্লবের মুখে তৃণের মতো যখন ভেসে গেছে ধনতন্ত্র, তখন ধনতন্ত্রের হাতে যন্ত্রশিল্প যতটুকু গড়ে উঠ্‌ত শ্রমিকদের হাতেই তা গড়ে উঠ্‌বে—আর ক্ষেতখামার রাষ্ট্রগত করে জাতীয় সম্পত্তি করে গড়ে তোলার ভারও প্রগতিশীল পুঁজিবাদীর অবর্ত্তমানে চাষীরাই বহন করবে। লেনিন বলেছিলেন : "রাশিয়ার দ্রুত ধনতান্ত্রিক উন্নতি নির্ভর করছে ক্ষেতখামার জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে গড়ে উঠ্‌লে। রাশিয়ার একাজের জন্য 'প্রগতিশীল পুঁজিবাদী' আছে। তারা রাশিয়ার কৃষক।"[৫] আজ, রুশবিপ্লবের ত্রিশ বছর পরেও, আমরা সেই 'প্রগতিশীল পুঁজিবাদী'দের কার্য্যকলাপের যা ফিরিস্তি পাই তাতে দেখা যায়, রাশিয়ায় ক্ষেতখামারে এখনও ব্যক্তিগত মালিকানা বর্ত্তমান—আর মুনফাখোর ব্যবসায়ী চাষীর সেখানে অভাব নেই। ধনতন্ত্রের সুকীর্ত্তিগুলো নির্ম্মাণ করা আজও রাশিয়ায় সম্ভব হয়নি, অথচ তার প্রবেশ-পথ প্রশস্ত রাখা হয়েছে। চাষীরা সেখানে পুঁজিবাদে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে, 'প্রগতিশীল পুঁজিবাদী' হ'তে পারেনি।

রুশ-বিপ্লবের আঁকাবাঁকা-পথে বিচরণের পরও যদি কৃষকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের মন পরিচ্ছন্ন না হয় তাহলে আমরা বর্ত্তমান য়ুরোপের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কৃষি-সংস্কারের ছবির দিকে তাকিয়ে খানিকটা জ্ঞানার্জ্জন করতে পারি।

কৃষিঅর্থনীতির ভারতীয় সমিতির (Indian Society of Agricultural Economics) একটি রিপোর্টে য়ুরোপীয় কৃষি-সংস্কারের ছবিটির হদিস পাওয়া যায়। জার্ম্মাণী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডে ব্যাক্তিগত এবং রাষ্ট্রগত বৃহদায়তন জমি ভরণপোষণযোগ্য ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হচ্ছে। চল্লিশহাজার ক্ষুদ্রায়তন কৃষিপ্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে ইংল্যাণ্ড। এই ভূসম্পত্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থের প্রতি রাষ্ট্রের অপলক দৃষ্টি থাকবে! য়ুরোপের এ-ব্যাপারে আমরা, যারা 'Land to the peasants'-এর কদর্থ করে বসে আছি—উল্লসিত হয়ে ভাবতে পারি যে বুঝিবা য়ুরোপ সমাজতন্ত্রের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে! ক্ষুদ্রায়তন জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপন করা যে সমাজতন্ত্র নয় ধনতন্ত্রেরই খেলা এবং এ-খেলা যে য়ুরোপে কাউটস্কির আমল থেকে সুরু হয়েছে এবং উনিশ শতকীয় আমেরিকার নবীন ধনতন্ত্রও যে তা খেলে রেখেছে, সে খবর আমরা জানিনে বলেই উল্লসিত হব। মার্ক্স এ-সম্পর্কে বলেছিলেন: "সবাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকানা পাবে এ স্বপ্ন ঠিক তেম্নি বাস্তব আর সাম্যবাদী—সব মানুষকে সম্রাট, রাজা আর পোপ তৈরী করবার স্বপ্নটি যেম্নি!"[৬] ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক তৈরী করে ব্যক্তিগত মালিকানার বহুসংখ্যক সমর্থক তৈরী করা যায় বলেই ব্যক্তিগত মালিকানার কর্ণধার ধনতন্ত্র আজ সমস্ত য়ুরোপে এই চিত্র বর্ণময় করে তুলছে। ধনতন্ত্রের স্বার্থরক্ষী হিসেবে যদি কোনো শ্রেণী দাঁড়াতে পারে তা একমাত্র কৃষক। শ্রমিক বিপ্লবকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করার উপযুক্ত শক্তি আছে একমাত্র কৃষকশ্রেণীর।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে তবু কৃষকের পুঁজিবাদী সুপ্তশক্তিকে জাগরিত করতে হয়, অনুন্নত দেশগুলোতে ততটুকু কাজও করতে হয়না—সেখানে পুঁজিবাদী কৃষক সদাজাগ্রত শক্তি, তাদের এক চোখের বাঁকাদৃষ্টি ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উপর, আরেক চোখের ক্রূর দৃষ্টি শ্রমিকশক্তির উপর। আত্মরক্ষায়-বিঘ্ন উপস্থিত হলে মাত্র ধনতন্ত্রের সঙ্গে তারা হাতমেলাতে পারে কারণ উভয় পক্ষেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদ এবং তার আনুসঙ্গিক গুণাবলী! সেই গুণাবলীর সর্ব্বোত্তম বস্তু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা! স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার দরুণই কৃষক উৎপাদকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও অপর একটি উৎপাদক শ্রেণীর—শ্রমিকশ্রেণীর—সঙ্গে প্রগাঢ় মিলনে আবদ্ধ হতে পারে না। যৌথকর্ম্মে অভ্যস্ত বলেই শ্রমিকশ্রেণীর মন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা থেকে মুক্ত। অস্তিত্ববিলোপকারী সঙ্কট উপস্থিত না হলে কৃষকশ্রেণী তার বিপরীতমনোভাবাপন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রিযাপন করতে রাজী নয়। "প্রাচীন রুশইতিহাসের বর্ব্বরতার উত্তারাধিকার হিসাবে রাশিয়ায় যে কৃষকসমস্যা তৈরী হয়েছিল, বুর্জ্জোয়ারা যদি তার সমাধান করতে পারতেন—যদি সে-ক্ষমতা তাঁদের থাকৃত, তাহলে সম্ভবত ১৯১৭ সনে রাশিয়ার শ্রমিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করতে পারতেন না।"[৭]—ট্রট্স্কির এই ধারণার

পেছনে মিথ্যার সামান্যতম বাষ্পও নেই। গণতান্ত্রিক কেরেনস্কির কাছে কোনোরকম আশা বা আশ্বাস না পেয়েই অস্তিত্বলোপের আশঙ্কায় রাশিয়ার কৃষকশ্রেণী অক্টোবর বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাতে বিপ্লব সমাধা হ'ল বটে কিন্তু শ্রমিকের সঙ্গে তাদের মিলন সামাধা হল না। তাদের মিলিত শক্তিতে নগর ও গ্রামের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সাম্যবাদের দীপান্বিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লনা রাশিয়ার মুখ। এ যে হতে পারে না, কৃষকের কৃষকত্ব বা কৃষকস্বার্থ বজায় রেখে যে যন্ত্রশ্রমিকের সঙ্গে তার একাত্ম মিলন হয় না—যা হতে পারে তা যে শুধু জরুরী কাজ চালাবার মতো ক্ষণস্থায়ী সহযোগিতা—একথা সবাই স্বীকার না করলেও, অক্টোবর বিপ্লবের পরেকার কয়েকটি মাসের রূশ-ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা স্বীকার করবেন। বিপ্লবের পরদিন থেকেই রাশিয়ার যে কোনো 'ত্রক্তিরে' (নিম্নশ্রেণীর সরাইখানা) বলশেভিকদের উপলক্ষে এ ধরণের কথা শুনতে পাওয়া যেতো: "লেনিন কে? একজন জার্মাণ—। রাশিয়ার জনসাধারণ বলতে যাদের বোঝায় তোমরা তা নও! চাষীরাই রাশিয়ার জনসাধারণ।"[৮] কথাগুলো যে সরাইখানার উড়ো কথা নয়, বলশেভিক নেতারা তা প্রথম কৃষকসম্মেলন আহ্বান করেই বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষকনেতৃত্বের উত্তরাধিকারী 'বামপন্থী সমাজবিপ্লবী' দল (Left Socialist Revolutionaries) সেখানে বলশেভিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বসল। বামপন্থী সমাজবিপ্লবী সভ্যরা বললেন যে রাশিয়ায় যা চলছে তা শ্রমিকের একনায়কত্ব—চাষীরা সেখানে কোথায়? সভামঞ্চে লেনিন আসতেই—'লেনিন মুর্দ্দাবাদ' ধ্বনি উঠতে লাগল! লেনিনকে তার উত্তরে আবেদন করতে হ'ল এ বলে: "চাষীভাইরা, বলতো জমিদারের জমি আমরা কাকে দিয়েছি—শ্রমিকরা যন্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রিত করুক তা কি তোমরা চাওনা? এই হ'ল শ্রেণীযুদ্ধ। জমিদার চাষীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শিল্পপতি দাঁড়ায় শ্রমিকের বিরুদ্ধে। শ্রমসম্বল শ্রেণীতে বিভেদ ঘটুক—তাই কি তোমরা হতে দেবে?"[৯] লেনিনের এই আবেদন রাষ্ট্রক্ষমতার বিলিব্যবস্থার কোনো সুপথ দেখায় না—কাজেই বিতর্ক, বিরোধিতা এবং উষ্মার অবসান তাতে হলনা। বামপন্থী সমাজবিপ্লবী দল লেনিন-ট্রটস্কির অপসারণের দাবী জানিয়ে বসল। তারপর বলশেভিক ও সমাজবিপ্লবীদের একটি গোপন সম্মেলনে বহু বাদানুবাদের পর শাসনযন্ত্র গঠনসম্পর্কে এই দুইদলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হল মাত্র। দুইদলের নিশান জড়িয়ে দেওয়া হল বটে, রাস্তায় সম্মিলিত শোভাযাত্রাও বেরুল—সমাজবিপ্লবী দলের নেত্রী স্পিরিডোনোভা বললেন: "অতীতে সব শ্রমিক আন্দোলন পরাভূত হয়েছে—আজকের এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক, তাই তা অপরাজেয়।"—ট্রটস্কি বললেন: "আজ রাশিয়ার প্রভু মাত্র একটি শক্তি—তা হচ্ছে শ্রমিক-সৈনিক-কৃষকের সঙ্ঘ।"—সবই করা হল, বলাও হল সব কিন্তু বলশেভিক স্বপ্ন—শ্রমিক-কৃষক মিলন—সফল হলনা। সুপ্তোত্থিত অসংখ্য

কৃষকের দুর্লভ নেতৃত্ব করবার অধিকার যাদের আছে বলশেভিক সহযোগিতারও বা তাদের কি দরকার? তাই কয়েকমাস পরেই স্পিরিডোনোভার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: লেনিনকে দোষী সাব্যস্ত করে তিনি বললেন: "কৃষকদের তুমি প্রতারণা করেছ—নিজের কার্য্যোদ্ধারে তাদের ব্যবহার করেছ—কিন্তু তাদের স্বার্থের দিকে তাকাও নি।" তারপর নিজের দলের সভ্যদের দিকে তাকিয়ে স্পিরিডোনোভা চেঁচিয়ে উঠলেন: "লেনিনের ফিলজফিতে তোমরা শুধু গোবর—শুধুমাত্র সার!"—তারপরও হিষ্টিরিয়ারোগীর মতো তিনি বলশেভিকদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: "আমাদের অন্যান্য বিভেদ হয়ত মিটে যাবে কিন্তু কৃষক-সমস্যায় আমরা যুদ্ধ পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে রাজী। যখন চাষীমাত্রই—কি বলশেভিক চাষী, কি সমাজবিপ্লবী চাষী, কি নির্দ্দলীয় চাষী—সমানভাবে অপদস্থ, নির্য্যাতিত, বিধ্বস্ত হচ্ছে—চাষী বলেই বিধ্বস্ত হচ্ছে—তখন আমার হাতে আবার তোমরা পিস্তল আর বোমা দেখতে পাবে......"[১০]। আসলেও বামপন্থী সমাজবিপ্লবীদের হাতে পিস্তল দেখা গেল। শাসনযন্ত্র অধিকার করবার জন্যে একটি Coup d'e'tat-ও তাঁরা করলেন—লেটিশ সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে ট্রট্স্কি সমাজবিপ্লবী সৈন্যদের অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য করালেন। কিন্তু সে অস্ত্রত্যাগ সাময়িক, ৩১শে আগষ্ট সমাজবিপ্লবী দলের একটি জু মেয়ে—ডোরা কপ্লান—লেনিনকে গুলি করল।[১১]

রাশিয়ার যে বিপুল সমাজশক্তি বলশেভিক বিপ্লব ও লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে—তার বিরোধিতার যদি আজ অবসান হয়ে থাকে তা শুধু হয়েছে এই কারণে যে সোভিয়েটরাষ্ট্রে তার দাবী আজ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েটরাষ্ট্র এমন কোনো পথ অবলম্বন করেনি যাতে স্বার্থে আঘাত পেয়ে বামপন্থী সমাজবিপ্লবীরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। স্বার্থাহত সেখানে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমিকবিপ্লব সফল করেও তারা চাষীস্বার্থের বন্ধনে বন্দী। রাশিয়ার উদাহরণ থেকে এ শিক্ষাটি আমাদের পাওয়া দরকার যে কৃষিসম্বন্ধের মধ্য দিয়েই অনগ্রসরতা তার নখদন্ত প্রকাশ করবার সবচেয়ে বেশি সুযোগ পায়। আর তারি জন্যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবও অনুন্নত দেশগুলোতে পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করতে পারেনা। দেশ অখণ্ডভাবে জাতীয় চেতনায় গড়ে উঠুক গণতান্ত্রিক এই আদর্শের পথেও কৃষকমনের মধ্যযুগীয় স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা প্রবল বাধা নিয়ে দাঁড়ায়। তাই "অনুন্নত দেশের সবচেয়ে বড় কাজ সামাজিক সম্বন্ধকে প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাংশ আর নবীন সামন্ততন্ত্রের স্তরীভূত আবরণ থেকে মুক্ত করা।"[১২]

১। The Eastern Economist—Nov. 1946. ২। The History of the Russian Revolution—P. 416

৩। Ibid. ৪। Theory of the Agrarian Question. ৫। Ibid.

৬। The Economics of the *People's Tribune* and its attitude to young America.

৭। The History of the Russian Revolution.

৮। Ten Days that shook the World—by John Reed—P. 294. ৯। Ibid—P. 298—99.

১০। Memoirs of a British Agent—by Bruce Lockhart—(Putnam Ed.) P. 298.

১১। Ibid—P. P. 317.

১২। Trotsky's Introduction of the Book *The Tragedy of the Chinese Revolution* by H. R. Isaacs.

হারাণের নাতজামাই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। আর কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘাঁটির ঘরের পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও যেত, অতি সহজে, অনায়াসে গায়ে ফুঁ দিয়ে। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে কিছুতেই ধরাতে চায় না, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ কখনো তার পাত্তা পায় ? দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুসী।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাট বাঁধবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর ঘর কখানা, যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল, আঁটঘাট বাঁধাই ছিল। খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে, খবর দিয়েছে কেউ। আজই বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে হঠাৎ, সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে ঠিক ছিলনা কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে তার পরে। এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে ? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে অনেক চাষীর। জানা যাবে, সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল জানা যাবে, গোপণ থাকবে না। দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী।

খবর যাক, খবর পেয়ে আসুক, ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোন গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জান নয় দেবে আপনজনটার জন্যে।

চোখ কচলে উঠেই লাঠি সড়কি দা' কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ্চ। হাঁসখালি পাড়া

ঘিরতে ঘিরতে দপ্‌দপ্ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় কয়েকজন পুলিশ সশস্ত্র।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি ঠিক হারাণের বাড়ীটা চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙ্গে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন বাড়ী ?

হারাণ বলে, হায় ভগবান !

ময়নার মা বলে, তুমি উঠলা কেন কও দিকি ?

বলে কিন্তু জানে যে কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি হারাণ, শুধু একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলেটাকে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কাণে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু'এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা, কি বলে, কি কয় !

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

হাসির কথা নয়।

একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙ্গুলের ইসারায় তাকে মুখবুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গলায় নিদারুণ আপশোষে ফুঁষে ওঠে, আঃ ! ভাল্ শাড়ীখান পরতে পারলি না ?

বলেছ নাকি ? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙ্গে তাঁতের রঙীন শাড়ীখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়ীটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভাল কথা, আপনার নাম জগমোহন, বাপের নাম সাতকাড়। বাড়ী হাতীনাড়া, থানা গৌরপুর—

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কাণ খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রথম প্রৌঢ় বয়সেই তার বিধবার চুলছাঁটা মুখখানিতে দুঃখ দুর্দ্দশার ছাপে ও রেখায় কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে।

গাঁ ভেঙ্গে তেড়ে আসতেছে, রুখে। তাই না ভাবতেছিলাম, ব্যাপারটা কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, সারছে। দশবিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাৎ। আমি যাই, সামলাই।

র'ণ, র'ণ, ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কি হয়। আপনে তো আছেন।

শ' দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু'চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ীর পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলবার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমত নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটা।

হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তাল্লাস করে আসামী না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তাল্লাস করতি দিমুনা।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমুনা!

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় সুরু হয়ে গেছে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।

ময়নার মা বলে, দ্যাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিব্র্যা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধূলা দিছে। আপনারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা। মন্মথ বলে ভড়কে গিয়ে, ঘর তাল্লাসে তোমার আপত্তি নেই?

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপি চুপি আসে কেন জামাই ময়নার মা?

গা জ্বলে যায় ময়নার মার।—সদর দিয়া আইছে!

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল হেঁকে, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা কাটা ছাঁটা ঠেকানো আংটাক অর্ত্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটিমাত্র ছাড়া আওয়াজের মত।

ময়নার রঙীন শাড়ীরও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মত চোখে এঁটে যেতে যায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার অনাবৃত স্তনটি। এ যেন কবিতা বি, এ, ফেল মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাস্তব আঘাত, এমন যোয়ান মর্দ্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গায়ের দু'জন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তবু যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মত।

গর্জ্জন করে হারাণকে শেষ প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনীর বর?

হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না।

অ! মন্মথ বলে।

তার কিছু বলা বা করা উচিত ভাবে ভুবন।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কত্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেণ পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া মরে।

তুমি অমনি ছুটে এলে?

আমুম না? রতিভরি সোণারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?

ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। জাতে চাষা, আর কত হবে। আর কিছু করার নেই, বাড়ীগুলি তাল্লাস ও তছনচ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু'পা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র বেপরোয়া ভাব, ভয় ডর নেই একেবারে। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মত আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথা কানা হাঁড়িপাতিল জিনিষপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়ীতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ, এসব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্ত্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—রঙীন শাড়ীজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না।

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো' না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাছা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে, ময়নার মা'র গলা ধরে যায়, আপনারে কি কমু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দু'বার ময়নার মা সস্নেহে আদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোণ, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই! মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

দেখতে দেখতে মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরে আগে হাতীপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাসা কেউ কখনো করে নি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূণ্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা। সে যে এমন রসিকতাও জানে কে ভেবেছিল!

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুসী উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মধ্যে এত?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?

লাজের রঙে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়

আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কমানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা সার্ট, কাঁধে মোটা সুতির ফরসা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ীর দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি ? কখন আইলা ?

শোণ, শোণ।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কি ব্যাপার ?

কেমনে কমু ?

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দু'জনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্টতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দু'জন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

বাড়ীত্ নাই। তুমি কেডা, হালার পুতরে খোঁজ ক্যান ?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে ?

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নেই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে। মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই।

শাউড়ী পাইছিলা দাদা একখান !

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, এগোতে আরম্ভ করে। দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গণে। তাই, ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে হাসি মুখে ধীর শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল জানা ছিল জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। আস বাবা, আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। জ্বাল নি আছে খোকাকে ?

আছে।

আরেকটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত চাপা গোসা জামায়ের কাটাছাঁটা এক কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পিঁড়ি পাততে পাততে চকিতে ময়না তাকিয়েছে কবার, একটিবার অন্ততঃ চোখাচোখি হতই ব্যাপারটা অল্পবিস্তর কিছু হলে। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার শাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ীর পণ করেছে জগমোহন। লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা ছাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন ছাখে না জানতে চাইবে জগমোহন, তখন বলবে কথাটা। কিন্তু শালার খবরে এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না জগমোহনের।

থাড়াইয়া রইলা যে? বস বাবা, বস।

ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না যামু গিয়া।

অখনি যাইবা?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?

শুইছিল? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় বুঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, একদণ্ড ঘরে গিয়া ঝাঁপ দিছে, তুমি দোষ দেখলা! অন্যে তো কয় না?

অন্যের বৌ হইলে কইতো।

ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান হাসাহাসি করে।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।

তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দা ছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কি হইছে গো ময়নার মা? নিতাই পালের বৌ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান?

দিশা ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, কাঁদে ক্যান! জান না কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও। ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?

বাপ নাকি? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাদের অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। আবার তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা ছাখো।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?

জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই কখনো গট গট করে বেরিয়ে যায় না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো এখনো বাকী আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতে হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো ?

না। কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী !

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ্ঞ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

হারাণ কাঁপা গলায় জিগায়, আসে নাই ? ছোঁড়া আসে নাই ? হায় ভগবান !

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে। তখন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগার করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, তখন ময়না চাপা সুরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামায়ের সাথে লড়াই নেই।

আবার জিগায় হারাণ, আসে নাই ? আমার মরণটা আসে নাই ? হায় ভগবান।

চুপ করে ছিল জগমোহন, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে শালার খবর।—পুলিশে ধরছে ক্যান ?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরবার পথে একা পাইয়া ধরছে।

ধরছে কেন ?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে যায়, কাঁসিস্তে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা ? থাইকা যাও।

—থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও ? আখা ধরাই ? পোলাটারে ধরছে, পরাণড' পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

কবে আইবা ?

দেখি।

উঠি উঠি করে দেরী হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতে পুলিশ হানার সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মত। আজ মন্মথের সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। চোখ সাদা।

প্রথমেই হারাণের বাড়ী।

কি গো মণ্ডলের শাশুড়ী, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা ?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে ?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্য্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জ্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!

বাড়ীর সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্য্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মত না হলেও লোক মন্দ জমেনি। কিন্তু দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েৎ মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পাণা পুকুরটা পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আটগুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোকও ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ীর লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে!

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে, নব্বই বছরে বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই ? কই গেল ? হায় ভগবান!

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার রূপরস সাধনা

[বাংলার স্থাপত্য]

যামিনীকান্ত সেন

বাংলার রূপসাধনা প্রসঙ্গে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপত্যকলা কম বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। বিস্ময়ের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন আলোচকই এ বিষয়ে অগ্রসর হয়ে বাংলার সৌধকলার প্রকৃতি, তত্ত্ব ও ব্যঞ্জনার অপূর্ব্ব রীতি সম্বন্ধে কোন পর্যাপ্ত আলোচনা করেনি। শুধু কোন মন্দিরটি কোন প্রচলিত আদর্শে রচিত—এ আলোচনা এ ক্ষেত্রে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। উত্তর ভারতের "ইন্দো-আর্য্য" বা নাগর আদর্শ মধ্যভারতের 'বেশর' ও দক্ষিণ ভারতের "দ্রাবিড়" আদর্শে রচিত হর্ম্ম্যগুলি কেবল ভাব ও কৃষ্টিগত প্রেরণাকে মুখ্যভাবে প্রকাশ করেন। যদিও এদের ভঙ্গী বিচিত্র ও বিভিন্ন। উত্তর ভারতের রচনা যে একঘেয়ে নয় তা' প্রাক্‌ভারতীয় সৃষ্টিগুলি বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হবে। সব রচনাকেই এক শ্রেণীর ভিতর ফেলে বিচার করলে এ সমস্ত সৌধ সমুচ্চয়ের বিশিষ্টতা কোথা এবং কি ভাবে এ সব বিভিন্ন রূপোচ্ছ্বাস বিম্বিত হয়ে নানা জাতির হৃদয়তন্ত্রের মুকুরস্বরূপ হয়েছে—তার বিচার হয় না। বহিরঙ্গের দিক দিয়ে বিচার করলে এ ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না।

ভুবনপ্রদীপে আছে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করলে একশটি বাজপেয় উৎসর্গের এবং একলক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্য অর্জ্জন করা যায়। কাজেই ভারতের সর্ব্বত্রই মন্দিরের অভাব দেখা যাবে না। এ মন্দিরগুলিই যথার্থ জাতীয় চিত্তের প্রতিফলক। বহু বর্ণ, জাতি ও সমাজ অধ্যুষিত ভারতে বিভিন্ন রক্তগত বিশিষ্টতা এবং সাধনাগত বৈচিত্র্য মন্দির আলোচনার সাহায্যে যেমন সুস্পষ্ট হবে এমন আর কোন উপায়ে হবে না। বস্তুতঃ সৌধকলাকে মধ্যমণিরূপে স্থাপিত করেই সকল কলার চর্চ্চা হয়। মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়, মন্দিরের প্রাচীরে চিত্রাঙ্কনের রীতি অপরিহার্য্য—সঙ্গীতকলাও মন্দির হ'তে উৎসাহ পায়। এজন্যই রসতাত্ত্বিক রসকিন্ (Ruskin) ইউরোপের দিক হ'তে বলেছেন স্থাপত্যই সকল শিল্পের জনক। কাজেই স্থাপত্য রসের ভিতরই সকল রূপ-সাধনার

অঙ্কুর পাওয়া যায়। এজন্য প্রাচীনকাল হ'তে বাস্তুবিদ্যার প্রসঙ্গ এদেশে প্রচুর হয়েছে। দিঘনিকায়ে [১, ৯, ১২] শুক্রনীতিতে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, (৪৫ অধ্যায়) অগ্নিপুরাণ ও গরুড় পুরাণে [৪৬ অধ্যায়] সৌধকলার আলোচনা আছে। মানসার মতে বাস্তু বলতে শুধু গৃহ বা হর্ম্ম্য বোঝায় না, মন্দির, দুর্গ, গ্রাম, নগর, রাস্তা ঘাট, সেতু এবং দীর্ঘিকাদিও বোঝায়। কাজেই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বাস্তুবিদ্যার পরিধিকে খুবই বিস্তৃত করা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় ইন্দো-আর্য্যরীতির প্রাচুর্য্য আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ অঞ্চলে যা' দেখতে পাওয়া যায় তা অতি বিচিত্র ও বিস্ময়জনক—সকল পুঁথিপত্রের নির্দ্দেশকে অপ্রচুর মনে করে এদেশের শিল্পীরা এ পথে অগ্রসর হয়েছে।

পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং সপ্তম শতাব্দীতে উয়াং-চুয়াং [Hiuen Tsang] বাংলাদেশে বহু মন্দির, স্তূপও দেখতে পেয়েছেন ব'লে বর্ণনা করে গেছেন। বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্তূপ পাওয়া গেছে ঢাকার আসবপুরে, রাজসাহীর পাহাড়পুরে এবং চট্টগ্রামে উয়াং চুয়াং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের **পো-সি-পো** বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের **লো-লো-মো-চি** বিহারেরও বর্ণনা করেছেন। এর ভিতর পো-সি-পো বিহারের স্থান নির্ণীত হয়েছে মহাস্থানে। এ বিহারটি ইদানীং ভাসুয়া বিহার নামে পরিচিত। একটা উঁচু পাহাড়ের মত স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে—যার পরিমাণ হচ্ছে ৮০০´×৭৫০´×৪০´। পাহাড়পুরের বিহারটিও অতি প্রকাণ্ড। এটা উভয়দিকে ৯০০ ফুট চওড়া। ধর্ম্মপালের রাজত্বের কালে এই বিরাট বিহারটি রচিত হয়। বাংলার বিশিষ্ট প্রেরণা এবং জগজ্জয়ী আদর্শে স্থাপত্যের এই অপরাজেয় নমুনাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে—কারণ এত বৃহৎ বিহার ভারতের আর কোথাও নেই। এ কৃতিত্ব অসাধারণ বলতে হয়। শ্রীযুক্ত কে. এন. দীক্ষিত বলেন, "No sight monastery of this dimension has come to light in India"। বিপুল শ্রীমিত্রের নালন্দা লিপিতে একে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—"a singular feast to the eyes of the world"। বস্তুতঃ বিরাটের সহিত বাংলার পরিচয় বহুকালের! বাংলায় দ্রাবিড় শীলতার প্রেরণা এসব রচনায় সার্থক ও প্রমাণিত হয়েছে সন্দেহ নেই। ভারতের কোথাও এরকমের কিছু নেই—অথচ বাংলাদেশেই এরূপ কিছু সৃষ্ট হল এর কারণ অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন নেই? বিরাটের বাহুল্য ও উদ্দাম অত্যুক্তি বর্জ্জন করলেও যথার্থ বিরাটত্ব বাংলার প্রিয় ছিল তা' এ শ্রেণীর অন্যান্য সৌধ সৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়।

এ রচনার আর একটি সার্ব্বভৌম দিক্ আছে। এ বিহারটি প্যাগোডারীতিতে নির্ম্মিত হয়েছিল। এই রীতি একটির উপর দ্বিতীয়, তার উপর তৃতীয় এবং এমনি করে'

চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের সাহায্যে ঊর্দ্ধদিকে ছাদ নির্ম্মাণ করে' রচনাকে সুশোভিত করে। ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান এই পদ্ধতি অনুকরণ ও গ্রহণ করেছে। কারও মতে এ পদ্ধতি সুদূর প্রাচ্য অর্থাৎ চীন ও জাপানের সৃষ্টি। পণ্ডিতপ্রবর সিলভ্যাঁ সেভির (Sylvain Savi) মতে এই পদ্ধতির সূত্রপাত হয় ভারতবর্ষে। পাহাড়পুরের বিহার আবিষ্কার হওয়াতে এ বিষয়ে সকল সন্দেহেরই অবসান হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের এই আদর্শ সমগ্র পূর্ব্বপ্রাচ্যভূমি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছে। বাংলার অন্য একটি রীতিও যে সমগ্র ভারতবর্ষ নতমস্তকে গ্রহণ করেছে তা'র বিবরণ পরে দেওয়া হবে।

পাহাড়পুড়ের মন্দিরটির রচনার মত কোন রচনাই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি—এ হ'ল আর একটি বিস্ময়জনক খবর। বাংলার সৃষ্টিশক্তির এই মৌলিকতা দেখে আবাক্ হ'তে হয়। বাংলার ইতিহাস লেখক বলেন; "The Paharpur Monument may be said to have its own distinctive characteristic and no exact parallel has so far been found elsewhere a type entirely unknown to Indian archæology the temple rose in several terraces."*

বাংলার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী এবং তর্কশাস্ত্র হ'তে লব্ধ-অনুপম বিশ্লেষণ-প্রিয়তা একঘেয়ে রচনায় কোনকালেই উৎসাহিত করেনি। আলোচকেরা এখানে একরকমের আদর্শের পরিবর্ত্তে বহু আদর্শের সঙ্গম দেখতে পেয়েছে। "ভদ্র" "রেখা" স্তূপশীর্ষা বহুস্তরের প্যাগোদা এবং শিখরশীর্ষা বহুস্তরের প্যাগোদা প্রভৃতি নানাভঙ্গীর বাংলাদেশের রচনা দেখে পুলকিত হ'তে হয়। এরকমের বৈচিত্র্যপ্রীতি অন্যত্র দুর্লভ। **বরাকরের মন্দিরটি** ভুবনেশ্বরের মত।

এসব ছাড়া বহু মন্দির আছে যাদের রচনাভঙ্গী বিচিত্র ও অভিনব। বর্দ্ধমানের **দিউলিয়া মন্দিরের** অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষ্য করবার ব্যাপার। বাঁকুড়ার **সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে** আর একটি রূপের স্রোতোভঙ্গ দীপ্ত হচ্ছে। সব যেন নূতন নূতন ছবি আঁকা হয়েছে নূতন বিষয়ে নিয়ে। এসব ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীন মনন এবং স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেরণা বারবার অভিনব সুযোগ পেয়েছে সন্দেহ নেই।

পূর্ব্ববঙ্গের মন্দিরগুলির বৈচিত্র্য ও রূপের ডালিও বিস্ময়কর। কতকগুলি মন্দির গির্জ্জার চূড়ার ন্যায় ঊর্দ্ধগামী সরু শিখর কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। বাংলার **জটেশ্বরের প্রাচীন** মন্দিরের অভিনব ছন্দ দেখবার ব্যাপার। এ মন্দির প্রায় হাজার বছর প্রাচীন অথচ এখনও অনুপম শোভায় মণ্ডিত। এতে গতানুগতিক কিছুই নেই। একটা বলিষ্ঠ-প্রেরণা যেন মূর্ত্তিমান্ হয়েছে মন্দিরটির সুদৃশ্য বক্ষে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের মন্দিরগুলির বৈচিত্র্যও বহুমুখী বিভিন্নতা দেখে আবাক্ হ'তে হয়। মানভূমের **পাড়াগ্রামের** মন্দিরটি

* R. C. Mazumdar, History of Bengal P. 505.

যেন একটি মধুর কাব্য। এ অঞ্চলের তেলকুপির মন্দির ভুবনেশ্বরের রীতিকে অনুসরণ করেছে। এখানকার ইটের দেউটিও যেন এক অপূর্ব্বসৃষ্টি—সমগ্র রচনাটি যেন একটা গোলাকার দীর্ঘ আসবাব। সিঙ্গভূমের পঞ্চরত্ন মন্দির এক অপূর্ব্বসৃষ্টি। বাহুলাড়ার মন্দিরটিকে যেন একটা সম্পূর্ণ আধুনিক cubic ছন্দে অঙ্কিত রচনারূপে মনে হয়। এ সমস্ত রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে যে এদের একটি আর একটির মত মোটেই নয়। সবই যেন অভিনবত্বের দাবী করে' উর্দ্ধশিরে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুতঃ এত বিচিত্র বহুত্বের সৃষ্টি ভারতের আর কোথাও দেখা যায়না। সব জায়গায় এক একটি প্রদেশের রীতি একটি আদর্শকে মুখ্য করে নিজের প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করেছে। বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সবসময় মনঃপূত হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশের রচনা মোটেই একঘেয়ে হ'তে পারেনি। বাংলার কাব্য ও সাহিত্যে যেমন, আলাওল, ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিরা বিভিন্ন রকমের সাহিত্য সৃষ্টি করে' সকলকে পুলকিত করেছে—তেমনি সৌধকলায়ও অফুরন্ত সৌন্দর্য্যস্বপ্ন রূপগ্রহণ করেছে বিভিন্ন ও বিচিত্র আকার নিয়ে। এ সমস্ত সৃষ্টি লঘুভাবে বিচার করলে অনেকটা অপ্রত্যাশিত রচনা মনে করা যেতে পারে, বস্তুতঃ তা নয়। এ সব সৃষ্টিতে প্রমাণিত হয় বাঙ্গালী জাতি নূতনত্বের প্রেমিক—সে একঘেয়ে বা একটানা কোন রচনা কোন কালেই পছন্দ করেনি। এই নূতনত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম বিচারে যা' মৃত্যু হ'তেও অমৃতের পথ খুঁজে পায়।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সমস্ত সৌধগুলির বিচিত্র ছন্দ সমগ্র বাংলাদেশের রক্তগত উত্তেজনার স্মৃতি বহন করছে। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রাচীনতার মানদণ্ড নিয়ে পরিমাপ করবার উৎসাহ এক্ষেত্রে অতি তুচ্ছ ব্যাপারই হয়ে পড়ে। উড়িষ্যার গগনভেদী মন্দিরের চাতুর্য্য, খাজুরাহোর সপ্রতিভ আয়োজন, হালেবিদের আলঙ্কারিক মুখরতায় ভারতীয় স্থাপত্যকলা নিঃশেষ হয়নি। স্থপতিরা শুধু এরকমের মহাকাব্য রচনা করে' এ দেশে কর্ত্তব্য শেষ করেনি—তারা ব্যক্তিগত স্বপ্নের পরম্পরা সৃষ্টি করতেও অগ্রসর হয়েছে। এ সমস্ত lyric বা গীতিপ্রাণ রচনা দেশকালের সমগ্র সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধনকে তুচ্ছ করতে পরাঙ্মুখ হয়নি।

বাংলাদেশ ভাবপ্রবণ, স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ও মননশীল। কাজেই এখানকার রচনার প্রাচুর্য্য নানারসসম্ভারকে বহন করতে উদগ্রীব, স্বাধীন ছন্দে সকল রচনাকে গলিত ও প্রবাহিত করতে উন্মনা এবং প্রতি সৃষ্টিতে মনসিজরাগের হিল্লোল দ্যোতিত করতে উৎসাহিত। বাংলাদেশের সৌধশিল্পে এরকমের অসাধ্য সাধন হয়েছে। সচরাচর স্থাপত্যের ধারাগুলি প্রায়ই ঐক্যের ছন্দে বিগলিত হয়। ইউরোপের মধ্যযুগের সুদৃশ্য cathedral বা গির্জ্জাগুলি প্রায়ই একরকমের। ভিতরকার অসংখ্য খিলানগুলির অফুরন্ত ঘাতপ্রতিঘাত সমগ্র রচনাকে জাগ্রত করে তোলে। বাইরের দৃশ্যপটও অনেকটা এক রকমের। মুসলমান শিল্পীর

মসজিদগুলিও গম্বুজ, মিনার ও চত্বরের একঘেয়ে সংগ্রহ বহন করে আস্‌ছে। তার ভিতর বৈচিত্র্যসঞ্চার সব সময় সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে সকল সম্ভাবেরই বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়ে থাকে। এমনকি অতি কঠিন বিধিনিষেধে প্রতিহত ইস্‌লামের সৌধকল্পনাও বাংলাদেশে এসে রূপান্তর গ্রহণ করেছে। এরকমের কৃষ্টিগত পরিবর্ত্তন এবং ভাবগত বিপ্লব অন্যত্র খুব কমই দেখা যায়।

গৌড়ের স্থাপত্যকলা এখনও জগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শ্বেতভক্তির পক্ষে লোভনীয় ও প্রিয় শ্বেতমর্ম্মের সৃষ্টি এখনও সকলের চিত্তবিনোদন করেছে অসামান্যভাবে। কালো পাথরের রচনা সে রকম প্রীতির চোখে বিচার করা সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন; কাজেই উপকরণের দিক হ'তে যে বাধা বাংলাদেশের প্রাপ্য তা' পেয়েও সে উপকরণের সামান্যতাকে অতিক্রম করবার সাধনা বাংলাদেশে পরে এসেছে। ফলে গৌড়ের স্থাপত্য একটি অভূতপূর্ব্ব রূপবিতান সৃষ্টি করে' সকলের তাক লাগিয়েছে!

বাংলাদেশে গৌড়ের স্থাপত্য এক অভাবনীয় কীর্ত্তি। আদিনার মসজিদের সারি সারি খিলানের অফুরন্ত শ্রেণী দেখে অবাক হতে হয়। এই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যটির তুলনা পাওয়া কঠিন। ছোট সোনা মসজিদের রচনাকাল ১৮৯৩ খ্রীঃ। এই মসজিদটির উপরকার গম্বুজগুলি সোনার রঙে ভূষিত করা হত। মধ্যভাগে বাংলার কুটিরের বঙ্কিম চালের ভঙ্গীতে রচিত একটি গম্বুজও আছে। এসব গম্বুজ সোনার রঙে চিত্রিত হয়ে এক অপূর্ব্ব শোভা বহন করত যা উত্তর বা দক্ষিণাঞ্চলের রচনায় সম্ভব হয়নি। মসজিদের উপর সোনার রঙ দেওয়ার রীতি এ দেশেই সূচিত হয়। সোনার রঙে আবৃত এ মসজিদটি সহজেই এ শ্রেণীর সকল রচনাকেই হতপ্রভ করে দেয় কারণ পৃথিবীর কোথাও মসজিদকে এরকমের রঙে সুশোভিত করার নমুনা পাওয়া যায়না।

গৌড়ের বাদশাহগণ বহু মসজিদ তৈরী করেন। এগুলির ভিতর একটি অন্যটির মত নয়। প্রত্যেকটির ভঙ্গী, ছন্দ ও রচনাপদ্ধতি বিভিন্ন। কদম রসুল মসজিদ, তাঁতি পাড়া মসজিদ, লোটন মসজিদ যেন এক একটা স্বতন্ত্র কাব্য! লোটন মসজিদ রঙীন porcelain এর সাহায্যে মণ্ডিত হয়—এই মসজিদখানিও ভারতে একটা নূতন দিগন্ত সূচিত করে।

বিস্ময়ের বিষয় বাংলাদেশে এসে পাঠানেরা তাদের নিজেদের আদিম সংস্কার ও প্রেরণা যেন অনেকটা ভুলে যায়। তারা অনেকটা বাঙালীই হয়ে পড়ে—এজন্য কখনও বাংলার বাদশাহেরা লজ্জিত হয়নি। বাংলার বাদশাহগণই বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য নিজেদের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে। বহু হিন্দু কবি মুসলমান বাদশাহগণের প্রশস্তি করে নিজেদের কাব্যের সূচনা করেছে। পরাগলী মহাভারত, ছুটিখাঁর মহাভারত প্রভৃতি বহু সুপরিচিত গ্রন্থ বাদশাহদের অসামান্য উদারতা প্রকাশ করে। স্থাপত্যক্ষেত্রেও পারস্য

বা আরবভূমির আদর্শ আমদানি করতে বাংলার কোন বাদশাহ উৎসাহিত হয়নি। ফতেখাঁর মসজিদখানি একেবারে একখানি বাঙলার কুটিরের ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে। এ রকম মসজিদ জগতের আর কোথাও পাওয়া যাবেনা।

বাংলার কুটিরের ভঙ্গীতে একরকমের গম্বুজ রচনা এ সময় হতে প্রচলিত হয় বাংলাদেশে। এ রচনাটি বাংলার একান্তভাবে মৌলিক সৃষ্টি। স্থাপত্যক্ষেত্রে গতানুগতিক রচনা ছাড়া আর কিছু উদ্ভাবন করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পী এক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব অর্ঘ্য দান করেছে। অবনত চারকোণের রেখা ও কঠিন কোণের এক রূপগত সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে এখানকার স্থপতিরা অমর হয়েছে। এ রকমের ছন্দ সমগ্র ভারতে অনুকৃত হয়ে প্রশস্তি লাভ করেছে। জয়পুরের স্থাপত্যে বাংলার এই দান শিরোধার্য্য করা হয়েছে। শিখদের স্বর্ণমন্দিরের শীর্ষভাগে এরকমের রচনার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ গৌরব বাংলাদেশের পক্ষে সামান্য নয়। এ সমস্ত রচনার কাল হচ্ছে চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী।

বাংলার স্থাপত্যক্ষেত্রে এই মুসলমানকীর্ত্তিই শেষ কীর্ত্তি নয়। সম্পুর্ণভাবে বাংলার মনোবিহারকে আয়ত্ত ও শ্রদ্ধা করে' গৌড়ের পাঠানরাজগণ এদেশের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে গেছে। আজ সে যুগের বাদশাহগণ অন্তর্হিত হলেও তাদের স্থাপত্যকীর্ত্তি এ বিষয়ে অভ্রান্তভাবে সাক্ষ্য দেবে। সমসাময়িক এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলার আর একটি স্বাধীনরাজ্যের স্থপতিগণ বাংলার স্থাপত্যের এক অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে গেছে। কলিকাতা হতে মাত্র একশত পঁচিশ মাইল দুরে বিষ্ণুপুর সহর এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এ সহরটি মল্ল-রাজগণের রাজধানী ছিল। এই বংশটি আদি মল্ল রঘুনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। মল্লরাজবংশ বিষ্ণুপুরে বহুমন্দির নির্ম্মাণ করে। এর ভিতর প্রত্যেকটির রূপভঙ্গীই মৌলিক ও স্বাধীন। এখানকার মদনমোহন মন্দিরের শ্রী অতুলনীয়। ইন্দোআর্য্য পদ্ধতির সহিত বাংলার কুটির-লালিত্য সঙ্গত করা হয়েছে এই সৌধে! বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরে বাংলার চালাঘরের মর্য্যাদাকে যেন তুরীয় স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। যুগ্মভাবে রচিত এ মন্দিরের অষ্টকোণের উচ্ছ্বসিত আবর্ত্তন সমগ্র ভারতীয় স্থাপত্যে অভিনব ব্যাপার। এখানকার রাসমঞ্চে লীলায়িত ক্রম ও হিল্লোলিত অঙ্গগৌরব একটা পিরামিড-সুলভ ছন্দকে আঁকড়ে আছে এক অভিনব রূপগত মিলনের ক্রোড়ে! জোড়বাংলা মন্দিরের গাত্রে নানা ছন্দ উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মুসলিম রচনায় এ অধ্যায় সম্ভব হয়নি। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির দেবলীলা ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরকন্না, পল্লীজীবন, পশুপক্ষী জীবনের অনেক কাহিনী মন্দিরগাত্রে খোদিত করা হয়েছে।

মল্লরাজগণের এই রাজ্য ১৭৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। বাংলার স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে যতটা

চিন্তার স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় ততটা বিষ্ণুপুরে সম্ভব হয়েছিল। এজন্য এখানকার মন্দিরগুলির সুগঠিত দেহভঙ্গী ও লীলায়িত নক্সা সকলকে বাংলার সভ্যতার পরম বিশিষ্টতার স্মৃতিপথে নিয়ে আসে। বাংলার রচনা চিরকালই বৈচিত্র্যের প্রতি আকৃষ্ট—বহুত্বের ভিতর ঐক্যকে নয়—ঐক্যের ভিতর বহুত্বকে লক্ষ্য করা—অথচ সে ঐক্য হ'তে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়া—এরকমের মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণাতেই ছিল বাঙালীর ঐশ্বর্য্য। এজন্য ইংরাজ আমলে যখন কলিকাতা রাজধানী হয়ে পড়ে তখন ভারতবর্ষের সকল জাতি এখানে এলেও বাঙালী সেজন্য ভীত হয়নি। বরং সে অতিথিবৎসলরূপে সকলের শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করে। বাংলাদেশ শুধু বাংলারই জন্য—এরকম কুণোভাব কখনও বাঙালীর মনে স্থান পায়নি। বহুকে বর্জ্জন করে বাঙালী আনন্দ পায়না—বাঙালী চিরকালই বাহিরকে আপন করে তৃপ্ত হয়েছে। রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনীর কথা বাঙলার সাহিত্যিকগণই প্রচার করেছে—শিবাজীর সংগ্রাম এবং প্রতাপ সিংহের হলদি ঘাট বাঙালীকেই আন্দোলিত করে বেশী।

বাঙালীর স্থাপত্যে বাংলার এই স্বাধীন মনন, স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি ও বৈচিত্র্যের রসগ্রহণের প্রেরণা দেখা যায়। ভৌম দিক হতে বাঙালী এমন বিহার তৈরী করেছে যার তুলনা সমগ্র ভারতবর্ষে নেই। আলঙ্কারিক দিক হতে বাঙালী বহু নক্সা, ছন্দ ও স্থাপত্যরীতির পথ-প্রদর্শক হয়েছে। শুধু একদিকে নয়—স্থাপত্যের সকলদিকে বাংলার দান বিরচিত হয়েছে। সূক্ষ্মদিকেও নানা বৈচিত্র্য যেমন অফুরন্ত জীগিষায় বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি বিরাটের দিকেও বাঙালী অন্ধ কোন কালেই হয়নি। বাংলার স্থাপত্য সমগ্র ভারতীয় রচনাক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। সে অধ্যায় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা প্রয়োজন। বাইরে সব কিছু পাওয়া যাবে ভেবে যারা ঘরের দিকে তাকায় না তাদের পক্ষে সৌন্দর্য্যচয়ন কঠিন হয়। স্থাপত্যক্ষেত্রে বাংলার রচনার যথোপযুক্ত বিচারই হয়নি। শুধু পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পদচিহ্নে অগ্রসর হয়ে অধিকাংশ জ্ঞানার্থী দুস্তর পঙ্কে পড়ে গেছে।

আধুনিক যাত্রা

করালীকান্ত বিশ্বাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে নূতন করিয়া যে যাত্রার প্রচলন হইয়াছিল তাহাকেই আধুনিক যাত্রার সূত্রপাত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রথম দিকে এই যাত্রা বিষয় ও রীতিতে প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু যে কারণে প্রাচীন

যাত্রার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে অনুরূপ কারণেই আধুনিক যাত্রার' শৈশব সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য পাওয়া কঠিন। তখনকার দিনে ছাঁপাখানার প্রসার হয় নাই, নির্ভরযোগ্য পুঁথি অথবা তাহার বিবরণও যথেষ্ট পাওয়া যায় না। বাংলা নাটকের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের এই অন্যতম গ্রন্থিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই চারিটি ইঙ্গিতের নির্ভর করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করা ছাড়া আপাতত অন্য কোনও উপায় নাই। অনুসন্ধিৎসুদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে হয়ত আরও উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

যাত্রাকে পূর্ব্বে বলা হইত যাত্রাগান। এখন আমরা বলি যাত্রা অভিনয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যাত্রাকে যাত্রাগান বলা হইত—অর্থাৎ উহাতে অভিনয়ের অংশ অপেক্ষা গানের অংশই বেশী ছিল। ইহা প্রাচীন রীতিরই পুনরাবৃত্তি। পাঁচালি, কথকতা, হাফ আখড়াই, তরজা, কবি প্রভৃতিতেও গানই ছিল প্রধান উপাদান—ইহার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই নাটক না হইলেও নাটকীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এই অনুষ্ঠানগুলির বহু সমাদর ছিল। সখের যাত্রার সহিত ইহার পার্থক্য প্রধানত বিষয়ে ও অভিনয়ের লোকসংখ্যায়। সখের যাত্রায় এই অনুষ্ঠানগুলি হইতে কিছু কিছু উপাদান স্থান পাওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন যাত্রা হইতে সখের যাত্রায় রীতির দিক হইতে এই সামান্য পার্থক্যটুকু থাকিতে পারে; বিষয়ের দিক হইতে সখের যাত্রার নূতনত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্যাসুন্দর আখ্যান অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সখের যাত্রার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। পৌরাণিক কাহিনীও স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করে।

সখের যাত্রা সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকায়' একটি মন্তব্য আছে—মন্তব্যটি প্রসঙ্গত, সখের যাত্রা সম্বন্ধে কোনও রচনা নহে। কলিকাতায় একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত পত্রের সম্পাদিকীয় স্তম্ভে সখের যাত্রার উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় সখের যাত্রার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও উহা লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও বলিয়াছেন যে এখন, সখের যাত্রার অনুষ্ঠান ত কদাচিত হইয়া থাকে। 'সমাচার চন্দ্রিকার' ১৮২৬ সালের সম্পাদকীয় এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সখের যাত্রার প্রচলন কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সখের যাত্রা ইংরেজী ধরণের নাটকীয় অনুষ্ঠানের সহিত কোনও অংশে তুলনীয় কি না তাহা সম্পাদক মহাশয় বলেন নাই।

মুদ্রিত পুস্তকাদিতে পরবর্ত্তী যুগে কোথাও কোথাও সখের যাত্রার উল্লেখ আছে, দুই একজন লেখক তাহার অল্পাধিক সমালোচনাও করিয়াছেন। 'কীর্ত্তিবিলাস' নামক নাটকখানি অনুরূপ একটি পুস্তক। লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। নাটকটির প্রথম প্রকাশকাল

১৮৫২ এবং প্রথম মৌলিক ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন:

"......অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে যাত্রা নামে এক প্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই, অভিনয় ক্রমশ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই, যে যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি সুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে। যদি সাধারণ উৎসাহে পণ্ডিত লোকেরা সমস্ত রচনা করে তবে যাত্রার উৎকৃষ্টতা জন্মে তাহার কি সন্দেহ।..."

লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন, উক্ত ভূমিকাতেই সেনেকার উল্লেখও করিয়াছে। তথাপি এই নাটকখানি প্রথম মৌলিক রচনার গৌরব ছাড়া অপর কিছু দাবী করিতে পারে না। কিন্তু ভূমিকাটি নানাদিক হইতে তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভূমিকাটি পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

'কীর্ত্তিবিলাস' নাটকের প্রকাশকালের প্রায় সমসাময়িক তারাচরণ শীকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক। এই গ্রন্থটির ভূমিকাতেও যাত্রা সম্বন্ধে আছে, উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

"......এতদ্দেশীয় কবিগণের প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃতভাষায় প্রচলিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশের নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলা অনুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় কেবল সঙ্গীতদ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ।"......

উপরোক্ত দুইটি উদ্ধৃতি হইতে সখের যাত্রার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রার মত সখের যাত্রাতেও বক্তৃতার স্থান ছিল না—আদ্যোপান্ত ছিল গান। 'শৃঙ্খলা অনুসারে অভিনয় সম্পন্ন' হইত না, এই উক্তিদ্বারা তারাচরণ শীকদার কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন বলা যায় না। তবে মনে হয় তিনি অভিনয়কালে অভিনেতার *improvisation*-এর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। সমসাময়িক কবি তরজা প্রভৃতির প্রভাবে অভিনেতারা হয়ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া আপন আপন কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু গানের মধ্যে এইরূপ *improvisation* অথবা *entempre* উক্তির স্থান নিতান্তই কম। কাজেই গান-অতিরিক্ত কিছু কিছু বিষয় অভিনয়ে স্থান পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত 'কীর্ত্তিবিলাসের' ভূমিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বাঙালী দর্শকের হাস্যরস-প্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। তারাচরণ শীকদার তাহাকেই 'অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণের' ভণ্ডামি আখ্যা দিয়াছেন। মূল গ্রন্থের সহিত সঙ্গতি না থাকিলে এইরূপ হাস্যরসের

অবতারণা নিন্দার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা বিষয়ের কথা শীকদার মহাশয় চিন্তা করেন নাই, যোগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন। নাটক অথবা নাটকীয় অনুষ্ঠান সাধারণের পোষকতায় প্রসার লাভ করে। কাজেই জনসাধারণের দাবী স্বীকার করিয়াই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে। হাস্যরসের অবতারণা সাধারণ দর্শক চায়, তাহার স্থান লেখককে করিতেই হইবে। হালকা হাসি এবং ব্যঙ্গ জাতি-হিসাবে বাঙ্গালীর প্রিয়। বাংলা রামায়ণে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে তাহার স্থান আছে। যাত্রাগানের একটা গানের স্রোতের মধ্যে বৈচিত্র্যের জন্যও হাস্যরসের অবতারণার প্রয়োজন ছিল। অভিনেতাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হাস্যরস অবতারণার পরোক্ষ কারণ হইতে পারে।

গানের মাধ্যমে যে নাটকীয় বিষয়ের প্রকাশ তাহাতে action অথবা ঘটনা-সংঘাতের অবকাশ কম। ইয়োরোপীয় অপেরাতেও আগাগোড়াই গান—তথাপি লোহেন গ্রীন, লা বোহেম প্রভৃতি বিখ্যাত অপেরায় নাটকীয় সংঘাত প্রচুর। আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক যাত্রার প্রথম যুগে অনুরূপ সংঘাত না থাকিবার কারণ ইহাই যে বাংলাদেশের প্রাচীন যাত্রার প্রকাশরীতিতে সংঘাত অথবা action এর সুযোগ খুব কমই ছিল।

'কীর্ত্তিবিলাসে'র লেখক দেশজ নাট্যরীতির প্রতি পণ্ডিত এবং প্রকৃত অধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ক্ষমতাবান লেখকদের দৃষ্টি যদি এই দিকে পড়িত তবে বাংলা দেশে প্রকৃত জাতীয় নাটক গড়িয়া উঠিতে পারিত। প্রাচীন যাত্রাকে সুগঠিত কাঠামোর মধ্যে আনিয়া তাহাকে নূতন রূপে রূপায়িত করিয়া তুলিবার চেষ্টা কেহ তখন করেন নাই, কীর্ত্তিবিলাসের লেখকও নহে। তিনি বরং সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে নান্দী ও সূত্রধারের অবতারণা করিয়াছেন এবং 'সেনেকা নামক রোম দেশীয় পণ্ডিতের' অনুকরণে তথাকথিত ট্রাজেডি রচনা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। যে 'উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব' এর উল্লেখ তারাচরণ শীকদার করিয়াছিলেন 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক তাহা দূরীকরণে একটুও সাহায্য করে নাই।

বাংলা দেশের নাটকের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে সখের যাত্রার কতখানি স্থান অথবা তাহার প্রভাব কতখানি তাহার প্রামাণিক আলোচনা সম্ভব নহে। নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে বর্ত্তমান অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হইতে পারে। 'হিন্দু পায়োনিয়ার' পত্রিকার মারফতে আমরা জানিতে পারি যে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে বিদ্যাসুন্দর নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে সখের যাত্রা অভিনয় পূর্ব্বেও হইয়াছিল। শ্যামবাজারের এই অভিনয় পূর্ব্বের কোনও পুঁথি অবলম্বনে অথবা নূতন রচিত কোন নাটকের কিনা তাহা জানা যায় না। 'হিন্দু প্যায়োনিয়ার' পত্রিকার আলোচনা হইতে মনে হয় যে তাহাতে ডায়ালগ ব্যবহৃত

হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার উদ্ধৃতির উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে সখের যাত্রার প্রথম যুগে ডায়ালগ খুব কমই ব্যবহৃত হইত। অতএব প্রাচীন ও সখের যাত্রার মধ্যে প্রথম যুগে ফর্ম্মের দিক হইতে কোনও পার্থক্য ছিল না। প্রাচীন যাত্রার একটি পালা একাদিক্রমে কয়েকদিন ধরিয়া অভিনীত হইত। এখনও বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ যাত্রার প্রচলন আছে। সখের যাত্রা এইরূপ একাদিক্রমে অভিনয় হইত না। কেননা যাত্রা যাহাদের পেশা নহে তাহাদের পক্ষে দিনের পর দিন অভিনয় চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। সংক্ষিপ্ত পালা সখের যাত্রার নূতন উদ্ভাবন। পরবর্ত্তী কালে নাটকের পালা আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সখের যাত্রার অপর বৈশিষ্ট্য কৌতকাভিনয়। মূল কাহিনী অতিক্রম করিয়া কৌতুক অভিনয়ের অবতারণা করা হইত। এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাইতেছে তারাচরণ শীকদারের ভূমিকা হইতে। বর্ত্তমান কালে কৌতুকাংশ বাংলা নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সখের যাত্রার কৌতুকাভিনয়কে কেবলমাত্র *relief* অথবা *interlude* মনে করা ঠিক নহে। সখের যাত্রায় অনেকগুলি অভিনয়োপম অনুষ্ঠানের উপাদান মিশিয়াছে। জেলে-জেলেনি, ঘেসেড়া-ঘেষেড়ানীর অভিনয়ে খেউরের প্রভাব আছে নিশ্চয়ই। যাত্রার এই অংশগুলির রুচির বিকার দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া বরং ভাবিয়া দেখা উচিত উৎকৃষ্ট 'ব্যালে' সৃষ্টি করিবার কি অপূর্ব্ব সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। সে যাহাই হউক, নানা বিবর্ত্তনের পরে কৌতুক অভিনয় আধুনিক নাটকের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশিরকুমার ভাদুরী 'সীতা' অভিনয়েও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ দর্শকের তাহাতে সাগ্রহ সমর্থন ছিল। নাট্যাভিনয় সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই। লেখক ও প্রযোজকদের কর্ত্তব্য জনপ্রিয় উপাদান গ্রহণ করিয়া তাহাদের রুচি উন্নততর করিবার চেষ্টা করা। গান সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

প্রাচীন যাত্রা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সখের যাত্রা নাটকের ক্রমোন্নতির একটি সোপান নিশ্চয়ই। প্রকৃত নাটক সৃষ্টির পথে সখের যাত্রায় গানের আধিক্য অন্যতম বাধা হইলেও তাহাকেই প্রধান মনে করিবার কারণ নাই। নাটক বিকাশের জন্য যে সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন, বাংলা দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার অভাব অনেক সময়েই অনুভূত হইত। বিরূপ প্রতিবেশেও যে প্রাচীন যাত্রা হইতে সখের যাত্রার উদ্ভব হইতেছিল তাহা অগৌরবের নহে।

আধুনিক যাত্রার সহিত সকলেই সমধিক পরিচিত। ইয়োরোপীয় আদর্শে রচিত বাংলা নাটক ও দেশজ প্রাচীন যাত্রার মিশ্রণে উহার সৃষ্টি। দেশজ প্রাচীন যাত্রার *actiori* অথবা *conflict* এর স্থান ছিল না বলিলেই হয়। ইয়োরোপীয় নাটকের উহাই প্রাণ। এই দুইটি বিপরীত আদর্শের মিশ্রণে যাহার উৎপত্তি তাহা যদি খুব উন্নত শিল্পকলার পরিচায়ক

না হয় তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আধুনিক যাত্রায় এই কারণেই এমন অনেক কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহার পূর্ব্বাপর কোন সঙ্গতি নাই। কলিকাতায় এবং মফঃস্বল শহরে যখন নূতন নাটকের অভিনয় হইতে লাগিল তখনই আধুনিক যাত্রার পূর্ণতর বিকাশ। কলিকাতার অভিজাত দর্শকদের সম্মুখে যাহা কল্পনাতীত যাত্রার আসরে তাহা অনায়াসে চালাইয়া দেওয়া যায়। যাত্রাগানের রচয়িতারা ইহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দর্শকেরা কি চায়—দর্শকের রুচি উন্নত করিবার কোনও দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। নাটকের নূতনত্ব মোহ সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রারচয়িতারা দর্শকগণকে তাহাই পরিবেশন করিয়াছেন যাহা সহজ পরিচয়ে তাহারা অনায়াসে গ্রহণ করিবে। কোনরূপ দুঃসাহসিক পরীক্ষার কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। তাই যাত্রার কথায় কথায় গান, নানারকম সঙের ভাঁড়ামি।

সে যুগের যাত্রা-অধিকারীদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী প্রভৃতি যথাসম্ভব প্রাচীন রীতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। হয়ত তাঁহাদের এই চেষ্টা ইচ্ছাকৃত নহে, নূতনত্বের প্রতি অবিশ্বাস এবং নূতনকে গ্রহণ করিবার সাহসের অভাবেই হয়ত গতানুগতিক পুরাতন রীতি বজায় রাখিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন। এই অধিকারীদের যাত্রা পালায় গানের আধিক্য বেশী, নাচ অথবা সঙের আয়োজন অপেক্ষাকৃত কম ছিল, অপরদিকে মহেশ চক্রবর্ত্তী, বৌ মাষ্টার, ঝোড়ো, উমেশ মিত্র, মদন মাষ্টার, লোকা ধোপা প্রভৃতি সমসাময়িক নাটকের ছাঁচে ঢালিয়া নূতন যাত্রা সৃষ্টি করিলেন। নাটকের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়া নাচগানের প্রাচুর্য্য ও সঙের অবতারণা অধিকমাত্রায় করিতে হইয়াছিল। এই শেষোক্ত অধিকারীর দলই প্রাচীন যাত্রা লোপের অন্যতম কারণ। সস্তা জাঁকজমকে আসর মাৎ করিয়া, দর্শকদের রুচি তাঁহারা বিকৃত করিতেই সাহায্য করিয়াছিলেন।

যদিও হরিশচন্দ্র মিত্র এবং হরিমোহন কর্ম্মকারই যাত্রাভিনয়ের উপযোগী নাটক প্রথম রচনা করেন তথাপি মনোমোহন বসুই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যাত্রাপালার স্রষ্টা। তাঁহার রচিত নাটকে বহু গান থাকিত বলিয়া তাহা যাত্রার পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহা ছাড়া তিনি, অনেক প্রচলিত নাটকে গীত সংযোজিত করিয়া তাহা যাত্রাভিনয়ের উপযোগী করিয়া দিতেন। কবিগান ও পাঁচালি রচনা করিয়া তিনি পূর্ব্বেই সাহিত্যের আসরে পরিচিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সহিতও তাঁহার নাম জড়িত। মনোমোহন বসু তখনকার ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন নাই, কাজেই আদর্শ সন্ধানে তাঁহাকে সমসাময়িক বাংলা নাটক ও প্রাচীন পালাগানের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিনি অন্যতম মন্ত্রশিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের দোষগুণ উভয়ই তাঁহার

রচনায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যাত্রাগান ও পাঁচালী রীতির সহিত সমসাময়িক বাংলা নাটকের আদর্শ মিশাইয়া তিনি আধুনিক যাত্রার সৃষ্টি করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সমসাময়িক বাংলা নাটকের মারফতে তাঁহার রচনার উপর পরোক্ষভাবে ইংরেজী প্রভাব পড়িয়াছিল। তথাপি একথা বলিতে পারা যায় যে তাঁহার রচনায় দেশজ উপাদানই অধিক স্থান পাইয়াছে।

মনোমোহন বসু যখন যাত্রাগান রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন কলিকাতার অলিতেগলিতে অভিনয়ের মরশুম লাগিয়াছে। রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত ব্যয়সাধ্য, এবং তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় হইত তাহা অনেকের ভাগ্যেই দেখিবার সুযোগ হইত না। ধনীব্যক্তিদের গৃহে বহুমান্য অতিথিদের সম্মুখে অভিনয় হইত। সাধারণ তাহার কাহিনী শুনিত মাত্র। নাট্যাভিনয় জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয়। তাই সাধারণের অনুচ্চারিত প্রয়োজন ছিল আধুনিক যাত্রার মত আড়ম্বরহীন ব্যয়বাহুল্যহীন নাট্যানুষ্ঠানের।

আরও একটি কারণে আধুনিক যাত্রা প্রসার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। রঙ্গমঞ্চ ও তাহার কলাকৌশল একমাত্র শহরেই সম্ভব। ইংরেজ আমলে অনেকগুলি মফঃস্বল শহর পড়িয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু একমাত্র কলিকাতাতেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব আছে। মফঃস্বলের নাট্যালয়গুলি নিতান্তই এ্যামেচারি ব্যাপার। ইংরেজ অধিকারের পরেদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্ত্তিত হইলেও মূলত দেশ কৃষিপ্রধানই রহিয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষির প্রাধান্য ছিল আরও বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক পরিবেশ যাত্রাগানের মত একটি শিল্পকলাকে প্রসার লাভ করাইবার পক্ষে অনুকূল। অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব ছাড়া আমাদের দেশজ নাটকের ট্রাডিশনও যাত্রা ঘেঁসা। ট্রাডিশনের একান্ত অনুকরণে ট্রাডিশন রক্ষা করা যায় না নূতন বিষয়ের সংযোগেই ট্রাডিশন প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। এলিয়টের যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে ট্রাডিশন স্থাণু নহে—পরিবর্ত্তন ও বিকাশের অবকাশ তাহাতে আছে। আমাদের প্রাচীন যাত্রারীতিতে নূতন প্রাণসঞ্চার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সচেতনভাবে না হইলেও মনোমোহন বসু এই প্রার্থিত নূতনত্ব সংযোগ করিয়া আমাদের দেশজ নাটকীয় রীতির ট্রাডিশন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক বাংলা নাটক তাঁহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াও দেশজ নাট্যরীতির অগ্রগতির প্রকৃত সহায়ক হইতে পারেন নাই। তাহার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট—তাঁহার সমস্যাটি এ ভাবে চিন্তা করেন নাই। নাট্যাভিনয়ের উপরোক্ত কয়েকটি অসুবিধা দূর করিতে এবং স্বাভাবিক আকর্ষণে জনপ্রিয় উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনোমোহন বসুর নাট্যরচনা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইল এইজন্য যে

তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যাত্রাপালা রচয়িতারা মনোমোহন বসুর রচনাই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আদর্শের ত্রুটিগুলি পরবর্ত্তী রচনায় আরও প্রকট। মতিলাল রায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা কেহই মনমোহন বসুর পদ্ধতিকে আরও মার্জ্জিত করিয়া যাত্রাগানকে উন্নত করিয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই।

পূর্ব্বে হরিমোহন কর্ম্মকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। যাত্রাপালা রচনা ছাড়া তিনি একটি নূতন আর্ট ফর্ম্ম সৃষ্টির দাবী করিয়াছিলেন। তিনি একাধিক 'গীতিকা' রচনা করিয়াছেন। 'গীতিকা' কথাটি তিনি ইংরেজী 'অপেরার' প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। হরিমোহনের 'জানকী বিলাপ' ও 'মালিনী'র সহিত ইয়োরোপীয় অপেরার সাদৃশ্য অল্পই। প্রাচীন যাত্রায় বক্তৃতা থাকিত না, হরিমোহনের গীতিকাতেও বক্তৃতা নাই। হরিমোহন বাংলা অপেরা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীযুগে গীতিনাট্যের তিনিই জনক। উত্তরকালে গীতিনাট্য বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল।

কীর্ত্তন

মণিলাল সেনশর্ম্মা

প্রথমেই বলে রাখি যে কীর্ত্তনকে অনেকেই বাংলার লোকসঙ্গীত অর্থাৎ পল্লীর অপকর্ষ সঙ্গীত বলেছে সে কথাটি মারাত্মক ভুল। কীর্ত্তন প্রাচীন ভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতেরই অঙ্গ। অনেকেরই ধারণা সারা ভারতে যে প্রাচীন সঙ্গীত প্রচলিত তার সঙ্গে কীর্ত্তনের যোগ নেই ও উত্তরভারতীয় ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরীই সুপ্রাচীন এবং সারা ভারতের উৎকর্ষ সঙ্গীতের যোগ্য প্রতিনিধি; সে কথাটিও সঠিক নয়। বরং কীর্ত্তন প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠিরই প্রতিনিধি। উত্তরভারতীয় সঙ্গীত-শ্রেণীগুলি তার পরবর্ত্তী উৎকর্ষ।

জয়দেবকে আমরা দেখতে পাই বার শতকের শেষ দিকে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে কীর্ত্তন রচনা করেছেন সংস্কৃতে। উত্তরভারতীয় বহুল প্রচারিত ধ্রুপদ খেয়াল তার অনেক পরবর্ত্তী রচনা। ধ্রুপদের রচনাকাল ষোল শতকের শেষে আর সতের শতকে তার প্রসিদ্ধি। জয়দেব যে কীর্ত্তন লিখেছিলেন সেগুলি তখন সারাভারতে (উত্তর ও দক্ষিণ) যে উৎকর্ষ সঙ্গীত চলছিল সে পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত, গঠিত ও গীত হয়েছিল। তবে বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের লীলা। প্রাচীন মার্গ-সঙ্গীতের উৎকর্ষ বাংলায় তখন খুব

চলছিল দেখতে পাই। কেননা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে এমন অনেক তাল ও রাগের নাম পাই বর্ত্তমানে সেগুলির ব্যবহার বাংলায় বহুল প্রচারিত উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে পাই না অথচ দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতে এখনও পাই এবং বর্ত্তমান কীর্ত্তনে এখনও রয়েছে। গীত-গোবিন্দের গানগুলি মার্গ সঙ্গীতের সুরে তালেই বাঁধা। সেগুলি এখনও সেরূপ সুরে ও তালেই গাওয়া হয়। কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে দুএকটি গান এখনও জানা আছে। 'রতিসুখসারে' গানটি বাংলার কীর্ত্তনীয়াগণ যে সুরে ও তালে গায় অনুরূপ সুরে ও তালে একজন দক্ষিণী সঙ্গীতজ্ঞ কলিকাতায় দক্ষিণভারতীয় প্রবাসীদের রসিকরঞ্জন সভায় আহুত হয়ে এই গত গ্রীষ্মে গেয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় গীতগোবিন্দের গানগুলি মান্দ্রাজীদের সঙ্গীতজ্ঞ নারীপুরুষ সকলের মধ্যেই সমধিক প্রচলিত। বাংলায় তার চিহ্নও বর্ত্তমানে নেই বললে মিথ্যা বলা হয় না। উত্তরভারতেও সেগুলি অপ্রচলিত।

বল্লালসেনের সভাসঙ্গীতজ্ঞ লোচন পণ্ডিত-কৃত প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থ 'রাগতরঙ্গিণী'তে যেসব তাল ও রাগের উল্লেখ আছে বর্ত্তমানে উত্তরভারতে সেগুলি রূপভ্রষ্ট হয়েছে বা অপ্রচলিত হয়েছে; অথচ সেগুলি দক্ষিণভারতে কতক প্রচলিত আছে এবং বাংলার কীর্ত্তনে এখনও কতক ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত জয়দেব যে কেবল কবি ছিলেন তা নয়। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীতকলায়ও পারদর্শী ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর সঙ্গীতের দল ছিল। তাঁর পত্নী পদ্মাবতী সে দলে লব্ধপ্রতিষ্ঠা নটীও ছিলেন। তিনি গাইতেন নাচতেন জয়দেব দোহার কাজ করতেন ও মৃদঙ্গ বাজাতেন। সেকালে যাঁরা নটবৃত্তি করতেন তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠাই ছিল। শুভোদয়ায় তাদের সঙ্গীত পারদর্শীতার ঘটনাবলী আছে। কিন্তু জয়দেব যে কীর্ত্তন রচনা করেছেন সেগুলি পরবর্ত্তী কালে বাংলায় যে কীর্ত্তন পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে সে পদ্ধতি হতে কিছু পৃথক। কীর্ত্তন অর্থে ভগবদভক্তির জন্য যে গুণকথন লীলাবর্ণন সে সবই কীর্ত্তন। জয়দেবের সময়ে সে অর্থেই কীর্ত্তন শব্দটির ব্যবহার হয়েছে রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে পালা গান গুলিতে। কিন্তু তার গানের উৎকর্ষের দিক হতে সেগুলি তখনকার মার্গ-সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত।

প্রাচীনকালে সঙ্গীত বলতে গীতবাদ্য ও নৃত্যকে বোঝাতো। আর সে সঙ্গীতকে পরিচালনার ভার একজন গায়কের উপর ন্যস্ত থাকতো—যাকে বলা হতো মূল গায়ক। সেজন্য গানের প্রাধান্য প্রাচীন সঙ্গীতে ছিল। প্রাচীন সঙ্গীতের ধাতু' বিভাগ ছিল উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক ধ্রুব ও আভোগ আর সেরূপ বিভাগ গীতগোবিন্দের. গানগুলিতে নাই। সে সময়ে সঙ্গীত উঠানে বা খোলা স্থানে করাই সম্ভব হতো—কেননা গায়কগায়িকা বাদক ও নটনটীগণের সমাবেশ বৈঠকখানায় সম্ভব হতো না। জয়দেবের সময়ে বার শতকে বাংলায় রাধাবিরহের গানগুলি নটীদের দ্বারাই সম্পন্ন হতো।

বর্ত্তমানে সঙ্গীত অর্থাৎ গান বাজনা ও নাচ একত্র একমাত্র যাত্রায় নাটকে ও সিনেমায়ই পাওয়া সম্ভব। বৈঠকখানায় উৎকর্ষ গীত যা হয় তার সঙ্গে মাত্র তাল রাখবার জন্য যন্ত্র বাজে। সুরযন্ত্রে নিজস্ব সুর বিস্তার করার ও সে গানের ভাব অনুযায়ী নাচ সংযোজনা করা হয় না। কিন্তু প্রাচীনকালের এমন কি জয়দেবের সময়কার সঙ্গীতে সেরূপ আবেদন দেওয়া হতো। তার পরবর্ত্তী কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তিত রূপেও নৃত্য যোগ করা হতো। শ্রীচৈতন্য শ্রীবাসের উঠানে যে কীর্ত্তন করতেন তাতে তিনি নিজেই নাচতেন। কীর্ত্তনের মূল গায়ক কখনও গানের সঙ্গে বাদ্যের ছন্দে নৃত্যের আভাস প্রকাশ করতেন। কিন্তু কীর্ত্তন হতে নৃত্য বর্ত্তমান শতকে বাদ পড়ে গেছে।

বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের গানের যে বিভাগ সেটি ধ্রুপদ গানেরই বিভাগ—অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ—তার প্রচলন আমরা পাই হুমায়ুন আকবরের সময়ে উত্তরভারতে। প্রাচীনসঙ্গীত শাস্ত্রীগণ যে বিভাগ করেছিলেন পূর্ব্বে বলেছি তার নামকরণ ছিল উদ্‌গ্রাহ মেলাপক ধ্রুব ও আভোগ। ধ্রুব মধ্যভাগে থাকে কিন্তু সেটিই গানের প্রধান ও নিত্য অংশ। এরূপ প্রাচীন বিভাগ কীর্ত্তনেই এখনও পাওয়া যায়। এইরূপ নিয়মানুসারেই অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছে। সাধারণত উত্তরভারতীয় গানের অনুকরণে বাংলা গানে আমরা উদ্‌গ্রাহ পাই না মেলাপকও পাই না। কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকায় উদ্‌গ্রাহের রচনাবৈশিষ্ট্য এবং মেলাপক অংশও সামান্যভাবে আছে। কিন্তু ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি গানে উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক নেই।

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে যেসব তালের নাম পাই সেগুলির ব্যবহার উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে নেই; যেমন ধরা যাক—ধ্রুবতাল শ্রুতিতাল রুদ্রতাল ব্রহ্মতাল চঞ্চৎপুট জপতাল ইত্যাদি। উত্তরভারতীয় গানে ব্যবহৃত না হলেও বাংলার কীর্ত্তনে এখনও সেগুলির প্রচলন আছে। কেবল ধ্রুবকে ধড়া আর চঞ্চৎপুটকে চঞ্চপুট বলা হয়। দক্ষিণী সঙ্গীতেও সেইসব তাল এখনও ব্যবহৃত হয়। জয়দেবের সময়ের গানেও সেগুলির ব্যবহার দেখতে পাই।

সঙ্গীত-রত্নাকরকে ত্রয়োদশ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ স্বীকার করেও উত্তরভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ রাগের রূপ রত্নাকর অনুযায়ী রাখতে সমর্থ হয়নি। রাগের নামের মিল থাকলেও রূপের মিল অনেক স্থলে পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক রাগ যা বাংলার কীর্ত্তনে এখনও চল্‌ছে, দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতে এখনও প্রচলিত, উত্তরভারতীয় উৎকর্ষ-সঙ্গীতে মধ্যযুগ হতে অপ্রচলিত হয়েছে। বাংলার সঙ্গীতজ্ঞগণ এতকাল হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়ালে ব্যবহৃত রাগের রূপকে সঠিক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে মিলিয়ে কীর্ত্তনে ব্যবহৃত রাগের রূপকে বিকৃত মনে করেছে; অথচ প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থ অনুযায়ী রাগের রূপ হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের মৌখিক রাগের রূপের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গড়মিল হয় দেখতে পেয়েও ওস্তাদদের

রূপকেই সঠিক ধরে নিয়েছে। কীর্ত্তনে ব্যবহৃত রাগও বিকৃত হয়েছে সত্য কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরূপ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের রাগ-রূপ হতে অনেকাংশে বিকৃত। সেজন্য তাকে আদি ও অকৃত্রিম মনে করার কিছু নেই। গত বৈশাখ মাসে এসম্বন্ধে কতকটা আভাস দেওয়া হয়েছিল।

জয়দেবের সময়ে রাগের রূপ ও তার আলাপ উৎকর্ষ সঙ্গীতের আসরে বহুলভাবে করা হতো। এই নিয়ে কে কত বড় শিল্পী তা নির্দ্ধারিত হতো। সেক শুভোদয়ায় আছে যে একবার লক্ষ্মণসেনের সভায় নাচগান হচ্ছিল। সেদিন সভায় গঙ্গো নটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সুহই রাগের আলাপ করছিল। তখন রাজবাড়ীর কাছে এক বণিক-বধূ কূয়ায় জল তুলতে গিয়ে গান শুনে এমন বিমনা হয়ে যায় যে কূয়াতে কলসীর বদলে ছেলের গলায় দড়ি দিয়ে কূয়াতে নামিয়ে দিয়েছিল। বিদ্যুৎপ্রভার গান শেষ হলে উড়িষ্যা হতে আগত দিগবিজয়ী গায়ন বুঢ়ন মিশ্র আলাপ করলেন পঠমঞ্জরী রাগ। জয়পত্র বুঢ়ন মিশ্রকেই দেওয়া হয় দেখে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করলেন। পদ্মাবতী দাসী পাঠিয়ে স্বামীকে (জয়দেব) আনলেন। তিনি এসে বসন্ত রাগের আলাপ করলেন। সভায় জয়ধ্বনির সঙ্গে বুঢ়ন মিশ্রকে জয়পত্র দেওয়ার প্রস্তাব নামঞ্জুর হলো।

এই যে রাগের আলাপ সেটি বাংলায় আধুনিক কালে যে পদ্ধতির আলাপ চলছে তার সঙ্গে মিল নেই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ধ্রুপদ প্রথমে বাংলার মাটিতে আসে আঠার শতকের প্রথম দশকে। তার আগে ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলায় কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অন্য আর এক রসের সৃষ্টি হল।

জয়দেবের পরে আমরা দুজন পদাবলী রচয়িতা পাই যাদের ছাড়া কীর্ত্তন এখনও চলে না। কিন্তু তাঁরা সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে দিয়ে একজন লিখলেন মৈথিলীতে আর একজন বাংলায়। বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলার কীর্ত্তনীয়াগণ বাংলার জিনিষ বলে মনে করে। কিন্তু তার পদাবলী বর্ত্তমানে বাংলায় যে ভাবে গীত হয় সেসময়ে এরূপভাবে গীত হতো না। এখনও বাংলার পশ্চিমে বিদ্যাপতির পদাবলী পাঁচালী-কথকতার মত গীত হয়ে থাকে। চণ্ডীদাসকে বীরভূমের নান্নুর গ্রামে সহজ বাংলায় সহজ ভাবে কীর্ত্তন করতে দেখতে পাই। এইসব পদাবলীতে শ্রীচৈতন্য বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে তার ধর্ম বিস্তারের জন্য এই কীর্ত্তনকেই প্রধান বাহন করে তুলেন, কেননা এই প্রিয় জিনিষটির সহায্য নিলে এখানে সহজে ধর্ম প্রচারের সুবিধা হবে বলেই এইসব তখনকার জনপ্রিয় গীত পদ্ধতিকে তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সঙ্গীতজ্ঞ বলে কীর্ত্তনকে এক নতুনরূপে পরিবেশন করেন। তার সময়েই কীর্ত্তনের সমৃদ্ধি ঘটে। আর সে পদ্ধতি জয়দেবের সময়কার কীর্ত্তন হতে অনেকটা পৃথক হয়ে পড়ে।

মঙ্গলগ্রহ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সেদিন বুঝলাম আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।

অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধিব্যাধি অর্ধাঙ্গিণীর অব্যক্ত গুঞ্জন এবং আধ ভজন অপোগণ্ডের দুরদার মাতামাতি একদিন, একদিন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেছল। সবাই অবাক হয়ে দেখল নতুন সেই গ্রহ।

আমরা ভাবতে পারিনি, আমি, আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা। যে বাড়ীর ইট সিমেণ্ট খসে পড়ছে, উঠতে নামতে দুর্বল হৃৎপিণ্ডের মত সিঁড়িটা কাঁপে, ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে এখন তখন, সেখানে হঠাৎ শাড়ী গয়নার ঝলক, সাবান পাউডার দামী সিগারেটের ঘি গরমমশলা মাংসের গন্ধ কেমন অদ্ভুত লাগল। আমাদের ঘরের টিক্‌টিকিটা পর্যন্ত অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল প্যাসেজের ওপারে লাল আলোয় ভরা জানালাটার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে বুঝি এসে উঠেছিল। এরি মধ্যে জিনিসপত্র জায়গা মত সাজিয়ে গুছিয়ে ফিট্‌ফাট্‌। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝঞ্ঝাট একটু শব্দ পর্যন্ত না।

রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত ক'খানা রুটি গলাধঃকরণ ক'রে আস্তে আস্তে আমার সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়ল। টারপিনের অভাবে কেরোসিন আর কর্পূরের এক রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরী করে গৃহিনী তখন দেয়ালে পিঠ রেখে মেঝেয় ব'সে পায়ে মালিশ করছে। আর আমি, লাল-ফিতে-বাঁধা অফিসের ফাইল সামনে নিয়ে বসে কখনো ঢুলছি, হাত দিয়ে মশা তাড়াচ্ছি একেক বার। ল্যাল, মঙ্গলগ্রহের মত লাল স্তব্ধ সেই ঘরের দিকে চোখ পড়তে সত্যি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

সস্তা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকেনা। আমি কখনো মোমবাতি, কোনোদিন রেড়ির তেল দিয়ে কাজ সারি। কেরোসিন যা জোগার করি হেমলতার বাতের দৌলতে নিঃশেষ হয়ে যায়। তেমনি এ বাড়ির অন্য সব ঘরে। কারো টিমটিমে কারো বা তাও না। কাজেই অন্ধকার এই জগতে এমন চমৎকার আলোয় টলটলে একটা ঘর যদি অনেক রাত অবধি জেগে থাকে সেদিকে চেয়ে আপনিও কি জেগে থাকবেন না! তাকিয়ে থেকে ভাববেন ' এরা কারা। কেমন এই নতুন গ্রহের বাসিন্দারা। বুঝলাম হেজাক জ্বলছে। আর ডোমটা শাদা না হয়ে লাল হয়ে ঘরটা যেন আরো সুন্দর রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আমার চোখে পলক পড়ল না। মেয়েটি, মেয়ে কি মহিলা তখন ঠিক

বুঝলাম না। জানালার কাছে দু'বার এল। একবার একটা ডিস নিয়ে গেল একবার এসেছিল সস্‌পেন নিতে। থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত খোঁপা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি চুপ করে দেখছিলাম। অনেক রাতে একটা লোক ঢুকেছিল ঘরে। রোগা টিংটিংয়ে। টাই-স্যুট পরা। যেন অনেক হাঁটাহাঁটি করে অনেক ক্লান্তি নিয়ে এখন এখানে এসে আশ্রয়। সিগারেট টানল ওই জানালার ধারে বসে আট দশটা। দৃশ্যটা আর ভাল লাগছিলনা বলে শুয়ে পড়লাম। যেন লোকটা না হয়ে সেই মেয়েটি যদি আরো দু'য়েকবার জানালায় আসত, একটু দাঁড়াত ভাল লাগত। শু'য়ে শু'য়ে ভাবলাম কালো স্যুট পরা মূর্তিটা চাঁদের কলঙ্কের মত, হুট্ করে ওখানে এসে ওটা কেন জুটল। বেশ ত ছিল।

সকালে অবিশ্যি আমার সংসার আগে জাগে, তারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরাণী আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি তাড়াহুড়া খুব। চীৎকার করে ছেলে দুটো ইস্কুলের পড়া তৈরী করছে, প্রীতি বীথি অর্থাৎ আমার বড় দু'মেয়ে রান্নাবান্না করছে। অসাড় পা দু'টো মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হেমলতা চালের কাঁকড় বাছছে। আড় চোখে ওদিকে চেয়ে দেখলাম প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের গায়ে হলদে রোদ এসে গেছে। কিন্তু সেখানে এখনো ঘুম। দরজাটা বন্ধ।

না, রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের রেড়ির বাতির বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যত উজ্জ্বল ও অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন, সকালে, যখন একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও বসে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বড়লোক—ভাবলাম—এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা পড়া পুরোণো চৌবাচ্চার জলই খেতে হবে, পচা ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। নিস্তার নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হল আমার। হঠাৎ যদি স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনো যাত্রী এসে ঐ কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হবনা যে আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্ততঃ এদিক দিয়ে থাকবেনা। ধীরে ধীরে আলাপ পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই ত স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার অছিলায় ওদিকের পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।

হঠাৎ পেছনে যেন কে এসে দাঁড়াল।

'বাবা স্নান কর অফিসের বেলা হ'ল।'

চমকে উঠলাম। প্রীতি। রুষ্ট হয়ে উঠি।

'অফিসের বেলা হ'ল আমি চোখে দেখতে পাচ্ছিনা ?'

প্রীতি একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। কেননা বেলা আটটা না বাজতে আমার তরফ থেকে রোজ রান্না নামানোর তাগিদ হয়, ওরা দু'বোন জানে। চুপ করে ঘরে ঢুকলাম।

দেখি আমার বড় ছেলে মণ্টুর কাঁদো কাঁদো চেহারা। রাগ আরো বেড়ে গেল।

'কি হয়েছে শুনি ?'

'আমার জ্যামিতি পড়া তুমি আর বুঝিয়ে দিলেনা বাবা।'

'অফিসের চরকায় তেল দিয়ে কূল পাইনা তোর পড়া দেখিয়ে দিই কখন।'

চুপ হয়ে গেল মণ্টু। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসি। ভাত দেয় ছোট মেয়ে বীথি। বুঝি হাত থেকে চার ছটা ভাত গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। রীতিমত গর্জন করে উঠলাম। 'একটু সাবধান হবি—অমন ক'রে জিনিস লোকসান করে আমায় রাস্তায় বসাবি নাকি। যে কোনোদিন রেশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

অধোমুখে বীথি সামনে থেকে সরে গেল। সাদা নিষ্প্রভ দু'টো চোখ মেলে হেম আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে না থাকিয়েও বেশ টের পাই। কর্পুর-কেরোসিনের গন্ধটাও যেন নতুন করে নাকে এসে লাগে।

জামা কাপড় প'রে ধনেচাল চিবোতে চিবোতে যখন বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম দেখি প্যাসেজের ওপাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো। এবং ঘুম যে ভেঙ্গেছে চোখেই দেখতে পেলাম। শুক্‌নো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙ্গাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি—মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেলনা—ওদিকের গলির দিকে মুখ করে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখখানা ভাল দেখা হলনা।

অবিশ্যি বুঝলাম রাত্রে দু'বার যাকে জানালায় দেখেছিলাম। একবার এসেছিল ডিস নিতে, একবার এসে একটা সস্‌পেন নিয়ে গেল। যেন জানালার গায়ে ঠেকোনো, ছোট একটা শেলফ বসানো হয়েছে ওধারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাত্রের ছবিটা ভাবি।

রাস্তায় এমন কি ট্রামের ভিড়ে দাঁড়িয়েও রৌদ্রে দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা মনে মনে আঁকি। অফিসে লেজারের সামনে বসেও। তারপর সেই স্যুট-পরা আদমীর চেহারা যখন মনে পড়ল ভিতরটা কেমন ভার হয়ে গেল। কাজে মন দিলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মণ্টুর হাতে চকোলেটের বাক্স ফণ্টুর হাতে আপেল।

'কোথা পেলি এসব কে দিলে।' চোখ বড় হয়ে গেল আমার।

প্রীতি পেয়েছে ব্লাউজের টুকরা, বীথি পেয়েছে সাড়ী।

'কে দিয়েছে শুনি না ?'

'লীলাদি', বীথি বললে খুশি চোখে।

'খুব বড়লোক,' প্রীতিও সামনে এল। 'লীলাদির বর ইঞ্জিনিয়ার।'

আমার কাপড় জামা বদলানো হলনা। হাত-মুখ ধোওয়া নেই। হাতে নিয়ে জিনিসগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছি। 'পাটনা থেকে এসেছে ছুটিতে,' বললে বীথি, 'ভাল বাড়ি পাওয়া গেলনা তাই এখানে।' বীথির মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাতে যাব এমনি সময় দরজায় ছায়া পড়ল।

মেয়ে নয় মহিলা।

খোঁপায় চওড়া কালো-পাড় আঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধনুকের মত বাঁকা। তন্বুমধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।

প্রীতি বীথি বাইশে উনিশে পা দিয়েছে। যৌবনের দেখা পায়নি ওদের শরীর। আর সেই বীথি যখন পেটে, কুড়ি বছর বয়স থেকেই হেমলতার বাত, তখন থেকে আজ অবধি দু'পায়ের ওপর সোজা হয়েও দাঁড়াতে পারেনি। আমার চোখ তখন মাটির দিকে, স্যাণ্ডেলের ফাঁকে, পায়ে আলতার ছোপ।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ', ঘাড় তুললাম, মুখখানা আবার দেখলাম। কপালে হাত ঠেকিয়ে মহিলা নমস্কার জানালে। আমিও।

'একটু কষ্ট করবেন', চৌকাঠের গায়ে একটা হাত রাখল লীলাময়ী, এক পা বাড়াল সামনে। 'ওকে দিয়ে ত কাজ হবেনা, কোলকাতায় এসেছে কেবল ঘুরতে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা আর ফুরোয় না।'

হেসে বললাম, 'বলুন, কিছু করতে হবে ?'

লীলাময়ী হাসল লজ্জায়, না, কি চট্ করে আমি রাজী হয়েছি বলে। 'একটু মাংস এনে দিতে হবে বাজার থেকে।'

'ও আবার একটা কাজ', নুয়ে পড়েছিলাম, সটান সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। 'এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে আছে তখনো। লীলাময়ী হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলে।

'দুবার ভেবেছি আপনাকে বলব কি না, আমার তো আর লোকজন নেই।'

'ছাখ কথা', হেসে বললাম, 'এতে লজ্জার কি আছে, তবে আর এক বাড়িতে থাকা

কেন।' বলে প্রীতির চোখের দিকে তাকালাম। ও অন্যদিকে চোখ সরিয়েছে। বীথি নেই আর সেখানে।

'আপনার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে', লীলাময়ী বলল, 'আমাদের বৌদি বুঝি Invalid ?'

কৃতার্থের হাসি হেসে চৌকাঠ পার হয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার পিছনে ও সিঁড়ি অবধি এল।

'নতুন জায়গায় এসে উঠলে কত কি দরকার, ওর তো কোনোদিকে মনোযোগ নেই, কি মুস্কিলে না পড়েছি আমি।'

'আ, কেন আপনি মন খারাপ করছেন।' নির্জন সিঁড়ি পেয়ে আমার গলা আরো ঝরঝরে হয়ে গেল। 'যখন যা দরকার বলবেন, এটুকুন উপকার যদি না করলুম তবে আর একত্র বসবাস কেন।' নিবিড় পরিচ্ছন্ন যৌবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার শুকনো বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। চোখে পলক পড়লনা।

'বেশ কচি পাঁঠার মাংস হয় যেন।'

'তা আর বলতে হবে না।' লম্বা পা ফেলে বাজারের দিকে ছুটলাম। এই লীলাদি। লীলাময়ী বা লীলাবতীও হতে পারে। আমার যেন লীলাময়ী মনঃপূত হল। একদিনে এতটা অগ্রসর এ যেন স্বপ্নের অতীত। না, এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখে কোনো নারী আমার দিকে তাকায় নি, এমন সুন্দর সহজ গলায় কথা বলেনি। আমার যৌবনের বা কেরাণী জীবনের ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। আমার নিজের মেয়ে তো প্রীতি বীথি বলতে পার বয়েস হয়েছে; আজো পাত্রস্থ করা হয়নি বলে মন ভার মুখ ভার। কিন্তু ভাল করে বাপের সঙ্গে দুটো কথা বলতে আপত্তি কি। ভয়ে চোখে চোখে তাকায় না, যেন আমি দানো, খেয়ে ফেলব কি গিলে ফেলব। সুন্দর চোখের কথা নয় নাই বললাম। আর তাকাবে কে? হেমলতা? মরা মাছের মতো সাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো মেলে ও আমার দিকে তাকায় ঠিক বলা চলেনা, কোনোমতে জেগে থাকে। নিচে কলতলায় ললিত নন্দীর বৌয়ের সঙ্গে একদিন চোখাচোখি হয়েছিল, হয়েছিল মানে হবার উপক্রম হচ্ছিল, সাতহাত এক ঘোমটা টেনে হাতের শূন্য বালতি চৌবাচ্চার ধারে রেখে সরে গেছে আমাকে কল ছেড়ে দিয়ে। ফালুর জেনানাকে আমি কলতলায় দূরে থাক কোনোদিন জানালায় আসতেও দেখলাম না। আর তাকাবে কে? ট্রামে বাসে? পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের কোনো কেরাণীর দিকে কেউ কি কখনো তাকায়?

পাঁচ-সাতটা দোকানে ঘোরাঘুরি ক'রে কচি ও তাজা পাঁঠার মাংস যোগাড় ক'রে বাড়ির দিকে চললাম। ভাবছি তখন, ভাবতে ভাবতে চলেছি। কথাটা কানে লেগে আছে।

ওর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। মনোযোগ যে নেই কাল রাত্রে দূর থেকে একবার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফিরিঙ্গি ছোড়াদের মত বাউণ্ডুলে চেহারা। আট দশটা সিগারেটই শেষ করল জানালায় দাঁড়িয়ে। হাওয়া-খোর।

সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অন্ধকার ঘর। বুঝলাম আজ মোম, রেড়ি কোনোটাই যোগাড় করা হয়নি। যদি বা কিছু সঞ্চিত থাকে আমার অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনি কালুর ঘর অন্ধকার। ললিতের ঘরে টিম্‌টিমে কি একটা জ্বলছে যেন। না থাকার সামিল। কেবল একটি জানালায় তীব্র উচ্ছ্বসিত আলোর বন্যা। সত্যি যেন আমাদের ঘরের পাশে নতুন এক গ্রহ এসে বাসা বেঁধেছে।

প্যাসেজ পার হয়ে পার্টিশনের কাছে যেতে ও বেরিয়ে এল। যেন এইমাত্র কল-ঘর থেকে ফিরেছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে, এলো চুল। বৃষ্টি-ধোওয়া কদমফুলের সৌরভের মত মিষ্টি একটা গন্ধ আমার নাকে লাগল।

'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।'

'কেন ও-কথা বলে বার বার মনে কষ্ট দিচ্ছেন।' মাংসের পুঁটুলি লীলাময়ীর পায়ের কাছে সিমেন্টের ওপর রাখলাম।

'একটা চাকর পর্যন্ত না,' নুয়ে পুঁটুলিটা ও হাতে তুলে নিলে। 'আমরা যখন ছুটিতে যাচ্ছি চাকরদুটোকে ছেড়ে দাও, ঘুরে আসুক ক'দিন দেশ থেকে, কি বুদ্ধিমানের কথা শুনুন,—কোলকাতায় ঢের লোক পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমানটি কে আন্দাজ করতে কষ্ট হ'লনা। এবং বুদ্ধির বহরটা আরো বড় ক'রে দেখাবার সুযোগ এল আমার, গম্ভীর গলায় বললাম, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেও চাকর জুটবেনা, বাড়ি পাওয়ার মতোই কঠিন। উনি এখনো ফেরেননি বুঝি?'

'রাত বারোটার আগে?' কৌতুকোজ্জ্বল কালো চোখ আমার মুখের ওপর মেলে দিয়ে যুবতী হাসল। 'ভালো লোক ঠাওরেছেন।'

'রোজই এমন করেন নাকি?' কৌতূহল খুব বেশী হ'ল, একটু হাসলামও। 'অনেক রাতে ফেরেন বুঝি?'

'রোজ, চিরকাল', যেন চিরকালের এই অভ্যাসটা ধাতস্থ হয়ে গেছে লীলাময়ীর, খারাপ লাগেনা, নইলে এমন ঝরঝরে গলায় হাসবে কেন, 'ওখানে যেমন করেছে, এখানে এসেও দেখছি তাই, বন্ধুর ওর শেষ নেই, হয়ত দুপুররাতে এসে বলবে খেয়ে এসেছি অমুকের বাড়িতে, কি অমুকের সঙ্গে হোটেলে, আমি খাবনা, এই রকম।'

রকমটা কি ভাল? মুখ দিয়ে আমার প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল, গম্ভীরভাবে বললাম, 'না, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।'

চৌকাঠের ওপর চোখ রেখে কি যেন ও ভাবল। না কি ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য ফের লীলাময়ী ঠোঁটে হাসি টেনে আনল। এবার আমার প্রসঙ্গ।

'বেশ পরিশ্রম করতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চয়', দৃপ্ত পৌরুষের গলায় বললাম, 'পুরুষের এত গা ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে না। সন্ন্যাসী বাউলের সংসার নেই।' ইঙ্গিতটা ইচ্ছা করেই একটু ভালর দিকে রাখলাম।

ছুরির ফলার মতো ধারালো চক্‌চকে দুটো চোখ আমার আপাদমস্তক বিদ্ধ করল। ছেঁড়া জামা আমার? ছেঁড়া জুতো? গরীব কেরাণী? না, এ-চাউনির অর্থ অন্যরকম। এ স্বতন্ত্র।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন, এই আবার ছুটলেন বাজারে, একটু আলসেমী নেই।'

'আলসেমীটা মনের', ঠোঁট টিপে হাসলাম, 'না কি এ বয়সে এতটা ছোটাছুটি মানায় না, বলছেন আপনি?'

কিছু বলল না, লীলাময়ী ঠোঁট টিপে হাসল।

বললাম, 'যাই, আপনার কাজকর্ম আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে বৈকি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী ঘাড় ফেরালো, শরীর ঘোরালো। অপরূপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চক্‌চকে ছোপ দেওয়া সাড়ী পরনে। মনে হ'ল মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিণী। মাংসের পুঁটুলিটা হাতে করে চৌকাঠের ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হ'ল। সুন্দর গর্বিত নির্ভীক। আমি চেয়ে রইলাম।

ঘরে ঢুকতে অন্ধকারে একটা ফুঁসফাঁস শব্দ কানে এল। মেজাজ কেমন গরম হয়, ভাবুন একবার। দরজার কাছে, অনুমান করলাম, বীথি ওটা।

'কি হয়েছে শুনি, কাঁদছে কে?'

'মন্টু', বুঝলাম প্রীতির গলা। 'ইস্কুলে জ্যামিতি পড়া দিতে পারেনি, মাষ্টার মেরেছে।'

'বেশ করেছে', হাল্কা গলায় বললাম, 'এক আধটু মার খাওয়া ভাল।'

প্রীতি আধ ইঞ্চি সেই মোমের টুকরোটা জ্বালল। জামাকাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। বললাম, 'এ বয়সে ইস্কুলে সবাই মার খায়। মার না খেয়ে কেউ মানুষ হয়েছে? উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেরাণী, প্রোফেসার—মার একদিন সবাই খেয়েছে।' মন্টু আমার কথাগুলি কান পেতে শুনল। প্রীতি, বীথি, ফন্টু আর ওদের মা। যেন এমন মিষ্টি কথা আমার মুখ দিয়ে কোনোদিন বেরোয়নি। গলা মোমের মাঝখানে সলতের টুকরোটা সাঁতার কাটতে কাটতে ফুটুস ক'রে এক সময়ে নিভে গেল। আমারও খাওয়া হয়ে গেছে। এবং অন্ধকার ঘরে বসে থাকার কোনো মানে হয়না বা এতগুলি

মিষ্টি কথার পর আবার কি অপ্রি কথা ব'লে হেমলতার সংসারকে হতচকিত ক'রে দিই এই ভয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ললিতের ঘরের টিম্‌টিমে আলোটাও নিভে গেছে এখন। পাড়াটাই ঝিম্ মেরে যায় রাত আটটার পর। তাই ও ঘরের লাল আলো-জ্বলা জানালাটা আরো বেশী কাছে মনে হচ্ছে যেন। হাত বাড়ালে নাগাল পাব।

পায়ের শব্দ শোনা যায়? বাসনের ঠুন্‌ঠান্ আওয়াজ?

কান পেতে রইলাম। দেখলে মনে হয় যেন ওঘরে এই সবে সন্ধ্যা নেমেছে। গা ধুয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি ক'রে লীলাময়ী রাঁধতে বসেছে। আঁটোসাটো নিটোল নিখুঁত মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ধ্যানস্থের মতো জানালাটার দিকে চেয়ে রইলাম। না, এদিকে কিন্তু একবারও এলনা, ডিস বা বাটি নিতে। কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোলমত একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়াল-ঢাকা ওই অংশটায় বসে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টাদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হয়ে আছে।

বিড়িটা নিভে যেতে আর একটা ধরাতে যাব হঠাৎ যেন নিচের সিঁড়িতে কা'র পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ইঞ্জিনিয়ার?

শ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে রইলাম। আর শব্দ নেই। বোঝা গেল ইঁদুর। পুরোনো বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব বেশী। ময়লা বেরোবার পাইপ বেয়ে নির্বিবাদে ওরা ওপরে উঠে আসে। মোটা ধোঁয়ার রংয়ের বিশাল এক এক ইঁদুর।

লীলাময়ীর ঘরে ইঁদুর ঢোকে? কথাটা কেন জানি মনে হ'ল। জানালার দিকে চেয়ে ঢোক গিললাম। কল্পনা করলাম সত্যি যেন একটা নোংরা হোঁৎকা ইঁদুর ঢুকেছে ওঘরে। লীলাময়ী আঁৎকে উঠবে ভয়ে? না চিৎকার করে উঠবে! না রাগে দাঁত ঘষে হাতের তপ্ত খন্তাটা ইঁদুরের মস্তকে ছুঁড়ে দেবে! না কি ঘাড় ফিরিয়ে নরম ঠাণ্ডা চোখে একবার মাত্র তাকাতে বাসনকোসনে গা না ঠেকিয়ে ইঁদুরটা ভালমানুষের মতো লীলাময়ীর সাদা সুন্দর পায়ের কাছ দিয়ে সুর্‌সুর্ করে নর্দমার পথে বেরিয়ে গেল।

তাই,—তাই হবে। এতো আমাদের ঘরে ইঁদুর ঢোকা নয় যে ওটাকে দেখেই মালিশরতা হেমলতা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠবে, প্রীতি বীথি মোটা থপ্‌থপে পা ফেলে ঝাঁটা নিয়ে আসবে ছুটে ইঁদুর মারতে, মণ্টু ফণ্টু ঘরময় দাপাদাপি করবে, সে এক কাণ্ড! শুনলাম দূরের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজলো।

পা বদল ক'রে ফের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াব এমন সময় প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের দরজা নড়ে উঠল। প্রথমে আলোর একটা রেখা তারপর আলোর রেখার মতোই উজ্জ্বল দীর্ঘ সেই দেহ। বুকের ভিতর দুব্‌দুব্ করছে আমার। প্যাসেজের

মাঝামাঝি যখন এল মুখখানা আর ভাল দেখা গেলনা। আশ্চর্য, লীলাময়ী এদিকেই আসছে, আমার ঘরের দিকে!

রেলিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

'ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে? ছেলেমেয়েরা?'

'প্রীতি বীথি? মন্টু ফন্টু?' বললাম, 'কিছু দরকার আছে?'

'একটু কারী খাবে ওরা।'

অন্ধকারে আন্দাজ করলাম ওর হাতে এলুমিনিয়ামের একটা বাটি।

'এত রাতে ওটা আপনি হাতে ক'রে এনেছেন! তা ছাড়া ঐটুকুন তো ছিল, আমি নিজে বাজার করেছি।'

'তাই বলে সব একলা খেতে হয়!' হাসল লীলাময়ী, অন্ধকারে বৃষ্টির ফোঁটার মত সে হাসির শব্দ।

বললাম, 'তা ছাড়া ঘুমের চোখে উঠে খাবে, স্বাদ বুঝবেনা, কাল হয়ত আপনাকে রান্নার নিন্দেই শুনতে হবে।'

'বেশত, আপনি জেগে আছেন, একটু চেখে স্বাদ বুঝে রাখুন, সাক্ষী থাকবেন।'

'অর্থাৎ আমার জন্যেও এসেছে, হেসে হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। পারতাম খেতে খুব এককালে মাংস,—এখনো, এখনো পারি এমন—'

'না পারার আছে কি', অন্ধকারে আর এক ঝলক হাসি উঠল। 'দাঁতক'টি সকালে নড়বে বলে তো মনে হয়না।'

মনে পড়ল সন্ধ্যাবেলা সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম ধারালো চক্‌চকে চোখে ও আমার দাঁতগুলির দিকেও দু'বার তাকিয়েছিল।

'আপনার তো খাওয়া হয়নি।'

'এইবার খাব, না কি রাত দুপুর অবধি আমিও জেগে বসে থাকব নাকি খাবার সামনে নিয়ে? চললাম—'

হাসল ও, যেন তারের যন্ত্রে ছর্ টেনে গেল।

মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। না, এ আমাকেই দেয়া, আমাকেই দিতে আসা। আমার ঘর রাত আটটা থেকে নিভে গেছে, ঘুমে তলিয়ে আছে, পাঁচ সাত হাত দূরে আর এক ঘরে বসে ওর টের না পাওয়া খামোকা কথা।

মনে মনে হাসলাম। কেননা একটা ছবি তখন আবার মনে এসে গেছে। টিং টিং ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে পেন্টুলন পরা সেই মূর্তি। বন্ধুর আড্ডা ছেড়ে আর এক বন্ধুর

আড্ডায়। সিগারেটের ধোঁয়া হয়ে চিরকাল তুমি উড়তে থাক ভেসে যাও, বললাম মনে মনে।

সোজা চলে গেলাম নিচে কলতলায়। জায়গাটা এখন সর্বজন-পরিত্যক্ত। নিরাপদ।

না, প্রীতি বীথিকে অর্থাৎ হেমলতার সংসারকেই আর নাড়া দিলাম না এই ভেবে, ওদের মন পরিষ্কার নেই। বিশেষ ক'রে বুড়ি মেয়ে দুটো। আমি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলি ওটা যেন ওরা পছন্দ করেনা এমন ভাব। না হলে সকালে আমার অফিসে যাওয়া নিয়ে বীথির অত মাথাব্যথা উঠেছিল কেন? সন্ধ্যাবেলা আমি ঘরে না ফেরাতক প্রীতি অন্ধকার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? এখন এই মাংসের ব্যাপারটাও ভাল চোখে দেখবেনা; দেখতে পারে না কুটিল যাদের মন।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গরম উপাদেয় মাংসখণ্ডগুলি একে একে সব সাবাড় ক'রে বাটিটা জলে ভিজিয়ে রেখে মুখ হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে আবার আগের জায়গায় রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার পরিষ্কার চোখে পড়ল, জানালার ওপারে, টেবিলের ওপর থালা রেখে লীলাময়ী খেতে বসেছে। দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে ওর ধীরেসুস্থে চিবিয়ে রসিয়ে খাওয়া, তারপর হাত মুখ ধোয়া, মুখ মোছা, পান খাওয়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পানের রসে রাঙানো ঠোঁট উল্টে-পাল্টে দেখা। আঁচলটা কাঁধ থেকে পড়ে গেছে। আলস্যে মন্থর। একদিকের দেয়াল থেকে লীলাময়ী অন্য দেয়ালে চোখ ফেরালো, এল একেবারে জানালার কাছে। জানিনা রেলিং ঘেসে দাঁড়ানো আমার আবছা মূর্তি ওর চোখে পরেছিল কিনা, ঈশ্বর জানে, তবে আমি ত দেখলাম অন্ধকারে চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক্ খুলল।

অবিশ্যি একটু পরেই আলো নিভল। আমার দু'কান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। যেন কানপেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশে ফেরার শব্দ।

আস্তে আস্তে ঘরে এসে শু'য়ে পড়লাম। সেই পেন্টুলন পরা আদমী রাতের কোন ভুতুড়ে প্রহরে ঘর নিয়েছিল জেগে বসে থেকে দেখবার আমার দরকার ছিল না। আমাদের মধ্যে ও ছিল না।

সকালে বড় একটা নিমের ডাল নিয়ে দন্তধাবনে ব্যস্ত ছিলাম। একটা কিছু না ক'রে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি বা কি ক'রে। তবু বীথি, কুবুদ্ধির হাঁড়ি, দু'বার দরজায় এসে উঁকি দিয়ে গেছে। দেখুক। আমার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ তো আর কেউ অস্বীকার করবে না। অটল ও অনড় হ'য়ে আমি ওধারে দরজার গায়ে হলদে রোদ্দের

পরিধিটা মনে মনে জরীপ ক'রে চললাম। যেন আজ আরো বেশী বেলা হচ্ছে। ঘুম আর ভাঙেনা।

একসময়ে দরজা নড়ে উঠল। ইতস্তত করছিলাম নিমের ডালটা মুখ থেকে নামিয়ে নেব কিনা, তার আগেই দরজা ফাঁক হ'ল।

বেরোল, সে নয়, টাই-স্যুট পরা তালপাতার সেপাইটি।

বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিই। এতৎসত্ত্বেও ছোড়া আমার দিকেই এগিয়ে এল। হাসি হাসি চেহারা।

'দয়া ক'রে একটা রিক্স ডেকে দিন না।'

নিমের তিক্তরস মিশ্রিত একটা ঢোক গিললাম। রইলাম চুপ ক'রে।

'আপনি কুলদা বাবু?'

'কুলদা রঞ্জন পাইন' মুখ খুলতে হ'ল এবার। 'পার্কার এণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র হেড্ ক্লার্ক। এ বাড়িতে আমি সতেরো বছর।' ভাবলাম পাটনায় তুমি ইঞ্জিনিয়ার না লাটসাহেব, এখানে কি।

'তাই বলছিল ও', মাথা নেড়ে কাপ্তেন নতুন সিগারেট ধরাল। 'খুব করছেন আমাদের জন্মে, শুনলাম।'

মনটা একটু নরম হ'ল।

'না খুব আর কি', বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'ছাট্‌স, রাইট্, ও তাই বলছিল, আপনি থাকতে আমাদের অনেক সুবিধে হচ্ছে।'

'আবার বেরোনো হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, ইফ্ ইউ ডোন্ট্ মাইণ্ড্, দয়া ক'রে একটা রিক্স ডেকে দিন না।'

'ও আবার একটা কাজ নাকি' রাগটা একদম চলে গেছে তখন আমার। 'আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

'ছুটিতে এলাম, ওদের সবাইর সঙ্গে দেখা না করাটা কি ভাল?'

'সে তো ঠিকই, কেন দেখা করবেন না। না করার আছে কি।' হৃষ্টমনে নিচে গিয়ে রিক্স ডেকে আনি। বন্ধুবান্ধব নিয়েই তো সংসার, এদিনে ক'টা লোক হ'তে পারে বন্ধুবৎসল', পর্যন্ত দু'টো উপদেশও দিলাম।

তারপর ঠুন্ ঠুন্ 'ক'রে রিক্সর তো ঘণ্টা বাজল না আমার বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজতে লাগল।

শিস দিতে দিতে ওপরে উঠছিলাম ডবল সিঁড়ি ডিঙিয়ে, যেন বুকের থেকে একটা ভার

নেমে গেছে। কিন্তু মনের এই প্রফুল্ল ভাব নষ্ট ক'রে দিলে ধুম্‌সি মেয়েটা। সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি। যেন গোরু চড়াতে এসেছে।

'তোমার বেলা হয়ে গেল, বাবা।'

'তুই আমার অফিস করবি নাকি।' রাগে রুখে উঠলাম এবং আরো কি বলতে গেছি, দেখি, ঘন সবুজ রঙের একটা টুথ ব্রাশ হাতে সিঁড়ির মুখে লীলাময়ী। ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা চোখ।

ভয় হ'ল রাত্রের মাংসের কথাটা না তোলে হঠাৎ।

কিন্তু লীলাময়ী চালাক মেয়ে। সেয়ানা।

যেন কাল বিকেলের পর এই আমার সঙ্গে দেখা।

'আজ আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব।' কত যেন দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা। দাঁড়াল প্রীতির ঠিক পেছনে।

'কষ্ট আর কি', বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'এবেলা পারবেন না। সময় নেই আপনার। ওবেলা অফিস থেকে ফেরার সময়—'

'বলুন না কি করতে হবে,'—যেন সঙ্কুচিত আমিও, সন্ত্রস্ত। চোরা চোখে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ানো প্রীতির চোখ দু'টো দেখে নিলাম। 'কিছু আনতে হবে বুঝি?'

'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ পান তো।' লীলাময়ী আমার চোখে তাকাল। পরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'ও আবার কষ্ট কি।' হেসে লীলাময়ীর মুখের দিকে তাকালাম। লাল-রঙা ডবল নোট দু'টো আলগোছে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যুবতী ধীর মন্থর পায়ে দাঁত ঘসতে ঘসতে প্যাসেজের দিকে চলে গেল।

একটা ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রীতির মুখের ওপর ছুঁড়ে আমিও ঘরে চলে এলাম।

যেন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা আমি এই গোষ্ঠি থেকে। মন্টু ফন্টু একসঙ্গে খেতে বসেছে, একবার ওদের মুখের দিকেও তাকাই নি। যদি বা এক আধবার চোখে পড়েছে মনে হয়েছে দুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে জমাট এক একটি শিলাখণ্ড আমার রাস্তা জুড়ে আছে। এবেলা পরিবেশন করল বীথি। রান্না করেছে নিশ্চয় বুড়ি মেয়েটা। যত বয়েস হচ্ছে মাথায় দুশ্চিন্তা কুটকুট করছে। রান্না। আর রাত্রে এতটা ঘি গরমমশলার মাংস খেয়ে চিংড়ি ছাচি কুমড়োর তরকারী জিহ্বায় কেমন লাগবে কল্পনা করুন। আর ঘরময় হেমলতার গাত্রোত্থিত মালিশের উগ্র ঝাঁজালো গন্ধ। যেন উনিশ বছর এই গন্ধটা ছড়িয়ে হেমলতা আমার পরমায়ুকে জীর্ণতর করবার জন্যে বেঁচে আছে। কোনোমতে খাওয়া শেষ ক'রে জামা চরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসে পৌঁছে, আমার যা প্রথম কাজ, ডেস্পাচের অনঙ্গ ধরকে আড়ালে ডেকে নিলাম।

'শঙ্খিণী নারীর লক্ষণ কি, ভায়া ?'

'গোপন-স্বভাবা, কিন্তু তেজস্বিনী।'

চুপ করে জায়গায় এসে বসলাম। এসব ব্যাপারে অনঙ্গ ধরের পরামর্শ মেনে চলি আমরা, বয়স্করা। নারীচরিত্র ওর নখাগ্রে। এক বিয়ে করেছিল লোকটা আইন মত, আরেক বিয়ে সেদিন করে এসেছে আইন ভেঙে, এ বয়সে। সাহস যেমন জানেও অনেক। সুতরাং উঠতে বসতে এসব ব্যাপারে আমরা অফিসের তথাকথিত বুড়ো যারা অনঙ্গর মতামতের সঙ্গে লক্ষণ বিলক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখি। চেষ্টা করি সেভাবে চলার। নইলে তো এখনকার ছেলে ছোকরাদের মতো ট্রামে-পার্কে-ময়দানে-রাস্তায় ঘুরতে হত মায়াবিনী হরিণীর খুরের ধূলো খেয়ে।

এখানকর ওরা জানে না অন্দরের অন্ধকারেও সুন্দর জন্তু থাকে খেলার,—খেলবার। কোথায় সেই স্থৈর্য, সে আবিষ্কার।

লেজার আড়াল করে সারাদিন বসে মাথা খাটালাম, চিন্তা করলাম। পাঁচটা বাজতে রাস্তায় নেমে সোজা গঙ্গার ঘাটে।

একটা একটা করে সতেরোটা মাছ উল্টে পাল্টে দেখে শেষে বেশ চক্‌চকে চ্যাপ্টা মনের মতন ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। ইচ্ছা করেই রাস্তায় সন্ধ্যা করলাম।

গলির মুখে এসে মাছটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিলাম। কেননা আমাদের ঘর বারান্দার বাঁয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্যাসেজ ধরে পার্টিশনের দিকে যাও যে কেউ দেখবে হাতে মাছ। কিন্তু তবু সিঁড়ির মুখে মন্টুটা দেখে ফেলল। আবছা অন্ধকারেও টের পেল মাছ। কিছু বললে না কেবল হাঁ করে চেয়ে রইল, যেন ওর বিশ্বাসই হয়নি এতবড় ইলিশ বাবা ঘরে আনবে।

দেখলে বীথি, চৌবাচ্চার দিকে যাচ্ছিল ও।

প্রীতি। কালকের মত চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক চোখ মেলে চেয়ে ছিল। এবং সবগুলো চোখকে উপেক্ষা করে, যেন আমি কাউকে দেখিনি, সোজা চলে গেলাম ঘাড় গুঁজে প্যাসেজের ওধারে।

কড়া নাড়তে ঘর দুয়ার লাল আলোয় উঠল টল্‌টল্ করে। এই সবে আলো জ্বলল। বেরিয়ে এল লীলাময়ী। ফোলা ফোলা চোখ। যেন অবেলায় অনেক ঘুমিয়ে উঠেছে। খোপা ভেঙে থুবড়ে পড়েছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধখানা মাটিতে লুটোয়।

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।'

ইতস্তত করলাম, পিছনের দিকে তাকাই একবার।

'বাঘ, বাঘের খাঁচা এটা!' ধমক দিয়ে লীলাময়ী হাসল। ফুলের পাপড়ি ছিটকে পড়ল চারদিকে। ওর হাসির আড়ালে কালো চোখের তারায় দেখলাম স্বচ্ছ নীল স্ফুলিঙ্গ। এক মুহূর্তের জন্যে।

নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হয়ে আমাকে ভিতরে যেতে হল। ছোট্ট উঠোন। চুপচাপ।

এক হাতে আঁচল গুটোতে গুটোতে অন্য হাতে সদরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়াল। হাসল আবার। নিশ্চিত নির্ভয়। এখন আমরা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। বুকের ভিতর ঢুবঢুব করছে আমার।

'কি করব বলুন,' বললাম আস্তে আস্তে। যেন ওর হাতের পুত্তুলি আমি, নির্দেশ মেনে চলব। 'কোথায় রাখব মাছ ?'

'রাখুন ওখানে।' আঙুল দিয়ে নর্দমার ধারটা দেখিয়ে যুবতী ফের মিটিমিটি হাসল। 'যেন আপনাকে হুকুম করছি, তাই আবার ভাবছেন না তো ?' বলে চোখ টিপল।

'হুকুম করতে জানেন বলেই ত করছেন।' মাছটা নামিয়ে রেখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। রসে কৌতুকে আয়ত ঢলঢল চোখ। ভাবলাম, তোমার হুকুম জন্মে জন্মে মানতে রাজী।

'তাই না কি। দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দীর্ঘ ফর্সা দেহ সম্রাজ্ঞীর মতন। দু'হাতে খোঁপা ঠিক করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এল থালা আর বঁটি নিয়ে।

'ও, আমায় সামনে রেখে মাছ কাটবেন বুঝি ?'

'দেখব না ভালো কি মন্দ, টাটকা না পচা ?' কুটিল আঁকা-বাঁকা হাসি ঠোঁটের কিনারায়। যেন এখন পর্যন্ত সহজ হতে পারছেনা এমন ভাব। শঙ্খিণী।

'দেখুন।' ঠোঁট টিপে হাসলাম। 'অনেক ঘুরে দেখে শুনে এনেছি।'

'তাই বুঝি এত রাত হল ?' কুটিলতর চোখে হাসল ভ্রুবিলাসিনী। এমন চালাক এমন চাপা। ঠাট করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বঁটি বিছিয়ে বসল। কান গরম হয়ে গেছে আমার। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। বুঝি আশা আশঙ্কা ভয় ও লোভ একসঙ্গে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেকক্ষণ গোপন রাখতে। ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা। লীলাময়ী ঝপ করে তখন কিনা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

'আপনার স্ত্রী উঠে দাঁড়াতে পারে না ?'

'একেবারে অচল।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, অবিশ্যি অন্য কারণে। ওর হাতের মাছ দুখণ্ড হয়ে বটির বুক থেকে থালায় নেমে এল। তাজা লাল রক্ত। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

'দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।' বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের একটা ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বার বার।

'আরেকটু নিচে', রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছলনা।

'হ'ল না', বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন না মুছে।' কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকাল। হাত জোড়া, পারছেনা নিজে। মনে হল গালে ওর রক্তবর্ণ এক তিল। হাত কাঁপছিল আমার, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুট দিয়ে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য লীলাময়ী। অটল অটুট। যেন কিছুই হয়নি, যেন এই স্বাভাবিক। বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেষ করি।'

'ততক্ষণে উনুনের কাঠ কখানা তো কাটিয়ে নিতে পার ওকে দিয়ে।' ঘরের ভিতর থেকে শব্দ এল, ইঞ্জিনিয়ারের গলা, শুয়ে আছে যেন।

আমার চোখে চোখে চেয়ে লীলাময়ী মিটিমিটি হাসছে।

'এবেলা বেরোতে পারেনি, মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম, শুনুন কেমন পাকা সংসারীর মতো কথা বলছে এখন।' পরে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে গলা বড়ো করে বলল, 'তা উনি কেটে দেবেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক, কুলদাবাবুকে দিয়ে তোমার জন্য নিচে থেকে একটিন সিগারেটও আনিয়ে রাখব ভেবেছি।'

মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেন্টের ওপর চোখ রেখে কথাগুলি শুনছি আমি।

কবিতা

এই বুঝি প্রেম

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বাদল দিন শেষ হলে যখন আকাশে
সন্ধ্যা করুণ হাসি হেসে যায় নীরবধারায়,
পাখীর ফেরার ছায়া নদীর তরল জলে দোলে।
তখন উদাস মাঠে হেঁটে যেতে কেন মনে হয়
মাটির পৃথিবীখানি আগাগোড়া বাঁধান পাথর।
উসর ধূসর দেশ এ আমার এ তোমার নয়।
আমাদের পাশাপাশি দুজনের দুখানি হৃদয়
স্বচ্ছ দীঘির মত ছলছল কানায় কানায়,
চাঁদ এসে রং গোলে, কাল মেঘে চকিত আঁধার,
আকাশ হাসিয়া ওঠে ফাঁকে তার শিশুর মতন—
পৃথিবী পারের মত বাঁধা বলে শুধু মনে হয়।

দুজনেতে হেঁটে যেতে মাঝে মাঝে কেন যে এমন
হৃদয় তরল ঠেকে, বুঝিনা তো, এই বুঝি প্রেম।
মাটির মানুষ রোজ মাটি চিনি চিনিনা আকাশ ;
নারী ও পুরুষে মিলে গলে গলে স্বচ্ছ সলিল
হঠাৎ জীবনে মেলে সুদূরের অমেয় প্রসাদ।
পাথর মাটির সাথে প্রতিদিন খওয়ায় ঘষায়
আমাদের যত প্রাণ সময়ের সাগরে হারাই,
প্রেম বুঝি তারি কিছু আকাশের প্রসাদে পূরায়।

কোনো মেয়েকে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমার দু'চোখে যদি কখনো এ দু'চোখ হারায়
তখনি অরণ্য এসে ঢেকে দেয় আমার আকাশ ;
মৃতপত্রে শ্বাপদের শাণিত নখর বিঁধে যায়।

মনে হয়, সূর্য্যহীন হাহাকারে শুনি দীর্ঘশ্বাস
যেন কোনো অসহায় অধুনাবিস্মৃত নগরীর।
তাইতো প্রার্থনা সখী, তূণবদ্ধ করো দুটি তীর।

প্রেমের ফসিল আজো এ-মৃতহৃদয়ে আছে লেগে,
প্রস্তরের ইতিহাসে ঐতিহাসিকেরই কাজ আছে—
অদৃশ্য নিয়তি সম তবু দুটি চোখ আজো জেগে,
এ অসহ্য চিন্তা নিয়ে কি করে শিকার বলো বাঁচে ?
সমুদ্র পাহাড় হলে অন্য প্রেম অরণ্যই হয়,
জানি সখী !···এ অশান্ত মন তবু মানে না নিশ্চয় !

আমার ফসিলটুকু নিয়ে বলো কি তোমার লাভ ?
যে প্রেমে পাথর আমি চিরদিনই সে প্রেম প্রলাপ।

প্রভাতী

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

অনেক দুঃস্বপ্ন নিয়ে
রাতের সমুদ্রে বিচরণ
হল সমাপন।

কালো ছায়া ইতস্তত ভাসে
অস্পষ্ট প্রভাত যেথা নতুন দিনের স্বপ্নাকাশে
মেলেছে নয়ন—
দ্বিধায় জড়িত পদ, ভারাক্রান্ত মন।

রৌদ্রদীপ্ত এ প্রভাত চলে যাবে দূরে
প্রভাতেই ?
অকলঙ্ক সৃষ্টির নূপুরে
নৃত্যছন্দ নেই।

প্রভাতের অনুরাগে রক্তিম আকাশে
তবু মৃদু হাসে
সুদূর প্রাচীন সূর্য—
আমার প্রভাতী হয়ে আসে !

শাদা হাত

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বলিলাম তাকে ঃ
ফুলের মতন শাদা হাতদু'টি উপহার দাওনা আমাকে।
মেয়েটী না ক'য়ে কথা চোখ নত রাখে ;
তখন আকাশে মেঘ ঢাকে জ্যোৎস্নাকে।

সন্ধ্যার চাঁদের মত কত কথা ভেসে ওঠে মনের আকাশে।
সে আছে তখনো ব'সে পাশে।
কখনো বা তার দু'টি ধ্যানস্থ নয়ন
একটু আমার মুখে, একটু বা রাখে দূর নীলে—
মেয়েটী কি করে অন্বেষণ ?
আর বার তাহাকে যখন
বলিলাম ঃ হাতদু'টি দাও এই ফাঁকে !
আপেল ফলের মত লাল ঠোঁট তখন হাসির মোমে ঢাকে।

এত হাসি—কাশফুল—আকাশের তারা অগণন—
কুড়ায়ে কুড়ায়ে ফেরে মন।
এ জীবন শুধু কি স্বপন ?

এমনি একটি ছবি মনে কয়ো ফুটে আছে কোনো এক
অগভীর বনের ঝির্ঝরে।

পাশ দিয়ে গেছে নদী পাখিদের স্বরে,
অরণ্য নিঝুম।
আমরা সেখানে আসলুম।
শিশিরে-পলাশে কুঙ্কুম,
ভিজে মাটি—মৃত্তিকার ঘ্রাণ—
মেখে নিই, লুটে নিই হৃদয়ের গান।
আবছা সন্ধ্যায়
বনের পাখির মত তাকে নিয়ে মন উড়ে যায়
আকাশে-নক্ষত্রে-দ্যোতনায়।
মনে করো, তারা যদি ফিরে না আসিত,
নক্ষত্রে পৌঁছিত,
পৃথিবী তাদের কোনো উপহার দিত ?
বলিত যে : ঘাসে শিশিরের মত ওরা ভালবাসা—
মুছে গেছে পৃথিবীতে সেই সব পাখিদের বাসা।
এখানে থাকে না কিছু ঝরে যায় হৃদয়ের সকল প্রত্যাশা।

এটা খুব ঠিক
রাত শেষে নিভে যাবে, সকালে রৌদ্রের মত দিক
যখন উজ্জ্বল হবে, আমাদের হৃদয়ের রং
মুছে যাবে স্বপ্নে সঞ্চরণ।

তাই তাকে
বলিলাম : দাও হাতটাকে—
মেখে নিই যতটুকু অনুভূতি থাকে।

চিত্র-প্রদর্শনী

অনিল চক্রবর্ত্তী

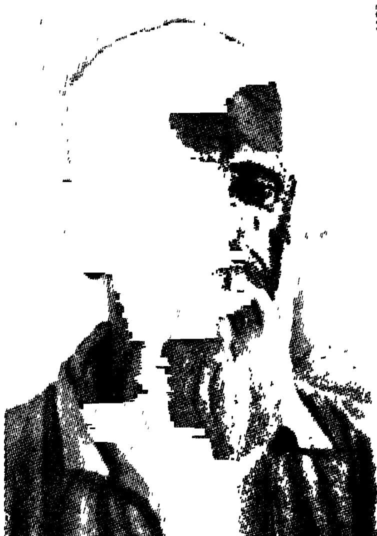
জাপানের কোন এক গৃহের একটি কক্ষে সুন্দর একটি ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, একই কক্ষে একাধিক সুন্দর ছবিকে সতীনের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ কথার সত্যতা প্রমাণসিদ্ধ। আকর্ষণীশক্তি যার যত প্রবল দর্শকের মনোযোগ এবং অভিনন্দন সে যে তত বেশী সহজে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে তা তো অতি সাধারণ সত্য কথা। সেই ক্ষেত্রে আকর্ষণ যদি একই যোগে একাধিক দিক থেকে আসে তখন সাধারণ দর্শকের পক্ষে ইতঃস্তত করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই বিভ্রান্তি আরো বিশেষ করে মানুষকে আশ্রয় করে তখন যখন সে এসে দাঁড়ায় লক্ষ্যণীয় কোন প্রদর্শনীর মধ্যে। এ আমার নিজের কথা হলেও নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সাধারণভাবেই এ কথা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের দোহাই না দিয়েও এ সত্য অবশ্য অকপটে স্বীকার করা চলতো তবু তাঁর শরণ নেওয়ার হেতু হচ্ছে এই যে, এ অবস্থা শুধু সাধারণ মানুষকেই বিভ্রান্ত করে না, অসাধারণ প্রতিভা নিয়েও মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি-বিশেষও যে তা থেকে অব্যাহতি পান না, সে কথা মনে করে সাধারণ পরিমণ্ডলে আবৃত অনভিজ্ঞপ্রায় মনকে আশ্বস্ত করা।

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে যে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিলো তারই অন্যতম দর্শক হিসেবে সেখানে গিয়ে মনে পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি। গত বৎসরের প্রদর্শনীর তুলনায় এবার দেখলাম, সেখানে স্থান পেয়েছে অনেক বেশী ছবি, এবং বৈচিত্র্যও তাই অপরিহার্য্যরূপেই লক্ষ্য করা গেলো। চিত্রশিল্পের অনুশীলন আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। তবু, আনন্দ হয় এই ভেবে যে, বহিঃপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার বিপর্য্যয়কে অস্বীকার না করেও এই যে আমাদের দেশের শিল্পীশ্রেণী অবিরত সাধনায় একটা সুকুমার শিল্পচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করে আছেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি এই যে তাঁদের সুনির্ম্মল শ্রদ্ধানিবেদন, এ তো স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, বহিঃপ্রকৃতির অবস্থান্তরের আঘাত-প্রতিঘাতের পরও তাঁদের সুচারু তুলিকা কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। ভারতীয় ঐতিহ্যের এ-ও আর এক প্রকৃতি যা প্রবহমান কাল থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

একটি চিত্র-প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে বসে এত কথা বলার কারণ এই যে, এবার এমন কতকগুলি চিত্র চোখে পড়েছে, যারা চিত্রীর পরিচয়ের স্বাক্ষর হয়ে তাঁদের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এ পরিচয়ের আলো যদি কোনো এক ভবিষ্যদ্দীপ্তির প্রতিশ্রুতি হয়, তা হলে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে তারও পেছনে আছে অপরিচিত অনেক সাধনাস্তব্ধ দিনের প্রস্তুতি। এই সাধনাই হচ্ছে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণ-প্রবাহ।

প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। যে কয়েকটি ছবি বিশেষ করে সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখানে তাদেরই কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে বলে রাখা প্রয়োজন, যাঁদের ছবির উল্লেখ এখানে করেছি তাঁরা সকলেই ছাত্রশিল্পী। শিক্ষক এবং প্রাক্তন ছাত্রদের অনেক ছবিই এখানে স্থান পেয়েছিলো, তাদের প্রায় সবগুলোই হয়ত সৌন্দর্য্যে বা আর্টের বিচারে মনোহারী এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ তথাপি কেন যে তাঁদের সে পরিণত শিল্প-নিদর্শনের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র ছাত্রশিল্পীর চিত্রই বেছে নিচ্ছি, তার কারণ নিশ্চয়ই বিশদভাবে বলে দেবার প্রয়োজন হবে না।

তুলির টানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন রণেন আয়ান দত্ত। এবারকার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর গত বৎসরের আঁকা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে গেছে। ধরণ তাঁর বিশেষ বদলায়নি, অবশ্য স্কুলের ছাত্র হিসেবে তা বদলানোর কারণও কিছু নেই, কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেলো এগিয়েছে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতা। গোটা পনেরো ছবি তিনি এবারকার প্রদর্শনীকে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাদের প্রায় সবগুলোই তাঁর অঙ্কন-ক্ষমতার সম-অংশীদার। এবং এর মধ্যেও বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'সারল্য' (He was really simple) ছবিটি। বিষয়বস্তুর হুবহু প্রতিকৃতি তৈরী করতে পারার মধ্যেই অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্য নয়, তার বৈশিষ্ট্য এবং কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্যভাবে ফুটে ওঠে তখনই যখন দর্শক নিশ্চিতভাবে পায় অঙ্কিত চিত্রের মধ্যেই তার প্রাণবস্তুর সন্ধান। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার মূলনীতিতেও আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এ নীতির অনুসরণ করে রণেনবাবুর এই ছবিটিকে যে আমি তাঁর সার্থক রচনা বলে আখ্যায়িত করবো তা নয়, এ প্রসঙ্গে এখানে আমি শুধু বল্‌তে পারি, চিত্রকর এ ছবির মধ্যে যাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশী ধরতে পেরেছেন তার মনটিকে। নিছক নিরীহ একটি পাহাড়ীয়া লোকের মুখ, যে মুখ সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হয়, নয় বা দুষ্টবুদ্ধিতে কুটিল। সুতরাং এ মুখে সৌন্দর্য্যের সন্ধান করা বৃথা। কিন্তু তথাপি এ ছবিটি এমন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন ? প্রাণবস্তুর স্পর্শ পেয়েছে বলেই না ! নিছক প্রতিকৃতি আঁকার খাতিরেই যদি এ ছবির চিত্রকর তুলিতে হাত দিতেন তা হলে, অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি, সৃষ্টিকার্য্যের শেষে যা তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন, তা ঠিক এই ছবিটিই হ'ত না, হ'ত হয়ত এই মুখেরই ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফি



বড়মিঞা ফাইন আর্ট

শিল্পী : পান্নালাল মুস্তফী



(পুরস্কার প্রাপ্ত) সারল্য ফাইন আর্ট

শিল্পী : রণেন আয়ান দত্ত



ফাইন আর্টে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

শিল্পী : শ্যামলেন্দু দাশগুপ্ত



মডেলিং-এ প্রথম পুরস্কার

শিল্পী : সতীশ চক্রবর্ত্তী



বড়মিঞা ফাইন আর্ট

শিল্পী : পান্নালাল মুস্তফী



(পুরস্কার প্রাপ্ত) সারল্য ফাইন আর্ট

শিল্পী : নরেন আয়ান দত্ত



ফাইন আর্টে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

শিল্পী : শ্যামলেন্দু দাশগুপ্ত



মডেলিং-এ প্রথম পুরস্কার

শিল্পী : সতীশ চক্রবর্ত্তী

এবং চিত্রাঙ্কণের তফাৎ যে কোথায় রণেনবাবুর এই ছবিটিই তা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দেবে। যা শুধু একটা প্রতিকৃতি হয়েই থাকতে পারতো চিত্রকরের কয়েকটি মাত্র দরদমাখা আঁচড়ের ফলে তাই হয়ে উঠ্‌লো প্রাণবন্ত। এই কয়েকটি আঁচড়ই যে নিপুণ শিল্পীর দক্ষতাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই একটি মাত্র ছবি দেখেই বলে দে'য়া যেতে পারে, শিল্প-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত যদি না ঘটে তা হলে রণেন আয়ান দত্ত নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ কারীগর বলে খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। তাঁর আরো একটি ছবি আমার কাছে খুব ভালো লাগ্‌লো। সে তাঁর 'কাঠ-গুদামের' ছবিটি। বিশেষ করে এই ছবিটির উল্লেখ করবার আর একটি কারণ আছে। প্রকৃতির দিক থেকে এ ছবি 'সারল্য' ছবিটির বিপরীতধর্ম্মী সন্দেহ নেই। তথাপি, যে কেউ এই দুটো ছবিকে পাশাপাশি রেখে অকুণ্ঠিতচিত্তে বল্‌বে, চমৎকার। 'কাঠের গুদাম' তো চিত্রীর সংবেদনশীল হৃদয়ানুভূতির প্রশ্রয় খোঁজেনি, তথাপি সে যে আপন বিশিষ্টতায় আপনিই এমন স্পষ্ট এবং সপ্রশংস দৃষ্টির কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, সে তার সৃষ্টিকর্ত্তার তুলির জোরেই।

পান্নালাল মুস্তফী ছাত্রশিল্পী হলেও ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সুনাম অর্জ্জন করতে সুরু করেছেন। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর কয়েকটি ছবির দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা গেছে, অঙ্কন-ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত দাবীর জোরেই তিনি তাঁর পরিচয়ের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুল্‌তে সমর্থ হয়েছেন। গত বৎসরের মতো এবারো দেখলাম, পান্নালালবাবুর মাত্র কয়েকটি ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। চিত্রকরের পরিচয় লাভের পক্ষে মনে হয় এই রীতি অবলম্বন করাই সঙ্গত। তাতে একই শিল্পীর রীতি এবং ক্ষমতাকে অনুধাবন করা, বিচার করা অনেকটা সহজ। সে যাই হোক, তাঁর দুটো ছবি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে 'বড় মিঞা', অপরটি 'ব্রহ্মচারী'। রীতি ও পদ্ধতিতে দুটো ছবিই একরকম হলেও এদের মধ্যে 'বড় মিঞাই' শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। ছবিটিকে রঙে ও রেখায় উজ্জ্বল করে তুলবার কোনো চেষ্টা নেই, আছে শুধু মানুষটির স্বাভাবিক প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করার। তার জন্যে যেখানে তুলির যতটুকু আঁচড়ের প্রয়োজন শিল্পী শুধু ততটুকু আঁচড়ই টেনেছেন। এই আন্তরিকতার জন্যই ছবিটি এমনতরো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে। পান্নালালবাবুর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়। তিনি সাধারণত আপন দৃষ্টির বাইরে যেতে রাজী নন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি একান্তই গণ্ডীবদ্ধ, বরং বলা চলে তিনি স্বভাবতই একটু বাস্তবমুখী।

তারপর নাম করতে হয় শ্যামলেন্দু দাশগুপ্তের একটি ছবির, তা হচ্ছে 'গাছের ফাঁকে ফাঁকে'। তাঁর আরও যে কয়টি ছবি এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, তাদের দিকে একবার ভালো করে তাকালেই অতি সহজে তাঁর মনের গতির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্যামলেন্দুবাবু

স্বভাবত প্রকৃতিপ্রিয়। সম্প্রতি চিত্রশিল্পে ধরণ-ধারণ, রীতি ও নীতি ইত্যাদি অনেক কিছু প্রচলনের ফলে ব্যাপকভাবে মননশীলতার অনুশীলন সুরু হয়েছে দেখতে পাই। বুদ্ধিমান মানুষের রুচি অনুযায়ী চারুকলারও প্রতিক্ষেত্রেই যে ক্রমশ একটি আপেক্ষিক বিবর্ত্তন প্রকাশ পাবে তাতে আর বিচিত্র কি। তাই প্রকৃতির রূপও আজ দেখতে পাই মননশীতার রঙে রঙীন হয়ে একান্তভাবেই subjective হয়ে উঠছে। কিন্তু এ জাতীয় রচনার আদর আজও আমাদের দেশে ব্যাপকতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। শ্যামলেন্দুবাবুর এই ছবি দেখে মনে হয়, তিনি সাধারণ দর্শকশ্রেণীর মনের ছোঁয়া পেতেই যেন উন্মুখ। সেদিক থেকে ভাবলে স্বচ্ছন্দেই বলতে পারা যায় তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। বন-প্রকৃতির এক টুক্‌রো ধরা পড়েছে তুলির মুখে। আলো-ছায়ার কারিকুরি শিল্পীর নৈপুণ্যগুণে সুন্দর একটি atmosphere তৈরী করে তুলেছে।

এ ছাড়া আর যে কয়টি ছবি বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'একটি মুহূর্ত্ত', অমলকুমার সেনের 'Don't drop thy pin' এবং নমিতা সাহার 'রাজকুমারী'। দেবকুমারবাবুর ছবিটি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। রঙ এবং তুলিই তাঁর যন্ত্র কিন্তু মুহূর্ত্তের ছবি মুহূর্ত্তের টানেই শেষ। সযত্ন প্রয়াসে তিনি একটি সুসম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাননি, চেয়েছিলেন দ্রুত টানে একটি বিশ্রামকক্ষের চেহারা ফুটিয়ে তুল্‌তে। এখানে দর্শনীয় কোনো বস্তুই স্পষ্ট নয়, অথচ সব মিলে তার ইঙ্গিতটুকুর মধ্যেই সবটুকু সুস্পষ্ট। এই suggestiveness-ই ছবিটির বিষয়বস্তু। তাই, যা তিনি এঁকেছেন শুধু তার মধ্যেই তাঁর কৃতিত্বের সন্ধান করলে চলবে না। অমলবাবুর ছবিটিতে ঘটেছে রঙের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। শুধু রঙের কারুকার্য্য দিয়ে তিনি একটি 'নিস্তব্ধ ক্ষণ'কে যে রূপ দিয়েছেন তা কেবল লক্ষ্যনীয়ই নয়, প্রশংসার যোগ্যও। নমিতা সাহার অনেকগুলো ছবির মধ্যে বিশেষ করে ভালো লাগলো তাঁর 'রাজকুমারী'। বিষয়বস্তু অনুসারে তিনি অঙ্কন-রীতিও গ্রহণ করেছেন ভারতীয়ই। অবশ্য তাঁর অন্যান্য প্রায় সবগুলো ছবিই এক পদ্ধতিতে আঁকা।

'মডেলিং'-এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সতীশ চক্রবর্ত্তী। তাঁর 'Head Study' যিনি লক্ষ্য করেছেন, তিনিই একথা স্বীকার করবেন আশা করি। 'মডেলিং' -এ শিল্পীকে শুধুমাত্র চিত্রকরসুলভ দক্ষতাই আয়ত্ত করতে হয় না, তাছাড়া তাঁকে হতে হয় গাণিতিক দৃষ্টিসম্পন্ন। তার অর্থ, চিত্রকর যা শুধু তুলির টানে বা রেখায় রেখায় ইঙ্গিতের মধ্যেই রেখে দিতে পারেন, সেখানে শিল্পী তাকেই করে তোলেন প্রত্যক্ষ। আকার আয়তনের প্রত্যক্ষ গাণিতিক বিচারের ওপর 'মডেলিং-এর কৃতকার্য্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সতীশবাবু যে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করতে পেরেছেন তার কারণ, তিনি

শিল্প-পদ্ধতির সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিচারবোধকে।

এখানে চিত্র-প্রদর্শনীর সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হলো না, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবির নাম করেছি মাত্র। এই আংশিক বিবরণ থেকে এ সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে, প্রদর্শনীটি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছিলো। তা নয়, এমন কয়েকটি ছবিও চোখে পড়েছে, যারা এ প্রদর্শনীতে একেবারেই স্থান না পেলে ভালো হতো, অবশ্য তাদের সংখ্যা বেশী নয়। সাহিত্যে বা সঙ্গীতের মতো চিত্রশিল্পও যেমন একদিকে মানুষের হৃদয়ানুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ, তেমনি অপরদিকে সে ঠিক তাদেরই মত উন্নত মানসিকতারও শিক্ষক। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা যদি এ কথাটা মনে রেখে এই শিল্পকে গ্রহণ করেন, তা হলে আমরা আশা করি জনসাধারণের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁরা নিশ্চয়ই লাভ করবেন।

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'পাখীরা' কবিতার ২১ পংক্তির শুদ্ধ পাঠ 'আহা, এই ধানে ধানে ইহাদের নীড়গুলি ভ'রে যেত নাকি ?' হইবে।

সাময়িক সাহিত্য

উপন্যাস

দীপপুঞ্জ—নরেন্দ্র নাথ মিত্র। প্রকাশক—পুস্তকালয় : ২৯, বাদুরবাগান রো, কলিকাতা। দাম—৩৲

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পর যে কয়জন সাহিত্যিক রচনাশৈলীতে নূতনত্ব এনে, বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র আরও অনেকটা দূর প্রসারিত করে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুনতর পথে পরিচালিত করে যথেষ্ট সাহস এবং নিপুণতার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি প্রতিভারও পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই বাঙালীর সমাজ-জীবন থেকে বেছে নিয়েছিলেন একটা ব্যাপক এবং বিস্তৃততর ক্ষেত্র। তার ফলে একদিকে যেমন তাঁরা নেমে এসেছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং আরও পরে নিম্নতর মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকমজুর আর মাঝিমাল্লার জীবনে, তেমনি সেই জীবনকে প্রতিবিম্বিত করার প্রয়োজনে তাঁদের গ্রহণ করতে হয়েছিলো বিস্তৃততর পরিধি। তাই, আমরা দেখতে পাই, ছোটগল্প রচনার চেয়ে তাঁরা উপন্যাস রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন বেশী। ফলে, সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ এই লেখকগোষ্ঠীর হাত থেকে আমরা বেশ কিছুদিনে পেলাম অনেকগুলো উন্নত ধরণের উপন্যাস। সেদিন বাংলাসাহিত্যের রসরসিক সম্প্রদায় আশান্বিত হয়ে ভেবেছিলো, রক্ষণশীল মনোবৃত্তির প্রতিবন্ধকতার গণ্ডী পেরিয়ে এই যে সাহিত্যিকের দল নতুন পথে, নতুনভাবে বিস্তৃততর সমাজ-জীবনের সন্ধান দিলেন, তাতে অন্তত একথা মনে করা ভুল হবে না যে, এই নবতর পথ বেছে নিয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্যরথীর দল আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষেরই সমাজ-জীবনে আবার এলো একটা ব্যাপক আবর্ত্তন আর তার ফলে অনিবার্য্যভাবে দেখা গেলো সাহিত্যের মধ্যেও তার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এই নূতন বিপর্য্যয়কে অস্বীকার করবার উপায় নেই, অথচ এ নবচেতনাকে বিষয়বস্তু করে উপন্যাস রচনা করতে এগিয়ে আসতে পারলেন না পূর্ব্ববর্তন সাহিত্যরথীদের সকলেই। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা এলেন, তাঁদেরও অনেকে প্রাক্তন সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হলেন না। অবশ্য তাঁদের এই অকৃতকার্য্যতার অর্থ এই নয় যে তাঁরা সকলেই দিশা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আসল কথা, তাঁদের কেউ কেউ রাষ্ট্রচিন্তাকে উপন্যাসের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করে নিলেও স্পষ্টই বুঝতে পারা গেলো, রাষ্ট্রিক বিবর্ত্তনকে তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিনের শুধু বিষয়বস্তুর খাতিরে, নতুন পথের সন্ধান দেওয়ার ইচ্ছায় নয়। কিন্তু জীবনের গতি যেখানে সচল, সেখানে সাহিত্য-সৃষ্টিও ভবিষ্যৎ পথিকৃৎ-এর অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদেই সে

পথিকৃৎ একদিন আপনা থেকেই জন্ম নেয়। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে যাঁরা উপন্যাস-রচনায় হাত পাকাতে লাগলেন তাঁদের অনেকেই সত্যিকারের উপন্যাস-স্রষ্টা নন, তাঁরা কেউ হয়তো চরিত্র-সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত কেউ বা কেবল ঘটনাবিন্যাসে দক্ষ। সাম্প্রতিক উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই দেখতে পেলাম, সামাজিক বিবর্ত্তনকে অবলম্বন করে যাঁরা উপন্যাস রচনা করলেন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই সার্থকতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

এই গেলো একদিক। অন্যদিকে আর একদল উপন্যাসকার রইলেন, যাঁরা শহরজীবনকে গ্রহণ করলেন না, ফিরে গেলেন গ্রামে। রবীন্দ্র ও শরৎসাহিত্যের পর যে সাহিত্যিকগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে তাকে অন্যপথে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বিষয়-বস্তুর সন্ধান করে ফিরেছিলেন শহরেই। এবং তার পর থেকে গতানুগতিকতার মতো শহরজীবনই যেন হয়ে উঠেছিলো বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আবার নতুন করে কেউ কেউ গ্রামের দিকে চোখ ফেরালেন বটে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বেশী নয়। দ্বীপপুঞ্জের লেখক তাঁদের মধ্যে একজন কিনা এখন তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, কারণ এই তাঁর প্রথম উপন্যাস। তবে, এ উপন্যাসের পটভূমিকা গ্রাম।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করে যা দেখা গেলো, তাতে মনে হয় বাঙালী পাঠক-সাধারণের আশান্বিত হওয়ার মতো বিশেষ কোনো কারণ নেই। কিন্তু এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ' এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এবং এই ব্যতিক্রমটিকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই এই পর্য্যালোচনা করতে হলো। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 'দ্বীপপুঞ্জ' পড়ে মনে হলো, বহুদিন পর সত্যি একখানি ভালো উপন্যাস পড়লাম।

'দ্বীপপুঞ্জ' মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের মন যেন আপনা থেকেই ঘটনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, শুধু ঘটনা বলার জন্যই লেখক এ গল্প তৈরী করেন নি। যাঁরা ঘটনার জন্যই উপন্যাস পড়েন এ বই তাঁদের জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁদের জন্য যাঁরা উপন্যাসের মধ্যে ঘটনার অতীত ঘটনাকার মনগুলির গভীর অতল স্পর্শ করতে চান। শরৎচন্দ্র বলতেন, চরিত্রসৃষ্টির জন্য ঘটনার অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই, চরিত্রের স্বরূপ যদি একবার মনের মধ্যে ঠিকমতো তৈরী করে নেয়া যায়, তাহলে ঘটনা আপনিই আসবে তার প্রয়োজনমত। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কের হদিস নিতে গিয়েও মনে হলো, লেখক ঠিক এই পথ দিয়েই যেন চলেছেন। এখানে কে কখন কি করলো সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে কার মন, কার চরিত্র কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে কোনদিকে এগিয়ে গেল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নবদ্বীপকেই ধরা যাক। সে কে? না, কোনো এক অখ্যাত গ্রামের সা'পাড়ার ধনী গৃহস্থ। তার একদিকে আছে গঞ্জের সব চেয়ে বড় ব্যবসা, আর একদিকে আছে লম্পট অকর্ম্মণ্য বিবাহিত বয়স্ক পুত্র, যার বুদ্ধিমতী স্ত্রী আছে, আর আছে দশ বারো বছরের মেয়ে। নবদ্বীপের একদিকে সামাজিক খ্যাতি প্রতিপত্তি, ব্যবসায়ীসুলভ আভিজাত্য, অন্যদিকে ব্যর্থ পিতৃত্বের বেদনা, কলঙ্কলিপ্ত সন্তানের কাছ থেকে পাওয়া মর্ম্মান্তিক জ্বালা। এই দুই-এর মিশ্রণেই নবদ্বীপ সম্পূর্ণ।

তাই তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতিমুহূর্ত্তে সে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একদিকে সে যেমন পারে না আজন্মঅর্জ্জিত আভিজাত্যকে ত্যাগ করতে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি সে পারে না দুশ্চরিত্র পুত্রকেও কঠোর হস্তে শাসন করতে। বাইরে সে যত বড় ধনী অন্তরে অন্তরে সে ততখানিই দীন। ধনের আড়ম্বর দিয়ে পুত্রের সকল অপকর্ম্মকে, তার চেয়েও বড় নিজের অন্তরের দীনতাকে সে ঢেকে রাখতে চায়। এই যে প্রতিনিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ নবদ্বীপের চরিত্র তা তো ঘটনার পারম্পর্য্য দিয়ে ধরবার জিনিষ নয়, তাকে ধরতে হয় মনোবিশ্লেষণের দুরূহ পন্থায়।

কিংবা সুবল; যার স্ত্রী আছে মঙ্গলার মত, এত অল্পবয়সেই যে হয়ে উঠ্‌তে পারে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম মোড়ল, যার ব্যবসাও ক্রমশই উর্দ্ধমুখী, সেই নিরঙ্কুশ নির্বিঘ্ন সুবলের জীবনও এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে গেলো কি করে! হয়ে গেলো তার অন্তর্দ্বন্দ্বেই। অন্দরে সে শিশু, আর বাইরে তার অদ্ভুত আধিপত্য। সে চায় তার আধিপত্য অটুট থাক, কেউ যেন তার পথে বিঘ্ন না ঘটায়। কিন্তু তার মনের এ গতিবেগ বারবার ব্যাহত হয়ে মুষ্‌ড়ে পড়েছে বাইরে নবদ্বীপের কাছে ধাক্কা খেয়ে, আর ভেতরে নিজের স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে। এই উত্তেজনা আর এই ব্যর্থতা—এ দুয়ের সংঘর্ষ নিয়েই পুরোপুরি সুবল। তারপর তার চরম ট্রাজেডী মঙ্গলার পদস্খলনে। মঙ্গলার পদস্খলন মঙ্গলারই মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, সুবলের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। কিন্তু সুবলের মনের আর এক দ্বন্দ্ব সুরু হলো এ ঘটনার পর। যে স্ত্রীকে সে আঠারো বছোরের স্নেহ প্রীতি প্রেম দিয়ে জড়িয়ে ছিলো, সেই স্ত্রীই তার চোখের সামনে অপরের সন্তানেরমা হতে যাচ্ছে, অথচ তাকে তা নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে। এখানে আর এক দ্বন্দ্ব তার মনের। একদিকে লোকলজ্জা আর ঈর্ষা, অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি বহুবৎসর-পালিত ভালোবাসা। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মনে মনে পুরে খাক হয়ে গেছে সুবল, কিন্তু তার কিনারায় পৌঁছতে পারে নি। তার জীবনের ট্রাজেডী এইখানে।

'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রই মঙ্গলা। তাকে ঘিরেই সব। এখানেও সেই একই কথা, তার মন। স্বামীকে মঙ্গলা ভালবাসে, তার সুখদুঃখের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে মিশিয়ে সুদীর্ঘ আঠারোটা বছর কাটিয়ে দিয়ে এসেছে। এ তার এক রূপ। অন্য রূপে সে সাম্রাজ্ঞী। মঙ্গলার সে রূপকে শুধু তার স্বামীই নয়, সা' পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ভয় করে, শ্রদ্ধা করে। আবার তার একটা অন্তর আছে যে অন্তর দিয়ে সে গ্রামের দশজনের একজন, তখন সে রোগীর শুশ্রূষায় সেবাপরায়না, নিমন্ত্রণবাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্রী আর চটুল রঙ্গরসে উদ্বেল নারী। মঙ্গলার চরিত্রের এই তিনটি স্তরকে অনুধাবন করলে তাকে বুঝতে পারা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এখানেই তো সে সম্পূর্ণ নয়। তাকে বুঝ্‌তে হলে তার জীবনের পরিবর্ত্তন-ক্ষণটিকে লক্ষ্য করতে হবে। ঠিক এই জায়গাটিতেই লেখকের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নির্ভর করে, এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় স্ত্রীচরিত্রের এই দুরূহ মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটনে তিনি ব্যর্থ হননি। লম্পট মুরলীর নামে সমস্ত গ্রামের স্ত্রীপুরুষ ছিছি দেয়, মঙ্গলা তাকে ঘৃণা করে, তার কলুষিত মনের ঈষৎ পরিচয় পেয়েই তাকে সরিয়ে দেয়; কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই মঙ্গলাই আবার আঠারো বছরের বিগত জীবনকে ভুলে গিয়ে সেই লম্পট মুরলীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এ কি করে সম্ভব! কিন্তু এ ও যে সম্ভব তা বুঝ্‌তে পারা কঠিন হবে না, যদি মঙ্গলার মনের দর্পণ দিয়ে সমস্ত

ঘটনাকে পর্য্যালোচনা করা যায়। মঙ্গলা সুবলকে ভালোবাসে, কিন্তু সুবলের আপাত নিস্পৃহতায় সে ভালবাসা শীতল হয়ে যায়। বন্ধ্যাত্বের বেদনাকে সে বহুভাবে অস্বীকার করলেও তার অবচেতন মন তাতে সায় দেয়নি। মুরলী লম্পট, সে কেড়ে নিতে জানে। মঙ্গলার ভালোবাসা সুবলের কাছ থেকে নিঃশব্দে ফিরে এসেছে, আর মুরলী তার সে ভালোবাসাকে কুড়িয়ে নিতে চায়নি, চেয়েছিলো কেড়ে নিতে। মঙ্গলার যে দ্বিতীয় রূপের কথা বলেছি, এখানে সেকথাটা মনে রাখতে হবে। মুরলীকে সে ভালোবাসেনি, সে তার দেহ দান করেছিলো মুরলীর প্রাণপ্রাচুর্য্যেভরা শক্তির কাছে। লেখকের কৃতিত্ব এই আত্মসমর্পণ পর্য্যায়েই শেষ নয়। তারপরেই যে সুরু হলো মঙ্গলার মানসিক দ্বন্দ্ব তার বিশ্লেষণেও লেখক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছেন। মঙ্গলার পাশাপাশি মনে পড়ে মাণিকবাবুর পুতুল-নাচের ইতিকথার কুসুমকে কিন্তু মঙ্গলা যেন আরো বেশী, আরও একটু যেন এগিয়ে গেছে!

প্রধান চরিত্রগুলো ছাড়াও, ছোটখাটো চরিত্র-চিত্রণেও যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন নরেনবাবু। এ বই-এর একটা জিনিস যে কোনো পাঠকের ভালো লাগবে, তা হচ্ছে লেখকের সহানুভূতি। যে দরদমাখা অন্তর দিয়ে তিনি বিনোদকে এঁকেছেন তাতে সে যে নিঃসন্দেহে সকল পাঠকের কাছ থেকেই সমান সহানুভূতি কুড়োবে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

শুধু মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণেই নয়, আঙ্গিকের দিক দিয়েও নরেনবাবু দেখিয়েছেন, উপন্যাস-রচনায় প্রথম হস্তক্ষেপ হলেও এ দিকেও তাঁর যথেষ্ট নজর ছিলো। যা কিছু ছোটোখাটো অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, তা ঐ প্রথম রচনা বলেই বোধ হয়, ভবিষ্যৎ রচনায় নিশ্চয়ই লেখক সে সব দোষত্রুটী স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে যেতে পারবেন।

অনিল চক্রবর্ত্তী

দিল ডাক: পরিমল মুখোপাধ্যায় (বুক ষ্টাণ্ড: দাম তিন টাকা)

বিগত মহাসমর আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দিয়েছিলো সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে এ যাবৎ অনেকেই হাত লাগিয়েছেন; তবে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গন নিয়ে উপন্যাস রচনা বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম। সে দিক থেকে 'দিল ডাক' নতুনত্বের দাবী করতে পারে। উপন্যাসখানির পটভূমিকা-রচনায় শ্রীযুক্ত পরিমল মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে প্রেরিত 'বিনোদিনী বাহিনীর' অন্তর্ভুক্ত একটি মেয়ে তাঁর নায়িকা— এবং অজস্র উন্মাদনার মধ্যেও এই বাঙালী মেয়েটির একটু 'মন-কেমন-করা' নিয়ে তিনি উপন্যাসখানি রচনা করেছেন। সব কিছু মিলিয়ে পরিমলবাবুর প্রচেষ্টা বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতো; কিন্তু তা হলোনা। শুধুমাত্র মেয়েটির চিত্তবিক্ষেপের গ্লানিটুকুকে সম্বল করে তিনি যে আখ্যানভাগ রচনা করেছেন তার অনিবার্য দুর্বলতা একে গতানুগতিকতার পর্যায়ে টেনে নামিয়াছে।

সাহিত্যের মধ্যে সমাজচেতনার উপস্থিতি যে প্রবলভাবে বাঞ্ছনীয় এ কথাটা আজকাল আর তেমন নতুন শোনায়না। কিন্তু এই সহজ কথাটা বারবার উচ্চারণ করা সত্ত্বেও সাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে

যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হয়েছেন কি? হয়েছেন বলতে পারলেই সুখী হতাম—কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীতেই সাক্ষ্য দেবে। তার চেয়েও মারাত্মক কথা এই যে অনেকে আবার নিছক ফ্যাশনের মোহে পড়ে রাতারাতি সমাজসচেতন হয়ে উঠ্‌বার চেষ্টা করছেন। এই মনোভাবও আদৌ সুস্থ নয়। 'দিল ডাকের' লেখক যে নিছক ফ্যাশানগ্রস্থ হয়ে সমাজসচেতন নন, উপন্যাসখানিতে তারই পরিচয় পাওয়া গেলো। অন্ততঃ তাঁর আন্তরিক আমেজটুকু এই কথাই বল্‌বে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সংকলন

নতুন লেখা—সম্পাদক : সাধনাকান্ত চৌধুরী (প্রকাশক : দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮।২ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট ; দাম ২৲ পৃঃ ২১৮)

'নতুন লেখা'—নামটা ভ্রমাত্মক। 'নতুন লেখা' না বলে নতুন গল্প বললে যথাযোগ্য হয়। সংকলনটি প্রকাশের পেছনে নেহাৎই উঞ্ছ ব্যবসায়মূলক মনোবৃত্তি ছাড়া আর যা' আছে পরিচালক 'আমাদের কথা'য় তার একটা হদিশ দিয়েছেন: "লেখার নিজস্ব মূল্য যা-ই থাক বহুক্ষেত্রেই পুরোণ লেখকের শুধু নামের জোরেই সাহিত্য-ব্যবসা চলেছে। নতুন লেখকের এ'গোষ্ঠির মধ্যে প্রবেশাধিকার নেই। মুরুব্বীহীনের চাকরী পেতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়—নতুন লেখকের অদৃষ্টে তার চাইতে লাঞ্ছনা কম নয়।...নতুন লেখায় আমরা প্রধানত সেই সব নতুন লেখকদেরই প্রাধান্য দেব যাদের মধ্যে স্ফুলিংগ রয়েছে। সুযোগ পেলে বড় যারা হবেনই, বড় যাদের আমরা করবোই। নতুন লেখকদের ভালো লেখা আর ভাল লেখকদের নতুন লেখা আমরা পাশাপাশি ছাপব।' উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নেই। যতদূর জানি, ঠিক এইধরণের মন নিয়ে কোন প্রকাশক এখন পর্য্যন্ত এগিয়ে আসেননি। দু'একটি সংকলনে নতুন লেখককে মধ্যে মধ্যে স্থান দেয়া হচ্ছে বটে কিন্তু তাও যেন অনেকটা পাদ-পূরণের প্রবৃত্তিতে। অর্থাৎ মহাজনদের স্পর্শসুখটুকু কেবল নতুন লেখকদের উপহার দেয়া হচ্ছে। 'নতুন লেখা' এ'নিয়মের উৎসাহব্যঞ্জক ব্যতিক্রম।

'নতুন লেখায়' এক কুড়ি গল্প আছে। এঁদের মধ্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র—খ্যাতনামাদের বাদে একেবারে আন্‌কোরাদের সংখ্যা হচ্ছে দশ। মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রতিভা বসু, বাণী রায় প্রভৃতি কয়েকজন পরিচিত লেখক লেখিকা রয়েছেন।

নামজাদাদের মধ্যে অনেকদিন বাদে প্রেমেনবাবুর গল্প পড়ে খুসী হওয়া গেল। অচিন্ত্যবাবুর গল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে অচিন্ত্যবাবুর গল্পটিই সংকলনের শ্রেষ্ঠগল্প। প্রতিভা বসুর গল্পের বক্তব্যটি আকর্ষণীয়—কিন্তু বাচনভঙ্গী কাঁচা। বুদ্ধদেব বাবুর গল্পে বক্তব্য কম—বলার ঢংটি কিন্তু মধুর। মাণিকবাবুকে দু'একটি বিষয়ে আশ্চর্য্য রকমের সংযত মনে হোল। গল্পের উপসংহারে অত্যন্ত স্পষ্ট didactic সুর কেমন খাপছাড়া মনে হয়; যাঁরা মাণিকবাবুর রচনা পড়ে

অত্যন্ত তাঁদের কাছে কেমন কেমন লাগতে পারে। নতুন লেখকেরা যে বিলক্ষণ নতুন তাঁদের রচনা পড়লেই তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। এঁদের মধ্যে সুলতা করের 'শতাব্দীর প্রভাব' বেশ পূর্ণাংগ, আঁটো সাঁটো গড়নের। প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'শ্রাবণস্বপ্ন' একটি পুরোপুরী পুরাতন পর্য্যায়ের বসুমতী-মার্কা গল্প। সম্পাদক গল্পটি গ্রহণ না করলে বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। 'মমতাহীন মৃত্যু' বা 'এই যুদ্ধ'—এই দুটি অতিসরল সাদামেটে গল্পও বিশেষ সুবিধের হয় নি। এই ধরণের কাহিনী বহু লেখা হয়েছে—আখ্যানভাগ বা বর্ণনাভংগী কোন বিষয়েই লেখকের কোন 'স্ফুলিংগ' দেখা গেল না। সম্পাদকের গল্পটিতে বেশ একটু মেলোড্রামার উপাদান ছিল—তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি, আরো ছোট ও আরো কৈন্দ্রমুখী করতে পারলে গল্পটি সফল হতে পারত। পৃথ্বীশ রায়চৌধুরীর গল্পটি মন্দ নয়—কিন্তু ভদ্রলোকের কর্মজ্ঞান বড় কম। তাই শেষের দিকে ছাড়া অন্যান্য অংশে গল্পটি কেমন যেন এলায়িত মনে হয়। মাধুরী রায়-এর 'পার্বতী' গল্পটির আবহাওয়ায় বেশ একটু জাদুর ভাব ছিল—লেখিকা তার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারলে সুবোধ ঘোষের মত চমকলাগানো গল্প রচনা করতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি একটি পান্‌সে 'কথিকা' বানিয়ে ফেল্লেন। গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গরল ভেল' এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পলকে যে আঁখিঝরে' প্রথম শ্রেণীর গল্প হয়েছে। গণেন্দ্রবাবুর মধ্যে উপদেশদানের স্পৃহা মধ্যে মধ্যে বড়ো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁকে আরো সংযত হ'তে হবে। বিনয় ঘোষের 'দশমীর সূর্য ওঠে পূর্বাচলে' সংকলনটির অন্যতম নিকৃষ্ট গল্প। লেফ্‌টিষ্ট ও রিয়ালিষ্ট হবার মোহে একজাতের লেখক বাঙলাসাহিত্যে আজকাল কি ধরণের বিকৃতরুচির আমদানী করছেন বিনয় ঘোষের গল্পটি তার নিদর্শন।

যাই হোক্, মোটামুটি সংকলনটি ভালই হয়েছে। বিশেষ করে উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন সেই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত না করে উপায় নেই।

রবি চক্রবর্ত্তী।



পূর্ব্বাশা
ফাল্গুন-১৩৫৩

বাংলা
(১৩৫৩)

শিল্পী
হৈমন্তী সেন

পূর্বাশা

নবম বর্ষ ● একাদশ সংখ্যা

ফাল্গুন ● ১৩৫৩

ভারতবর্ষ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

চারদিকে নূতন আলোর আকাশ, আমার রক্তে পুরোণো মাটি।
পুরোণো মাটি—
সময়ের ঢেউ-লাগা সিক্ত সৈকত।
সময়ের ঢেউ গুণি, ঢেউ শুনি আমার মনে।

এ-মাটিতে যেদিন প্রথম জীবনের উৎসব
আকাশে তখন রাত্রি,
রাত্রির ছায়া মানুষের জীবনে।
তবু কালো রাত্রির কালো মানুষেরা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়েছিল,
সুদূর সূর্য্যের দিকে তাকিয়েছিল।
সেই নম্র আলো ভালো লেগেছিল তাদের
জীবনকে ভালোবাসবে বলে'।
জীবন, চিরদিনের জীবন, প্রাণের উষ্ণ নীড়—
নারীর রচনায়, নারীর স্বপ্নে, নারীর নিবিড় চোখে
হৃদয়ের কতো বিচিত্র লিপি!
জীবনকে ভালোবেসেছিল তারা

আর ভালোবেসেছিল মাটিকে ;
মাটির প্রথম সন্তানের মাটিকে পাওয়া
মায়ের মতো, দেবতার মতো পাওয়া
কতো সহজ তবু কতো গভীর—
কতো নিবিড় জীবনের এ-উচ্চারণ :
'ধরিত্রীদেবতা', 'ধরিত্রীমাতা' !

গভীরতার ক্লান্তিতে ফুলে ওঠে সমুদ্র।
নিবিড়তায় নিঝুম জীবনও কি চেঁচিয়ে ওঠেনি হঠাৎ ?
আকাশ, রাত্রির ঘুমন্ত আকাশ হয়ত জাগল তাই
ইন্দ্রবরুণমিত্রাগ্নি নিয়ে জেগে উঠল আকাশ !
আকাশের ছোঁওয়া লাগল কালো মানুষের জীবনে
রৌদ্রের ছোঁওয়া, শুভ্রতার ছোঁওয়া।
তবু কতোটুকু দিতে পারে আকাশ মাটির মানুষকে ?
দিতে পারে স্বপ্ন, রক্ত নয়—
দিতে পারে মৃত্যুর কাহিনী, জীবনের স্পন্দন নয়।
'স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো'
আকাশে মৃত্যুর বিচরণ—জীবনের বিচরণ মাটিতে,
কালো মানুষের শুভ্র হাড় শুভ্রতর করে দিতে পারেনা আকাশ।

কে হারাল !
মাটিই কি শুধু হারিয়ে গেল আকাশের পারাবারে
বন্দী কি হ'ল না আকাশ ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে ?
কে জানে ? জানেনা আকাশ, জানেনা মাটি, জানে শুধু জীবন
নূতন এক জীবন, জীবনের নূতন আহ্বান :
শবরের শর্ব্বরীতে কতো রমণীর শুভ্র দেহ মিশে গেল,
শবরীর শর্ব্বরীতে এলো সূর্য্য-প্রতিম কতো তাপস !
আকাশ আর মাটির মোহনায় নূতন একটি দ্বীপ,
দ্বৈপায়নের কণ্ঠে নূতন ধ্বনি :
'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্'।
নূতন কথা—জীবনের ঐশ্বর্য্যের কথা।
মৃত্যুর কথা নয়, ঐশ্বর্য্যের কথা।

অমৃতের কথা নয়, ঐশ্বর্য্যের কথা।
মৃত্যুর কি মানে পেয়েছ নচিকেতা,
জীবনের কি মানে পেয়েছে অমৃতের পুত্রেরা ?
জীবনের মানে খুঁজে নাও ঐশ্বর্য্যে,
কতো প্রচুর, কতো তীব্র যে জীবন খুঁজে নাও।
পুরোণো মাটির নূতন দ্বীপে জন্ম দাও আগ্নেয় জীবনের :
'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্'।

ভারতবর্ষের জন্ম হ'ল।
গন্ধার-কেকয়-মদ্র-উশীনর-মৎস-কুরু-পঞ্চাল-কাশী-কোশলের জন্ম হ'ল,
মণিকুট্টিমে খচিত হ'ল অরণ্য-লাবণ্য !
শুধু তপোবন আর উটজে বনজ্যোৎস্না নয়,
শকুন্তলার চকিত দৃষ্টি নয় শুধু,
কালো আর সাদা মাটির গাঢ় আলিঙ্গন আঁকা মেঘপ্রভ শিলাগৃহে
—বিদ্যুৎময়ী ললিতবনিতার ভ্রূভঙ্গী,
অলকে তাদের কুন্দকোরক, চূড়াপাশে নবকুরুবক !
বিদিশা-দশার্ণ-উজ্জয়িনীর সৌধাবলীতে গেহিনীও তা'রা
স্তনমনম্র তন্বী, শ্যামা,
সলজ্জ প্রিয়া তা'রা—শিথিলনীবীক্ষৌমবাস,
তা'রা বিরহিনী, একবেণীবদ্ধা।
নিশীথের রাজপথে অভিসারিকার মেখলানিক্কণ,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে কর্ণাভরণের বিদ্যুৎ !

অগ্নির জন্ম দাও তুমি, নারী,
জীবনের জন্ম দাও।
আগ্নেয় জীবন আকাশে লেলিহান হয়ে ওঠে
পৃথিবী ভরে যায় কারুকার্য্যে !
তোমার শক্তিশালায় আত্মার নির্ম্মাণ—বিশ্বের নির্ম্মাণ চলেছে, নারী,
মহাকাশের মহিমা কি তুমি নও—
তুমি কি নও পৃথিবীর অণুর অণিমা—
নও সর্ব্বক্রমশরীরিণী ?

উন্মুক্ত জীবনের বিজয়স্তম্ভে তাই খচিত হ'ল সমুদ্র-মেখলা ভারতবর্ষ
তৈরী হল জীবন-দেবতার মূর্ত্তি,
ফিরে এলো ধরিত্রীমাতা শক্তিমাতার ঐশ্বর্য্য নিয়ে।
সময়ের সীমা ছাড়িয়ে সে ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি
দীর্ঘ ভবিষ্যতে তার বিস্তার!
জন্ম হ'ল জননীর,
মাতৃভূমির জন্ম হ'ল।

সন্তানের মাতৃভূমি—দেশ!
পরশপুর থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ
তাম্রপর্ণী থেকে শ্রাবস্তী—
মাটির দেশ নয় শুধু, মানুষের দেশ।
মদ্র-মল্লী-যৌধেয়-কীরাত-মৌর্য্য-লিচ্ছবি-গৌড়
পাণ্ড্য-অন্ধ্র-পুলিন্দ-রাষ্ট্রিক-ভোজ—
উদ্ধত জনতরঙ্গের অজস্র দর্পিত বাহু!
তা'রা পৃথিবল্লভ, অবনীজনাশ্রয়, পরমভট্টারক, পরমমহেশ্বর,
অশ্বপতি-গজপতি-নরপতিরাজত্রয়াধিপতি তা'রা!

উজ্জিহান সূর্য্যের দেশ!
প্রভাতের তৃষ্ণা কেঁপে উঠল কতো পাখীর পাখায়,
দূরদূরান্তের কতো পাখীর রক্তে প্রমত্ত সূর্য্যকামনা!
আর কতো রক্ত গৈরিক ধূলো হ'য়ে গেল সূর্য্যের উত্তাপে!
কতো দেহ, কতো প্রাণ
তোমার মাটিতে, তোমার আকাশে, তোমার আলোতে হারাল

তারপর আবার বুঝি সূর্য্যের ক্লান্তি সময়ের সমুদ্রে—
এবার মেঘ, এবার ঝড়।
সূর্য্যকিরীট ফেলে দিয়ে কি বেশে এসে দাঁড়ালে, সাবিত্রী—
কোন্ অন্ধকার ভবিষ্যতে প্রবাহিত তোমার কালো চুলের নদী—
কালের কতো দূর পথে?

রক্তের ঝর্ণায় কোন্ শক্তি পান কর, মহাকালী,
মৃত্যু দিয়ে জীবনকে কোন্ শক্তি পান করাও ?

এবার তুমি শাক্ত সন্তানের ধাত্রী, ভারতবর্ষ, সন্তানের জননী নও আর।
আরব সমুদ্রের তীরে তীরে একদিন তাজিকের অশ্বক্ষুরে তপ্ত বালু উড়ল,
সে-তপ্ততায় বিরাট এক মরুশক্তির, সমুদ্রশক্তির উপঢৌকন পেয়েছে তোমার মন,
পেয়েছ মনের নীড়।
মরু-পথিকের সঙ্গে তাই মন তোমার বিচরণ করেছে বহুদূর—
পশ্চিম দিগন্তের আরণ্য তমসায়।
তারপর তোমার তমসা—তমোতপস্যা তোমার,
গুর্জরপ্রতীহারের চিতাভস্মে পাণ্ডুর হ'ল তোমার আকাশ—
আর গজনীর আকাশে বাঁকা চাঁদ উঠলো।
তোমার ভৃঙ্গারে সেদিন তরুণ তুরুষ্কের শক্তির সুরা !
তাদের বাঁকা তলোয়ারে ঝলমল ঝিলমের তীর—
কনৌজের মৃত রাজপথ ঝঙ্কৃত ;
সেদিন ঘুরের ঘূর্ণীবাত্যা
তরৌরির রণপ্রান্তরে—
গৌড়ের তমালতালীবনরাজিনীলায় !
তবু 'ম্যয় ভুখা হুঁ'—চীৎকার,
আরাবল্লীর পাহাড়ে পাহাড়ে তোমার বুভুক্ষু আত্মার বিচরণ !
ব্যর্থ হয়েছে দিল্লীর দলিত প্রাণের ক্রন্দন,
পাণিপথে অঞ্জলি ভরে রক্তপান করেছ তুমি !

বহুদিন—বহুযুগ—
বহু প্রভাতের ললাটে রক্ত তিলক—
তারপর একদিন এ-রৌদ্রের অবসান।
আষাঢ়ের—রবি-আস্-সানীর একটি মেঘস্নিগ্ধ আকাশে
সিক্রির মস্‌জিদ থেকে খুৎবা ধ্বনিত হ'ল :
"তুমিই আমায় ঐশ্বর্য্য দিয়েছ খোদা—
দিয়েছ বলদৃপ্ত বাহু আর বিচক্ষণ হৃদয়…"

মুখতুলে তাকাল ব্যথিত মাটি প্রাসাদ-ঝরোখায়—
"কে এলো—
হৃদয়ের ধ্বনি নিয়ে কে এলো ?"
মাটির অণুতে অণুতে প্রতিধ্বনি বাজল :
"দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা !"

হয়তো কোনো তুরাণী রূপসীর চোখের নীল
নাল পাহাড়ের কুয়াশা হ'তে তাদের রাত্রির স্বপ্নে নেমে এসেছে—
গুলবাগের ঘ্রাণে গভীর হয়েছে নিঃশ্বাস,
তবু তা স্বপ্ন—
অতীতে-ফেলে-আসা জীবনের প্রেত-ছায়া
বহুদূরে তাদের কাবুল-সমরখন্দ-শিরাজ-বোখরা !
পায়ের নীচে তখন নূতন মাটি,
ঘুমভাঙ্গা চোখে সমতলের শ্যামল আলো,
সিন্ধু আর গঙ্গার বাহুবেষ্টনে বন্দী তা'রা।
নূতন মাটির নবজাত সন্তান !
নূতন মাটি, তবু তাদেরই জন্মভূমি !
ভালো লাগে চোখে তাদের যমুনার কালো জল,
ভালো লাগে যমুনার কোলে চোখের জল ফেলে যেতে !

আবার ইন্দ্রধনুচ্ছটা তোমার সন্তানের দেহে,
শুভ্ররুচি তুমি সন্তানের মনে—
রূপরস গন্ধশব্দের উৎসব আবার !
তাই আবার সুদূর প্রতীচীর মুগ্ধ লুব্ধ দৃষ্টিপাত—
তাই হিস্পাণীর উপকূল গুঞ্জন-মুখর :
পার হতে হবে রাত্রির কতো সমুদ্র—
কালো অরণ্যের ছায়া-শিহরিত কতো পথ—
কতো দৈত্যের দেশের পর এ স্বপ্নস্বর্গ ?
দুস্তর পারাবারে ভাসল প্রতীচীর পণ্যতরী।

তারপর একদিন সমুদ্র-শঙ্খের গর্জ্জনে মালাবারের বেলাভূমি উচ্চকিত,
শঙ্খশুভ্র মানুষের ভীরু পদধ্বনি নারিকেলের নিভৃত ছায়ায়,
আগ্রার বিপণিতে পণ্যাজীবের দীন হাসি !
কি নিষ্ঠুর, কুটিল স্বপ্নের ছদ্মবেশ এ দীনতা
কে জানত সেদিন ?
কে জানত পণ্য হ'বে ভারতবর্ষের মাটি,
পণ্য হ'বে মানুষের মন ?
জান্‌তনা কর্ণাটক, পলাশী, মহিশূর, দিল্লী—
কামানের আগুনে পুড়বার আগে জানতনা ।

হে প্রাচী, মায়ের মত উষ্ণ অনুরাগে তুমি স্পর্শ করতে পারোনি প্রতীচীর তুহিনশীতল বুক—
সে তোমার সন্তান হতে চায়নি, প্রভু হয়েছে ।
যন্ত্রের পেষণে তোমার মাটিকে ধূলোর মতো দিগ্বিদিকে উড়িয়ে দিয়েছে তার বাহু,
তোমার মাটিকে—তোমার আত্মাকে !
শুন্‌তে চায়নি সে তোমার কান্না, দেখতে চায়নি হাসি, খুঁজতে যায়নি প্রাণ
দেখবার ছিলনা কিছু তার, জানবার ছিলনা কিছু
তার ছিল শুধু ইন্দ্রজালে তোমার মাটিকে সোনা করে নেওয়া !
তুষারের দেশে স্বর্ণসূর্য্য উঠল,
হে প্রাচী, তুমি প্রাচীন অন্ধকারে আবার !

অন্ধকার !
সে অন্ধকারে কোথায় আর প্রাণের বিচিত্র উৎসার—
সময়ের কর্ম্মশালায় কোথায় সে মহাজীবনের নির্ম্মাণ ?
সব—সবই অন্ধকারের ছায়ায় হারাল !
অন্ধকার ।
একটু আলোও কি আসেনি সে রূঢ় অন্ধকারে
পশ্চিম আকাশের একটু তির্য্যক আলো—
সূর্য্যের সামান্য প্রসাদ ?

এসেছিল—কোন্ এক বিস্মৃত সমাধি থেকে বুঝি উঠে এসেছিল—
সূর্য্যের স্মৃতি-লিপি অন্ধকার আকাশে,
অন্ধকার মাটির অণুতে অণুতে তাই বিদ্যুৎ-স্ফুরণ—
প্রাচীন অন্ধকার,
অগ্নিসরণিতে সূর্য্যসাযুজ্যের স্বপ্ন এলো তোমার চোখে !
অন্ধকারের দীপাবলী—
লোহিত আগুনের অজস্র, অশান্ত স্ফুলিঙ্গ
একটি শ্বেতশুভ্র নিষ্কম্প শিখায় আকাশ আলিঙ্গন করেছে আজ।
সে-শুভ্রতায় বিচ্ছুরিত পুরোণো মাটির আত্মার জ্যোতি,
অতীতের, ভবিষ্যতের।

তোমায় চিনি, ইতিহাস-দেবতা,
মনের বিধাতা, চিনি তোমায়—
জানিনে আর দেবতারা কোথায় !
জানি তোমার নাভিনালে ফুটে উঠেছিল অতীতের শতদল,
ফুটে উঠবে ভবিষ্যতেরও পদ্মরাগ।
তোমার মালাগাঁথার শেষ নেই,
শেষ নেই ফুলের মত জীবনের—জীবনের মত ফুলের শেষ নেই !
ফুল—যার সুরভিত স্বপ্নে এসেছে আমার বসন্ত—
আমার বৈশাখ, আমার আষাঢ় রূপায়িত যার রূপরেখায় !
যে-মাটি ফুল ফোটায় আমার রক্তে তারই হাতছানি—
পঙ্কমাতার পঙ্কজ আমি মহাকালের মালায় ।।

[প্রথম প্রকাশ : স্বরাজ—২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৭

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার রূপরস সাধনা

[আধুনিক আন্দোলন]

যামিনীকান্ত সেন

ইংরাজ-প্রভাব শুধু কামানের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এসে এদেশের পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর ও রাজপুত প্রভৃতি জাতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছে একথা আংশিকভাবে ঠিক হলেও ইংরাজী সভ্যতার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ছিল বিজিত জাতিদের ভিতর নানাভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। মোগল আধিপত্য যে ইংরাজ চূর্ণ করেছে তারা অসাধারণ জাতি, তাদের সভ্যতা অতুলনীয় একথা প্রচারের দ্বারাও প্রমাণ করা হয়েছে এবং কাজের দ্বারাও সকলকে বোঝাতে হয়েছে। ফলে পরাজিত জাতিরা বিজেতাদের যে চোখে দেখে—সে চোখেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এদেশের জনসাধারণ দেখতে সুরু করে।

ফলে এদেশে ইউরোপীয় প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ইংরাজী ভাষা এখানকার প্রধান ভাষায় পরিণত হয়। ইংরাজী সাহিত্য এদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে পরিগণিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে ইংরাজীর অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করলেন। পরবর্ত্তী কবিরাও ইংরাজের আদর্শে গীতিকবিতা ও উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করে ইংরাজের সভ্যতা ও শীলতাগত প্রভাব এদেশে পরোক্ষভাবে স্থায়ী করেছে। ইংরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রচনা ও প্রচার কার্য্যের দ্বারা।

মুসলমান শাসকগণও গোড়াতে বাংলাদেশে এসে পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজারা যাতে হেয় প্রমাণিত হয় এবং সকলে যাতে নিজেদের দুর্ব্বল ও তুচ্ছ মনে করে এরকম প্রচার কার্য্য চালায়। রাজা লক্ষ্মণসেন সতের জন অশ্বারোহী দেখে পলায়ন করে এরূপ একটি উক্তি বহুকাল প্রচারিত হয়। ফলে এদেশে নিজেদের প্রতি সকলেরই একটা অশ্রদ্ধার

ভাব জেগে ওঠে। এই অশ্রদ্ধার উপর নিহিত হয়ে পাঠান আমল বহুকাল নির্ব্বিবাদে চলে এসেছিল। ইংরাজ আমলে এই অশ্রদ্ধা আরও ঘনীভূত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতা সকল দিকে এ জাতিকে অবরুদ্ধ করে এবং সকলেই নিজেদের অপদার্থতাকে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করে।

সাহিত্যক্ষেত্রে ইউরোপের প্রভাব এসে পড়ে অসামান্য ভাবে। রম্যকলা ও কারুশিল্পেও এই প্রভাব আরও মারাত্মক হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলে ইংরাজ চিত্রকরেরা এসে নবাবদের প্রতিকৃতি রচনা করে—কারণ নবাবেরা পরিশেষে ইংরাজের বশ্যতাই স্বীকার করে। ইউরোপীয় শিল্পীরা ক্রমশঃ এদিকে এসে এখানকার ধনীদের প্রতিকৃতি রচনা সুরু করে দেয় এবং কখনও বা নানা বিষয় নিয়ে চিত্র আঁকতেও অগ্রসর হয়। তাতে করে বাস্তবপন্থী (realistic) তৈলচিত্র রচনার প্রথা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। এ শ্রেণীর শিল্পীদের ভিতর Zoffany'র নাম উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিকলাতেও ইউরোপীয় শিল্পীর প্রভাব বিস্তৃত হয়। লাটসাহেবদের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয় কলিকাতার ময়দানে, ফলে ইউরোপীয় কলার এবং সে কলার আদর্শের চিহ্ন দেশের ললাটে প্রত্যক্ষভাবেই ন্যস্ত করা হয়। এদেশের মূর্ত্তিশিল্পীদের কৃত্য সকলেই যেন ভুলে যায়। ইউরোপীয় বা বিলিতী না হ'লে কিছুই শ্রেষ্ঠ হতে পারেনা এ ধারণা প্রতিদিনই প্রতি বিষয়ে এগিয়ে চলে। অজস্রভাবে বিলিতী মালের আমদানী হ'তে থাকে—দেশীয় শিল্পকে নানা কূটনীতি ও অত্যাচারে ধ্বংস করা হয়। মসলিনের দেশে বিলেত হতে কাপড় আসতে থাকে। একদিকে ইংরাজী সভ্যতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এমনি ভাবে, অন্যদিকে আর কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনা-পরম্পরা ঘরের ও বাইরের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করে। কিছুকাল ইংরাজ শাসনের পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও কলা বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তা'তে করে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য এই অনুসন্ধানের ফলে বেরিয়ে পড়ে। এ ভাষাটি সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করে। পরাজিত ভারতবর্ষকে সকলেই এত তুচ্ছ মনে করত যে, সংস্কৃত সাহিত্যের সকল গ্রন্থকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা জাল গ্রন্থ বলতে সুরু করে। পণ্ডিত Maxmuller বলেছেন "Yet such was the surprise created by the discovery of this language and by its startling similarity to this classical languages of Greece and Rome that some of the most distinguished people of the last century declined to beleave its historical reality and accused the wily Brahmins of having forged it to deceive their conquerors" * শুধু একথা বলে' ব্যাপারটি শেষ হয়নি। Dugald Stuart

* Dugald Stuart, Conjectures concerning the origin of Sanskrit unannuller, The Science of Language Vol, 1891.

নামক পণ্ডিত সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "He therefore declined the reality of such a language as Sanskrit altogather and wrote his famous essay to prove that Sanskrit had been put together after the model of Greek and Latin by those arch-forgerers and liars, the Brahmins and the whole Sanskrit Literature was an unposition."

ব্রাহ্মণেরা সকলেই জানিয়াও মিথ্যাবাদী এবং সংস্কৃত সাহিত্যটিই একটা অলীক ব্যাপার, একথা যারা ঘোষণা করে তাদের এদেশ সম্বন্ধে ধারণা কিরূপ তা' সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

এদেশের রূপ ও রস সাধনার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য বিচার এরূপ অসহিষ্ণু ও অনুদার হয়েছে। অজন্তার চিত্রকলা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। Lionel Bavnett ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্প আবিষ্কারের একটা বিবৃতি দিয়েছেন।* ভারতের ভাস্কর্য্য ও চিত্রসৃষ্টি দেখে অনেকে এগুলিকে "ধার করা" বা "জাল" বলেছে, আবার অনেকে বলেছে এসব কুৎসিত ও জঘন্য। উপরোক্ত গ্রন্থের লেখক ভারতীয় আর্টকে বলেছে "Fantastic" "Grotesque" "Loathsome" ও "Monstrous"। ইংরাজী ভাষায় কুৎসামূলক এমন শব্দ পাওয়া কঠিন যা ভারতীয় কলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়নি। ‡ বিজিত জাতির রচনাকে এমনিভাবে কুৎসা দ্বারা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে ক্রমশঃ এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এসব পণ্ডিতদের কথাকে শিরোধার্য্য করেছে। আপশোষের বিষয় হিন্দুজাতি নিজেদের বহু দেবমূর্ত্তিকে লজ্জাজনক মনে করেছে—অথচ ইউরোপ কোন কালে গ্রীক দেবতাগুলির মূর্ত্তিকে এরকম চোখে দেখেনি। মিশনারীদের মতামত পাঠ করে দেশ নিজকে আসামীর কাঠগড়াতে অভিযুক্ত বলেই মনে করেছে। মিশনারীরা সফলই হয়েছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে, রামমোহন রায় এবং পরবর্ত্তী সকল শ্রেণীর ধর্ম্মসংস্কারকগণ তথাকথিত হিন্দু পৌত্তলিকতার নিন্দায় মুখর হয়েছিল এবং একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য অধীর হয়েছিল। গ্রীক পৌত্তলিকতা কখনও নিন্দার বিষয় হয়নি এবং খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক পৌত্তলিকতাও রোম সহরে জয়ধ্বজা তুলে আজও বর্ত্তমান। গ্রীকেরা জীবিতও নয় এবং ইংরাজের হাতে পরাজয়ও মানেনি—রোম সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। আধুনিক বিচারকেরা দেখেছেন হিন্দুকল্পনায় পুত্তলিকার প্রশস্তি নেই—মনীষী Spalding একথা স্পষ্ট বলেছেন। রূপ রচনার দিক হতেও বরং গ্রীক মূর্ত্তি পুত্তলিকা হতে পারে কিন্তু হিন্দু মূর্ত্তি আদ্যোপান্ত, লক্ষণ, আধার, মুদ্রা, ভঙ্গী ও তিলক প্রভৃতি দ্বারা একটা পরোক্ষতত্ত্বের দ্যোতক। প্রত্যক্ষ চেহারা হিন্দু দেবমূর্ত্তির চরম বা শেষ কথা নয়।

* Antiquities of India.

‡ Antiquities of India, p. 256

রামমোহনের ঐক্যবাদই হোক রমেশচন্দ্র দত্তের বৈদিক একত্বের প্রশস্তিই হোক বা বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদই হোক এ শ্রেণীর মতবাদ পাদরীদের বহুত্ববাদের উপর অশ্রান্ত আক্রমণের ফলেই উপস্থিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রচারকার্য্য সকলকেই এক কোণে জড় করেছিল অসহায় মেষশাবকদের মত। সকলেই নিজের পুঁথিপত্র ঘেঁটে মিশনারীদের তিরস্কৃত "পৌত্তলিকতা" ও 'বহুদেববাদ' হ'তে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্মের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য উৎসাহিত হয়। অধঃপতিত জাতির পরাজিত (defeatist) মানসিকতা এ ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। ভারতের বহুত্ববাদ ও একত্ববাদ যে একই সত্যের দ্যোতক এ বিষয়ে এখনও দেশ সচেতন হয় নি। দাসমনোবৃত্তি চিত্তকে এখনও উন্মুখী করেনি। জগতে ঐক্যবাদের মূলেও যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে—একথা সেকালে কারও মনে জাগেনি।

এদেশে যাঁরা পারমার্থিক ব্যাপার নিয়ে চর্চ্চা ও অধ্যয়ন করেছে তারাও নিজেকে অন্তরে অন্তরে হীন মনে করেছে তাতে সন্দেহ নেই। না হলে নিজেদের বর্ত্তমান মত সমর্থনের জন্য দু'হাজার বছরের ভিতরকার ইতিহাস খুঁজেও কোন সমর্থন না পেয়ে দু'হাজার বছরের প্রাচীন যুগের দোহাই দেওয়া কেন? এদেশে কি স্বাধীন যুগ ছিল না? গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের স্বাধীন যুগে এ দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও কলালীলার জগজ্জয়ী সম্পদ সৃষ্ট হয়ে যে অভূতপূর্ব্ব সমুত্থানের সূচনা করে তা সমগ্র এসিয়াকে সমৃদ্ধ করে। অথচ এ যুগে ঈশ্বরের অদ্বৈততত্ত্ব কল্পনার সহিত মায়াবাদের পুচ্ছ কখনও স্বীকৃত হয়নি এবং অনাসক্ত যোগক্রিয়াও কখনও সকলের চিত্ত হরণ করেনি।

মোটকথা মুখে স্বীকার না করলেও পাশ্চাত্য প্রচারকার্য্যের ফলে সকলেই নিজেদের ধর্ম্ম, সমাজ, আচরণ ও কলালীলাকে লজ্জার ব্যাপার মনে করেছিল। একাল পর্যন্ত ইউরোপের পণ্ডিতরা ভারতীয় বহুহস্ত ও বহুশীর্ষা মূর্ত্তিগুলিকে অসঙ্কোচে "Grotesque" বা বীভৎস বলে থাকে। এ সব মূর্ত্তিকে ওরা কিছুতেই সুন্দর বলতে প্রস্তুত নয়। ভারতীয় শিল্পের সমঝদার Lord Ronuldshayও এ সব মূর্ত্তিকে "Grotesque" বলেছে। আজ পর্য্যন্ত এগুলির সৌন্দর্য্যগত ছন্দ যে কোথায় তা' কেউ বুঝতে পারেনি। অথচ যে দেশে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে চরম সাধনা হয়েছে এবং চৌষট্টি কলার উদ্ভাবন ও চর্চ্চা হয়েছে—তারা যে ইচ্ছা করে কুৎসিত কিছু রচনা করবে এরূপ কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অথচ ইউরোপের দুর্ব্যাখ্যা ও অপভাষণ শুনে' এ দেশের লোকও ওদের কথা মেনে নিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের মত ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত লোকও যদি ওদের বাজে কথা মেনে নিয়ে ভারতীয় সৃষ্টির বিচার করে তা হ'লে পরিতাপের সীমা থাকেনা। অথচ তাই হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজদের অনুকরণ করে ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের এই বীভৎসতার

(grotesqueness) কথা উল্লেখ করেছেন। যাঁরা ধর্ম্মবিষয়ে অগ্রণী তাঁরাও যদি ইউরোপের আজগবী মত গ্রহণ করে তবে বলতে হয় দাসত্বের নিষ্পেষণে এদেশের এযুগে মৃত্যুই ঘটেছে।

কাজেই ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের প্রচারকার্য্যে এদেশের সমগ্র তাত্ত্বিকও কলাবিষয়ক ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। তাতে করে ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ করা ছাড়া এদেশের আর গত্যন্তর ছিলনা।

এদেশের মূর্ত্তিবাদের বিরুদ্ধে পাদরীদের প্রচারকার্য্য এবং ভগবানের যথার্থ বহুত্ববাদ বিষয়ে ইউরোপের উপলব্ধির অক্ষমতা দেশের সভ্যতা ও শীলতা সম্বন্ধেও জগৎকে বিভ্রান্ত করেছে তাতে। এদেশও অসাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মোগলাই আমলেও এরকম অন্ধতা দেখা যায়নি কারণ প্রাচ্য বলে মুসলমান পণ্ডিতগণ সহজেই ভারতের বহুমুখী রূপের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করেছিল। একেশ্বরবাদী হয়েও ইসলাম ভগবানের সর্ব্বঘটে অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাছাড়া সুফীবাদও ইসলামকে ভারতের ঘনিষ্ট করে। এজন্য মুসলমান আমলেও রাজপুত্র দারাশিকো উপনিষদ, যোগবাশিষ্ট এবং ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন। সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার না করে এদেশে একটা নূতন ধর্ম্মই সৃষ্টি করে।

আত্মরক্ষার জন্য এদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে বৈরাগ্যবাদ, সন্ন্যাসবাদ ও অনাসক্তিবাদের প্রচার হয় কারণ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের পেছনে যে মায়াবাদ আছে তা'কে মাথায় তুলে নিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভাবুকেরা অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাই চরম কর্ত্তব্য মনে করে। অথচ যে তান্ত্রিক দর্শনের শক্তিবাদ ও যোগবাদ এক সময় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল তা' বোঝবার ক্ষমতা এযুগে কারও হয় নি। ফলে খ্রীষ্টান প্রচারকগণের চেষ্টায় এদেশ এক বিপদ হ'তে অন্য বিপদে গিয়ে পড়েছে। বৈরাগ্যের দ্বারা বসুধাকে জয় করা যায় না।

শিল্পরচনাক্ষেত্রে এই দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা সমগ্র জাতিকে ক্ষয়রোগগ্রস্ত করেছিল। কয়েকটি ইউরোপীয় সমঝ্‌দার দেখ্‌তে পান যে এদেশে ইউরোপীয় আদর্শেই সবকিছু রচিত হচ্ছে অথচ প্রাচ্যদেশের কলাসম্পদ তুচ্ছ করার ব্যাপার নয়। রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' জাপান যখন জয়লাভ করলে তখন জাপানের প্রতি খুব শ্রদ্ধা হল ইউরোপের এবং জাপানী কলালীলার প্রতি বিশিষ্টভাবে একটা অনুরাগের সঞ্চার হয়। এরপর শিল্পী হিরোশিগে ও হোকুসাইর আঁকা বহু চিত্র ইউরোপে বিক্রয়ের জন্য রপ্তানি হতে সুরু করে। সকলেই এই সব প্রাচ্য চিত্রের অসাধারণ রেখা-নৈপুণ্য ও বর্ণের কালোয়াতী দেখে মুগ্ধ হ'ল। হুবহু না হলেও এসব চিত্রের কলালীলার তুলনা ইউরোপে পাওয়া যায়নি। কাজেই ইউরোপের এই প্রতীতি হল শুধু মানুষ বা বাস্তব চেহারা অনুকরণ বা নকল করলেই চিত্রকলার শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চিত্রকে রসবান্ করতে হলে অন্যপথে যেতে হয়। এরকম নূতন

দৃষ্টিভঙ্গীতে সমগ্র ইউরোপীয় চিত্রকলার ভিতর একটা বিপর্য্যয় আসে। এর ফলে আভাসবাদী (Impressionist) চিত্ররচনা আরম্ভ হয় ইউরোপে। ইউরোপের ইতিহাসে এটা একটা বিরাট মানসিক বিপ্লব সন্দেহ নেই। এর ফলে কয়েকটি ইউরোপীয় সমঝ্‌দার মনে করে যে কলাক্ষেত্রে ইউরোপীয় আদর্শই একমাত্র আদর্শ নয়।

অপরদিকে ভারতের সহিত জাপানের সামাজিকতাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। বিখ্যাত কলাসমালোচক মনীষী ওকাকুরার কলিকাতায় আগমন একটা স্মরণযোগ্য ঘটনা। এই সুরসিক জাপানী রসবিদ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী অতিথিরূপে ছিলেন। তিনি সকলকেই প্রাচ্য আদর্শের দিকে অগ্রসর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হতে অনুরোধ করেন। প্রাচ্য আদর্শে রচিত জাপানী চিত্রকলার রসতত্ত্ব তিনিই সকলের মনে জাগ্রত করেন। তখনই সকলের মনে স্বাদেশিকতার দিক দিয়ে ভারতীয় কলার ঐশ্বর্য্যের বিষয় জাগরূক হয় এবং ইউরোপীয় কলার বিদেশী ও সঙ্কীর্ণভঙ্গীকে তুচ্ছ মনে করার প্রেরণা জাগে। ওকাকুরার শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। স্বাধীন জাতির এই সুপণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিচার করতে গিয়ে দু'হাজার বছরের পুরোণ আদর্শকে খুঁজে বের করেন নি—গুপ্তযুগের আদর্শই এ বিষয়ে যে প্রচুর তা' তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি স্বীকার করেন যে এ আদর্শে চীন এবং জাপানেরও একটা উত্থানের যুগ আসে। তিনি বলেন:

"Kalidas's poetry, Varahamihir's astronomy, wall paintings of Ajanta and sculptures of the Ellora caves gave their inspiration to the Taug art of China···For the moment spirit was seeking union with matter and the joy of the first embrace was to ring from Ujjain to Choan and Nava, through the songs of Kalidasa, of Ritaihaken and of Hitomaru." *

কাজেই গুপ্তযুগের রচনার বিশিষ্ট শ্রী কোন কালেই উপেক্ষার ব্যাপার হ'তে পারে না। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকেই ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্ট আদর্শের অনুরাগী হলেন। এক্ষেত্রে শিল্পবার্ত্তার অগ্রণী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটা নূতন দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হলেন।

এ সময় ইউরোপীয় শিল্পে দীক্ষিত হ্যাভেল সাহেব (Havel) সাহেবও ভারতের আদর্শের একটা যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণে অগ্রণী হন। তিনি ভারতীয় আদর্শে চিত্ররচনার পক্ষপাতী হন এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন। একজন পাশ্চাত্য রসবিদের পক্ষে এরকম মতামত পোষণ একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল। অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেল সাহেবের মতামতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে চিত্ররচনায় ভারতীয় আদর্শের বিষয় চিন্তা

* **Okakura, Ideals of the East P. 105**

করতে লাগলেন। নিজের গৃহেই মোগলাই ও রাজপুত আদর্শে রচিত চিত্রকলার সংগ্রহ ছিল। কাজেই এবিষয়ে পথ কাটতে বিশেষ দেরী হলনা। অজন্তার রীতিও অধীত হ'ল। এসমস্ত আয়োজন ও বিচারের ফলে তিনি একটা চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠা করলেন। এ রীতিকে নব্য ভারতীয় কলার রীতি বলা হল।

এতকাল পরে উচ্চশ্রেণীর সমঝ্‌দারগণ মনে করলেন চিত্রকলাক্ষেত্রে একটা যথার্থ স্বদেশীয় স্বতন্ত্র রীতি প্রতিষ্ঠিত হল। যে সব ইউরোপীয় রসিক জাপানী ও চৈনিক চিত্রকলায় একটা উচ্চ প্রাচ্য আদর্শ দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দ পেতেন তাঁরা অবনীন্দ্রের এই চিত্রাঙ্কনে সন্তুষ্ট হলেন। ঐকান্তিকভাবে কলাগত বিশিষ্টতায় ও রূপসম্ভারে এই রচনার মূল্য কি তা' বিবেচনা করার অপেক্ষা কেউ করলেনা। এ চিত্রগুলি যে ইউরোপীয় অনুকরণ নয় এ কথাই হল সব চেয়ে বড়। এমনি করে' অজন্তার চিত্র, মোগলাই চিত্র ও জাপানীচিত্রের সংমিশ্রণে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার সূত্রপাত হ'ল। এ চিত্রকলা বহুকাল চলে এসেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি নব্য শিল্পীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। অন্ধ্রদেশে, লঙ্কাদ্বীপ, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর, পঞ্জাব, বাংলায় এক বরণীয় শিল্পীকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই নূতন আলোকের সাহায্যে বহু চিত্ররনার সূচনা করেছে। বাংলাদেশ চিরকালই নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এসেছে। সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ হিন্দীতে সম্ভব হয়নি বাংলাদেশেই সম্ভব হয়েছে। অতি আধুনিক অসম ছন্দও বাংলায় প্রবর্ত্তিত হয়েছে ইউরোপীয় প্রেরণার ফলে এবং নূতন কিছু করবার ঝোঁকে। এই নূতনত্বপ্রীতিই জাতিকে সজীব রাখে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিপ্লববাদ সূচিত হয় সমসাময়িক যুগে। কলাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আর একটি বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করে' সমগ্র ভারতবর্ষকে এক নূতন দিকে টেনে আনে।

ঐতিহাসিক দিক হ'তে নব্যভারতীয় কলার আবির্ভাব এদেশে চিরস্মরণীয় হবে। কিন্তু স্বরূপগত ঐশ্বর্য্য ও কলাকৃতিত্বের চরম দান হিসেবে বাংলাদেশের অন্যান্য অভিনব সৃষ্টিকেও স্বীকার করতে হবে রসিকদের। বিশেষতঃ এযুগে এক নূতন আন্দোলন চলেছে ইউরোপে, যাতে করে বর্ব্বর-কলা, গণকলা ও গ্রাম্যকলার বলিষ্ট রূপরচনাকে সকলেই সম্বর্দ্ধনা করছে বিশেষভাবে। কাজেই এই নব্যতম যুগেও জগতের নিকট বাংলার দানের স্বরূপ আলোচনা না করলে বাংলার রূপকীর্ত্তির আলোচনা অঙ্গহীন হবে। অত্যন্ত আধুনিক কালের রচনা ছাড়া।আরও কয়েকটি পদ্ধতি এদেশে হয়েছে তা'তেও নূতন দিক্‌দর্শনের উৎসাহ আছে। কাজেই সব কটি পদ্ধতির আলোচনা না করলে বাংলার আধুনিক যুগের দানের ঐশ্বর্য্য বোঝা কঠিন হবে। বাংলাদেশে বহু প্রাচীন. চিত্রপ্রথা এখন জীবন্ত আছে। তা ছাড়া নূতক কটি চিত্রপদ্ধতিও সুত্রপাত করা হয়েছে। এই আবহাওয়ার ভিতর বাংলার

মনসিজ দৃষ্টিতত্বকে খুঁজে নিতে হবে। দু'একজনের রচনার অন্তরালে বাংলার বহুমুখী শীলতার দান প্রস্ফুট হবে না।

নব্য ভারতীয় চিত্রকলায় যে রীতির প্রতিষ্ঠা হল তাতে কৌল, মার্জ্জিত, সুসভ্য ও সংস্কৃত রুচির প্রতিফলন আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে চিরকালই ভাবপ্রকাশের দু'টি ধারা বা পথ গৃহীত হয়েছে। কৌল বা classical সংস্কৃত সাহিত্য একমাত্র ভাবের বাহন বলে কোন কালেই গৃহীত হয়নি। সংস্কৃত নাটকেও প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার আছে কথোপকথনে। অন্যদিকে বুদ্ধদেব জনসাধারণের মধ্যে বাণী প্রচারের চেষ্টায় সকলের সহজবোধ্য, কথিত পালিভাষার ব্যবহার করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, অধঃপতিত, প্রোথিত অবনত জাতিগুলির ভিতর নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। পালিভাষা জনসাধারণের ভাষা, কোটি কোটি লোকের হৃদ্‌পিণ্ডের তালে তা গ্রথিত। শুধু সুসভ্য ও সুমার্জ্জিত নাগরিক সভ্যতার বাহন নিয়ে ভারতের বিরাট জনতার ভিতর ভাব প্রচার সম্ভব হয়নি। তাই সর্ব্বত্র গণকলার সহজ কারুতা ও অদম্য ছন্দশক্তি অফুরন্তভাবে চিরকাল সকলের চিত্তবিনোদন করে এসেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শকে তুচ্ছ মনে করা হলেও কেউ কেউ সে আদর্শের দীপ-শিখাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। কিন্তু সে আদর্শকে একটা রূপরচনার অফুরন্ত উৎসরূপে গ্রহণ করার সাহস বা উৎসাহ খুব কম লোকেরই হয়েছে। ইউরোপে গ্রীসের অন্তর্গত Athos পাহাড়ে কয়েকজন ধারাবাহিকভাবে গণশিল্পের আদর্শে এখনও খ্রীষ্টীয় মূর্ত্তি আঁকে—কিন্তু এরকমের আদর্শ কারও অভিনন্দন পায়নি বহুকাল। এদেশের পট রচনা, পুঁথির পাতা আঁকা, মাটির খেলনা ও পুতুলের বর্ণবিধান করা—এসবের ভিতর ফল্গুর মত একটা বিরাট প্রাণশক্তি কাজ করেছে। এযুগে কেউ কেউ এই গঙ্গোত্রী হতেও শিল্পরচনার একটী রাজপথ কাটতে উৎসাহিত হয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশেই এরকম অভিনব ও অপ্রত্যাশিত চেষ্টা হয়েছে। ইউরোপের অন্তরঙ্গ কলার জন্ম হয়েছে প্রাচীনতার খাণ্ডবদাহ হতে—বাংলাদেশের নব্য অন্তরঙ্গ কলার সূত্রপাত হয়েছে জীবন্ত রূপাগ্নির মুগ্ধকর হোমানল হতে; যেমন এক দীপ হতে অন্য দীপ জ্বালান হয় তেমনি করে এক অভিনব ও অকল্পিত সৌন্দর্য্যের দেবযান পথ নির্ম্মিত হয়েছে। এ কৃতিত্ব আধুনিক ইতিহাসে অসাধারণ। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মনোভঙ্গী, নূতনত্বের সাধনা ও সূক্ষ্ম বিচারের ভিতর দিয়ে এই আদর্শের কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠেছে। বাংলার রূপস্বপ্নের এই যৌবন জলধিতরঙ্গ কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি এবং কখনও পারবেও না।

কীর্ত্তন

(দুই)

মণিলাল সেনশর্ম্মা

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলেই হোক বা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ধর্ম্মপ্রচার সহজে হবে বলেই হোক বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে তখনকার প্রচলিত সঙ্গীতকে তিনি তাঁর প্রধান বাহন করে নেন। সঙ্গীতকে ধর্ম্মের অঙ্গ করে তুলতে তখনকার সঙ্গীত একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা হয়েছিল ; আর নতুন শ্রেণীবিভাগও তখন থেকেই কীর্ত্তনে হয়েছে।

নামকীর্ত্তন আর লীলাকীর্ত্তনের মধ্যে নামকীর্ত্তনে শুধু ভগবানের নামই গীত হয়। ভজন মাত্রই নামগীত। কিন্তু কীর্ত্তনের নামগীত অন্যরূপ। শ্রীচৈতন্য নামকীর্ত্তনকে এক বিরাট জনগীতিতে (Mass Singing) পরিণত করেন। নামকীর্ত্তন একঘেয়ে হয়ে পড়ে না এইজন্যে যে নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাগে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গীত হয়। যদি তা না হতো তবে চতুষ্প্রহর, অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহর একই নাম একই সুরে ও ছন্দে চলতে থাকলে গায়কের ও শ্রোতার নিশ্চয়ই অবসাদ আসতো ; কিন্তু তা তো হয় না।

বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যে প্রার্থনাগীত এক অপূর্ব্ব সম্পদ। অন্যান্য গীতিপদ্ধতিতেও প্রার্থনাগীত রয়েছে। কিন্তু কীর্ত্তনের প্রার্থনাগীতে সুরের কাজ কীর্ত্তনগীতের অনুগত বলেই কীর্ত্তনের প্রার্থনাগীত আলাদা শ্রেণীভুক্ত হয়েছে, সংকীর্ত্তন করতে করতে নগর প্রদক্ষিণ— গান করতে করতে মিছিল করে যে কীর্ত্তন তার প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে তিনি যে এই রীতিকে একটি গণসঙ্গীতে (Community Singing) পরিণত করে গেছেন এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ।

ধর্ম্মপ্রচারের বাহন কীর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে শ্রীচৈতন্যদেব খোলেরও সৃষ্টি করেন। তখনকার প্রচলিত মৃদঙ্গ, যা উৎকর্ষ সঙ্গীতে সে সময় ব্যবহৃত হতো, তা আকারে ক্ষুদ্র। সে মৃদঙ্গ এখনও দক্ষিণীসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী কালে মৃদঙ্গ কাঠ দিয়ে তৈরী হতে থাকে যার নাম পাখোয়াজ ; সে পাখোয়াজও এখন কেবল ধ্রুপদ গানে ও বীণার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে রবাব (রুদ্রবীণা) বীণা, মুরলী প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার হতে সে সময়কার সঙ্গীতের উৎকর্ষ কতখানি হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা করিয়ে দেয়। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর কীর্ত্তনে ঐ সব যন্ত্রের বদলে কেবল খোল ও করতাল ব্যবহার করে গেছেন। খোলকে সে সময়কার উৎকর্ষ সঙ্গীতে

ব্যবহৃত মৃদঙ্গ হতে আকারে বড় করা হতো যাতে যন্ত্রটির ধ্বনি সমবেত জনসঙ্গীতের উপযোগী হয়। আর অন্যান্য বহুমূল্য যন্ত্রকে কীর্ত্তন হতে বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে মানবকণ্ঠের স্বাভাবিক শক্তির উপরই নির্ভর করা হয়; যেন উপস্থিত সকলে কীর্ত্তন গান করে। করতাল ও খোল সাধারণ পাড়াগাঁয়েও দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য নয়—সহজে সেগুলি পাওয়া সম্ভব; যাতে দরিদ্রের পক্ষেও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা কঠিন না হয় তার জন্যেই এগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করে যে গীত হয় সেগুলি অর্থাৎ লীলাকীর্ত্তন অন্তরঙ্গ ভক্তদের জন্যে আর নামকীর্ত্তন বহিরঙ্গদের জন্যে গীত হবে—শ্রীচৈতন্যদেবের এই মত বলে বৈষ্ণব ভক্তগণ বলে থাকে। লীলাকীর্ত্তনকে রসকীর্ত্তনও বলে। রস অর্থ 'আনন্দ'। কোন কিছু শ্রবণে দর্শনে চিন্তায় মনে মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয় সেটিই রস। কীর্ত্তনে এই রসকে ক্ষুদ্রভাগে ভাগ করে গীত করা হয়। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রস শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে; আর তার মধ্যে মধুর রসই অধিক আস্বাদ্য। সেজন্য সেরূপ গানের সংখ্যাই কীর্ত্তনে অধিক। কিন্তু অনেকে বাৎসল্য রস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই পছন্দ করেন, প্রেমলীলা অর্থাৎ অভিসার কলহান্তরিতা মাথুর প্রভৃতি পছন্দ করেন না। ভগবানকে প্রভু বা বন্ধু বলে মনে করা অন্য ধর্ম্মে চললেও তাকে সন্তানভাবে দেখা স্নেহ, করা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ছাড়া কোন ধর্ম্মে নেই।

খুব অনুরক্ত যুবকযুবতীর মিলন ইচ্ছা আর প্রেমিকপ্রেমিকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাসময় ভাব অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্ত্রের শৃঙ্গার রসের বিপ্রলব্ধ আর সম্ভোগ ভাগ দুটির প্রত্যেকটিকে চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিপ্রলব্ধের ভাগগুলির নাম পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস। আর সম্ভোগের ভাগগুলির নাম—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। এই প্রত্যেকটিকে আবার আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সে ভাগগুলিরও নাম আছে আর এগুলির অসংখ্য পদাবলী রয়েছে; সেগুলিই পালা আকারে সাজিয়ে গান করা হয়। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ করার যে প্রীতিইচ্ছা আর তারপরে আত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে সমাধিস্থ অবস্থা এই আধ্যাত্মিক রূপটিই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনার ভিতর দিয়ে কীর্ত্তনে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে কাব্যরস ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য নষ্ট না হয় এমনভাবে একটি প্রেমের চিত্র ফুটিয়ে তোলাই কীর্ত্তন গানের চরম সার্থকতা। সেজন্যে কীর্ত্তনীয়াদের খুব সতর্ক থাকতে হয়। কীর্ত্তনীয়া স্নেহের মধ্য দিয়ে, আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে প্রেমের মধ্য দিয়ে পরমার্থতত্ত্ব বলে। আত্মার প্রিয়তম পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভের বাধাহীন আকাঙ্ক্ষার কথা কীর্ত্তন গায়ক স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করলেই কীর্ত্তন ব্যর্থ হয়।

কথকঠাকুর বা ভাগবতবক্তা তত্ত্ব ও লীলার নিগূঢ় রহস্যময় সম্বন্ধ স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কীর্ত্তনীয়া গানটির কবিত্বই উপভোগ্য করে তোলে। গানটির মধ্যে যে কবিত্বপূর্ণ প্রেমতন্ময়তা আছে তাকে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কীর্ত্তনীয়ার নেই।

কীর্ত্তনে 'রসাভাস' বলে একটি কথা আছে। যেখানে প্রকৃত রসের অভাব অর্থাৎ রসের আভাস আছে অথচ প্রকৃত রস নেই তাকেই রসাভাস বলে। কীর্ত্তনীয়া আদিরসের গানে যদি পরকালের গানের কথা জুড়ে দেয় তবে আদিরসের বিরোধীভাব হবে এবং সেটিই হবে রসাভাস; কীর্ত্তনীয়া তার গানগুলি সাজাতে আর 'আখর' ব্যবহার করতে এবিষয়ে খুবই সতর্ক থাকে।

গানটি যেমন ভাবে রচিত ঠিক তেমনি ভাবে গান করলেই কীর্ত্তন হয় না। অন্য সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্ত্তনের মূলগত পার্থক্য এই যে অন্যান্য গানে সুরের অলঙ্কার ব্যবহার করলেও গানের কথার পরিবর্ত্তন করা চলে না, কিন্তু কীর্ত্তনে গানের অর্থ বিশদ করার জন্য, রচয়িতার অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্যে গায়ক বিভিন্ন সুর ও তালে নানা পদ নিজে যোজনা করতে পারে আর এই পদগুলিকে 'আখর' বলা হয়। অনেক সময় সুর ও তালের পরিবর্ত্তন করে পদকর্ত্তার ভাষাই হুবহু পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাকেও 'আখর'ই বলে। কীর্ত্তনীয়ার উদ্ভাবনী-শক্তি, কবিত্বশক্তি ও সুর-তালের নৈপুণ্য থাক্‌লেই কীর্ত্তন শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে বর্ত্তমানে কীর্ত্তনীয়া 'আখর' ব্যবহারের লোভ সংবরণ করতে না পেরে এমন সব কথা ব্যবহার করে যাতে রসাভাসই প্রকাশ পায়।

পদাবলীর অনুসরণে অনেকেই বাংলায় কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী, শিশির ঘোষের বলরামদাসের পদাবলী এবং আরও অনেকে পদাবলীর মত করে কবিতা লিখে গেছেন। আর সেগুলিকে কীর্ত্তনের সুর সংযোজনা করে আজকাল সুন্দর করে গীতও করা হয়। কিন্তু কীর্ত্তনীয়াদের গানে এগুলির কোন স্থান নেই। তারা পদাবলী বল্‌তে বৈষ্ণব মহাজন-রচিত পদ, যেমন জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পদ, কমলাকান্ত, দীনবন্ধু দাসের পদ ইত্যাদি অর্থাৎ যেগুলি প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে সঙ্কলিত আছে সেগুলিকেই বোঝে। কীর্ত্তন এক একটি পালা। কীর্ত্তন-গায়ক বিভিন্ন পদকর্ত্তার বিভিন্ন পদ বেছে নিয়ে পালা আকারে সাজিয়ে নেয়। এই সাজাবার মধ্যে গায়কের অনুক্রমজ্ঞান কিরূপ তা ধরা পড়ে। যাত্রার পালায় যেমন কথোপকথন রয়েছে কীর্ত্তনের পালা সেরূপ নয়। সঙ্গীতের মাধ্যমে পালার বিষয়বস্তুটি পরিবেশন করে রসকীর্ত্তন।

অনেকে বলে থাকে কীর্ত্তন ভাবপ্রধান আর সুর ও তাল তার গৌণ ব্যাপার। কিন্তু কথাটি বড় ভুল। সুর-ছন্দ-গতি না থাকলে সঙ্গীত হতে পারে না। কীর্ত্তন সঙ্গীত বলে

প্রথমেই তাতে সুর-ছন্দ-গতির দিকে লক্ষ্য করতে হবে। ভাবের দোহাই দিয়ে সুরতালের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কীর্ত্তনে সম্ভব নয়। ভাব কীর্ত্তনে রয়েছে ; ভাব যদি ভক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে অন্য সঙ্গীতেও ভাব আছে। ভাব যদি 'আবেশ' হয় তবে কীর্ত্তনে অবশ্য বিশেষ করে আছে। কিন্তু সব সঙ্গীত শুনেই বিহ্বলতা আসে। বৈঠকী গানেও আসতে পারে, মালসী গানেও আসতে পারে। কিন্তু তার জন্যে সঙ্গীতে সুর তালের প্রতি উপেক্ষা কেউ করে না। কীর্ত্তনেও তা হয় না। তবে কীর্ত্তনে কেবল সুরের আলোচনা অর্থাৎ কথা বাদ দিয়ে সুর নিয়েই গান সম্ভব নয়। কীর্ত্তনে সুরের আবেদন যথেষ্ট আছে কিন্তু কীর্ত্তন কথাকে উপেক্ষা করে না, কথার সহযোগে গানের আবেদনকে পরিপূর্ণ ও নিবিড় মর্ম্মস্পর্শী করে তুলবার চেষ্টা করা হয়। কীর্ত্তনে সুর-ছন্দ-গতির আবেদন, কাব্যের অলঙ্কার ও শব্দসুষমা আর ধর্ম্মের প্রেরণা এই তিনই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কীর্ত্তন সঙ্গীতের উদ্দেশ্যও তাই। এই তিনের সমন্বয়ের চেষ্টা পৃথিবীর আর কোন সঙ্গীতে নেই। কেবল বাংলা দেশেই তা সম্ভব হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব গানের দ্বারা মনে একগ্রতা ও প্রাণে ব্যাকুলতার সৃষ্টির, গানের দ্বারা 'আবেশ' অর্থাৎ বাহ্য সত্তা ভুলে গিয়ে ভাব সমাধিস্থ হওয়ার পদ্ধতি প্রচলন করে গিয়েছেন।

জয়দেবের সময়ে যে কীর্ত্তন সেটি পুরাপুরি মার্গসঙ্গীত ছিল। তখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। সে কাব্যের শব্দ ঝংকার ও অলঙ্কার আর সুর তালের একত্র সমাবেশে সেগুলি পালা আকারে গঠিত হয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীত তাই ছিল। কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্য সেই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সাধনা যা শ্রীচৈতন্যদেব পরবর্ত্তী কীর্ত্তনে দিয়ে গেছেন জয়দেবের সময়কার কীর্ত্তনে তা ছিল না। তখনকার কীর্ত্তন ছিল তখনকার উৎকর্ষ সঙ্গীতেরই একটি ধারা। শ্রীচৈতন্যদেব সেই উৎকর্ষ সঙ্গীতের মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা যোগ করে দিয়ে যাওয়াতে তার পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবাহে সমাজ বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের সময়কার কীর্ত্তন পরিবর্ত্তিত হয়ে পড়ে। আর তার ধারা সারা বাংলায় এমনভাবে প্লাবিত করে যে আঠার শতকের প্রথম পর্য্যন্ত বাংলায় আর কোন গানের ধারাই উন্নত ছিল না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদগুলিও শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে, বর্ত্তমানে যে ভাবে কাজে লাগানো হয় ও গীত হয়, তেমনভাবে গীত হতো কিনা এবিষয়ে সন্দেহ আছে। সেগুলি সহজ সন্তদের গানের মতই গাওয়া হতো বলে মনে হয়। তবে গানের পদগুলি প্রাচীন মার্গ সঙ্গীত অনুযায়ী লেখা। কাজেই সুররচনাও তখনকার উৎকর্ষ সঙ্গীত অনুযায়ীই ছিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের পদ রসকীর্ত্তনের পালাতে ব্যবহার করে আখর

দেওয়ার যে পদ্ধতি চলছে সেটি ছিল না। সে সময়ে তাদের গান কথকতা বা পাঁচালী পড়ার মত অথবা সহজীয়াদের গানের মত একক গাইবার রীতিতে গীত হতো মনে হয়।

কীর্ত্তন গাইবার আগে প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাইবার রীতি। গৌরচন্দ্রিকা অনেকটা প্রস্তাবনার মত। গৌরচন্দ্রিকা অর্থে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রশস্তি। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের ভাববিহ্বল অবস্থা বা লীলা অবলম্বন করে অনেক ভক্তকবি পদ রচনা করেছে। সেই পদগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকা গানের পর রাধাকৃষ্ণলীলা গান করা হয়। গৌর-চন্দ্রিকায় শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বলে কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি ভাবই আরোপিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংস্পর্শে এসে তার ভক্তগণের যে উন্মাদনা আসে তার ফলে চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচন্দ্রোদয় চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পদাবলী বলতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ও গৌরাঙ্গ এবং ভক্তদের সম্বন্ধে রচিত গানকে বুঝতে হবে।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বহু কীর্ত্তন-গায়ক নিজব্যয়ে এসে গান করে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই সময়ের গানকে 'ধূলোট' বলে। এই ধূলোট হতে কীর্ত্তনীয়াদের যশ বৈষ্ণব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ বৈষ্ণব তীর্থস্থান বাংলায় অনেক আছে—অনেক মন্দির আছে যে সব স্থানে কীর্ত্তনের অনুশীলন অল্পবিস্তর হয়। বৈষ্ণব তীর্থগুলিতে পর্ব্বের সময় কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয়। হোলির সময় হোলি গান, ঝুলনের সময় ঝুলনগান, রাসের সময় রাসলীলা প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা করতেই হয়। তাছাড়া বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষদের তিরোভাব মহোৎসবে তাদের লীলাবিষয়ক কীর্ত্তন হয়ে থাকে, সেগুলিকে 'সুচক কীর্ত্তন' বলে, 'চরিত্র কীর্ত্তন'ও বলা হয়। সূচক কীর্ত্তন স্মৃতি বন্দনারই এক মনোরম কৌশল।

কীর্ত্তনের পালাগানগুলি গাইবারও সময় নির্দ্ধারিত আছে। হোলির সময়েই হোলি গান বা রাসের সময়ই রাসগান, ঐ সময়ে কয়েকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। শরৎকালে হোলি গান করা চলবে না। তাছাড়া ছোট ছোট পালাগানগুলি, যেমন, গোষ্ঠ রাত্রিতে বা রাস সকালে করা চলবে না। কুঞ্জভঙ্গ অতি ভোরে আর রাস অধিক রাত্রিতে গাইবার রীতি। লীলার ক্রম অনুযায়ী পালাগানের ক্রম নির্দ্ধারিত হয়েছে। বৈষ্ণব সমাজে এই নিয়ম রক্ষায় খুব যত্ন দেখা যায়।

কুশীদাশ্রিত

শ্রীরমাপদ চৌধুরী

পার্কটার দক্ষিণ দিকে একসারি বড় বড় ম্যানশন দেখতে পাচ্ছো? ঐ যে কার্ণিসের কোলে কার্ণিস, ভেন্টিলেটারের ভুরুতে ভেন্টিলেটার দেয়া বাড়ীগুলো—ওরই মাঝখানে দেখো আরেকখানি ক্ষুদে অট্টালিকা। হ্যাঁ, দু'পাশের বাড়ীর বিরাটত্ব এ বাড়ীখানার মহিমা কমিয়ে দিয়েছে সত্যি। কিন্তু। বিচার করে দেখো তো, দেখো না একটু চোখ চেয়ে, একটু ভালো ক'রে, তোমাদের চোখে দু'বেলা যে সব প্রাসাদ দৃষ্টির প্রসাদ পাচ্ছে তাদের চেয়ে কি এখানি অনেক বড় নয়? নয় অনেক বেশি সুন্দর, আর সৌষ্ঠবে নয় কি সার্থক?

চিকের চিবুকে চিক দিয়ে ঘেরা বাড়ীখানা একটু রহস্যজনক, একটু অবোধ্য, নয়? তা তো বটেই। এ পাড়ায়—এ পাড়ার বুকে যেন বেমানান। অলজ্জ স্বাধিকারের জোরে এ পল্লীর মেয়েরা সোজা হয়ে চলে, শীতের রাতেও পরে হাতকাটা জ্যাকেট। অর্গ্যাণ্ডি, মলমল, আদ্ধি। জড়োয়া নয়, জড়ায় জড়ির কাজ করা হাওয়াই সাড়ী। কিম্বা পাতলা রেশমের জামদানি। হোক্ না শীতের সন্ধ্যা, থাক্ না বাতাস-বসন্ত। কি আসে যায়, সামান্য একটু রোমশিহরণের কন্টকে, কিন্তু কথালাপ আর কৃষ্টির রোমাঞ্চ তো নষ্ট হয় না। তাই। তাই এরা সাড়ীর আঁচলটা টেনে দেয় বুকের মাঝ দিয়ে, সাড়ীটা সাপটে থাকে দেহের লালিত্যে, বাঁকা আর ভাঙা দেহরেখায় লেগে থাকে বাসনার আবরণ।

এরা হাসে সশব্দে, গান গায় গলা ছেড়ে, সিনেমায় যায় পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে। রঙীন সাড়ীর আগুন ছড়ায়, এসেন্সের আমেজ ছড়ায়। স্যাম্পু করা চুল ফুরফুর করে, নীল রুমালের বাঁধন পড়ে। নেচে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায়। রেকর্ড বাজায়, রেডিও শোনে। সাদা মলমলে কি গোলাপী গালের ছায়া? না, লুকোনো দেহের পাটলবর্ণের প্রতিচ্ছবি?

কিন্তু।

কিন্তু এদের মাঝখানে ও বাড়ীখানার মুখে পড়লো কি করে চিকের চিবুকে চিক। ঘোমটার আড়ালে ওরা কারা?

যেই হোক্, ও বাড়ীর লোক মিশতে চায় না এদের সঙ্গে। সাগর আর নদীর মাঝে দূরত্বটা কম হ'তে পারে। কিন্তু মাঝখানে যদি দাঁড়ায় অভেদ্য পাহাড়—মিলবে কি ক'রে। হ্যাঁ, ওদের মাঝখানে আছে কৃষ্টির পাহাড়। ঐশ্বর্য্যের অনৈক্য না থাকতে পারে, আছে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য।

ঐ সাদা বাড়ীটার অর্দ্ধেকটা জ্যোতিষবাবুর দখলে। বাকী আর্দ্ধেক বাড়ীআলার।

কোলকাতায় প্রথম যখন বদলি হয়ে এলেন, জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেননি পাড়াটার গুণগরিমা। ইদানীং টের পাচ্ছেন, আর মনে মনে চটে উঠছেন। কড়া হুকুম দিয়েছেন, পর্দ্দা সরাবে না, চিক তুলবে না।

ষাট টাকায় ঢুকেছিলেন চাকরীতে, আজ জ্যোতিষবাবু পাচ্ছেন পনেরো শ'। সময় এবং স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন, ছ'আনা দামের টাই ছেড়ে টুটাল ধরেছেন বহুদিন। বড়ছেলেকে ঢুকিয়েছিলেন মফঃস্বলের কলেজে, ছোটকে পড়িয়েছেন প্রেসিডেন্সীতে। কিন্তু, মেয়েদের এতটুকু উড়তে দেন নি।

ছেলেদের নাম বদলেছে উন্নতির ধাপে ধাপে। বড়র নাম লক্ষ্মীনাথ, মেজোছেলে অতুল, ছোট সূর্য্যেন্দু। মেয়েদের নামও মার্জ্জিত হয়েছে। বড় রাধারাণী, মেজো নির্ম্মলা, সেজোমেয়ের নাম নমিতা আর সমিতা হ'ল ছোট।

বড় আর মেজোমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক আগে। নমিতারও বিয়ে দেবার সময় হয়ে এলো।

কিন্তু। জ্যোতিষবাবু ভাবছেন অন্য কথা। তাঁরও যে সময় হয়ে এলো। আর মাত্র পাঁচ বছর বাকী। তারপরই রুটিনবাঁধা জীবনে যতি পড়বে। থেমে যাবে তাঁর দৈনন্দিন কর্ম্মব্যস্ততা। শীতের সকালে স্নান করতে হবে না, নটার সময় সারতে হবে না অনিচ্ছুক আহার।

চাকরী থেকে আর পাঁচ বছর পরেই অবসর নেবেন জ্যোতিষবাবু।

তারপর ?

সেই কথাই ভাবছিলেন জ্যোতিষবাবু।

সারাটা জীবন ভাড়াটে বাসায় কাটিয়ে এসেছেন। আজ কলকাতা, কাল রংপুর তারপর রাজসাহী নয়তো মালদহ। বিক্রমপুরে কাটিয়েছেন ছ'বছর ; বাঁকুড়োতেও নেহাৎ কম দিন নয়।

জ্যোতিষবাবুর জন্মস্থান কিন্তু বর্দ্ধমানে। কাটোয়া লাইনের মাঝামাঝি কোথায় যেন। বৃদ্ধ হয়ে আসছেন, বয়স বাড়ছে। জনারণ্যের জঞ্জাল তাই আর সহ্য হয় না।

জ্যোতিষবাবু ঠিক্ করেছেন, আর ভাড়াটে বাড়ীতে নয়। এবার একটা নিজস্ব বাড়ী চাই। নিজের বাড়ী। যেখানে উত্তরাবসরের দিনগুলি আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। সহর নয়, গ্রাম। ধোঁয়া আর ধাঙড়ের দেশে নয়, ধ্যান আর ধানের দেশে। দেশের ভিজে মাটি তাঁর মন টানছে।

ছোটবেলাটা কাটিয়েছিলেন গ্রামের বিশ্রামে। সব মানুষই তো ফেলে আসা শৈশবের

রোমাঞ্চ রোমন্থন করে জীবনের শেষদিন অবধি। কৈশোরের দিনগুলি তাঁর চোখে রমণীয় বলেই কৈশোরের মাটিটাও এত মধুর মনে হয় তাঁর। সে কথা জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা, সোনার গ্রামের সোনার ধানের সুগন্ধ আঘ্রাণ আজো বুঝি তেমনি মিঠে আর মনোহর।

বড় ছেলে পল্লীর ওপর বীতশ্রদ্ধ। সে বাধা দেয় যুক্তির সংযুক্তিতে।

বলে, পাড়াগাঁয়ের মত অপরিচ্ছন্ন জায়গায় বাস করে না কেউ। উপায় যার নেই, সে থাকুক গ্রামে, কিন্তু সখ করে টাকা নষ্ট করার মত জায়গা নয় পাড়াগাঁ।

জ্যোতিষবাবুর অনেক সুমধুর স্বপ্নে বোনা গ্রাম। যুক্তি কি বিশ্বাসকে টলাতে পারে।

জ্যোতিষবাবু বলেন, নালাটালাগুলো স্রেফ বাঁধিয়ে দোব সিমেণ্ট দিয়ে। কাঁকরের ওপর দিয়ে কন্‌ক্রিটের একটা পুল করে দোব, গাড়ী যাবে একেবারে বাড়ীর দরজায়।

—পুকুর আর পানা ?

—সে খরচও নয় আমিই দোব। রোজগার করেছি, খরচ করবো।

স্ত্রী দনুজদলনী বলেন, টাকাগুলো ঐ করেই ওড়াবে আর কি।

জ্যোতিষবাবু সে-কথায় কর্ণপাত করেন না।

মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর আছে, দীঘিও হয়তো বলা চলে। নাম, ঊর্দ্ধবাস। নাম-সার্থক-করা পুকুরই বটে। চারপাশের জমি থেকে পুকুরের পাড়গুলো অনেক উঁচু। জ্যোতিষবাবু ঠিক করেছেন, ঊর্দ্ধবাসেরই উত্তর পাড়ে বেশ বাংলো টাইপের একখানা বাড়ী করবেন।

এর আগেও বহুবার আঁকজোক কেটেছেন তিনি।

এখনো সে প্ল্যান শেষ হয়নি। দিনের পর দিন কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঘরের ছক কাটতে সুরু করেন। কোনদিকে কপাট হবে, ক'টা জানালা। রান্নাঘর দূরে হবে না, বাড়ীর মধ্যে।

বাধা এলো হঠাৎ সেজমেয়ের কাছ থেকে।

জ্যোতিষবাবুর আঁকা প্ল্যান দেখেই ভুরু কুঁচকে গেল নমিতার। বললে, তার চেয়ে রামপুরের ডাঙায় একটা তাঁবু খাঁটিয়ে থাকলেই হয়।

অর্থাৎ বাড়ীর প্ল্যানে খরচের দিকটা একটু সংক্ষেপ করেছিলেন জ্যোতিষবাবু। দু'খানি ঘর, রান্নাঘর। ব্যস্, এক ইঁটের দেয়াল।

তাঁর আর দোষ কি ? খরচ বাড়াও তো ছেলেরা চটে। খরচ কমাও তো মেয়েরা চটে। শেষে মাঝামাঝি একটা সুরাহা হ'ল। দোতলা হবে, ওপরের দু'খানি ঘর।

স্ত্রী দনুজদলনী এদিকে বেঁকে বসলেন।

কোলকাতায় চার বছর ধরে থেকে, ইতিমধ্যেই শহরটার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে।

আরো পাঁচবছর ধরে সে মায়াকে ঘনীভূত করার পর কি গ্রামে যেতে ইচ্ছে হবে তাঁর!

জ্যোতিষবাবুর মতে কোলকাতা একটা জঘন্য জায়গা। ভদ্রলোকে বাস করে না এখানে। কথাটা বলেই ঘৃণায় নাক কুঁচকে চিকের ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়ীর দিকে তাকালেন তিনি।

ছেলেরা বললে, গ্রামেও বাস করা যায় না, দূর থেকে মনে হয় কতই ভালো।

জ্যোতিষবাবু চটে উঠলেন।—এক ছটাক খাঁটি দুধ খেতে পাও এখানে? টাটকা মাছ পাও? শাককজি পাও ইচ্ছা মত? গ্রামে তোমার গোয়ালে গরু, কত দুধ চাই খাও না। পালঙ শাক নিজের হাতে কেটে আনবো, পুকুর থেকে তুলবো কলমি। জাল ফেললেই মাছ।

—কিন্তু ম্যালেরিয়া?

—টিবি, কলেরা, পক্স নেই এখানে? বছরে বছরে টীকে নিচ্ছো না?

—অপরিষ্কার জল।

—তা ত হবেই, সিওয়ারের পাশ দিয়ে জলের পাইপ যায়নি যে সেখানে। খানিক থেমে বললেন, আর তাছাড়া টিউবওয়েল তো করবই।

না। কোন কিছুতেই হার মানবেন না জ্যোতিষবাবু।

শেষে, শেষবাণ ছুঁড়লো সেজমেয়ে।—গ্রামে বাস করবে? তার চেয়ে 'পল্লীসমাজ' বইটা পড়ে দেখো। কেবল ঝগড়া, মারামারি, মামলা, মকর্দ্দমা।

অতএব উর্দ্ধবাস বাতিল।

স্রোত আর সময় কারো মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে না।

বাড়ী তৈয়ারী জল্পনা কল্পনা চলে, বছরও কেটে আসে। ইতিমধ্যে, সেজমেয়ের বিয়ে হয়েছে, রাঁচীর কাছে এক ছোট্ট ষ্টেশনে আছে সে। স্বামীর চাকুরীস্থলে। বড় ছেলেরও বিয়ে দিয়েছেন মাসখানেক আগে।

বড় ছেলে লক্ষ্মীনাথ ঠিক্ করেছে ওকালতি করবে সে। কোলকাতায় নয়, এখানে পাত্তা পাওয়া দুষ্কর। বর্দ্ধমানে।

ছোট ছেলে এম এ পাশ করে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, চাকরী করবে না সে। ছোটবেলা থেকে সাহিত্যবাতিকটাই ওর মাথা খেয়েছে, জ্যোতিষবাবু জানেন। বড় মেয়ে বাবার

আগে সাবধান করে দিয়ে গেছে। সূর্য্যেন্দুর নাকি কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে। তাকেই বিয়ে করবে বলে গোঁ ধরেছে।

সূর্য্যেন্দু এ-সবের সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

ও শুধু বুঝেছে কিছুদিনের মধ্যে ও ত্যজ্যপুত্র হবেই, এবং তা নাও যদি হয় তো জ্যোতিষবাবুকেই হতে হবে ত্যজ্যপিতা। আসলে সংসারের কোন মানুষটার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না সে। ওর মনের কেন্দ্রে একক আধিপত্য হ'ল স্বয়ং ওরই, স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঁচতে চায় ও।

তাই।

তাই, জ্যোতিষবাবু যখন সূর্য্যেন্দুর অভিমত চাইলেন, সূর্য্যেন্দু সরল উত্তর দিলো না।

জ্যোতিষবাবু বললেন, আর তো চার বছর বাকী, একটা বাড়ীটাড়ী করতে হয় এবার। বর্দ্ধমানেই যদি করি তো কেমন হয়?

—মন্দ কি। এর বেশী উত্তর দিলো না সূর্য্যেন্দু।

একটু আহত বোধ করলেন জ্যোতিষবাবু।

স্ত্রী দনুজদলনীকেই ডাকলেন।—শুনছো, বর্দ্ধমানেই নয় পাঁচ কাঠা জায়গা কিনি?

—বর্দ্ধমান? আকাশ থেকে পড়লেন দনুজদলনী।

সত্যি। বছর দশেক আগে একবার সহরটা দেখে এসেছেন তিনি। বিশ্রী জায়গা। সহর না হাতী।

জ্যোতিষবাবু বোঝাবার চেষ্টা করলেন, আরে না না, সত্যেন, আমাদের আপিসের সত্যেন বলছিলো আজকাল নাকি উন্নতি হয়েছে সহরটার।

দনুজদলনী বীতরাগ হয়ে ওঠেন।—উন্নতি না কাঁকুড়। বছরে দুবার করে বাণে ভাসতে পারবো না আমি। তার চেয়ে নিগণের জলার মাঠে হোগলার ছাউনী করে থাকলেই হয়।

—দামোদরে তো বাঁধ দেয়া হচ্ছে।

—তুমি যেমন মানুষ, সে-কথা আর বিশ্বাস করবে না। মনে নেই, সেদিন হাবুমামা কি বলে গেল? কনট্রাক্টরি নিয়ে কি করে টাকা করছে ওরা? দামোদরের বাঁধতো ওরাই দিচ্ছে, কংক্রিট দিয়ে ভরাট করার কথা, করছে বালি দিয়ে।

জ্যোতিষবাবু বলেন, তোমার হাবুমামা তো। মামাশ্বশুর হ'ন তাই কিছু বলিনা। যা খুশী যেন করলেই হ'ল, ইন্‌স্পেক্টর নেই, দেখছে না তারা?

—ঘুষ বলে একটা জিনিষ আছে।

জ্যোতিষবাবু প্রেসিমেকাসের মত নিরুত্তর হয়ে গেলেন। কথা পালটিয়ে বললেন,

কিন্তু সেখানেও তো মানুষ রয়েছে, আর লক্ষ্মী তো বলছে বর্দ্ধমানেই ওকালতি করবে। বৌমাকে নিয়ে গিয়ে সংসার তো পাতবেই, তবে আর ভাড়া গুণতে যাবে কেন? নিজের বাড়ী থাকলে—

লক্ষ্মীনাথ কাছেই কোথায় ছিল।

সে বলে বসলে, রোজগার যদি করতে পারি তো তিরিশ চল্লিশ টাকা ভাড়া দিতে গায়ে লাগবে না। আর, প্রাকটিস না জমলে তো চাকরীই করতে হবে, তখন কোথায় থাকবো তার ঠিক কি।

অর্থাৎ, বিয়ের পরই নিরিবিলিতে নববধূকে নিয়ে সংসারের স্বপ্ন কে না দেখে। কে টানতে চায় পিতামাতার যত্নের যন্ত্রণা।

জ্যোতিষবাবু তবু বলেন, কিন্তু বাড়ী তো আমাকে করতেই হবে কোথাও না কোথাও।

সমিতা ছোট মেয়ে। জ্যোতিষবাবুর উন্নতির শেষ শিখরে ওর জন্ম। তাই, ইস্কুলে যেতে পায় ও একা। চিকে চোখ রাখতে পায়। মিশতে পায় সতীর্থাদের সঙ্গে। ও যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের সকলেরই নিজস্ব বাড়ী আছে, অতএব সেদিক থেকে সমিতার মনের একটা কোণে কিছুটা দুর্ব্বলতাও আছে।

ও বললে, বাড়ী যদি করতেই হয়তো কোলকাতায়। খরচ তো একই, যা জমির দামটা একটু বেশি।

দনুজদলনী বললেন, তা সমু সত্যি কথাই বলেছে বাপু।

—পাঁচ সাত হাজারও তো কম লাগে বর্দ্ধমানে করলে। জ্যোতিষবাবু বলেন।

মেজোছেলে অতুল বললে, কিন্তু রিটার্ণ তো পাবেন অনেক বেশী। আধখানা ভাড়া দিলে মাস গেলে দেড়শো টাকা ভাড়া পাবেন।

—বাড়ী কি ভাড়া দেব নাকি?

সে যাই হোক, বর্দ্ধমানে হতে পারে না।

নির্ঝর নিস্তব্ধ হবে না তোমাকে নিরীক্ষণ করে। নোঙর ফেলবে না সময়।

জ্যোতিষবাবুর চিন্তা চাপা পড়ে যায় সংসার সংগঠনের নীচে।

হঠাৎ একদিন হৈ চৈ। মেজছেলে অতুল কি যেন করে বসেছিল। জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বয়সটা খারাপ, সময় থাকতে বিয়ে দিলে শুধরে যেতে পারে। তা না হলে, আবার কবে কি করে বসবে। পাড়াটাও খারাপ, লজ্জা তো নেই, হয়তো থানা পুলিশ অবধি করতে পারে।

হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে।

মেজবৌমা দেখতে সুবিধের নয়। একটু সুন্দর দেখে বৌ আনলেই হ'ত। লক্ষ্মীর বেলায় তো টাকার লোভ ছিলো না, অতুলের বেলাও লোভটা সংবরণ করলে ভালো হত।

হয়তো বাপের ওপর চটে গেছে। বৌমাকেও তো চিঠিপত্তর দেয় বলে মনে হয় না। নাগপুরে কি একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে। চিঠি লিখলেও উত্তর দেয় না।

জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে সুখের স্বপ্ন বুনতেন জ্যোতিষবাবু। কিন্তু আজ দেখছেন সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসছে আনন্দ ততই যেন উবে যাচ্ছে। শেষের দিনগুলির জন্য হয়তো অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে।

না, আর মাত্র তিনবছর বাকী। স্থায়ী আসনের ব্যবস্থা করতে হবে সময় থাকতে। ছেলেরা কেউ এক বেলাও হাসিমুখে ভাত দেবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

বাড়ী চাই। একটা বাড়ী করতে হবে।

গীতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ কেন জানি বারাণসীর দিকে মন চলে গেল। স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

স্ত্রী দনুজদলনী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন। কি বলো।

—বলছিলাম কি, যে আর তো বছর তিনেক মোটে বাকী। তা একটা বাড়ীর ব্যবস্থা তো দেখতে হয়।

—তোমার ঐ ভাবা পর্য্যন্তই, বাড়ী আর হবে না কোনদিন।

—হবে না কেন, করলেই হয়।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন জ্যোতিষবাবু। তারপর বললেন, তা দেখো, বুড়ো বয়সে কি আর কোলকাতা টোলকাতা ভালো লাগে। বলছিলাম শেষ দিন কটা কাশীবাস করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। ধরো কাশীতেই যদি একটা বাড়ী করি ?

দনুজদলনী উল্লসিত হয়ে উঠলেন।—সে তো ভালোই, তাই করো।

—ধরো গঙ্গার ধারেই ছোট্ট দেখে একখানা বাড়ী, দু'বেলা গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথের মন্দির। কাশীতে শাকসব্জী কত সস্তা। এক একটা বেগুন আধ সের, এক আনা কি ছ'পয়সা সের। মটরশুঁটি, কপি, তারপর তোমার রাবড়ি, প্যাঁড়া।

উদরোন্মুখ জ্যোতিষবাবুর কথায় দনুজদলনী না হেসে থাকতে পারেন না। বুড়ো বয়সেও খাওয়ার চিন্তা।

তবু গম্ভীর ভাবেই বললেন, না সে ভালোই, কাশীতেই হোক।

কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন জ্যোতিষবাবু। আচ্ছা, কাশীতে জমির দাম কত করে ? আন্দাজ ? আন্দাজ কি এতদূর থেকে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, নৃপেনবাবুর খুড়শ্বশুর

থাকেন কাশীতে, তাঁকে চিঠি লিখে জানতে হবে। নৃপেনবাবুকে বলতে হবে একখানা চিঠি লিখতে।

বাড়ীখানা অবশ্য একটু বড় দেখেই করতে হবে। দেশ থেকে, এখান থেকে যারা যাবে তাদের তো আর ধর্ম্মশালায় উঠতে দেয়া যায় না! ছেলেমেয়েরাও তো যাবে মাঝেসাঝে।

দোতলা তো নিশ্চয়। ওপরে খান পাঁচেক ঘর, নীচে খান পাঁচেক। রান্নাঘর, ভাঁড়ার, পায়খানা আর চৌবাচ্চা—ওপরেও হবে, নীচেও হবে।

রাস্তার ওপর। কিম্বা গঙ্গার ধারে জমি নিতে হবে। মন্দির থেকে বেশি দূর হলে চলবে না। অবশ্য, তাতেও কিছু এসে যায় না, এক পয়সা মাইলে এক্কা ছুটবে—শেয়ারে।

সাঁচীর দিকে হলে দোষ কি? আর নয়তো রামনগর কি চুণার? না, সে তা হলে আর কাশীবাস হল না।

কাগজের ওপর ছক কাটতে সুরু করেন জ্যোতিষবাবু। কোথায় কোন ঘর হবে, কোন দিকে দরজা আর কোনদিকে জানালা।

সব প্রায় সমাধা করে এসেছেন। নৃপেনবাবুকে দিয়ে চিঠিও লিখিয়েছেন, এখন কেবল উত্তরের অপেক্ষায়।

বাইরের দেয়ালগুলো পয়েন্টিং না প্লাষ্টার, কি করবেন? ভেতরের দেয়াল বাফ্ রঙে ডিসটেম্পার করিয়ে নেবেন। আরো কত কি কল্পনা করছিলেন।

সব ভেঙে গেল হঠাৎ।

নৃপেনবাবুর খুড়শ্বশুরের চিঠিতে।

কাশীধাম নাকি বদলে গেছে। কাশী আর সে কাশী নেই।

ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

তা'ছাড়া।

তাছাড়া বেরিবেরি থেকে সুরু করে পঞ্চাশ রকম রোগ। জমিও ভালো পাওয়া যায় না। যা আছে তা সহরের বাইরে।

অতএব, কাশী বাতিল।

বোশেখ থেকে বোশেখ। আরেকটা বছর কেটে গেল।

এই একটা বছরে অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন জ্যোতিষবাবু। অম্বলের রোগ ধরেছে। বার্লি খেয়ে অপিস করেন।

বড় ছেলে বর্দ্ধমানে প্রাকটিস জমিয়েছে, মাঝে মাঝে চিঠিপত্তর দিয়ে খোঁজ খবর নেয়

মেজছেলে অতুল পুজোর সময় একবার বাড়ী এসেছিল। তারপর থেকে আর কোন চিঠি দেয়নি।

সূর্য্যেন্দুর সঙ্গে ভাব হওয়া মেয়েটি এসেছিল একদিন। সূর্য্যেন্দুই নিয়ে এসেছিল। মেয়েটি দেখতে অদ্ভুত সুন্দরী—সে কথা জ্যোতিষবাবু একশোবার বলবেন, কিন্তু স্বজাতি তো নয়। সূর্য্যেন্দু বলে, এ যুগের জাত হল টাকায়, আর মঞ্জুশ্রী সেদিক থেকে অনেক উঁচু জাতের। ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে সে।

কিন্তু সূর্য্যেন্দুর ব্যবহারটা তাঁর ভালো লাগে না। কেমন যেন নির্লজ্জ।

মঞ্জুশ্রী যখন ওঁকে প্রণাম করলো, মেয়েটিকে চিনতে না পেরে বিস্মিত হয়েছিলেন জ্যোতিষবাবু। কিন্তু আরো বিস্মিত হলেন সূর্য্যের কথায়।

মঞ্জুশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বাবা। তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে, মঞ্জুশ্রী সেন। আপনার ভাবী বৌমা। কথাটা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই বলেছিল সূর্য্য, কিন্তু জ্যোতিষবাবুর চোখে ব্যাপারটা কেমন এক ঘৃণ্য রূপ ধরে।

মেয়েটির ব্যবহার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে তাঁর। কলেজে পড়া মেয়েদের মধ্যেও যে এতখানি শীলতা থাকে জ্যোতিষবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি এর আগে। মঞ্জুশ্রী বেশ ভালো মেয়ে, পুত্রবধু হবার উপযুক্ত তো বটেই, বরং বলা চলে সূর্য্যেন্দুই ওর যোগ্য নয়।

কিন্তু।

না, বিয়ে দিতে তিনি পারবেন না। এতদিনের সংস্কার, কৌলীন্য, সুনাম, বংশগৌরব সব নষ্ট করতে পারবেন না। মঞ্জুশ্রী যদি স্বজাতি হ'ত।

আহারের পর গ্লাসে জোয়ানের আরক ঢালতে ঢালতে ভাবেন। ভাবেন, সূর্য্যেন্দুকে এখনো হয়তো ফেরাবার উপায় আছে।

মাসখানেকের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাবেন ঠিক করছেন। সূর্য্যেন্দুকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেতে কি চাইবে? ওকে বোঝাতে হবে ওর সাহিত্যচর্চ্চা একেবারে হচ্ছে না, বাইরে গেলে কিছু হতে পারে।

আসলে, সূর্য্যেন্দুকে অত্যন্ত ভালবাসেন জ্যোতিষবাবু। একটু দুর্ব্বলতা, তাই কিছু বলতে পারেন না।

সূর্য্যেন্দু না বললে না।

তাঁর সঙ্গে মধুপুরে সেও গেল।

কেন জানি মধুপুর জায়গাটা জ্যোতিষবাবুর খুব ভালো লেগে গেল। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, আর মাত্র দু'বছর বাকী। চাকরী থেকে অবসর নিতে আর মাত্র দু'বছর।

বাড়ী একটা বানাতেই হবে। অতএব, মধুপুরই বা নয় কেন।

দু'বেলা ভ্রমণের ফাঁকে জমি খুঁজে বেড়ান জ্যোতিষবাবু।

বাড়ীতে কাউকে কিছু বলবেন না। এর আগে তিন তিনবার বলে ঠকেছেন। একটা না একটা বাধা ওরা দেবেই। বিশেষ কেউ অবশ্য সঙ্গে আসেনি। ভয় স্ত্রী দনুজদলনীকে, আর ছোটমেয়ে সমুকে। সূর্য্যেন্দু তো নির্ব্বিকার!

তবু বলবেন না কাউকে।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে জমি খোঁজেন জ্যোতিষবাবু। পছন্দমত জমি পেলেই দরদস্তুর করে আসেন।

শেষে পছন্দসই একটা জমির খোঁজ পেলেন জ্যোতিষবাবু। দামও বেশি নয়।

কিন্তু। জমিটা কেনবার আগে প্ল্যান একটা এঁকে ফেলতে হবে। কাগজকলম নিয়ে বসে পড়েন। আঁকজোক কাটেন। ঘরের সংখ্যা, বারান্দার দৈর্ঘ্য।

সব শেষ করে কথাটা খুলে বললেন দনুজদলনীকে।

—জমি তো ঠিক্ করেছি এই মধুপুরেই।

—তা বেশ তো।

—এই দেখো বাড়ীর প্ল্যান।

—ও ছাই বুঝি না, বলো দোতলা না একতলা, কখানা ঘর?

—করি তো দোতলাই করবো।

—তা করো না এখানেই, মন্দ কি। জমিটা কোথায়?

কিন্তু জমিটা কোথায় তা আর বলতে হ'ল না। তার আগেই সমিতা বেণী দুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, ম্যাগো। মধুপুরে আবার মানুষ বাস করে সখ করে? এখানে সবাই চেঞ্জেই আসে জানি।

—তা আমারো তো চেঞ্জ দরকার।

সমিতা বললে, জানতাম না তাই আসতে দিয়েছি তোমাকে। বিকেলে বেড়াতে যাই, দু'পাশে শুধু খুক্ খুক্ কাশি। অম্বল সারাতে এসে শেষে একটা বড় রোগ ধরুক আর কি।

সূর্য্যেন্দু বেশি কথা বলে না। বললে, সামনের বাড়ীর গাড়ীবারান্দার কাছে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের একটা ভাঙা য়্যাম্পিউল দেখছিলাম কাল।

অতএব, মধুপুর হতে পারে না।

মধুপুরে আর থাকাও চলতে পারে না।

আশ্চর্য্য!

চার বছর ধরে হাওয়ায় হাট বসাবার কল্পনা করে এসেছেন, অথচ কাজ এগোয়নি এতটুকু। কেবল জল্পনা কল্পনা, কেবল জরীপ আর নক্সা, কাঠ আর কংক্রিটের স্বপ্ন।

বুড়ো হয়ে আসছেন। আসছেন? এর মধ্যেই তো পাক ধরেছে চুলে। দু'দিন পরেই চাকরী থেকে অবসর নেবেন। তারপর?

তারপর।

আয় কমবে। মাসে দু'শো টাকা ভাড়া গুণতে পারবেন আর? কোথায় যাবেন তখন, কে দেবে বিনামূল্যের বসতি। স্থায়ী সুখ আর অফুরন্ত অবসর পেতে হলে নিজের বাড়ী চাই। নিজস্ব বাড়ী। যেখানে জলের পাম্প নিয়ে দু'বেলা ঝগড়া করতে হবে না বাড়ীআলার সঙ্গে। যেখানে, 'ভাড়াটে' অপবাদ সইতে হবে না। যেখানে থাকবে শান্তি আর শৃঙ্খলা।

না, কোলকাতাতেই একটা বাড়ী বানাবেন।

বাড়ীআলার সঙ্গে ইদানীং প্রায়ই তাঁর মনোমালিন্য ঘটছে। তাকে দেখাতে হবে যে তিনিও পারেন শহর কোলকতার বুকে একখানা বিরাট বাড়ী হাঁকাতে। সে সঙ্গতি তাঁর আছে। আছে তো সত্যিই। চাকরী করে অর্থশালী হওয়া যায় না—এ প্রবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন জ্যোতিষবাবু। চাকরীও করেছেন, অর্থশালীও হয়েছেন। ঘুষ না নিয়েও। পনোরো বছর ধরে দেড় হাজারের ম্যাক্সিমামে পড়ে আছেন। ওঁদের চাকরীতে পেনশন যেমন নেই, তেমনি গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটাও তো কম, দেবে না! প্রথমে তিন বছর ষাট টাকায় হাজার। হিসেব করেন জ্যোতিষবাবু, মনে মনে। ওদিকে গড়ে পাঁচশো ক'রে বছরে জমেছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে, অতএব রেল থেকে আরো পাঁচশো—বছরে হাজার, পনেরো বছরে পনেরো হাজার। এদিকে বছরে দেড়হাজার, রেল থেকে আরো দেড় হাজার—বছরে তিন হাজার। পনেরো বছরে হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডই হ'ল ষাট হাজার। গ্র্যাচুইটি। তিরিশ বছর চাকরী, অর্থাৎ তিরিশ মাসের রিটায়ারিং পে। সেও তো প্রায় পঁয়তাল্লিশ—ওঃ না, ম্যাক্সিমাম দশ হাজার। যাই হোক্, সত্তর হাজার টাকা তো এইখানেই, ইন্‌সিওরেন্স আছে পঁচিশহাজার টাকার। পাঁচ হাজার হোল্ লাইফ, কুড়ি হাজার ম্যাচিওর করবে বছর খানেক পরেই। অতএব। এত কি গরব দেখায় বাড়ীআলা। না হয় বাড়ীই করেছে একখানা, জ্যোতিষবাবু ইচ্ছে করলে এর চেয়ে অনেক ভালো বাড়ী করতে পারেন।

ইচ্ছে করলে কেন, বাড়ী তো করবেনই। এই শহর কোলকাতার বুকেই বাড়ী তৈরী করবেন।

এবার আর নিজের প্ল্যান নয়। রীতিমত আর্কিটেক্ট ডাকিয়ে উপদেশ চাইলেন।

কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে চলতে লাগলো ফোনালাপ। ঘোরাফেরা করতে লাগলো ব্লু প্রিন্টের রাশি।

কিন্তু।

কোনটাই জ্যোতিষবাবুর মনঃপুত হয় না।

এমন সময় দনুজদলনী মনে পড়িয়ে দিলেন ছোটমেয়ে সমিতার বিয়ে দিতে হবে। ষোলয় পা দিয়েছে সে। শুধু কি তাই? রাতে আলো জ্বলে কেন তার ঘরে। নীল কাগজের চিঠির প্যাড কিনেছে কেন সমু। ডাকলে শুনতে পায় না কেন, কথা বললে উত্তর দেয় না কেন?

সমিতার ভাবনা জ্যোতিষবাবুকে বিচলিত করে নি।

হঠাৎ একটা ধাকা খেলেন তিনি সূর্য্যেন্দুর কাছ থেকে।

"ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হয়েও যে সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে আসতে পারে, তোমাদের সম্মতির আশায় অপেক্ষা করে করে তো তার জীবনটা নষ্ট করতে পারি না। তাই, তোমাদের কাছ থেকে সরে এলাম। আশা রাখবো জীবনের শেষ দিন অবধি, যে তোমরা একদিন না একদিন ক্ষমা করবার সুযোগ পাবে।

"মঞ্জু হয়তো তোমাকে আর মাকে একদিন প্রণাম করতে যাবে। একাই। আমার ওপর তোমাদের যত ক্রোধ তা যেন সে বেচারীর ওপর না পড়ে।

"মা ও তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি

সূর্য্যেন্দু"

এদিকে মেয়ের বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছেন দনুজদলনী।

কথায় কথায় বলেন, তখনই বলেছিলাম, পাশ করেছে এবার বিয়ে দিয়ে দাও। তা না, তখন হ'ল রোজগার করুক। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সূর্য্যেন্দু—

কথা শেষ হয় না, দনুজদলনীর চোখের কোনে জল দুলতে থাকে।

জ্যোতিষবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, সমুর বিয়ে তো, তা ব্যবস্থা করছি, ব্যবস্থা করছি। ঐ তো আসানসোলের সেই ছেলেটির খোঁজ নিতে লিখেছি নির্ম্মলাকে।

এইভাবে সূর্য্যেন্দুর জন্য শোক আর সমিতার জন্য স্বামীর ভাবনা ভাবতে ভাবতে কোথা দিয়ে যে একটা বছর কেটে গেল টের পেলেন না জ্যোতিষবাবু। হঠাৎ একদিন দেখলেন—দেখলেন কেন, আবিষ্কার করলেন, যে তিনি বেকার।

ছোটবেলায় পড়াশুনো শেষ করে একবার বেকার হয়েছিলেন, আজ কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে জ্যোতিষবাবু আবার বেকার হয়ে পড়লেন।

চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী নটায় স্নান সেরে, ভাতের জন্য তাড়া দিলেন।

দনুজদলনীর খেয়াল ছিলো না। আপিসের পোষাক পরে মা কালীর ছবিটাকে প্রণাম করে জ্যোতিষবাবু বেরুতে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর নিজেরই মনে পড়ে গেল যে, গতকাল সব র্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি।

তবু।

তবু আপিসে বেরিয়ে গেলেন। লজ্জায় ভাঙতে পারলেন না কথাটা, স্ত্রীর কাছে। যাক্, সকলের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে আসা যাক্। ফিরে এসেই আবার বাড়ী তৈরীর চিন্তায় ডুবে গেলেন জ্যোতিষবাবু। অনেক ভাবলেন। ভেবে ঠিক করলেন, না বাড়ী তৈরী করে কাজ নেই।

—সে কি! বাড়ী না করলে, থাকবে কোথায়? দনুজদলনী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

জ্যোতিষবাবু থেমে থেমে বললেন, একটা বাড়ী তৈরী করতে যাওয়া, মানে পঁচিশ তিরিশ হাজার কম করে। তার চেয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে হাজার আট দশ বসে বসে পাওয়া যাবে বছরের শেষে। পেনশন তো নেই, চালাবো কিসে? তার চেয়ে সুদের টাকায় বেশ বেড়ানো যাবে, আজ গয়া, কাল বৃন্দাবন। পুরীটাও যাওয়া হয়নি বহুদিন।

দনুজদলনীও ভেবেচিন্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা ঠিক।

এরপরও দুটো বছর কেটে গেছে।

বাড়ী তৈরীর কল্পনা নিয়ে আর কোনদিন বিভোর হয়ে ওঠেননি জ্যোতিষবাবু। দিব্যি সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। সমিতার বিয়েও দিয়েছেন সুপাত্রে। ভাড়াটে বাড়ীতেই থাকেন, মাঝে মাঝে ঘুরে আসেন তীর্থে তীর্থে। বড় ছেলে আর মেজো ছেলের কাছেও যান কখনো কখনো।

সূর্য্যেন্দু প্রায় ত্যজ্যপুত্র। মঞ্জুশ্রী মেয়েটি খুব ভালোই, কিন্তু স্বজাতি তো নয়। মাঝে মাঝে সূর্য্যেন্দুর জন্যেই একটু ব্যথা পান। তা না হলে জ্যোতিষবাবুকে সুখীই বলা চলতো।

সর্বজনীন উত্তমপুরুষ

পুলকেশ দে সরকার

এবার থিয়োরী—

সর্বজনীন উত্তমপুরুষকে যখন আবিষ্কার করা গেল, তখন এর নীতিও একটা চাই। কোত্থেকে কিভাবে এই উত্তমপুরুষের উদ্ভব হয় নীতিবিদ্‌দের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। সুতরাং তাঁদের এই জ্ঞানপিপাসা মেটানোও সর্বজনীন উত্তমপুরুষের একটা কর্তব্য।

জ্ঞানপিপাসায় যাঁর কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে এবং যিনি জ্ঞানসিঞ্চনের জন্য ঝারি নিয়ে ফিরছেন তাঁদের দু'জনের মধ্যেও ঐ উত্তমপুরুষ সর্বজনীন হয়ে আছেন।

কথা হচ্ছে, এমন সর্বগ্রাসী সর্বজনীনতা লক্ষ্য করে একেশ্বরবাদীরা এর উৎপত্তি একটাই স্থির করে ফেলতে পারেন। বলতে পারেন, উত্তমপুরুষের এই সর্বজনীনতার কারণ, একই উৎস থেকে সমস্ত উত্তমপুরুষের জন্ম। এই বিচিত্র বিশ্বসংসারে সেই উৎসেরই বিভিন্ন বিকাশ, আসলে তিনি এক।

আরও মারাত্মক প্রস্তাব হতে পারে যে, ইনি চিরন্তন, সনাতন ও শাশ্বত। নারায়ণের যোগনিদ্রা-ভঙ্গের দিন থেকে আজও সেই একধারা চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। অর্থাৎ উত্তমপুরুষ কেবল সর্বজনীন নয় কালাতীত।

সামাজিক মানুষের অহং বা অহমিকা অথবা ব্যষ্টিমুখ্যতা কি সর্বকালের এবং মানুষ মাত্রেরই, আরও বড় কথায় জীবমাত্রেরই, জন্মগত এবং মৃত্যুতেও তার শেষ নেই? অর্থাৎ এই যে ধর্ম, ঈশ্বরের মত জীবদেহকে বাহন করেই কি এর প্রকাশ? জীবজগতে জীবদেহটা বড় কথা নয়, বড় কথা ব্যষ্টিমুখ্যতা, জীবদেহ অসৎ, অবিদ্যা, মায়া। ব্যষ্টিমুখ্যতাই সৎ।

ব্যষ্টির এই যে ভীড় ঠেলে সর্বাগ্রগণ্য হবার ব্যগ্রতা এইটেই তো আসল কথা।

নীৎসের কথা। নিজের শক্তি অর্জনের সঙ্কল্প, পরকে অতিক্রম করার সঙ্কল্প, to power and to overpower.

একদল নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী ধাবমান ঘোড়সওয়ারকে দেখে নীৎসের দর্শন স্থির হয়ে গেছল। ঘনিষ্ঠ সমর্থন পেলেন ডারুইনের (বাইওলজিতে) জীবতত্ত্বে। অস্তিত্বের সংগ্রাম (struggle for existence) আর শ্রেষ্ঠতমের বিনাশোত্তরণ (survival of the fittest).

দেখে শুনে মনে হয় উত্তমপুরুষটি সর্বাগ্রগণ্য হবার জন্য যখন কালসমুদ্র সাঁতরে

এগোতে থাকেন বা এগোতে চেষ্টা করেন তখন তার ঢেউ মধ্যম পুরুষদেরও গায়ে লাগে। আর তাইতে নীৎসে বলেছেন ভৃত্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে মনিব হবার। এখানে বাঁচার দ্বন্দ্বের চাইতেও বড় হয়েছে সর্বোত্তম ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। অপরের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা ; যাকে আমরা গার্হস্থ্য ভাষায় বলি মেরেকেটে বেরিয়ে যাওয়া।

কিন্তু নীৎসের মস্ত ভুল তিনি ব্যষ্টিকে অর্থাৎ মানুষকেই সর্বগ্রাসী বা সর্বনিয়ন্তা বলে মনে করেছিলেন ; মনে করেছিলেন, মানুষের ঐ 'মন' বলে যে একটা অ-পদার্থ আছে ঐটেই সবকিছুর শেকড়। মনোবাদীদের ঐ একটা দোষ, মনকে অধ্যাত্মিক করতে গিয়ে তাঁরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেন। মানুষ আর মানুষ থাকেনা ; পরিণামে দেব-সন্তান হয়ে পড়ে।

আজও যে এই ভুল কেটেছে তা নয়। ফ্রয়েডের মতো এতবড়ো চুলচেরা বিচারকও এই ভুলের জের টেনে গেছেন। ব্যষ্টিকে বা মানুষকে যে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব এটা মনোবাদীরা কিছুতেই মানতে চান না। অথচ মর্মভেদী বেড়িয়াম ইউরেনিয়ামকেও দেহের খাঁচাটাকে ভেদ করেই ঢুকতে হয়, উপেক্ষা করে নয়। সমগ্রতা থেকে ওকে কিছুতেই বিয়োগ করা চলেনা। মন যেখানেই অধিষ্ঠান করুন তার বাহন চাই, আর একবার বাহনের কাঁধে ভর করলে বাহনের গতিকে স্বীকার করতেই হবে, পরিণতিকেও। মজা এই বাহনটিও কতগুলো নিয়মের অধীন, যে নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার না আছে বাহনের না আছে সেই আধ্যাত্মিক মনটির।

নতুবা মনের তো রাশ নেই ; সে তো ইচ্ছে করলেই হিল্লীদিল্লী ঘুরে আসতে পারে ; সেজন্য বিমানের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাকে যদি সত্যই ফাঁকা বায়ুস্তরকে ছেড়ে কঠিন বাহনটিকে ভর করে চলতে হয় তবে হিল্লীদিল্লী পরিদর্শনে বিমান চাই-ই ; নতুবা হিল্লীদিল্লী মনোরাজ্যেই থেকে যাবে।

সুতরাং ব্যষ্টিকে বা মানুষকে বুঝতে হলে, সমজদারকে সরাসরি মনোরাজ্যে ঢোকবার বৃথা চেষ্টা না করে ব্যষ্টির আওতায় আসতে হবে।

সোজা কথায়, মানুষকে বুঝতে হলে মনুষ্য-সমাজে আসতে হবে, মানুষের মনস্তত্ত্ব দেবরাজ্যে হাতড়ে বেড়ালে হাতে কেবল মুঠো মুঠো অন্ধকারই উঠে আসবে।

কালাতীত মনটির যে ক্ষমতাই থাক তার ডিঙিয়ে চলার মানসিক অবস্থাটা কেন এল তার ঠিকানা মিলবে সেইখানটায় যেখানে তার ডিঙিয়ে চলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ধূর্টাশবণিকের কুক্ষিগত মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনে যে কণ্ট্রোল আর কিউ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, ডিঙিয়ে চলার মনোবিকার যদি বুঝতে হয় তবে তার জবাব এখানেই পাওয়া যাবে।

যে খদ্দেরকে আদর আপ্যায়নের জন্য স্বয়ং দোকানের মালিক ছুটে এসে চাল ডাল

তের্লের নমুনা দেখাতে ঘর্মাক্ত হতেন সেই একই দোকানের মালিক আজ সেই খদ্দেরকে চিনতে তো পারেনই না বিক্রেয় বস্তুর সামান্য সমালোচনায় মারমুখী হয়ে ওঠেন কেন? কিউয়ে দাঁড়াতে গিয়ে একটা লোককে ফাঁকি দিতে পারলেই যেন বেঁচে গেলাম আর কয়লাওলা ওজন কম দিচ্ছে দেখেও দাঁত বের করে তার তোয়াজ করে এলাম।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ থেকে এই ১৯৪৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলার এককালের বিনীত ভদ্রব্যক্তিদের মধ্যেও ফাঁকি দেবার একটা চৌর্যবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছে। বাস ট্রামকে চারপয়সা ফাঁকি দেয়া থেকে সুরু করে বড়রকমের একটা দাও মারার ব্যাপার পর্যন্ত। বাইরের এই অপরকে ফাঁকি দেয়ার প্রবৃত্তি গৃহের শান্তনীড়েও সংক্রামিত হয়েছে, তাই ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষেও সেই উত্তমপুরুষটিকে হন্যে দিয়ে ঘুরতে দেখা গেছে, আজও যাচ্ছে।

আসলে মানুষ ভালও নয়, খারাপও নয়, কথাটা এত পুরোণো আর বহুবাদীসম্মত যে পুনরুক্তিতেও লজ্জা হয়। মানুষ যে অবস্থার বিপাকে ভালমন্দ হয়, এও তেমনি একটা পুরোণো কথা। অথচ এই পুরোণো কথাটাই আমরা বার বার ভুলে যাই বলে ১৯৪২ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকগুলো এমন নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে বসল কেন ভেবে বিস্মিত হয়েছি। দুষ্প্রাপ্যের দিনে কোথায় চাল পাওয়া যায় সে তার প্রতিবেশীকে বলতে চায়না, পাছে নিজের হঠাৎ পাওয়ার উৎসটা অপরের উপস্থিতিতে শুকিয়ে যায়। জীবনেও যে মিথ্যে কথা বলেনি, ফাঁকি দেয়নি, চুরি করেনি সে তাই করেছে ও করছে। সমগ্র সমাজ জীবন থেকে কেমন করে যেন "খাঁটী" জিনিসটা উবে গেল। আজকের গোয়ালা আর ঘিওয়ালা ভাবতেই পারেনা, খাঁটী জিনিস মানুষে কখনো বিক্রী করেছে, করা যায় বা করা উচিত।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেন মানুষগুলি 'আড়চোখে হুড়োহুড়ি করে বেড়াচ্ছে। ওপরতলার যোগজীবনকে না জানিয়ে প্রাণেশবাবু বাজারের ঐ কোণের দোকানদারকে কানে কানে একটু চড়াদরেই বাদামতেল মেশানো খাঁটী সরষে তেলের ব্যবস্থা করে আসেন। 'কোথায় পেলেন?' 'এই পেলাম এক জায়গায়।' 'বলুন না।' 'আর তো নেই।' প্রাণেশবাবু যোগজীবনের কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। যোগজীবন ছুটে পালিয়ে এক ঝুড়ি কয়লা নিয়ে আসেন। 'কয়লা দিচ্ছে নাকি?' 'এই শেষ', যোগজীবন একবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারলে হয়। কি আপদ! প্রাণেশবাবু খুব নীতিবাগীশ ছিলেন। তিনি এবার সেলামি দিয়ে বাড়ীভাড়া খুঁজছেন। সাড়ে নয় চুয়াল্লিশ কাপড়ে যোগজীবনবাবুর হাঁটু ঢাকে না, অরবিন্দের জন্য কালোবাজার হাতড়ে বেড়ান।

সংসারে সবই বাড়ন্ত; কাঁকড় ধূলোমেশানো বরাদ্দবাঁধা চালে কুলোয় না-বলে

বাড়তি রেশন কার্ডের দায়ে বীরপাড়া বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার জেলে যাবার উপক্রম। পাড়ার যে জাঁদরেল সন্তোষবাবু পরম নিশ্চিন্ত মনে পান চিবোতে চিবোতে হাঁকতেন, ওহে হরিহর, সাড়ে সাতসের সরষে তেল এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও এবং বলে আর একমিনিটও দেরী করতেন না সেই জাঁদরেল সন্তোষবাবু রেশনের কৌপীন পরে তেলের টিন হাতে কার নিকুচি করছেন?

যেন রেস্; এক ঘোড়াকে আর এক ঘোড়া একটুকুর জন্য 'নেকে' মেরে দিচ্ছে। লটারী; ঘূর্ণায়মান চোখা তীরটা কার ঘরে এসে থামে, কার জয় কার পরাজয়। একেবারে সামগ্রিক অনিশ্চয়তা। আজ কি তেল পাওয়া যাবে? ডাল আছে? সেদ্ধ না হোক পেলেই হোল। ব্লেড পাওয়া যাবে দাড়ি কামাবার? ওষুধ পাওয়া যাবে—কুইনিন? অনিশ্চয়তা—অনিশ্চয়তা। 'দেখি একবার বেরিয়ে'—ঘুঁটে পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেল একদিন!

কাউকে বিশ্বাস নেই, নিজেকে পর্যন্ত নয়।

মানুষ এমন খারাপ হয়ে গেল কেন? সেই অমায়িক দোকানদার এমন দাঁত খিঁচোয় কেন? পুরোণো ছেঁড়া গরম জামা বের করে এককালের নামকরা দোকানী "নিলে নিন, না নিলে না নিন"—এর মেজাজ কোথায় পেল?

মানুষ কি কোনকালে ভাল ছিল? এই দোকানীই না নির্ভুল ওজনে খাঁটী মাল কাটাবার চেষ্টা করত; হিসেবে ভুল হলে ছুটে গিয়ে একশোবার ক্ষমা চাইত? এই ভদ্রলোকই না দোকান বয়ে মাসিক পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যেতেন? চাল তেল নুন কয়লা কাপড় সংগ্রহে সারিবদ্ধ উৎকণ্ঠিত জনতার সাত নম্বর আট নম্বরের বজ্রাঘাতে মৃত্যু কামনা করছে কেন?

এমন দিন ছিল নাকি কখনো যখন দোকানী সরবরাহে ছিল নিশ্চিন্ত, আর শ্রীযুক্ত ক্রেতা অর্ডার মাফিক জিনিস তাঁর বাড়ীতে পৌছাবেই স্থির জানতেন? অথবা আবার কি সেদিন আসবে?

অর্থাৎ, অনিশ্চয়তার রাজ্য থেকে নিশ্চয়তার রাজ্যে গেলে মানুষ কি ভাল হ'য়ে যাবে নাকি? রেস্ খেলার অবসান হবে? অনিশ্চয়তার অবসানে ভীড় ঠেলে এগোবার প্রবৃত্তি কমবে? যাকে বলে প্রাপ্তি (achievement) আর তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস, সে তো কেবল পাবো না পাবো না এই আশঙ্কাতেই। পাবো না জেনে পাওয়ার আনন্দ।

কিন্তু আবার যদি পরম নিশ্চিন্তে পান চিবোবার দিন আসে? অঢেল চাল, যথেষ্ট ডাল, পাহাড়প্রমাণ কয়লা—আবার সেই ফুটপাতে 'যা নেবেন তা দু'আনা'! তেলের সমস্যা যদি কথা না ফুরোতেই মেটে? তবুও কি ভীড় ঠেলে চলার প্রবৃত্তি প্রকাশ পাবে নাকি?

রেশন আর কন্ট্রোলের গোলক ধাঁধাঁয় আজ উত্তমপুরুষটি হন্যে দিয়ে ফির্‌ছেন।

১৯৪২-এ নরহরি ট্রাম পোড়াতে গিয়ে মারা গেছে, সে শহীদ হ'য়ে বেঁচেছে। তারই সঙ্গে নরোত্তম পালিয়ে বেঁচেছে ; আজ সে সেদিনকার দুঃসাহসিকতা আর পলায়ন-কৌশলের কথা সগর্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মাইকের কানে কানে বলে, আর তাই খান্ খান্ হ'য়ে যেসব দূরবর্তী শ্রোতার কানে ফেটে পড়ে তারা এই নমস্য ব্যক্তিটির প্রত্যক্ষ দর্শনে ও তাঁর কণ্ঠ শ্রবণে রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষে যারা মরেছে তারা ক্ষুধার জ্বালা থেকে রেহাই পেয়েছে। যারা অখাদ্য খেয়েও টিকে গেছে—তারা সেদিনকার কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে বলে। বাঁচার দ্বন্দ্বে তারা কি করে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তারপর যারা ইম্ফল রণাঙ্গনে কওমি নিশান নিয়ে এসেছিল এবং যারা দিল্লীর লালকেল্লা লক্ষ্য করে ড্যালহৌসী স্কোয়ারে কদম কদম এগিয়ে গেল অথবা ধর্মতলায় যাদের যাদের মধ্যে আগে কেবা প্রাণ করিবেক দানের নিশ্চল নির্বিকার চিত্ততা দেখা দিয়েছিল— অথবা যারা ইম্ফল রণাঙ্গনে জাপানী রোখার জন্য হাওয়ায় ঘুসি মেরে বেড়াচ্ছিল, ধর্মতলায় বা ইম্ফলে প্রাণ দিতে পারেনি—অথবা ভবিষ্যৎ বংশধরদের বঞ্চিত করে যে সমসাময়িকেরা ইতিহাস শুনে ফুলে উঠ্‌ল তাদের মধ্যেও যে সর্বজনীন উত্তমপুরুষটি ছিলেন, তাকে প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দিয়ে বোঝানো যাবে ?

বোঝানো যাবে যদি আমরা রেশন আর কন্ট্রোলের লাভলোভী ব্যবস্থাটাকে বৃহত্তর সমাজে বা বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিফলিত করতে পারি।

না, প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা নয়। সামাজিক অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অরাজকতা। দেবেন ঘোষ স্কুল ডিঙিয়ে কলেজ ডিঙিয়ে ল পাশ কর্‌ল ব'লে সে যে উকীল হবেই সংবাদপত্রের সাবএডিটার হবে না, এ কে বল্‌তে পারে ? উকীল হলেও সে যে মক্কেল পাবেই তাও স্থির করে বলা কঠিন। আজ্‌কে যারা কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন কর্‌ল কালও যে তারা তাই কর্‌বে এ কোন গণক বলতে পারে, অথবা কাল যে সে পকেট মেরে কফিখানায় বস্‌বে না তাও তো জানা নেই ? সমাজে নেশাপেশারও স্থিরতা নেই, অন্নবস্ত্রের ও সমান দরে সমান সরবরাহেরও তেমনি কোন নিশ্চয়তা নেই। লোকে প্রকৃতিকে খেয়ালী বলে, তার কারণ লোকে আরও বেশী খেয়ালী সমাজে থাকে বলে। সমাজে লোক কত, কি পরিমাণ তার চাল ডালের প্রয়োজন, কত গজ কাপড় চাই, কত মণ কয়লা চাই, এসব লক্ষ্য রেখে কোন সময়ই কেউ কিছু উৎপাদন করে না। ফলে বাজারে ক মণ কি পরিমাণ জিনিস আস্‌বে তাও কেউ জানে না। এও বরং ভাল। কিন্তু অবস্থাটা আরও ঘুলিয়ে যায় যখন সমগ্র জগৎটাকে গুটিকয়েক লোক তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজন মতো রেশনের যাঁতাকলে

ফেলে কন্ট্রোল করতে চায়। তাদের হিসেবে "অতিরিক্ত" গম পুড়িয়ে "অতিরিক্ত" কাপড় পচিয়ে দর ঠিক রাখতে চায় তারা। গোলমাল আর অনিশ্চয়তা ততই বেড়ে চলে।

তাই দেবেন ঘোষের চৌদ্দপুরুষের আশঙ্কা দেবেন ঘোষে বর্তেছে, দেবেন ঘোষ স্থির জেনেছে যে কিছুই ঠিক নেই। হাতের কাছে যা পাও নিয়ে নাও; বার বার শেয়ালটা অদ্যভক্ষ ধনুর্গুণ করে নিঃশেষ হয় বটে কিন্তু ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের ব্যাধিটা "বংশগত" হয়ে পড়ে। ছোট ছেলের ইচ্ছে হয় বটে হাতের পয়সাটা দিয়ে এক্ষুনি লজেঞ্চ খায় কিন্তু দেবেন ঘোষের অভিজ্ঞ পিতা হরেন ঘোষ নিজে ধনুকের ছিলা খেয়ে দেবেন ঘোষকে ঐ হাতের পয়সাটাকে জমাবার বুদ্ধি দেন।

হিসেবী বিদ্যাসুন্দর না খেয়ে-দেয়ে ঐ বাড়ীখানা তুলেছে, তাইতে না আজকে তার অপগণ্ডগুলি তাতে হাত পা ছড়িয়ে আছে? তপন বলে, ছোঃ, দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার; যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—ভাগ্যে থাকে এই যে স্নেহবশে গুটিকয়েক জন্ম দিলাম এরা ঠিক চরে বেড়াবে। বলে—জিভ্ দিয়েছেন যিনি, জানতো?

দেখা যাচ্ছে, উত্তমপুরুষ অদৃষ্টেও থাক্‌লেন পুরুষকারেও থাক্‌লেন।

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাক্‌লে যক্ষও সত্য হতেন না, ওমর খৈরামও সত্য হ'তেন না। ভবিষ্যতের আপদ আর নিরাপত্তার দোলানিতেই পরলোক কী বাৎ মনোরম হয়ে ওঠে। উত্তমপুরুষ গোলক ধাঁধাঁয় পথ খুঁজে ফেরেন।

উত্তমপুরুষ পথ খুঁজে ফিরছেন।

এককালে মনে হয়েছিল ব্যষ্টি উৎপাদনের কালগ্রাসী ব্যস্ততা থেকে উত্তমপুরুষ বুঝিবা সামাজিক উৎপাদনে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সমাজকর্তাদের সাজানো সমাজে সামাজিক উৎপাদন ব্যষ্টির পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল। তবুও, জুতাসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের কুটীরশিল্প ছেড়ে ব্যষ্টি যখন কারখানার রাজ্যে কেবল জুতাসেলাই নিয়েই থাকতে পারল তখন মনে হয়েছিল দ্বন্দ্বের যুদ্ধে সময়টা সংক্ষেপ হয়ে আসছে। মুচি কেবল যদি জুতোই সেলাই করে তবু তার কাপড়ের জন্য তাকে তাঁতে বসতে হবেনা। কিন্তু গতযুদ্ধের দৌলতে মুচির মনে আবার এই সংশয় জেগেছে যে, সারাদিন যদি তাকে জুতোসেলাই নিয়েই থাকতে হয় তবে তার চাল-তেল-কাপড়ের দোকানে রেশন এনে দেবে কে? অর্থাৎ দ্বন্দ্বের-কাল এখন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, অনিশ্চয়তা বেড়েছে, অসামাজিক মানুষ থই পাচ্ছেনা। উত্তমপুরুষ পথ খুঁজে ফিরছেন। এবারকার পরিণতিতে একথা বেশী ক'রে পরিষ্কার হয়েছে যে, বর্তমান অসামাজিক ব্যবস্থা মূলত অচল সত্ত্বেও যদি একে গায়ের জোরে চালাবার চেষ্টা হয় তবে মানুষ ঘুরে ফিরেই বন্য হ'য়ে উঠ্‌বে আর উত্তমপুরুষ উগ্রতর হ'য়ে উঠ্‌বে।

অনিশ্চয়তার দরুণ ব্যষ্টির ইচ্ছাশক্তি নিঃসংশয়ে মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়েছে। ব্যষ্টিরা তাদের অনিচ্ছায় ইতস্তত ছিট্‌কে পড়ে ; ফলে যার রিসার্চ স্কলার হবার হয়তো সম্ভাবনা ছিল সে এঁদো ঘরে কম্পোজিটার হ'য়ে আছে, আর যে ব্যবসা করার মতলবে বি-কম পড়্‌ল, সে দেখ্‌ল তার টিউসানীর গণ্ডী পার হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু মজা এই, অনিচ্ছার বিরুদ্ধে ঘাড়ে চেপে যে কাজ তার এলো তারই প্রতি ক্রমস্ফূর্ত একটা সমতার বশে সে একটা সান্ত্বনার যুক্তিও স্থির ক'রে ফেলে (অবশ্য এ সান্ত্বনায় বিশ্বের প্রতি আক্রোশের খাদ অনেকখানি মেশানো থাকে, কিন্তু উত্তমপুরুষ তা স্বীকার করতে গররাজী) ; সান্ত্বনার যুক্তি একবার স্থির হ'য়ে গেলে মহাবিদ্রোহী উত্তম পুরুষ মাথা চাড়া নিয়ে উঠ্‌তে থাকেন। তাই, যে চিরকাল প্রুফ টেনে এলো সে মনে করতে থাকে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রুফটানা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, হয়তো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এমনও মনে হ'তে পারে যে, সে যদি প্রুফটানা বন্ধ করে তবে এই নিত্যভ্রাম্যমান ব্রহ্মাণ্ড অকস্মাৎ থম্‌কে যাবে। ঠিক সেই কারণে, মাসিক পনের টাকা বেতনের তহশীলদার অকস্মাৎ ফুলে গিয়ে বলে, টাকার গরম আমায় দেখিও না, হাজারে হাজারে টাকা এ শর্মার হাত দিয়ে যায়, অঢেল টাকা নাড়াচাড়া করেছি। নিজের চাকরীরই যার নিরাপত্তা নেই তেমন "পদস্থ" চাকুরেও এক বিস্মৃত মুহূর্তে পরের চাকরী খাওয়ার হুম্‌কি দেন। এমনও অনেককে দেখা যায়, যারা অনর্থক লোককে চাকরীর ভরসা দিয়ে নিজের মিথ্যা মর্যাদাবৃদ্ধি করেন। কিম্বা যিনি চাকরী বা আজকালের কলকাতার বাড়ী পেয়েছেন তিনি বলেন, চাকরী ? বল কি হে ? এই ছাঁটাইয়ের দিনে ? বাড়ী ? কি বলেন মশাই বাড়ী ? অর্থাৎ হে দুর্ভাগা, একবার এই ভাগ্যবানের দিকে চেয়ে দেখ। উদ্যোগীনাং হি তো বটেই উপযুক্ততারও একটা পুরস্কার আছে। তুমি নিতান্ত অযোগ্য তাই কিছুই হয়নি। ভাগ্যবান অসম্ভবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হাসেন এবং পানের দোকানে আয়নার বরাবর খুব কায়দা ক'রে সিগারেট ধরাতে ধরাতে নিজের নিখুঁত ঝাড়াই গরম স্যুটটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যান, বুকের কাঁপানিতে ভেস্টটা প্রায় ফাটে ফাটে।

এই পৃথিবী ; এই একীকৃত পরিবর্তনশীল, অস্থির মানুষের পৃথিবী। জন্তুজগৎ থেকে একান্ত পৃথক্ মনুষ্য সমাজ। নিতান্ত পার্থিব এই সমাজের মূলে রয়েছে অসঙ্গতি, সমাজে সামাজিকতাও নেই, ব্যষ্টির স্ফূর্তিও নেই। ব্যষ্টি ও সমাজ তাই প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের পরিণতি অহমিকা, আর ঐ মৌলিক অসঙ্গতির জন্যই তার এই সর্বজনীনতা। এই সামাজিক অসঙ্গতির দরুণই ব্যষ্টি সামাজিক গোলকধাঁধা পথের সন্ধানে মাথা কুটে মরে এবং নিদারুণ আক্রোশে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ভান করে। তাই ব্যষ্টির মুক্তি সুতরাং উত্তমপুরুষের মুক্তি হবে সেদিন যেদিন এই সামাজিক অসঙ্গতির অবসান হবে, আজকে তার আচরণে যে জটীল

"মনস্তত্ত্বের" আবিষ্কার করি তারও সেদিন হদিস্ পাওয়া যাবে। উত্তমপুরুষ সেদিন হবে প্রথমপুরুষ—একীকৃত সামাজিক মনুষ্যত্ব। উত্তমপুরুষ, চিরন্তন, সনাতন বা শাশ্বত নয় যেমন নীৎসে চিরন্তন, সনাতন বা শাশ্বত নয়।

উত্তমপুরুষ অস্থির; কেবল একবার পথটা পেলেই তার বিলীয়মান প্রকৃতি ধরা পড়বে।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্স

শশধর সিংহ

দুই

১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে স্নুরু করিয়া ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ফ্রান্সের উপর দিয়া যে-ঝড় বহিয়া গেল তাহার ইতিহাস এইখানে বিশদভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই কলঙ্কময় পর্ব্বেও ফরাসীরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয় নাই। জেনারেল দ্য গল (De Gaulle) ইংলণ্ড হইতে স্বদেশ-বাসীদের আশার বাণী শুনাইলেন। ফ্রান্সকে নাৎসী জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি বলিলেন: "আমরা একটিমাত্র রণে হারিয়াছি, যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই।" (Une bataille est perdue, mais la guerre continue.) এইভাবে "স্বাধীন ফরাসী" দলের সৃষ্টি হইল। ফ্রান্সের বাহিরে সর্ব্বত্র ফরাসীরা দলে দলে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিল। ঐ সময়ে য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র জর্ম্মানদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। বৃটেনের ভবিষ্যৎ তখন তমসাচ্ছন্ন। এইরূপ সঙ্কটকালেও ফরাসী নেতাদের কেহ কেহ বৃটেনের উপর যে আস্থা হারান নাই তাহা ইঁহাদের ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিল। তাঁহারা জানিতেন যে, অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধের অবসান না হইলে নাৎসীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ব্লিৎসক্রীগের পিছনে সামরিক চিন্তার যে-একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা জার্ম্মেনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং যতই দিন যাইতে লাগিল নাৎসীদের লড়িবার শক্তি ততই কমিতে লাগিল। আর অন্যদিকে মিত্রপক্ষের ক্ষমতা তুলনায় বাড়িতে লাগিল। বর্ত্তমান যুদ্ধপদ্ধতিতে এই শক্তির তারতম্যের

উপর সামরিক পরিণতি নির্ভর করে। ফ্রান্সের জনসাধারণও এই তথ্যটি উপলব্ধি করিতে শিখিল। লণ্ডন হইতে প্রেরিত দ্য-গলপন্থীদের বেতার প্রোপাগ্যাণ্ডা এই কারণে উত্তরোত্তর সাফল্যলাভ করিতে লাগিল। নাৎসী ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে গিয়া এইভাবে ফ্রান্সের গুপ্ত (underground) আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। আর ১৯৪১ সালের প্রথম হইতেই ফরাসীদের মধ্যে একটা নৈতিক পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইল। অধিকৃত অংশ হইতে ক্রমে একটা নূতন মনোভাব ফ্রান্সের অনধিকৃত এলাকায়ও ছড়াইল। পরাজয়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলন (resistance movement) ক্রমশঃ একটা অভাবনীয় গতিশীলতা লাভ করিল।

১৯৪১ সালের জুন মাসে জর্ম্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করে। ইহার অব্যবহিত পর হইতেই ফরাসীদের নাৎসীবিরোধী সংগ্রাম এক নূতন পর্য্যায়ে পৌঁছিল। বলা বাহুল্য, ইহার কারণ প্রথমতঃ সামরিক। রুশ- রণপ্রান্তে জর্ম্মানদের শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়াতে পশ্চিম য়ুরোপের উপর নাৎসী প্রভাবের প্রখরতা অনেকাংশে কমিয়া আসিল এবং ইহার সুযোগ ফরাসী গণতন্ত্রীরা পূরামাত্রায় নিতে ছাড়িল না। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে যে-নৈতিক পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছি তাহা এখন হইতে ব্যাপকরূপ ধারণ করিল। সুতরাং প্রতিরোধ আন্দোলন কেবল যে দেশময় ছড়াইল তাহা নহে, ইহাতে নানা রাজনৈতিক মতবাদেরও সংমিশ্রণ ঘটিল। লুই লেভি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "প্রতিরোধ আন্দোলন নানা দলে বিভক্ত হইল ও প্রজাতন্ত্রীরা কেবল প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত নহে, রাজতন্ত্রী এমন কি কাগুলার বা ফ্যাসিবাদীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করিতে শিখিল। ফ্যাসিবাদীরা কেহ কেহ (যদিও সবাই নহে) তাহাদের রাজনৈতিক মত বদলাইল। পার্লামেণ্টের তরুণ সভ্য পিয়ের ব্লক এখন লণ্ডনে আছেন। তিনি তাঁহার ফ্রান্সের জেলজীবনের কাহিনীতে বলিয়াছেন যে, ক্রয়া দ্য ফ্যো ও আকশিঁও ফ্রাঁসেজ দলের সহ-জেলবাসীরা যদিও জার্ম্মেনী ও ভিশির প্রতি বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত ছিল তথাপি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলেই ইহাদের সহিত মতদ্বৈধ ঘটিত।" ["Within the resistance groups, republicans work side by side with the reactionaries, royalists, even cagoulards. Some (by no means all) fascists have changed their political opinions ; Pierre Bloch, the young socialist M. P. now in London, has stated in his accounts of prison-life in France that whereas his Croix de Feu and Action Francaise fellow-prisoners were in complete agreement with him on the need of the opposition to Germany and Vichy, he felt disagree-

ment arise as soon as the political future was referred to." ("France is a Democracy" by Louis Levy.]

ম'সিও লেভির বক্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ফরাসী সমাজের উপর নাৎসী প্রভাব শিকড় গাড়িতে পারে নাই। নিকট পরিচয়ে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দলেরও অনেকে হিটলারপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই জাতীয়-বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ফ্রান্সের সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয় নাই। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধকালীন ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় ঐক্যের ভিতর দিয়া রাজনৈতিক দলাদলি দূরীভূত হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধপূর্ব্বের রাজনৈতিক বিভাগ আবার দেখা দিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দলগঠনের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বামপন্থীদের প্রভাব আজ কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। চিন্তাজগতেও আবার বিপ্লবী ঐতিহ্যের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। নাৎসী প্রতিরোধ আন্দোলনের সহিত অনেক খ্যাতনামা ফরাসী বৈজ্ঞানিকের নাম জড়িত আছে। লুই লেভি বলিয়াছেন: "আমাদের সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীররা হইতেছেন নাৎসীবিরোধীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য উদাহরণস্থল। লাঁজভ্যাঁকে জর্ম্মানরা গ্রেপ্তার করিয়াছিল; লাপিকও অত্যাচারী বিজয়ী শক্তির হাতে নিজেকে বলিদান করিয়াছেন; জঁা পেরঁ্যা সংগ্রাম চালাইবার জন্য আমেরিকায় যান ও সেখানে মারা যান; আর পল রিভে এখন আমেরিকায় আছেন।" ("The most outstanding scientists of our time have also been the most convinced anti-fascists. There is Langevin, who was arrested by the Nazis; Lapique, also victim of persecution by the occupying power; Jean Perrin, who died in the United States, where he had gone to continue the struggle; and Paul Rivet, who is today in America.") এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-দম্পতি জলিও-ক্যুরি Joliot-Curie)র। অন্যান্য অনেকের মত ইঁহারাও ফ্রান্সের কম্যুনিষ্টদলে যোগদান করিয়াছেন।

১৯৪৫ সালে নাৎসী কবল হইতে মুক্ত হওয়ার পর কথা উঠিল ফরাসী রাষ্ট্রের নূতন রূপ কি হইবে, কাহারাই বা হইবেন ইহার নেতৃস্থানীয়। জেনারেল ছ গলই বা এই পরিস্থিতিতে কি করিবেন। তিনি যুদ্ধের পর দেশে সম্মানের পদ গ্রহণ করিবেন এবং দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করিবেন তাহা দলনির্ব্বিশেষে সবাই মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানের বহুপূর্ব্ব হইতেই বামপন্থীরা ছ গলের ডিক্টেটরি মতিগতি সম্বন্ধে দেশকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে

গুপ্ত আন্দোলনের মুখপত্র "ফ্রাঁ তিরেয়্যার" ("Franc-Tireur") লিখিয়াছিল: "আমরা আগে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা সর্ব্বতোভাবে জেনারেল দ্য গলের সাহচর্য্য করিব, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যদি একাধিপত্য করিতে চান তাহা হইলে আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। একদল মার্শেল অর্থাৎ পেত্যাঁর হাত হইতে আমরা যে-ডিক্টেটরি গ্রহণ করি নাই তাহা আমরা কোনও জেনারেলের হাত হইতে নিতে নারাজ"। ["We have said, and we repeat, that we are entirely behind General de Gaulle in his fight for the liberation of the country, but we should be against him if he were to contemplate after the liberation a dictatorship which we could no more accept from a General than we have accepted it from a Marshal."]

কাজেও তাহাই হইল। ফ্রান্সের নূতন রাজনৈতিক সংস্থানের গোড়াপত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত দ্য গলের একাধিপত্য বজায় রহিল সত্য, কিন্তু ক্রমে ফ্রান্সের বিভিন্ন দলের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী রাজনীতির যুদ্ধোত্তর রূপ দ্রুত বদলাইতে লাগিল। কোন দলই বিনাসর্ত্তে দ্য গলকে মুখপাত্র করিতে রাজী হইল না। এমন কি দ্য গলের অনুগত "এম আর পি" (MRP) দলও প্রথম হইতে এইরূপ করার বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের প্রথম প্রেসিডেন্টের অকস্মাৎ সক্রীয় রাজনীতি হইতে অন্তর্ধান করার পিছনে যে-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে তাহা প্রধানতঃ দ্য গলের দলহীনতারই সাক্ষ্য দেয়। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্য গলের ব্যক্তিগত চরিত্রও তাঁহার এই অবস্থার জন্য খানিকটা দায়ী। নেপোলিয়ানের মত তাঁহারও অহমিকা এই যে, তাঁহাকে ছাড়া ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় তাঁহার আচরণ হইতে বুঝা যায় যে, অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া ফরাসী জাতির ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া তিনি বিশেষভাবে নিজের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের কথাই ভাবিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ফরাসীরা জেনারেল বুলাঁজে (Boulanger)র কথা ভুলে নাই। দেশের সঙ্কটকালে দ্য গলের মত এই লোকপ্রিয় সামরিক নেতাও দেশকে বিভ্রান্ত করিতে বসিয়াছিলেন।*

* "...প্যারিসের জনসাধারণ তাঁহার 'বাম-পন্থী' মতামত নিছক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং সানন্দে তাঁহার পদানুসরণ করিতে রাজী হইল...বুলাঁজে ফ্রান্সের সংস্থানের সংশোধন দাবী করিলেন। উগ্র বামপন্থীরা ১৮৭৫ সালের সংস্থানকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। র‍্যাডিকেল ও সোসেলিষ্টরা উভয়েই ইহার সংশোধন চাহিয়া ছিলেন......এই হেতু তিনি এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আবার অন্যদিকে উগ্র জাতিয়তাবাদী অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল দুলগুলি তাঁহাকে সাহায্য দান করিল।" ["...the people of Paris took his declaration of 'Left' opinions at their face value

আধুনিক ফরাসী ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূরিত না হইলেও ফ্রান্সে গণতন্ত্রবাদের বাহ্যিক রূপ কখনই বেশীদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই হিসাবে অন্ততঃ ফরাসীবিপ্লব জয়ী হইয়াছে মানিতেই হইবে। দেশের রাজনৈতিক মতভেদ দলের বৈচিত্র্যও ইহার সাক্ষ্য দেয়। জর্ম্মানদের ও ভিশি সরকারের নানা প্ররোচনা ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও ফরাসীজাতি গণ-তান্ত্রিকতার বনিয়াদ হইতে বঞ্চিত হইতে অস্বীকার করিয়াছে। যুদ্ধকালীন প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও স্বতঃপ্রবৃত্ততা (spontaneity)-ও ইহার প্রমাণ দেয়। সাম্যবাদের আদর্শ ফরাসী সমাজে একটা মৌলিক ঐক্য আনয়ন করিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি মিলিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধান্তে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ আবার যুদ্ধপূর্ব্বের মতদ্বৈধ ফিরাইয়া আনিয়াছে।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সে যুদ্ধের পর প্রথম নির্ব্বাচন হয়। ইহার ফলে যে-জাতীয় মহাসভায় বা লাসাঁব্লে নাশিওনাল (L' Assemble´e Nationale)-এ যে-সব দল নির্ব্বাচিত হয় তাহাদের নাম ও সংখ্যা দেওয়া হইল :

কম্যুনিষ্ট	...	১৪২
এম আর পি (Mouvement Republicain Populaire)		১৪০
সোসেলিষ্ট	...	১৩৩
র‍্যাডিকেল সোসেলিষ্ট	...	১৯
অন্যান্য	...	৮৮
মোট সংখ্যা	...	৫২২

"এম আর পি" ছাড়া উপরের সবগুলি দলের সহিত হয়ত পাঠকের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে। মুভমাঁ রেপ্যুব্লিক্যাঁ পপ্যুল্যার মূলতঃ ক্যাথলিকপন্থীদের দল। ইংরেজীতে ইহাকে Progressive Catholic বা সময় সময় Popular Republican আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মঁসিও বিদো (Bidault) এই দলের নেতা এবং নাৎসী বিরোধের

---

and were ready to follow him happily...Boulanger was asking for a revision of the Constitution. The Constitution of 1875 was detested by the extreme Left ; radicals and socialists alike wanted its revision...Hence the popularity of Boulanger. But at the same time the General was supported by the jingo nationalists." *Cf.* "France is a Democracy."]

অন্তরালে ইহার উৎপত্তি। এই দল কম্যুনিষ্ট-বিরোধী, কিন্তু মোটামুটি প্রগতিশীল। র্যাডিকেল সোসেলিষ্টদের আসল নাম হইল "পার্‌তি রেপ্যুব্লিকাঁ এ রাদিকাল সসিয়ালিস্‌ত্‌" (Parti republicain et radical socialiste)। বৃটেনের লিবারেল পার্টির মত এই দলকে উদারপন্থী বলা যাইতে পারে। র্যাডিকেলদের প্রভাব প্রধানতঃ কিষাণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল এবং এখনও আছে। এই দলের মতাবলী সম্বন্ধে মঁসিও লেভি লিখিয়াছেন : "এইগুলি প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রবাদের রাজনৈতিক ভঙ্গীর বাহ্যিক আকারগুলি মানিয়া চলে, রাষ্ট্রের লৌকিকতার উপর জোর দেয় এবং ধর্ম্মযাজকদের ঘোর বিরোধী। ইহাদের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক মতবাদ অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তির উপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে, শ্রমের মুক্তিপ্রয়াসী এবং শ্রমিকশ্রেণীর সম্পত্তি বর্দ্ধিত হউক ইহা চায়।" ["...elles etaient republicaines, attache´es aux formes politiques de la de´mocratie et de la laicite´ de l' Etat et m´e`me obstine´ment anti-clericales. La doctrine e´conomique e´tait assez vague. Elle reposait sur les principes de la Re´volution francaise,´etait individualiste, visait `a 'l'e´mancipation du travail', pour-suivait 'l' acceession `a la proprie´te' des masses laborieuses."] বলা বাহুল্য, এই দলকে সমাজতন্ত্রী বলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। র্যাডিকেল মতবাদের ভারকেন্দ্র হইতেছে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বার্থ। ঐকত্রিকতা বা collectivism-এর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি এই দলকে বামপন্থী বলিতে হইবে। "এম আর পি"র মত ইহাও কম্যুনিষ্টদের পরিপন্থী। এই দলের বিশিষ্ট নেতা হইতেছেন এরিও (Herriot)। সোসেলিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য মতবাদের নহে, পন্থার। এই দুই দলেরই আদর্শ হইল শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু কি করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই পন্থা নিয়া ইহাদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। সোসেলিষ্টরা ক্রমিকতা ও গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। অন্যদিকে কম্যুনিষ্টরা শ্রেণীসংঘর্ষ ও "ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রোলিটেরিয়াটে" বিশ্বাস করে। তবে ইহাও বলিয়া রাখা ভাল যে, কার্য্যতঃ ফরাসী কম্যুনিষ্টরাও পার্লামেন্টিয় পন্থা ও ক্রমিকতা মানিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই দুই দলের প্রভেদ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত প্রভেদ।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর নির্ব্বাচনের ফলে চতুর্থ রিপাব্লিকের গোড়া পত্তন হইল। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাস হইতে সুরু করিয়া "এম আর পি", কম্যুনিষ্ট ও সোসেলিষ্টদের লইয়া একটি কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয় এবং যুদ্ধোত্তর সংস্থান গড়িবার কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৮৭৫ সালে তৃতীয় রিপাব্লিক গঠনকালে সেনেটের হাতে যে-অতিরিক্ত

ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা বামপন্থীদের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেনেটের অধিকাংশ সভ্য ছিলেন রক্ষণশীল এবং ইঁহাদের বৈরীভাবের দরুণ ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। লুই লেভি লিখিয়াছেন: "ফরাসী মালিকশ্রেণী চিরকাল সংবাদপত্রের মারফতে জনমতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে; পার্লামেন্টে কিন্তু ইহার আসল অস্ত্র ছিল সেনেট।" ("French capitalism has always maintained its grip on public opinion through its control of the press, in Parliament, however, its instrument was the Senate".)

চতুর্থ রিপাব্লিকের সংস্থানের প্রথম খসড়াতে সেনেট কোন বিশেষ স্থান পাইল না। স্ত্রী-পুরুষ সমভাবে ভোটদানের অধিকারী হইল। পাঁচ বছরের জন্য এসেমব্লি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইল। রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের পদ পোষাকী পদে পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী মে মাসে এ-সম্বন্ধে যে-গণমত বা রেফারেণ্ডাম লওয়া হইল তাহাতে এই সংস্থান টিঁকিল না। কম্যুনিষ্টরা ছাড়া আর প্রায় সবাই ইহার বিরুদ্ধে মত দিল।

আরেকবার নূতন সংস্থানের খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার পড়িল "এম আর পি" সভ্য মঁসিও কসৎ-ফ্লরে (Coste-Floret)র উপর। "প্রজে কসৎ-ফ্লরে" (projet Coste-Floret) বা দ্বিতীয় খসড়ার সহিত ১৮৭৫-এর সংস্থান ও ১৯৪৫ সালের ৫ই মে তারিখের পরিত্যক্ত খসড়ার তুলনা করিলে দেখা যায় যে: (১) (ক) ১৮৭৫ সালের সংস্থানানুযায়ী আইন সভার দুই কামরা—চেম্বার অব ডেপুটিজ ও সেনেট—হইতেই আইনের সূত্রপাত করার অধিকার ছিল। (খ) চতুর্থ রিপাব্লিকের প্রথম খসড়ায় ন্যাশনেল এসেমব্লিকে করা হইল আইন সভার প্রধান অঙ্গ অথবা "Chambre Souvraine"। আইন সূত্রপাত (initiate) করার অধিকার কেবল এই কামরাকেই দেওয়া হইল। দ্বিতীয় কামরা অর্থাৎ "কঁসেই ল্যুনিওঁ ফ্রঁাসেজ" (Conseil l'Union Francaise)কে ইংরেজীতে কাউন্সিল অব দি রিপাব্লিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই কামরাকে পরামর্শ দেওয়ার বা "consultative" ক্ষমতা দেওয়া হইল, কিন্তু আইন সূত্রপাত করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইল। (গ) "কসৎ-ফ্লরে" খসড়ায় স্থির হইল যে, আইন সভা দুই কামরাতে বিভক্ত হইবে। "আসাঁব্লে নাসিওনাল" বা এসেমব্লি সার্ব্বজনীন ভোট (universal suffrage) দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। অন্যদিকে রিপাব্লিকীয় কৌন্সিল পরোক্ষভাবে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (local bodies)-এর মারফতে নর্ব্বাচিত হইবে। দুই কামরাই আইন সূত্রপাত করিতে পারিবে এবং এসেমব্লিতে পাশ করা কোন আইন দ্বিতীয় কামরার মনোমত না হইলে এই সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা উদ্রেক করিবার ক্ষমতা ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। (২) (ক) ১৮৭৫ সালের ব্যবস্থানুযায়ী রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট আইন সভার দুই কামরা দ্বারা ৭

বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন। সেনেটের অর্দ্ধেক সভ্যের ভোটের সাহায্যে চেম্বার অব্ ডেপুটিজকে ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার তাঁহার ছিল। (খ) ১৯৪৫ সালের ৫ই মে'র খসড়ায় ৭ বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্টকে নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার কেবলমাত্র এসেমব্লির হাতেই ন্যস্ত হইল। (গ) দ্বিতীয়বারের খসড়ায় ব্যবস্থা হইল যে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ৭ বৎসরের জন্য দুই কামরার ভোটে নির্ব্বাচিত হইবেন, কিন্তু এসেমব্লিকে বাতিল করিবার তাঁহার কোন ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকিবে না।

নানা কারণে শেষ খসড়াটিও কোন দলেরই সম্পূর্ণ মনঃপুত হয় নাই। দেখা গিয়াছে যে, ৫ই মে তারিখের খসড়াতে এসেমব্লির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল এবং ইহা সম্ভব হইয়াছিল সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে। প্রথম হইতেই "এম আর পি" দলের ভয় হয় যে, এসেমব্লির হাতে ক্ষমতার এই ব্যাপকতা কালে কম্যুনিষ্ট দলের শক্তি বর্দ্ধন করিবে। তজ্জন্য পপুলার রিপাব্লিকান নেতারা দ্বিতীয় কামরা ও প্রেসিডেন্টের গৌরব বাড়াইয়া এসেমব্লির ক্ষমতা কমাইতে সচেষ্ট হইলেন। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এসেমব্লির সার্ব্বভৌম ক্ষমতার দৌলতে "এম আর পি" দলের পরিপুষ্টি সাধিত হইলে মঁসিও বিদো প্রভৃতি এই বিষয়ে এতটা তৎপর হইতেন না। সে যাহা হউক ইহাও সত্য যে, শেষ খসড়াটি সর্ব্বদলের সহযোগে সাধিত হইয়াছে এবং ইহা পারস্পরিক রফার ফল। এই ব্যাপারটি আলোচনা করিতে গিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ লিবারেল সাপ্তাহিক "ইকনমিষ্ট" লিখিয়াছে: "ফ্রান্সের অস্থায়ী রাজনৈতিক অবস্থার অবসান হেতু সর্ব্বদল পরস্পরকে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। 'এম আর পি' দল খসড়ার ভূমিকায় কতগুলি বিষয়, বিশেষতঃ রাষ্ট্রের লৌকিকতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সম্বন্ধে আগের মত আপত্তি করে নাই। কম্যুনিষ্টরাও দ্বিতীয় কামরা ও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মত বদলাইতে রাজী হইয়াছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা ভাবিবার বিষয় এই যে, সোসেলিষ্ট দল কম্যুনিষ্টদের সহিত তাহাদের পূর্ব্বের সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়াছে এবং মঁসিও ব্লুমের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বলাবাহুল্য যে, ইহার একটা বদ্ধমূল ধারণা এই যে, সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে সোসেলিষ্টদের পরাজয়ের একটা কারণ কম্যুনিষ্টদের সহিত ইহাদের সহযোগ।" ["All parties have made concessions in their general wish to end the provisional period. The M R P. have foregone their earlier insistence on certain points in the preamble—especially those in connection with *laicité* and private property. The Communists have given ground over the powers and functions of the second chamber and the President. And the Socialists, most important

of all, have conceded their earlier alliance with the Communists to M. Blum's *idée fixe* that their defeat was caused by this alliance." 31/8/'46.] এইবারে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইল সোসেলিষ্ট ও 'এম আর পি'র সাহচর্য্যে এবং কম্যুনিষ্টদের মতের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে জেনারেল দ্য গলও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। "ফ্লরে"-সংস্থানের খসড়ায় তাঁহার তুষ্ট না হওয়ার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ইহার ভিতর দিয়া প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল তাহা ইঁহার মনোমত হয় নাই। "ইকনমিষ্ট"এর ভাষায়: "জেনারেল দ্য গল প্রেসিডেন্টের হাতে যতটা ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন মনে করেন তাহা এই ব্যবস্থায় পাওয়া যায় নাই।" ("It gives the President much less authority than General de Gaulle has always thought necessary". 31.8.46.) দ্য গল যদি মনে করিতেন যে, পার্লামেন্টিয় প্রথায় তিনি তাঁহার যুদ্ধকালীন ক্ষমতা ফিরাইয়া পাইবেন ও শ্রমিকশ্রেণীর হাত হইতে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে পারিবেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তিনি নূতন পরিবর্ত্তিত সংস্থানের বিরুদ্ধে এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন না। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, দ্য গল পার্লামেন্টিয় গণতন্ত্রের হস্তে আর অধিক ক্ষমতা দিতে নারাজ। তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিভক্তি (separation of powers) সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হইলে ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রে স্থায়িত্ব আসিবে না। "দ্য গল ও নূতন সংস্থান" ("De Gaulle and the Constitution") শীর্ষক এক প্রবন্ধে লণ্ডনের "ইকনমিষ্ট" দ্য গলের সংস্থানী চিন্তাধারা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "ইহার পরিবর্ত্তে তিনি এমন একটা সংস্থান চাহেন যাহার ভিত্তি হইবে মঁতেস্কিও ও আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তাধারায়। ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বিচার, শাসন ও আইনের তিন বিভাগে সঠিকভাবে ভাগ করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টও জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। ইনি হইবেন শাসনবিভাগের কর্ত্তা এবং এই বিভাগের ক্ষমতার উৎস হইবে জনসাধারণ। ইহা এসেমব্লির দলগত সংঘর্ষের উর্দ্ধে থাকিবে। এপিনালের বক্তৃতায় জেনারেল দ্য গল ইঙ্গিত দিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় যে, তাঁহার মতে এইরূপে গঠিত মন্ত্রীসভা প্রধানতঃ প্রেসিডেন্টের নিকট দায়ী থাকিবে, পার্লামেন্টের নিকট নয়। ইহা হইবে মার্কিন কেবিনেটের একটি সংশোধিত সংস্করণ। বৃটিশ কেবিনেটের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য থাকিবে না, কারণ ইহা পার্লামেন্টের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।" ["He proposes instead a constitution derived from Montesquieu and the Founding Fathers in which a strict separation of powers—judicial, executive and legislative is observed. The Executive, in the person

of thc President elected, like the American president, by the people, would derive its powers from the peoples, will stand above the party strife of the Assembly. General de Gaulle even appeared to suggest at Epinal that the Government should resemble not the British Cabinet with its full parliamentary responsibility, but a modified version of the American Cabinet with its primary dependence upon the President". 5.10.46.] আর দ্য গল নিজেই বলিয়াছেন: "আমাদের মতে, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এক ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিবে—ইহা হইবে একইরূপ চিন্তাধারা দ্বারা সংহত একটা দলের ন্যায়; একটি নেতার অধীনে একই লক্ষ্যসাধনে ব্রতী হইয়া এই দলটি গঠিত হইবে, আর ইঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া ইহা ঐকত্রিকভাবে ন্যাশনেল এসেমব্লির নিকট দায়িত্ব স্বীকার করিবে।" ["In our opinion thc French Government should be as one man—a team united by similar ideas, gathered together for the purpose of common action around one leader and under his leadership, collectively responsible to the National Assembly.") সাত বৎসরের মধ্যে প্রেসিডেণ্টকে সরাইবার কথা উল্লেখ না করাতে এইরূপ গভর্ণমেণ্টের কি পরিণতি হইবে তাহা কল্পনাতীত নহে। "Führer"-নীতি বা নেতাবাদের বিরুদ্ধে যে-প্রবল সংগ্রাম হইয়া গেল তাহাই আবার দ্য গল ফ্রান্সে প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন। রাজনৈতিক অরাজকতা, গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের অভাব, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির দোহাই দ্য গলের পূর্ব্বে অন্য অনেক জবরদস্ত নেতা দিয়া আসিয়াছেন, এবারও দেওয়া হইতেছে।

দ্য গলের পার্লামেণ্টবিরোধী নীতি প্রচারের ভিতর দিয়া একটা সুফল হইয়াছে এই যে, ফ্রান্সের বড় বড় দলের সবাই দেশের "অস্থায়ী" (Provisional) রাজনৈতিক অবস্থার অবসান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন কি দ্য গলের অনুগামী "এম আর পি"-পন্থীরাও ভয় করেন যে, ইহার সুযোগ নিয়া ফ্রান্সে ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গণতন্ত্রবাদের ধ্বংস সাধন হইবে। নিজেদের মধ্যে রফা করিয়া নূতন সংস্থান গ্রহণের ইচ্ছা এই ভীতির পরিচায়ক। পরে অবশ্য "এম আর পি" দলের কেহ কেহ মিলিয়া "Union Gaulliste" নামক আরেকটা দল খাড়া করিলেন এবং তাঁহাদের প্ররোচনায় অনেকে দ্বিতীয় রেফারেণ্ডামে ভোটও দিতে রাজী হইলেন না। তথাপি নূতন-সংস্থান গৃহীত হইল। পরে গত ১০ই নভেম্বর তারিখে এই নব্য ব্যবস্থানুযায়ী যে-সাধারণ নির্ব্বাচন হইল তাহাতে বিভিন্ন দলের নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১)	বামপন্থী-কম্যুনিষ্ট	১৮৩
	,, সোসেলিষ্ট	১০১
		২৮৪
(২)	দক্ষিণ পন্থী-"এম আর পি"	১৬০
	,, "পি আর এল"	৩৬
	,, "য্যুনিওঁ গলিসৎ"	৯
	স্বাধীন রিপাব্লিকান	২৩
	প্রজা পার্টি	৯
	অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদল	৭
		২৪৪
(৩)	বিবিধ—	২৬

কিছুকালের জন্য বিপদ কাটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ফ্রান্সের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের সমাধান এখনও হয় নাই। দেশের শ্রেণী-সংঘর্ষের তীব্রতা বরঞ্চ বাড়িয়াছে। দ্য গল যতদিন কোন বিশেষ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হইবেন ততদিন তাঁহার প্রভাব ফরাসীজাতিকে নির্ম্মমভাবে বিভক্ত করিতে থাকিবে। প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এই পরিস্থিতির যথাযোগ্য সুযোগ নিতেও ছাড়িবে না। ক্যাথলিক চার্চ "এম আর পি" দলের ভিতর দিয়া একদিকে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে বিপ্লবের পথ হইতে ভ্রান্ত করিতে সমূহ চেষ্টা করিতেছে, আর অন্যদিকে প্রগতিশীলতার মুখোস পরিয়া বামপন্থীদের ভুলাইতে চাহিতেছে। "এম আর পি" নির্ব্বাচনে নামিল একটা প্রগতিশীল কর্ম্মতালিকা নিয়া এবং বামপন্থীদের কথার মারপ্যাঁচে ফেলিয়া পরাজিত করিতে বদ্ধপরিকর হইল।" ["The MRP went into the election on a progressive programme designed to outplay the Left at its own game." *Economist*, 23.11.46.] কিন্তু নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে বুঝা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণী এই প্রতারণায় ভুলে নাই। দেশে "প্রগতিশীল ক্যাথলিক" ও সোসেলিষ্ট দুই দলেরই প্রতিষ্ঠা কমিয়াছে। অন্যদিকে সোসেলিষ্ট নেতৃবৃন্দের ও তাঁহাদের অনুগামীদের মধ্যে মতের তফাৎ ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছে। মঁসিও ব্লুমের "মানবীয়" (humanist) দৃষ্টিভঙ্গী আর শ্রমিকশ্রেণীকে তৃপ্ত করিতেছে না। "ইহা সব সময়েই জানা ছিল যে, শ্রমিক ভোটদাতারা এবং কৃষক সম্প্রদায়ের অনেকেই দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে ভোট দিবে না। তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর কাহাদের দিকে ইহারা ভোট দিবে? ইহারা "এম আর পি"কে ভোট দিতে পারিত সত্য, কিন্তু তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব ও পোপের আধিপত্য মানিয়া লইয়াছে। কার্য্যতঃ ইহার দুইটির কোনটাই ইহারা স্বেচ্ছায় মানিবেনা। আবার যদি

ইহারা রাসাম্ব্লেমাঁ দে গোশের কতিপয় সভ্যকে ভোট দিত তাহা হইলে প্রমাণিত হইত যে, ইহারা তৃতীয় রিপাব্লিকের বিপর্য্যস্ত পুত্তলিকাদের উপর এখনও আস্থা হারায় নাই। সাধারণ লোকের পক্ষে আসলে সম্মুখের দিকে না তাকাইয়া গত্যন্তর নাই। সুদিনের জন্য ইহাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। অতীতের দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া ইহাদের দুঃখের বোঝা বাড়াইয়া লাভ নাই। অবশেষে ইহাও সত্য যে, ইহারা সোসেলিষ্টদের পক্ষেও ভোট দিতে পারিত। ইহাদের অনেকে, যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প-সংখ্যক লোক, ইহাদের পক্ষে ভোট দিয়াও ছিল, তথাপি ইহারা জানিত যে, তাহারা এমন একটি দলের পক্ষে ভোট দিতেছে যাহাদের কম্যুনিষ্টবিরোধ এবং (গৌণতঃ) পুরোহিতবিরোধ ছাড়া কোন পজিটিভ প্রোগ্রাম নাই। লোকে আজ নঙর্থকনীতির জন্য ভোট দিতে নারাজ। এই কারণে তাহারা কম্যুনিষ্টদের পক্ষে ভোট দিয়াছে। তাহারা বুঝে যে, ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী নূতন রকমের, ইহারা মানুষকে সত্যকার মূল্য দিতে জানে এবং ইহারা মানুষের চেষ্টায় সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করে।" ["The working-class electorate would not vote Right, nor would a wide cross-section of the peasantry : so much was always certain. For whom then could they vote, if not for Communist candidates ? They might have voted M R P but that would imply middle-class leadership and Vatican influence, neither of which they would willingly accept. If they voted for the few candidates of the *Rassemblement des Gauches*, they might subscribe to the overturned idols of the Third Republic. But the people are impelled to look forward, to believe in better times rather than in a repetition of twice-told miseries. Lastly, they might have voted Socialist. Many, but fewer than before, did, but even these would be aware that they were voting for a party with no positive programme, but anti-Communism and (secondarily) anti-clericalism. People are reluctant to vote in a negative sense. So they voted for the Communists because they believed they offered a new approach to life, and a doctrine of human values and belief in human organisation". Cf. "Communism in France," *Economist*, 23/11/46.]

গত শতাব্দীতে প্যারিস-কম্যুনে শ্রেণীসংঘর্ষের যে-নমুনা দেখা গিয়াছিল তাহা আজকার পরিস্থিতিতে ফলাও হইয়া দেখা দিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতার পরিধি

তখন ক্ষুদ্র ছিল; আজ তাহা দেশব্যাপী। বলা বাহুল্য, ফরাসী জাতি আজ এক ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন। শ্রেণীযুদ্ধে কে জয়ী হইবে—ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণী না নবজাগ্রত শ্রমিক শ্রেণী? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার এখনও সময় হয় নাই।

সংশোধন—গত বারের প্রবন্ধের শেষ দিকে "এমিগ্রাঁ"র পরিবর্ত্তে "এমিগ্রে" হইবে।

অভিভাবক

রশীদ করীম

নিরিবিলি নিজ কামরায় বসে পড়ছি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এত পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন বলে মনে মনে কর্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত দিচ্ছি এমন সময় সহপাঠী ইরশাদের প্রবেশ। সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। সময়টা কারও বাড়ীতে বেড়াতে আসার পক্ষে ঠিক উপযোগী ছিল না। ইরশাদ কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল—'আমাকে আব্বা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন; তুই আশ্রয় না দিলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা নেই।' ইরশাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নির্লিপ্ত, যেন বাড়ী থেকে বিতাড়িত হবার মত স্বাভাবিক ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। কারণ অনুসন্ধান করলে সে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে পকেটের ভিতর থেকে একটা খাতা বের করল। সেটা আমার হাতে সমর্পণ করে ইজিচেয়ারে সটান শুয়ে পড়ল, তারপর চোখ মুদল। খাতাটার উপর দিয়ে একবার ত্বরিতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম পাণ্ডুলিপিটা ইরশাদের ডায়েরী। অল্পক্ষণেই ইরশাদের লেখায় মশগুল হয়ে গেলাম। সে লিখেছে—

আমার আত্মীয় স্বজনেরা অভিযোগ করেন আমি বাপ-মার প্রতি প্রাপ্য-সম্মান প্রদর্শন করি না। সন্তানের শ্রদ্ধায় বাপ মার অবিসম্বাদিত দাবী আছে, তাও নাকি তাঁরা আমার কাছ থেকে পান না। সম্মান প্রদর্শন বাহ্যিক লৌকিকতা মাত্র, অতএব আমার ব্যবহারে সেটার অভাব ঘটলে, আত্মীয় স্বজনের, বিশেষ করে বাপ মার ক্ষুণ্ণ হবার কথা। কিন্তু শ্রদ্ধা অন্তরের জিনিষ, দাবী করলেই পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে নিতে হয়, এমন কি বাপমাও শুধু সম্পর্কের জোরেই শ্রদ্ধেয় হতে পারেন না। অকৃত্রিম

শ্রদ্ধা লাভ করবার জন্যে তাঁদেরকেও সতর্ক থাকতে হয়, নিজের দুর্ব্বলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। বাপ যদি স্খলন পতনের জন্য ছেলেকে তিরস্কার করতে পারেন, ছেলে কেন বাপকে পারবে না ?

অল্পবয়স থেকে আমাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে কয়েকটা প্রথাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরে নিয়েছি। যথা, বাপমাকে ভক্তি করতে হবে, ধর্ম্ম না মানলে জাহান্নামে যেতে হবে, বিধর্ম্মীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে কাফের বলতে হবে—আরও কত কি। কিন্তু এই আপ্তবাক্যগুলি কতদূর সত্য আমরা ভেবে দেখেছি কি ? আমার বাপ যদি বর্ব্বর হয় ? বিধর্ম্মী বন্ধু যদি অতিশয় ভদ্রলোক হয় ? আর ধর্ম্ম ?—যাক্। ধর্ম্মের কথা যাক্।

আমার পিতৃদেব তো আর একটা আইডিয়া নন, তিনি একজন ব্যক্তি। অতএব তাঁর চরিত্রে দোষ থাকা মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয়, বরং না থাকাটাই পরম বিস্ময়কর। ছেলে কি অন্ধ যে বাপের চরিত্রের দুর্ব্বলতা তার চোখে পড়বে না ? না দেখবার ভান করে সে কি সুখ পায় ?

আমার আব্বা মোটের উপর অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি, বস্তুতঃ ওঁর মত সজ্জন খুব কমই আছে। কিন্তু বাপ হলেও, যেহেতু তিনি রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষও, তাঁর চরিত্রে ত্রুটি না থেকে পারে না। সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে আব্বার দিন কাটে চেয়ারে বসে পা নাড়াতে নাড়াতে ও তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিজনদের তম্বী করে। রাজকর্ম্মচারী হিসাবে তিনি প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন, আর সেই শক্তি প্রয়োগ করতেও কখনো কার্প্পণ্য করেন নি। তাঁর চোখের ইষৎ কম্পনে শত শত অপরাধীর হৃদকম্প হত, কলমের এক এক আঁচরে হতভাগ্যরা জেলে যেত, ভাগ্যবানরা হাজত থেকে মুক্তি পেত। শক্তি নিয়ে খেলা করা তাই আব্বার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল্। তাই যেদিন তিনি জেলার শাসনভার এক ইংরাজ কর্ম্মচারীকে বুঝিয়ে দিয়ে পেনসন ভোগ করতে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর স্বগ্রামে ফিরে এলেন সেদিন তাঁর চোখে পাণি। শ্বাসরুদ্ধকর খাটুনীর মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে তিনি পারওয়ারদেগারের কাছে এই মোনাজাত করেছেন, 'হে গফুফর রহিম, আমি যেন এমনি শান্ শৌকতের মাঝে মরতে পারি। জিন্দেগীর এই একমাত্র আরমান ছাড়া আর কিছু বাকি নেই।' কিন্তু তার মোনাজাত নামঞ্জুর হল। তাই খোদার বিরুদ্ধে তাঁর ফরিয়াদ—'হে খোদা, কাফেরদের কঠোর শাস্তি দিয়ে, দুশমনদের শায়েস্তা করে, পাঁচ ওয়াখত নামাজ পড়ে আমি তোমার খেদমত করেছি অথচ প্রতিদানে এই দিলে।'

গ্রামের লোকে আব্বাকে একজন কৃতিসন্তানরূপে সমীহ করে, কিন্তু কৈ, ভয়তো করেনা? শুধু সমীহে আব্বার মন ওঠে না। শাসনদণ্ড চালিয়ে আব্বার মন এমন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে তিনি মনে করেন, তাঁকে ভয় না করলে, ভয়ঙ্কর একটা কিছু না ভাবলে, তাঁর মূল্য সঠিক নিরূপিত হয় না। তাঁকে ভয়ঙ্করের নেশায় পেয়েছে। তাই বাড়ীর লোকজনদের উপরেই তিনি শক্তির সমারোহ চালান। তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাড়ীর সকলে তটস্থ। কুকুরটা পর্য্যন্ত ঘেউঘেউ করে না—টিকটিকিগুলি আওয়াজ করতে ভয় পায়—এমন কি মনে হয় বুঝি ঘড়িটারও দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে আব্বাজানের রক্তের সম্পর্ক, তাই দয়াবশত তিনি আমাদেরকে অপেক্ষাকৃত কৃপা দেখান। কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, বা কারও সঙ্গে প্রেম করলে, অথবা গান বাজনায় আসক্তি দেখালে তার পরিণাম যে ভাল হবে না, সে কথা আমরা বহুবার শুনেছি। এই তিনটির একটিতেও ধর্ম্মের সম্মতি নেই। অথচ আমি আসেমাকে ভালবাসি ও বিয়ে করতে চাই। তাই আমার উপর আব্বার শনির দৃষ্টি পড়েছে। তিনি বলেন, 'বিয়ে করতে চায় করুক, কিন্তু ভালবাসার কথা বললে গলা টিপে দেব!' তাঁর ধারণা, যখন আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি তখন আমার চরিত্রের আর কিছু বাকি নেই। আসেমাকে আমি একটা প্রেমপত্র লিখেছিলাম, সেটা কি করে যেন আব্বার হাতে পড়েছিল। প্রতিকার করতে আব্বা আমাকে জুতোপেটা করেছিলেন। ভাগ্য বলতে হবে, কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকার প্রচলন আর নেই। পরে অবশ্য আমাকে শান্ত করবার জন্য আব্বা আদর করে বলেছিলেন, 'তোর জন্য একটা রাঙা টুকটুকে বউ দেখে আনব।'

আগেই বলেছি, না, আব্বা লোক খুব ভাল।

একজন সিদ্ধহস্ত কথাশিল্পীর হাতে পড়লে আব্বা একটা অনবদ্য চরিত্র হতে পারেন, কিন্তু তাঁর মত লোক সংসারের পক্ষে বিপজ্জনক।

কলেজের এক হিন্দু বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অত্যন্ত অমায়িক ও শিক্ষিত ছেলে। দুই ছাত্রবন্ধু মিলিত হলে সাহিত্যপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য ভাবেই এসে পড়ে। বিশেষ করে অশোক ও আমার মত টমাস হার্ডীর ভক্ত সচারচর দৃষ্টিগোচর হয় না। জীবন সম্বন্ধে টমাস হর্ডীর দৃষ্টিভঙ্গী আমরা অলোচনা করছিলাম। নির্দ্দয় নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসকে উপহাস করছিলাম ও ধর্ম্মকে তূলাধূনা করে ছাড়ছিলাম। আব্বা যে দরজায় কান পেতে আমাদের আলোচনা শুনতে পারেন সে সম্ভাবনার কথা একবারও আমার মনে উদিত হয়নি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ তিনি ঘরে প্রবেশ করেন ও অশোককে সম্বোধন করে বলেন, 'দু পাতা ইংরিজি পড়ে খুব সায়েব হয়ে গিয়েছ না? ধর্ম্ম মান না। সাধে তোমাদেরকে কাফের বলে!'

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য অশোক একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে হতভম্ব হয়ে একবার আমার, একবার আব্বার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। যেন কিং কর্ত্তব্য স্থির করতে পারলে না। কিন্তু কর্ত্তব্য যে কি আব্বাই বলে দিলেন,—'ঐ যে সামনে দরজা দেখছ, সোজা বেরিয়ে যাও।' অশোক যথা আজ্ঞা পালন করল।

সেই থেকে অশোকের সঙ্গে আমার চিরকালের মত বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

আর একদিনের কথা বলছি—

রমজান আমাদের বাড়ীর এক ভৃত্য। বেচারা দেখতে যাকে কিন্নর বলে তেমন কিছু নয়। কি করেই বা হবে? যার খাটুনির কোনও বিরাম নেই, শরীরের উপর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নামক তিনটা ঋতুর ত্রিবিধ প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হবার যার কোনও অধিকার নেই, রোগে হোক স্বাস্থ্যে হোক যাকে খাটতেই হবে, না খাটলে রুটির পরিবর্ত্তে বেত খেতে হবে, সে রূপকুমার হবে প্রত্যাশা করার মত কুৎসিত রসিকতা আর কি হতে পারে? রমজানের কেশগুচ্ছ ওপরের দিকে সাঁড়াশির মত তোলা, বেশ থেকে বহুদিনের পচা মাংসের গন্ধ বার হয়, চোখ দুটি কোটরের দিকে এত বেশী ঢোকা যে আছে কি নেই ঠাহর করে দেখতে হয়। আব্বা ঠিকই বলেন, রমজানকে দেখে দিল্ ঠিক তর্ হয়ে যায় না। আব্বা আরও বলেন, রমজান দেখতে ভূতের মত, কারণ তার মনটা শয়তানের মত।

বাড়ীর একটা মুরগী হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল। গোলমাল করে আব্বা বাড়ী মাথায় তুললেন। শেষ পর্য্যন্ত স্থির করলেন, মুরগীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে নিশ্চয়ই রমজানের কোনও যোগাযোগ আছে।

সমস্ত বাড়ীটাকে প্রকম্পিত করে আব্বা হাঁক দিলেন, 'রমজান!'

এই ডাকটার সঙ্গে রমজান অত্যন্ত পরিচিত। কেয়ামতের দিনে ইজরাইলের শিঙাকেও বুঝি সে এত ভয় করে না। বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে রমজান সামনে এসে দাঁড়াল।

আব্বার ক্ষুদ্র চোখদুটি তখন জ্বলজ্বল করছে, রাগে পা টলছে, সমস্ত শরীর থর্থর করে কাঁপছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখের অভিব্যক্তি আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। তাঁর সেই মূর্ত্তির সামনে আসতে অতি বড় সাহসীরও ভয়ে বুক কাঁপবে। বেচারা রমজান তো জুজুর ভয়েই কম্পমান!

—'হারামজাদা, মুরগী কোথায়?'

—'জী, আমি তো জানিনা!'

—'জী, আমি তো জানি না! ব্যাটা ন্যাকা সাজছে।' আব্বার দৃষ্টি রুক্ষ থেকে হয় রুক্ষতর, পেশীগুলি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর।

ভয়ে রমজানের বুক কাঁপতে থাকে, পরে মনে হয় বুঝি জমিনও টলছে। নইলে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে কেন ?

—'কোথায়, উঁ, কোথায় ?'

মুরগীর হদিস রমজান জানে না, কিন্তু এটা সহজেই বুঝতে পারে যে নেতিবাচক উত্তর মুনিবের মনঃপুত হবে না। তাই নিরুত্তর থাকাই সে স্থির করল। রমজানের নীরবতাকে আব্বা তার অপরাধের স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিলেন।

প্রবল চপেটাঘাতে রমজান চোখে আঁধার দেখে ঘুরে পড়ল।

এরই তিনদিন পর মুরগীটাকে মৃতাবস্থায় কলাগাছের তলায় পাওয়া গেল। বিড়ালের নখের আঁচড়ে মুরগীটার সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। বিড়াল রক্ত চুষে মাংস খেয়ে কিছুটা চামড়া ও অনেকটা পালক পরিত্যাগ করে পালিয়েছে।

আব্বা বুঝলেন, এ মানুষের কাজ নয়।

রমজান শয়তান হলেও, এতটা শয়তান হতে পারে না।

অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে আব্বা ডাক দিলেন, 'রমজান !'

এই আহ্বানও রমজানের সুপরিচিত।

—'জী হুজুর যাই !'

আব্বা গভীরকণ্ঠে দুঃখপ্রকাশ করেন, 'তোকে মিছিমিছি মেরেছিলাম রে !'

মুনিবের পায়ের ধূলা নিয়ে একগাল হেসে রমজান উত্তর দেয়, 'ছিঃ হুজুর, দুঃখ করবেন না। আপনাদের লাথি ঝাঁটা খেয়েই তো আমরা মানুষ। খোদার কাছে হাজার শুকুরগুজারী করি, আপনার মত মুনিব পেয়েছিলাম !'

ইরশাদের ডায়েরী এখানেই শেষ হয়েছে। তার লেখা ও ব্যক্তিত্ব আমার মনে ঠিক কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আজও বলতে পারব না।

কিন্তু এই ঘটনার তিন মাস পর সে হঠাৎ এক রাত্রিতে আত্মহত্যা করল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তার মত স্বাধীনচেতা ছেলের পক্ষে কারও গলগ্রহ হয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়। আমার আত্মীয়েরাও নানা কারণে তাকে পছন্দ করতেন না।

ইরশাদের মৃত্যুর পর থেকেই না কি তার আব্বার মাথার গোলমাল শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন তিনি কেমন আছেন জানি না। জানবার আগ্রহও বেশী নেই।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বদেশী মোক্তার মানে বিনি পয়সায় ব্যবসা করেন নাকি? না, শুধু স্বদেশী মোকদ্দমার আসামীদের পক্ষ নেন?

আদতে ওসব কিছুই নয়। স্বদেশী মোক্তার মানে মোক্তার বটে, কিন্তু মোক্তারি করেননা, শুধু তদবির করেন। জানেন সব তদবিরের ঘাঁতঘোঁত।

সরকারী মহলের এমন দু-একটি তাঁবেদার, হয় উকিল নয় মোক্তার, চেনা যায় প্রায় প্রত্যেক সদরে-মফস্বলে। উপরালার সঙ্গে খাতির জমায়, দহরম-মহরম করে। ধামাটা-ঝুড়িটা এগিয়ে ধরে। যত সরকারী খিটকেল তার ঝঞ্ঝাট পোহায়। কোথায় কি কৃষি-প্রদর্শনী হবে তার মেরাপ-বাঁধে। কোথায় কোন সভায় কে বক্তৃতা দেবে পাড়াগাঁ থেকে শোনবার লোক ধরে আনে। কোথায় কার বদলিতে পার্টি হবে তার ফুলের মালা জোগাড় করে, নাম-লেখা কেক আনে আর খণে-খণে হ্যাসাগে পাম্প করে সভার জেল্লা বাড়ায়। সরকারী সকল ঘটে আম্রপল্লবটি হয়ে আছে। কিংবা কলসীর নিচে হয়ে আছে খরের বিড়ে। রাব-দাব খুব, খুব চৌচাপট। মামলায় নেই কিন্তু তদবিরে আছে; সওয়ালে নেই, কিন্তু আছে সুপারিশে। সামনে থেকে পেশ নয়, পাশের থেকে পেশ। তোমার কি চাই? লাইসেন্স? নমিনেশ্যন? তোমার? তুচ্ছ একটা জামিন?

সব জায়গায়ই দেখতে পাবেন একটি-দুটি। এক কথায়, বেসরকারী বাজার-সরকার। দরবারে-কারবারে কোটের উপর মেডেল ঝোলায় আর মাথায় শামলা আঁটে। সবজায়গায়ই আছে, না থাকলে গভর্ণেমেন্ট চলে না। অমুক জায়গায় অমুক বাবু, তমুক জায়গায় তমুক বাবু, এই শহরের ভোলা বাবু।

'ভোলাদা ছাড়া কেউ কিছু সুবিধে করতে পারবে মনে হয়না। সেই কলেক্টরের বাড়ির চুরি তো?'

'হ্যাঁ।' তামসী চোখ নামাল।

'মোটা হাতে কিছু টাকা নেবে ভোলাদা, কিন্তু ঠিক জামিন করিয়ে দেবে। কলেক্টরকে বললেই টাউন-জামিন দিয়ে দেবে ঠিক। তা, টাকা আছে তো আপনার কাছে?'

'আছে। অসাধ্য না হয়, দেয়া যাবে।'

'আপনার কে হয় ?' তামসীর চোখে চোখ রাখল নারায়ণ।

'বিশেষ কেউ নয়। এমনি চেনাশোনা—'

'বিশেষ কেউ হলেও লজ্জিত হবার কিছু নেই, মরতে যে বসেছে তার লজ্জার চাইতে তাকে যে বাঁচাতে চেস্টা হচ্ছে তার গৌরবটাই দেখবার মত। আত্মহত্যা এক জিনিস, আত্মদান আর-এক।'

হৃদয়ের গভীরে এসে সুর লাগল। কে এই লোকটি ?

লোকটি ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে। কারু যদি কোনো উপকারে আসে তারই উপায় খুঁজে বেড়ায়। আর, বলুন, পরের কাজ করা মানেই দেশের কাজ করা। আর, এমন মজা, যাদের বলছি পর, তারাই আমার আপন। এই সব চাষা-ভুষা, মুনিষ-কিষান, মুটে-মজুর। যারা ইতর, যারা অধম, যারা গরিব।

আর, ভুলে গেছি বলতে, যারা আসামী। যারা রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

তামসী হেসে ফেলল।

কিন্তু ভোলাদার হাসি মুখ ছেড়ে সমস্ত টাকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। এত দিন যে কেন আসেননি আপনারা তাই বুঝতে পারছিলাম না। এই দুর্যোগে আমি ছাড়া আর সঙ্কট-ত্রাণ কোথায় ? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আমাকে লোকে এখানে মোক্তার বলে না, ব্যালিষ্টার বলে। কেন বলে ? শুধু কলেক্টরের কাছাকাছি আছি বলে। কলেক্টরের কাছে গিয়ে তাক বুঝে এক টাক হাসলেই জামিন করিয়ে আনতে পারব। আর, আমার হেপাজতে থাকাও যা হাজতে থাকাও তাই। সেকেণ্ড অফিসারের ঘরে মামলা, চাই কি, একটু কষামাজা করে খালাস করিয়েও আনতে পারি হয়তো। তামসীর বুকের শিরাগুলো শিরশির করে উঠল। হ্যাঁ, পঞ্চাশটাকা রাখুন, তার এক ক্রান্তি কম নয়। যত টাকারই মুচলেকা হোক, আমার ঐ বাঁধা গৎ। নামে যেমন আমি ভোলা, কাজেও তেমনি আত্মভোলা মানে স্বার্থভোলা।

নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে সাহস খুঁজল তামসী। পাঁচটি দশ টাকার নোট নয়, বুকের থেকে পাঁচখানি পাঁজর খুলে দিল। বললে, 'কোর্টে আমাকে যেতে হবে ?'

না, না, আপনি যাবেন কেন ? আপনি উঠেছেন কোথায় ? নারানের আস্তানায় ? হরি ঘোষের গোয়ালে ? যেখানেই উঠুন, বিকেলে বেড়াতে-বেড়াতে আসবেন একবার এখানে। এসে দেখবেন আপনার লোক আপনার জন্যে ঠায় বসে আছে পথ চেয়ে। নারানের যেমন একটি গোয়াল আছে, আমার তেমনি একটি খোঁয়াড় আছে। টাউন-জামিন হয়ে যাদের ছাড়িয়ে আনি তাদের আখড়া। আপনার সঙ্গে আপনার লোকের

কি সম্পর্ক জানিনা, যদি তেমন কিছু হয়, এক সঙ্গে এক ঘরে থাকবারও বন্দোবস্ত হতে পারবে। অনেক টাউন-জামিনের জন্যে বাড়ি থেকে স্ত্রী আনিয়ে দিয়েছি। তার জন্যে অবিশ্যি আলাদা কি আছে—'

নারায়ণের চোখদুটো বিরক্তিতে বিষাক্ত হয়ে উঠল।

'কথাটা কিছু মন্দ বলিনি হে সন্নেসিঠাকুর। স্ত্রী অর্থ ই স্ত্রীলোক নয়। পত্নী-ভার্যাও বোঝায়। টাউন-জামিনে থেকে মন যখন বিগড়ে যায়, আবার চুরি-ডাকাত্তির দিকে ঝোঁক পড়ে, তখন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে এক রাত্তির থাকতে দিয়ে বিষ কাটাই। আমার এটা শুধু জেলখানা নয়, এটা হাসপাতালও। বাঁধি-ধরি, আবার চিকিৎসা করি। তুমি কি বুঝবে স্ত্রীলোকের কুদরৎ ?'

'আচ্ছা বিকেলে আসব।' তামসী বললে সুখস্বপ্নের চোখে।

'একসঙ্গে এক ঘরেই থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইচ্ছে করলে আপনারা এখান থেকে চলেও যেতে পারেন আপনাদের খোদ বাড়িতে। নারান যখন আপনাদের মুরুব্বি তখন আর কোনো ভয় নেই। আর, ভয় করব কাকে ? কলেক্টরের এলেকা জেলা, আর আমি যে টাউনের জামিনদার তার এলেকা মাপবার আমিন হয়নি বাংলা দেশে। শুধু তারিখের দিন একবার হাজির হলেই হল। নয়তো জমকালো লেটার-হেড-ওলা একটা ডাক্তারী ফারখত।'

বিশ্বাস করবে কিনা কে জানে, ফিরে আসতে-আসতে নারায়ণ বললে, 'যদি পারে ভোলাদাই পারবে। আর যদি না পারে টাকা নিয়ে তাকে সটকাতে দেব না।'

'না, না, টাকা যাক। টাকা ফেরৎ চাই না আমি। আমি ফেরৎ চাই—'

কথাটা শেষ করতে পারল না তামসী। কী ফেরৎ চায় ? ফেরৎ চায় রণধীরকে ? না, সেই তাদের পরিচ্ছন্ন অতীত, যখন দেখা যায়নি এই বর্তমানের চেহারা! সেই তাদের জীবনের প্রথম একমেটে গড়ন।

রোদ চড়ছে। নারায়ণ বললে, 'কোথায় আছেন ?'

'এই এক বন্ধুর বাড়িতে।' তামসী প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে গেল। 'আমাকে একটা গাড়ি ডাকিয়ে দিন। অনেক উপকার করেছেন আমার।'

গাড়ি করে লক্ষ্যহারার মতো ঘুরল এখানে-ওখানে। কোনো চিন্তার স্পষ্ট একটা ছবি ফোটাতে পারলনা মনের মধ্যে। সমস্তই হয়তো একটা ছলনা এই সন্দেহের দুয়ার খোলা গেলনা কিছুতেই। দেখা গেল না ঘরের মধ্যেকার সম্ভাবনার মূর্তিকে। অল্প-অল্প খোলে, প্রতিমার ডাকের গয়না ওঠে একটু ঝলমল করে, আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

'চলো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি।' গাড়োয়ানকে চমকে দিয়ে হেঁকে উঠল তামসী।

'তোর জন্যে বসে আছি।' দেবিকা বেরিয়ে এল। 'কোথায় ছিলি এত বেলা ?'

'শহর দেখছিলুম ঘুরে-ঘুরে।'

'আমি ভাবছিলুম রণধীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নাকি রাস্তায় !' নিষ্ঠুরের মতো দেবিকা সূক্ষ্ম করে একটু হাসল। 'পরে ভাবলুম, তা কি করে হয়, জেলের চাবি তো আমার আঁচলেই বাঁধা, গোছা খুলে নিয়ে যেতে পারিসনি ছিনিয়ে। পরে মনে হল, চলে গেলি নাকি ?'

'ট্রেন তো রাত্রে।'

'দেখলুম মাল দুটো পড়ে আছে। ভাবলুম তবে নিশ্চয়ই একবার ফিরে আসবি।' দেবিকা আরেকটা হাসির কণ্টক ফোটালো। যেন রণধীরকে সে ছাড়তে পারে কিন্তু এই মাল দুটো ছাড়তে পারে না।

স্নান করে খেয়ে অন্যমনা হয়ে চুপচাপ ব'সে ছিল তামসী। একটি সামান্য বিকেলের জন্যে কোনোদিন তার এত উৎকণ্ঠা হয়নি। বাইরে নিশ্চল রোদের দিকে তাকিয়ে আছে সে শূন্য চোখে। একটা নেশার মত লাগছে। সামান্য রোদ যে এত সুন্দর লাগে তা কে জানত।

দেবিকা পাশের ঘরে বসে উল বুনছে। তামসীর সঙ্গ ক্লেশকর হয়ে উঠেছে। যত কথাই সে বলুক না কেন, যতই ঘরোয়া বা হালকা, সব কথার অন্তরালে একটা ভিক্ষার কাতরতা সে শুনতে পায়। শীতের হাওয়ার মধ্যে যেমন মুমূর্ষু পাতার মর্মর থাকে প্রচ্ছন্ন হয়ে। আর যদি তামসী মুখ বন্ধ করে থাকে, সে স্তব্ধতাটা তো স্পষ্ট একটা কষ্টের মত, রাগের মত মনে হয়। কী অন্যায়, কী অবিবেচক ! বন্ধুতার জন্যে অকর্তব্য করতে হবে। মামলায় বস্তু নেই তবু জিতিয়ে দিতে হবে উকিলের খাতিরে। এমন কথা বলতে লজ্জায় ওর জিভটা অসাড় হয়ে গেল না ? ছি ছি ছি ! যে চোর, তার কোমরে দড়ি না দিয়ে গলায় বরমাল্য দিতে হবে ? কথা বলবার আর জিনিস পেল না ও ? তার চেয়ে ও টাকা চাইত, সুপারিশ চাইত, চাই কি চাকরি চাইত। তা না, মেয়ে চেয়ে বসল কিনা সিঁদেল এক চোরকে। ঘৃণায় সারা গা ঝলসে যাচ্ছে দেবিকার। সংসারে আজ মানুষের কত কাজ, কত চিন্তা, তার মধ্যে কিনা জেগে বসে কেউ প্রেমের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছে ! দেশের জন্যে সংগ্রামে মানুষের আজ কত কঠিন হবার কথা, কত অনম্র। তার বদলে এই বিলাস, এই অস্বাস্থ্য। আইন ও শৃংখলার হাবেলিতে বসে এই দুর্বলতা বরদাস্ত করা যাবে না। উলের কাঠি দুটো দ্রুতবেগে নড়তে লাগল দুই হাতে। যদি পারত, দেবিকা এখুনি এক ফুঁয়ে দিনের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দিত। রাত্রের ট্রেনে এখুনি রওনা করিয়ে দিত তামসীকে।

কিন্তু দুপুর থাকতে-থাকতেই নীলাচল বাড়ি ফিরে এসেছে।

'তোমার সেই আসামীর আজ জামিন হয়ে গেল।'

'কোন আসামীর?' হাতের সেলাই বন্ধ হয়ে গেল দেবিকার।

'যে তোমার ঘড়ি-কলম চুরি করেছিল—'

'তাকে তুমি জামিন দিলে?' চেয়ার থেকে এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠল দেবিকা। 'তার মানে? তোমার এই মতিচ্ছন্ন হবার কারণ কি? তোমার কাছে নিরিবিলিতে গিয়েছিল বুঝি তদবির করতে?'

'কী বলছ তুমি?' নীলাচল কিম্ভুতের মত চেয়ে রইল।

'একটা মেয়েমানুষের কান্নায় তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে গেলে? এক চোর ঢুকে জিনিস চুরি করে নিল। আরেক চোর এসে মন কেড়ে নিল তোমার? কেন, চেহারাটা কি খুব মনে ধরেছে? কালো রঙে চেকনাই ফুটেছে খুব?' দেবিকার একেবারে খাণ্ডারমূর্ত্তি।

'এর মধ্যে মেয়ে-টেয়ে কোথায়? ভোলাবাবু এসে জামিন দাঁড়ালেন, মনসিজবাবুকে ডেকে বলে দিলুম মঞ্জুর করে দিতে। এ শহরে ভোলাবাবুর জামিন বাতিল হয়নি কোনোদিন।'

'সত্যি বলছ, তামসী যায়নি তোমার কাছে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খায়নি? কান্নাকাটি করেনি তোমার হাতে ধরে?'

'কে তামসী? তোমার বন্ধু? যে এসেছে তোমার বাড়ি? সে যাবে কেন? সে আসামীর কে?'

'সে আসামীর মাসতুতো লাভার। মানে দুজনেই চোর। একজনের চোখ বোঁচকার দিকে, আরেকজনের চোখ—' দেবিকা তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল স্বামীকে: 'বুঝতে আমার কিছু দেরি হয় না।'

'যাও, যাও।' নীলাচলও ঝাপটা মেরে উঠল: 'বুঝতে আমারো দেরি হয় না। তুমিই তোমার সখির বৃন্দে-দূতী সেজেছ। তুমিই তাকে টাকা দিয়েছ, ভোলা ঘোষের খোঁজ দিয়েছ। নইলে নতুন এসে ভোলা মোক্তারের সে টিকি ধরে কি করে? সে হাড়ে-টক বদমায়েসের টাকার খাঁই তো আর কম নয়। এদিকে তো শুনেছিলুম তোমার সখি অভাবের লোক, অনটনে টনটন করছে—'

সেই তো কথা। অভাবেই তো লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। তারপরে ভাসাজাল ফেলে অনেকেই বসে আছেন যদি ভেসে-চলা কোনো মেয়ে আটকায়। আর ও সব ভেসে-চলা মেয়েরও কোনো ভাল-মন্দ ভেদ নেই, বাস্তু-উটকো বিচার নেই, নরম-গরম তারতম্য নেই—

তাই তো নিজে সেধে খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছ। চোরকে ধরিয়ে দিয়ে

চুয়নীর সঙ্গে গলাগলি হয়ে কাঁদতে বসেছ। নইলে জেনে-শুনে আসামীর তদবিরকারকে তুমি জায়গা দাও কেন? বুদ্ধির ডগা তোমার এত ভোঁতা হয়ে গেছে? পেটের বিদ্যে সব নিংড়ে দিয়েছ?

এ নিয়ে কোনো মীমাংসা হওয়া কঠিন। দু জনেই তুমুল গজরাতে লাগল। কিন্তু একবিষয়ে দুজনের বিন্দুমাত্র দ্বিমত হলনা। ঘরের শত্রু বরযাত্রকে তখুনিই বিদেয় করে দিতে হয়।

তামসীর চোখে একটু ঢুল লেগেছিল। এরি মধ্যে, এক নিশ্বাসের মধ্যে, সে আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখে উঠেছে। যেন এক সুনীল সমুদ্রে সে স্নান করতে এসেছে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, তৃণতরু নেই। সে আর শুধু ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ। এক-এক করে সে গায়ের জামা আর কাপড় খুলে ফেলল। ঝাঁপ দিল সেই নীল জলে, অতলস্পর্শ মৃত্যুতে। হঠাৎ চেয়ে দেখল, আর জল নেই, সে মাটির উপর শুয়ে আছে একাকী। শুষ্ক, নিঃসঙ্গ মৃত্তিকা। একটা লজ্জা, একটা ক্ষুধা এসে আচ্ছন্ন করল তাকে ধীরে ধীরে। দেখল মাটির ঘাস সহসা দীর্ঘাকার হয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে, ঢেকে ফেলেছে, লুকিয়ে ফেলেছে।

'আর কেন, যাও এবার নিধুবনে, তোমার কেষ্টঠাকুর ছাড়া পেয়েছেন।' দেবিকা তামসীর ঘরে ঢুকে প্রায় তার মুখের উপর চাবুক মারল।

তামসী হাসল। বললে, 'আমার সঙ্গে দুটো মাল আছে। দয়া করে একটা গাড়ি ডাকিয়ে দে শিগগির। যত তাড়াতাড়ি গাড়ি আনাতে পারবি তত তাড়াতাড়ি বেরুতে পারব।'

গায়ের রাগ গায়ে মারতে হল দেবিকার। যত অনর্থ ঘটাল ঐ মালদুটো। সরাসরি ঘাড়ধাক্কা দেওয়া গেল না। গাড়ি আনতে যতই দেরি হবে ততই সে শক্তিশেল হয়ে বিঁধে থাকবে বুকের মধ্যে। ততই নিশ্বাসে বিষাক্ত করবে সে এই বাড়ির হাওয়া।

সত্যিই, জিনিসের কী ভার, কী বাধা! সামান্য একটা বিছানা আর বাক্স তাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে, অকর্মক করে রেখেছে। সত্যি, কবে সে ভাবহীন, বস্তুহীন হতে পারবে। সমুদ্রে যখন সে ঝাঁপ দিয়েছিল তখন তার কোনো ভার ছিল না, বস্ত্র ছিলনা। সত্যিকার জীবনে কবে আসবে তার সেই রিক্ততার মুক্তি, সেই অবারণ বন্ধনহীনতা।

সহাস্যমুখে গাড়ীতে উঠছে, দেবিকা খিঁচিয়ে উঠল: 'জামিনে ছাড়া পেয়েছে বলেই মনে করিসনে যে শ্রাদ্ধবাড়ির দাগা ষাঁড়ের মতো উদ্দাম হতে পারবে। তারপরেও বিচার আছে, জেল আছে—'

তামসী হাসিমুখে বললে, 'জানি। জেলভাঙার কারিগরও তৈরী হচ্ছে ঘরে-ঘরে।'

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সাহিত্য

প্রবন্ধ

বিচিত্র মণিপুর—নলিনীকুমার ভদ্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ। দাম—২৲

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পরিচিত নয় এমন বাঙালী বিরল, অথচ তার আজন্ম লীলা-নিকেতন বাংলারই প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরের সংবাদ আজও আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্রকে ধন্যবাদ, তিনি সে দেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। স্বাধীন মণিপুরের ইতিহাস পূর্ব্ব-ভারতের একান্ত গৌরবের বস্তু, তাকে স্মরণ করে আজো প্রতিটি মণিপুরবাসীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। শেষ স্বাধীন নৃপতি রাজা টিকেন্দ্রজিতের নামে আজো সমগ্র মণিপুর শ্রদ্ধায় ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। এ মণিপুর আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ, তাছাড়া, তার সঙ্গে আমাদের সহযোগ আজকের ব্যাপার নয়, বহুকালের। সময়ের ব্যবধানের জন্য আমরা সে কথা আজ ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তথাপি সে ইতিহাস সত্য। নলিনীবাবু সহৃদয়তার সঙ্গে যে সে সহযোগিতার কথা মনে করেছেন, তাতে যে তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয় মেলে তাই নয়, তাতে তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং স্বাদেশিকতার সন্ধানও পাওয়া যায়।

সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই অতি সহজে বুঝতে পারা যাবে যে, 'বিচিত্র মণিপুর' কেবলমাত্র একটি ভ্রমণকাহিনীই নয়। আসলে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনায় তিনি মণিপুরের সমগ্র ইতিহাসের বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মণিপুর আর মণিপুর অভিযানে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কীর্ত্তিক ার পর্য্যায় পর্য্যন্ত তিনি এগিয়ে এসেছেন।

শুধুমাত্র ইতিহাস-রচনায়ই যদি লেখক সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতেন তাহলেও তাঁকে দোষ দেওয়া চলতো না, কিন্তু তিনি তাঁর সমালোচনী দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে গেছেন মণিপুরের সমাজ-জীবনের অন্দরমহল পর্য্যন্তও। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এ যদি তাঁর ভ্রমণকাহিনী হতো তাহলে এ বই-এর মূল্য এমন কিছু হতো না, এমনকি এ বই-এর প্রয়োজনই বোধ হয় আমরা বোধ করতাম না। কিন্তু এই যে তিনি ঐতিহাসিক এবং সমালোচনী দৃষ্টি নিয়ে সে দেশের সমগ্র বিবরণ আহরণ করতে চেয়েছেন, তাতে আমরা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে প্রশংসা না জানিয়ে পারি না।

'মণিপুরে বিবাহ-উৎসব' বা 'মণিপুরী নৃত্য-উৎসব' প্রভৃতি লেখক অতি নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করেছেন, এবং তাতে আমরা জানতে পারি তাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির কথা। তাছাড়া, তাদের সাজসজ্জা, জীবন-যাপনপ্রণালীর প্রত্যেকটি খুটিনাটিকেও তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন সন্দেহ নেই।

শুধু তাই নয়। মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি কাহিনীকথাও লেখক সংগ্রহ করে এনে আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমাদের কাহিনীতে রূপকথা আছে, তাদের দেশেও তা আছে। তাতে

এমন কোনো বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তাদের এই রূপকথার মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত সত্য কথাটি রয়েছে তা হচ্ছে তাদের সরল ও সহজ প্রেমানুভূতি আর অত্যন্ত খাঁটি স্বদেশপ্রেম। অনার্য্যজ্ঞানে সে দেশবাসীদের প্রতি যে যতই অবজ্ঞা জানাক, তারাও যে যে কোনো মহান সভ্য জাতির চেয়ে কিছুমাত্র খাটো নয়, এই কাহিনী কয়টির উল্লেখ করে লেখক সে কথা প্রমাণ করেছেন। মণিপুরের জাতীয়-জীবন ও ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই কাহিনীর উল্লেখ তাই যুক্তিপূর্ণ এবং নলিনীবাবু যত সংক্ষেপেই তা বর্ণনা করুন না, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য পাঠক সাধারণ আশা করি ধরতে পারবেন।

'বিচিত্র মণিপুরে' একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে লেখকের ভাষা আর তাঁর বলবার ভঙ্গী। স্থান ও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে ভাষাও যেন একেক সময় রূপান্তর লাভ করেছে। প্রকৃতি বর্ণনায় বা নরনারীর সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণে ভাষা যেন লেখকেরই অগোচরে কাব্যময় রূপ নিয়েছে। লেখক যে তাঁর পাণ্ডিত্য বা অভিজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ এ বই রচনা করতে বসেন নি, এ আন্তরিকতা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আর একটা কথা হচ্ছে, একটা দেশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক ভুলে যান নি যে তিনি একজন রসজ্ঞ ব্যক্তিও, কারণ, শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ের পাণিপ্রার্থীর আবেদন বা যাত্রাভিনয়ে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ভীমগর্জ্জনে প্রেম-সম্ভাষণের বর্ণনায় যে হাস্যরসের অবতারণা তিনি করেছেন, তাতে যে কোনো পাঠক আনন্দ পাবেন।

অতি অল্প পরিসরের মধ্যে একটা দেশের যে সামগ্রিক পরিচয় লেখক এ বই-এ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে তাঁর প্রচুর ক্ষমতার পরিচয় মেলে। উৎসুক পাঠকমহলে 'বিচিত্র মণিপুর' যথার্থ সমাদর লাভ করবে তা নিঃসন্দেহ।

অনিল চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গীত ও সমাজ : নারায়ণ চৌধুরী। প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিঃ। দাম : চার আনা।

সমাজ ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি, সমাজ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তিকার মত এই পুস্তিকাটি পূর্ব্বাশা সিরিজের নবতম যোজনা। সমাজ-বিবর্ত্তনের সঙ্গে সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির ন্যায় সঙ্গীতের চেহারাও বদলায়—গ্রন্থকার সে কথাই বলতে গিয়ে, কি কি ভাবে সঙ্গীত বাংলাসমাজে পরিবর্ত্তিত রূপে দেখা দিয়েছে এবং পরে কি রূপ নেবে তারই আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন সঙ্গীত আদিকালে সমষ্টিগত ছিল, পরে সমাজের পরিবর্ত্তন হওয়াতে সঙ্গীত সমষ্টিগত না থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে ভবিষ্যতের গান হবে সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ সমষ্টিগত সম্মিলিত-কণ্ঠ উপযোগী, আর সেটিতে ব্যক্তিগত শব্দসম্ভারপূর্ণ কৌলিন্য ছেড়ে জনগণের সুখদুঃখের আশা আকাজ্ক্ষার ছোঁয়াচ লাগে এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। সমাজে ব্যক্তির চেতনা লুপ্ত হয়ে সমষ্টির চেতনা ক্রমে প্রবল হচ্ছে তারই জন্যে ভবিষ্যৎ সঙ্গীত ঐরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হবে। তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষ যখন যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিবৃত্তির তাগিদে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলে তখন মিলিত সুর পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। মিলিত প্রচেষ্টাতেই গীত বাদ্য ও নৃত্যের পরিপূর্ণতা আর সেগুলির সম্মিলিত আবেদনের নামই সঙ্গীত। ধনতন্ত্রের প্রেরণা থেকে যৌথ সমাজের ভিত্তি বিভক্ত হয়ে যখন আলাদা আলাদা পরিবার তৈরী হতে লাগলো তখন থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হতে লাগলো। আর আধুনিক বাংলা সঙ্গীত অথবা রবীন্দ্রনাথের গান বাংলায় ধনতন্ত্রের প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত।

কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রভাব যে-সব দেশে বাংলার চেয়ে অনেক আগে আরম্ভ হয়ে এখনও বিশেষভাবে প্রকটিত সে-সব দেশেও সঙ্গীত এখনও পূরাপুরি সমষ্টিগত। সমষ্টির উপর ভিত্তি করেই তাদের সঙ্গীতের কাঠামো তৈরী আর সে সঙ্গীত এখনও ঐভাবেই পরিপুষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশের মত কোন কালেই একব্যক্তি-ধর্ম্মী সুর সেখানে হয়ে উঠেনি। রামপ্রসাদী সুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মী সুর অথচ কোন সময়েই ধনতন্ত্রের আওতায় সে-সুর বদ্ধিত হয়নি। বাংলার সঙ্গীত-বিবর্ত্তনের কারণ খুঁজতে গ্রন্থকার অর্থনীতিক দৃষ্টিতে বাংলার সমাজের বিবর্ত্তন ও তার থেকে বাংলার সঙ্গীতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে গিয়ে বড়ই অসুবিধায় পড়েছেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন ও সে-সমাজের পরিবর্ত্তন শুধু অর্থনীতির ভিত্তিতে দেখে কোন সিদ্ধান্তে এলে পরিবর্ত্তনের সঠিক মূলসূত্রটি পাওয়া সম্ভব নয়। গত দু'শত বৎসরের পরিবর্ত্তনটি খুব লক্ষ্য করা সম্ভব হলেও তার পূর্ব্বেকার সমাজ-বিবর্ত্তন খুব বেশী অর্থনীতিক নয় বলে সমাজের পরিবর্ত্তন আর সে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতির পরিবর্ত্তনগুলিও ততটা অর্থনীতিক নয়। বাংলার প্রাচীন সমাজের পরিবর্ত্তন বেশী করে ধর্ম্মগত। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে সমাজ ও সঙ্গীতের মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল।

এই সেদিন, শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বাংলার নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল সেটি খুব বেশী অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন নয়। কিন্তু বাংলায় সে সময়ে সবদিক দিয়ে একটি বন্যা এসেছিল। সামাজিক জীবনেরও পরিবর্ত্তন হয়েছিল। সঙ্গীতের যে বিরাট পরিবর্ত্তন সে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল সে কথার উল্লেখই গ্রন্থকার করেননি দেখে হতাশ হয়েছি। তাছাড়া কীর্ত্তনকে লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ভূক্ত করেছেন দেখে বিস্মিত হয়েছি। বাংলার অন্ধকার যুগে একদিকে কবিগান, পাচালী সর্ব্বসাধারণের সামাজিক সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল। আর অন্যদিকে নবাব জমিদারদের বাড়ীতে বাঈজির 'নাচ' গান ভোগসুখের প্রধান জোগানদার হয়ে উঠেছিল। একটির উল্লেখ সঙ্গীতের মধ্যযুগীয় মনোভাব বলতে গিয়ে বলা হলেও অন্যটির কোন উল্লেখই করা হয়নি। কেবল ধ্রুপদ খেয়াল আর রবীন্দ্রনাথের গান ও আধুনিক সঙ্গীতই বাংলার সমাজ বিবর্ত্তনে সঙ্গীতের পরিবর্ত্তিত রূপ নয়। এখনও আরও অনেক পরিবর্ত্তন, আরও অনেকপ্রকার সঙ্গীত বাংলার সমাজবিবর্ত্তনের সাক্ষী হয়ে আছে।

গ্রন্থকার সঙ্গীতে মধ্যযুগীয় মনোভাব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে আমরা একমত। আমাদের অধিকাংশ জমিদার গায়কবাদক এখনও মধ্যযুগের বুলিই আওড়াচ্ছেন। তানসেনের পৌত্র বংশীয় 'ঘরানা' দৌহিত্র বংশীয় 'ঘরানা' নিয়েই এদের সঙ্গীত আলোচনা। সঙ্গীতের প্রগতি কোন পথে, এখনকার রূপ কি, এসব আধুনিক মনোভাব সেখানে মাথা গলাতে পারে না। রাজা জমিদারদের সঙ্গীত আসরটির যে চিত্র নারায়ণ চৌধুরী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেটি বাস্তবিকই উপভোগ্য।

গ্রন্থকার লিখেছেন আমাদের দেশে জাতীয় সঙ্গীত আজ পর্য্যন্ত সচেতন হয়নি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতাগণের গানে আশু লক্ষ্যটাই প্রধান, দূরের লক্ষ্য এবং চরম লক্ষ্য সেখানে নিতান্তই অস্পষ্ট। আর তাতে জনগণের সুখদুঃখের ছন্দে সে গানের সুর স্পন্দিত নয়। 'নতুন গান যা তৈরী করা হবে সেই গান নিভৃতে একা গাওয়ার গান নয়, সেই গান প্রকাশ্যে দল বেঁধে গাওয়ার গান।' তিনি বলেছেন 'সম্মিলিত' কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিত হয়ে যে বিরাট ঐক্যতান গড়ে উঠবে সেইটিই হবে প্রকৃত ভবিষ্যৎ সঙ্গীত। বর্ত্তমান জাতীয় গান সম্বন্ধে যা তিনি বলেছেন তাতে আমার

বলার কিছু নেই কিন্তু নতুন যে রূপ তিনি আমাদের সাম্নে তুলে ধরেছেন সেটি কি একাধারে জাতীয় সঙ্গীত এবং উৎকর্ষ সঙ্গীত, অথবা গণসঙ্গীতই হবে জাতীয় সঙ্গীত অথবা সকলে একত্রে গাইতে পারবে যা সেটিই হয়ে যাবে উৎকর্ষ সঙ্গীত। স্বরূপটি মোটেই পরিষ্কার নয়। এখানে একটি কথা বলে রাখি যে জোর জবরদস্তি করে একই পদ্ধতির সঙ্গীতকে সকলের কাঁধে চাপিয়ে দিলে সঙ্গীত না হয়ে তা কোলাহলই হবে মাত্র।

আরও অনেকদিক থেকেই গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। সামাজিক পরিবর্ত্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে সঙ্গীত কি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আর বই লিখবার চেষ্টা কেউ করেননি এবং এইটেই বোধ হয় এ সম্বন্ধে প্রথম পুস্তিকা। এদিকে আরও অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে বাংলার সঙ্গীত-ধারার ইতিহাসের একটি অধ্যায় লেখা হতে পারে। এই পুস্তিকা সে-সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে।

মণিলাল সেনশর্ম্মা

আধুনিক চীন : থান য়ুন শান (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : দাম আট আনা)
প্রাচীন বাংলার গৌরব : শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : দাম আট আনা)

'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ'-সিরিজের আরো দুখানি বই পেলাম,—থান য়ুন শানের 'আধুনিক চীন' এবং শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'।

মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে মহাচীনের ঐতিহ্য প্রাচীনতম ; এ সম্পর্কে মিশর ও ব্যাবিলনের দাবী নিয়ে তর্ক উঠ্তে পারে বটে, তবে প্রাচীণত্ব এবং সেই সঙ্গে সময়-ছাড়ানো প্রাণশক্তির দিক থেকে একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশই বোধ হয় মহাচীনের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতে পারেনা। বস্তুত মিশর আর ব্যাবিলনের কথা বল্তেই প্রাচীন ইতিহাসের ধূসর গন্ধজড়ানো এক বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠার কথা মনে পরে যায় ; কিন্তু ঐ সময়-ছাড়ানো প্রাণশক্তির জোরেই বোধ হয় মহাচীন আর ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ পর্যন্তও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে টিঁকে রয়েছে।

আধুনিক কালের চীন আর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা চল্‌তে পারে ; বৈদেশিক শক্তির রাজ্যবিস্তারলিপ্সা আর সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিবাদ-কলহের অভিশাপে দুটি দেশই সমান জর্জর, থান য়ুন শানের ভাষায় 'দুটি বিপন্ন বোনের' মতো। চীনের ইতিহাসে পাশ্চাত্য বনিকের মানদণ্ড এখনো পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে রাজদণ্ড হয়ে উঠ্‌তে পারেনি বটে, কিন্তু সেই মানদণ্ডের দাপটই কি চীনের সাম্প্রতিক রাজনীতিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রাখেনি ? স্বভাবতই চীনের ইতিহাস জানবার জন্য প্রচুর আগ্রহ আমাদের ; পরিমিত পরিধির মধ্যে তাকে লিপিবদ্ধ করে থান য়ুন শান আমাদের সেই আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করলেন।

'আধুনিক চীনে' চীনের পুরোনো ইতিহাস, আধুনিক চীনের রাষ্ট্রিক পরিবর্তন, চীনের অর্থনীতিক বিভাগ এবং চীনের সামাজিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কোনওক্রমেই অসম্পূর্ণ নয়। তবে মতবাদের দিক থেকে একটা কথা উঠ্‌বার সম্ভাবনা রয়েছে। থান য়ুন শান, 'কুয়োমিনটাং' সরকারের একজন গোঁড়া সমর্থক ; স্বভাবতই মস্কোর তৃতীয় আন্তর্জাতিক দলের ক্রিয়াকলাপের ওপর তিনি সরাসরি আক্রমণ চালিয়েছেন। কিন্তু থান য়ুন শান

একটা কথা মনে রাখ্‌লে ভাল হতো যে, চীনের রাষ্ট্রনীতিক অনগ্রসরতা সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদলের আংশিক দায়িত্ব মেনে নেবার পরে অনেকেই হয়তো মার্কিনী সাহায্যপুষ্ট কুয়োমিন্‌টাং সরকারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন।

১৩২১ সালে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে তা-ই 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'-রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

গোখেল একদা বলেছেন 'সারা ভারতবর্ষ কাল যা চিন্তা করবে বাংলার আজ তাই চিন্ত্যনীয় বিষয়'। কথাটা অমূলক নয়। বস্তুতঃ সর্বভারতীয় সংস্কৃতি যে বাংলার কাছে অনেকখানি ঋণী এ কথা অনস্বীকার্য্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বাংলার সেই সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাচনা করা হয়েছে। যিনি এই আলোচনা করেছেন ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বেশী কিছু বল্‌তে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। প্রবন্ধটির পুণঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কবিতা

২৬শে জানুয়ারী—নরেন সেনগুপ্ত ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯ ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া। দাম—১৷৹

একক (কবিতা সাময়িকী)—সম্পাদক: শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ৪৪৬।১ কালিঘাট রোড, কলিকাতা ২৬। প্রতি সংখ্যা—৷৹

২৬শে জানুয়ারী ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর মুক্তিকামনায় যে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে প্রতিবৎসর এদিনে সে কথাই তারা সমস্বরে ঘোষণা করে আর ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য নিজেকে সমর্পণ করবার মহৎ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

২৬শে জানুয়ারী সে প্রতিজ্ঞারই কাব্যরূপ। এ দু'জন কবি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেন নি সত্য কিন্তু বাংলা কবিতার পাঠকমহলে বোধ হয় তাঁরা আজ তেমন অপরিচিতও নন। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে যে কয়টি কবিতা স্থান পেয়েছে তার সব কয়টিই দেশাত্মবোধক। সুতরাং একই সুরে গাঁথা কবিতার মধ্যে তাঁদের কাব্যপ্রতিভা সমগ্রভাবে স্ফূরিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। তথাপি এইটুকু থেকে যে পরিচয় পাওয়া গেলো তাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে, তাঁদের কেউই শুধুমাত্র কবিযশ লাভের লোভে কলমে হাত দেন নি। অন্ততঃ বীরেনবাবু সম্বন্ধে তো অকুণ্ঠায় বলতে পারি। তিনি কয়েকটি কবিতায় যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'স্বাধীনতা', '২৬শে জানুয়ারী' বা 'বঙ্কিমচন্দ্র' তাঁর ক্ষমতার সাক্ষী। উচ্ছল আবেগের বশে এগিয়ে চলেন বলেই হয়তো নরেনবাবুর রচনায় মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে, একটু সংযত হলে তিনি আরো ভালো কবিতা লিখতে পারবেন সন্দেহ নেই। নুতনত্বের প্রতি তাঁর যে একটা আকর্ষণ আছে তা তাঁর প্রায় সবগুলো কবিতায়ই লক্ষ্য করা গেলো।

বাংলাদেশে নাকি কবির অন্ত নেই, অথচ খাঁটি 'কবিতা পত্রিকা' বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তার জন্য দায়ী কে? সম্পাদক, লেখক না পাঠক সাধারণ? বুদ্ধদেববাবু কোনো শক্তিকে তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বারোটা বছোর। কিন্তু কি করে যে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার হদিশ খানিকটা তিনি নিজেই দিয়েছেন গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। লেখকের

আন্তরিকতা এবং পাঠকের যোগাযোগে যদি সত্যিকারের মনের স্বীকৃতি না থাকে তবে কোনো পত্রিকাই টি\`কে থাকতে পারে না। যে কারণেই হোক, 'একক'এর প্রকাশ এতদিন বন্ধ ছিলো। নতুন কলেবরে আবার তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখে খুসী হলাম। আশা করে রইলাম, এবার তার গতি অপ্রতিহত হবে। বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে মনে হয় 'একক'-এর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট যত্নের সঙ্গেই এবার তাঁদের কাজে হাত দিয়েছেন। 'এককে'র মারফৎ কবিতার প্রতি বাঙালী পাঠক-সাধারণের আকর্ষণ বাড়ুক, এই কামনা করি। অনিল চক্রবর্ত্তী

বিষণ্ণ: তরিৎকুমার সরকার (পুষ্কর প্রকাশিকা ; দাম দেড় টাকা)

ডাবল্ ক্রাউন কাগজে ছাপা, প্রচুর ছাপার ভুলে বোঝাই, সস্তা ভূমিকাসম্বলিত, খেলো মলাটের একখানি কাব্যগ্রন্থ; দেখেই সমস্ত মন বিষণ্ণতায় জড়িয়ে আস্‌বে। তবু এরি মধ্যে কয়েকটি ভালো কবিতার সন্ধান পাওয়া গেলো।

'বিষণ্ণ'র কবিতাগুলি পড়বার পর একটা কথা বিশেষভাবে মনের ওপর ছাপ রেখে যায়; তা হলো লেখকের চিত্রসৃষ্টির নিপুণ কৌশল। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য কয়েকটি কথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুল্‌তে সক্ষম হয়েছেন। এ দিক থেকে 'গলি' এবং 'আসামের জঙ্গল' কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। সম এবং অসম মাত্রার ছন্দের ওপর তার যে স্বাভাবিক দখল, প্রায় সব কটি কবিতাই তার স্বাক্ষর বহন করছে।

'বিষণ্ণ'র কবিতাগুলির গঠনকৌশল নিখুঁত—তারি সঙ্গে লেখকের প্রগলভ শব্দচাতুর্যের পরিচয় পেলাম। জিনিষটির স্বাদ কিছুটা তীব্র, কিন্তু ও স্বাদে অনেকেই মুগ্ধ হতে পারেন।—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপন্যাস

আমার পৃথিবী: স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রাপ্তিস্থান—দি বুক সিণ্ডিকেট, ১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। দাম—১৸৹

'আমার পৃথিবী' নিতান্তই মধ্যবিত্ত। তাই বইখানিতে কয়েকটি মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আমরা দেখতে পাই। অতীন, সীতু, রাম্নু এদের সকলের মধ্যেই occasional flashes আছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনে সুযোগের অভাবে সে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হতে পারে নি। দৈনন্দিন জীবনে ঠিক এমনটিই দেখা যায়। সেদিক থেকে লেখক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি তিনকড়ির এবং অতীনের পিতার চিত্রটিও ভারী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু একমাত্র এই মধ্যবিত্ত চরিত্রাঙ্কণ ছাড়া সমগ্র বইটিতে কোথাও এমন কিছু নেই যা পাঠকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে। তাই সেদিক থেকে বইখানির সার্থকতা অনুভব করা যায় না। এ ছাড়া গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠা অত্যন্ত একঘেয়ে এবং অবান্তর বলে মনে হয়। আর জানালা দিয়ে কমলার প্রেম-পত্র ছুঁড়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও নিতান্ত মামুলি ধরণের—এ সব লেখার আজকের দিনে কোনই অর্থ হয় না। আশা করি লেখক তাঁর পরবর্তী রচনায় এইসব ত্রুটী-বিচ্যুতি সংশোধন করে নিতে পারবেন।

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী-পরিচয়

ডাঃ অমিয়কুমার সেনের কন্যা হৈমন্তী সেনের বয়স মাত্র ষোলো বৎসর। তিনি আশুতোষ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। এত অল্প বয়সেই তিনি চিত্রাঙ্কণে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, গত সংখ্যা পূর্ব্বাশায় প্রকাশিত চিত্র 'আতঙ্ক' এবং বর্ত্তমান সংখ্যার 'বাংলা ১৩৫৩' তার নিদর্শন। চিত্র-রচনায় হৈমন্তী সেন পাশ্চাত্য রীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁহার ছবিতে বিশেষ লক্ষ্যণীয়, বিষয়বস্তুর পূর্ণতা এবং বর্ণসামঞ্জস্য।



জালিনওয়ালাবাগ

পূর্ব্বাশা, চৈত্র
১৩৫৩

চিত্রাধিকারী ঃ
জাতীয় প্রদর্শনী

পূর্বাশা

নবম বর্ষ ● দ্বাদশ সংখ্যা

চৈত্র ● ১৩৫৩

অশোক-স্মৃতি

প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রিয়দর্শী অশোক প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূর্ত স্বরূপ। তাঁর চরিত্র ও বাণীতেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তিনি যে ধর্ম ও মৈত্রীর বাণী তৎকালীন সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহন করে নিয়েছিলেন তার ফলেই ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য বিশ্বমানবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জাতি বর্ণ ও ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ভিত্তির উপরে সর্বভারতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মহৎ জীবনের সাধনা। এই মহাসাধনার স্মৃতি আজও বিশ্বমানবের এক বৃহৎ অংশের চিত্তে উজ্জ্বলরূপে জাগরূক আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষের অন্তর থেকে সে স্মৃতি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সহজে বা স্বল্পকালে সে বিলুপ্তি ঘটেনি। মহৎ আদর্শ মানবহৃদয়কে গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ ও সুচিরকালের জন্য প্রেরণাদান না করে পারে না।

অশোকের মৈত্রীসাধনাও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার তিরোধানের অনতিকাল পরে রচিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায়ে জম্বুখণ্ডের যে অধীশ্বর, অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং ধর্ম ও সাম্যের দ্বারা রাজ্যশাসন করেছিলেন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রচণ্ড আসুরিক শক্তির আক্রমণে কলিঙ্গরাজ্য বিধ্বস্ত হবার প্রায় অব্যবহিত পরেই অশোক অনুতপ্ত হৃদয়ে ও-রাজ্যের অধিবাসীদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হলেন। অস্ত্রবিজিত কলিঙ্গে তাঁর এই চিত্তবিজয়ব্রত যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আছে ও-জনপদের প্রাচীন ইতিহাসেই। অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই কলিঙ্গ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীন কলিঙ্গের চেতবংশীয় জৈন সম্রাট্ খারবেলের (খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক) আধিপত্য উত্তরে অঙ্গমগধ ও দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই প্রবল পরাক্রান্ত জৈন নৃপতিও তাঁর হাতিগুম্ফা লিপিতে 'সব-পাসংডপূজক' বলে বর্ণিত হয়েছেন। এই বিশেষণটি যে অশোকের 'দেবানাং পিয়ে পিয়দসি রাজা সব পাসংডানি পূজয়তি' এই বাণীরই প্রতিধ্বনি তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের অস্ত্রবিজয়ের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেও কলিঙ্গ তাঁর ধর্মবিজয়ের প্রভাবকে সানন্দেই স্বীকার করে নিয়েছিল।

অশোকের ত্রয়োদশ পর্বতলিপি থেকে জানা যায় তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যেও তিনি ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রভূমিও কলিঙ্গের ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করে এবং ওই প্রদেশের সাতবাহনবংশীয় সম্রাট্গণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সাতবাহন-নৃপতিরা শুধু যে স্বীয় প্রদেশকে মৌর্যসাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রিয়দর্শী অশোকের মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ তাঁদের চিত্তকেও জয় করে রাষ্ট্রীয় বিরোধের ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ গৌতমীপুত্রের (খ্রী ১০৬-১৩০) বর্ণনাপ্রসঙ্গে একটি খোদিত লিপিতে বলা হয়েছে যে তিনি কৃতাপরাধ শত্রুজনেরও প্রাণহিংসায় বিমুখ ছিলেন (কিতাপরাধে পি সতুজনে অপানহিসারুচি)। এই যে অপ্রাণহিংসারুচিতার জন্য গৌরববোধ, এটা নিঃসন্দেহেই অশোকের অহিংসাবাণীপ্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল।

মহারাষ্ট্রের সাতবাহনবংশীয় সম্রাট্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মালব (রাজধানী উজ্জয়িনী) ও সুরাষ্ট্রের (কাঠিয়াবাড়) শকক্ষত্রপ রাজগণ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এই বংশের বিখ্যাত রাজা মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামা পশ্চিম ভারতে একটি সুবিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। সুরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন গিরিনগরের (আধুনিক গিরনার) নিকটবর্তী একটি পর্বতগাত্রে অশোকের কয়েকটি অনুশাসন উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই পর্বতটিরই আরেক অংশে উক্ত রুদ্রদামার আমলে ৭২ শকাব্দে (খ্রী ১৫০) উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। আধুনিক জুনাগড় সহরের নিকটে অবস্থিত বলে এই পর্বতলিপিটি জুনাগড়-লিপি নামে খ্যাত হয়েছে। এই লিপিটিতে মৌর্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নাম সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। এই লিপি থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাষ্ট্রিয় পুষ্যগুপ্ত গিরিনগরের অদূরে

সুদর্শন নামে একটি বৃহৎ তড়াগ নির্মাণ করান। অশোকের পরে (মতান্তরে অশোকের আমলে) যবনরাজ তুষাস্ক একটি বাঁধ ও কয়েকটি প্রণালীর দ্বারা তড়াগটিকে অলংকৃত করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এই বাঁধটি প্রবল ঝটিকায় বিনষ্ট হলে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার আদেশে সেটি পুনর্নিমিত হয়। দেখা যাচ্ছে রুদ্রদামার আমলে চন্দ্রগুপ্ত তথা অশোকের নামই যে শুধু ভারতবাসীর মনে সুস্পষ্টভাবে জাগরূক ছিল তা নয়, তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত কীর্তিও তখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল এবং সেই কীর্তিকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষাও তখনকার দিনে যথেষ্ট প্রবল ছিল। মৌর্যসম্রাট্‌দের আদর্শও তৎকাল পর্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রেরণা জাগাতে বিরত হয়নি বলেই মনে হয়। বিদেশাগত শকজাতীয় রাজারাও এই সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাতবাহন সম্রাট্‌দের ন্যায় শকক্ষত্রপরাও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে গর্ববোধ করতেন। জুনাগড়-লিপিতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রনামা সর্ববর্ণের রক্ষক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিজয়ের আদর্শ অনুসারে 'ভ্রষ্টরাজ প্রতিষ্ঠাপক' বলে বর্ণিত হয়েছেন। ক্ষত্রিয়জনোচিত সংগ্রামদক্ষতাও তাঁর কম ছিল না। উক্ত লিপিতেই বলা হয়েছে 'অভিমুখাগতসদৃশ শত্রু'জনের প্রতি 'প্রহরণবিতরণে' তিনি বিমুখ ছিলেন না। এই উক্তি ভারতবর্ষের অভিমুখাগত বিজিগীষু সেলুকসের প্রতিরোধকারী চন্দ্রগুপ্তের আদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ শকনৃপতিও সংগ্রামক্ষেত্রের বাইরে নরহত্যা থেকে বিরত থাকার কঠিন সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন 'আপ্রাণোচ্ছ্বাসাৎপুরুষবধনিবৃত্তিকৃতসত্যপ্রতিজ্ঞ'। এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণ থেকে মনে হয় গৌতমীপুত্র সাতবাহনের ন্যায় শকমহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার চিত্তেও অশোকের অবিহিংসানীতির প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল।

তারপর গুপ্তযুগের ইতিহাসে দেখি সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত (আ ৩৩০-৩৮০) অশোকের একটি ধর্মস্তম্ভের গাত্রে স্বীয় কীর্তিকাহিনী উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এই লিপিটি আজকাল সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তি নামে খ্যাত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের প্রপৌত্র স্কন্দগুপ্তের আমলেও (৪৫৫-৪৬৭) গিরিনগরের পর্বতগাত্রে অশোকের ধর্মলিপির (তথা রুদ্রদামার প্রশস্তির) অদূরেই একটি প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। এটি এখন স্কন্দগুপ্তের জুনাগড়-প্রশস্তি নামে পরিচিত। কিন্তু সে সময়ে অশোকের ধর্মলিপিগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ছিল কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিন্তু তখনও অশোকের মহৎ কীর্তির কথা জনসাধারণের স্মৃতিতে অনির্বাণ দীপ্তিতেই বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ানের বিবরণ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেও মগধে অশোকের আমলের বিশাল রাজপ্রাসাদ তথা তৎকালীন চিকিৎসালয়গুলি দেখে ফা হিয়ানের হৃদয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছিল। এই

চিকিৎসালয়গুলি যে অশোকের রুগ্ন মানুষ ও পশুর চিকিৎসাব্যবস্থারই ঐতিহাসিক পরিণতি তাতে সন্দেহ নেই।

তৎকালীন ভারতীয় এবং সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্যেও অশোক-স্মৃতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। দিব্যাবদান (চতুর্থ শতক) নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষত তার অশোকাবদান নামক প্রাচীন অংশ থেকে বোঝা যায় গুপ্তসম্রাটগণের রাজত্বকালে অশোকের ইতিহাস অবিকৃত না থাকলেও তাঁর মহত্ত্বের প্রভাব নিষ্ক্রিয় ছিল না। দীপবংশ (চতুর্থ শতক) এবং মহাবংশ (পঞ্চম শতক) নামক পালিভাষায় রচিত সিংহলের ঐতিহাসিক কাব্য দুটিতেও অশোকের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী নয়। কিন্তু সে সময়েও সুদূরের সিংহলের অধিবাসীরাও যে অশোকের আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করত সে কথা এই কাহিনী থেকেই প্রমাণিত হয়।

অতঃপর পুষ্যভূতিবংশীয় সম্রাট্ হর্ষবর্ধন ও চৈনিক মনীষী হিউএন্থসাঙের (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। হর্ষবর্ধন অশোকের আদর্শে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং হিউএন্থসাঙ ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে অশোকের স্মৃতি-বিজড়িত কত স্তম্ভ ও স্তূপ দেখেছিলেন আর কত কাহিনী শুনেছিলেন তা উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভারতবিবরণে বর্ণিত আছে। কিন্তু হিউএন্থসাঙের বিবরণ থেকে মনে হয় সম্ভবত তৎকালেই অশোকের ধর্মলিপিগুলি ভারতীয়গণের কাছে দুর্বোধ হয়ে গিয়েছিল। নতুবা অন্তত কতকগুলি অশোকলিপির মর্ম উক্ত বিবরণে অবশ্যই পাওয়া যেত বলে মনে করা যায়। সপ্তম শতকের উত্তরার্ধে আরেকজন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ অশোকের একটি ভিক্ষুবেশী মূর্তি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তাতে বোঝা যায় অশোকের চরিত্র ও আদর্শ দেশের স্মৃতিতে তখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেও যে অশোকের পুণ্যস্মৃতি ভারতীয় হৃদয় থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বারাণসী ও কান্যকুব্জের গাহড়বালবংশীয় নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের (১১১৪-১১৫৪) সারনাথ-শিলালিপি থেকে। গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিষ্ঠাবান অনুরাগী। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও বিরূপ ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের জন্য একাধিক সংঘারাম ও বিহার নির্মিত হয়েছিল। কুমারদেবী ও বাসন্তীদেবী নামে তাঁর দুইজন মহিষী ছিলেন বৌদ্ধ। উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় কুমারদেবী ধর্মাশোক নরাধিপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারানাথে একটি নবনির্মিত বিহারে ধর্মচক্র প্রবর্তনরত বুদ্ধমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্ভবত এটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকস্মৃতির শেষ নিদর্শন।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপত্যশিল্পরসিক সুলতান ফিরুজ তুঘলক আম্বালা জেলার অন্তর্গত তোপরা নামক স্থানে অশোকের একটি স্তম্ভ দেখে তার শিল্প সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং ১৩৫৬ সালে তিনি বহু ব্যয়ে ও বহু কষ্টে এটিকে তোপরা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। এখনও সেটি ওখানে অক্ষতভাবেই বিদ্যমান আছে। ফিরুজ শাহ পরে মীরাট থেকেও আরেকটি অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে আনয়ন করেন। এই স্তম্ভটি পরবর্তীকালে গুরুতর আঘাত পেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে এই টুকরোগুলিকে জোড়া দিয়ে স্তম্ভটিকে দিল্লীতে তার পূর্বের জায়গাতেই পুনঃস্থাপন করা হয়। এখনও সেটি সেখানেই আছে। যাহোক, ফিরুজ শাহের আমলে দুটি অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলেও তৎকালে স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপি পাঠ করা দূরের কথা এ দুটি যে অশোকের নির্মিত একথাটিও কেউ জানতেন না। এভাবে অশোকের স্মৃতি ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে (১৬০৫) বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে পূর্বোক্ত এলাহাবাদস্তম্ভের গাত্রে পূর্বপুরুষদের নাম উৎকীর্ণ করা উপলক্ষ্যে অশোকের দুটি লিপিকে যেভাবে নষ্ট করা হয়েছে তাতে একান্ত নির্মমতাই প্রকাশ পেয়েছে।

এই সপ্তদশ শতক থেকেই অশোকের কীর্তির প্রতি য়ুরোপীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন থেকে তাঁরা এবিষয়ে ক্রমশ অধিকতর আগ্রহান্বিত হতে থাকেন এবং তাঁদের আগ্রহকেই কালক্রমে অশোকের কীর্তি ও ইতিহাসের উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরও দীর্ঘকাল অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে Quaint Tom Coryate তোপরা থেকে আনীত দিল্লীর প্রস্তর স্তম্ভটিকে পিতলের তৈরী বলে ভ্রম করেছিলেন। স্তম্ভগাত্রের আশ্চর্য মসৃণতা ও চাকচিক্যই এই ভ্রান্তির হেতু। ঊনবিংশ শতকের বিশপ হিবারও এটিকে ঢালাই করা ধাতুর তৈরী বলে বর্ণনা করেন।

ঊনবিংশ শতকেই য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আশোকের ইতিহাস উদ্ধারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অন্তত ১৮০৫ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মহিসুর এবং পেশোয়ার থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রায় ত্রিশটি স্থানে পর্বত বা স্তম্ভ-গাত্রে কিংবা শিলাফলকে উৎকীর্ণ অশোকের বহু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু একই স্থানে একাধিক লিপি এবং একই লিপি বহু বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ হয়েছে। এদিক থেকে হিসাব করলে অশোকের লিপি সংখ্যা হয় একশো চুয়ান্ন। তার মধ্যে পনেরোটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত অমু ঘোষ কর্তৃক (মাদ্রাজ প্রদেশের কুরনুল জেলায় ঘেরাগুড়ি নামক স্থানে) এবং দুটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩১ সালে শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাও শাস্ত্রী কর্তৃক (হায়দরাবাদ রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার উত্তরতীরে পালকিগুণ্ডু ও গবীমঠ নামক স্থানে)। এই সমস্ত বিস্মৃত লিপি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হল বটে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এগুলির পাঠোদ্ধারও

সহজসাধ্য ছিল না। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই য়ুরোপীয় মনীষিরা অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হন। বহু প্রয়াসের পর ১৮৩৭ সালে ইংরেজ মনস্বী জেমস্ প্রিনসেপ শিলাপাত্রস্থ মূক লিপি থেকে অশোকের বাণী উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অশোকের লিপিকে অবলম্বন করে নিরন্তর যে অজস্র গবেষণা চলছে তার সন্ধান নিলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত অশোক সম্বন্ধে যত গবেষণা-আলোচনা হয়েছে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তত আলোচনা হয়নি। যাঁদের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে অশোকের লিপি থেকে তাঁর চরিত্র ও বাণী দীর্ঘকালের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার লাভ করে আধুনিক মানুষের চিত্তকেও মুগ্ধ করছে তাঁদের মধ্যে প্রিনসেপের পরেই স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, এমিলি সেনার, জি কুলার, ভিনসেণ্ট স্মিথ, এফ ডবলু টমাস, হুল্ট্স্, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি মনস্বীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে শুধু যে আশোকের বিস্তৃত জীবন কাহিনী ভারতবর্ষের জাতীয় স্মৃতিতে নব দীপ্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা নয়, তাঁর চরিত্রই ভারত ইতিহাসের মহত্তম ও উজ্জ্বলতম চরিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক (J. M. Macphail) অশোক-চরিত্রকে হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

In the history of ancient India, the figure of Asoka stands out like some great Himalayan peak, clear against the sky, resplendent in the sun, while the lower and nearer ranges are hidden by the clouds.

এই উক্তির সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। বস্তুত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ভূমিকায় হিমালয়ের যে স্থান, তার ঐতিহাসিক ভূমিকায় অশোকেরও সেই স্থান। তাঁর চরিত্রের উত্তুঙ্গ মহিমা ভারত ইতিহাসের শিরোভাগে অবস্থান করে শুধু যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে চিরকালের জন্য আশ্রয় দিয়েছে তা নয়, ভারতীয় গৌরবকেও জগতের কাছে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বস্তুত অশোকের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও জাতীয় জীবন তার চরম সার্থকতা লাভ করেছিল এবং সে সার্থক্যের মহিমা আজও অনতিক্রান্ত রয়েছে।*

* অচিরপ্রকাশিতব্য 'ধর্মবিজয়ী অশোক'-এর ভূমিকা।

বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার রূপরস সাধনা

[নব্যকলা]

যামিনীকান্ত সেন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পরিবারে জন্ম, সে পরিবার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না হলে হঠাৎ একটা চিত্রপদ্ধতির উদ্ভাবনের ইতিহাস সুস্পষ্ট হবেনা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। সেকালে ব্যবসাবানিজ্যদ্বারা ইনি প্রচুর সম্পদ অর্জ্জন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আসবাব পত্র, বসনভূষণে যে রূপ উৎকৃষ্ট রুচি ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি প্রকট হত তা ছিল সে যুগে দুর্লভ। এ দেশের রচনায় কোন জিনিষ উৎকৃষ্ট সে সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। কথিত আছে তিনি প্যারিসে ইউরোপের রাজরাজরাদের একটা বিরাট ভোজ দেন এবং অভ্যাগত সকলকে এক একখানি কাশ্মিরী শাল্ উপহার দেন। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের মূল্যবান চিত্রসংগ্রহ ছিল এবং তিনিও একজন উৎকৃষ্ট সমজদার ছিলেন। তাঁর ধর্ম্মপ্রবণ চিত্ত তাঁকে করে সংযমী, সাধু ও মননশীল। তাঁর পুত্রেরা সকলেই কাব্য ও কলার দাস ছিলেন। গগণেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র ঠাকুর এ পরিবারের দ্বিতীয় শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের ভিতর সেই কলা-কুশলতা বিশেষ-ভাবে সংক্রামিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে ভাবপ্রধান আকর্ষণ—এরূপ সূক্ষ্ম ও উল্লোল ভাবের পৃষ্ঠপট আধুনিক আর কারও চিত্রে নেই। তা ছাড়া তিনি ঠিকভাবে চিত্রকলার সংস্কার আরও করেছিলেন। তা'তে তরল সৌন্দর্য্য ও বাস্তবতার নকল করার কোন প্রয়াসই ছিলনা। শিল্পীর বহুচিত্র লোকচক্ষুর গোচর হয়েছে—কোথাও তিনি জন-সাধারণের জন্য প্রচলিত হুবহু চিত্রের অনুকরণকে সংক্রামিত করে কোনও চিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদন করেন নি। এক্ষেত্রে তাঁর বিপরীতধর্ম্মী ছিলেন রবিবর্ম্মা। রবিবর্ম্মার চিত্রের বাস্তববাদ (realism) ফটোগ্রাফের মত। সে হিসেবে প্রাচ্য আদর্শের মাদকতা তাতে নেই। রবিবর্ম্মার 'রাধাকৃষ্ণ', 'নলদময়ন্তী', 'দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা' ও 'উর্ব্বশী' প্রভৃতি চিত্র মডেল দেখেই আঁকা সম্ভব হয়েছে। এ সব চিত্রে বর্ণক্ষেপের বাহাদুরী আছে ; এ রকম

বর্ণসঞ্চার ভারতীয় চিত্রে বহুকাল দেখা যায়নি। অপরদিকে তাঁর রচনা একেবারে ইউরোপীয় আদর্শে কল্পিত। তা'তে ভারতের বা প্রাচ্য অঞ্চলের রেখা বা রঙের স্বাধীন কালোয়াতী কোথাও মাথা তোলেনি। এক সময় রবিবর্ম্মার চিত্রে পাশ্চাত্য ভাবপুষ্ট এদেশ আত্মহারা হয়।

অবনীন্দ্রের 'নূরজাহান' ও রবিবর্ম্মার 'উর্ব্বশী'র কল্পনা একেবারে বিপরীত। ভাবের ও কল্পনার যাদু এবং প্রাচ্য আবহাওয়ার আলেয়া অবনীন্দ্র যেমন নিজের চিত্রকলায় সঞ্চারিত করেছেন এমন আর আধুনিক কেউ করতে পারেন নি। ঠাকুর পরিবারে কলাবিত্তা সম্পর্কে উচ্চশ্রেণীর আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা অবনীন্দ্রের মনোজগৎ সমৃদ্ধ হয়েছিল। সে সমৃদ্ধি তাঁকে ভাবপ্রকাশের যে সুযোগ দিয়েছে সে সুযোগ আর কেউ পায়নি। ক্রমশ অবনীন্দ্রের কলাচক্র সাহেবদের সুনজরে পড়ে। হ্যাভেল প্রমুখ শিল্পীরা খুব ভাল করেই অবনীন্দ্রের চিত্রকলাকে অভ্যর্থনা করে। অবনীন্দ্র বহুচিত্র এঁকেছেন। সব কিছুতেই প্রাচ্য আবহাওয়া সঞ্চারিত করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তুলিকা প্রয়োগের কায়দায় তিনি কতকটা জাপানী রীতিই অবলম্বন করেন।

অবনীন্দ্রের জেষ্ঠভ্রাতা গগনেন্দ্রের প্রতিভাও এক্ষেত্রে সামান্য ছিলনা। তিনি এদেশে আর এক পথে চলেন। ইউরোপীয় ঘনপন্থী (cubistic) চক্রের রচনার ভিতর তিনি কলালীলার নূতন মায়া দেখতে পান। সে পথে তিনি বিস্ময়জনক সৃষ্টি করেন—যা ঠিক ইউরোপীয় নয়। তা'ছাড়া তাঁর নৈশবিষয়ক চিত্রগুলি ছিল এদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আলো ও ছায়ার দুরূহ প্রয়োগে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নামক চিত্রে তিনি সোনালি রং ব্যবহার করতেও ছাড়েন নি। এ সব রচনা ঠিক পাশ্চাত্য নয়—অথচ এগুলির ভিতর পাশ্চাত্য প্রথায় অবিকল নকল করার কোন আগ্রহই দেখা যায় না। গগনেন্দ্রের রচনাতে একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতির সূচনা হয়েছে। এদেশের নব্য চিত্রকলার আধুনিক ইতিহাসে গগনেন্দ্রের নাম উল্লেখ না করলে তা' অসম্পূর্ণ হয়। এ দু'জন শিল্পী Indian Society of Oriental Art-এর প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

অবনীন্দ্রের শিষ্য ছিল অনেক। এ সব শিষ্যদের রচনা অবনীন্দ্রের প্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত করে। শিষ্যদের নিকট অবনীন্দ্রের পরাজয় কথনও ঘটেনি। অবনীন্দ্রের আবহাওয়া ও মনন কোন শিষ্যই আয়ত্ত করতে পরেনি। অবনীন্দ্রের কল্পনার অঘটন-ঘটনপটু ইন্দ্রজাল কোন শিষ্যই অধিকার করতে পারেনি। শিষ্যদের ভিতর নন্দলাল বসু রেখা রচনার কৃতিত্বে অপরাজেয়। সচরাচর রেখাপ্রয়োগে অধিকার লাভ করার পশ্চাতে বহু সাধনার প্রয়োজন হয়। নন্দলালের প্রতিভা তাকে এ সাধনায় বহুপরিমাণে সিদ্ধিদান করে। নব্য ভারতীয় পদ্ধতিতে রচিত চিত্রপ্রসঙ্গে রেখাপ্রয়োগের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ সবসময়

সুলভ হয়না। শিল্পী যখন কংগ্রেস মণ্ডপ অলঙ্করণে আহূত হন তখন গণকলা বা Folk Art-এর আদর্শে চিত্রপর্য্যায় রচনা করার এক সুযোগ তাঁর ঘটে। সে ক্ষেত্রে শিল্পীর রেখা প্রয়োগের অভূতপূর্ব্ব গতিবেগ ও সৌকুমার্য্য সহজেই প্রকাশ পায়। গণচিত্রের প্রচলিত ধারার রুদ্ধ কাঠামো ছিন্ন করে নন্দলাল যখন এক্ষেত্রে চিত্ররচনায় উৎসাহিত হন—তখন তা' এক নূতন রূপদীপালী রচনা করেই অগ্রসর হয়। প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় জীবনের মধ্যযুগে বিচিত্র বর্ণব্যঞ্জনায় যশস্বী হন। এ শিল্পী অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কিছুকাল বরোদা রাজ্যে চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী চিত্রকলায় অবনীন্দ্রের দীক্ষা গ্রহণ করলেও ভাস্কর্য্যে বিশেষভাবে নিজের প্রতিভা দেখান। কলিকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিকল্পনা এ শিল্পীর কাজ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার এক মূর্ত্তিও দেবীপ্রসাদ রচনা করেন।

রবিবর্ম্মার প্রাকৃত রীতিতে যে সব শিল্পী বাংলাদেশে তুলিকা প্রয়োগ করেছেন তাঁদের ভিতর শিল্পী হেমেন মজুমদার সকলের অগ্রণী। কিন্তু এ ধরণের চিত্র ইদানীং কলার দিক থেকে কোন মর্য্যাদার অধিকারই দাবী করতে পারছে না। হুবহু ভাবে রচিত কলার মূল্য নেই বললেই চলে। এসব চিত্র অঙ্কনের অবকাশে শিল্পী বর্ণপ্রয়োগে নিজের যে স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দেয় তাই শুধু লক্ষ্য করবার বিষয়।

বাংলার নব্যচিত্রকলার ক্ষেত্রে শিল্পী যামিনী রায় আর একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। বাংলার গণশিল্পের ধারাকে অক্ষতভাবে পাওয়া গেছে পাহাড়পুরের রচনা হতে সুরু করে একালের কালীঘাটের পট আঁকার পদ্ধতি পর্য্যন্ত। তা ছাড়া বাংলাদেশের কাঁথায় আঁকা সূচির কাজ, চালচিত্রে ও আলপনা প্রভৃতিতে গণরচনার ছন্দ মুখর। তাতে গ্রাম্য-কলার প্রবল ও ব্যাপক নিবেদন প্রচুর আছে। এসব এ যুগে কতকটা প্রাচীনতার কঞ্চুকে ঢাকা ছিল। আধুনিকতার জীবন্ত শোণিতে এসব রচনা উষ্ণ হয়নি। শিল্পী যামিনী রায় এ ধারার আবার নূতনভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। গণকলার সবল রেখাহিল্লোল, দৃঢ় অনুভূতি ও প্রবল ভাবাবেগে যামিনী রায়ের চিত্রকলা ওতঃপ্রোত। এদেশে চিত্রগত নানা আন্দোলনের সকল প্রলোভন ত্যাগ করে এই সাহসী শিল্পী ধ্রুবতারার মত সমুজ্জ্বল ও স্থির গণকলার পথে অগ্রসর হয়েছেন অসীমের সীমাকে স্পর্শ করতে।

বাংলার পট প্রাচীনতার দিক দিয়ে অনেককে আকৃষ্ট করলেও রসের দিক দিয়ে খুব কম লোকের চিত্তকেই আকৃষ্ট করেছে। এক সময় শুধু রেখার প্রয়োগে এসব প্রচুরভাবে সৃষ্ট হয়ে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করত। মাটির হরেক রকমের খেলনা যেমন তীর্থযাত্রীদের বা মেলার দর্শকদের চিত্তবিনোদন করত, এসব রচনাও তেমনিভাবে সকলের মনোহরণ করত। কিন্তু ইউরোপীয় ক্ষমতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এ শ্রেণীর প্রেরণা শীর্ণ হয়ে যায়।

ইদানীং ইউরোপের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি পাশ্চাত্য দৃষ্টিকে আবার অন্যদিকে আকৃষ্ট করেছে। আন্তর্জাতিক সমগ্র সৃষ্টিসঞ্চয়কে বিচার করে ইউরোপীয় রসিকরা গ্রীক বা রোমক আদর্শকে একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলে' ঘোষণা করেছেন। ফলে আদর্শের ঘটেছে এক বিপর্য্যয় ও বিপ্লব।

এ বিপর্য্যয়ের ফলে ইউরোপ "অদ্ভুত" বা "অত্যুক্তিপূর্ণ" রচনাকেই মর্য্যাদা দান করছে। নিগ্রো রচনার প্রতি এ প্রসঙ্গে অনেকে আকৃষ্ট হয়েছে। আধুনিক শিল্পী Epstein "আদম" ও "খ্রীষ্টের মূর্ত্তি" করেছেন নিগ্রো আদর্শে। নিগ্রোশিল্পের plastic গুণে পাশ্চাত্য জগত মুগ্ধ হয়েছে। একে গ্রীক ভাস্কর্য্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলা হচ্ছে। চিত্রকলাক্ষেত্রে ও অন্তরঙ্গ (Expressionist) কলা একেবারে নূতন অপ্রাকৃত ও অবাস্তব আদর্শের পথে চলতে থাকে। সব রচনাকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে গলিত ও অঙ্গহীন আদিম অবস্থায় উপস্থিতি করাই শিল্পীর কর্ত্তব্যে পর্য্যবসিত হয়। এমনি করে' বাইরের আচরণ ভেঙ্গে ভিতরকার যথার্থতা উপস্থিত করা যায়। শিল্পী Matisse Ganguin প্রভৃতি "composition" এর পরিবর্ত্তে "decomposition"এ উৎসাহিত হয় বেশী। জর্ম্মন শিল্পী Klee প্রভৃতির রচনায় শিল্পের এই নূতন ভঙ্গী প্রবর্ত্তিত হয় অম্লানভাবে।

নগরের দিক হ'তে Clive Bell ও Roger Fry আর্টের উদ্দেশ্য যে "Significant form" রচনা করা একথা এযুগে ভাল করেই বলেছেন পাশ্চাত্য ক্ষমতার দিক হ'তে। কাজেই রূপরচনার কোন বিশেষ ভঙ্গী না দিলে যে একাজ সিদ্ধ হয় না তা সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ নূতন ও বিশিষ্ট ভঙ্গী দান করতে হলে শুধু বহিরঙ্গের লঘু সৌষ্ঠব সম্পাদন যথেষ্ট নয়। ইউরোপ একসময় যা' বাইরে দেখা যাচ্ছে তাই অনুকরণ করে' মনে করত শিল্পীর কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে। আবার এযুগে দেখ্ছে বস্তু বা জগৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন সমস্ত প্রতীতি ভুল। আইনষ্টাইন (Einstein) দেশকাল সম্বন্ধে প্রাচীন সকল বিশ্বাস ও জ্ঞান ভুল, তা প্রমাণিত করেছেন। দার্শনিক বার্গসোঁর কালবাদ ("Duree") ইউরোপের মনোজগতে এক নূতন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। রঞ্জন-রশ্মি এক সুগুপ্তজগতের নূতন দৃশ্য উপস্থিত করেছে। অন্যদিকে ফ্রয়েড মনোজগতের উর্দ্ধস্থিত যবনিকার অন্তরালে এক বিরাট প্রোথিত অবমানসজগৎ আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপকে এসব এক নূতন অপ্রত্যাশিত অসীমতার দিকে নিয়ে গেছে। তা'তে করে' পুরাতন প্রাকাশিক (Expressional) রীতি আর পর্য্যাপ্ত হচ্ছেনা—নূতন পথে চলতে হচ্ছে। এ পথ ভাঙ্গবার পথ। বাইরের ভাসমান রূপের মূল্য স্বীকার না করে অন্তরঙ্গ রূপকে উপস্থিত করাই হল কলাকৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ দান। এজন্য ইউরোপ আজ গণকলারও পক্ষপাতী হয়েছে। পশ্চিমের অতিপ্রাকৃত (Sur-real) আর্ট রূপলীলাকে এলোমেলো ও অহেতুকী করতে উৎসাহিত করেছে।

শিল্পী ডালি ও আর্ণেস্টের রচনা মত্ততার সৃষ্টির মত। তাতে কোন যুক্তি বা হেতু নেই, অবমানস জগতের হিল্লোলের মত বা উল্লোল স্বেচ্ছাতান্ত্রিক মত্ততায় ভরপুর।

তাই এদেশেও যামিনীরায়ের সৃষ্টির প্রতি ইউরোপীয় কলাকুশলীরা আকৃষ্ট হয়েছে। যামিনী রায় পটের রচনাকে অনুকরণ মাত্র করেছেন এ কথা মনে করা ভুল। শিল্পী গ্রাম্য অলিগলির ভিতর হ'তে এই কলারীতিকে উদ্ধার করে' একে বিরাট রাজপথে নিয়ে এসেছেন। নূতন নূতন সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যামিনী রায়ের রচনা সমুজ্জ্বল। শিল্পী এই রচনার ভিতরকার প্রাচীন ছন্দের তাল বোঝেন এবং এ তালকে আরও বিচিত্র ও বহুমুখী উপাদানে অভ্রান্তভাবে সমৃদ্ধ করতে জানেন। এরূপ সমৃদ্ধ করার অধিকার এদেশে আর কারও জন্মেনি।

বিস্ময়ের বিষয়, পটের ছন্দকে শিল্পী সঙ্গত করেছেন ইউরোপীয় অন্তরঙ্গ সৃষ্টির সহিত। তা'তে করে' শিল্পীর রচনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। শিল্পীর প্রতিটি রচনার সাহসিকতার সহিত অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্য্য সমতান হয়েছে। এ কৃতিত্ব অসাধারণ প্রথম শ্রেণীর শিল্পী না হ'লে অবলীলাক্রমে রূপের এই ঐক্যতান রচনা সম্ভব হয়না। ফলে যামিনী রায় আন্তর্জাতিক রসিকদের প্রিয় ও বরণীয় হয়েছেন। ইদানীং যামিনী রায়ের গৃহ আমেরিকা ও ইউরোপ হ'তে আগত দর্শকে পূর্ণ হয়ে যেত। বহুকাল পরে সমগ্র জগতের নিকট বাঙালী শিল্পীর আবার অভিনন্দন লাভ সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বাঙালীর সাধনা ও মনন একটা নূতন শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠায় ভারতে অগ্রণী হয়েছে। বাংলার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় অতি প্রাচীন কাল হতে পাওয়া গেছে এবং প্রতিযুগেই পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক যুগেও বাংলা দেশ রূপকলার নূতন সৃষ্টির বাহন হয়ে সমগ্র ভারতে নিজের প্রতিষ্ঠাকে জয়যুক্ত করেছে। বন্ধনের ভিতর মুক্তি, অন্ধকারের ভিতর আলো, জড়তার ভিতর প্রাণশক্তি উদ্বোধন করে' বাংলা দেশ মৃত্যুর ভিতর অমৃতের সন্ধান সম্ভব করেছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি অভাবনীয় আবির্ভাব সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এদেশের পক্ষে একটি নূতন ঘটনা। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ একশ্রেণীর চিত্ররচনা করে' সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করেছেন। এ চিত্রকলা বন্দিত হয়েছে ইউরোপে ও এশিয়ায়। কবির কাব্যসৃষ্টিই এ প্রশংসার হেতু হয়েছে একথা ঠিক নয়। যে রীতিতে এই চিত্রপর্য্যায় সৃষ্ট হয়েছে তা'র সঙ্গে বিশ্বের সৌন্দর্য্যবোধের উষ্ণ সম্পর্ক আছে। ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের অবাস্তব, অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত (sur-real) সৃষ্টির সহিত কবির এসব রচনা সহজেই সঙ্গত হয়েছে। জাপানে কবির এ সমস্ত চিত্রসঞ্চয় প্রদর্শিত হয়ে সকলের চিত্তরঞ্জন করেছে। কবি এ ক্ষেত্রে নিজের অশিক্ষিতপটুত্বে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন। ইউরোপে, জর্ম্মনীতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবির চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয় তা' রসিকদের বিশেষ মনঃপূত হয়। বাংলার রূপরস সাধনা এমনি করে'

যন্ত্রের বল্গাহীন অশ্বের মত দিগ্বিদিকে ছুটে গেছে। বিখ্যাত জর্ম্মন আলোচক H. Fremden Blatt এসব চিত্র সম্বন্ধে বলেন: "Fine sense of line, marble colouring, tenderly sensitive and shining in darkling hues"। সমালোচক বলেন রহস্যপন্থী বলে' ভারতীয় রচনার জর্ম্মন শিল্পীর রচনার সহিত একাত্ম হওয়া সম্ভব হয়েছে। সমালোচক বলেন: "An inclination to mystery connect the Indian with Nolde—All is full of rhythm and inner melody."

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ভাবাবেশ ও রচনাভঙ্গীর স্বাধীনতা এদেশের পক্ষে অভিনব। তাঁর বিদ্যালয়ে এ পর্য্যন্ত যা রচিত হয়েছিল তার সহিত নিজের সৃষ্টির কোন সাম্যই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে। কবিবর Yeats তাঁর কাব্যকে সকলের সামনে উপস্থিত করেন ভূমিকার সাহায্যে। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ভিতর একটা সার্ব্বভৌম রূপবিবেকের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত নয়। এদেশের পক্ষে একেবারে অভিনব হ'লেও তাঁর চিত্রকলার ভিত্তি পাওয়া যাবে এদেশের গণকলার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপমূর্চ্ছনায়। রবীন্দ্রনাথ এজন্য যামিনী রায়ের রচনারও পক্ষপাতী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এসমস্ত চিত্রাবলী রচনা করে' লেখককে মতামতের জন্য বোলপুরে নিমন্ত্রণ করেন। প্রকাশ্যভাবে এর আগে এসব চিত্র কাকেও দেখান হয়নি। প্রথম দেখার এ সুযোগ গ্রহণ করে লেখককে এসব সৃষ্টির রূপগত সার্থকতা বিষয়ে একটি বিবৃতি দান করতে হয় ঘনিষ্টভাবে। তা'তে এসব রচনা নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রদর্শনী করার একটা প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন।

কলিকাতারও একটা বিশেষ প্রদর্শনী হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার Govt. School of Art গৃহে। আহুত হয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার একটা বিশিষ্ট সমালোচনা "বিচিত্রা" কাগজে প্রকাশের জন্য দান করেন। এ সমালোচনায় বলা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে এক করেছে। বস্তুতঃ বাংলা দেশের পক্ষে চিত্রকলাক্ষেত্রে এজন্য আন্তর্জাতিক দান একটা গৌরবের বিষয়।

এ কয়টি শিল্পরীতি প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব বাঙালীরই, আর কারও নয়। এটা কি শুধু একটা আকস্মিক ব্যাপার? মোটেই নয়। বাঙালীর রক্তে আছে চিরনবীনত্বের তরঙ্গভঙ্গ। মৃত্যুর ভিতর দিয়েও অমৃতের পথ খুঁজে নিতে বাঙালীই যে সক্ষম একথা পূর্ব্বে বলেছি। কাজেই বর্ত্তমান যুগেও বাঙালী জাগ্রত। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ইউরোপের নেশায় ভোর তখন বাংলায় জেগেছিল প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদই জীবনের লক্ষণ। ইংরাজ কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে' বড় বড় অর্থকরী পদের সৃষ্টি করে' অনেক দেশকেই ইদানীং

অহিফেন সেবনে যেন মূঢ় করে' রেখেছে। বাংলা দেশের জাগরণ হয়েছে বহুকাল—এ দেশকে উৎকোচে বশীভূত করা যায় নি।

ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীতকলায়ও বাংলা দেশ বিশিষ্ট নবীনতার দিকে গেছে। ভাস্কর্য্যে দেবীপ্রসাদ, জি পাল, প্রদোষ দাসগুপ্ত প্রভৃতি অনেক শিল্পী একটা নূতন জাগরণ নিয়ে এসেছে। সঙ্গীতকলায় রবীন্দ্রনাথ এক নূতন বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন। প্রাচীন কালোয়াতী অত্যুক্তিকে বর্জ্জন করে' অপেক্ষাকৃত সহজ তানে ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো করা কঠিন ছিল। কবিগুরু নানা বৈচিত্র্য সম্পাদন করে' ভারতীয় সঙ্গীতের এক নূতন সীমান্ত উদ্ঘাটন করেছেন। অপরদিকে আর একজন বাঙালী শিল্পী প্রাচীন আয়তনের ভিতর একটা নূতন আবেগের সঞ্চার করেছেন আধুনিকতার নবীন আকর্ষণে। দ্বিজেন্দ্ররায়ের সঙ্গীতকলা এদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। অতি বলিষ্ঠভাবে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও রুদ্র ধ্বনির সমাবেশ করা হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতের নীবন্ধ রাগরাগিনীর বন্ধনকে নত করে'। এ দেশের কীর্ত্তন সঙ্গীত, রামপ্রসাদী রচনা ও বাউল সঙ্গীত যেমন এককালে নূতন নূতন লীলায়িত ছন্দ ও মূর্চ্ছনার সাহায্যে উত্তরভারতীয় সঙ্গীতকলার নেতৃত্বকে তুচ্ছ করে, তেমনি এ যুগেও রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গীতকলা নূতনত্বের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। এ পথে অতুলপ্রসাদ সেনের দানও অতি বিচিত্র ও রসসমাবেশে ভারাক্রান্ত। এ তিনটি সঙ্গীতকারই বাঙালী। ভারতের অন্যান্য দেশ যখন প্রাচীনতাকে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে' আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকেও ঠুংরির সামান্য পাত্রে উপস্থিত করতে ব্যগ্র, তখন বাংলাদেশে এসেছে সাগরগর্জ্জনের মত নব্য অনুভূতির উত্তাল তরঙ্গ কল্লোল। তা'তে পুরাতন নোঙর ছিঁড়ে বাংলার মননশীল সভ্যতা নূতন পথে জয়যাত্রার পাল তুলেছে এবং অকুতোভয়ে দরিয়ার মাঝখানটায় ছুটে গেছে নূতন শঙ্খের ধ্বনি করে'। বাংলার এই জাগ্রত আহ্বান পাঞ্চজন্যের মত সমগ্র ভারতের দুঃস্বপ্ন যে ভঙ্গ করেনি একথা বলা চলেনা। বাঙালীর প্রদত্ত সুরে গীত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ভারতের সর্ব্বত্র এখনও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে একথা কেউ অস্বীকার করে না। এমনি ক'রে দিকে দিকে বাঙালী তুলেছে নূতন পতাকা এবং সমগ্র ভারতকে আহ্বান করেছে নূতন দিগ্বিজয়ে। বাংলাদেশ প্রাচীনতাকে অশ্রদ্ধা করেনি। ধ্রুপদের সমাদর বাংলা দেশেই ইদানীং অধিক কিন্তু ধ্রুপদকে বুকে রেখে বাঙালী মরতে প্রস্তুত নয়। ধ্রুপদ মোগলাই সভ্যতার পরিপক্ক দান—এ যুগে তা ঝরাফুলের মত—যদিও তা রূপে সমুজ্জ্বল এবং গন্ধে অতুলনীয় কিন্তু তবু এই নূতন রক্তে পুষ্ট নয়—নূতন সাধনায় তার' প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। যা' আধুনিকের হৃদয়-শতদলে বিকশিত হয়নি তা' জাতির নূতন পূজার সহায়ক হ'তে পারেনা।

কীর্ত্তন

মণিলাল সেনশর্ম্মা

(তিন)

কীর্ত্তন পালা গানের যে একটি ধারা নরোত্তম দাস সৃষ্টি করে তার নাম 'গরাণহাটি' কীর্ত্তন। খেতরীর মহোৎসবে যে গান হয় যা ভক্তিরত্নাকরে আছে তাতে দেখা যায় যে সে উৎসবে যে কীর্ত্তন গান হয়েছিল তাতে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নরোত্তমের পরিবারভুক্ত গোকুলানন্দ গানের প্রথমে মন্দ্রমধ্যতার স্বরে গমকাদি সহকারে রাগের আলাপ করে। উৎকর্ষ গানের আগে রাগের আলাপ করার যে রীতি এখনও রয়েছে কীর্ত্তনেও তা তখন ছিল বুঝতে হবে। কীর্ত্তনীয়াগণ গান ধরার আগে সকলকে একত্রে যে গান করে তাতে কথা থাকে না, যাকে 'মেল-জমাট' বলে, এই ব্যাপারটিতে বর্ত্তমানে সকলের কণ্ঠমিলন করে সুরের জমাট করার চেষ্টা হয় মাত্র। হয়ত কোন সময়ে সমবেত কণ্ঠস্বরে হারমণি আনবার চেষ্টা অথবা সুরের আলাপ করার উদ্দেশ্যে তা করা হতো। বর্ত্তমানে সেগুলি আর নেই। সেগুলিতে দোহার মত কোলাহলের সৃষ্টি হয় মাত্র।

খেতরীর উৎসবে গান করতে আরম্ভ করবার সময়ে নরোত্তমকে রঘুনন্দন মালা পরিয়ে দেয়। সেই অবধি কীর্ত্তন গায়ককে মালা পরিয়ে দেবার প্রথা প্রচলিত। নরোত্তম সর্ব্বপ্রথমে কীর্ত্তন গানের প্রথমে গৌরাঙ্গের যে গুণকীর্ত্তন থাকে, যাকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয় সে গান করে পরে লীলাগান আরম্ভ করে। পূর্ব্বে বলেছি এই গৌরচন্দ্রিকার গানের অঙ্গ বিভাগ প্রাচীন উৎকর্ষ সঙ্গীতের পদ্ধতিতেই রচিত। গরাণহাটি কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু পাওয়া যায়না। তবে অন্যান্য দুটি কীর্ত্তনের পদ্ধতির নাম পরগণার নাম হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করা হয় যে গরাণহাটি নামেও কোন পরগণা ছিল যার থেকে গরাণহাটি নাম হয়েছে। এই খেতরীর মহোৎসব শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী ঘটনা। তখন থেকে কীর্ত্তনের আর এক নতুন রূপ প্রবর্ত্তিত হয়ে থাকলে তার পূর্ব্ববর্ত্তী কীর্ত্তন অনেকাংশে সঙ্গীত-রত্নাকর অনুমোদিত প্রাচীন মার্গসঙ্গীত ছিল।

বর্দ্ধমান জেলার মনোহরসাই পরগণার নাম হতে উৎপন্ন মনোহরসাহি কীর্ত্তন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রবর্ত্তন করে বলে জানা যায়। জ্ঞানদাস বলরামদাসদের সমসাময়িক শ্রীনিবাস আচার্য্য। মনোহরসাহি কীর্ত্তনে সুরের কারুকাজ অত্যন্ত বেশী। গরাণহাটির সুর গম্ভীর ও চাল ভারী। মনোহরসাহি তার থেকে চঞ্চল। মনোহরসাহিকে খেয়াল আর

গরাণহাটিকে ধ্রুপদের সঙ্গে চাল চলতিতে তুলনা করা চলে, যদিও খেয়াল আর ধ্রুপদ হতে তাদের রূপগুণের মূলগত প্রভেদ রয়েছে। এই মনোহরসাহিতে করুণ ভাব সহজে বেশী ফুটে উঠে। অক্ষয়কুমার সরকার তার 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে ১৮৭২ সালে চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' অভিনয় করা সম্বন্ধে লিখছেন—"খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে কীর্ত্তন প্রবেশ করে নাই; আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহি সুর লাগাইলাম। এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধুবাবুও আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন।" নাটকে সেই সময় হতে' কীর্ত্তনের সুর ঢুকেছিল। বর্ত্তমানেও সিনেমায় এবং নাটকে কীর্ত্তনকে ব্যবহার করা হয় তবে খুবই কম।

রেনেটী কীর্ত্তন-পদ্ধতির নামাকরণ বর্দ্ধমান জেলার রাণীহাটি পরগণা হতে এসেছে। এই পদ্ধতিও শ্রীনিবাস আচার্য্যই নাকি সৃষ্টি করে। রেনেটি গীত টেঁয়াবৈদ্যপুরে বৈষ্ণব দাস ও তাঁর বন্ধু উদ্ধব দাস প্রভৃতি খুবই সমৃদ্ধ করেছিল। তাছাড়া আরও একটি পদ্ধতি—নাম মান্দারণী (মান্দারণ-মেদিনীপুর) রেনেটির মতই সহজ ও চঞ্চল। কিন্তু এই চঞ্চল সুর খেমটা তালে বাঈজির গানের সুরের মত নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তনের যে ধারা প্রচার করেছিলেন তার বিকাশ পরবর্ত্তীকালে খুবই ঘটেছিল তবে আঠার শতকের মাঝামাঝি হতেই কীর্ত্তনের অবনতি আরম্ভ হয়। আঠার শতকের প্রথমদিকে রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত-সমুদ্র' সংকলন করেন। আর তার কয়েক বৎসর পরে বৈষ্ণব দাস 'পদকল্পতরু' সংকলন করেন। কাজেই সে সময় পর্য্যন্ত কীর্ত্তন যে বাংলায় ব্যাপক ভাবে চলছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আঠার শতকে 'পাঁচালী' ও কবিগানের খুব প্রচলন হতে থাকে, রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে কবিগান হতো। কিন্তু কবিওয়ালাদের পাল্লা আর তার পালটা জবাব জনসাধারণ বেশী উপভোগ করতো বলে মনে হয়। সে সময় হতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায়, আর কীর্ত্তন সাম্প্রদায়িক হতে থাকে। পাঁচালী, কবিগান ও যাত্রাগানের প্রসার তখন বাড়তে থাকে।

উনিশ শতকে কীর্ত্তনের একটি ধারার সৃষ্টি হয় যার নাম 'ঢপ'। ঢপ শব্দটির কি ভাবে উৎপত্তি তা জানা যায় না। যশোর জেলার মধুসূদন নামে কান একজন বৈষ্ণব এই গানের যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন। তাঁর পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে গান করতেন। আর তাঁর অনেক পদ রচিত আছে তাতে কীর্ত্তন পদাবলীর নিয়ম অনুসারে 'সূদন' নাম দিয়ে ভনিতা দেওয়া হতো। গত শতকের মাঝামাঝি হতে 'ঢপ' খুব চলতে থাকে। 'ঢপে' রাগরাগিনীর রূপ রাখবার চেষ্টা করা হতো তবে কীর্ত্তনের ছায়া যথেষ্ট ভাবে থাকে। 'ঢপ'

গায়িকাদের মুখেই সচরাচর শোনা যায় তবে কয়েক বৎসর যাবৎ ততটা প্রচলন নেই। বর্ত্তমানেও হিন্দুর আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে কীর্ত্তন গাওয়ার রীতি প্রচলিত। তাতে পূর্ব্বে কীর্ত্তন-ওয়ালীদের গাইবার রীতি ছিল; বর্ত্তমানে পুরুষ গায়কগণই গেয়ে থাকে।

কীর্ত্তনে 'ঔড়ব' বা 'খাড়ব' সুরের গান প্রায় নেই বললেও চলে। সবই 'সম্পূর্ণ' জাতীয় গান। কোন সুরকে বাদ দেওয়া কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য নয়। সবকে নিয়েই কীর্ত্তন। তা'হলেও 'ঔড়ুব' ও 'খাড়ব' শ্রেণীর রাগরাগিনীর আভাস কীর্ত্তনে আছে। কিন্তু সে-গুলি কীর্ত্তনে ততটা নিষ্ঠার সঙ্গে দেখানো হয় না। রাগের রূপের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, শ্রোতার মন যাতে রাগের গঠনের উপর আকৃষ্ট না হয়, আর প্রতিবাদ্য বিষয়টির দিকে তাদের মনে যাতে নিবিড় করে ধরে দিতে পারা যায় সে দিকেই গায়কের প্রধান ও প্রথম দৃষ্টি থাকাতে রাগের রূপের একটু আধটু ত্রুটিকে এতকাল গ্রাহ্য করা হয়নি। আর তাতে কীর্ত্তনে রাগের রূপের পরিবর্ত্তন অনেকটা হয়ে পড়েছে। এতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই; কেন না প্রাচীন রাগের রূপের তারতম্য বর্ত্তমানে প্রচলিত অন্যসব উৎকর্ষ সঙ্গীতেও যথেষ্ট। এখনকার রাগের রূপ নিয়েই বর্ত্তমানের উৎকর্ষ সঙ্গীত। সব রাগের রূপ না পাওয়া গেলেও কতগুলি রাগের কাঠামো কীর্ত্তনে এখনও আছে। অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা কীর্ত্তন শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন অথবা শুনেছেন তাঁদেরে আর ভূমিকা করে বলতে হয় না। উত্তর ভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতে অধুনা অপ্রচলিত এমন অনেকগুলি যেমন—মালব মুখারী ইত্যাদি রাগের গান এখনও কীর্ত্তনে প্রচলিত আছে। তাছাড়া সিন্ধুড়া, খাম্বাজ, জয়জয়ন্তী বেহাগ, গুর্জ্জরী, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি অনেক রাগেই কীর্ত্তন গাওয়া হয়।

কীর্ত্তনে রাগ ব্যবহারের একটি ক্রম এখনও আছে। রাগ গাইবার যে সময় নিরূপণ করা আছে—যেমন ভৈরব সকালে, বিকালে গৌরী, রাত্রিতে বেহাগ—সেটি কীর্ত্তনের পালা গানের ক্রম অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা চলে যে কুঞ্জভঙ্গ অতিপ্রত্যূষে গাইবার রীতি। সেই পালাতে যে গানগুলি ব্যবহার করা হয় সে গানগুলিতে সকালবেলা গাইবার যে রাগগুলি আছে সে সব রাগের রূপই বেশী পাওয়া যাবে। যে পালাতে ভৈরব রাগের সুর বেশী শোনা যায়। সেরূপ উত্তর-গোষ্ঠ গাইবার রীতি সন্ধ্যায় বলে তাতে গৌরী রাগের সুরই বেশী। আর রাস গাইবার রীতি মধ্য রাত্রে, কাজেই তাতে বেহাগের প্রাচুর্য্য।

কীর্ত্তনে বহু প্রকারের কঠিন তালের ব্যবহার হয়। তাদের মধ্যে কতগুলি তাল উত্তরভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতেও ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে কঠিন তালের গান তেমন নেই। ধ্রুপদে ভারী ছন্দের তাল আড়াচৌতাল, ধামার ইত্যাদি অথবা টপ্পায় মধ্যমান তালের গানে গুরুগম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হতো। খেয়ালে যদিও গম্ভীর ছন্দের তালে গান আছে কিন্তু

অধুনা সাধারণতঃ খেয়ালে 'তেতালা' তালের গান ছাড়া বড় একটা শোনাই যায় না। কীর্ত্তনে ভাবকে উঁচু স্তরে নেবার জন্য গুরুগম্ভীর ছন্দের ব্যবহার বেশী হয়। অবশ্য হালকা ছন্দও রয়েছে; সেগুলিও সময় সময় ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত। কীর্ত্তনে ভাবকে আরও হৃদয়স্পর্শী ও নিবিড় করার জন্যে একই গানে তালের পবিবর্ত্তন করা হয়। আখরে তালের পরিবর্ত্তন তো একরকম না করলে চলেই না। অন্য কোন সঙ্গীত-পদ্ধতিতে এমন তাল পরিবর্ত্তনের নিয়ম নেই। তবে গতির পরিবর্ত্তন সব সঙ্গীতেই আছে, কীর্ত্তনেও আছে। খোলের ছন্দে যে 'আখর' তাকে 'কাটান' বলে। গায়ক ভাবকে কাটিয়ে তুল্‌তে যখন 'আখর' ধরে আখরের ছন্দ অনুযায়ী খোলের বাজনা যখন চলে তখন তাকে বলে 'কাটান'। আখরকেও অনেক সময় কাটান বলা হয়। এইভাবে গায়ক ও বাদক সুর ও বাদ্যের সহযোগিতা কীর্ত্তনে করে থাকে। অনেকেই উত্তরভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতের রাগরাগিনী ও পদ্ধতির গানের সঙ্গে কীর্ত্তন গানের সুর মিলিয়ে মনে করে কীর্ত্তনে রাগরাগিনী নেই, সুরের কাঠামো নেই। অর্থাৎ তারা সশ্রদ্ধ হয়ে ভেবে দেখেনি যে কীর্ত্তন গানে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে শ্রোতার মনে তুলে ধরার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। রাগের অঙ্গ-শোভা শ্রোতার কানে তুলে ধরাটা তাদের কাছে গৌণ ব্যাপার। কিন্তু উত্তর ভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতে শেষ পর্য্যন্ত রাগের অঙ্গশোভা শ্রোতাকে ধরিয়ে দেওয়াটাই মুখ্য হয়ে পড়ায় একটা মূলগদ প্রভেদ এই শ্রেণী দুটির মধ্যে আছে। উত্তর ভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতে অভিজ্ঞ অনেকেই কীর্ত্তনের তালের মাত্রা গুনে গুনে ছন্দ ধরতে না পেরে মনে করেন কীর্ত্তনে তাল নেই। অথচ কীর্ত্তনে বিষম পদী ও সমপদী বেশ সূক্ষ্মমাত্রা বিভাগের উপর খুব কঠিন তাল সব আছে যেগুলি অভ্যাস করা বেশ আয়াসসাধ্য।

বৈষ্ণব সুরকারগণ যে সুর রচনা করেছেন সেগুলি বাস্তবিকই অভিনব। সুরগুলি উদ্ধত বা আকস্মিকতাগ্রস্ত নয়। তাদের আবেদন কমনীয় তার মূলে আছে কীর্ত্তন গানের উদ্দেশ্য—আত্মনিবেদন। তারই জন্য সুরের দাপট নেই আছে নমনীয় ভাব। কীর্ত্তনের সুর নিবেদিতা হয়ে কান্তের দিকে চলেছে। কিন্তু মানবীয় প্রীতি ইচ্ছার ভাব যাতে সুরে না আসে তার দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি আছে তাদের সুররচনায়। জ্ঞানদাসের পদ "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"—গানটিকে হালকা ছন্দে এমন সুর দেওয়া সম্ভব যা যে-কোন গায়কগায়িকার কণ্ঠে লালসাবর্দ্ধক আবেদনই বেশী প্রকাশ পাবে। কিন্তু বৈষ্ণব সুরকার এই পদের সুর কামগন্ধহীন করবার জন্যে খুব ঢিমা ছন্দে সুরটি খুব টেনে টেনে চড়া সুরে তুলে গাইবার সুর রচনা করে দিয়েছে যাতে গায়কগায়িকা ও শ্রোতার মনে নীচু ভাব না আসে; অথচ তারা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সন্ধান পায়। বৈষ্ণব-

পদাবলীর সুর সবই ঐরূপ। সুর রচনায় তাদের যে কতটুকু চিন্তা রয়েছে সে কথা কীর্ত্তনের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব না থাকাতে অনেকের কাছেই তা এখনও অবোধ্য।

বাংলার একটি বিশেষ উৎকর্ষ সঙ্গীত কীর্ত্তন—এমন একটি গীতপদ্ধতি পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু কীর্ত্তনের প্রচলন বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও তেমন নেই কেন। যাকে নিয়ে বাঙ্গালী জগত-সভায় পরিবেশন করতে পারে তার এমন দশার প্রধান কারণ কীর্ত্তন বাংলায় রচিত, আর তার ভাব পরিস্ফুট করার 'আখর' দেওয়ার পদ্ধতি অভিনব হলেও সেটি কেবল বাংলা-সাহিত্যিকদেরই কাছেই অত্যন্ত উপভোগ্য, বাংলা ভাষা না-জানার কাছে সেটি ততটা উপভোগ্য নয়। প্রাদেশিকতাপূর্ণ বলেই কীর্ত্তনের সমাদর সারা ভারতেও ঘটেনি। সংস্কৃতে রচিত কীর্ত্তন কিন্তু এখনও দক্ষিণা-সঙ্গীতে প্রচলিত। ভারতীয় উৎকর্ষ সঙ্গীতে সর্গম প্রচলিত বলে এবং সুরের অলঙ্কার-ব্যবহার চলতি বলে তার প্রচলন তবুও অনেকটা ব্যাপক। কীর্ত্তনে সর্গম চলে না।

কীর্ত্তন অপ্রচলিত হয়ে পড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে সময় থেকে কীর্ত্তন সাম্প্রদায়িক হতে থাকে। জনসাধারণের দৃষ্টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিক থেকে অন্যদিকে যায়। সমবেত গানের চেয়ে একক গাইতে পছন্দ করতে থাকে। তাতে মালসী গান, রামপ্রসাদী প্রভৃতির দিকে সঙ্গীত-মন ঝুঁকে পড়ে। গত শতকের মাঝামাঝি হ'তে ধ্রুপদ পদ্ধতির অনুকরণে বাহ্য সঙ্গীত রচিত হওয়ার পর হতে সে-সব গানের চর্চ্চাই শিক্ষিত সমাজে চলতে থাকে, ফলে কীর্ত্তনের অধঃপতন ঘটে। তবে এই শতকের প্রথম দিকে রসময় মিত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রামকমল ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ ব্রজবাসী খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির চেষ্টায় কীর্ত্তনের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হচ্ছে। বাঙ্গালী সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞ কীর্ত্তনকে পছন্দ করেন না, ভাবতে পারা যায় না। আসলে যাঁরা পছন্দ এখন করেন না, তাঁরা কীর্ত্তন ভাল করে শোনেননি অথবা রাগোত্তর পর্য্যায়ে এখনও পৌঁছতে পারেননি।

কপাট

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

স্বপ্নের শিথিল ভাষা হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসে ;
দু-একটি বকুল ঝরে—তার পরে হাওয়া নেই আর।
হাওয়া নেই হাওয়া নেই, এইমতো মৃদু হাহাকার
হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে ; অথচ তখনো আমি চুপ।
যেহেতু হৃদয়মন তোমাকে দম্‌কা ভালোবাসে
তাই সে মরবে, তবু খুলবেনা কঠিন কুলুপ।
এবার তোমার পালা, দৃষ্টিধারার মৃদু ছাঁট
আমাকে মুছিয়ে দিক্, ভাঙে এই মনের কপাট।

মানুষের মন

(বীরেন্দ্র গুপ্ত-কে)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাখীদের দেখে দেখে
পাখীদের কাছ থেকে মন চেয়ে নিয়ে
আমরা উধাও হবো, অনেক আকাশ ধূ ধূ দূরে ফেলে রেখে
কোন এক সূর্যোত্তর তবু আলোজ্বলা কোনো নীলিমার দেশে
পাখীদের নীল মন হ'য়ে।

আমরা পাখীর মন হ'য়ে দূর থেকে
পৃথিবীর অরণ্যের কালোছায়া, মেঘেদের অন্ধকার দেখে

গত দুঃস্বপ্নের কথা সারারাত ভেবে ভেবে কখনো কাটাবো ;
কখনো তারার কথা ভুলে গিয়ে রাত্রিহীন জ্যোস্নাসাগরে
তবু চাঁদ মনে রেখে পৃথিবীকে কবিতা পাঠাবো।

পাখীদের দেখে দেখে
পাখীদের কাছ থেকে মন চেয়ে নিয়ে
পৃথিবীর মানুষের দুঃখ আর কান্না আর মৃত্যু-হানাহানি
আর তার কালোমেঘ, স্তব্ধ অরণ্যানী
কখনো বুকের কাছে সন্তর্পনে মণি ভেবে যত্নে দেবো রেখে!

আমরা পাখীর মন হ'য়ে দূর থেকে
মানুষকে দেখে দেখে তারপর চেয়ে নেবো মানুষের মন।
অনেক ঝড়ের রাতে অনেক দুকূলভাঙ্গা সমুদ্রের হিংস্নুক ঝিনুক
ভেজা বসনের প্রান্তে বেঁধে নিতে করবো যতন।···
সেদিন পাখীর বুকে আমরা কান্নায় ভরা চেয়ে নেবো মানুষের বুক।

রিক্ত

চিত্ত ঘোষ

দিন কাটে—
অসংখ্য সবুজ দিন
সময়ের মাঠে।

প্রসূতি অঘ্রাণ
হেমন্ত-শিশির রৌদ্রে
নিয়ে আসে ফসলের ঘ্রাণ।

ঝড়ে বৃষ্টি ধারা
জ্বলে সূর্য্য

হাসে চাঁদ
ছুটে পড়ে তারা।

দিন বাড়ে—
সবুজ ধানের শিষে
সোনালী আশ্বাস মিশে,
মাটীর সমুদ্রে ঝড়
তরঙ্গিত হাওয়ায় উত্তাল,
ফসলের মর্ম্মর সঙ্গীতে
জন্ম লয় কিশোর সকাল।

দিন বাড়ে
ব্যর্থ দিন, কীটদষ্ট দিন
ম্লান, মৃত দিন।

ঝড়ের রাতের শেষে
সোনালী সঞ্চয়—
এল ডাক—
হ'ল বুঝি কাটার সময়!

মাটীর নরম মাঠে
ধান কাটে
দিন কাটে
সময় কৃষাণ,
আকাশের অন্ধকারে শোনা যায়
অরণ্যের গান।
অসংখ্য সোনালী ধান
আঁটি আঁটি ধান,

অসংখ্য উজ্জ্বল দিন
মায়াবী রঙীন,
মাটীর নরম মাঠে
আর নাই—
জীবনের ছায়া পথে
আর নাই।

আধ্যাত্মিকতা

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস. সি

বিজ্ঞানের যুগে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয়ত অনেকেই উপলব্ধি করবেন না, তার কারণ অনেকেই আধ্যাত্মিকতার অর্থ ও আদর্শ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নন। আধ্যাত্মিক পুরুষকে আমরা সাধারণত ভাবজগতের মানুষ বলে মনে করে থাকি, তাই বাস্তবজগতে সেই মহাত্মার নাগাল পাবার ভরসা রাখি না। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা এবং গান্ধীজীর সান্ধ্য-উপাসনা ঠিক এই কারণে দুর্ব্বোধ্য এবং রহস্যময় হয়ে ওঠে। মনে হয় যে আধ্যাত্মিকতা বিচারবুদ্ধিপ্রসূত নয়, যে আধ্যাত্মিকতা যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না, সেই ভাবসর্ব্বস্ব আধ্যাত্মিকতায় আজকের দিনে মানুষের কোন্ কল্যাণ সাধিত হবে, কতটুকু উপকারে আসবে?

এইখানে আমরা ভুল করি। কারণ আমরা আধ্যাত্মিকতার অর্থই যে জানি না। আধ্যাত্মিকতা বলতে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা অথবা মন্ত্রোচ্চারণে ভানুমতীর খেল বোঝায় না। আধ্যাত্মিকতা কোন বহিরাগত নৈসর্গিক সামগ্রী নয়, কিংবা কোন অত্যাশ্চর্য্য দৈব নয়। আজকের ধারণায় মানুষের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত কোন বিশেষ অধ্যাত্মলোকের স্থান নেই। "Spiritual can have a meaning only if it be applied to certain qualities of human experience as lived in its natural setting in the universe whose secrets scientific inquiry seeks to penetrate".—RANDALL. মানব-জীবনের

বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাজাত এই আধ্যাত্মিকতা এমন এক গুণবিশেষ যা জীবাত্মার কল্যাণকামী। আধ্যাত্মিকতার আদর্শ অনেক বড়ো। এই আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হলে মানুষ কখনো কারো অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। জগদ্ধিতায় মন্ত্রে যে নিজেকে দীক্ষিত করেছে তার মনে পার্থিব সম্পদ মোহ বিস্তার করবে কেমন করে? তাই অভিযুক্ত সক্রেটিসকে বলতে শুনি, যুবা-বৃদ্ধ সকলের কাছে আমার এই অনুরোধ তারা যেন ভোগ-বিলাসী না হয়, তাদের চিন্তা যেন কেবল দেহসর্ব্বস্ব না হয়, তারা যেন আত্মার উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করে। ঠিক অনুরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমরা অশীতিপর গান্ধীকে দেখতে পাই চলেছেন পূর্ব্ববঙ্গের মহাশ্মশানে নব-প্রাণের বীজ রোপণ করতে। একটি খাঁটি হিন্দু এবং একটি খাঁটি মুসলমানের সন্ধান কি সেখানে মিলবে যাঁদের আত্মা আজও অবিকৃত আছে? আধ্যাত্মিকতার মূল তত্ত্বই হল এই আত্ম-পরিচয় আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতি।

এখন এই আত্মার সংজ্ঞা কী এবং দেহ ও আত্মার পার্থক্য কী তাই জানতে হবে। আত্মা কি দেহ-ছাড়া যে আত্মার উন্নতি চাই অথচ দেহের প্রতি উদাসীন থাকতে হবে? ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সাধারণত মনে হবে জড় দেহে আত্মা হল জীবন—কিন্তু তাও ঠিক নয়, যেহেতু দেহকোষগুলি জীবন্ত এবং একমাত্র জীবন্ত দেহকোষেই আত্মা বা জীবনের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। আত্মা হল দেহ-মনের এমন এক বিশেষ অভিব্যক্তি, এমন এক বিশেষ গুণ, এমন এক বিশেষ কার্য্যক্রম, যা প্রকৃতির সঙ্গে জীবের এবং জীবনের সঙ্গে কার্য্যধারার সাম্য ও সংহতি বজায় রেখে থাকে। আত্মা থাকলেও আমরা সকলকেই আত্মিক পুরুষ বা মহাত্মা বলে অভিহিত করতে পারি না। অভিযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনের সকল স্তরে যাঁর দূরদর্শিতা, মহানুভবতা ও কার্য্যকলাপপূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে, যিনি পারেন চলার ছন্দটিকে অব্যাহত রাখতে, তিনিই যথার্থ মহাপ্রাণ।

আত্মোন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের এক বিচিত্র সম্বন্ধ বিদ্যমান। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা দেবার্চ্চনা ছাড়াও ধর্ম্মের এই দিকটি প্রকৃতই উন্নততর। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্ম একই বস্তু না হলেও আজকের দিনে প্রকৃত ধর্ম্ম বললে আধ্যাত্মমূলক ধর্ম্মকেই বোঝায়। ধর্ম্মের যে দিকটি উচ্চাভিলাষী তাই হল আধ্যাত্মিকতা। উচ্চাভিলাষ না থাকলে সুন্দরের সাধনা ব্যতিরেকে বেঁচে থাকা তো অর্থহীন। মানুষ আধ্যাত্মিক কেবলমাত্র তখনই যখন আদর্শ সামনে ধরে সে পথ চলে—যখন তার পান ভোজন সব কিছুই সত্য এবং মঙ্গলময় পরিণামের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মানুষ আধ্যাত্মিক কেবলমাত্র তখন যখন তার লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল এমন সুস্পষ্ট ও সরল হয়ে ওঠে যে তার সমগ্র জড়জীবন যেন এক স্বচ্ছ আজ্ঞাবাহী যানরূপে পরিণত হয় যা মিতব্যয়িতা অথচ অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচালিত হতে পারে। আধ্যাত্মিকতা কিন্তু কোন কৃত্রিম গন্তব্যপথের নির্ম্মাতা নয়—এ হল এমন এক অন্তর্দৃষ্টি এমন

এক স্থিরপ্রজ্ঞা যা জানে পৃথিবীর কী কতটুকু গ্রহণ করতে হবে এবং কী-ই বা কতখানি পরিত্যাগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক পুরুষ পথ চলেন নিরাসক্তভাবে, অথচ তাঁর স্নেহের অভিসিঞ্চনে পৃথিবী পুলকিত হয়ে ওঠে।

আধ্যাত্মিক পুরুষ ভিক্ষায় সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু জানেন পার্থিব সম্পদ কী করতে পারে আর কী-ই বা করতে পারে না। ঠিক যেন সদাশিব—অনাসক্ত অনুরাগী, সংসারে সংসার-ত্যাগী।

সাংসারিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার খানিকটা তুলনা করা চলে। Worldliness বা সাংসারিকতা হল জীবনের যান্ত্রিকতাগুলি নিরূপণ এবং গ্রহণ করা। যান্ত্রিকতা আবার উদ্দেশ্যমুখী—যন্ত্র কখনো পরিশেষে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সচল থাকতে পারে না। আর এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আধ্যাত্মিকতার মূল নীতি।

জর্জ্জ সান্তায়ন তাঁর "ধর্ম্ম-বিচার" (Reason in Religion) নামক পুস্তকে বলেছেন, ধর্ম্ম ব্যতীত সাধারণতঃ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটতে পারে না। কারণ ধর্ম্ম জানে কি ভাবে সংসারে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়, কি ভাবে তাদের নীতিগুলি পৃথক করে নিতে হয় এবং কেমন করে তা থেকে আদর্শ তৈরী করা যায় যা বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা চলতে পারে।

আধ্যাত্মিকতা তাহলে জীবনের এমন এক বিশেষ গুণ যা কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে জীবনের উদ্দেশ্যগুলি বা লক্ষ্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। It strives to seek the highest, and to that highest it attaches itself, eager in devotion and confident in the face of setbacks. Such a life cultivates insight and vision ; it issues in action, but it has an inner intensity, a flight of the alone to the alone, in which it receives inspiration and sustaining power.—সর্ব্বোচ্চ সন্ধানী আধ্যাত্মিকতা নিজেকে মিলিয়ে দেয় সর্ব্বোত্তমের সাথে, যা প্রেমে ব্যাকুল অথচ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আত্মবিশ্বাসী। কাজের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার পরিণতি, কিন্তু এর অন্তর্দ্যোতনার ফলে স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মত একা একাই এর কাজ চলতে থাকে, আর তা থেকেই নিজেকে চালু রাখবার শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে।

সাংসারিকতার ক্ষুদ্রতা ও অসারত্ব সম্বন্ধে মানুষকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। যে জীবন শুধু নামে মাত্র বেঁচে থাকা—কোন গতিকে দিন কাটানো—কি মূল্য আছে সে জীবনের? সুন্দরভাবে কেমন করে বাঁচতে পারা যায় মানুষকে তারই অনুসন্ধান করতে হবে আত্মার কাছ থেকে—জীবনে কোন্ বস্তু সার এবং কোন্‌টি অসার অথবা কম দামী সেটুকু বিচারবোধ আয়ত্ত করতে হবে।

দুঃখ-বেদনায় জর্জ্জরিত নানা দায়িত্বের গুরুভারে ভারাক্রান্ত মানুষ বৃহত্তরের সন্ধান করবে কেমন করে? কোথায় তার অবসর? আত্মা অথবা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কেমন করে সে আলোচনা করবে! বিশ্বের কল্যানাভিলাষী বলে নিজেকে প্রচার করি, কিন্তু নিজের দুঃখ-শোক জয় করতে পারি কই!

পুরাকালের ধর্ম্মবিশ্বাসে তবু একটা সান্ত্বনা ছিল—শান্তির প্রলেপ ছিল। প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনা মানুষকে আজকের মত এতখানি অধীর করে তুলত না, কারণ তখনকার ধারণা ছিল আত্মা অমর—মৃত্যুর পরপারে আবার তার দেখা মিলবে। আজকের যন্ত্রযুগ সেই প্রাক্তন বিশ্বাসকে শিথিল করে দিয়েছে। কোথায় শান্তি কোথায় সান্ত্বনা মানুষ অস্থির হয়ে অন্বেষণ করে চলে। জীবনে যা ছিল আনন্দময়, যার জন্যে বেঁচে থাকা সার্থক বলে মনে হত, তা-ই যদি সহসা অপহৃত বা অপসারিত হয়, তাহলে সংসারে এমন কি আছে যা নিজ আত্মার শান্তি বিধান করতে পারে?—What is there that can restore the soul?

এই তীব্র বেদনাকর নিরুৎসাহের তামসী মুহূর্ত্তে অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করে বলে ওঠে, হে বিজ্ঞানী, কোথায় তোমার সেই আলো যার দ্যুতি বিশ্ব-ভুবনে পুলকের বন্যা প্রবাহিত করে দেবে, কোথায় তোমার সেই পুষ্পকরথ যা নন্দন-কানন থেকে আমার অপহৃত পারিজাতটি ফিরিয়ে এনে দেবে!

যখন তীব্র প্রলোভন-জাল আদর্শকে করে সমাচ্ছন্ন, বিবেককে করে দুর্ব্বল, বিচার-বুদ্ধিকে পঙ্গু—যখন তার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব চরিত্রকে এমনভাবে আলোড়িত করে যার ফলে এতদিনকার সুনাম, তিলে তিলে গড়া যশের সৌধ, এক মুহূর্ত্তে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে—তখন মানুষের সেই নৈতিক পরাজয়ে কোথায় বিজ্ঞানের কোন্ সঞ্জীবনী শক্তি আছে যা তার সকল গ্লানি বিধৌত করে সমাজে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

দুঃখ, ভগ্নোদ্যম এবং নৈতিক পরাজয়ের গ্লানি থেকে বিজ্ঞান অথবা যন্ত্র মানুষকে আজও মুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু সেজন্যে বিজ্ঞান দায়ী নয়—দায়ী হল ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা।

বিজ্ঞানের দ্বারা যেসব অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মসমস্যার সমাধান সম্ভব নয় সেখানে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন অনুভূত হয়—বড় বেশী রকমই অনুভূত হয়; তার কারণ পূর্ব্বেকার যে বিশ্বাসে মন তৃপ্ত হত আজ তা ভেঙে পড়েছে। সান্ত্বনা চাই বটে, কিন্তু এ-ও ঠিক যে সান্ত্বনার প্রাক্তন রীতিতে আজ আর মন ভুলতে চাইবে না। আগেকার মত অনুনয়ে বা আগেকার মত স্তুতিতে আজ আর মন ভিজবে না বা খুশী হয়ে উঠবে না। তার কারণ আজ মানুষের

দৃষ্টিভঙ্গীরই যে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে—বিশ্ব, জীবন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে গত দিনের সব ধারণাই যে আজ বদলে গেছে।

রূপকথা বা পুরাকাহিনীর মধ্যে মানব-জীবনের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান মিলতে পারে, কিন্তু তাই বলে কেউ পুরাকথার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাতে পারে না। আজও এই নূতনের যুগেও তাই এমন এক জীবন্ত ধর্ম্মের প্রয়োজন মানুষ উপলব্ধি করে যা তার সকল প্রকার আলোড়নে সাড়া দেবে।

আজকের ইন্টেলেকচুয়াল এবং সামাজিক পরিবেশ পূর্ব্বেকার পারিপার্শ্বিকতার চেয়ে অনেকাংশে বিচিত্র ও নূতন। এই জটিলতার আবর্ত্তে বহু বিচিত্র আলোড়নের উদ্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে পরস্পরে ভুল বোঝাবুঝি এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনৈক্য বেড়েই চলে, আর সেই সঙ্গে গুরুতর মানসিক ও দৈহিক বৈফল্য ঘটবার অবকাশ থাকে প্রচুর। শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্ভরশীল সম্বন্ধটি বিদ্যমান ছিল আজ তা-ও অবলুপ্ত হতে বসেছে।

সমাজকে এই মনোবিকার থেকে সুস্থ করতে হলে দক্ষ মনোবিজ্ঞানীর আবশ্যক যিনি কার্য্য-কারণের প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করতে পারেন। সুখের বিষয় এই ধরণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ক্রমেই প্রসার লাভ করছে এবং অপেক্ষাকৃত উদার দৃষ্টিতে মানুষ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাগুলি বিচার করতে শিখেছে। আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীরা বহু তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন—বহু রহস্যময় প্রদেশে আলোক সম্পাত করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শ না থাকায় তাদের নির্দ্দেশ পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। আচারের উৎস এবং আচরণের ফল এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদটুকু হৃদয়ঙ্গম না করায় এবং পথচলার কোন সরল সূত্র নির্দ্দেশ না করায় নৈতিক অভিজ্ঞতার যুগে যে নিয়মানুগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল সংযমী মনটি গড়ে উঠেছিল আজ তারও ধ্বংস সাধন হয়েছে। যাঁরা নতুন করে মানুষের সমস্যাগুলি সমাধান করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন তাঁরা শুধু প্রার্থনা বা উপাসনায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারেন। আবার যাঁদের মধ্যে প্রাক্তন ঈশ্বর-বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে তাঁরা নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু যে ধর্ম্ম শুধু নিরাকার আত্মামাত্রে পর্য্যবসিত সে ধর্ম্ম কেমন করে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে? ধর্ম্মকে তাই অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি দুই-ই অধিকার করতে হবে। আজকের ধর্ম্মজীবনের ট্রাজেডি হল এই যে তা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আবেগময় অনুভূতি ও আসক্তিকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

রামায়ণ, মহাভারত অথবা বাইবেল যা অতীতের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা ইতিহাসের নিদর্শন বলে

পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কেন? অনেকের মতে আবার ভবিষ্যতের ধর্ম্মকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে, যথা—'বিজ্ঞান ধর্ম্ম,' 'সমাজ ধর্ম্ম', 'মানবতার ধর্ম্ম' ইত্যাদি। কিন্তু কেন? মানুষ কি পুরাকালের কেউ নয়?

আমরা তো ভুলতে পারি না যে মানুষ সর্ব্বযুগের সর্ব্ব কালের বংশধর। সে যে অতীতের চারণ কবির উত্তরাধিকারী—তার হৃদয়ে তাদের সঙ্গীত আজও অনুরণিত হয়ে ওঠে। সে যে অতীত যুগের মহাশিল্পীর বংশধর—তাদের সৃজনী-শক্তি আজও তার রক্ত-স্রোতে প্রবাহিত হয় আর তার দৃষ্টিকে করে তোলে দিগন্তপ্রসারী। সে হল শিশু আবিষ্কারক, শিশু-ভাবুক, শিশু-সন্ন্যাসী। তার বংশানুক্রম যে তার প্রকৃত স্বরটি পূর্ব্বাহ্ণেই নিরূপণ করে রেখেছে। পূর্ব্বপুরুষের অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে যুগ যুগান্ত ধরে জুগিয়ে এসেছে বিপদে ধৈর্য্য শোকে সান্ত্বনা, নিরুৎসাহে আশা।

ঠিক আজকের মতই পুরাকালের লোকও প্রয়াস পেয়েছিল বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে। ঠিক আজকের মতই তারাও চেয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে। সেদিন তাদের হাতে কিন্তু আমাদের মত এত মূল্যবান উপাদান ছিল না, অথচ আজকের সমস্যাগুলির সঙ্গে সেদিনের সমস্যার প্রায় কোনই পার্থক্য ছিল না।

আজকের দিনে তাই ধর্ম্মজীবনের এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্রটুকু বজায় থাকে।

যে যাই বলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চব্বিশ

ভোলানাথ ঘোষ বললে চেনে না, স্বদেশী মোক্তার বললে চেনে। গাড়ি মোড় ঘুরল। অভিজাত ফাঁকা থেকে চলল অভাজন ঘিঞ্জিতে।

রাস্তাটা দীর্ঘ হোক এই শুধু কামনা করছিল তামসী। যাতে আরো অনেকক্ষণ সে ভাবতে পারে, বুনতে পারে স্বপ্নের ছিন্ন জাল। যাতে দিনের আলোটা আরো একটু অস্পষ্ট হয়, নীরবতার আভাস আসে বাতাসে। কী ভাবে দেখা হবে, কী কথা কইবে, চোখের উপর চোখ রেখে তাকাতে পারবে কিনা, হাসবে না মুখ ম্লান করে থাকবে, কিছুই সে ভাবতে পারছে না, দেখতে পারছে না। সে ভাবছে, দেখছে, অপরিচিত নির্জন ঘরে অপরিচিত নির্বাক অন্ধকার। প্রশ্নোত্তরহীন অন্ধকার। জিজ্ঞাসা নেই, জবাবদিহি নেই; বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই; অনুমান নেই, অভিমান নেই। ভয়ঙ্কর সুন্দর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর সুন্দর ঘনিষ্ঠতা। একজনের ক্লান্তি দিয়ে আরেকজনের ক্লান্তি মুছে দিচ্ছে, একজনের লজ্জা দিয়ে আরেকজনের লজ্জা। একজন নিঃসংশয়ে ধরা দিয়ে ধরে রাখতে পারছে আরেকজনকে। জীবনের একটা তীব্রতর চেতনার মধ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে তারা, সূর্যের সামীপ্যে সুদূর কোন এক শিহরিত গিরিশৃঙ্গের উপরে। নবীনারম্ভের নান্দীমুখে। সেখানে সব পবিত্র, পরিচ্ছন্ন; সেখানে অন্ধকার দীর্ণ করে জন্ম নিচ্ছে ভবিষ্যতের সবিতা।

বদ্ধ ঘর কেন, ঘর ছেড়ে পথেই না হয় বেরিয়ে পড়বে তারা। ভোলাবাবু তো বলেছিলেন দিনের দিন হাজির হতে পারলেই হল, তার আগে চক্কর দিয়ে এসো না যেখানে খুসি। কেউ খোঁজ নিতে আসবে না। তাই সই, পথেই সোজা নেমে পড়বে তারা। পথে নেমে এসে আলোয় চারদিকে তাকিয়ে অনেক হালকা বোধ করল তামসী। অনেক

জোরে জোরে সে হাঁটছে, অনেক বড় বড় পা ফেলে। হাঁটতে-হাঁটতে তারা চলে এসেছে মাঠময় এক গ্রামের মধ্যিখানে। ঝাকড়া-চুলো গাছের নিচে। ছায়াভরা ঘাসের উপর গা-হাত-পা টান করে শুয়ে পড়ল তামসী। তার শুধু আজ পথ চলবারই স্বাধীনতা আসেনি, এসেছে বিশ্রাম করবার স্বাধীনতা, ঘুমের আলস্যে শিথিল হবার স্বাধীনতা। এতক্ষণ এই দীর্ঘ পথ অনর্গল হাসছিল সে, এখন একেবারে অঝোর ঝোরে কাঁদতে লাগল। অফুরন্তের মত। এত কান্নাও ছিল তার বুকের মধ্যে? ছিল কাঁদবার এত স্বাধীনতা। হাসল তামসী। কে জানে! কে জানে কোন নিঃসঙ্গ পাহাড়ের জঙ্গলে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে নিভৃত নির্ঝর।

হাওয়ায় ভাসলে তো চলবেনা, এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে নিশ্চল হয়ে। কোথায় যাবে তারা? কোথায় আঁকা রয়েছে সেই মানচিত্র? কিছুই জানেনা, রেখামাত্র না। কী হবে জেনে? যে দিকে দু' চক্ষু যায় চলে যাবে তারা। পালিয়ে যাবে। তারিখের দিন হাজির হবে না। হুলিয়া বেরুবে। পুলিশ কিছুতেই হদিস পাবে না। কত দুর্ধর্ষ আসামী ধুলো উড়িয়ে পাঁচির-পগার পার হয়ে গেছে। কত বীরব্রতা নারী জীবনের মূল্যে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, আবরণ দিয়েছে।

হৃৎপিণ্ডের শব্দে তাল কাটল তামসীর। সে সব আসামী কি চোর? পকেটমার?

এই বাড়ি। ভোলাবাবু বাড়ী আছেন? না, তিনি গেছেন কোন এক ব্যাঙ্ক খোলার নেমন্তন্নে। কটা পিতলের শিক আর কটা জাবদা খাতা জোগাড় করে যেখানে-সেখানে ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে আজকাল। প্রচুর খাওয়া দিচ্ছে আর রঙচঙে ক্যালেণ্ডার বিলোচ্ছে। আর, বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি উদ্বোধনী সভায় সভাপতি হচ্ছেন কলেক্টর। তেমনি ধর্মসভায়, সাহিত্যসভায়, সমাজসংরক্ষণী সভায়। আর যেখানেই—

জানি। সেখানেই ঢাকের বাঁয়া। আপনি কে?

আমি মোক্তারের মুহুরি।

মোক্তারের আবার মুহুরি আছে জানতনা তামসী। খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'জামিনে খালাস করে আনা হয়েছে এমন একজন আসামী নেই এখানে?'

কত আসামীই তো খালাস হচ্ছে অহরহ, কার কথা বলছেন? সেদিন কী মজা হল দেখুন না। হাকিম যেই রায় দিল, খালাস, আসামী অমনি কাঠরা থেকে বেরিয়ে সোজা ছুট দিলে রাস্তা দিয়ে। বাবু আমাকে বললেন, সুরেন্দর, আমাদের ফি? ধরো হারাম-জাদাকে। কাছা-কোঁচা একত্র করে ছুটলাম, ধরলাম গিয়ে প্রায় আধমাইলটাকের মাথায়। বললাম, পালাচ্ছিস যে, খালাসী ফি দিয়ে যেতে হবেনা? লোকটা বললে, সকালবেলাই তো ফি দিয়েছি বাবুদের, আবার ফি কি? খালাস পেয়েছি শুনে দৌড়ে বাড়ি চলেছি বৌকে খবর দিতে। আর ফি নেই, হারামজাদা বলে কি? চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে

গেল। বললাম, তুই তো ছাড়া পেয়েছিস কিন্তু গোড়ায় জামিন দিয়ে এসেছিলি যে তা ছাড়াতে হবে না? সেই মুচলেকা যে আটকে থাকবে, তার ছাড়ানের কি কই? লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সম্পূর্ণ খালাস তা হলে এখনো হয়নি এই রকম ধোঁয়া ধোঁয়া কী ভেবে কাছার ডগা থেকে চারটে টাকা খুলে দিলে। দিয়েই আবার বাঁই-বাঁই করে ছুট। বাবুকে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে আমি আট আনা ট্যাকস্থ করলাম। তাই বলছি, জামিন-খালাসেরও মানে আছে দুই প্রকার। আপনি কার কথা বলছেন?

তামসী পষ্টাপষ্টি বললে, 'কলেক্টরের বাড়ির সেই চুরির আসামী।'

'ও, হ্যাঁ, টাউন-জামিন পেয়েছে—'

'কোথায় তিনি?' তামসীর কণ্ঠমূলটা কাঁপতে লাগল।

'এই কোথায় একটু ঘুরে আসতে গেছে। আপনি বসুন এসে এই ঘরে। এইটেই টাউন-জামিনদের আস্তানা। আমিও এখানেই থাকি এক খুবরিতে।'

টিনের ঘর, গর্তভরা কাঁচা মাটির মেঝে। গোটা দুই ত্যাড়াব্যাঁকা লোহার চেয়ার, একটা রোগা-পটকা কেরাসিন কাঠের টেবিল। তাল ঠিক রেখে বসা বা টেবিলে হাতের ভর রাখা দুইই ক্লেশসাধ্য। উইয়ে-খাওয়া ন্যাড়া দুটো তক্তপোষ পড়ে আছে দুই পাশে, পোড়া বিড়ি আর দিয়াশলাইর কাঠির ছরকোট। টেবিলটার উপর একটা খবরের কাগজ আঠা দিয়ে আঁটা, অনেক সব পেন্সিলের আঁকিবুঁকি। আগে বোধ হয় ভিতরে ছেলেদের পড়ার টেবিল ছিল—অনেক জন্তু-জানোয়ারের মুখ আঁকা। একটা একেবারে হুবহু মুহুরির মুখ, নইলে শেয়ালের কানে কলম থাকবে কেন? মুখ তুলে চাইল তামসী। দেখল মুহুরি এ তল্লাটে নেই।

কোথায় গেল রণধীর? তামসীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পালিয়ে গেল না তো? এই বিরলে-বিদেশে তাকে ফেলে রেখে সে যেতে পারে কখনো? কেন, এক দিন যায়নি?

আঠা দিয়ে আঁটা সেই খবরের কাগজের এক অংশে জোর করে চোখ রাখল তামসী। সেই খবরটাতে না আছে বর্ণ, না বা আছে বাস্তবতা। তামসী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল খবরটাতে ক'টা র আছে, ক'টাই বা ত। যদি র বেশি থাকে তা হলে—আর যদি ত বেশি থাকে তা হলে—কী তা হলে? ত বড় কম। ত-র আশা নেই। না, এই আরেকটা ত। আলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। অক্ষর চেনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ, পিছনে, দরজার দিকে, ভারী একটা নিশ্বাস শোনা গেল। অনড় হয়ে দাঁড়াল একটা অনভিব্যক্ত ছায়ামূর্তি।

'আমি তখনই আন্দাজ করেছিলাম তোমারই এই কারসাজি।' মূর্তি ঘুরে এল চোখের সামনে, অবয়বী হয়ে, স্পর্শনীয় হয়ে। 'ভোলাবাবু আমাকে কিছুতেই বলবেন

না কী করে এ সম্ভব হল। ভেবেছিলেন খুব একচোট চমকে দেবেন আমাকে। মনে-মনে আমি ঠিক আঁচ করেছিলাম। তুমি ছাড়া আর কার এমন অহংকার হবে।'

এতটুকু চমকায়নি রণধীর। এতটুকুও প্রত্যাশার বাইরে মনে হয়নি তার। তাই তামসীকেও চমকে দেয়নি সেই রৌদ্র-ঝলকিত "অসি" নামে ডেকে উঠে। স্বরে যেন সেই উষ্ণ উন্মাদনা নেই, কেমন একটা শীতল বিতৃষ্ণা। স্পর্শহীন নিস্পৃহতা।

এক মুহূর্ত মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তামসী। তাকিয়ে রইল রণধীরের মুখের দিকে। কেমন যেন অদ্ভুত, অচেনা মনে হচ্ছে। যেন আরেক দেশের, আরেক গ্রহলোকের। যেন অনেক দূর থেকে দেখছে। মুখটাকে তাই সুন্দর লাগছে না। কেমন রুক্ষ, রসশূন্য দেখাচ্ছে। শীর্ণতাটা মনে হচ্ছে রুগ্নতার মত।

না, সমস্ত চোখের ভুল তামসীর। রোদে-রোদে সে ঝলসা-কাণা হয়ে গেছে। না, কিছুতেই সে বিশ্বাস হারাবে না, ধৈর্য হারাবেনা। গ্রহণের রাত্রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতেই সে চন্দ্রের রাহুমুক্তি দেখবে। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তেই মিলবে তার স্থির জল, সরল জল। বালির দূরলীন স্তরের অন্তরাল থেকে বেরুবে হর্মমালিনী নগরী, সেই পুরাতনী সভ্যতা।

তামসী টেবিলের উপর দীর্ঘ ভঙ্গিতে তার ডান হাত প্রসারিত করে ধরল। সবলতায় অনাবৃত ডান হাত। বললে, 'বোসো।'

রণধীর বসল না। পাইচারি করতে লাগল। খাঁচার মধ্যে বন্দী জানোয়ারের মত।

বললে, 'তোমার খুব পয়সা হয়েছে, না? খুব বড়লোক হয়েছ? খুব শাঁসালো মক্কেল গেঁথেছ? নইলে তোমার এত তেজ, এত স্পর্ধা!'

দুই উন্মীলিত চক্ষুর উপর যেন ঘুসি খেল তামসী। কিন্তু অন্তরের স্থৈর্যকে সে আহত হতে দিল না। বললে, 'তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে বোসো আমার পাশে, এই চেয়ারে। দাঁড়াও, আগে একটা আলো আনাবার চেষ্টা করি।'

'থাক, কাজ নেই।' রণধীর বাধা দিল: 'আলোতে তোমার মুখশ্রী আর না দেখালেও চলবে। জানি, আমার মুখটাও লোকচক্ষে দেখাবার মত নয়। হ্যাঁ, আমি চোর—তবু আমি তোমার চেয়ে সরল, তোমার চেয়ে স্পষ্ট। হয়তো তোমার মতো আমি কুৎসিত নই। আমি শুধু নিজেকেই অধঃপাতে নিয়ে যাই, তোমার মতো নিজের সঙ্গে আরেকজনকে, আরো বহুজনকে, টেনে নামাইনা।'

তামসী দুই করতলে মুখ চেপে ধরল। যেন একটাও না স্বররেখা বেরিয়ে আসে অতর্কিতে।

রণধীর এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। বললে, 'তোমার কী মতলব, আমাকে এখন কী করতে হবে ?'

সত্যি, এটা এখন বিহ্বলতা দেখাবার সময় নয়। তামসী মুখ তুলে ম্লান রেখায় হাসল। বললে, 'আমি কী জানি! তুমিই বলো না—'

'আমি বলব ?'

'হ্যাঁ, যদি বল, জামিনের সর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, তবে এখানেই থাকতে হয়। আর যদি বলো, এখান থেকে চলে যাবে, তা হলে চলো, রাত্রের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি আমি ছাড়িনি, দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'চলে যাব! কোথায় ?'

বড় বেশি আশা হল তামসীর। বললে, 'কোথাও না। যে দিকে চোখ যায়। এখান থেকে ওখানে, আরো একখানে। পালিয়ে যাব আমরা।'

'পালিয়ে যাব ? তোমার সঙ্গে ? সেটা কি তবে আমার পালিয়ে যাওয়া হবে ?

তামসী নিশ্চল হয়ে রইল।

'তোমার সঙ্গেই যদি যাই তবে তোমার থেকে পালাতে পারলুম কি করে ?'

তামসীর মনে হল তার শরীর থেকে হাড়গুলি যেন খসে-খসে পড়ছে। হাতে-পায়ে তার জোর নেই, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে শক্তি আনল। বললে, 'আমার থেকে পালাতে পারাটাই কি তবে তোমার আসল মুক্তি ?'

'নইলে, তুমি মনে কর, তুমি উত্তাল সমুদ্রে পাল মেলে দিয়ে ফালাও বাণিজ্য করবে, আর আমি তোমার অন্নভোজী হয়ে তোমার গাধাবোটের লস্করি করব, সেটাই আমার জীবনের সার্থকতা ? অত পরমাই ভাল নয়, টাকা বা বয়স কোনোটাই টিকে থাকেনা শেষ পর্যন্ত।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' তামসী টেবিলের একটা ধার বাঁ হাত দিয়ে আঁট করে চেপে ধরল: 'ভেবেছিলাম তোমার চোর-নামের কলঙ্কটাও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে দেবনা। জামিনে ছাড়িয়ে এনে প্রথম থেকেই তার ঘসামাজা শুরু করব। ভুল হয়েছিল আমার। বুঝিনি সেই কলঙ্কের ঘা মাস-মেদ খেয়ে একেবারে হাড়ে এসে লেগেছে।'

'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল। একশো বার ভুল। তুমি ভেবেছিলে জেলটা খুব খারাপ জায়গা, আর যেখানে তুমি বসবাস করছ সে জায়গাটা খুব সৌখিন, উচ্চবংশীয়। ভুল! যেখানে তুমি আছ সেখানের চেয়ে জেলখানা অনেক বড় পুণ্যস্থান। কুষ্ঠ স্পর্শ, প্রকট রোগ, গুপ্তগতি নয়। গোপন ব্যাধির চেয়ে তা অনেক ভদ্র, অনেক ধার্মিক।'

এমন সময় লণ্ঠন হাতে ভোলাবাবুর প্রবেশ। সহাস্য টাক নিয়ে। বলতে-বলতে;

'এ কী কথা, টাউন-জামিনের ঘরে আলো দেয়নি এখনো ? ও সুরেন্দর, এদের খাওয়ার কথা বলে দিয়ে এসেছ হোটেলে ? ফি নিয়েছ ? রাত্তিরে থাকবার ফি ?'

তামসী তখুনি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমি চললুম।'

'চললেন ?' ভোলাবাবু টাক চুলকোতে লাগলেন : 'হাজত থেকে আপনার জন্যে এত করে আসামী ছাড়িয়ে আনলুম আর আপনি অমনি চললেন ? কেন, কী হল ?'

'ধর্মের কাহিনী বোঝানো গেল না। এরা কে কবে ধর্মের কাহিনী শুনেছে বলুন ? পুঁই আদাড় ছাড়া এদের মন আর কোন দিকে যাবে ?' তামসী দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমিও চললুম।' বলে উঠল রণধীর।

'আপনিও চললেন ?' ভোলাবাবুর টাকে প্রায় চুল গজাবার জোগাড়। 'কোথায় ?'

'থানায়। থানায় গিয়ে আমি সারেণ্ডার করব। জামিন বাতিল হয়ে আমি ফের যাব হাজতে। আমি ডিফেণ্ড করব না। দোষ স্বীকার করব। সোজাসুজি জেলে যাব। পাপকে ঢাকবার জন্যে প্রবঞ্চনাকে ডাকব না।'

ভোলাবাবুর টাকে আর ঘাস গজাল না, টাক হেসে ফেলেছে। বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। অজাযুদ্ধের পর এখন ঋষিশ্রাদ্ধ চলেছে। আসল লঘুক্রিয়াটা এখনো বাকি। দেরি নেই, এখুনি ঝাঁটপাট দিয়ে বিছানা পেড়ে এনে সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। কই হে সুরেন্দর, ফি-র চার্টটা দেখিয়েছ ?'

'তার চেয়ে নির্দিষ্ট পল্লীতে গিয়ে রাত্রিযাপন করাও অনেক সম্মানের।' রণধীর মরিয়া হয়ে বললে।

'মাপ করবেন ভোলাবাবু।' তামসী ঘুরে দাঁড়াল : 'সঙ্গে আমার মাল আছে। সুটকেসের মধ্যে গয়নার বাক্স। সমর্প ঘরে বাস করাটা বারণ করে দিয়েছে শাস্ত্রে।'

ভোলাবাবু একবার এদিক একবার ওদিক তাকাতে লাগলেন। দু জন রাস্তার উলটো দু' মুখে বেরিয়ে গেল। ভোলাবাবু দুই অঙ্গুষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত করে বলে উঠলেন : 'আসামীও নেই, ফরিয়াদীও নেই, আমি মুখথু হাকিম এজলাস কামড়িয়ে পড়ে আছি।'

বেশিক্ষণ পড়ে থাকতে পারলেন না। ছুটতে ছুটতে লাগ ধরলেন রণধীরের। রণধীর বললে, 'আপনার ভয় নেই। নামতে হলে আমি নিজেই শুধু পথে নামি, অন্যকে পথে বসাইনা।'

রণধীরের জীবিকার্জনের পথ কুসুমাস্তৃত ছিল না। দগ্ধভাগ্য সে, বারে-বারে রুদ্ধদ্বারের সামনে তাকে প্রতিহত হতে হয়েছে। কাঁটায়-খোঁচায় ছিঁড়ে গিয়েছে তার হাত-পা। অন্ধ ভাগ্য তখন তাকে টেনে নিয়ে এসেছে অন্ধকার চোরা গলিতে, ঠেলে দিয়েছে ক্রমনিম্ন পিচ্ছিলতায়। তবু, তখনো, আশা হারায়নি রণধীর, প্রতি স্খলিত পদের প্রাকমুহূর্তে মনে

হয়েছে এই বুঝি মিলে যাবে তার স্থির তীর, নিজেকে নিবারণ করার আকর্ষণ। কিন্তু কোথায় তার সেই প্রতিমুখাগতা শুক্রতারা। কোথায় সেই তিমিরহারিণী। রসিক ভাগ্য একদিন তাকে নিয়ে এল তামসীর দুয়ারে, তার নিবিড় আবৃত্তির মধ্যে। দেখল সম্পদে-শোভায় গর্বে-গৌরবে ঝলমল করছে তামসী। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নিজের অধিকরণে। তুষারকিরীটিনী গিরিচূড়ার মত দূর মনে হয়েছিল কিন্তু ডাক দিয়ে দেখল সে তার পার্শ্ববাহিনী গ্রাম্য নদীরেখা। স্বপ্নের সুরে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। বয়ে চলেছে কোন জলনিধির সন্ধানে। মুহূর্তে নিজেকে রাজচক্রবর্তী বলে মনে হল। মনে হল তামসীর ঐশ্বর্য তার নিজের ঐশ্বর্য, তামসীর সাফল্য তার নিজের অহঙ্কার। জীবন, যৌবন, আত্মসমর্পণ—কিছুই ভিন বলে মনে হল না। মনে হলে তমস্বিনী রাত্রির তপস্যাবসান হচ্ছে। আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় জীবনারম্ভের। ভবিষ্যমান ভারতবর্ষের।

কিন্তু কী দেখল সে রাত্রের গভীরে এসে? দেখল স্বপ্নের সেই সৌধ শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেছে মেঘস্বরে, পড়ে আছে বীভৎস পণ্যপীঠ। সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন নদী জঞ্জালে আবদ্ধ হয়ে স্রোত হারিয়ে ফেলেছে, হয়ে উঠেছে পল্বলের পঙ্ককুণ্ড। ঐ যে সব চমকদার চুমকি, আসলে ও সব তীক্ষ্ণ ক্ষতমুখ। ঐ যে সব পারিপাট্য আসলে ও সব কাপট্যের ভূমিকা। তারপর আর কী দেখবার ছিল রণধীরের? আর কিসের প্রতীক্ষা করবার? তার আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, ফিরে দাঁড়াবার সংকীর্ণতম জায়গা নেই। সমস্ত পাপের চেয়ে বড় পাপ হচ্ছে প্রবঞ্চনা। সমস্ত নির্মমতার চেয়ে বড় নির্মমতা হচ্ছে পরানুকম্পা।

'একটা জিনিস বুঝলাম—'রণধীর বলল চলতে-চলতে।

'এই দিকে থানা, এই বাঁয়ের রাস্তায়।' ঠিক রাস্তায় এনে ভোলাবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি?'

'জেলখানাটাই নিখুঁত খাঁটি জায়গা। আর, বাইরে থাকি কি ভিতরে, আমার কাছে আমার সমস্ত জীবনটাই জেল। আকাশ নেই, গাছপালা নেই, নারীকণ্ঠ নেই, শিশুর হাসি নেই। সারা জীবন আমার ট্রেন চলবে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙের মধ্য দিয়ে। সে সুড়ঙের আর শেষ নেই, ক্ষান্তি নেই। শুধু শ্বাসরোধী অন্ধকার আর ধোঁয়া, ট্রেনের চাকায় আর পাহাড়ের প্রতিঘাতে অসহ্য আর্তনাদ। একটা জীবন্ত বিভীষিকা। কোথায় রোদ কোথায় মাঠ কোথায় বাতাসের দোল!'

এই যে থানা। ভোলাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকলেন। সামনে ছোট দারগাবাবুকে পেয়ে উৎকণ্ঠিত সুরে বললেন, 'দেখুন মশাই, দেখুন। এ লোকের জায়গা কি জেলখানা না পাগলা গারদ।'

(ক্রমশঃ)

জীবাণু

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড়ী আকাশে দিব্যি রোদ ঝিলমিল করছিল—হঠাৎ সব ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। সারদাপ্রসাদ টের পেলেন নিবিড় ভাবে ফগ্ ঘনিয়ে আসছে। সামনে স্ট্যাণ্ডের গায়ে ফিট করা আয়নাটার দিকে তাকালেন, উজ্জ্বল কাচের ওপর জলের রেণু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ফগ ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা খুশিতে মনটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠল সারদাপ্রসাদের। বেশি আলো ভালো লাগেনা তাঁর, ভালো লাগেনা দিবালোকের অতি প্রগল্‌ভ উজ্জ্বলতা। কুয়াশার এই প্রায়ান্ধকার বিষন্নতার সঙ্গে তাঁরও মনের একটা অন্তরঙ্গ সংযোগ রয়েছে। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার মতো তাঁর চারদিকে সঞ্চিত হতে থাকে, তারপর ক্রমশ নিজের হাত পা গুলো পর্যন্ত আর স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না। সারদাপ্রসাদের মনে হয় নিজের বিগত জীবনটা। এম্‌নি করে যদি স্মৃতির সম্মুখ থেকে আবছায়া হয়ে যেত—মগ্নচৈতন্যের চারদিকে যদি আবর্তিত হতে থাকত এম্‌নি একটা সীমাহীন ধূসরতা, তা হলে—

—আর একটা কম্বল দেব বাবু? ঠাণ্ডা লাগছে? —চাকরের প্রশ্ন এল।

—নাঃ, থাক।

ফগ আসছে—সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরছে প্রেমের মতো—রাশি রাশি শীতল চুম্বনের মতো। সারদাপ্রসাদ শুনেছেন প্রেমে উত্তাপ আছে, আছে মানুষের রক্তকে সজাগ সচেতন করে তোলবার নিবিড় একটা কবোষ্ণতা। কিন্তু মানুষের প্রেমের পরিমিতি থেকে তিনি আজ বহুদূরে। আজ যে পৃথিবীর উন্মুক্ত উদার প্রেমের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে বৃষ্টি, সেখানে ফগ, সেখানে বরফ গলা শীতল ঝর্ণা আর পাইন দেওদারের মর্ম্মর।

কী হতে চলেছিল জীবন, কী হয়ে গেল।

ফগ এসেছে। বুকের ওপারে কম্বলে ঢাকা শরীরটা তার ভেতরে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে মনে হবে হারিয়ে যাচ্ছেন সারদাপ্রসাদ, তলিয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নেপথ্যলোকে। এই কি মৃত্যু—একেই কি উপসংহার বলে? একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, যা কিছু দেনা-পাওনা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ হয়ে গেছে—শুধু শান্ত অনাসক্ত মনে হারিয়ে যাওয়ার, ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে

প্রতীক্ষা। বাতাস যেমন করে ফুলের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেম্‌নি ভাবে যা কিছু ভাব ভাবনা চিন্তা কল্পনাকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে পাপড়ির মতো ঝরে পড়া।

কিন্তু এই মৃত্যু কি চেয়েছিলেন সারদাপ্রসাদ? কখনো কি কল্পনা করেছিলেন এমনভাবে ফুরিয়ে যাওয়াটা?

না, তা নয়। তিনি তো বরং পরিপূর্ণ জীবনেরই কামনা করেছিলেন—চেয়েছিলেন সূর্যালোকপ্রদীপ্ত উজ্জ্বল একটি পরিপূর্ণ বাঁচাকে। আঘাত, ব্যথা, দুঃখ, ভুল আর গ্লানির মধ্য দিয়ে কামনা করেছিলেন এদের সমস্ত কিছুর ঊর্ধে যে জীবনসত্তা, তাকেই। কিন্তু কী হয়ে গেল। পথে নামবার আগেই হারিয়ে গেল পথ।

বারো বছর আগেকার কথা। সারদাপ্রসাদ তখন লণ্ডনে—সেইবারেই ডাক্তারীর শেষ ডিগ্রিটা পাবার কথা। কৃতী ছাত্র সারদাপ্রসাদ, পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কারো মনেই সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। আর ছিল আশা, সামনে প্রসারিত ছিল অজস্র অতুল সম্ভাবনা। কলকাতায় ফিরে বাপের বিপুল প্র্যাক্‌টিস এবং প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরীটা নিয়ে তিনি অদম্য উৎসাহে কাজে লেগে যাবেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যাবেন যে মানুষে চিরকাল কৃতজ্ঞার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করবে।

আর এই স্বপ্নকে যে আরো মধু-মদির করে তুলেছিল গ্ল্যাডিস্‌ তার নাম। গ্ল্যাডিস থার্ষ্টন। সমুদ্র পারের নীলিমা ওর চোখে, ওর ঠাকুরমা নাকি জার্মাণ ছিলেন। আল্‌পসের তুষার ওর দেহবর্ণে—ওর রক্তে রক্তে ইয়োরোপের জাগ্রত যৌবন। সারদাপ্রসাদের জীবনে দুরন্ত মৌশুমী বাতাসের মতো ওর আবির্ভাব, স্নিগ্ধ-সজল অথচ উদ্দাম।

পরীক্ষার অতি পরিশ্রমেই বোধ হয় শরীরে ভাঙন ধরলো। গ্ল্যাডিস্‌ এসে বললে, না, না এ চলবে না। দিন কয়েক বাইরে গিয়ে শরীরটা সারিয়ে এসো।

সারদাপ্রসাদ প্রতিবাদ করলেন: তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এতো এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। খুব বেশি পরিশ্রমের জন্যেই বোধ হয় এমনটা হয়েছে—পরীক্ষাটা মিটে গেলেই শরীর আবার সেরে উঠবে।

্যাডিস্‌ বললে, না, সে হবে না। এবার পরীক্ষা দিতে না পারলে বেশি ক্ষতি হবে না, বেশি ক্ষতি হবে শরীরটা ভেঙে পড়লে। তোমাকে আর আপত্তি করলে চলবে না— কিছুদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

ডাক্তার সারদাপ্রসাদও নিজের সম্বন্ধে একান্ত অচেতন ছিলেন তা নয়। নিজেও বেশ বুঝতে পারছিলেন শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা সাধারণ ক্লান্তি নয়, তার চাইতে আরো কিছু বেশি—কিছুটা পরিমাণে সন্দেহজনক। কাজেই দ্বিধা থাকলেও আপত্তি

করতে পারলেন না—গ্ল্যাডিসের প্রচণ্ড তাগিদে এবং কিছুটা মানসিক অস্বস্তিতে তিনি শেষ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডে রওনা হয়ে গেলেন।

প্রথম কিছুদিন চমৎকার কাটল। চারদিকের অবারিত সৌন্দর্যের মাঝখানে, লণ্ডনের শ্বাসরোধী কয়লার বাষ্পে বিষাক্ত বাতাসের বাইরে খোলা হাওয়ায় শরীরটা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু মাত্র কয়েকটি দিনের জন্যেই। তারপরেই সত্য আত্মপ্রকাশ করল, মৃত্যুর চাইতেও নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর সত্য। এক মুহূর্তে চোখের সাম্‌নে থেকে দপ করে পৃথিবীর সূর্যালোক নিবে গেল।

ঘাড়ের নীচে মেরুদণ্ডে টিউবারকুলোসিস। মরণের নির্ভুল পরোয়ানা।

মিথ্যে হয়ে গেল পৃথিবী, মুছে গেল জীবনের সোনালি রঙ। ডাক্তারেরা বল্‌লেন, অপারেশান করে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া আর কোনো আশাই নেই।

শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল না। সারদাপ্রসাদ বেঁচে উঠলেন, কিন্তু সে বাঁচা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। সে বাঁচা জীবনের প্রতি একটা মর্মান্তিক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। শেষ পরীক্ষায় পাশ করা আর হল না, প্র্যাকৃটিস অরে ল্যাবরেটারী হয়ে গেল একটা বেদনাবিদ্ধ মরীচিকা, আর গ্ল্যাডিস্? ইংলিশ-চ্যানেলের নীল জলে কোথায় সে নীল চোখ দুটি যে হারিয়ে গেল—সারদাপ্রসাদ তা কি জানেন? সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল ওর জীবন—এই মেঘাচ্ছন্ন ধূসরতায় ও কল্পনার চাইতেও অবাস্তব।

ফগ কেটে গেছে। আবার রোদ ঝলমল করে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সারদাপ্রসাদ। ভারী চমৎকার স্নো-ভিউ পাওয়া যাচ্ছে আজকে—কাঞ্চনজঙ্ঘা ওদিকের সম্পূর্ণ আকাশটাকে অধিকার করে রাজমহিমায় বিরাজ করছে। মনে পড়ে সুইজারল্যাণ্ডকে, মনে পড়ে আল্‌প্‌সের সেই চিরশুভ্র তুষার বিস্তারকে। সে তুষার তাঁকে আশা দিয়েছিল, আশ্বাস দিয়েছিল; আর এই তুষারে আজ তাঁর চৈতন্য হিমশীতল আচ্ছন্নতার মধ্যে সমাহিত হয়ে যাচ্ছে।

চাকর এল: বাবু, পাইপ দেব?

—আচ্ছা, দে।

চাকর পাইপ এনে দিলে। সেইটে ধরিয়ে নির্ণিমেষভাবে সামনের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন সারদাপ্রসাদ। সত্যি চমৎকার লাগছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে। ওপাশের জংলা কালো পাহাড়টার মাথার ওপরে তার রাজকীয় বিস্তার। এ পাহাড়গুলোর চাইতে সে কত স্বতন্ত্র, অভিজাত। বর্ণে, গৌরবে, ঔজ্জ্বল্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে, সে এদের সগোত্র নয়।

এই ঔজ্জ্বল্য, এই গৌরব তো সারদাপ্রসাদের জীবনেও আসতে পারত। সাধারণের মাঝখানে মিশে জলবিন্দুর মতো তিনিও অনায়াসেই হারিয়ে যেতেন না, বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, প্রতিভায় তিনিও জ্বলজ্বল করতেন, হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা তাঁকে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই একটা একক মহিমা দিয়ে ভূষিত করে রাখত। কিন্তু—

কিন্তু সারদাপ্রসাদ উঠতে পারেন না। কাঁধ আর গলার মাঝামাঝি অনেকটা জায়গার হাড় একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা পেছনের দিকে ভেঙে পড়তে চায়। সুতরাং দিনরাত বিছানাতেই পরে থাকতে হয়। ইচ্ছেমতো মাথাটা ঘোরাবার উপায় পর্যন্ত নেই—বিছানায় একইভাবে চিত্ হয়ে পড়ে থাকাই হচ্ছে তাঁর দৈনন্দিন জীবন। মুখের সামনে স্প্রীংয়ের আয়না ফিট্ করা রয়েছে, চারদিকের দৃশ্য দেখবার জন্যে আয়নাটাকে তিনি যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাতে পারেন। সাদা চোখে সহজভাবে জগৎকে দেখবার অধিকার থেকে পর্যন্ত তিনি বঞ্চিত। তাও তাঁকে দেখতে হয় প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে। আশ্চর্য, সারদাপ্রসাদ বেঁচে আছেন।

বেঁচে আছেন বইকি; এই বারো বছর ধরে এইভাবেই তো বেঁচে আছেন তিনি। যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর যে মানব-সমাজকে তিনি দুহাতে দান করতে চেয়েছিলেন, আজ তাদেরই দানের ওপর তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। জীবনের কাছে তিনি অনিবার্য অপরিহার্য নন, জীবনের ওপরে একটা অসহ্য অহেতুক বোঝা মাত্র। চাকরদের অনুগ্রহে তাঁর দিন কাটছে, ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে ওরা তাঁর গলা টিপে মেরে যথাসর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিতে পারে।

আশ্চর্য এই বেঁচে থাকা। পাহাড়ের মাথার ওপর নিঃসঙ্গ বাংলো বাড়ি। পাশ দিয়ে একটা শুকনো ঝর্ণা, বর্ষাকালে তাই দিয়ে নামে মুক্তা-গলানো জলের ধারা। আর চারপাশে পাইনের বন—একটা একটা রাত্রে যখন বৃষ্টিবাতাসের খেয়ালী ক্ষ্যাপা মাতামাতি সুরু হয়, তখন ওই পাইনগাছের ঘন-নিবদ্ধ সূক্ষ্মাগ্র কালোপাতাগুলোর ভেতর থেকে যেন অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন ওদের ভূতে পেয়েছে। আর সেই সব রাত্রে ভয় করতে থাকে সারদাপ্রসাদের—সজাগ হয়ে ওঠে মনের কাছে নিজের অসহায় একাকিত্বের অচেতন অনুভূতিটা। মনে হয় পাহাড়ের মাথার ওপরে এই বাংলোটা বড় বেশি নির্জন, তিনি বড় বেশি নিঃসঙ্গ, কারো অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ ছাড়া এত পুরু আর দামী দামী পালকের লেপেও তাঁর শীত কাটছেনা।

সেইসব রাত্রে সারদাপ্রসাদ যেন অসংযত হয়ে ওঠেন—মাথার মধ্যে যেন কেমন সব বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে নিজের হাতে নিজের গলাটাকে নিষ্পিষ্ট করে দিতে, ইচ্ছে করে মানুষ খুন করতে। কী অপরাধ করেছিলেন

সারদাপ্রসাদ, কার কাছে করেছিলেন ? কে এমনভাবে একটি ফুঁ দিয়ে তাঁর জীবনের যা কিছু আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেছে ? বারো বছর কেটে গেল, অতিক্রান্ত হয়ে গেল একটা যুগ। তবু এখনো সময় আছে, এখনো যৌবন আছে তাঁর। সমস্ত শরীর তাঁর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, দুধে আলতায় মেশানো তাঁর গায়ের রঙ, রূপবান হিসেবে নিঃসংশয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন, তাঁর বিদ্যা আছে, অর্থের অপ্রাচুর্য নেই—প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর সুস্থ, কর্ম্মক্ষম। তবু তাঁর কিছু নেই। তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে, তাঁকে চাকরের অনুগ্রহের ওপরে অসহায় শিশুর মতো নির্ভর করতে হবে, তাঁকে আয়নার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি দেখে খুসি থাকতে হবে, আর মৃত্যুর চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর, অনেক দুর্বিসহ যে জীবন—সেই জীবন বয়ে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে।

কোনোকালে ঈশ্বর মানেননি সারদাপ্রসাদ—আজও মানেননা। বস্তু-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসেই মনের ভেতর থেকে ওই সংস্কারটাকে তিনি সমূলে উৎপাটিত করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আজ মনের কাছে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারতেন, এর জন্যে তিনি দায়ী নন, এ তাঁরকৃতকর্মের প্রতিফল, এ তাঁর জন্মান্তরের পাপ, হয়তো বা কোনো গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। এবং এও হয়তো তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন যে ইহজন্ম এই দুঃখদুর্গতির শোচনীয়, মর্মবেদনার মধ্যে কাটালেও পরজন্মে এবং পরকালে তাঁর একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে হয়ে যাবে।

কিন্তু সে পথ তাঁর বন্ধ—তাঁর পায়ের তলা থেকে দাঁড়াবার সে মাটি সরে গিয়েছে। বস্তুবাদী হিসেবে তিনি জানেন ঈশ্বর-কল্পনা মানুষের অজ্ঞান অবুদ্ধির পরিণাম, জন্মান্তরবাদ আষাঢ়ে গল্পের চাইতে একটু বেশি মুখরোচক এই মাত্র। তবু সারদাপ্রসাদের আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করে, দার্শনিকের বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করে : যদি ঈশ্বর নামে কেউ থাকো, তবে হে ঈশ্বর বিচার করো, উদ্ধার করো আমাকে, আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও—

চাকর এসে দাঁড়াল।

—বাবু, চা এনেছি।

সারদাপ্রসাদ পাইপটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রেখে হাত বাড়ালেন। একটা ফিডিং কাপে করে চাকর চা এগিয়ে দিলে। নিঃশব্দে সারদাপ্রসাদ চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

—ওরে, ডাক এসেছে ?

—হ্যাঁ বাবু, এই দিয়ে গেল। আপনার টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছি।

—আচ্ছা যা, আমি দেখবখন।

চায়ের পাত্র শেষ করে আবার পাইপ ধরালেন সারদাপ্রসাদ, তারপরে আগ্রহভরে ডাকের দিকে হাত বাড়ালেন। চিঠিপত্র নেই, লেখবারও কেউ নেই। সপ্তাহে দুখানা করে বাড়ির চিঠি আসে, কুশল নেওয়ার সহজ ভদ্রতাটুকুর আদান-প্রদান চলে। কুশল! সারদাপ্রসাদের হাসি পায়। তিনি ভালো আছেন কিনা এ খবরটা নিয়মিত না জানালে নাকি বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তার অবধি থাকেনা। দুশ্চিন্তাই বটে।

আজ চিঠি নেই—বাড়ির চিঠি আসবার দিন নয় আজকে। এসেছে দুতিনখানা পত্র-পত্রিকা। একখানা খবরের কাগজ, আর বাকি দুখানা বিলিতি মেডিক্যাল জার্ণাল। অন্ধকার জীবনে একফালি পিছলেপড়া সূর্যের আচলা।

খবরের কাগজটা ঠেলে সরিয়ে রাখলেন সারদাপ্রসাদ। খবরের ওপর কোনো মোহ নেই তাঁর, কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। পৃথিবীতে কোথায় কোন যুদ্ধ হচ্ছে, কোথায় বোমার বহরের বর্ষণে জার্মাণীর আধখানা সহরকে বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথায় ধানের ক্ষেতে পঙ্গপাল নেমে ফসলের সর্বনাশ করে দিয়েছে, কোন্ নেতা গর্জন করে বলেছেন এক মাসের মধ্যে তিনি বক্তৃতা দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করে নেবেন এবং কোন্‌খানে একটা গোরুর পাঁচপেয়ে বাচ্চা হয়েছে, এসব মূল্যবান খবরাখবরের কোনো লোভ, কোনো আকর্ষণ নেই সারদাপ্রসাদের। ও পৃথিবী তাঁর কাছে রূপকথা, ও পৃথিবী তাঁর কাছে জন্মান্তরের মতো একটা আষাঢ়ে গল্পের অতিরিক্ত কিছু নয়। পাহাড়ের ওপরে এই ছোট বাংলোটিতে ওদের কোনো তরঙ্গই কলকল্লোলে এসে মুখরিত হয়ে পড়বেনা—আন্দোলিত করে তুলবেনা চারপাশের উদ্ধত পাইনের অরণ্যকে, প্লাবন নামিয়ে দেবেনা শুকিয়ে মরে থাকা ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণার বুকে।

তার চাইতে—অনেক বেশি আগ্রহ, অনেক বেশি উত্তেজনা নিয়ে মেডিক্যাল জার্ণাল-দুটোর মোড়ক ছিঁড়লেন তিনি। শুধু নিজের রুচিগত কৌতূহল নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাও নয়। ডাক্তার সারদাপ্রসাদ তার চাইতে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস নেই, মির্‌য়াক্‌লে আস্থা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ঈশ্বর ল্যাবরেটরীর টেষ্ট্-টিউবে স্বতঃপ্রমাণ এবং স্বতঃপ্রকাশ, তার রাজ্যে যে-কোনো মুহূর্তে মির‍্যাক্‌ল ঘটে যেতে পারে।

সেই মির‍্যাক্‌লের স্বপ্নই দেখেন সারদাপ্রসাদ, সেই মির‍্যাক্‌লের জন্যেই তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। কিছুই বলা যায় না, হয়তো এখন কল্পনাও করা যায় না ঃ তবু পত্রিকার পাতা খুলেই হয়তো দেখতে পেলেন কোনো একটা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে, যার বলে তাঁর ঘাড়ের কাটা হাড়কে নতুন করে জোড় লাগানো যায়। আর সেই

মুহূর্তে ? সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে নতুন করে প্রাণের সিংহদ্বার মুক্ত হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই তিনি বলতে পারেন ঃ এই পাহাড়ী বাংলো নয়, এই মেঘ আর কুয়াশার বেদনাচ্ছন্ন নির্বাসন নয়, জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে এই শূন্যতার বিলাপ নয়। তিনি আবার মাথা তুলে দু পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়াবেন, এক আছাড়ে ভেঙে ফেলে দেবেন ছবি দেখানো এই আয়নাটাকে। তারপর বুক সোজা করে নেমে আসবেন ওই খবরের কাগজটার মধ্যে, ওই কাগজটার জাগ্রত চঞ্চল বহুবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর পটভূমিতে। শুধু ওইখানেই তিনি থামবেন না—তারপর আবার নীল-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যাবেন সেই নীল-নয়নার সন্ধানে ; যদি তাঁকে খুঁজে পান, পুরুষের মতো—নীরোগ স্বাস্থ্যবান যে-পুরুষ কাঁধের ওপর মাথাটাকে সোজা রেখে দাঁড়াতে পারে তার মতো সতেজ কণ্ঠে বলবেন ঃ আমি ফিরে এসেছি, তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।

কিন্তু স্বপ্ন—দিবাস্বপ্ন। মেডিকেল জার্ণালের পাতায় সদ্য-আবিষ্কৃত দশহাজারগুণ ম্যাগ্নিফাই করা ব্যাক্‌টিরিয়ার ছবি আছে, তাদের প্রাণতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু মানুষের কথা নেই, তাঁর মতো একটা বলিষ্ঠ, শক্তিমান, কীর্তিমান মানুষকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি নেই কোনো। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো উজ্জ্বল মহীয়ান একটা মানুষের মৃত্যুর মতো বাঁচাকে আলোকিত করে তোলবার কোনো আশ্বাস নেই, আছে অতিশক্তিশালী মাইক্রোস্‌কোপের লেন্সেও যা ধরা পড়েনা, সেই অলক্ষ্যপ্রায় জীবাণুর জীবনের অতি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা। ডায়াগ্রাম, ফোটোগ্রাফ, ক্যাল্‌কুলেশন।

কাগজ দুটোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সারদাপ্রসাদ।

আয়নার মধ্যে আলো ম্লান হয়ে এলো। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যাচ্ছেনা। বৃষ্টি নেমেছে। সারদাপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন, নিজের হাতে গলা টিপে আত্মহত্যা করাটা সম্ভব কিনা ?

—কে ওখানে ?

আয়নায় ছায়া পড়ল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটি পাহাড়ী দম্পতী এসে আশ্রয় নিয়েছে বাংলোর বারান্দায়। স্বাস্থ্যে, যৌবনে টলমল করছে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে সেই আনন্দে দুজনে হেসেই আকুল। এতটা পাহাড় ভেঙে উঠেছে অথচ এতটুকু হাঁপাচ্ছেনা, একবিন্দুও ক্লান্তি বোধ হয়নি।

সারদাপ্রসাদ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে উঠলেন : বীরু, বীরু?

চাকর বীরু ছুটে এল।

—কোথায় থাকিস, কী করিস হতভাগা? দুটো পাহাড়ী উঠেছে বারান্দায়—তাড়িয়ে দে এক্ষুণি।

হুকুম পালন করতে বীরু এক পায়ে খাড়া। এগিয়ে গিয়ে বললে, হটো, হটো।

—কেন বাপু? বৃষ্টিতে একটু দাঁড়ায়েছি—পাহাড়ী ভাষায় ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালে ওরা।

—না, না, ওসব চলবেনা, বাবুর পছন্দ নয়। যাও হটো—

তেমনি হাসতে হাসতে ওরা নেমে গেল। দুঃখিত হয়নি, অপমানিতও না। সহজ স্বাভাবিক জীবনে এসব ধূলোবালি ও:দের হাওয়ায় উড়ে যায়। বৃষ্টির ভেতরে ভিজতে ভিজতে ওরা খাড়াই পাহাড়ী পথটা দিয়ে অবলীলাক্রমে নীচে নামতে লাগল, স্বাস্থ্য আর যৌবনের নির্ভুল প্রতীক।

সারদাপ্রসাদ বললেন, এখুনি ফিনাইল ছিটিয়ে দে—লাইজোল স্প্রে করে দে। সাত জন্মে ব্যাটারা স্নান করেনা, ওদের জামা-কাপড়ে দুনিয়ার যত জার্মের আস্তানা। যা—যা, দেরী করিস নে—

জীবাণুকে ভয় করেন সারদাপ্রসাদ, ভয় করেন মৃত্যুকে। আশ্চর্য, সারদাপ্রসাদ বাঁচতে চান। কিন্তু সত্যিই কাকে ভয় করেন তিনি? ওদের জামা কাপড়ে ব্যাক্‌টিরিয়াকে, না ওদের পাথুরে শরীরের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রবহমান যৌবনকে? জীবনকে, না জীবাণুকে?

আয়নার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার।

বেড়াজাল

সুশীলকুমার গুপ্ত

সুবীর কেরাণী। এই তার এখন যথেষ্ট পরিচয়। অন্য পরিচয় তার কিছু ছিল, কিন্তু সেটা দেখবার জন্যে কেউ সময় নষ্ট করতে রাজী নয়।

বাগবাজারের একটা খোলার ঘরের মধ্যে সুবীরের সাজান সংসার। বাগবাজার থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে সোজা এসপ্লানেড—সমস্ত পথটা সুবীরের কাছে নিজের হাত পায়ের মতই পরিচিত। বাগবাজারের মোড়ে বাসগুলো জটলা পাকায়, ওদিকে বুড়ো গাড়োয়ানটা মুখ গোমড়া করে ঘোড়ার গাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে; গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে ভিখিরীটা ভিক্ষে চায় সুর করে, গন্ধে কাছে ঘেঁসা যায়না, মাছি ভনভন করে, ফুটপাত থেকে নেমে নাকে রুমাল দিয়ে রাস্তা পেরোতে হয়; প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে পা ফোলা পানওয়ালা কাঠের বাক্সে পান নিয়ে সকলের সামনে পান তুলে বলে, "সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু!" ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটি স্ত্রীলোক ঘোমটা টেনে ছোট ছেলেটাকে কাছে শুইয়ে ভিক্ষে চায়,—সব একটানা চিরপুরাতন সুর, ছন্দপতন নেই, ব্যতিক্রম নেই, বৈচিত্র্য নেই।

এসপ্লানেড থেকে একটু এগোলেই অফিস। পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই বাইরেটা দপ্ করে নিভে যায়, সামনে কলিংবেলের শব্দ, চাপরাশীর আনাগোনার খসখসে আওয়াজ, কাগজের তাড়া খোলার মচমচে শব্দ, পান্‌সে ইলেকট্রিক লাইট, ফিনফিনে ফ্যানের বাতাস আর সব ছাপিয়ে কতগুলো অসহায় পাণ্ডুর বিবর্ণ চোয়াল, ঘোলাটে থমথমে চোখ, কাল ঝুলে-পড়া ঠোঁট, পানেঠেসা টোলখাওয়া ঘটির মত গাল, দুমড়ে যাওয়া অস্বাচ্ছন্দ্যকর কপাল—বাংলার বর্ত্তমান ভবিষ্যের ভেঙে পড়া ভিত। মধ্যে কলমচালান আর হাঁ করে ঘড়ি দেখা, হাত টাটিয়ে গেলে বৌ নিয়ে পাশের লোকের সঙ্গে ইয়ারকি অথবা সিনেমা যাওয়ার প্রপোজাল করা—ঐসব; পৃথিবী ওদের কাছে গুটিয়ে এসেছে, আকাশও ভাঁজে ভাঁজে কমে আসছে, দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডী ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। সুবীরের মতে একমাত্র সান্ত্বনা যে সময়েরও আয়ু ফুরোয়, জীবনের দিনও সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে।

সুবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যে যাচাই করে অনেকেই তার

ওপর কিছু আশা করেছিলেন। এত হলো স্বাভাবিক খতিয়ান। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল করে ও যখন কোলকাতায় স্কটিশে পড়তে এলো মা তখন নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাবলেন, বাবা আশা করলেন সংসারের মোড় ফিরল এবার। সুবীরের সামনেও ভবিষ্যতের কুয়াসাচ্ছন্ন সূর্য্য ঝলমল করে উঠল।

হোষ্টেলে সুবীরকে প্রথম দেখার জন্যে টি টি পড়ে গেল। সুপারিনটেনডেন্ট দু'বেলা সুবীরের খোঁজ নিতে আরম্ভ করলেন। রাস্তায় ঘাটে মাষ্টাররা থমকে দাঁড়িয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "কেমন পড়াশুনো হচ্ছে সুবীর? ভালত?"

অনেক মেয়ে যেচে আলাপ করলে। ক্লাসের নোটখাতা চেয়ে মেয়েরা প্রেমপত্র লিখতে আরম্ভ করলে। সুবীরের সঙ্গে বিকেলে একা বেড়ানোর জন্যে মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ হলো। অমন ডাটিয়াল মেয়ে রেখা গুপ্তা সুবীরকে বইয়ের মধ্যে চিঠি পাঠাল, "শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাল আপনার সহিত আলাপ করিয়া কৃত কৃতার্থ মনে করিলাম। আপনার শরীর খারাপ শুনিয়া সবিশেষ চিন্তিত আছি। আপনাকে আমার কি ভাল লাগে বলিতে পারিনা। আপনার বাঁকা তরোয়ালের মত ভ্রূরেখা ও জ্বলজ্বলে চোখ দুইটি যে কাহাকেও মুগ্ধ করিতে পারে।..."

মেয়েদের সঙ্গে এনগেজমেন্টের দরুণ ওকে সারা বিকেলটাকে মসৃণভাবে খণ্ডিত করতে হয়। মেয়েরা হোষ্টেলের সামনে এসে হাজির হয়। তারপর কফি হাউস অথবা ইডেন গার্ডেন, কোনকোন সময় গঙ্গার কোন নির্জ্জন ফ্লাটে।

সীতেশ ওকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করত। ওকে গ্র্যাণ্ডহোটেলে এনটারটেন করে অনেকেই গর্ব্বের সঙ্গে বলে বেড়িয়েছে।

চিঠি সুবীর ভালই লেখে অনেক মেয়েদের মত। "তাত লিখবেই" পরেশ হরেনকে বলে, "ম্যাট্রিকে বাংলায় ভি পেয়ে নব্বই পারসেন্ট রেখে ফার্ষ্ট হয়েছিল। গত পাঁচ বছরের মধ্যে অত নম্বর কেউ পায়নি।"

সুবীরের এ্যালবাম থেকে অনেক মেয়ে ওর ছবি উঠিয়ে নিয়ে লিখে দিয়েছে, "fill up the gap" অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চিঠিও দিয়েছে "আপনার ছবিটি লইবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন। আপনার জন্যে আন্তরিক ভালবাসা রহিল। ইত্যাদি।"

সহজ আবেশ মুখর, হাল্কা হাসির দিনগুলি!

বাড়ীর আত্মীয়েরা কত আশা করতেন ওর ওপর।

পাড়ার বর্ষিয়সী মহিলারা চিবুকে হাত দিয়ে বলতেন, "ওমা! এতটুকু ছেলে

বি-এস-সি পড়ে। এই ত সেদিনকার সুবু। আমাদের নন্দর সঙ্গে প্যাণ্ট পরে গুলতি নিয়ে পাখী মেরে বেড়াত টো টো করে। আমিও বকে বাঁচতাম না।"

রাণুদি সুবীরকে ভালবাসত খুব। বলতো, "সুবু আমাদের বিদ্যেসাগর। হাজার টাকার কম সুবু আমার চাকরি করবে না। মোটা মাইনের চাকরী নিয়ে লোকে পা ধরে সাধাসাধি করবে।"

বাবার বন্ধুরা বাবাকে বলতেন, "ছেলে নিজের টাকায় বিলেতে যাবে দেখ। স্টেট স্কলারশিপ ল্যাজে বাঁধা। তোমার কি চিন্তে ভাই!"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলমের বাইরে সুবীর পত্রিকায় লেখালেখি করতো। ফার্ষ্ট ইয়ারে তার লেখা বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাগুলিতে বেরিয়েছে। তার 'ঝড়' গল্পটা পড়ে তারাশঙ্করবাবু বলেছিলেন, "সুবীর চেষ্টা ছেড়না, এদিকে লেগে থাকতে পারলে উন্নতি আছে।"

সে আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নালোকিত জীবনের সঙ্গে আজ কোন সামঞ্জস্য নেই। হেমন্তকালে খোলার চালের ওপর ঝরে পড়া শিশিরের মত মাঝে মাছে পুরণো দিনগুলো চোখ ঠাওরায়। ফুটো টবে তুলসী গাছের ওপর জমা শিশিরের মত অতীত জীবনটা ছলছল করে। এখন সে কেরাণী—এই তার শ্রেষ্ঠ ও স্বাভাবিক পরিচয়! শব্দটা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করলে আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে করে না।

আজ বিশ্বেস হয় না তখন সে কি জোরে লাভ ম্যারেজ করতে গিয়েছিল। অবস্থা নিজের ভাল নয় তার ওপর রাণী বড় লোকের মেয়ে। রাণী বলেছিল, "পারবে ত, সব ভেবে দেখ।"

"কুছ্ পরওয়া নেই," আস্তিন গুটিয়ে বলেছিল সুবীর, "আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবেনা রাণি!" তা' তখন সে বলতে পারতো, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর ছাত্র সে, চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য ভাল,—ছাত্রজীবনের বড় যা কিছু!

কিন্তু সে হার মেনেছে। রাণী সে কথা তুলে প্রায়ই খোঁটা দেয়। বেশ ঝগড়া হয়ে যায় দুজনে।

আজকের এই অবস্থার জন্যে খানিক পরিমাণে দায়ী তার পলিটিক্সের হুজুগ। প্রথম প্রথম ওটা মন্দ লাগেনি, বেশ মাদকতা ছিল ওর মধ্যে। ও ভালছেলে, বিভিন্ন পার্টির লোকেরা ওকে দলে টানতে ঝুলোঝুলি করত। কলেজ ইলেকশানের সময় ও ছিল আন্-কনটেষ্টেড ক্যানডিডেট। শেষের পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি ঐ সব হুজুকে মেতে। ওর চোখে তখন রামধনুর সাতরঙা স্বপ্ন। ও তখন মার্ক্সিষ্ট লিটারেচার পড়ে মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করতে শিখেছে, নিজেকে প্রলিটারিয়েট বলে তর্কে আসর মাত করতে অভ্যাস করেছে, গান্ধীবাদ সম্বন্ধে কড়া প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছে। ও তখন দেশসেবক, বস্তীউন্নয়নের

স্বপ্ন ওর চোখে, বিড়লা টাটার সংগে শ্রমিকের ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের তীব্র পক্ষপাতী। এমন সময় এক সভায় বক্তৃতা করাতে নাম গেল গভর্ণমেন্টের কালোখাতায়। পরাধীন দেশের সনাতন নিয়মে তার কাছে ডালহাউসী স্কোয়ারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে মার্চ্চেন্ট অফিসের পঁয়তাল্লিশ টাকার কেরাণী।

গভর্ণমেন্ট সার্ভিস না করে ও চেয়েছিল পেপারে ঢুকতে। সব জায়গায় ও ইনটারভিউ দিয়েছে কিন্তু তারা যে টাকা অফার করেছে, তা'তে চমকে উঠতে হয়। সব জায়গায় এক কথা, "দেখুন, গ্রাজুয়েট হলে আমরা পঁয়ত্রিশ টাকা দি', আপনিও তাই পাবেন। আর দেখুন, আপনাকে শুধু নিউজ ট্রানস্লেশান করতে হবে, ফ্রি রাইটিংএর স্কোপ দেওয়া হবেনা।"

এই কি পেপারের সেলফ্ একস্‌প্রেশনের সুযোগ! ও বলেছিল, "আপনারা চাপরাশী চান না সাব এডিটার।"

ম্যাট্রিকের সময় কত স্বপ্ন ছিল ওর চোখে। রিসার্চ করবে ও, বিলেতে জার্ম্মানীতে যাবে পড়তে। প্রফেসার ওকে বলেছিলেন, ক্যেমিষ্ট্রি পড়তে। ওতে স্কোপ আছে। অবশ্য স্কোপকে সনাতন নিয়মে তিনি ইকুয়েট করেছিলেন একটা আশী টাকার কেরাণীর চাকুরীর সঙ্গে। তাও হলোনা। কেমিক্যাল ফার্ম্মে ঘুরে জুতো ছিঁড়ে গেল। সব জায়গায় খাটুনী অসম্ভব, এইচ টু এসের গন্ধে জীবনের আয়ু কমে আসছে সব সময়, টাকাও তিরিশ থেকে চল্লিশ।

আগে দশটা বারটার সময় ট্রামে বাসে যাতায়াত করতে শুনতো, পনের আনা লোক টিকিট কাটছে 'ডালহাউসী স্কোয়ার'; ঘৃণায় নাক সিঁটকতো ও। ওরা গভর্ণমেন্টের চাকরের দল, দেশের স্বাধীনতার পরিপন্থী-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মিছিল। হায়! দেশের কাজের কড়া ঝাঁঝ ওর ঝিমিয়ে গেছে, ডালহাউসী স্কোয়ারকে তার তীর্থ বলে মনে হচ্ছে দুঃখ দারিদ্র্যের জুতো লাথি খাওয়ার মধ্যে।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকার চাকরী। কোন মতে পনেরটা দিন চলে। অনেক জায়গায় যারা ওর ইনটারভিউ নিয়েছে তারা হয়ত ওরই সঙ্গে ক্লাশ নাইন পর্য্যন্ত পড়ে ওদিক মাড়ায়নি। সীতেশ ছোকরা এখন ইন্সিওরেন্সে হাজার টাকার চাকরী করছে। ওই সীতেশই ওকে একদিন অত সেধেছিল বাড়ী নিয়ে যেতে। ও সেদিন মটর হাঁকিয়ে কলেজ স্কোয়ারের কাছ দিয়ে চলে গেল। হিমাংশু এখন মস্ত দোকান দিয়েছে। মীরার বিয়ে হয়েছে কোন আই-সি-এসের সঙ্গে।

পুরণো প্রেমপত্রগুলো ও মাঝে মাঝে বার করে পড়ে আর হাসে। পুরণো লেখার মধ্যে একটা নির্জীব আনন্দ পায় যেন। লিখতে আর ইচ্ছে করে না। কি হবে লিখে? বাড়ীতে যেটুকু থাকে জানলা দিয়ে টুকরো চৌকোণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পায়রাগুলোর বকম্ বকম্ শব্দটা ওর বেশ লাগে। ঝর···র ঝর···র শব্দে পায়রাগুলো উড়তে থাকে। পুরণো দিনগুলো কেঁপে ওঠে যেন!

ঘরখানা অন্ধকার খুপরী। পায়রার খোপের মত। সামনের নর্দ্দমার পাশে ডাষ্টবিন। আকাশ দেখতে হলে অন্ততঃ ঘাড়টাকে যাটডিগ্রী কোণ করে ভাঙতে হয়। কলার খোসা, মাছের আঁশ, ছাই, এঁটো ভাত, তরকারির খোসায় গলিটার মধ্যে বেশ একটা আস্তরণ পড়েছে।

বাঁচবার ধারালো আশাটাকে যেন পারিপর্শ্বিক লোহার হাতুড়ি পিটিয়ে ভোঁতা করে. দিয়েছে। আলোবাতাস নিয়ে প্রত্যেকটি চালে কাড়াকাড়ি। বাড়ীর উনোনে আগুন দিলে পাড়াটার দম বন্ধ হয়ে যায়, মশার গুঞ্জনে জায়গাটা মুখরিত হয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে ছারপোকাসঙ্কুল চেয়ার, সামনে বিয়ের সময় পাওয়া টেবিলটা পুরণো হয়ে দাঁত ভেঙ্গাচ্ছে। একটা দেরাজ, ঝুলপড়া আয়না, ভাঙা খাট, দু'টো পুরণো ষ্টীলের বাক্স আর একরাশ বই—এই ত তার সম্পত্তি। আত্মীয়স্বজনেরা আগে কেউ কেউ আসত, আজকাল কেউই আসেনা।

রাণীর দিকে তাকিয়ে ওর হাসি পায়। দারিদ্র্যের চাবুকের চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে। তার চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়েছে, মাথায় রাশ চুলের জায়গায় একটা ছোট পুঁটুলী হয়েছে, মসৃণ গালের হাড় দু'টো যেন কোন জন্তুর মত লাফ দিয়ে পড়ার জন্যে ওত্ পেতে আছে। শেলাই করে জোড় দেওয়া কাপড়ে জড়ানো ফেটে যাওয়া মাটির প্রতিমা। ওকেই ও একদিন কত ভালবাসত! চারপয়সার ট্রাম খরচ করে ও আড্ডা মারতে আসত ওদের বাড়ীতে, ছল করে খানিকটা থাকতে চেষ্টা করতো, হাতখানাকে স্পর্শ করতে উদগ্র হয়ে থাকত সব সময়।

আর ছোট একটা ছেলে। জিরজিরে পাঁজরা বেরিয়েছে, দু'বছরে হাঁটতে পারে না, হাত পা নাড়ে, পা দিয়ে মাছি তাড়ায়। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন ভোগে। হাসতে পারেনা ভালভাবে, বুঃ বুঃ শব্দ করে শুধু। তার ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী।

লাগোয়া পাশের বাড়ীতে থাকেন এক ভদ্রলোক। শৈলেনবাবু। বয়স পাঁচের কোঠার প্রথম দিকে, মার্চ্চেন্ট অফিসের কেরাণী। প্রথম প্রথম সুবীরের ভয় করত ভদ্রলোককে দেখে। মিশকালো চেহারা, ভাঙা রংচটা নিকেলের চশমা সূতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। পানখাওয়া কালো দাঁত, পুরু ঝুলেপড়া ঠোঁট, থ্যাবড়ানো নাক—সব জড়িয়ে একটা কুঞ্চিত বীভৎসতা। যৌবনের উদ্দামতার চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে। মুখখানা আমসির মত শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে ধারালো ছুরির মত। গায়ে শতছিন্ন জামা, ছেঁড়া জুতো, সার্টে বোতাম নেই।

স্ত্রীকে দেখলে মনে হয় পুড়ে খাক হয়ে গেছেন। তিনটে কাঠির মত ছেলে ঘুরে বেড়ায়। লেখাপড়া নেই, খাওয়াও জোটেনা সব দিন।

রাত্রে ভক ভক তাড়ির গন্ধ আসত। সুবীর নাক সিঁটকতো খুব। ভদ্রলোক তাড়ি খেয়ে মৌজ করতেন।

প্রথম যেদিন সুবীর এলো ভদ্রলোক গামছা পরে পায়খানা যাচ্ছিলেন, গাড়ু হাতে। থেমে বললেন, "কোত্থেকে আসা হচ্ছে? থাকতে পারলে হয়।"

সুবীর বলেছিল, "বাড়ী থেকে।"

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, "তা বেশ বেশ! জায়গাটা নেহাত খারাপ নয়। থাকলেই সব সয়ে যাবে'খন।"

সুবীর বলেছিল, "বাড়ী পাচ্ছিনা বলে এলাম, পেলেই উঠে যাব। মানুষ এখানে থাকতে পারেনা।"

ভদ্রলোক আবার হাসলেন, কি বিশ্রী হাসি! বললেন, "তাই নাকি? আমরা আর মানুষ নই নাকি? তা বেশ বেশ।" একটু থেমে বললেন, "কি করা হয় মহাশয়ের?"

সুবীর বলেছিল, "মার্চ্চেন্ট অফিসে কাজ করি।"

"কেরাণী ত!" আবার হাসলেন ভদ্রলোক, "তা বেশ বেশ। ব্যস্ত আছি, অফিসের সময়। বিকেলে দেখা হবে আবার।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। সুবীর ভেবেছিল যত শিগ্গীরি পারে সে চলে যাবে, কিন্তু কই। সেই ভদ্রলোকের মধ্যে কি এক নিষ্করুণ ছবি দেখেছিল তা ওই জানে। আজ মরে গেছে সব!

শৈলেনবাবুর স্ত্রী রাণীর কাছে কত দুঃখ করেন।

স্ত্রী লোক ভালই ছিলেন, অবস্থা সব দুয়ে নিয়েছে।

স্ত্রীকে সামান্য কারণে মারধোর করেন শৈলেনবাবু। বহুবার সুবীর ঠেকিয়েছে। ভারী খারাপ লাগত ওর। অভাবে মনের দিক থেকেও শৈলেনবাবু ক্ষতুর হয়ে গেছেন।

অফিস ছাড়া বাড়ীতে যেটুকু সময় থাকেন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াতেই কাটে। রান্নাঘরে মুখ চলে দু'জনের। কি চমৎকার গার্হস্থ্য!

শৈলেনবাবু বলেন, "ভাগ্যিস মাসের মধ্যে পনেরদিন অসুখে ভোগ তুমি। নইলে সবদিন খেলে লোটাকম্বল নিয়ে আমাকে রাস্তায় বেরুতে হতো। ঐ জন্যেই তোমাকে আমি ভালবাসি।"

স্ত্রী ফুটে ওঠেন, "মদ খেয়ে ছোটলোকের সঙ্গে মাতলামি করে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে ভুলে গেছ নাকি! তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকল তবুও···"

হুংকার করে ওঠেন শৈলেনবাবু, "চোপরাও ! যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা। জুতোর শুকতলার মত রাখতে হয় তোদের, লায় দিলে বাঁদরও মাথায় ওঠে। চড় চাপড়া খাওয়া ত অভ্যেস আছে মুখ সামলে কথা কবি।"

গরম হাতা তুলে স্ত্রী কঁকিয়ে ওঠেন, "মেরে চুপ করাবে নাকি তুমি। ভারী বীরত্ব। অফিসে ত লাথি মারে আর বাড়ী এসে…"

"খবরদার", গর্জ্জে ওঠেন উনি, "জুতিয়ে পিঠ ভেঙে দেবো তোর। অ…জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। চুলের মুঠি ধরে দশ পাক ঘুরিয়ে দেবো এখুনি।"

স্ত্রীর সঙ্গে এমনি শৈলেনবাবুর বিশ্রম্ভালাপ, দাম্পত্য প্রেমের টুকরো ঝলকানি, একটু ফুটফুটে প্রকাশ মাত্র।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে মদ খান আর লবঙ্গ চোষেন। মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে উঠে ক্যালেণ্ডারের তারিখটা দেখেন।

যেচে আলাপ করেন গলা বাড়িয়ে জানলা থেকে।

—"কি হচ্ছে মশায় ?"

"কাগজ পড়ছি।" উত্তর দেয় সুবীর।

"ছোঃ, ওসব ছেড়ে দিয়েছি ভায়া। সার জিনিস হচ্ছে…" মদের বোতলটা উঁচু করে দেখাল।

মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যস্থতা করতে সুবীরকে ওদের বাড়ী যেতে হয়।

দু একটা কথাও হয় মাঝে মাঝে।

সুবীর বলে, "আপনি মদটা ছেড়ে দিন শৈলেনবাবু। বুড়ো বয়সে বেঘোরে মারা পড়বেন।"

হাসতে হাসতে বলেন শৈলেনবাবু, "না বুঝে বলছ ব্রাদার ! পরে বুঝবে ! অনেক দুঃখে ধরেছি ভায়া। যখন দেখলাম সব নিভে ছাই হয়ে গেল তখন দেখলাম শেষ আগুন জ্বলছে ঐ সব লাল বোতলে। বাঁচতে হবে ত,—" একটু দম নিয়ে বলেন, "অবশ্য বাঁচব না বেশীদিন…আমি মরলে অবশ্য ও-ও বাঁচে। দেখ না ঘটা করে শনি পূজো করে।" আঙুল দিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে দেন।

স্ত্রী মুখ ভার করে উঠে যান।

সুবীর বলে, "বুড়ো বয়সে একটু ভাল হন শৈলেনবাবু।"

হা হা করে হাসতে থাকেন উনি। "এখনও কাঁচা বয়স ব্রাদার, পরে বুঝবে। য়ুনিভার্সিটিতে খোঁজ করে দেখলে শৈলেন মিত্তিরকে লোকে ভাল ছেলেই বলবে। কিন্তু

ব্রাদার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তাই হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর কটা দিনই বা।" পেটের ব্যথায় কুঁকড়ে পড়েন উনি।

"আচ্ছা স্ত্রীকে মারেন কেন? উনি ত আপনার কিছু করেন না।" প্রশ্ন করে সুবীর।

"ওরে, স্ত্রীকে আমিও ভালবাসতাম ব্রাদার আমিও ভালবাসতাম। জিজ্ঞেস করে দেখ, পায়ে হেঁটে সাতক্রোশ পথ ঠেঙ্গিয়ে সপ্তাহে দুবার শ্বশুরবাড়ী যেতাম ও থাকতে। কাপড় চাইলে পঞ্চাশটাকার বেনারসীও কিনে দিয়েছি, বিশভরি হারও গড়িয়ে দিয়েছি। সোহাগ কম করিনি ব্রাদার তবে সেদিন আর নেই!" শৈলেনবাবুর হাঁপ ধরে।

শৈলেনবাবুর কথার ফাঁকে ফাঁকে কোন বিলীয়মান অতীতের খানিকটা অস্পষ্ট আলো যেন সুবীর দেখতে পায়।...

হঠাৎ বিমনা হয়ে যায়, নিজের ভবিষ্যতের ছায়া যেন ওর সামনে কাঁপতে থাকে।...

শৈলেনবাবু কোন কোন সময় সুবীরকে বলেন, "মদ না খেয়ে কি করে থাক ভায়া। খিটিমিটি ত লাগে মাঝে মাঝে। ঘা কতক দিয়ে চলে আসবে তারপর দু'জনে দু'গ্লাস। ব্যস্ সব ঠাণ্ডা, ব্যোম্ ব্যোম্...

সুবীর বুঝত স্ত্রীর সঙ্গে কলহকে ইঙ্গিত করছেন উনি। চুপ করে চেয়ে থাকত দূরে গম্বুজটার দিকে।

তিনদিন খোকার জ্বর হচ্ছে। সেদিন সকালে জ্বর প্রবল হলো।

খোকাকে কেন্দ্র করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ঝগড়া হয়ে গেল।

রাণী চীৎকার করে বল্লো, "আচ্ছা লোক তুমি! ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে চোখের সামনে মরবে তবু চেষ্টা করে দেখবে না একবার!"

সুবীর বল্লো, "কি করবো আমি! কপালে যা' থাকে হবে। টাকা নেই ডাক্তার বদ্দি পাব কোথায়। বাজারে অনেক ধার, ধার কেউ দিতে চায় না!"

রাণীর মুখ ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে আস্ছে, "বিয়ে করার সময় মনে ছিলনা তোমার। একটা ছেলের অসুখে যার চিকিৎসা করার মুরোদ নেই তার সংসার করতে লজ্জা করে না। বলিহারী তোমাকে। ভাল ছেলের সার্টিফিকেট ধুয়ে জল খেলেই যদি সংসার চলত..."

ধমকে ওঠে সুবীর। "বেশী বকো না বলছি। কপালে থাকলে বাঁচবে নইলে নয়। কপাল যদি ভালই হবে তবে রাজরাজরার ঘরে জন্মালেই পারত।"

"ধমক দিয়ে চুপ করাবে নাকি তুমি?" রাণী বলে ওঠে, "ও কথা বলতে জিভ খসে পড়ে না তোমার।"

"দেখ!" সুবীর একটা কিছু করে ফেলত, কিন্তু চুপ করে চেয়ার টেনে জামা গায়ে ফেলে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন অফিসে যাওয়া হলো না। অফিসের একজন চাকুরের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার ক'রে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে ট্রাম ধরতে দাঁড়াল।

"আরে! সুবীরবাবু যে!"

একি! স্বরটা যেন পরিচিত। সুবীর পিছনে ফিরলে।

নিজের চোখকে সে বিশ্বেস করতে পারছে না, একি রেখা! হ্যাঁ, সেই রেখা!

"আছেন কেমন?" রেখা এগিয়ে আসছে। মুখে সেই বহু পরিচিত হাসি।

"কি, কথা বলছেন না যে! চিনতে পারছেন না বুঝি?"

সুবীর সম্বিত ফিরে পেলে। চার বছর আগেকার বসন্ত যেন ফিরে এসেছে!

ধরা গলায় ও জবাব দিল, "হ্যাঁ ভাল।"

রেখা এগিয়ে এসে বল্লে, "কত লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। সুব্রতবাবুর কাছে খোঁজ নিলাম। সকলে বল্লে, উনি একেবারে ডুব দিয়েছেন। আমি ভাবলাম বিলেত যাবার আগে আর দেখাই হবে না। যাক আমার ভাগ্যি।"

সুবীরের মধ্যে কলেজ জীবনের সমস্ত সৌরভ দৃঢ়তা ও গর্ব্ব জেগে উঠেছে।

রেখা আবার বল্লে, "কোনদিকে যাবেন? আসুন না হাঁটতে হাঁটতে এগোই।"

ওরা এগোতে লাগল।

সুবীর জিজ্ঞেস করলো, "কবে বিলেত যাচ্ছেন?"

"এই মাসখানেকের মধ্যে। অক্সফোর্ডে পারমিশন পেয়েছি। এখন প্যাসেজ পেলেই, ব্যস্"—সুবীরের মধ্যে বাল্যের নিদ্রিত আকাঙ্ক্ষা উঁকি মারছে। বহুদিন পরে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দেখলে একবার।

রেখা একটু থমকে দাঁড়িয়ে সুবীরের দিকে চেয়ে বল্লে, "বড্ড রোগা হয়ে গেছেন যেন। খুব খাটুনি যাচ্ছে বুঝি। কতবার বলেছি অত খাটবেন না।"

একটু থেমে বল্লে, "তা' বিয়েটিয়ে করেছেন?"

"নাঃ", সুবীর ঝোঁকের মাথায় বলে ফেল্লে। কি মনে হলো তার!

রেখা সুবীরের মুখের দিকে চাইল।

একটু হেসে বল্লে, "তা'লে চলুন না দু'জনে বিলেতে যাই। এক সঙ্গে পড়া যাবে।" মুখের দিকে চেয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

"নাঃ সে হয় না। অত টাকা আমার নেই। তবে ফিরে এলে অনেককে বলতে পারবো আমার একজন বান্ধবী...."

মুখটিপে হেসে বল্লে রেখা, "খুব ঠাট্টা হচ্ছে না ?"

সেই পুরণো হাসি, স্বপ্নালস অতল চোখ দু'টি। হাল্কা আসমানী রঙের শাড়ীর আঁচল আলগোছে ওর গায়ে এসে লাগছে। ওর গা থেকে মৃদু এসেন্সের গন্ধ বার হচ্ছে, চুল বাতাসে উড়ছে··· চূর্ণ অতীত দিনগুলো।

সেই সুবীর। পুরণো তারায় ভরা আকাশ....নীচে অতীত নিঃশ্বাসে নিবিড় রাজপথ··· চারি পাশে পুরণো গন্ধ।

পথ চলতে চলতে রেখা বল্লে, "পরশু পরেশবাবুর সঙ্গে মেট্রোতে দেখা। আপনার কথা জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'মিসেস গুপ্তা', ও ছেলে ডোববার নয়। প্রিনস্ অফ্ ওয়েলস্ মাঝ দরিয়ায় বানচাল হয়ে ডুবতে পারে, কিন্তু এমন কোন ঝড় নেই যে সুবীরকে ডোবাতে পারে। ওদের জাতই আলাদা। খবর না পেলেও বুঝবেন, নিশ্চয়ই কোন কাজে লেগে আছে। ওঠার সময় হলেই ধূমকেতু হয়ে উঠবে।'"

একটু থেমে বল্লে, "অবশ্য আমারও সেই মত।"

রেখা হাসছে। কি সুন্দর হাসি···ভাঙা মেঘের বুকে রূপালী চন্দ্রলেখা।

কথা বলতে বলতে ওরা প্রেসিডেন্সী কলেজের কাছে এসে পড়ল।

সুবীর বল্লে, "আসুন না রেখা দেবী, কফি হাউসে একটু বসা যাক! অনেকদিন ত যাইনি।"

বহুদিন পরে কফি হাউসে ঢুকল সুবীর···পুরণো দিনগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল যেন।

খেতে খেতে প্রথম কথা বল্লো রেখা, "আপনাকে দেখে পুরণো দিনগুলোর কথা বার বার মনে হচ্ছে।

'আচ্ছা, পুরণো দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনা যায় না।"

ওর কণ্ঠে একটা আকুতি।

হঠাৎ সুবীরের মনে হলো, না সে মরে যায়নি এখনও। ও বাড়ী, ও গলি, ও জীবন সত্যি নয়।

সে সুবীর রায়, কলেজের এক নম্বরী ছাত্র, অতগুলি মেয়ের প্রশংসার পাত্র, প্রেমপাত্রও বটে···বিশেষ করে রেখার···সব কথাটা ও ভাবতেও পারলে না। একটা আতপ্ত সান্নিধ্যে ও কাঁপছে।

অনেক কথাবার্ত্তার পর রাত হলে ওরা ওখান থেকে বেরুল। বিল শোধ করলে সুবীর।

ট্রাম ষ্ট্যাণ্ডে এসে রেখা বল্লে, "ঠিকানাটা নিন। দু'একদিনের মধ্যে যাবেন আমাদের ওখানে।" একটা কার্ড ওর হাতে দিল।

ট্রাম আসছে। রেখা হাত তুলে বল্লে, "নমস্কার," সুবীর একটু এগিয়ে রেখার ডান

হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে ছেড়ে দিলে। রেখা কেঁপে গেল, বাধা দিলে না।

ট্রাম এসে পড়েছে।

সুবীর যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছে। পরের ট্রামে শ্যামবাজারের মোড়ে নেমে চিরাচরিত পথে গলির মুখে এসে হাজির হলো। মনে হলো যেন গলিটা হাঁ করে তাকে গিলতে চাইছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে। রাণী দরজা খুলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে, "ওষুধ এনেছ ?"

"না, পেলাম না", উত্তর দিলে সুবীর।

"তবে", বোমার মত ফেটে পড়ল রাণী, সমস্ত মাতৃত্ব তার বজ্রের রূপ নিয়েছে, "তবে কোন মুখে ফিরে এলে শুনি। খোকা হরদম বমি করছে। লজ্জা করে না তোমার।"

"চুপ করো রাণি, ভাল হবে না বলছি," ইস্পাতকঠিন কণ্ঠে বলে সুবীর।

"কি !" ছুটে আসে রাণী, "বেহায়া বেইমান। নিজের ছেলে মরছে একটু মন কাঁপে না তোমার।"

অন্যদিন হলে কিছু বলত না সুবীর ; কিন্তু আজ সে এক কাণ্ড করে বসলে। ধাক্কা দিয়ে রাণীকে ফেলে দিলে। "বাপরে" বলে খাটের কানায় পড়ে ও মাটিতে বোধ হয় নেতিয়ে পড়ল।

সুবীরের মনে এক পৈশাচিক দ্বন্দ্ব।

উঠোন ডিঙ্গিয়ে শৈলেনবাবুর ঘরের মধ্যে গিয়ে ও উঠল।

চুর হয়ে বসে শৈলেনবাবু, সামনে মদের গ্লাস।

"কে ব্রাদার নাকি ! হবে ভায়া ?" হাতে মদের গ্লাস এগিয়ে দেন শৈলেনবাবু অন্যদিনের মত, "হবে ভায়া ?"

সুবীর কি ভাবল। না, এ পারিপার্শ্বিককে সে ভুলতে চায় !

ঢক ঢক করে কয়েক চুমুক খেয়ে ফেল্লে। 'উঃ, কি ঝাঁঝ গলা পুড়ে যায়।'

হাত বের করে শৈলেনবাবু বললেন, "Come round ব্রাদার হাতে হাত দাও। একটু কষ্ট, তার পরেই সব ভাল ব্রাদার।"

সুবীরের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

একটা যৌবন তার সমস্ত স্বপ্ন নিয়ে সেই পুরণো বেড়াজালে জড়িয়ে গেল, যার ফাঁস প্রতি গলির অন্ধকারে পাতা আছে।

দূরে একটা কুকুর ডাকছে কোন সফলকাম তান্ত্রিকের পাগলা হাসির মত।

গতানুগতিক

হীরেন বসু

মুখখানা আশ্চর্য্য রকমের বিকৃত করে হালদার মশায় যখন চেয়ারটা টেনে বসলেন, তখন সকলের কলমের দ্রুতগতি অকস্মাৎ থেমে গেছে।

—ত্রিশ বছর চাকরী করলুম, পেনসেনটাও মিললো না, হা ভগবান!

এর ওপর আর কিছু বলা যায় না। সবাই একবার সহানুভূতিসূচকভাবে চেয়ে যে যার কাজে লেগে গেলাম। তখন ওপাশে বেড়ার ফাঁকে ছোট সাহেবের রক্তচক্ষু দেখা দিয়েছে।

পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল। মেয়েলি হস্তাক্ষরের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারলুম, কে লিখেছে। না পড়েই ছিঁড়ে ফেললুম। আজ তিন সপ্তাহ ধরে এরূপ অনেকগুলি চিঠির একই ভাগ্য নির্ণীত হচ্ছে। ওসব ভাল লাগে না একটুও। আমার চিরবিক্ষুব্ধ অন্তর আবার বিদ্রোহে গর্জ্জে ওঠে। খাতার অক্ষরগুলো চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দিক্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

অভিভূতের ন্যায় স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।...

স্কুলের গণ্ডী পার হতে না হতেই বাবা দিলেন বিয়ে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে। কুল-গৌরবও যথেষ্ট। এ সুযোগ হারালে আর হয়ত মিলবে না। কাজেই সুপুত্রের মত পিতৃবাক্য পালন করলুম। কিন্তু তারপর যা হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা গেলেন মারা। আর কয়েক বছরের মধ্যেই এলো একান্ত অনাহূত কয়েকটি শিশু অতিথির ভীড়! তিন দিনেই সন্ধ্যার দেহ গেল পটকে। ঠুনকো রূপটা পড়লো ভেঙ্গে। ঢিলে, নড়বড়ে—মূর্ত্তিমতী ছন্দপতনের ন্যায় আমার জীবনে এক ভীষণ অমিলের সৃষ্টি করলে। গ্রামে ছিলেন হালদার মশায়। বাবার বাল্য বন্ধু। কোনরকমে সাহেবদের বলে ক'য়ে আমাকে তাঁর স্থানে বসিয়ে দিলেন। সেই থেকে আমি কেরাণী। রোজ দশটা পাঁচটা করি। আর প্রতি শনিবারে বাড়ী যাই। কিন্তু তাও দুদিনে বিষিয়ে উঠলো। বাড়ী ফিরলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো যখন "বাবা। বাবা!" বলে সোহাগ জানাতে আসে তখন এক একটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিই! কি কাতর অসহায় দৃষ্টি! ময়লা শতছিন্ন তাদের পরিধেয়—সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে কেমন একটা শিশুসুলভ ভাব। যত রাগ আমার ওদের ওপর। এমনি করে বাড়ী আসবার স্বপ্ন তাসের তাজমহলের মত ভেঙ্গে পড়ে! রবিবার রাতটা অপেক্ষা করি কখন ভোর হবে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি মেয়ের

কথা মনে পড়ে যায়। সেই একদিন বাসে করে কোথায় যাচ্ছিলুম। হঠাৎ একটি মেয়ে উঠে আমার পাশের সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যে বসে পড়লো। সন্ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ খপ্ করে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, আচ্ছা ভীরু তো আপনি! আপনাকে খেয়ে ফেলবো না কি? কণ্ঠস্বরের মধ্যে কেমন একটা সহজ স্পষ্টভাব। বেশ মুখরা মেয়েটি। পর পর কতগুলি খবরই না আমার জেনে নিলে। শেষে উঠে "একটু কষ্ট দিলাম কিন্তু" বলে রাস্তার মাঝে নেমে বিপুল জনস্রোতের মাঝখানে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সুন্দর এই মেয়েটি। বিদ্যুৎ-লীলার মত রহস্যময়ী—মুক্ত আকাশের মত লোভনীয়, অথচ বিরাট! ওকে পাবনা জেনেও হাতের মধ্যে ধরে রাখবার দূর-দূরাশাও রাখি। কিন্তু একি…

হঠাৎ একটা ধাক্কায় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

—আরে, কলম হাতে করে ভাবছ কি? এ কাজগুলো এখনো শেষ করনি তো? শীগগির করে ফেল। বাড়ী থেকে টেলিফোন এসেছে—বলে বড়বাবু বেরিয়ে গেছেন। এই বেলা করো। এখুনি দেখতে চাইবে।

একঘন্টা সময় যে কি করে কেটে গেছে বুঝতে পারি না। কাজেই টিফিনের সময় বসে কাজ করি।

বিমলের চাকরী গেল।

হতভাগ্য বেচারীর! মিলিটারী লরীর দয়ায় হাসপাতালে পড়ে ছিল…তিনমাস…কত খরচ করে এ যাত্রা বাঁচল, কিন্তু চাকরী রইলো না। যাবার সময় কত দুঃখই না করে গেল।

নতুন লোক এলো।

লম্বা, ফর্সা চেহারা। গায়ে স্মার্ট কলার সার্ট। গলার বোতামটা খোলা। তারি মধ্যে একটু সুশ্রী স্বাস্থ্যবান বুক দেখা যায়। সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে…তখনও সেক্সপিয়ারের ভাল ভাল লাইনগুলো হুবহু মুখস্ত বলতে পারে। আমার দিকে চেয়েই হেসে উঠলো। বুক পকেটটা কতকগুলো অনাবশ্যক কাগজের ভারে নুয়ে পড়েছিল। একটা ক্লিপ দিয়ে সেগুলো আঁটা ছিল। ফস্ করে পকেট থেকে সেগুলো টেনেই পর পর সবগুলোকেই টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে কেবল ট্রামের টিকিটটা হাতে করে বললে, শুধু এইটা ছাড়া সবগুলোই বাজে। সারাজীবনটা কেবল বাজে জিনিষের ভার বয়েই মরছ?

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলুম।

হাত নেড়ে কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাতখানা আমার মাথায় লেগে যাওয়ায় বললে, এহেঃ, আচ্ছা তেল মেখেছ তো? এই বলে হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলো। কি সহজ

স্নে হাসি। অফিসে ঢোকবার পর কাউকে এমনভাবে হাসতে দেখিনি। অনেকেই এসে দাঁড়ালো, বললে, আশ্চর্য্য, এই কুড়ি বাইশ বছরেই বুড়ো হয়ে গেছো ?

কিন্তু যেমনি সাড়ে দশটা বাজলো, অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিজের স্থানে বসে কাজ আরম্ভ করলে। যেন সে মানুষটাই নয়! আবার টিফিনের সময় মুখ খুললে, বললে, ওঃ, তিনঘণ্টা খেটে বুড়ো হয়ে গেছি। একটা মজা দেখবে? আঙুল দিয়ে দেখালে দূরে হালদার মশায় টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আস্তে আস্তে গিয়ে পকেট থেকে একটা স্প্রিংএর কব্জাওয়ালা নস্যের ডিবে বার করে নাকের তলায় খুলে দিলে। অমনি হাঁচতে সুরু করলেন হালদার মশায়। সবাই হেসে উঠলো। আমিও। হালদার মশায় তো চটেই লাল, তখনই সাহেবের কাছে নালিশ করতে যান আর কি! তাঁর পিঠ চাপড়ে কিন্তু সব ঠিক করে নিলে। তাঁর কাজগুলো আগাগোড়া নিজে করলে। তারপর বললে, দূর ছাই ভাল লাগে না! একটা গান শুনবে? বলেই ধরলে "come with me in moonbeam".

সবেতেই কেমন নির্ব্বিকার ভাব। পৃথিবীর কোন ব্যর্থতাই যেন ওকে নাগাল পায়না।

বড়বাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেছে।

তিনদিনের জ্বর থেকে উঠে অফিসে এসেছি। টিফিনের ঘরে হালদার মশায় ফিসফিস করে বললেন, ওদের সঙ্গে আর মিশোনা বাবা! দেখলে তো? আজই চাকরী খেয়ে দিলে। কাজ করুক না কেন। ডিপার্টমেণ্ট স্পয়েল করছে। চাকরীর স্থানে অত আদিখ্যেতা!

সত্যিই তো...

যেমনি অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি অকস্মাৎ চলে গেল। শুধু বললে, তোমাদের একটু জ্বালিয়ে গেলুম মাত্র।

আবার নতুন লোক এসেছে। বৃদ্ধ। নিকেলের চশমা চোখে। বললে, এসব ছেলে ছোকরার কাজ নয়। কিড়িং কিড়িং করে সাহেবের কল বেজে উঠলো। বললুম, যাচ্ছি স্যার! হঠাৎ দক্ষিণে খোলা জানালা থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে সব ওলোট-পালট করে দিলে। সেগুলো ঠিক করে সাহেবের কাছে দাঁড়াতে শুনলুম, অমলের ওপর দ্বিতীয় ওয়ার্নিং দেওয়া হ'ল...ভবিষ্যতে যেন সাবধানে থাকি।

বললুম, বহুত আচ্ছা!

...আমিও দিন গুণছি।

সাময়িক সাহিত্য

গল্প

আসমান জমিন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম ২৷০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সন্ত-প্রকাশিত গল্পগ্রন্থখানি পড়তে গিয়ে বিশেষ করে চোখে পড়লো, এর প্রত্যেকটি গল্পে নতুন বিষয়বস্তুর সমাবেশ এবং চরিত্র-নির্ব্বাচনের সৎসাহস। এক কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে, 'আসমান-জমিনে' অচিন্ত্যকুমার যা নিয়ে এসেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের দরবারে এমন ভাবে এর আগে আর কেউ আনতে সক্ষম হন নি।

বাংলাসাহিত্যের অত্যন্ত সাম্প্রতিক ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা এ কথাটা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কল্লোল-যুগে বংলাসাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা কথা-সাহিত্যে যে আলোড়ন এসেছিলো, তার প্রধান কথাই ছিলো, বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে সোজাসুজি নিকটতম সমাজের দিকে তাকানোর অদম্য প্রয়াস। তার ফলে সেই সময় বাংলা কথাসাহিত্য তার পূর্ব্বতন গণ্ডী ভেঙ্গে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, সেটা শুধু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজই নয়, একেবারে বস্তী-জীবন পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলো তার গণ্ডী। সাহিত্যক্ষেত্রের এই বিশাল প্রসারতার ফলে বাংলাসাহিত্যের পক্ষে যে শুধু সুফলই ফলেছিলো, এ কথা অবশ্য জোড় করে বলা চলে না, তবু এ কথা নিশ্চয়ই প্রত্যেক সাহিত্য-রসিক অকুণ্ঠায় স্বীকার করবেন যে, সেই বাঁধ-ভাঙার প্রবাহেই আমরা সমাজ ও জীবনকে সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করে পেয়েছিলাম। দ্বিরদরদনির্ম্মিত সৌধচূড়ার কল্পনা-বিলাস আর বাস্তব জীবন-বোধ যে এক জিনিস নয়, এ সত্যটিকে যে সেদিনের সেই বিপ্লবী সাহিত্যসাধকের দল পাঠক সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছিলেন, সেইটেই ছিলো তাঁদের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

সুতরাং আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার পর যখন অচিন্ত্যকুমারের কাছ থেকে আমরা একান্ত নিচু স্তরের মুসলমান সমাজ ও জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই তখন তাকে একেবারে অস্বাভাবিক বলে মনে করি না। কিন্তু তবু, তাঁর সাহিত্যিক নিষ্ঠার নতুন পরিচয় পেয়ে আর একবার তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়েও পারি না। নিছক সহিত্য সাধনাই যদি তাঁর ব্রত হতো, তা হলেও তো তাঁর গল্পের জন্য বিষয়বস্তুর অভাব ছিলো না। একেবারে এই স্তর পর্য্যন্ত নেমে না এলেও যে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা কতখানি বিস্ময়জনক তার প্রমাণ তাঁর যে কোনো উপন্যাস, যে কোনো গল্পগ্রন্থ। কিন্তু 'আসমান জমিনে' দেখতে পাই তিনি এসে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছেন, সেখানে যারা বিচরণ করে তারা কেউ জমিদার নয়, বড় অফিসের বড়বাবু নয়, এমন কি ছোট অফিসের সর্ব্বকনিষ্ঠ কেরাণীও নয়, তারা কেউ চোর, কেউ ডাকাত, কেউ বা ফকীর; আর সবচেয়ে বড় কথা তারা সবাই মুসলমান।

এবং এইখানেই অচিন্ত্যকুমারের নূতনত্ব। শেষ জীবনে শরৎচন্দ্র নাকি ভেবেছিলেন,

মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখ্‌বেন। হয়তো অচিন্ত্যকুমারের মত এতদূর এগিয়ে আস্‌তে তিনি সম্মত হতেন না, তবু মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস রচনা করার ইচ্ছা যে তিনি মনে মনে পোষণ করেছিলেন, তার পেছনে যে কারণ ও যুক্তি ছিলো, তা বোধ হয় এই যে, বাংলার সমাজ-দেহে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সাম্প্রদায়িক নামে বিভক্ত হয়ে থাক্‌লেও এই উভয়কে নিয়েই বাংলার সমগ্রতা। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিচারে আজ আর বাংলাদেশে এই দুই সম্প্রদায়ের অবিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পটভূমি বাছতেন শহরে না গ্রামে জানি না, কিন্তু আমরা জানি, শহর-জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কোনো কারণেই হোক যদি কিছু ফাঁক থেকেও থাকে, গ্রাম-জীবনে তাদের মধ্যে সে অবকাশের চিহ্নমাত্রও নেই। উভয়ের সংমিশ্রনেই বাঙালী জাতির সামগ্রিক রূপ, সাহিত্যক্ষেত্রে তা যদি স্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠে, তা হলে এ সাধারণ সত্য কথাটা বাংলা সাহিত্য কি করে প্রমাণ করবে যে, সমসাময়িক সমাজেরই প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে সাহিত্য? সাহিত্যিক নিষ্ঠা ছিলো শরৎচন্দ্রের, তাই তাঁর দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের এই বিরাট গলদটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিলো যে, বাংলাসাহিত্যে যে সমাজ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তা বিশেষ করে হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ নয়, সুতরাং সে সাহিত্যের দর্পণে তো সমগ্র সমাজের প্রতিফলন ঘটে নি!

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকদের কাছে তাঁদের এই ত্রুটিটুকু ধরিয়ে দিয়ে যেতেই পেরেছিলেন, নিজের হাতে তা সংশোধন করে যেতে পারেন নি। কিন্তু সে ইঙ্গিত ব্যর্থ হয়নি, পরবর্ত্তীকালে অচিন্ত্যকুমারের রচনা তা প্রমাণ করেছে। আগেই বলেছি, রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই হোক বা আর যে কোনো কারণেই হোক, শহর-জীবনে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কিছু অনৈক্য থেকেও থাকে, গ্রাম্য-জীবনে তার লেশমাত্র নেই। 'আসমান-জমিনে'ও দেখতে পাই, সবগুলো গল্পের পটভূমিই গ্রাম।

নতুন বলেই যে সব কিছু ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই, তাই নতুন কিছু দিতে পারাটাই মহত্বের লক্ষণ নয়। কল্লোলের যুগ থেকেই অচিন্ত্যকুমার অনর্গল ধারায় বাঙালী পাঠক সাধারণকে উপহার দিয়ে এসেছেন গল্প, উপন্যাস। এবং অচিন্ত্যকুমারের এই সুদীর্ঘ সাহিত্যপথপরিক্রমার এক এক প্রান্তে তাঁরাও দেখেছেন, তিনি কত সহজে কত অনায়াসে এক একবার পুরাতন পথ ছেড়ে দিয়ে নতুন পথের দিকে এগিয়ে গেছেন। আর প্রতিবারেই দেখা গেছে অচিন্ত্যকুমার ভুল করেন নি, আর মনে হয়েছে এই বুঝি তাঁর ঠিক পথ। ঠিক পথ সন্দেহ নেই কিন্তু একমাত্র পথ যে নয়, অচিন্ত্যকুমার নতুনতর পথের দিকে এগিয়ে গিয়েই আর একবার নতুন করে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই, 'আসমান-জমিন' নতুন পথের নির্দ্দেশ দিলেও, তা যে অচিন্ত্যকুমারের পূর্ব্ব সুনামকে কিছুমাত্র কলঙ্কিত করবে না, তা আশা করি যে কেউ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মেনে নিতে পারেন।

কিন্তু সে বিচার করতে যাওয়ার আগে প্রসঙ্গত আর একটা কথা মনে পড়ে গেলো। অধুনা দেখতে পাচ্ছি, কেউ কেউ মুসলমান সমাজ নিয়ে গল্প লিখতে সুরু করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ জিনিসটাও বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি, তাঁদের গল্পের নায়ক নয়িকারা শহর বা গ্রাম ভেদে শ্রমিক বা কৃষক। তার অর্থ, সমগ্রভাবে মুসলমান সমাজকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ আছে। যদি কেউ এইসব লেখকদের গল্প পড়ে দেখেন, তা হলে তাঁরা অত্যন্ত সহজেই লেখকের মূল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারবেন। শ্রমিক এবং কৃষকের রূপটাই যে মুসলমান জাতটার

একমাত্র পরিচয় নয়, এ কথাটা তাঁরা যে জানেন না, তা নয়; কিন্তু মনে হয় এর বেশী পরিচয়ে তাঁদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে তাঁরা সমাজের একটা অংশকেই শুধু গ্রহণ করেন, সে অংশ সমগ্রের যত ভগ্নাংশই হোক না কেন, এবং প্রয়োজনমত তাদের দিয়ে গল্প সৃষ্টি করে নেন। এইসব সাহিত্যিকদের পেছনে যতটুকু আছে সাহিত্যিক নিষ্ঠা, তার চেয়ে বেশী আছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কৃত্রিমতা। মানুষ কৃষক আর মজদুর তো তার বাইরের রূপে, ভিতরের রূপে যে তাকে আর এক রকমে দেখা যায়, এবং সেই ভিতরের রূপটি ধরতে পারার মধ্যেই যে সাহিত্যিকের সত্যিকারের কৃতিত্ব, সে কথাটাই তাঁরা ভুলে যান।

'আসমান-জমিনে' এই কৃতিত্বই দেখিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। একদিকে যেমন তিনি শুধুমাত্র কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়েই কারবার ফাঁদেন নি, তেমনি, তাদের বাইরের ব্যবহারিক জীবনকে কেন্দ্র করেই কেবল তাঁর গল্প গড়ে ওঠে নি। ব্যাপকভাবে সমাজকে নিরীক্ষণ করবার বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে তিনি একদিকে সন্ধান করেছেন তাঁর গল্পবস্তু, আরেক দিকে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি গিয়ে পৌচেছে মানুষের প্রাণমূলে। লেখকের প্রকৃত হৃদয়ানুভূতির স্পর্শ পেয়েছে বলেই প্রত্যেকটি মানুষ আপনা থেকে কথা বলে, তাদের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ আর আশা আকাঙ্ক্ষা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সরবানু আর রেস্তমের মধ্যেকার সত্যিকারের যোগসূত্রটা তাই ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছিঁড়ে যায় না, ইজ্জৎ আলী আর সোনাউল্লা ভিজা চোখে তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে, চোর মন্তাজ এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার ব্যর্থ জীবনের সাক্ষী মূক অসমাপ্ত কাঁচা মাটীর রাস্তার শেষ সীমায়, আর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হুকুমালি রুদ্ধ কণ্ঠে ডাক্তারের কানে কানে আন্তরিক কামনা জানায়, 'আমার আক্কেলালি গেছে, কিন্তু পাশাল্লা, মানেরদ্দি, সোনামদ্দি, গহুরালির ছেলেরা যেন না মরে।'

অচিন্ত্যকুমারের ভাষা এবং রচনাশৈলী সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই। যাঁরা একবার তাঁর 'যতনবিবি' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, 'কাঠ-খড়-কেরাসিনের' পর 'আসমান-জমিনে' এসে নিশ্চয়ই তাঁরা অচিন্ত্যকুমারের ভাষা ও রচনাশৈলীতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু ভাষার দিক থেকে তবু এমন একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করলাম যা আগের ঐ দুইটি বই-এও ছিলো না। এ বই-এর কাহিনীগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, গল্পকার যেন মুখে মুখে গল্প বলে যাচ্ছেন, আমরা বসে বসে শুনছি। গল্পগুলো ছোটো বলেই বোধ হয় এই ধারাটা বেশ লাগে, বড় হলে হয়তো বেশীক্ষণ এ অ্যামেজটুকু বজায় থাকতো না।

'যতনবিবি' থেকেই অচিন্ত্যকুমার অত্যন্ত সংযত হয়ে গেছেন। কিন্তু 'আসমান-জমিনের' এক এক জায়গায় মনে হলো, এতটা সংযত না হলেও যেন তিনি পারতেন, হয়ত আর একটু শ্লথ হলে আর একটু ভালো হতো। কাঠামো-সৃষ্টির ব্যাপারে একটুখানি অন্যমনস্ক যদি তিনি হতেন, তা হলে হয়ত তেমন কিছু ক্ষতি হতো না।

অনিল চক্রবর্ত্তী

প্রান্তরের গান : নবেন্দু ঘোষ (মডার্ণ পাবলিশার্স ; মূল্য—চারটাকা ; পৃঃ ৪২৪ ।)

সাধারণভাবে বলতে গেলে 'প্রান্তরের গান' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। অন্তত বাঙলাসাহিত্যে ঘুরেফিরে এই জাতীয় উপন্যাসকেই আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলে থাকি। "১৯৩৯ সালের প্রথম থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে তথা বাঙলাদেশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল তাকে পটভূমি করে" (ভূমিকা থেকে) এই উপন্যাসটি রচিত। ভূমিকার উপরি উদ্ধৃত অংশ থেকেই বোঝা যাবে, ঔপন্যাসিক একটা বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কাহিনীর স্থান কলাতিয়া—ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই ক'বছরের সামাজিক বিপর্যয়—রাজনৈতিক বিপর্যয় যার অন্যতম কারণ মাত্র—বাঙলার একটী ক্ষুদ্র গ্রামকে কিভাবে স্পর্শ করে গেছে, তাই দেখানো ছিল গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য। উপন্যাসটির নামনির্বাচনেরও ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়। "সব আছে, সব আছে। হাসি আছে গানও আছে। কিন্তু তবু সব কিছু যেন রিক্ত প্রান্তরের মত মনে হয়!" (পৃঃ ২১০) ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত বাঙলার সামাজিক জীবনের প্রতিভূ কলাতিয়াকে দেখে লেখকের এই অনুভূতির উদ্রেক হয়েছে ; উপন্যাসে তিনি তাই-ই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। উপন্যাসটি তিন ভাগে বিভক্ত—প্রান্তরের গান, ঝড়ের সংকেত, ঝড়।

এই জাতীয় উপন্যাসে সাধারণত চরিত্র বা ঘটনাই মুখ্য জিনিষ নয়। চরিত্র ও ঘটনার পেছনে—গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তির মতো—সামাজিক শক্তিগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ছবিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চরিত্রের আকর্ষণ তো থাকবেই, তা না হলে উপন্যাস আর নক্সার মধ্যে তফাৎ রইলো কোথায়! কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সবকিছু পার হয়ে সমাজের দিকে আটকে থাকে। 'প্রান্তরের গানে' কিন্তু সফল সামাজিক-রাজনৈতিক উপন্যাসের এই লক্ষণটি আমরা খুঁজে পেলুম না। রাজনৈতিক পটভূমি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখবার জন্য লেখক সর্বপ্রযত্ন ছিলেন বটে ; কিন্তু তদানীন্তন 'সামাজিক' ও 'রাজনৈতিক' বিপর্যয় সম্বন্ধে আমরা কোন সুস্পষ্ট সাহিত্যিক চিত্র পাইনি। মনে হয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক (এ'দুটি জিনিষ পরস্পর-সম্বন্ধী) পরিবর্তনের কাহিনী পরে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলির মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের দুর্নিবার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাইনি। সমাজের অন্তর্নিবাসী শক্তির সংগে চরিত্রের গূঢ় সংযোগ ঔপন্যাসিক দৃষ্টিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেনি।

নায়ক প্রবীর, কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী, (নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা যাতে না কমে, তার জন্যে বহু মেহনৎ করে লেখক তাকে ৪২এর আন্দোলনে জেলে পাঠিয়েছেন।) তাঁর চরিত্র অংকণে লেখক অযথা বাজারে রোমান্তিকতার অপব্যবহার করেছেন। তাঁর দেয়ালে গান্ধী, লেনিন ও রবীন্দ্রনাথের ছবি (পৃঃ ২৪১) শোভা পায়। জমিদারের শিক্ষিতা কন্যা শিখা তাঁর প্রেমে পড়ে, অন্যদিকে গেঁয়ো অর্ধশিক্ষিত মেয়ে মাধবী। অথচ দেশের সর্বহারাদের মুক্তির জন্য গলদ্‌ঘর্ম প্রবীর এঁদের প্রেমচর্চায় আমল দিতে অবসর পায় না। শিখা আত্মহত্যা করে, মাধবী তার ধৈর্যের পুরস্কার পায়। মাধবীর সহজাত লজ্জাশীল স্বভাবের সংগে শিখার ছটফটে উদগ্র স্বভাবের বেশ কিছুটা তুলনা করা হয়েছে। মাধবীর ভাই নন্দ যাত্রার গাইয়ে ; একদিন নৌকা চালাতে চালাতে হঠাৎ ভিন্‌গাঁয়ের মেয়ে কাজললতাকে দেখে প্রেমপরবশ হয়ে পড়ে, অবশেষে

প্রবীরের পরামর্শে একটু 'ইলোপ' মতন করে তাকে বিবাহ করে। ওদিকে ফ্যাক্টরীর বারবনিতা ললিতা 'ওস্তাদ' নন্দের প্রেমে পাগল; নন্দও কিরকম করে বিবাহান্তে দুর্বল মুহূর্তে তার খপ্পরে পড়ে যায়। এই নিয়ে এক গার্হস্থ্য কলহের পর নন্দ গৃহত্যাগ করে যুদ্ধে নাম লেখায়। এরপর 'ঝড়' —অর্থাৎ ৪২ এর আন্দোলন। গান্ধীপন্থী সুব্রত (প্রবীরের বন্ধু) আত্মগোপন করলো; প্রবীরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। প্রেয়সী মাধবী যথারীতি অশ্রুবর্ষণ করলো।

মোটামুটি এই হচ্ছে কাহিনী। কাহিনীর গতি অত্যন্ত শ্লথ। মানসিক বিশ্লেষণেও খুব একটা অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া গেল না। নন্দ ও প্রবীরের প্রেমকাহিনীর সংবাদ উপন্যাসটির দশআনা জায়গা জুড়ে আছে। অন্যান্য অংশ ষ্ট্রাইক্, 'পটভূমি'-পরিবর্তনের সংবাদ-পত্রসুলভ বর্ণনা, কতকগুলি টাইপ চরিত্রের কথোপকথন ইত্যাদিতে ভরপুর। চরিত্রগুলি অত্যন্ত stereotyped। কোন চরিত্রই মনে তেমন স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে না কেমন যেন সরলীকৃত পটের মানুষদের মত মনে হয়। নায়ক নন্দ ও প্রবীর সুন্দর চেহারার যুবক। বারবনিতা ললিতা অপূর্ব সুন্দরী, কাজললতা ও মাধবী ততোধিক। অর্ধশিক্ষিত নন্দ এখানে বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাসের তুখোর নায়কের ভাষায় কথা বলে, "কি সুন্দর তোমার চুলগুলো কাজললতা! কালোরাত এসে বাসা বেঁধেছে বুঝি এখানে?" (পৃঃ ৮৭) এককথায়, 'ভারতী' যুগের ভাবালু দৃষ্টিভংগীকে নতুন বোতলে চালান দেওয়া হয়েছে। ছোট গল্পের মাধ্যমে নবেন্দুবাবু যে সাহিত্যিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন,—আশংকা হয়, 'প্রান্তরের গান' তা' বহুলাংশে নষ্ট করবে।

—রবি চক্রবর্তী

সংকলন ও সাময়িকী

ছাব্বিশে জানুয়ারী: সম্পাদক, জ্যোৎস্না সিংহরায় (বুক্‌ক্রাফট; ৫৭, হ্যারিসন রোড; দাম—১৷৹)

নাম শুনেই বোঝা যায় সংকলনটি কি জাতীয় অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। আজকাল সংকলন-গ্রন্থের দল ভারী। তবু, এদের মধ্যে 'ছাব্বিশে জানুয়ারী'র উদ্দেশ্যটা একটু নূতন। 'বামপন্থী' সাহিত্য সংকলন অথবা কোন বিশেষ দেশ বা ব্যক্তি সম্বন্ধে রচনা-গ্রন্থন বাঙলা-সাহিত্যে হচ্ছে ও হয়েছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিনের শুদ্ধ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে এই ধরণের সংকলন গ্রন্থ বড় বেশী চোখে পড়েনি।

সংকলনটি পাঁচমিশেলী,— গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সমন্বয়। প্রত্যেকটি রচনারই মূল অনুভূতি এক —দেশাত্মবোধ। সাহিত্যিক মশলা হিসাবে এই 'দেশাত্মবোধ' বস্তুটির অপব্যবহার বা দুর্ব্যবহারের আশংকা আছে। অনুভূতিটি একটু সহজদাহ্য হওয়ার দরুণ সুকুমার বৃত্তিগুলিকে ঠিক খাতির করে না। তাই প্রবন্ধের বদলে হয়তো পাই মেঠো বক্তৃতার রাজ-সংস্করণ, কবিতার বদলে রৌদ্ররসাপ্লুত যাত্রা গানের মার্জিত রূপ, এবং গল্পের নামে নায়ক-নায়িকা ও লেখকের বকবকম্। 'দেশাত্মবোধ,'—অনেকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলবেন, 'অশ্রদ্ধা করতে নেই!'

সুখের বিষয়, 'ছাব্বিশে জানুয়ারী'র রচনাগুলিতে এই উদ্দামতা বেশি নেই। অনেকগুলি রচনাই বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, পরিষ্কার। প্রবন্ধের মধ্যে নীহাররঞ্জন রায়ের 'ছাব্বিশে জানুয়ারী' ও গল্পের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পতাকা' বেশ তৃপ্তি দিল। এই দুটি রচনায় বেশ সম্পূর্ণতার আস্বাদ আছে।

নরেন্দ্রবাবু আমাদের সুকুমার প্রবৃত্তিকে অযথা আঘাত না করে মিহিসুরে যা' বলতে চেয়েছেন তা' শুধু হৃদয়কেই স্পর্শ করে না, বুদ্ধিকেও ছুঁয়ে যায়। অথচ, তাঁর ঋজু বক্তব্য কোথায়ও কাহিনীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। তাঁর গল্পটি গল্প হয়েছে, নীতিমূলক ছেলেভোলানো কাহিনী হয়নি।

কবিতাবিভাগে সজনীকান্ত দাশের কবিতাটি আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। যাঁরা সজনীকান্ত দাশকে কবি বলে মনে করেন অথবা যাঁদের তাঁর বুদ্ধির ওপর কিছুমাত্রও আস্থা আছে, তাঁরা এই কবিতাটি পড়লে উপকৃত হ'বেন। যিনি বুদ্ধদেব বাবু বা জীবনানন্দ দাশের ওপর অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না, তিনি নিজে কত নিকৃষ্ট জাতের কবিতা লিখতে পারেন, এখানে তার চাক্ষুষ প্রমাণ রইল। কবিতার মধ্যে অজিত দত্ত ও দিনেশ দাসের কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধবিভাগে কয়েকটি দায়-সারা-গোছের রচনা আছে। এদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি অন্যতম; এইধরণের প্রবন্ধ না লিখলেই তিনি ভালো করতেন।

—রবি চক্রবর্ত্তী

সঞ্চয়ন—শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সংকলিত। ইংং পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম—৸৹।

জয়শ্রী (মাসিক পত্র)—লীলা রায় সম্পাদিত। ৪৭।এ রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা। প্রতিসংখ্যা—।৹

কয়েকটি গল্প কবিতা ও প্রবন্ধকে একত্র সমাবেশ করে 'সঞ্চয়ন'কে একটি সংকলনগ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। কোন রচনাই সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। এ গুলো ছাপিয়ে বাজারে বের করার যে কি সার্থকতা থাকতে পারে বুঝিনা। এর মধ্যে সম্পাদকের নিজের গল্প 'চলার পথ' তবু কিছু মান বাঁচিয়েছে।

দীর্ঘ ছয় বৎসর অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর জয়শ্রী আবার নব-কলেবরে আত্মপ্রকাশ করলো। সাহিত্য সাধনাই জয়শ্রীর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধান জয়শ্রীর অন্যতম উদ্দেশ্য। সে দিক থেকে এই পত্রিকাটি তার পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে সে আশা আমাদের আছে। তার যাত্রাপথ এবার সুগম হোক এই কামনা করি।

নিবেদন

এই সংখ্যার সঙ্গে পূর্ব্বাশা'র নবম বর্ষ শেষ হইল। সুতরাং যাঁহারা পুনরায় নূতন বৎসরে পূর্ব্বাশার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বেই আমাদিগকে তাহা জানান। কোন নির্দ্দেশ না পাইলে আমরা বৈশাখসংখ্যা পূর্ব্বাশা যথারীতি ভি পি যোগে পাঠাইব।

কর্ম্মাধ্যক্ষ
পূর্ব্বাশা